সকল দিক হইতে জানিতে পারা যায় এমন কোন গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নাই। সেই অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে আমরা কয়েক জন বন্ধুতে মিলিয়া এই গ্রন্থের সূচীপত্রের খসড়া করি, তখন আমার উপর বোধ হয় তিন চারিটি পরিচ্ছেদের ভার অর্পিত হয়, কথা ছিল অবশিষ্টাংশ অন্যেরা লিখিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঁচটি পরিচ্ছেদ ব্যতীত এ গ্রন্থের সমস্তই আমাকে একা করিতে হইয়াছে। একই ব্যক্তিকে শাসনসংস্কার হইতে ধর্ম সংস্কার পর্য্যন্ত সকল বিষয় লিখিতে হইলে, ভুল যে আশানুরূপ হইতে পারে না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।" আমি আরও লিখিয়াছিলাম যে, পাঠকগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দেন ত দ্বিতীয় সংস্করণে সেইগুলি শুধরাইয়া লইব। দুঃখের বিষয় স্বাধীন ত্রিপুরার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বাহাদুর ব্যতীত কেহ আমাকে পত্রের দ্বারা কোনো ভ্রম সংশোধন করেন নাই। তাঁহার কাছে আমি [illegible]

[illegible] তিন বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়; [illegible] বৎসর পরে এই গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশিত হইল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের [illegible] হওয়াকে দেশের না লেখকের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব [illegible] পারিতেছি না। [illegible] যে দেশকে জানিতে চান—ইহা

হয়—এ ... ১৯২১ সালেরটি ব্যবহার করিয়াছি। তা ... সরকার ... বাৎসরিক Statistical Abstract, Sea-born Trad প্রভৃতি ... হইতে ... যথাসম্ভব আজ-তক (up-to date) করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভারতে জাতীয় আন্দোলন প্রতিদিন নব নব আকার ধারণ করিয়া চলিয়াছে—সুতরাং এ বিষয়কে আজ-তক করা অসম্ভব। আরও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আজ-তক করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদিগকে ... আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। রা... শ্রীযুক্ত ... রায় মহাশয় 'প্রাণী' ও 'উদ্ভিদ' পরিচ্ছেদ দুটি লিখিয়াছেন। আমার ... বন্ধু ও আত্মীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত হীরালাল রায় এ-বি, ... অব ইঞ্জিনিয়ারিং (বার্লিন), বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ভারত-শাসন পরিচ্ছদটি লিখিয়াছেন। আমার ... শ্রীমতী সুধা... দেবী বি-এ, ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, সমাজ ... শিখসমাজ প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে ... এই বৃহৎ গ্রন্থের ব্যবহারকে সুগম করিয়াছে ... এই গ্রন্থের বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী বা Bibliography একটি বিশেষত্ব। ইহা বিশ্বভারতীর উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রী শ্রীমতী ইভা বসু বহুযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিতদের নাম উল্লেখ করিতে চাই: বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এ-বি (বিসকন্সন), পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার এ-বি, (হার্ভার্ড), সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগের শ্রীযুক্ত বরদাচরণ গুপ্ত। এতদ্ব্যতীত প্রথম সংস্করণ লিখিবার সম...

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ্-ডি (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ পরোক্ষভাবে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সকল পুস্তক আবশ্যক হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই বিপুল বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার হইতে পাইয়াছি। এই গ্রন্থালয়ের অধ্যক্ষতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় আমার পক্ষে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হইয়াছে। আমাদের মধ্যে জ্ঞানালোচনার দীপ নিয়ত উজ্জ্বল রাখিবার জন্য যাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি সর্বদা আমাদের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে সেই আশ্রম-আচার্য্য বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতাচার্য্য রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে স্মরণ না করিলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অসম্পূর্ণ থাকিবে। গ্রন্থখানির অর্দ্ধেকের উপর তিনি স্বয়ং পাঠ করিয়া বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যাঁহার জন্য প্রকাশিত হয় তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া ভূমিকার উপসংহার করিতে পারি না। ধনে, জ্ঞানে ও বিনয়ে যিনি সমভাবে সম্পদবান্—দেশের সেই বরপুত্র বন্ধুশ্রেষ্ঠ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের দান, সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত হইত না। এই গ্রন্থ তিনি 'হৃষীকেশ সিরিজ'-এর অন্তর্গত করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন; তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার মত ভাষা আমার নাই। অন্যত্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া তিনি আমাকে বিশেষভাবে পুনরায় কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধিয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন: "ভারত-পরিচয় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি।

এতগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না। আমি যতদূর জানি এ প্রকার গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে অন্যান্য বিষয় বৃদ্ধিতাকারে সন্নিবেশিত হইবে।" আমিও আজ আশা করিতেছি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিয়াছি; কারণ গ্রন্থখানি প্রথম সংস্করণ হইতে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা বড় হইয়াছে। ঘটনা ও তালিকা সমূহ এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে গ্রন্থখানি বহু স্থলে নূতন হইয়াছে বলিলে কিছু বেশী বলা হয় না। দ্বিতীয় সংস্করণ যথার্থই সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

সর্বশেষে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য দায়ী বরদা এজেন্সীর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল। তিনি দুঃসাহস করিয়া পুনরায় গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন—আশা করি বাঙালী-পাঠক তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। দেশবাসীগণ দেশের যথার্থ অবস্থা জানুন সেই উদ্দেশ্যে আমি এই গ্রন্থ লিখিয়াছি, প্রকাশকও ইহা প্রকাশ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্যে। দেশের কথা প্রকাশ কারিতে গিয়া আমি কোথায়ও স্বেচ্ছায় কোনো ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করি নাই বা কোনো জাতি বা সরকারের অযথা নিন্দাবা বা স্তুতি করি নাই—ঐতিহাসিকের ন্যায় নিরপেক্ষ থাকিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অজ্ঞতাবশত ভ্রম-প্রমাদ হয় ত বিস্তর করিয়াছি—তাহার জন্য স[illegible] পাঠকগণের করুণা মাগিতেছি। কিন্তু কতকগুলি বানান ও ব্যব[illegible] আমার স্বেচ্ছাকৃত; যেমন 'র্ম্ম'এর স্থানে 'র্ম', বা 'র্ব্ব'এর স্থানে 'র্ব' ইত্যাদি। দ্বিত্বের কোনো প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু ইহার পথ-প্রদর্শক। তারপর, প্রথমতঃ দ্বিতীয়তঃ ইত্যাদি শব্দের শেষে বিসর্গ আমি কোথায়ও দিই নাই। বাংলায় ইহার প্রয়োজন বোধ করি না।

'গ্রন্থপঞ্জী' (Bibliography) দেখিয়া কেহ মনে না করেন যে, লেখক সকলগুলি বই-ই পড়িয়াছেন। তবে তাহার অনেকগুলিই আমি ব্যবহার করিয়াছি। গ্রন্থপঞ্জী দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা এ বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে চান তাঁহাদিগকে পথ নির্দেশ করা। নির্ঘণ্ট (Index) খুবই বিস্তৃতভাবে দিয়াছি। নির্ঘণ্ট এই শ্রেণীর গ্রন্থের সর্বপ্রথম প্রয়োজন।

আশ্বিন, ১৩৩৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত সূচী

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগ

চতুর্থ ভাগ

পঞ্চম ভাগ

ষষ্ঠ ভাগ

সপ্তম ভাগ

অষ্টম ভাগ

নবম ভাগ

প্রথম ভাগ

তৃতীয় ভাগ

চতুর্থ ভাগ

৩। ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা—

পঞ্চম ভাগ

ষষ্ঠ ভাগ

সপ্তম ভাগ

৪। শুল্কের ইতিহাস—

৫। আয়-ব্যয়—

৮। ব্যয়বৃদ্ধির কারণ—

৯। 'হোমচার্জ'—

১০। রেলপথ—

অষ্টম ভাগ

নবম ভাগ

প্রথম ভাগ

১। প্রাকৃতিক অবস্থা

।

ভারতবর্ষ ও ভারতসাম্রাজ্য বলিতে ঠিক একই স্থান বুঝায় না। ইংরাজ-অধিকৃত যে-স্থানের শাসনভার বড়লাটের উপর ন্যস্ত তাহাই ভারত-সাম্রাজ্য। বেলুচিস্থান, ব্রহ্মদেশ এমন কি বহু-দূরস্থিত এডেন এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; অথচ ভাষায়, ভাবে, ধর্মে মিল থাকা সত্ত্বেও সিংহলদ্বীপ ভারত-সাম্রাজ্যের বাহিরে; উহা বৃটীশ 'ক্রাউন কলোনী'। আমরা এ গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিব, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল আমাদের বিচারের অন্তর্গত হইবে না।

ভারতবর্ষ ও ভারত-সাম্রাজ্য

ভারত-সাম্রাজ্যের চৌহদ্দী বলিতে অনেকটা জায়গা বুঝায়। উত্তরে চীন, তিব্বত ও পূর্বতাতার এমন কি প্রাচীন রুশ-সাম্রাজ্যের কিয়দংশও ইহার সংলগ্ন। পূর্বসীমান্তে স্বাধীন শ্যামরাজ্য ও চীন অবস্থিত। আফগনিস্থান ও পারস্য পশ্চিমের সীমান্ত। দক্ষিণে কোনো দেশ নাই বলিয়া সমুদ্রই ভারতের দক্ষিণ সীমান্ত।

ভারতের প্রাকৃতিক সীমানা ভারতের রাজনৈতিক সীমানা হইতে

অনেক ছোট। উত্তরে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পর্বতমালা ভারতের উত্তর-সীমান্তের অধিকাংশ স্থানেই রক্ষা করিতেছে ;—কাশ্মীরের উত্তরে হিমালয় নাই বটে, তবে কারাকোরাম এবং [illegible] পর্বতমালা এমন-ভাবে সারি [illegible] তাহাদের প্রবেশ [illegible] নহে। পূর্বদিকে থাকে-থাকে পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া বহুদূর পর্যান্ত বিস্তৃত। পশ্চিমদিকে হলা স্থলেমান প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। ভারতের দক্ষিণে ভারত-মহাসমুদ্র, সে সমুদ্রের কূল নাই, প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাষ্ট্রের সহিত ইহার যোগ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে জলপথ দিয়া সকল জাতির সহিত যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে।

ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা

ভারতবর্ষকে বাহিরের পৃথিবী হইতে প্রকৃতি দুই উপায়ে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের উত্তরাংশ তিনদিক হইতে পর্বতের দ্বারা এমনভাবে বেষ্টিত যে, হঠাৎ কোনো জাতির পক্ষে সে-দিক দিয়া প্রবেশলাভ সহজসাধ্য নহে। দাক্ষিণাত্য অসীম সাগর দিয়া ঘেরা,—বাহির হইতে সমুদ্রপথে কাহারও আসা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সমুদ্রের দিক্ হইতে ভারত যে নিরাপদ নয়, য়ুরোপীয়দের আগমনের পর হইতে তাহা বুঝা গিয়াছে।

ভারতের ভূ-প্রকৃতিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের আলোচনা করিব। ১। পর্বত। ২। উপত্যকা। ৩। মালভূমি।

হিমালয়

ভারতের উত্তরস্থিত হিমালয় পর্বত একটিমাত্র পাহাড় নয় ; অসংখ্য পাহাড় থাকে-থাকে উঠিয়া গিয়াছে, ইহার মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড উপত্যকা ; সে-সকল উপত্যকায় য়ুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি দেশ থাকিতে পারে। এই সকল উপত্যকায় যে জাতিরা বাস করে তাহাদের রীতিনীতি, ধর্ম-বিশ্বাস,

ভাব, ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই স্বল্প। হিমালয় পূর্ব পশ্চিমে লম্বা প্রায় দেড় হাজার মাইল, প্রস্থে গড়ে প্রায় দুইশ' মাইল। ইহার উচ্চতা সব জায়গায় সমান নহে। ইহার পাদমূলের উচ্চতা ৫০০ ফিটের উপর নয়—কিন্তু সর্বোচ্চ শিখর ২৯ হাজার ফিট উচ্চ। ইহার তলদেশে তরাইএর বিখ্যাত বন—উপরে তৃণশূন্য প্রাণিশূন্য চিরতুষার। সুতরাং এত বড় পাহাড়ের নানা অংশে যে নানারূপ জলবায়ু, নানারূপ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। সেইজন্য শীত-প্রধান স্থানের বৃক্ষাদি ও জীবজন্তু এবং মধ্য-আফ্রিকার ন্যায় উষ্ণপ্রধান স্থানের প্রাণীসমূহ হিমালয়ে দৃষ্ট হয়। তরাইএর বনের প্রধান বৃক্ষ শাল, শিশু, খদির, আব্‌লুস এবং কার্পাস। হিমালয়ের পূর্বাংশে হস্তী, গণ্ডার, বন্য মহিষ, হরিণ, নানা প্রকার পক্ষী, কীট পতঙ্গ ও নানা প্রকার সরীসৃপ বাস করে। পশ্চিমাংশে পাইন, অর্জ্জুন, সেগুণ এবং দেবদারু বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। হিমালয়ের উর্দ্ধ অংশে চামরী গরু, কস্তুরিকা মৃগ, বন্য ছাগ ও মেষ, ভল্লুক ও নানাপ্রকার শিকারী পক্ষী দৃষ্ট হয়।

হিমালয় ভারতের আর্য্যসভ্যতাকে মোঙ্গলীয় প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তথাচ নূতন মানুষের সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া এই পর্বতপ্রমাণ বাধা কাটাইয়া বহু পথিক উপত্যকা দিয়া গতায়াত করিয়াছে। তিব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া শতদ্রু নদ যেখানে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে—সেইখান দিয়া একটি গিরিসঙ্কট আছে। ইহারই সম্মুখে শিম্‌লা শৈল—ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্র। দ্বিতীয় পথ আলমোরা ও নৈনীতালের নিকটবর্তী। সুতরাং রাজনৈতিক দিক হইতে ঐ দুটি স্থানের বিশেষত্ব খুব অধিক। তৃতীয় পথ শিকিমের ভিতর দিয়া বাংলাদেশে আসিবার জন্য। এখান দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসাতে যাওয়া যায়। এই পথের সম্মুখে দার্জিলিং। দার্জিলিং যে কেবলমাত্র বায়ু-পরিবর্তনের স্থান তাহা নহে,

রাজনৈতিক দিক হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। হিমালয়ের এই তিনটি প্রধান গিরিসঙ্কট বর্তমানে খুবই দৃঢ়রক্ষিত ; এইসকল স্থানে সর্বদাই অনেক সৈন্য থাকে। সুতরাং সে-পথ দিয়া কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই।

ভারতের পশ্চিম সীমান্ত ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। এখানকার পাহাড়-গুলি তৃণশূন্য বারিশূন্য মরুসম, পূর্বদিকের একেবারে বিপরীত। আফগনিস্থানের বন্ধুর ও পার্বত্যভূমি হইতে দুই একটি মাত্র নদীর ধারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

পশ্চিম সীমান্ত

যেখানে কাবুল নদী পাহাড় ভেদ করিয়াছে, সেখানে 'খাইবার' গিরিসঙ্কট। পশ্চিম হইতে অনেকেই এই পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া বোধ হয় আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; এই দ্বার দিয়াই শক্, হুন, যুকি, গ্রীক্‌গণ আসিয়াছিল। এই পথ দিয়া পাঠান আসিয়া ভারতে নূতন ধর্ম প্রচার ও মুঘল আসিয়া সভ্যতার নূতন স্তর সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসে পশ্চিম সীমান্ত সুপরিচিত। সেইজন্য ভারত-সরকার এই দ্বারটিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন ও এখনো প্রতি বৎসর করিতেছেন। এই পথ ব্যতীত আরও কয়েকটি পথ আছে। তাহাদের মধ্যে 'বোলন' গিরিসঙ্কট সমধিক বিখ্যাত। কিন্তু বোলন-পথ ভারতে প্রবেশের পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। ইহার কারণ তাহার উভয় দিকে মরুভূমি—একদিকে বেলুচিস্থানের মরু, অপরদিকে সিন্ধু ও রাজপুতনার 'থর' ; আসিবার পথে মরুভূমি, গিরিসঙ্কট পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াও আবার মরুভূমি ; সুতরাং বাহিরের শত্রুর লোভ করিবার মত এপথে কিছুই নাই। নানা কারণে ভারতের সীমান্ত বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন বেলুচিস্থানের মালভূমিতে সীমান্ত-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত দুরারোহ পর্বতদ্বারা বেষ্টিত না হইলেও দুর্ভেদ্য অরণ্য ও অসভ্য জাতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ। পূর্বদিকে পাহাড়গুলি উত্তর হইতে দক্ষিণে সমান্তরালে বিস্তৃত। মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, তিব্বতের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা-পাহাড়গুলি পৃথিবী সৃষ্টি হইবার সময়ে যেন মোচড় খাইয়া বাঁকিয়া বর্মাদেশে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া গিয়াছে। সমগ্র উত্তর-বর্মা পাহাড়ে পরিপূর্ণ ; এ ছাড়া পূর্বদিকে খুব বৃষ্টি হয় বলিয়া এখানকার পাহাড়গুলি বনে পরিপূর্ণ। এখানে বন গহন ও পর্বত দুর্লঙ্ঘ্য সেইজন্য দেখা যায়, ভারত-ইতিহাসে যাহাকে দেশ-আক্রমণ বলে তেমন ব্যাপার পূর্বদিক হইতে কখনো হয় নাই। তবে মোঙ্গলীয় জাতির কোনো কোনো অংশ ছাঁকুনীর ভিতর দিয়া দুই চারিটা কণার মত বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। মণিপুরী, টিপ্‌রা, লুশাই, খাশিয়া, নাগা, গারো প্রভৃতি তাহাদের নিদর্শন। আসামের উত্তরপূর্ব কোণ-সম্বন্ধে ইংরাজ-সরকারের জ্ঞান বহুকালাবধি নিতান্তই কম ছিল, অথচ সেইখানেই চীন সাধারণতন্ত্রের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার 'আবর' নামে এক আদিমজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পাঠাইয়া ব্রিটীশরাজ এই অজ্ঞতা দূর করিয়াছিলেন।

পূর্ব সীমান্ত

বহুকাল পূর্বে হিমালয় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। শিমলার নিকটস্থ শিবালিক পাহাড়ে যে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেকগুলির নিদর্শন কলিকাতার যাদুঘরে আছে। দাক্ষিণাত্য তখন উত্তরভারত হইতে পৃথক। অনেকে অনুমান করেন, আফ্রিকার সহিত তখন ভারতের যোগ ছিল। হিমালয়-পাহাড়ধোয়া মাটি সাগরতল ভরিয়া তুলিয়া, পঞ্জাব, সিন্ধু, গঙ্গা-উপত্যকা ও আসামকে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিয়াছে।

সমতলভূমি ও নদী

হিন্দুস্থানের নদীগুলি দেশগঠন ও ধ্বংসের কার্য্য একাধারে করিতেছে। এখানকার নদীগুলি উচ্চ পর্বতের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া ভীমবেগে সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসে। আসিবার সময়ে পাথর গুঁড়া করিয়া মাটি ধসাইয়া প্রচুর মৃত্তিকা নদীজলের সঙ্গে ধুইয়া আনে। সিন্ধুনদ হিমালয়ের উত্তরে উৎপন্ন; ইহার ১৮০০ মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৮৫০ মাইল পাহাড়েই অবস্থিত; এই পার্বত্যপথে সিন্ধু ১৪০০০ফিট নামিয়াছে এবং তাহার পরে অবশিষ্ট ৯৫০ মাইল ২০০০ ফিট্ মাত্র নামিয়াছে। পঞ্জাবে সিন্ধুনদের সংহারমূর্তি—সিন্ধুপ্রদেশের বদ্বীপে তাহারই সৃজনমূর্তি দেখা যায়। আলিক্‌জেণ্ডারের সময়ে সিন্ধুর মোহনা যেখানে ছিল, এখন সমুদ্র সেখান হইতে অনেক দূরে। সিন্ধুর অন্যান্য উপনদী-গুলিও সিন্ধুর ন্যায় ধ্বংসকার্য্য করিতে নিপুণ বটে তবে গড়িবার শক্তি ইহাদের নাই। এইজন্য পঞ্জাবে প্রাচীন আর্য্যদের কোনো স্মৃতিচিহ্ন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্তই নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

হিন্দুস্থানের একটি পর্বত উত্তরভারতের নদীপথের ধারা বদলাইয়া দিয়াছে। শিবালিক পর্বত মধ্যে থাকায় শতদ্রু ও গঙ্গা খুব কাছাকাছি স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াও বিভিন্ন দিকে গতি লইয়াছে। হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি। পাহাড়ের মধ্যে প্রথম ১৮০ মাইল পথ আসিতে গঙ্গা প্রায় ১৩ হাজার ফিট্ নামিয়াছে। তাহার পরই সমতল ভূমি; সেই ১৩৭০ মাইল পথে গঙ্গা হাজার ফিট্ নামিয়াছে। সেইজন্য এখানে ইহার গতি মন্দ; বাংলা-দেশে আসিয়া প্রতি মাইলে ৪ ইঞ্চি মাত্র নামিয়াছে এবং কলিকাতার দক্ষিণে সে বেগ আরও হ্রাস পাইয়াছে। গঙ্গার পলিতে দক্ষিণ বঙ্গ গঠিত হইয়াছে ও আজও সুন্দর (সুঁদোর) বনের বদ্বীপ নির্ম্মিত হইতেছে। বাংলাদেশের এই গঠন-কার্য্যে আরও অসংখ্য নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রভাব বিশেষভাবে

হিন্দুস্থানের নদী

উল্লেখযোগ্য। তিব্বত হইতে এই নদী নির্গত হইলেও জলপথে তিব্বত হইতে এদেশে আসা-যাওয়া করা যায় না। ইহার কারণ তিব্বত অতি উচ্চ মালভূমি; সেখান হইতে আসামের কোণে যেখানে ব্রহ্মপুত্র প্রবেশ করিতেছে সেখানে জলস্রোত খুবই প্রখর। এই নদী প্রচুর মৃত্তিকা আনিয়া বঙ্গদেশকে গড়িয়া তুলিতেছে। কিন্তু গঙ্গা একদিকে যেমন গড়িতেছে সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা ও মেঘনা উভয় তীরের অনেক নগর-গ্রাম গ্রাসও করিতেছে। ব্রহ্মপুত্রের বিশাল জলরাশিতে গঙ্গার ক্ষীণ ধারা পড়াতে গঙ্গার বেগ কিয়ৎপরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ও ফলে ইহার পলিমাটি বাংলাদেশের অন্যান্য ছোট খাটো নদনদীর গর্ভ ভরাট করিয়া জলের পথ বন্ধ করিয়া দিতেছে। ইহার ফলে বাংলায় জল চলাচলের প্রাকৃতিক পথগুলি বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুস্থানের সকল নদীই যে হিমালয় হইতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে; মধ্য-ভারতের মালভূমি হইতে অনেকগুলি নদী গঙ্গা ও যমুনায় আসিয়া পড়িয়াছে। তবে তাহাদের প্রকৃতি অন্যরূপ; বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ইহাদের অদৃশ্য জলধারা বালুরাশির মধ্য দিয়া বহিতে থাকে; বর্ষাকালে চারিদিকের মৃত্তিকা-মিশ্রিত জলরাশি লইয়া ইহারা ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া চলে। এই সকল নদী নৌতার্য্য নহে, কারণ বর্ষাকালেই ইহাদের স্রোত প্রবল, অন্যান্য সময়ে জল এত অল্প থাকে যে, হাঁটিয়া নদী পার হওয়া যায়।

হিন্দুস্থানের নদীগুলি কৃষির খুব বড় সহায়। অনেক নদী বর্ষাকালে কূল ছাপাইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দেয়; অন্য অনেকগুলি হইতে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করা যায়। এই সকল নদীর মৃত্তিকা পাহাড় হইতে আসে বলিয়া খুব তাজা সারের কাজ করে। এছাড়া হিন্দুস্থানের বিশেষতঃ বাংলাদেশের নদীগুলি বড় রাজপথ বিশেষ। গঙ্গার প্রায় হাজার মাইল (কাণপুর পর্য্যন্ত) নৌকা করিয়া যাওয়া যায়।

কিন্তু সিন্ধুর মোহনা হইতে চার মাইল মাত্র নৌতার্য্য। এদিকে ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত নৌকা এমন কি বড় বড় জাহাজও যাইতে পারে।

এককালে এই সকল নদীই ছিল ভারতের বাণিজ্যের পথ। ছোট-খাটো বণিক ব্যাপারীরা গ্রামের জিনিষ সংগ্রহ করিয়া ছোট নৌকা বা পান্‌শী করিয়া নিকটস্থ হাটে যাইত; আবার বড় বড় ব্যবসায়ীরা গঙ্গা-তীরস্থ তীর্থস্থান ও রাজধানীগুলিতে পণ্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইত। বর্ত্তমানকালে নদীপথে যে বাণিজ্য চলে তাহা নিতান্ত সামান্য না হইলেও সমগ্র বাণিজ্যের তুলনায় তুচ্ছ। এখন রেলপথেই অধিক বাণিজ্য চলে। নদীপথের প্রধান অসুবিধা (১) ব্যবসায় কারবারী-আকারে করিতে গেলে ছোট ছোট নৌকা করিয়া জিনিষপত্র আনা-লওয়া পোষায় না, অথচ বড় বড় ষ্টিমার অধিকাংশ নদীতে চলে না। (২) নদীগুলির পথ ঠিক থাকে না, ইহারা প্রায়ই পথ পরিবর্ত্তন করে।

আর্য্যাবর্ত্তের ভূ-প্রকৃতি ও ইতিহাস

প্রাচীন হিন্দুস্থানের সভ্যতার কেন্দ্র পঞ্চনদ না হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত কেন হইল, একথা অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। ইহার একটি ভৌগলিক কারণ আছে। পঞ্জাবে দুই কারণে কোন জিনিষ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। প্রথমটি প্রাকৃতিক—সেখানকার নদীসমূহের অস্থিরতা। দ্বিতীয় হইতেছে রাজনৈতিক। 'খাইবার' গিরিসঙ্কট সুরক্ষিত না থাকায় জাতির পর জাতি এখান দিয়া প্রবেশ করিয়াছে; পঞ্জাব ছিল তাহাদের শিবির ও রণক্ষেত্র। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত বা গঙ্গা-উপত্যকায় প্রবেশ করা সহজ নহে; এখানকার প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ। রাজপুতনার মরুভূমি ও আরাবল্লীর পাহাড় একেবারে দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অপর দিকে শিবালিক দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে; সুতরাং ইহার মাঝখানে যে জায়গাটি আছে তাহা নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। এই স্থানটিই

প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ—বর্তমান যুগের দিল্লী। যুগে যুগে এইখানে যিনি রাজা হইয়াছেন তিনি বাহিরের শত্রুকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছেন; লোকেও তাঁহাকে রাজচক্রবর্তী বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এই দিল্লীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের পতন হইয়াছে। ইহারই নিকটে ভারতের বিখ্যাত যুদ্ধগুলি হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, ফতেপুর শিক্‌রি, পানিপথের তিনটি যুদ্ধ, সবগুলিই দিল্লীর নিকটে। সেইজন্য মুসলমানরা আসিয়া দিল্লীতে রাজধানী করিয়াছে, ইংরাজও অবশেষে সেখানে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রাকৃতিক ভূগোলের সহিত ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ যে অভেদ্য ইহাই তাহার অন্যতম উদাহরণ।

ভৌগলিক দিক হইতে ইংরাজদের ভারতবর্ষ অধিকারকে বিচার করিলেও আমরা দেখিব এক্ষেত্রে ভৌগলিক সংস্থান তাহাদের কতটা সহায়তা করিয়াছিল। ফরাশীরা আসিয়া দক্ষিণ-ভারতে প্রথম রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করে; ইংরাজ তাহাদের প্রধান কেন্দ্র করিয়াছিল বঙ্গ-দেশে। বাংলার নদীপথ সুগম; গঙ্গা ও অন্যান্য নদনদী বাহিয়া উত্তর-ভারতের অন্তরের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সৈন্য লইয়া যাওয়া সহজ ছিল। পশ্চিমের আক্রমণকারীরা উত্তর-ভারত হইতে নদীপথে নামিয়া পূর্বাঞ্চল জয় করে; ইংরাজেরা পূর্বদিক হইতে উঠিয়া উত্তর-ভারতের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু ফরাশীরা যেখানে সাম্রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেই দাক্ষিণাত্য বন্ধুর পার্বত্য দেশ, বৃহৎ নৌতার্য্য নদী সেখানে নাই। এই চলাফেরার অসুবিধা ফরাশীদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

দাক্ষিণাত্য খুব প্রাচীন দেশ। এখানকার উচ্চতা গড়ে প্রায় তিন হাজার ফিট্। এই উচ্চতা ক্রমেই দক্ষিণের দিকে বেশী। তিনটী পর্বত-শ্রেণী এখানকার ভূপ্রকৃতির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

দাক্ষিণাত্য

বিন্ধ্যাচল ভারতের কটিবন্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া দাক্ষিণাত্যকে আর্য্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব ও

পশ্চিম-ঘাট নীলগিরি পাহাড়ে গিয়া মিশিয়াছে। এখানে একদিক হইতে আর একদিকে যাইতে হইলে পালঘাটের গিরিসঙ্কট দিয়া যাইতে হয়।

মোটের উপর দাক্ষিণাত্য বন্ধুর ও পার্বত্য। পশ্চিমঘাট পূর্বঘাট অপেক্ষা অনেক উচ্চ। এখানে বৃষ্টি কম ও দেশ বন্ধুর বলিয়া নদীগুলিও তেমন ভাল হইতে পারে নাই। নর্মদা ও তাপ্তী ব্যতীত গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি সমস্ত নদীই বঙ্গ-সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। এখানকার নদীগুলি প্রস্রবণরূপে নিম্নভূমিতে পড়াতে এই বিপুল শক্তিকে কাজে খাটাইবার চেষ্টা হইতেছে। মহীশূর রাজসরকার কাবেরী জলপ্রপাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তাহা বহুবিধ কাজে লাগাইতেছেন।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি কৃষির পক্ষে অনুপযোগী হইলেও খনিজ পদার্থে সম্পদবান। কিন্তু শিল্পোন্নতি কেবল খনিজের উপর নির্ভর করে না; খনিগুলি সহজে মনুষ্যগমনোপযোগী স্থানে অবস্থিত হইবারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রধান অসুবিধা এই যে, খনিগুলি সমুদ্র উপকূল হইতে অনেকদূরে; তারপর নিকটে বড় নদী নাই এবং নৌতার্য্য খাল করিবারও সুবিধা কম। রেলওয়েই একমাত্র পথ; কিন্তু জমি বন্ধুর ও সমগ্র দেশ পার্বত্য বলিয়া রেলপথ নির্মাণের খরচ খুব বেশী পড়িয়া যায়। এসকল অঞ্চলে লোকজনের বাস কম ও অন্যান্য প্রকারের কারবার না থাকায় খরচের সমস্ত চাপ খনিদারদের উপর পড়ে; সেই জন্য লাভের ভাগ খুব কমই থাকে। এছাড়া আর একটি অসুবিধা এই যে, ভারতের খনিগুলি তেমনভাবে দেশের নানাস্থানে ছড়াইয়া নাই—একস্থানেই আবদ্ধ; যেমন—ভারতের কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়াতে আছে। এইরূপ অসামঞ্জস্য শিল্পোন্নতির খুবই অন্তরায়।

সমুদ্রোপকূল থাকা না থাকা বহুকাল আমাদের পক্ষে অবাস্তব ছিল। য়ুরোপীয়দের আগমনের পূর্বে সমুদ্র হইতে বিপদের আশঙ্কা কেহ কখনো

করে নাই। ভারতের উপকূল নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু ভাল বন্দর হইবার মত স্থান সেখানে খুবই কম। উপকূল থাকিলেই যে তাহা বন্দর-নির্মাণের অনুকূল হইবে তাহা নহে। বাংলাদেশের দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূল থাকিলেও উপযুক্ত বন্দর নাই। চট্টগ্রাম একটী বড় বন্দর বটে; কিন্তু বাংলাদেশের এক কোণে থাকাতে তাহার সম্পূর্ণ সুবিধা ব্যবসায়ীরা পাইতে পারে না। সুন্দরবনের নদী-নালা দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ আসিতে পারে না; এমন কি কলিকাতার বন্দরেও বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে কষ্ট পায়। গঙ্গানদীর মোহনায় অত্যন্ত 'চর' পড়ে বলিয়া সেখান দিয়া আসা-যাওয়া খুব কঠিন। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে পথ দেখাইয়া কেহই আনিতে পারে না। এছাড়া পূর্ব্বে বলিয়াছি বাংলাদেশের নদনদীগুলিতে বালি পড়িয়া ভরিয়া আসিতেছে। গঙ্গার এই অসুবিধার সঙ্গে রাতদিন সংগ্রাম করিতে হইতেছে ও ড্রেজিং মেশিন দিয়া জল ঘুলাইয়া নদীগর্ভকে ঠিক রাখিতে হইতেছে। এই সব কারণে কলিকাতার বন্দর রক্ষা করা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এসব ছাড়া বঙ্গোপসাগরের ঝড়ও উত্তম বন্দর হইবার পক্ষে বড় রকম অন্তরায়।

সমুদ্রোপকূল

মাদ্রাজের করমণ্ডল উপকূলে ঝড়ের উৎপাতে ভাল বন্দর নির্মাণ করা সুকঠিন। মাদ্রাজের উপকূল ক্রমশঃ সাগরের মধ্যে প্রবেশ করাতে বহুদূর পর্য্যন্ত সাগরের জল অত্যন্ত কম; সেইজন্য জাহাজ তীরে আসিতে পারে না।

পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পাহাড় সাগর হইতে প্রায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই উপকূলে যাওয়া-আসার সুবিধা কম। বর্ত্তমানকালে কেবলমাত্র বোম্বাই ও প্রাচীনকালে বরোচ বা ভৃগুকচ্ছ ও সুরাট বন্দর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

২। জলবায়ু

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র জলবায়ু দেখা যায়। পৃথিবীর আর কোথাও এমন বৈচিত্র্য দেখা যায় কিনা সন্দেহ। বৎসরের এক-সময়ে হিন্দুস্থানের এক অংশের ক্ষেত, খাল, বিল জলে ভরিয়া উঠে, অপর অংশে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বৃষ্টির মুখ দেখা যায় না। বর্ষার সময়ে পার্বত্য প্রদেশে ও সমুদ্রতীরে বায়ু জলকণায় পূর্ণ হয়; আর গ্রীষ্ম বা শীতকালে শৈত্যের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না।

ভারতের ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ দক্ষিণের সমুদ্র হইতে যে হাওয়া আসে তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। মৈসুমবায়ু বৎসরে দুইবার দুইদিক হইতে ভারতে বহিয়া আসে। ইহার মধ্যে উত্তরপূর্ব দিকের বায়ু শীতকালে বহে। তখন হাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক এবং বৃষ্টির পরিমাণও নিতান্ত অল্প হয়। শীতের বৃষ্টি পঞ্জাবের শস্যের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়; মাদ্রাজেও বৎসরে এই এক-সময়েই বৃষ্টি হয়। দক্ষিণে-বাতাস ফাল্গুন মাস হইতে এদেশে বহিতে আরম্ভ করে। কিন্তু জলকণাসমেত বায়ু আসিতে আরও তিনমাস কাটিয়া যায়। সেইজন্য বৃষ্টি আরম্ভ হয় আষাঢ় মাসে। এই বর্ষা ও দক্ষিণে-হাওয়া প্রায় আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চলে। সেই সময় হইতে হাওয়া দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া উত্তর পথ দিয়া আসিতে সুরু করে; এই পথ-পরিবর্ত্তনের সময়ে আশ্বিনে-ঝড় হয়। সেইরূপ শীতকাল হইতে বর্ষাকালে বায়ুর গতিপরিবর্ত্তনের সময়ে বাংলাদেশের বিখ্যাত কালবৈশাখী ঝড় হয়।

মৈসুমবায়ু

দক্ষিণের মৈসুমবায়ু দাক্ষিণাত্যে লাগিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার একভাগ আরব সাগর দিয়া বোম্বাই অঞ্চলে প্রবেশ করে, অপরভাগ বঙ্গোপসাগর দিয়া বঙ্গদেশে ও বর্মাতে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে যে-হাওয়া প্রবেশ করে

বৃষ্টি

তাহা কোণাকুণিভাবে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখের খাশিয়া পাহাড়ে আসিয়া ধাক্কা খায়। প্রথম ধাক্কা যেখানে লাগে সেই স্থানটির নাম চেরাপুঞ্জী। পৃথিবীর আর কোথায় এত বৃষ্টি হয় না। এই জায়গাটিতে বৎসরে গড়ে ৪৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ১৮৬১ সালে ৮০৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছিল; এখানে একদিনে ২৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইতেও দেখা গিয়াছে। খাশিয়া পাহাড় হইতে বৃষ্টির হাওয়া ধাক্কা খাইয়া পশ্চিম দিকে চলিতে থাকে। মৈসুমবায়ু যতই পশ্চিম দিকে যায় বৃষ্টির পরিমাণ ততই কমিতে থাকে। সেইজন্য বঙ্গদেশে ৮০।৯০ ইঞ্চি, বিহারে ৫০ ইঞ্চি, যুক্ত-প্রদেশে ৪০ ইঞ্চি, পঞ্জাবে ২৩ ইঞ্চি ও সিন্ধুতে ৬ ইঞ্চি মাত্র বারিপাতের ফল দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে বৃষ্টি নামিবার প্রায় দুই সপ্তাহ আগে বোম্বাইএর পশ্চিমঘাটে বর্ষা নামে। এখানে বর্ষার চারি মাসে প্রায় ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। দাক্ষিণাত্যে আরবসাগর হইতে মৈসুমবায়ু যতই পূর্বদিকে বহিতে থাকে বৃষ্টির পরিমাণ ততই কমিতে থাকে। আরব সাগরের বায়ু কিয়ৎপরিমাণে গুজরাটে যায় এমন কি উত্তরে পঞ্জাবের দিকেও যায়। সেইজন্য পঞ্জাবের ও রাজপুতনার পূর্বদিকটাতে বঙ্গোপসাগরের ও আরব সাগরের উদ্বৃত্ত হাওয়া মিলিত হইয়া যে বর্ষণ করে, তাহা নিতান্ত কম নয়।

ভারতের বার্ষিক বৃষ্টির শতকরা ৯০ ভাগ বর্ষার চারি মাসে পাওয়া যায়। ভারতের কোথায় কোন্ সময়ে বর্ষা নামে তাহার তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মালাবার	৩রা জুন	বাংলা	১৫ই জুন
বোম্বাই	৫ "	বিহার	১৫ "
দাক্ষিণাত্য	৭ "	সংযুক্ত প্রদেশ	
মধ্য প্রদেশ	১০ "	(পূর্বাঞ্চল)	২০ "
মধ্য ভারত	১৫ "	(পশ্চিমাঞ্চল)	২৫ "
রাজপুতানা	১৫ "	পূর্ব পঞ্জাব	৩০ "

এই বৃষ্টির উপর ভারতের ধনপ্রাণ নির্ভর করিতেছে। ভারতের কৃষি সম্পূর্ণরূপে বর্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই বারিপাতের পরিমাণ বৎসর হইতে বৎসরান্তরে অত্যন্ত তফাৎ হইতে থাকিলে কৃষির বিশেষ ক্ষতি হয়। ইহাতে শস্য অসময়ে ধুইয়া যায়, নতুবা পুড়িয়া নষ্ট হয়। বৃষ্টি যদি না থামিয়া কিছুকাল ধরিয়া পড়িতে থাকে, তাহাতেও চাষের সর্বনাশ হয়, শস্য পচিয়া যায়; আবার কয়েক সপ্তাহ বৃষ্টি না হইলেও শস্য পুড়িয়া যায়। সেইজন্য বৃষ্টি হইলেই কৃষির উন্নতি হয় না—যথাসময়ে ও যথাপরিমাণে না হইলে কৃষকের সর্বনাশ। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, ১৯১৮ সালে ভারতের সর্বত্র বৃষ্টি খুব কম হইয়াছিল; স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হইতে প্রায় ৯ ইঞ্চি কম। ১৯১৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় ২½ ইঞ্চি বৃষ্টি কম হয় কিন্তু ভারতের অন্যত্র বৃষ্টির পরিমাণ ৬½ ইঞ্চি বেশী হয়।

ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টির পরিমাণ সাধারণতঃ কম; তার উপর সকল বৎসর সমান পরিমাণ হয় না। এই কারণে এই দুইটি প্রদেশ অন্নাভাবে ও দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশী ভোগে। প্রদেশসমূহের মধ্যে বাংলা ও বর্মা কথঞ্চিৎ নিরাপদ এবং এই দুই দেশে প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত বারিপাত হয়। ভারতবর্ষের কোথায় কিরূপ বৃষ্টি হয় তাহার একটা তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

ঝড় ঝঞ্ঝা

বর্ষার পূর্বে ও শীতের পূর্বে দুইবার মৈসুমবায়ুর গতিপরিবর্তনের সময় ভারতবর্ষে ঝড় হয়; কালবৈশাখী ও আশ্বিনে-ঝড় বাংলাদেশের খুবই সুপরিচিত। ১৯১৮ সালে ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের সর্বনাশের কথা সকলেই কাগজে পাঠ করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাগরে ও আরব সাগরে কতগুলি ঝড় হইয়াছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিতেছি; ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বঙ্গসাগরেই ঝড় বেশী হইয়া থাকে।

	জান	ফে	মা	এ	মে	জুন	জু	আ	সে	অ	ন	ডি
বঙ্গ সাগর	০	০	১	৪	১৩	২৮	৪১	৩৬	৪৫	৩৪	২২	৮
আরব সাগর	০	০	০	২		১৫	২	০	১	১	৫	০

ভারতবর্ষের জলবায়ুর এই বিচিত্রতা ইংরাজগণ বহুকাল হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। ১৭৯৬ সালে প্রথমে মাদ্রাজে জলবায়ু পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হয়। ইহার পর এক এক প্রদেশে এক এক সময়ে এই পর্য্যবেক্ষণ স্থরু হইয়াছে। ১৮৭৪ সালে ভারত-সরকার যাবতীয় বীক্ষণাগারগুলিকে একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন ভারতের কোথায় কিরূপ তাপ, বাতাসের চাপ ও গতি, ঝড়ের সম্ভাবনা কোন্-দিকে, বৃষ্টির পরিমাণ কত প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ভারতে চারিটি প্রথম শ্রেণীর ও ২৩১টি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বীক্ষণাগার আছে। এছাড়া সাম্রাজ্যের নানাস্থানে আড়াই হাজার বৃষ্টি মাপিবার যন্ত্র (Rain Gauze) প্রতিষ্ঠিত আছে। এইসকল কেন্দ্র হইতে বারিপাত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ফল প্রতিদিন আটটার সময়ে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শিমলায় প্রেরণ করেন। সেখানে প্রতিদিন ভারতের মানচিত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কলিকাতার আলিপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর বীক্ষণাগার আছে। এছাড়া বে-সরকারী বীক্ষণাগারের মধ্যে কলিকাতা সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজের যন্ত্রপাতি বিখ্যাত।

পরিশিষ্ট

ভারতবর্ষের কোন্ মাসে কতখানি বৃষ্টি হয় :—

জ্যৈষ্ঠ	...	২'৬ ইঞ্চি	ভাদ্র	...	৯'৫ ইঞ্চি
আষাঢ়	...	৭'১ „	আশ্বিন	...	৬'৭ „
শ্রাবণ	...	১১'২ „	কার্ত্তিক	...	৩'১ „

ভারতবর্ষের কোন্ দেশে কিরূপ বৃষ্টি হয় :—

অতিবৃষ্টির দেশ—

নিম্ন ব্রহ্মদেশ ...	১২৩ ইঞ্চি	আসাম ...	৯৮ ইঞ্চি
পশ্চিম উপকূল মালাবার	১২৭ „	বাঙ্গালা (দক্ষিণ) ...	৯২ „
পশ্চিম উপকূল কোঙ্কন	১০৯ „	পূর্ব বাঙ্গালা ...	৮৫ „

প্রচুর বৃষ্টির দেশ—

পশ্চিম বাঙ্গালা ...	৫৯ ইঞ্চি	মধ্য প্রদেশ (পূর্ব)	৫৩ ইঞ্চি
উড়িষ্যা ...	৫৭ „	বিহার ...	৫০ „
ছোটনাগপুর ...	৫৩ „		

মাঝামাঝি বৃষ্টির দেশ—

উত্তর বর্মা ...	৪২ ইঞ্চি	সংযুক্ত প্রদেশ ...	৩৯ ইঞ্চি
মধ্য প্রদেশ (পশ্চিম) }	৪৫ „	বেরার ...	৩১ „
মধ্য ভারত (পূর্ব) }		গুজরাট্ ...	৩৩ „
		বম্বে (দাক্ষিণাত্য)	৩১ „
মধ্য ভারত (পশ্চিম)	৩৫ „	হায়দ্রাবাদ ...	৩৫ „
মাদ্রাজ (উত্তর) ...	৪০ „	মৈশূর ...	৩৬ „

সামান্য বৃষ্টির দেশ—

মাদ্রাজ (দাক্ষিণাত্য)	২৪ ইঞ্চি	পঞ্জাব (দক্ষিণ পশ্চিম)	৯ ইঞ্চি
রাজপুতানা (পূর্ব) ...	২৪ „	সিন্ধু ...	৬ „
পঞ্জাব (পূর্ব ও উত্তর) ...	২৩ „	বেলুচিস্থান ...	২ „
রাজপুতানা (পশ্চিম) ...	১২ „		

৩। উদ্ভিদ্

ভারতবর্ষের ন্যায় বড় দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু সেগুলির ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা কতকটা একঘেয়ে রকমের, কাজেই সে-সকল দেশের উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের মধ্যে অধিক বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

ভারতবর্ষের পাহাড় পর্বত এবং শিলামৃত্তিকাতে সে-রকম একঘেয়ে ভাব প্রায় নাই বলিলেই হয়; বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী ভারতে যত দেখা যায়, অন্য কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এখানে ১৭৬ শ্রেণীর সপুষ্পক উদ্ভিদের সতেরো হাজার জাতীয় বৃক্ষ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এগুলির সমস্তই যে ভারতের আদিম উদ্ভিদ্ তাহা বলা যায় না। বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের বহুকাল হইতে যোগ আছে। এই যোগসূত্রে তিব্বত, সাইবেরিয়া, চীন, জাপান, আরব, এমন কি আফ্রিকা এবং য়ুরোপ হইতেও অনেক উদ্ভিদ্ ভারতে আসিয়া বংশ বিস্তার করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, উদ্ভিদের প্রকৃতি-হিসাবে বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত ভারতবর্ষকে পূর্ব-হিমালয়, পশ্চিম-হিমালয়, সিন্ধু-প্রদেশ, গাঙ্গেয় প্রদেশ, মালব, দাক্ষিণাত্য এবং ব্রহ্মদেশ,—এই সাতটী ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন।

হিমালয় এই কথাটী শুনিলে একটা বড় পর্বতের কথা আমাদের মনে পড়ে। তখন মনে হয়, ইহার সকল অংশেরই প্রাকৃতিক অবস্থা বুঝি একই। কিন্তু তাহা নয়, হিমালয়ের পূর্বাংশে বৎসরে প্রায় একশত ইঞ্চি বারিপাত হয়। পশ্চিমের বারিপাত কদাচিৎ ৪০ ইঞ্চির বেশি হয়। সুতরাং একই পর্বতের এই দুই অংশে একই রকমের উদ্ভিদ্ না থাকারই কথা। অনুসন্ধান করিলে তাহাই দেখা যায়। পূর্ব-হিমালয় অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং মালয়দেশ-সুলভ গাছপালাতে পূর্ণ। পশ্চিম-হিমালয়ে এগুলির প্রায়ই সন্ধান পাওয়া যায় না। সেখানকার বন জঙ্গল

য়ুরোপীয় উদ্ভিদ্ এবং বাঁশ ও ঘাস জাতীয় গাছপালাতে পূর্ণ। লার্চ, ওক্, লরেল্, ম্যাপেল প্রভৃতি অনেক য়ুরোপীয় উদ্ভিদই সেখানকার জঙ্গলের প্রধান বৃক্ষ। পশ্চিম-হিমালয়ে এইসকল উদ্ভিদ্ কিছু কিছু থাকিলেও সেখানে দেবদারু, সিডার প্রভৃতিরই প্রাচুর্য্য বেশি।

সিন্ধু-প্রদেশকে মরুভূমি-বিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার পূর্বদিকেই রাজপুতানার মহামরু অবস্থিত। কাজেই সিন্ধু-প্রদেশে বৃষ্টি নিতান্ত অল্প হয় এবং ইহার ফলে সেখানে কেবল মরুভূমি-সুলভ গাছ-পালাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘপত্রী পাইন্ এবং শালই প্রধান। তা ছাড়া শিমুল, লজ্জাবতী, কয়েক জাতি বাঁশও স্থানে স্থানে জন্মে। জলসেচনের সুব্যবস্থা করিলে সিন্ধু প্রদেশে সুখাদ্য ফলের গাছ জন্মানো কঠিন হয় না।

ভারতবর্ষের যে অংশটী গাঙ্গেয় ভূখণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ সেখানে শীতা-তপের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্থানেই বিচিত্র গাছপালা দেখা যায়। ইহার পূর্বাংশে বৎসরে প্রায় ৭৫ ইঞ্চি বারিপাত হয়, কিন্তু পশ্চিমের বারিপাত ১৫ ইঞ্চির অধিক হয় না। বঙ্গদেশের শুষ্ক স্থানে গ্রীষ্মকালে অনেক গাছেরই পাতা ঝরিয়া যায়, এমন কি ঘাস পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। ভূমি ক্ষারবহুল বলিয়াই উদ্ভিদের এই দুর্দশা। বঙ্গ-দেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে যতই পূর্বদিকে যাওয়া যায়, সরস ভূমিতে উদ্ভিদের প্রাচুর্য্য ততই লক্ষিত হয় এবং শস্যক্ষেত্রের শ্যামলতা দর্শক-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আম বট ও তাল জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং বাঁশই এই সকল স্থানের প্রধান বৃক্ষ। চাঁপা, শিমুল প্রভৃতি জাতীয় অনেক বৃক্ষ এবং নানাজাতীয় গুল্ম বঙ্গদেশে প্রচুর দেখা গেলেও সেগুলি এদেশের আদিম বৃক্ষ নয় বলিয়াই উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। এই সকল বৃক্ষ ভারতের অপর অংশেও দেখা যায়।

সুন্দরবন নামক জঙ্গলাকীর্ণ প্রকাণ্ড ভূভাগ বঙ্গদেশেরই দক্ষিণ

সীমান্তে অবস্থিত। সমুদ্রতীরবর্তী বলিয়া এখানকার ভূমি জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায় এবং এখানে বারিপাতও বেশি হয়। কাজেই সুন্দরবনের ভূমি খুবই সরস। সুঁদ্রি প্রভৃতি গাছ সুন্দরবনেই জন্মে। সুঁদরি কাঠই আমাদের খুব কাজে লাগে। কয়েকটি তাল জাতীয় বৃক্ষও এখানে জন্মে। গোলপাতার গাছ তাল জাতীয় বৃক্ষ। ঘর ছাইবার জন্য গোলপাতার ব্যবহার হয়। তা ছাড়া মাদার গাছ এবং নানা-জাতীয় বড় ঘাসও এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

মালাবার প্রদেশের ভূভাগ খুব সরস। নানাজাতীয় তাল এবং বাঁশই এই দেশের প্রধান উদ্ভিদ্। তা ছাড়া অর্কিড্ জাতীয় গাছও সর্বত্র দেখা যায়। নীলগিরি পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় নয় হাজার ফুট। এই পাহাড় এককালে নানাজাতীয় উদ্ভিদে আচ্ছন্ন ছিল। এখন আগুনে পুড়াইয়া ও গোরুবাছুর দিয়া খাওয়াইয়া লোকে এই জঙ্গল ধ্বংস করিতেছে।

যে-সকল গাছের পাতা শীতকালে ঝরিয়া যায় এ-প্রকার বৃক্ষের বন দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থলে প্রচুর আছে। সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে চিরশ্যামল গাছেরই প্রাচুর্য্য অধিক। সেগুণ, পীত-শাল, টুন্, চন্দন প্রভৃতিই দাক্ষিণাত্যের প্রধান বৃক্ষ। এই প্রদেশের যে-সকল স্থানে কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকা আছে সেখানে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হয় এবং সর্বত্রই বাবলা গাছ দেখা যায়।

ব্রহ্মদেশের বৃক্ষাদির পরিচয় আজও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। দেশটী যেমন বড় সেখানকার ঋতুর বৈচিত্র্যও তেমনি অধিক। অনেক পাহাড় পর্বতে দেশ আচ্ছন্ন হইলেও ইহার ভূমি খুবই উর্ব্বর। ব্রহ্মদেশে প্রায় ছয় হাজার জাতির পুষ্পক উদ্ভিদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে সুটীপ্রদ উদ্ভিদ্ এবং অর্কিড্ অনেক দেখা যায়। কাছাড় শ্রীহট্ট প্রভৃতি আসামের পার্বত্য অংশের এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থা অনেকটা ব্রহ্মদেশেরই মত। গর্জন, সেগুণ এবং মেহগনী জাতীয় বৃক্ষ এইসকল স্থানের জঙ্গলে

পাওয়া যায়। গর্জন গাছগুলির উচ্চতা প্রায় দুইশত ফিটের উপরে হয়, সেগুলির গুঁড়ির বেড় ১৫ ফিট পর্য্যন্তও হইয়া দাঁড়ায়। বেত এবং বাঁশ ব্রহ্মদেশে যেমন অনায়াসে উৎপন্ন হয়, এমন কোনো দেশেই হয় না।

আমাদের দেশে যে-সকল উদ্ভিদ্ বিশেষ কাজে লাগে, তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে গেলে বাঁশের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাল জাতীয় অর্থকরী উদ্ভিদের মধ্যে খেজুর এবং সুপারী প্রধান। এক যশোহর জেলাতেই প্রতি বৎসরে একুশ লক্ষ মণ গুড় উৎপন্ন হয়। বাখরগঞ্জ জেলাতেই ২,৭০,০০,০০০ সুপারীগাছ আছে। নারিকেল ভারতবর্ষের আর একটি অর্থকরী বৃক্ষ। সাধারণ তালগাছের কাঠ অনেক স্থানে নানাকাজে লাগানো হয়।

ছোটনাগপুরের শাল এবং মহুয়া বৃক্ষ হইতে অনেক উপকার পাওয়া যায়। শাল কাঠে সুন্দর ও দৃঢ় কড়ি বরগা হয়। রেল লাইনের উপরকার কাঠও শালে প্রস্তুত। ছোটনাগপুর এবং হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ হইতে ইহা আমদানি হয়। মহুয়ার ফল এবং ফুল উভয়ই দরিদ্রের খাদ্য, ইহার ফলের বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয়। খেদনামক গাছ কাঠের জন্য বিখ্যাত,—ইহার সারালো অংশই আবলুস্ নামে পরিচিত। পলাশ গাছের কাঠ অব্যবহার্য্য হইলেও, ইহা লাক্ষাকীটকে আশ্রয় দেয় বলিয়া আমাদের আদরণীয়। আসান গাছে তসরের পোকা জন্মিয়া গুটি উৎপন্ন করে। শিমুল এবং সবাই ঘাসও আমাদের কম উপকারী নয়। শিমুলের তুলা আমাদের কাজে লাগে। সবাই ঘাসে খুব শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়, তা ছাড়া ইহা কাগজ প্রস্তুতের উপাদান স্বরূপেও ব্যবহৃত হয়। রাজমহল অঞ্চলে এই ঘাস প্রচুর জন্মে। ভারতবর্ষের ফলপ্রদ বৃক্ষাদির মধ্যে আম, কাঁটাল, কলা, আতা, পেয়ারা, আনারস, লিচু, তেঁতুল, কমলালেবু এবং তরমুজ জাতীয় উদ্ভিদই উল্লেখযোগ্য।

৪। প্রাণী

ভূমির প্রাকৃতিক-সংস্থান এবং আবহাওয়ার বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী দেখা যায়, পৃথিবীর কোনো স্থানে সে-প্রকার দেখা যায় না। য়ুরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষ অনেক ছোট, কিন্তু ভারতীয় প্রাণীর সংখ্যা য়ুরোপের প্রাণিসংখ্যার তুলনায় অনেক অধিক। পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে-সকল প্রাণী বাস করে, সেগুলিকে উত্তর আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াতেও দেখা যায়। ব্লাণ্ড্‌ফোর্ড সাহেবের গণনায় ১২২৯ জাতীয় মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণী ভারতবর্ষে আছে এবং এগুলির আবার ৪১০০ উপজাতি আছে। এই ১২২৯ জাতি প্রাণীর মধ্যে প্রায় ১৩৩ জাতি স্তন্যপায়ী পর্য্যায়ভুক্ত।

বানরজাতি

বানর জাতীয় প্রাণীর সংখ্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক। আসাম ও বর্মার জঙ্গলে অনেক উল্লুক বাস করে। প্রায় বারো উপজাতির হনুমান সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত আছে। বাংলাদেশের হনুমানের দেহ ছেয়ে-রঙের লোমে আবৃত থাকে। অন্যান্য স্থানে হনুমানের রঙ খুব ঘোরালো রকমের। নীলগিরিতে সম্পূর্ণ কালো রঙের হনুমানও দেখিতে পাওয়া যায়। মর্কটও এক বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। বর্মাতে প্রায়-লাঙ্গুলহীন একপ্রকার বানর আছে। হিমালয়ের তুষারাবৃত অত্যুচ্চ স্থানও বানর-বর্জ্জিত নয়।

বিড়ালজাতি

বিড়ালের সতেরোটি উপজাতি ভারতে বর্তমান। লিঙ্‌স্‌ কেবল হিমালয় প্রদেশেই দেখা যায়। শিকারীদের উপদ্রবে সিংহ ভারতবর্ষে দুর্লভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তের জঙ্গলে এখন দুই চারিটি সিংহ দেখা যায়। ব্যাঘ্র এখনো অনেক স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু শিকারীদের উপদ্রবে এবং দেশে

নূতন নগর ও গ্রামের পত্তনের সঙ্গে সেগুলি দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে। কিছুদিন পরে ইহাও সিংহের স্থায় দুর্লভ হইবে। হিমালয়ের নয় হাজার ফুট উচ্চ স্থানেও ব্যাঘ্র দেখা গিয়াছে।

চিতা-বাঘ ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নর-খাদক নয়।' ইহাদের মধ্যে কয়েক উপজাতি অনায়াসে গাছেও উঠিতে পারে। কালো চিতা-বাঘ বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকস্থ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের উচ্চ দেশে একরকম সাদা চিতা আছে, ইহারা তুষারাবৃত স্থানেই বাস করে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল গভীর জঙ্গলে বন-বিড়াল দেখা যায়। পূর্বে একজাতীয় বন-বিড়াল নদীর ধারে ঝোপে জঙ্গলে বাস করিত। নদীর মাছই ইহাদের আহার ছিল।

নকুল অর্থাৎ বেজী, বিড়ালজাতীয় প্রাণী। ইহারা খুব সাহসী ও মাংসাশী প্রাণী; বড় বড় সাপকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে।

সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল একজাতীয় হায়েনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গর্তে বাস করে এবং শৃগালের মত জীবজন্তুর মাংস আহার করে।

কুকুরজাতি

হেঁড়েল (wolf) এবং শৃগাল, কুকুরজাতিরই অন্তর্গত। বঙ্গোপ-সাগরের পূর্বদিকের দেশে হেঁড়েল দেখিতে পাওয়া যায় না। বেহার অঞ্চলে ইহাদের উৎপাত অতি ভয়ানক। সুবিধা পাইলে ইহারা মানুষ আক্রমণ করিতেও ছাড়ে না। ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে এবং তিব্বতে অনেক হেঁড়েল দেখা যায়।

উত্তরে তিব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্মা পর্য্যন্ত সকল স্থানে বন্ত কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; হরিণ প্রভৃতি বন্ত প্রাণীর মাংসই ইহাদের আহার্য্য। তিব্বত প্রদেশেই মাষ্টিফ-

নামক প্রসিদ্ধ কুকুরের জন্মস্থান। ইহাদের বংশ এখন তিব্বত হইতে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়াছে।

খেঁকশেয়ালের পাঁচটি উপজাতি ভারতবর্ষে বর্তমান। ধূসর রঙের সাধারণ খেঁকশেয়াল নিশাচর প্রাণী। শৃগাল ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়, কেবল পূর্ব অঞ্চলে ইহার সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। শিকারী কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ইহারা মরার ভান করিয়া নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া থাকে। চতুরতায় শৃগাল সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্যাঘ্র বা অপর হিংস্র জন্তু নিকটে থাকিলে, ইহারা বিকৃত স্বরে চীৎকার আরম্ভ করে। ইহাতে শিকারীরা শিকারের সন্ধান পায় এবং লোকে সাবধান হইতে পারে।

ভল্লুক

চারি উপজাতির ভল্লুক ভারতবর্ষে দেখা যায়। ছোটনাগপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে যে-সকল কালো ভল্লুক আছে, তাহারা ফল, মূল, মধু এবং মহুয়ার ফুল খাইতে ভালবাসে। ইহারা মানুষের বিশেষ অপকার করে না। হিমালয়ের নানাস্থানে অপর ভল্লুক বাস করে। এই পর্বতের ১২০০০ ফুট উচ্চ স্থানেও ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। ভল্লুকমাত্রেরই ঘ্রাণ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল কিন্তু ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এইজন্য অনেক শিকার ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারে।

পতঙ্গখাদক প্রাণী

ছুঁচো এবং সজারুই ভারতবর্ষের প্রধান পতঙ্গখাদক প্রাণী, আরসুলা প্রভৃতি ছোটো ছোটো পতঙ্গই ছুঁচোর প্রধান খাদ্য ; রাত্রিই ইহাদের আহার-অন্বেষণের সময়। বাদুড় ফলমূলভোজী হইলেও, পতঙ্গও ইহাদের গ্রাস হইতে উদ্ধার পায় না ; ভারতবর্ষে প্রায় ৯৫ উপজাতির বাদুড় আছে।

ভারতবর্ষে ছেদকপ্রাণীদিগের মধ্যে ইঁদুর, খরগোস, কাঠবিড়ালী প্রধান। ভারতের বড় জাতের ইঁদুরই প্লেগের বাহন। খরগোসের

আটটি উপজাতি নানাস্থানে দেখা যায়। হিমালয়ের অত্যুচ্চ স্থানও শশকবর্জিত নয়। কাঠবিড়ালীদের মধ্যে যাহাদের গায়ে কালো ডোরা থাকে, তাহারাই গ্রামের ভিতরে নির্ভীকভাবে বাস করে।

ছেদক প্রাণী

খুরযুক্ত প্রাণী ভারতবর্ষে অনেক আছে। হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্র, হরিণ, ঘোড়া, শূকর, গাধা, মেষ, ছাগল, গরু, মহিষ সকলই এই শ্রেণীভুক্ত। কচ্ছ ও বিকানিরের মরুভূমিবৎ স্থানে বন্য ঘোটক ও গাধা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতের জঙ্গলেও ইহারা বাস করে। তরাইয়ের এবং উড়িষ্যার জঙ্গলে হস্তীরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। একশৃঙ্গী এবং দ্বিশৃঙ্গী দুই উপজাতির গণ্ডার ভারতবর্ষে দেখা যায়। আসাম ও নেপালের জঙ্গলে আজও ইহারা বাস করে। এক সময়ে সুন্দরবনে প্রচুর গণ্ডার বাস করিত; আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না। ভারতবর্ষের যে-সকল স্থান উষ্ণ এবং নীরস কেবল সেইখানেই উষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। গায়াল, গৌরী, মহিষ প্রভৃতি গোজাতীয় অনেক বন্য প্রাণী ভারতবর্ষের জঙ্গলে আছে। বন্য মেষও দুর্লভ নয়। তিব্বতে বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত মেষ অনেক দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে ইহারা এত অনায়াসে লাফাইয়া চলে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হিমালয়ের বন্যছাগও খুব লম্ফনপটু। তিব্বত অঞ্চলে নীল-গাই প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শস্যক্ষেত্রের ভয়ানক অনিষ্ট করে; ইহাদের শৃঙ্গ দীর্ঘ হয় না। হরিণ ভারতের সকল জঙ্গলেই আছে। হিমালয়ের পাদমূল হইতে মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত স্থানে একশ্রেণীর দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ দেখা যায়। ইহাদের শৃঙ্গে দশ হইতে কুড়িটি পর্য্যন্ত শাখা থাকে। জলাভূমিতেই ইহাদের বাস। সম্বরনামক হরিণ ভারতবর্ষ ও বর্মার প্রায় সকল পার্বত্য জঙ্গলে প্রচুর পাওয়া যায়। হরিণ জাতির মধ্যে ইহারাই

খুরযুক্ত প্রাণী

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। গায়ে চক্রাকার চিহ্নযুক্ত চিতা হরিণ দেখিতে অতি সুন্দর। বঙ্গোপসাগরের পূর্বদিকের কোন দেশেই ইহাদিগকে পাওয়া যায় না। শৃঙ্গহীন কস্তুরী মৃগ হিমালয়ের জঙ্গলে বাস করে ; পুরুষ হরিণের নাভির নিকটে মৃগনাভি সঞ্চিত থাকে। এক ফুট উচ্চ একপ্রকার হরিণ বর্মা এবং দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলে ইহাদিগকে বড় ইঁদুর বলিয়াই ভ্রম হয়।

তিন উপজাতির বন্য শূকর ভারতের নানাস্থানে দেখা যায়। বঙ্গদেশের শূকর বিশেষ শস্যহানিকর। ইহারা মানুষকেও আক্রমণ করে এবং সহজে ভয় পায় না।

অদন্ত-জাতীয় প্রাণী ভারতবর্ষে অধিক নাই। "বন-রুই' নামক প্রাণীই আমাদের সুপরিচিত। ইহাদের দেহ মৎস্যের আঁইসের ন্যায় আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। পিপীলিকা প্রভৃতি ছোট পতঙ্গই ইহাদের প্রধান আহার।

অদন্ত

বঙ্গোপসাগরে তীমি কখন কখন দেখা যায়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলে 'শুঁশক' বাস করে।

তীমি জাতি

ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেব ভারতীয় পক্ষীসমূহকে ৫৯৩ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের উপজাতির সংখ্যা ১৬১৭। দাঁড়কাক ও পাতিকাক এবং হাঁড়িচাঁচা ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়। বুল্‌বুল্‌ও সকল স্থানেই পাওয়া যায়। শালিক, চড়াই, ফিঙে, বাবুই, তালচোঁচ, ছাতারে প্রভৃতিকেও ভারতের সাধারণ পক্ষী বলা যাইতে পারে। টুন্‌টুনি প্রভৃতি ছোট পাখীও সর্বত্র নজরে পড়ে।

সাধারণ পক্ষী

নীলকণ্ঠ, কাঠঠোক্‌রা এবং মাছরাঙার বহু উপজাতি ভারতবর্ষে আছে। ইহাদের পালকের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম। টিয়া জাতীয় বহু পক্ষী ভারতবর্ষে ও বর্মায় দেখা যায়। ভারতীয় পেচকের সংখ্যাও

নিতান্ত অল্প নয়। কোকিল জাতীয় পক্ষীর প্রায় ত্রিশটী উপজাতি বর্তমান। পাপিয়া এই জাতিরই অন্তর্গত।

শিকারী পক্ষী

চিল, শকুন, হাড়গিলা এবং বাজ, শিকরেল প্রভৃতিই ভারতীয় মাংসাশী পক্ষীদের মধ্যে প্রধান। ইহারা মৃত প্রাণীর মাংস আহার করে এবং সুবিধা পাইলে দুর্বল প্রাণীদিগকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে।

কাদাখোঁচা

কাদাখোঁচা জাতীয় পক্ষীর অনেক উপজাতি আছে। এই পক্ষীরা একস্থানে বাস করে না, শীতের শেষে ইহারা হিমালয় প্রদেশ হইতে ভারতের সমতল ভূভাগে আশ্রয় লয়। স্নাইপ্‌-নামক সুখাদ্য পাখী এই জাতিরই অন্তর্গত। তা ছাড়া খঞ্জন জাতীয় অনেক পক্ষী শীত পড়িলেই এদেশে আসে এবং বর্ষায় অন্যত্র বাস করে।

হংস, বক ও সারস

এই তিন জাতীয় পক্ষীর মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষের একস্থানে স্থায়ি-রূপে বাস করে না। ইহারা ঋতুভেদে সুবিধাজনক স্থানে চলিয়া যায়।

সর্প

ভারতবর্ষে ১৫৩ জাতীয় সর্প আছে। ইহাদের উপজাতির সংখ্যা ৫৫৮। ব্যাঘ্রাদি জন্তুদের উৎপাতে বৎসরে যত লোক ক্ষয় হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাহাড়ে চিতা প্রায় কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহারা কখন কখন গাছে ঝুলিয়া থাকে, দেহের গুরুত্বের জন্য দ্রুত চলিতে পারে না। হরিণ প্রভৃতি বৃহৎ জন্তুকেও ইহারা ধরিয়া আহার করে। ঢ্যাম্‌না বা ঢাড়স্‌ সাপও ছয় সাত ফিট লম্বা হয়। কিন্তু ইহারা নির্বিষ; ইঁদুর ব্যাঙ প্রভৃতিই ইহাদের আহার। ভারতের নিকটবর্তী সমুদ্রে ও জলাশয়ে নানাজাতীয় সর্প দেখা যায়। সামুদ্রিক সর্পমাত্রই বিষাক্ত। স্থলভাগের সর্পের

মধ্যে গোক্ষুরা, কারাইত, বরজ সাপ প্রভৃতির দাঁতে ভয়ানক বিষ থাকে।

ভারতবর্ষে তিন জাতীয় কুম্ভীর দেখা যায়। নদীতে যে-সকল কুম্ভীর দেখা যায় তাহারা মৎস্যাহারী, সুবিধা পাইলে মানুষকে আক্রমণ করে। ইহারা হস্তী এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতিকেও আক্রমণ করে। ভারতবর্ষের জলে ও স্থলে নানাজাতীয় কচ্ছপ দেখা যায়। স্থলের কচ্ছপ আকারে প্রায়ই বৃহৎ হয় না। ইহাদের মাংস সুস্বাদু।

কুম্ভীর ও কচ্ছপ

টিক্‌টিকি এবং গিরগিটি ভারতের প্রধান সরীসৃপ। গোসাপও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। সাপের মত দ্বিধা-বিভক্ত জিহ্বা আছে বলিয়া অনেকে মনে করে গোসাপের বিষ আছে। বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে গাছে একরকম বড় গিরগিটি দেখা যায়; ডিম্ব-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে ইহাদের মস্তকের কিয়দংশ লাল হইয়া পড়ে। লোকে ইহাদিগকে বহুরূপী বলে, কিন্তু তাহা নয়। গিরগিটির বিষ নাই।

সরীসৃপ

হাঙ্গর শঙ্কর মৎস্য বঙ্গোপসাগরে এবং সুন্দরবনের নদীতে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকটবর্তী লোণা জলে যে সকল মৎস্য পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ইলিস্ ভেটকি এবং তপ্‌সিই প্রসিদ্ধ। নদীর জলে রুই ও বোয়াল জাতীয় নানা প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। কই জাতীয় মৎস্য জল হইতে দূরে চলাফেরা করে। হিমালয়ের পার্বত্য নদীতে মহাশির নামে একপ্রকার বৃহৎ মৎস্য পাওয়া যায়; এগুলির ওজন কখন কখন এক মণেরও অধিক হয়। বঙ্গদেশের নদীতে "টেপামাছ" নামে একপ্রকার অদ্ভুত মৎস্য পাওয়া যায়; ইহাদের পেটের তলায় একটী বাতাসের থলি থাকে, এই থলিতে বাতাস পুরিয়া ইহারা জলের ভিতর উঠানামা করে।

মৎস্য

পতঙ্গ ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও মানুষের লাভক্ষতি অনেকটা পতঙ্গের উপরে নির্ভর করে। পঙ্গপাল শস্যক্ষেত্রের প্রধান শত্রু। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ পতঙ্গ বিশেষ বিশেষ গাছ আক্রমণ করিয়া মানুষের বহু অনিষ্ট করে। আমাদের উপকারী পতঙ্গ ভারতবর্ষে অনেক আছে। পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীই গুটি বাঁধিয়া তসর ও গরদের রেশম প্রস্তুত করে।

পতঙ্গ

বঙ্গদেশ এবং যুক্তপ্রদেশে তুঁতগাছে গুঁটিপোকা লাগাইয়া রেশম উৎপন্ন করা হয়। লাক্ষাকীট পতঙ্গজাতীয় প্রাণী। মধ্যভারত এবং বঙ্গদেশের কোনো স্থানে এই কীট কয়েকজাতীয় গাছে লাগাইয়া পালন করা হয়। প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় দুই কোটী টাকার লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।

৩। জাতি-তত্ত্ব

বাংলা ভাষায় জাতি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে জাতির অর্থটি প্রথমে স্পষ্ট

'জাতি' শব্দের বিভিন্ন অর্থ

করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ আবার বাউরী, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক সমষ্টিকে সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় জাতি বলা হয়; কিন্তু ইহার যথার্থ সংজ্ঞা 'বর্ণ' লৌকিক ভাষায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। আবার ইংরাজ, ফরাসী, বাঙ্গালী প্রভৃতি 'নেশন'কেও জাতি শব্দে অভিহিত করিতে সর্বদা দেখা যায়। 'নেশন' শব্দ ক্রমে

বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিকে আমরা জাতিই বলিয়া থাকি; ইংরাজিতে ইহাদিগকে Tribe বলে। ব্যবসায় অর্থে জাতিশব্দের প্রয়োগের উদাহরণ—কামার, কুমার, তাঁতি, ছুতার। ইংরাজিতে যাহাকে Race বলে তাহারও অনুবাদ আজকালকার সাহিত্যে জাতি দিয়া চলিয়া থাকে। আর্য্যজাতি, মোঙ্গলজাতি, নীগ্রোজাতি race অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আমরা প্রথমে ভারতের races বা মহাজাতিগুলির তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু ভারতের এই নৃ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্বে পৃথিবীর মধ্যে প্রধান প্রধান জাতিগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন। পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সমগ্র মানবজাতিকে শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণকায় এই তিন বর্ণতে বিভক্ত করিয়াছেন। মোটামুটি ভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত স্থান পীতবর্ণের মনুষ্যের আবাস। সুদূর সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত তুন্দ্রা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, অপরদিকে কাস্পপ (Caspian) হ্রদের ধূলিধূসর তীর হইতে জাপান প্রভৃতি দ্বীপমালা পর্য্যন্ত পীত জাতির বাসভূমি।

পীত

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে যদিও লোহিতকায় বলা হয় তথাচ অনেকে ইহাদিগকেও বিরাট পীতজাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। এই লোহিতকায় মানুষদের সহিত পীতকায় চীনাদের যে কিছু সাদৃশ্য আছে তাহা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। অনেক পরিব্রাজক উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করিয়া এই সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় মহাজাতি শ্বেতকায়। ইহারা য়ুরোপে, এশিয়ার পশ্চিমে ও ভারতের উত্তর অঞ্চলে বাস করে।

শ্বেতকায়

কিন্তু শ্বেতকায় জাতি সকলেই যে এক মূল হইতে উঠিয়াছে তাহা নহে; শ্বেতকায়দের মধ্যে প্রধান দুটি বড় ভাগ হইতেছে সেমেটিক

ও আর্য্য। আরব প্রভৃতি পশ্চিম-এশিয়াস্থিত কয়েকটি জাতি সেমেটিক মহাজাতির অন্তর্গত। তাহাদের সহিত আর্য্যদের আকার প্রকার আচার ব্যবহার ও ভাষা সমস্তেরই সম্পূর্ণ অমিল। আর্য্যজাতির বাস য়ুরোপেই অধিক; দুই একটি ক্ষুদ্র উপজাতি ছাড়া সমগ্র য়ুরোপেই এক-প্রকার আর্য্য। এশিয়াতে কেবলমাত্র পারস্য ও ভারতবর্ষে আর্য্যদের বাস দেখা যায়। তৃতীয় মহাজাতি কৃষ্ণকায়। ইহারাও একটি জাতি নহে; ভারতের দ্রাবিড়, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, আন্দামান নিকোবরের অসভ্য বাসিন্দা ও সুবিশাল আফ্রিকা মহাদেশের নীগ্রো, কাফ্রি জুলুগণ একই জাতির অন্তর্গত নহে। মোটা-মুটি ইহাদের সকলকেই কৃষ্ণকায় মানবশ্রেণীর মধ্যে ধরা হয়। এই তিন বর্ণের জাতি হইতে সমস্ত মানবের উৎপত্তি কিনা, তাহাদের আদিম বাস কোথায়, ইত্যাদি সহস্র প্রশ্নের উত্তর এখন পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণকায়

ভারতবর্ষের নৃ-তত্ত্ব লইয়া য়ুরোপের সুধীসমাজে বহুকাল হইতে আলোচনা হইতেছে—বহুমতামত লিপিবদ্ধও হইয়াছে। সকলেই এই মহাদেশের জাতি-বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা য়ুরোপের জাতিবিশ্লেষণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের জনসমুদ্রের আবর্তে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছেন। ইহার একটি কারণ ভারতবর্ষ কোনো একটি বা দুইটি জাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠে নাই। এখানকার ইতিহাসের সহিত এদেশের জাতিতত্ত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ভারত-বর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে যুগে যুগে নানা বর্ণের নানা জাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কোথাও তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। এদেশে আর্য্যদের প্রবেশের পূর্বেও লোক বাস করিত; দ্রাবিড়গণ এদেশের অধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁহাদের অপেক্ষা অসভ্য জাতিদেরও বাস এখানে

ভারতের নৃ-তত্ত্বে জটিলতা

ছিল। আর্য্যেরা একসঙ্গে ও একবারেই ভারতে প্রবেশ করেন নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া দলের পর দল নিজ নিজ গোত্র-পতির নেতৃত্বাধীনে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে শকজাতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করে; য়িউচিরা বহুকাল ভারতের পশ্চিমে রাজত্ব করিয়া বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিল; হূন ও গ্রীকগণ এদেশে আসিয়াও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহাও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু আজ তাহাদের বাছিয়া বাহির করা যায় না। ভারতবর্ষের বিপুল হিন্দুসমাজের অসংখ্য স্তরের মধ্যে কোথায় কোন্ Tribe একটি caste বা 'জাতে' পরিণত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। কবির এই উক্তি "হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হূনদল মোগল পাঠান এক দেহে হলো লীন" অনেক পরিমাণে সত্য।

বহু জাতির উপনিবেশ ও সংমিশ্রণ

ভারতবর্ষের সমগ্রজাতিকে মোটামুটি ভাবে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু এই বিভাগের প্রধান বিপদ হইতেছে যে, কোনো দুই জাতির মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট রেখা টানিয়া বলা যায় না এইখান হইতে অমুক জাতি আরম্ভ।

সাধারণতঃ মানুষের শারীরিক আকৃতি, ভাষার-চিহ্ন; ধর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহার জাতি নির্ণয় করা হয়। ইহার মধ্যে শারীরিক চিহ্নই সবচেয়ে বড় প্রমাণ; কেন না মানুষের ভাষা বদলাইয়া যায় এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়; যেমন আমেরিকায় নিগ্রোগণের ইংরাজীই এখন মাতৃভাষা; কিন্তু তাহাদের আকৃতি অপরিবর্তনীয়। বাংলাদেশেও অনেক অনার্য্যজাতির ভাষা সম্পূর্ণরূপে বাংলা হইয়া গিয়াছে; যেমন কোচ, চাকমাদের ভাষা। সুতরাং শারীরিক চিহ্নই জাতিবিশ্লেষণের একমাত্র

জতি-নির্ণয়ের সাধারণ উপায়

উপায় বলিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনো পর্য্যন্ত মনে করেন। শারীরিক চিহ্নের দ্বারা বিচার করিবার দুইটা উপায় আছে; প্রথমটি চোখে যাহা ধরা পড়ে তাহার দ্বারা বিচার। চীনা, জাপানী, বর্মনের গোঁফ দাড়ি অল্প, চোখ ছোট, চোয়ালের হাড় উঁচু, মাথার চুল খাড়া ইত্যাদি সকলেরই চোখে পড়ে এবং আমাদের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্য কোথায় তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। শারীরিক পরীক্ষার দ্বিতীয় উপায় হইতেছে খর্পর-বিদ্যা। এই বিদ্যার দ্বারা মাথার মাপ, নাকের মাপ, চোখের রঙ, চুলের রঙ প্রভৃতি বিচার করা হয় ও তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতেরা কয়েকটি মূল জাতির স্বাভাবিক মাপ পাইয়া থাকেন। সেই স্বাভাবিক মাপ হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের পার্থক্য কোথায়, কোন কোন জাতির সংমিশ্রণে তাহাদের খর্পর ও নাসিকার গঠন বদলাইয়াছে, বর্ণ কৃষ্ণাভ হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া ভারতের সমগ্র জন-সংখ্যাকে সাত ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ১৮৮৬ সালে ভারতে এই খর্পর-বিদ্যার সাহায্যে নূতন তথ্য নিরূপণের চেষ্টা আরম্ভ হয়। নিম্নে সেই বিভাগের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল।

খর্পর-বিদ্যা

১। তুর্ক-ইরাণী শাখা—ভারতের পশ্চিম সীমান্তবাসী আফগন, বেলুচি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসীদের এই শাখার অন্তর্গত করা হয়।

২। হিন্দু-আর্য্যশাখা—পঞ্জাব, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতির অধিবাসীগণ যথার্থ আর্য্য বলিয়া পরিগণিত। এখানকার লোকেদের আকৃতি তুর্ক-ইরানীদের হইতে যে পৃথক তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখানকার উচ্চ-নীচ বর্ণের মধ্যে মাপের দিক হইতে পার্থক্য সামান্য।

৩। শক-দ্রাবিড় শাখা—বোম্বাইএর মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, কুনবীরা ও দক্ষিণ ভারতের কুর্গগণ এই শাখার অন্তর্গত। ইহারা অপেক্ষাকৃত খর্ব;

ইহাদের খর্পর প্রশস্ত। দ্রাবিড়গণের সংমিশ্রণে ইহাদের আকৃতি আর্য্যগণ হইতে একটু পৃথক হইয়াছে।

৪। আর্য্য-দ্রাবিড় বা হিন্দুস্থানী—সংযুক্ত-প্রদেশ ও বিহারের আর্য্যগণের সহিত আদিম দ্রাবিড় অধিবাসীগণের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে মিশ্রণ কম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কেননা তাঁহাদের খর্পর নিম্নশ্রেণীর চামার মুসারদের খর্পর হইতে অনেক পৃথক।

৫। মোঙ্গলদ্রাবিড় বা বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর আকারপ্রকার ভারত-বর্ষে সমস্ত জাতি হইতে যে কিঞ্চিৎ পৃথক তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্য্যশোণিত কিয়ৎপরিমাণে প্রবাহিত; কিন্তু সাধারণ লোক মোঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে হিমালয় ভেদ করিয়া উত্তরের মোঙ্গলীয় জাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। নেপালী, ভুটানী, লেপ্‌চা, আক্কা, আবর, মিশ্‌মী প্রভৃতি জাতি সকলেই বিরাট পীত-মহাজাতির অন্তর্গত। ভারতের পূর্ব-প্রান্তে মোঙ্গলীয়দের বহুশাখা বাস করিতেছে। টিপ্‌রা, কুকী, মণিপুরী, নাগা প্রভৃতি জাতি আমাদের কাছে খুবই সুপরিচিত। দক্ষিণের শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বাঙ্গালীদের ও উত্তরের অসমীয়াদের সহিত খাসিয়া জয়ন্তিয়াদের মেলা-মেশা আছে; ত্রিপুরাবাসীরা এখন বাঙ্গালী হিন্দু, মণিপুরীরা বৈষ্ণব, চাক্‌মারা বাংলাভাষাভাষী হিন্দু। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে মেলা-মেশা যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। সেইটি এখনকার জল-বায়ু। তিন চারি পুরুষ পূর্বে যে-সকল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, পাণ্ডে, মিশ্র, অথবা মহরট্টাদেশীয় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের বংশধরগণের কাহাকেও আর একজন বাঙ্গালী হইতে বাছিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। বাংলাদেশ সম্বন্ধে যেমন

জলবায়ুর প্রভাবের কথা খাটে অন্য দেশ সম্বন্ধেও সে কথাটা ভুলিলে চলিবে না।

৬। মোঙ্গলীয় শাখা—পূর্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের উপত্যকায় ও পাদমূলে এবং ভারতের পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশে মোঙ্গলজাতির বাস। দারজিলিঙের লেপ্‌চা, নেপালের লিম্বু, মুরসী, গুরুঙ্গ, আসামের আদিম অধিবাসী অহোম, বোদো, পূর্ববঙ্গের কতকগুলি জাতি এবং উত্তরবঙ্গের কোচগণ এই মহাজাতিরই অংশ।

৭। দ্রাবিড়—দ্রাবিড়গণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া অনেকে মনে করেন। সিংহল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-ভারত পর্য্যন্ত দেশ দ্রাবিড়গণের বাসস্থান। তামিল, তেলেগু, কর্ণাটী, মালায়লাম এখানকার প্রধান জাতি। মুণ্ডা, খন্দ প্রভৃতি অসভ্য জাতিদেরও এই দ্রাবিড়জাতির মধ্যেই ফেলা হয়। তবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে তাহাদিগকে একজাতীয় বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। দ্রাবিড়গণ কৃষ্ণবর্ণ; ইহাদের খর্পর লম্বা ও চোয়াল উঁচু।

ইংরাজীতে যাহাকে Tribe বলে বাংলায় আমরা তাহাকে উপজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। সাঁওতাল, কোল, ভিল এক একটি উপজাতি।

উপজাতি

এখনো এইরূপ কতকগুলি জাতি হিন্দুসমাজের বাহিরে রহিয়াছে। কিন্তু বহুযুগ হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গ বিপুল হিন্দুসমাজের এক এক কোণে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। এইসকল উপজাতি এখন এক একটি বর্ণ বলিয়া পরিগণিত। নানা উপায়ে এইসকল অনার্য্যজাতি ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

১। কোনো বর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাচীনকালে কোনো উপায়ে ভূম্যধিকারী হইয়া সম্মান পায়। তখন হইতে তাহারা আপনাদিগকে

রজপুত বলিয়া প্রকাশ করিতে থাকে ; এদিকে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জন্য পুরাণ হইতে বংশ-তালিকা প্রণয়ন করিতে সদাই তৎপর বলিয়া সমাজের একটা স্তরে আসন পাতিয়া লইতে তাহাদের বিলম্ব হয় না। দুই এক পুরুষের মধ্যে তাহারা কোনো এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হয়।

২। কতকগুলি অনার্য্যজাতীয় লোক বৈষ্ণব, রামাৎ বা লিঙ্গায়েৎ প্রভৃতি মধ্যযুগের উদার ধর্মমত গ্রহণ করিয়া সেই সম্প্রদায়-অনুমোদিত আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করিয়া শীঘ্রই হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

৩। এক একটি বর্গ একেবারে নূতন নাম নূতন প্রথা লইয়া হিন্দু-ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। বাংলাদেশের উত্তরস্থিত কোচগণ যে অনার্য্য ও মোঙ্গলীয় জাতিসম্ভূত তাহা তাহাদের আকৃতি ও পূর্ব-ইতিহাস হইতে সকলেই জানিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে তাহারা আপনা-দিগকে রাজবংশী বলে এবং কোন্ এককালে পরশুরামের সময়ে তাহারা এদেশে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল ইত্যাদি বলিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করে। এইরূপে টিপরাগণ ক্ষত্রিয় হইয়াছে। যদিও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে, তথাচ পাহাড়ের মধ্যে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের আচার-ব্যবহার ভাষা যে মোটেই ভারতের অন্যান্য স্থানের ক্ষত্রিয়দের ন্যায় নহে, তাহা দেখিলে বুঝা যায়।

৪। কোনো কোনো বর্গের কতকগুলি লোক হিন্দু আচার, রীতি, নীতি, দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আপন বর্গ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ও দুই এক পুরুষের মধ্যেই হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি জাতি বলিয়া পরিচিত হয়। এইসকল উপজাতি দেখিতে দেখিতে উপরিস্থিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের প্রথা অনুকরণ করে। তাহাদের ন্যায় ইহারাও ক্রমে ক্রমে কৌলীন্য, থাক্, উচ্চ-নীচ ভাগ করিতে থাকে। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় কোড়া নামে এক জাতি আছে ; তাহাদের ভাষা সাঁওতালীর অপভ্রংশ, কিন্তু তাহারা এখন হিন্দুনাম, গোত্র, আচার

গ্রহণ করিয়া পৃথক হইয়া আসিতেছে। এইরূপে সংযুক্ত প্রদেশের আহীর, ডোম, দোসাদ, পঞ্জাবের গুজর, জঠ, মিও জাতি, বঙ্গের কোলি, মহার ও মহ্‌রাঠাগণ, বাংলাদেশের বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, পোদ, রাজবংশী, কোচ, টিপ্‌রাগণ ও মান্দ্রাজের মাল, নায়ার, বেল্লাল, পারিহা প্রভৃতি উপজাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া এক একটি 'জাত' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুসমাজের বাহিরে এখনো অনেকগুলি অনার্য্যবর্গ দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা এখনো তাহাদের ভূত-প্রেতপূজা ত্যাগ করিয়া হিন্দু দেবদেবীর পূজা আরম্ভ করে নাই ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার মানিয়া লয় নাই;—যাহারা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের সকলেই যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করে তাহা নহে, যেমন মুসাহার, ডোম। ইহারা প্রকৃতির উপাসক। ইহাদের এক একটি উপজাতি বহু উপবর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক উপবর্গ কোনো না কোনো বিশেষ জন্তু বা বৃক্ষকে পবিত্র বলিয়া মানে। সেই জন্তুকে তাহারা আহার বা প্রহার করে না এবং সেই গাছের ফল খায় না বা ডাল ভাঙে না; এবং যে জাতি সেই জন্তু বা বৃক্ষকে শ্রদ্ধা করে, তাহাদের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না।

হিন্দুধর্ম চিরকাল বাহিরের অনার্য্যজাতিকে সমাজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। ব্যক্তিগত দীক্ষাপ্রথা ছিল কিনা বলা কঠিন, তবে কোনো কোনো স্থলে সমস্ত বর্গ ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের অন্তর্গত হইয়াছে; তাহার দৃষ্টান্তই ভারতের সামাজিক ইতিহাস।

৬। ভারতের ভাষা

ভারতে যেসকল প্রাদেশিক বা কথ্য ভাষা আছে, তাহাদিগকে প্রধানত ৩ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) আর্য্য, (২) দ্রাবিড়, (৩) মুণ্ডা, (৪) মন্-খেমার, ও (৫) তিব্বত-চীনা। আমরা ক্রমশ ইহা-দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

ভাষাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, ভারত ও ইউ-রোপের বহু ভাষারই মূলস্বরূপ একটি প্রাচীন ভাষা ছিল, ইহা হইতেই ক্রমশ বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। এই মূল ভাষা হইতে যে-সকল ভাষা হইয়াছে, তাহাদিগকে ভা র ত-ই উ রো পী য় (Indo-European) নামে সাধারণত উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মোট নয়টি ভাষা ধরা হয়, যথা আ র্য্য, আ র্মে নী য়, গ্রী ক, ই টা-লী য় ইত্যাদি।

আর্য্যেরা সাধারণ আদিম বাসস্থান[১] হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশ খোকন্দ ও বদখ্‌সান প্রদেশে আগমন করেন। এখানে ইহাদের দুইভাগ হয়। একদল হিন্দুকুশ হইয়া কাবুল দিয়া ভারতে আগমন করেন, অপরদল পূর্বে পামির ও পশ্চিমে মার্ব (Merv) ও পূর্ব-পারস্যে অর্থাৎ ইরান দেশে উপস্থিত হন। এই উভয় দলের যে সাধারণ ভাষা ছিল, তাহাই একদিকে (ভারতে) ভা র ত-আ র্য্যী য়, আর অপরদিকে (ইরানে) ই রা নী য় ভাষার জননী।

ইরানীয়গণের মধ্যে যাঁহারা পূর্বদিকে ইয়রকন্দ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তাঁহাদের ভাষা কিন্তু ততদূর পর্য্যন্ত টিকিতে পারে নাই। ইহাদের ভাষার শেষ পূর্বসীমা সারিকোল প্রদেশ ধরিতে পারা যায়। আর যাঁহারা

১। এ সম্বন্ধে নানামত, তবে সাধারণত জানা যায় যে এশিয়া ও ইউরোপের সীমা-নার কাছা-কাছি কোনো স্থানে তাহা হওয়া সম্ভব।

পশ্চিমদিকে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাষা সমগ্র পারস্য, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই ইরানীয় ভাষার দুইটি বিভাষা পা র সী ক ও মি ডি য়ি ক (Persic and Medic)। পারসীক হইতে মধ্যযুগীয় পা র সী ক অর্থাৎ প হ্ল বী, এবং এই পহ্লবী হইতে বর্তমান পা র সী ক বা ফা র সী র উৎপত্তি হয়। ফারসী ভারতের কথ্য ভাষার মধ্যে নহে, কিন্তু মুসলমান-শাসনের সময়ে এখানে ইহার প্রভূত বিস্তার ও উন্নতি হইয়াছিল। অপরদিকে মি ডি য়ি ক হইতেছে পারসীদের ধর্মশাস্ত্র অবেস্তার ভাষা। মিডিয়ার (উত্তর-পশ্চিম পারস্য) ন্যায় পূর্ব-ইরানেও ইহা কথিত হইত। মিডিয়িক হইতে ভারতের দুইটি প্রধান ইরানীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে—প স্তো ও বা লু চী।

নামেই বুঝা যাইতেছে বা লু চী বেলুচিস্থানের ভাষা। বেলুচিস্থানের ইহাই প্রধান ভাষা; কিন্তু ব্রাহুঈগণ এখানে দ্রাবিড়ী ভাষা কহিয়া থাকে। বালুচীর দুইটি বিভাষা আছে, একটি উত্তরে ও অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিমে। বালুচীকে বস্তুত লখ্য ভাষা বলা চলে না। আজকাল ইংরাজী ও ফারসী অক্ষরে ইহা লিখিত হইয়া থাকে।

বালুচী

বালুচীর উত্তরে প স্তো। ইহা ইংরাজ-অধিকৃত ও স্বাধীন আফগানিস্থানের ভাষা। তা ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বাত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুর পশ্চিম তীরে দেরা-ইস্মাইলখাঁ পর্য্যন্ত স্থানের ইহাই প্রধান ভাষা। সিন্ধুর পূর্বতীরে ও উত্তরভাগে হাজরা ও রাওলপিণ্ডী জেলার কতক অংশে প স্তো কথিত হইয়া থাকে। সিন্ধুর নিম্নপ্রদেশে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে ভারত-আর্য্যীয় ভাষাই কথিত হয়। সাধারণত পাঠানেরাই প স্তো বলিয়া থাকেন, হিন্দুরা এইসকল স্থানে হি ন্দ কো নামে ভারত-আর্য্যীয় ভাষার এক বিভাষা ব্যবহার করেন। প স্তো র দুইটি প্রধান বিভাষা

পস্তো

আছে, (১) প খ্ তো ও (২) প স্তো ; প্রথমটি পূর্বোত্তর অংশের ও দ্বিতীয়টি দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের। প স্তো, প খ্তো একই শব্দ, উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন হইয়াছে। এই উভয়েরই আবার বহু অবান্তর বিভাষা আছে। প স্তো র ফারসীমূলক বর্ণমালা আছে এবং ইহার সাহিত্যও নিতান্ত কম নহে।

ওর্মুরী

পস্তোর সহিত যুক্ত হইলেও তাহা হইতে বিভিন্ন ওর্মুরী নামে একটি ভাষা আছে। ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দেরাইস্মাইলখানের উত্তরে ওয়াজীরিস্তানের মধ্যে বারুগিস্তা জাতির মধ্যে কথিত হইয়া থাকে। পামির অঞ্চলে আরো কতকগুলি ইরানীয় ভাষা আছে, যথা সা র কো লী, মু ঞ্জা লী, ইত্যাদি। এগুলি ইংরাজ-সীমানার বাহিরে ; তথাপি মুঞ্জালী হিন্দুকুশ পার হইয়া চিত্রলের লেওংকুহ্ উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মুঞ্জালী এখানে ই উ দ্ ঘা নামে প্রসিদ্ধ। মূল মুঞ্জালী হইতে ইহার অনেক ভেদ আছে।

পৈশাচী

আর্য্যদের অর্থাৎ ইরানীয় আর্য্যদের যে অংশ পামির প্রদেশে বসবাস করেন, তাঁহাদের কতক কালক্রমে লঘমান, কাফিরিস্তান (আফগানিস্থানে), চিত্রল, গিলগিট ও কাশ্মীরে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে ভারতীয় আর্য্যদের মিল ছিল না। ইঁহারা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া পিশাচ বলিতেন। ইহা হইতে এইসকল স্থানের ভাষার নাম পৈ শা চী বা পিশাচ ভাষা হইয়াছে। পৈশাচী ভাষাগুলি ঠিক ইরানীয়ও নহে, অথবা ঠিক ভারত-আর্য্যীয়ও নহে, উভয়ের মিশ্রণ। আফগানিস্থানের লঘমানে কথিত প শা ঈ, কাফিরিস্তানের বা শ গ লি ও ক লা শা ইত্যাদি, চিত্রলের খো ও য়া র, আর গিলগিটের শী না পৈশাচী ভাষার মধ্যে। এই শীনা ভাষাই কাশ্মীরীর মূলে রহিয়াছে। তবে ইহাতে

কাশ্মীরী

ভারতীয় ভাষার উপকরণ এত প্রবেশ করিয়াছে যে, তাহাতে ঐ মূলটি প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাই কাশ্মীরী ভারত-আর্য্যীয় ভাষারই মধ্যে গণ্য। ইহার কথা আমরা পরে আবার বলিব।

কোনো পৈশাচী ভাষারই সাহিত্য নাই, এবং অল্প কয়েক বৎসর হইল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ইহা লিখিত হইতেছে। সংস্কৃতের বৃহৎকথামঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগর ও বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ নামে প্রসিদ্ধ কথাগ্রন্থ তিন খানির মূল পুস্তক পৈশাচী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ ছিল। 'বৃহৎকথা' এখনো পাওয়া যায় নাই, মার্কণ্ডেয়-কৃত 'প্রাকৃত-সর্বস্ব' নামক পুস্তকে ইহার একটিমাত্র ক্ষুদ্র বচন উদ্ধৃত দেখা যায়।

ইরানীয় ভাষার কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এইবার ভারত-আর্য্যীয় ভাষার কথা সংক্ষেপে বলিব। পণ্ডিতগণের আলোচনায় জানা যায় ভারতে আর্য্যগণের একাধিক দল বিভিন্ন-বিভিন্ন সময়ে আগমন করে। একদল আগমন করিয়া প্রসিদ্ধ ম ধ্য দে শে বস-বাস করেন। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তর, প্রাচীন সরস্বতী নদীর তিরোধান স্থানের (নাভা ও পাতিয়ালা রাজ্যের পূর্বে সহরিন্দ বা সিরহিন্দ) পূর্ব, আর

মধ্যদেশ

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের অর্থাৎ প্রয়াগের পশ্চিম, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে মধ্য-দেশ বলা হইয়া থাকে। এই স্থানে আগত আর্য্যেরা যে বৈদিক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন সাহিত্যের বিকাশে একদিকে তাহা সংস্কৃত হইয়া সং স্কৃ ত নামে প্রচলিত হয়। অপরদিকে তাহারই পাশাপাশি যে কথ্য ভাষা চলিয়া আসিতেছিল তাহাই পরিবর্তন পাইতে পাইতে এই প্রদেশের বর্ত্তমান সাধারণ লেখ্য ও কথ্য ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জানিতে পারা যায় আর্য্যগণের আর কতকগুলি স্বতন্ত্র দল এই মধ্য-দেশের বাহিরে পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বে অর্থাৎ পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট রাজপুতানা, অযোধ্যা ও বিহারে বাস করিতেন। ইহাদের ভিন্ন-ভিন্ন

কথ্য ভাষা ছিল ; কিন্তু তথাপি ইহাদের এই সমস্ত ভাষায় পরস্পরের সহিত যতটা যোগ দেখা যায়, মধ্যদেশের কথ্য ভাষার সহিত ইহাদের ততটা যোগ নাই। তাই মনে হয় অতি পূর্বকালে ভারতীয় আর্য্যগণের কথ্য ভাষাগুলির দুইটি প্রধান ভাগ ছিল ; মধ্যদেশের একটি আর তাহার বহির্দেশের আর একটি, এই দুইটি।

ভারতের বর্তমান আর্য্যভাষাগুলিকে তিন ভাগে ফেলিতে পারা যায় ; (১) প্রথম, মধ্যদেশের ভাষা, ইহা গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দেশে ও তৎসন্নিহিত উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে প্রচলিত ; (২) দ্বিতীয়, এই মধ্যদেশের বাহিরের ভাষা, ইহা পূর্বে পঞ্জাব, গুজরাট, রাজপুতানা, অযোধ্যা, বাঘেলখণ্ড ও ছত্তিশগড়ে প্রদেশে প্রচলিত ; (৩) তৃতীয়, এই বহির্দেশেরও বাহিরে অর্থাৎ কাশ্মীর, পশ্চিম-পঞ্জাব, সিন্ধু, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বিহার, বঙ্গ ও আসামে প্রচলিত। এই তৃতীয় ভেদেরই মধ্যে হিমালয় প্রদেশে প্রচলিত (পাহাড়ী) ভাষাকে ধরা যায়, রাজপুতানীর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, রাজপুতানীই এই ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

পূর্বে বলিয়াছি ভারতে সমাগত আর্য্যেরা অতি প্রাচীনকালে বৈদিক ভাষাই বলিতেন, একদিকে ইহা সাহিত্যের বিকাশে সংস্কৃত হইয়া সাহিত্যের ভাষা হইয়া আসিল, অপরদিকে তাহা প্রা কৃ ত নামে কথ্য ভাষা হইল। প্রা কৃ ত অর্থাৎ সাধারণের স্বাভাবিক ব্যবহার্য্য ভাষা বলিয়া তাহার নাম প্রা কৃ ত। আদিম প্রাকৃতভাষা কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় না। ইহা যখন সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে তখনকার (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি যে-কল প্রাকৃত ভাষা জানা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পা লি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ে ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। জৈন ধর্মের প্রভাবে ও স্বাভাবিক মাধুর্য্যবশত বিবিধ সরস ও মধুর কাব্যের সৃষ্টিতে অন্যান্য প্রাকৃত ভাষারও সমধিক উন্নতি হয়। কথ্য বৈদিক

ভাষা যেমন একদিকে সংস্কৃত নামে সাহিত্যের ভাষা হইয়া তাহাতেই আবদ্ধ থাকে, আর পরিবর্তন প্রাপ্ত হয় নাই, প্রাকৃতও সেইরূপ এক-দিকে কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হইয়া তাহাতেই আবদ্ধ থাকে। অপর দিকে কথ্যরূপে তাহা স্বাভাবিক গতিতেই পরিবর্তন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রাকৃতের যে পরিবর্তন ঘটিল তাহাকে **অ প ভ্রং শ** বলা হয়। অপভ্রংশ হইতেই ক্রমশ পরিবর্তনে বর্তমান প্রাদেশিক আর্য্যভাষাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। অপরদিকে আবার এই অপভ্রংশ প্রাকৃতও সাহিত্যের ভাষা হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছে। কবিরা ইহাতেও কাব্য রচনা করিয়াছেন। বৈয়াকরণিকেরাও অন্যান্য প্রাকৃতের ন্যায় ইহারও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত হইতে ভিন্ন ভিন্ন অপভ্রংশ হওয়ায় তদুৎপন্ন প্রাদেশিক ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত বেদপন্থীদের ধর্মের ও তাহাদের অতি সমৃদ্ধ সাহিত্যের ভাষা। প্রাকৃতে (ও তদুৎপন্ন অপভ্রংশে) ইহার প্রচুর প্রভাব পতিত হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে বহু শব্দ ইহাতে আসিয়াছে; এই সমস্ত শব্দের কতক অবিকলই আছে (তৎসম), আর কতক-বা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে (তদ্ভব)। আরো কতকগুলি শব্দ ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এগুলি সংস্কৃত বা সংস্কৃতের মূলভূত প্রাচীন কথ্য ভাষা হইতে আসে নাই, তৎকালে প্রচলিত দূরবর্তী অপর কোনো-কোনো কথ্য ভাষা হইতে আসিয়াছে (দেশ্য)। প্রাকৃতজাত অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন প্রাদেশিক ভাষাসমূহেও এইসকল শব্দ চলিয়া আসিয়াছে। দ্রাবিড়ী ভাষারও শব্দ ইহাতে আসিয়াছে। ইহা ছাড়া সময়ে সময়ে বৈদেশিক বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা হইতে অনেক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে; যেমন মুসলমানদের সময়ে ফারসী ও আরবী শব্দ, ও ইউরোপীয়দের সংসর্গে পর্ত্তুগীজী, ওলন্দাজী ও ইংরাজী শব্দ।

পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি তদনুসারে আলোচনার সুবিধার জন্য ভার-

তের বর্তমান প্রাদেশিক আর্য্যভাষাগুলিকে আমরা নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়া লইতে পারি :—

১। মধ্যদেশের ভাষা

(ক) পশ্চিমী হিন্দী যথা—(১) উর্দ্দূ (২) বাঙ্গরূ (৩) ব্রজভাষা (৪) কনৌজী (৫) বুন্দেলী।

২। মধ্যদেশ ও বহির্দেশের মধ্যবর্তী দেশের ভাষা

(ক) মধ্যদেশের ভাষার সহিত অধিকতর সংস্পৃষ্ট—যথা (১) রাজস্থানী (২) পাহাড়ী (৩) গুজরাটী (৪) পাঞ্জাবী।

(খ) বহির্দেশের ভাষার সহিত অধিকতরভাবে সংস্পৃষ্ট পূর্বী হিন্দী।

৩। বহির্দেশের ভাষা

(ক) উত্তর-পশ্চিমী বর্গ যথা—(১) কাশ্মীরী (২) কোহিস্তানী (৩) লহন্দা (৪) সিন্ধী।

(খ) দক্ষিণী বর্গ যথা—(১) মরাঠী।

(গ) পূর্বী বর্গ যথা—(১) বিহারী (২) ওড়িয়া (৩) বাঙালী (৪) আসামী।

হিন্দী শব্দটি অনেক সময়ে অতিব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বক্ষ্যমান পূর্বী ও পশ্চিমী হিন্দীর ন্যায় বিহারী (মগহী, ভোজপুরী, মৈথিলী) ভাষাকেও ইহার মধ্যে সাধারণে ধরিয়া থাকে, বস্তুত বিহারী হিন্দী হইতে ভিন্ন।

মোটামুটি পূর্বোক্ত মধ্যদেশ বা গঙ্গাযমুনা-দোয়াবে (Gangetic Doab) ও ইহার কতক উত্তরে যে ভাষা আজকাল চলিত আছে তাহা প শ্চি মী হি ন্দী। দিল্লী মিরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার যে বিভাষা প্রচলিত আছে, তাহাকে হি ন্দু স্থা নী বলে। মোগলদের সময়ে ইহার বহু প্রচার ও উন্নতি হয়। মুসলমানেরা ইহা ফারসী অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করেন। হিন্দুদের নিকট হইতে ইহাতে যেমন সংস্কৃত শব্দসমূহ,

মুসলমানগণের নিকট হইতে তেমনি ফারসী ও আরবী শব্দসমূহ ইহাতে বহুলভাবে প্রবেশ করে। ক্রমে ফারসী ও আরবী শব্দের মাত্রা ইহার মধ্যে এত অত্যধিক হইয়া উঠে যে, শিক্ষিত মুসলমান ও মুসলমানী ধরণে শিক্ষিত হিন্দু ছাড়া কেহ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এই আরবী-ফারসীবহুল হিন্দী বা হিন্দুস্থানী উর্দূ নামে প্রসিদ্ধ। উর্দূ শব্দটি তুর্কী, ইহার অর্থ 'সেনা', 'সেনানিবাস', ও 'সেনানিবাস-সংলগ্ন বাজার।' উর্দূ-ই-মু'ল্লা শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'রাজকীয় সেনানিবাস-সংলগ্ন বাজার', ইহা হইতেই উৎপন্ন বা প্রথম প্রচলিত হয় বলিয়া এখানকার ভাষার নাম উর্দূ হইয়াছে। উর্দূতে ইহাকে বলা হয় 'উর্দূ-ই-মু'ল্লাকী ৰূবান', ইহার আক্ষরিক অর্থ রাজকীয় সেনানিবাস-সংলগ্ন বাজারের ভাষা। দিল্লীতেই ইহার প্রথম উৎপত্তি, সেখান হইতে মুসলমান বাদশাহগণের প্রভাবে ইহা চারিদিকে নানা স্থানে প্রচারিত হয়। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ ইহার প্রধান স্থান, দ্রাবিড়ী ভাষায় পরিপূর্ণ দাক্ষিণাত্যেও ইহা প্রচলিত হইয়াছে, সেখানকার মুসলমানেরা এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

উর্দূ বা হিন্দুস্থানী

বাঙ্গরু, ব্রজভাষা, কনৌজী ও বুন্দেলী পশ্চিমী হিন্দীর অপর বিভাষা। পঞ্জাবের পূর্ব-দক্ষিণ অংশের বাঙ্গর অর্থাৎ উচ্চভূমির অধিবাসীদের ভাষা 'বাঙ্গরু'। সময়ে-সময়ে ইহাকে হৈরানী বলা হইয়া থাকে। পঞ্জাবী ও রাজস্থানীর সহিত ইহা অধিক মিশ্রিত হইয়াছে। মথুরার চতুর্দ্দিকে ও গঙ্গা-যমুনা-রচিত দ্বীপের মধ্যভাগে (Central Gangetic Doab) ব্রজভাষা কথিত হইয়া থাকে। পশ্চিমী হিন্দীর বিভাষাগুলির মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা অতি মধুর এবং ইহার সাহিত্য উৎকৃষ্ট ও প্রধানত পদ্যে রচিত।

ইহার পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে ও কানপুরের উত্তর-পশ্চিমে কনৌজ ও

তাহার চতুর্দিকের ভাষা কনৌজী। ইহা প্রায় ব্রজভাষার মত। বুন্দেলখণ্ডের অধিকাংশের ভাষা বুন্দেলী, ইহা মধ্যভারতের নর্মদা-উপত্যকাতেও কথিত হইয়া থাকে। ইহারও সাহিত্য বেশ ভাল।

বুন্দেলখণ্ডের পশ্চিমে রাজপুতানা বা রাজস্থান। ইহার ভাষার নাম রাজস্থানী। ইহার বহু বিভাষা আছে। এই সমস্তকে চারভাগ করা যাইতে পারে। উত্তর অঞ্চলের বিভাষাকে মেরাতী অথবা বিঘোতা বলে। ইহার সহিত পশ্চিমী হিন্দীর বহু সাদৃশ্য আছে। দক্ষিণ রাজপুতানার বিভাষার নাম মালবী, ইহা মালব অথবা মালওয়া প্রদেশে কথিত হইয়া থাকে। মেরাতী ও মাল্‌বীতে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য নাই। পূর্ব রাজপুতানার বিভাষা জয়পুরী, আর পশ্চিম রাজপুতানার বিভাষার নাম মারবাড়ী। মারবাড়ী মারবার, মেবার, বিকানীর ও যশল্মীরে কথিত হইয়া থাকে। এই ভাষাভাষী মারওয়াড়ী ব্যবসায়ীরা সর্বত্র সুপরিচিত। ইহাতে রচিত বহু পুস্তক আছে। রাজপুতানা হইতে সময়ে সময়ে নানা লোক নানা কারণে গমন করিয়া হিমালয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবের চাম্বা হইতে নেপাল পর্য্যন্ত স্থানের অধিবাসীরাই শ্রেষ্ঠ। ইহারা ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়া ও তত্রত্য আদিম নিবাসীদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের রাজস্থানী ভাষাকে সেখানে বহুলভাবে প্রচার করে। ফলে এই রাজস্থানী সেখানকার ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন আকার গ্রহণপূর্বক বাড়িতে আরম্ভ করে।

চাম্বা হইতে নেপাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পার্বত্য প্রদেশের এই নূতন রাজস্থানীই পাহাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। এই পাহাড়ীকে তিন ভাগ করা যায়। একবারে শেষ পূর্ব প্রান্তে নেপালের ভাষা পূর্বী পাহাড়ী, ইহাকে খসকুরা অথবা সাধারণতঃ নেপালী বলা হইয়া থাকে (নেপালে সাধারণ

[illegible]

অর্থাৎ কুমায়ন ও গাড়ওয়াল প্রদেশের ভাষা; এবং প শ্চি মী পা হা ড়ী অর্থাৎ সিমলা পর্বত, চাম্বা ও পশ্চিম কাশ্মীর প্রভৃতির ভাষা। পশ্চিমী পাহাড়ীর মধ্যে হাজরা, মুরী, কাশ্মীর ও স্বাত প্রদেশের বা গুজর গুজুরী বা গূজর অথবা গুজরগণের গুজুরী ভাষাকেও ধরা হইয়া থাকে। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের ল ভা না বা ব ন্ জা রা জাতির লভালী ভাষাও পশ্চিমী পাহাড়ী হইতে উৎপন্ন।

রাজপুতানার মরুভূমির দক্ষিণে গুজরাট প্রদেশ। এখানকার চলিত ভাষার নাম গুজরাটী। ইহা দেবনাগরীর ন্যায় পৃথক্ অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। গুজরাটীতে অনেক ভাল ভাল পুস্তক আছে। ইহা ক্রমশই সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে।

মধ্যদেশ ও বহির্দেশের মধ্যবর্তী দেশের অপর একটি ভাষার নাম পঞ্জাবী। ইহা মধ্য পঞ্জাবে প্রচলিত। এই পঞ্জাবীই শিখদের ভাষা। ইহা সাধারণত গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত হয়। সময়ে সময়ে দেবনাগরী ও ফারসী অক্ষরেও লিখিত হইয়া থাকে। অমৃতসর ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশের পঞ্জাবীই উৎকৃষ্ট। ইহার প্রধান বিভাষার নাম ডো গ রী জম্মু ও কাঙ্গরা অঞ্চলে কথিত হইয়া থাকে।

এইবার পূর্বী হিন্দীর কথা। ইহা বহুবিস্তৃত; উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, বাঘেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, ছোটনাগপুর ও মধ্যভারতে ইহা প্রচলিত আছে। ইহার তিনটি বিভাষা প্রধান, আ উ ধী, বা ঘে লী ও ছ ত্তী শ গ ড়ী। আউধ অর্থাৎ অযোধ্যার ভাষা বলিয়া ইহাকে আ উ ধী বলা হয়। হর্দোই জেলা ও ফয়জাবাদ জেলার উত্তরাংশ বাদে সমস্ত অযোধ্যা প্রদেশে আ উ ধী কথিত হয়। (হর্দোইতে কনৌজী ও ফয়জাবাদের ঐ অংশে পশ্চিমী ভোজপুরী ভাষা প্রচলিত।) ইহা ছাড়া জৌনপুরের পশ্চিমাংশ, মিরজাপুর, এলাহাবাদ ও ফতেপুর জেলাতেও আউধী কথিত হইয়া থাকে। আউধকে কোশল (অর্থাৎ অযোধ্যা)

দেশের ভাষা বলিয়া কো শ লী নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহার অপর একটি নাম বৈ স্বা রী অথবা বৈ স্বা ড়ী। বৈস্বাড় রাজপুতগণ অযোধ্যার অঞ্চলে প্রচুর, তাহাদের দেশের ভাষা বলিয়া বৈ স্বা ড়ী নাম হইয়াছে।

নামেরই দ্বারা জানা যাইতেছে বা ঘে লী হইতেছে বাঘেল বা বাঘেলখণ্ডের কথ্য ভাষা। ইহাকে রি ঁ রা ঈ নামেও উল্লেখ করা হয়। কেননা ইহা রেবা রাজ্যের ভাষা। ছত্তীশগড় বা মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশের ভাষার নাম ছ ত্তী শ গ ড়ী।

ভাষা হিসাবে পূর্বী হিন্দী অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম ; ইহা দ্বারা যেরূপ বিবিধ ভাব প্রকাশ করা যায়, অন্যের দ্বারা তাহা পারা যায় না। ইহার সাহিত্যও অতি বিস্তৃত।

এইবার বহির্দেশের ভাষা। ইহাকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছি, (১) উত্তর-পশ্চিমী বর্গ, (২) দক্ষিণী বর্গ ও (৩) পূর্বী বর্গ। প্রথম বর্গের কাশ্মীরীর কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কাশ্মীরীতে রচিত প্রাচীন অনেক পুস্তক আছে। বর্তমান কাশ্মীরীতে ফারসী ও আরবী শব্দ এত প্রবেশ করিয়াছে যে, দুই বা তিন শত বৎসরের পূর্বের রচিত পুস্তক সাধারণে বুঝিতে পারে না। কাশ্মীরের অধিবাসীদের অনেকেই মুসলমান, ইঁহারা এই ভাষাই ব্যবহার করেন, কেবল ব্রাহ্মণরা প্রাচীন ভাষার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন। কাশ্মীরীর প্রধান বিভাষার নাম কি শ্ ত্ রা ড়ী।

উত্তরপশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশের পূর্ববর্তী স্বাত ও কোহিস্তান প্রদেশের প্রাচীন ভাষাকে কো হি স্তা নী বলা হইয়া থাকে। সম্প্রতি এখানে অধিকাংশ লোকেই পো স্তো ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে সিন্ধুনদীর পশ্চিম হইতে আফগানিস্থানের

মুসলমানেরা এখানেও পো স্তো বলিয়া থাকেন। ইহাতে কোনো সাহিত্য নাই। পঞ্জাবীর ন্যায় ইহাও লণ্ডা অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে।

সিন্ধুদেশ ও ইহার আশেপাশে সি ন্ধী ভাষা প্রচলিত। লহন্দার সহিত ইহার বিশেষ যোগ আছে। ইহাতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু সাহিত্য নাই। যাঁহাদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান হওয়ায়, ফারসী ও আরবী শব্দ ইহাতে প্রচুররূপে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বের অধীনে ইহা ফারসী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, অবশ্য এজন্য কতকগুলি ধ্বনিপ্রকাশের উদ্দেশ্যে ফারসী হইতে অতিরিক্ত কয়েকটি অক্ষর কথিত হইয়াছে। পূর্বে ইহা লণ্ডা অক্ষরেই লিখিত হইত। এখনো হিসাব-পত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা এই অক্ষরেই লিখিত হইয়া থাকে। ইহার চারিটি প্রধান বিভাষা আছে,—সি রৈ কী, লা ড়ী, থ রে লী ও ক চ্ছী। ক চ্ছী ভাষা গুজরাটী ও সিন্ধীর সংমিশ্রণ মাত্র, ইহার মধ্যে সিন্ধীরই অংশ বেশী।

বহির্দেশের ভাষাসমূহের দক্ষিণী বর্গের মধ্যে প্রধান ভাষা ম রা ঠী। সাধারণত বলিতে গেলে ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, বেরার ও মধ্যপ্রদেশে কথিত হইয়া থাকে। নিজামরাজ্যের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও পর্তুগীজ ভারতেও ইহা কথিত হয়। মরাঠীতে বিপুল সাহিত্য আছে। ইহা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হয়। কিন্তু সাধারণত হিসাব-পত্রাদির জন্য মোড়ী নামক অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে।

স্থূলত মরাঠীর তিনটি বিভাষা আছে, মূল বা দেশী মরাঠী, বেরার ও মধ্যপ্রদেশের মরাঠী ও কোঙ্কণ প্রদেশের মরাঠী। কোঙ্কণস্থ মরাঠীকে কো ঙ্ক ণী বলে।

বহির্দেশের পূর্বী বর্গের মধ্যে বিহারী, ওড়িয়া, বাঙ্লা ও আসামী। ইহাদের মধ্যে বি হা রী প্রধানত বর্তমান বিহারপ্রদেশে কথিত হয়। বিহারের বাহিরেও আগরা অযোধ্যা প্রদেশের পূর্বাংশে কয়েকটি

স্থানে কাশী, হাজারীবাগ ও রাঁচি অঞ্চলেও ইহা কথিত হইয়া থাকে। বিহারীর তিনটি প্রধান বিভাষা আছে, ভো জ পু রী, ম গ হী ও মৈ থি লী। যুক্তপ্রদেশের পূর্বে, পশ্চিম বিহারে রাঁচী অঞ্চলে ও ছোটনাগপুরের মালভূমিতে প্রচলিত ভাষা ভো জ পু রী। শেষোক্ত স্থানের ভাষাকে না গ পু রি য়া বলা হয়। সাধারণ ভোজপুরী হইতে ইহা একটু ভিন্ন। ভোজপুরী কা ই থী নামক অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। ভোজপুরীতে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সাহিত্য নাই।

ম গ হী (অর্থাৎ মা গ ধী) প্রাচীন মগধপ্রদেশেই আবদ্ধ নহে, স্থূলত বলিতে গেলে ইহা গয়া জেলার অধিকাংশ স্থলে, হাজারীবাগ জেলায়, এবং পালামৌ, মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলার কতক-কতক অংশে কথিত হইয়া থাকে। মগহীও সাধারণ কাইথী অক্ষরে লিখিত হয়। কখনো কখনো দেবনাগরী অক্ষরও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূরবী মগহী আবার বাঙলা অক্ষরেও লেখা হয়। মগহীতেও উল্লেখযোগ্য নিজের কোনো সাহিত্য নাই। ইহাতে ছোট-বড় নানারূপ গান আছে। বন্দীরা ইহাতে অনেক সময়ে দীর্ঘ-দীর্ঘ গান গাহিয়া থাকে।

মগহী

মৈ থি লী মিথিলা প্রদেশের ভাষা, ইহার অপর নাম তি র হু তি য়া অর্থাৎ তি র হু ত বা ত্রি হু তে র ভাষা। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে গণ্ডক নদী ও পূর্বে কৌ শি কী (বর্তমান কুশী), ইহার মধ্যবর্তী দেশের নাম মি থি লা। প্রধানত এই মিথিলাতেই মৈথিলী কথিত হইয়া থাকে। তবে চম্পারণ জেলার কতক অংশের ভাষা ভোজপুরী। অপরদিকে পূর্ণিয়ায় এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার পূর্বাংশেও মৈথিলী কথিত হয়। মৈথিলী লিখিবার স্বতন্ত্র অক্ষর আছে, ইহা মৈথিলী নামেই প্রসিদ্ধ।

মৈথিলী

মৈথিলীতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে। বাঙলার প্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি মৈথিল, তাঁহার পদাবলী মৈথিলীতে রচিত।

ওড়িয়া

ওড়িয়া, উড়িষ্যা ও তৎসংলগ্ন মান্দ্রাজের (গঞ্জাম, বিজিগাপটম্) ও মধ্যপ্রদেশের কতক-কতক স্থানের ভাষা। ইহা ছাড়া মেদিনীপুরের উত্তরাংশে ও বালেশ্বরের কিয়দংশে ইহা কথিত হয়। সিংহভূমেরও অনেক স্থানে ইহা প্রচলিত আছে। ওড়িয়ার বিভাষাগুলির মধ্যে তেমন ভেদ নাই। ওড়িয়া নামে এক প্রকার অক্ষর আছে, তাহাতেই ইহা লিখিত হইয়া থাকে। ওড়িয়ার নিজের উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে।

বাঙলা

ইহার পর বাঙলা। ইহা বর্তমান বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বা বঙ্গদেশের ভাষা। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের বাহিরেও, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মধ্যে হাজারীবাগ ও লোহরডগ মালভূমির নীচে ও পূর্বে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আসামে ইহা আসামী ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট ও কাছাড়েও ইহা কথিত হয়। পূর্বে এই দুই জেলা নিম্নবঙ্গেরই মধ্যে গণ্য হইত। বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইয়া দক্ষিণে উত্তর বর্মারও মধ্যে ইহা প্রবেশ করিয়াছে ও সেখানে আকিয়াব জেলায় বর্মীভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। ওদিকে সিংহভূমের ধলভূম অঞ্চলে ও ময়ূরভঞ্জের উত্তর অংশেও ইহা কথিত হইয়া থাকে।

পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ-অনুসারে বাঙলার তিনটি প্রধান বিভাষা বলিতে পারা যায়। লিখিবার জন্য বাঙলায় স্বতন্ত্র অক্ষর আছে। বাঙলার সাহিত্য সমৃদ্ধ।

আসামী

গোয়ালপাড়া ও লখিমপুর জেলার মধ্যবর্তী আসাম উপত্যকার ভাষা আ সা মী বা অ স মী য়া। গোয়ালপাড়ার পশ্চিমে ইহা বাঙলার সহিত মিশিয়াছে। আসামী সর্বত্র প্রায় সমান; তবে কামরূপ ও গোয়াল-

পাড়ার পূর্বাংশে যে আসামী কথিত হয়, তাহা সাধারণ আসামী হইতে ভিন্ন; আর মণিপুরে এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে ময়াঙ্গ জাতিরা যে আসামী ব্যবহার করে তাহাও বিভিন্ন প্রকার, ইহাকে ঐ জাতিরই নামে ময়াঙ্গ বলা হইয়া থাকে। ইহা বাঙলা অক্ষরেই লিখিত হয়। অসমীয়াকে বাঙলারই একটি প্রধান বিভাষা বলিলেই চলে। ইহার বিবিধ প্রাচীন সাহিত্য আছে।

এইবার আমরা দ্রাবিড় ভাষার কথা বলিব। দ্রাবিড়জাতি ভারতের বহুস্থানেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই ইহারা দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করে না। উত্তর ভারতে অবস্থিত অনেক দ্রাবিড় জাতি আর্য্যভাবালম্ব হইয়া আর্য্যভাষাই গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ভিন্ন সাধারণত দ্রাবিড়গণের মধ্যে প্রধানত দুইটি ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়, মূল দ্রাবিড় ও মুণ্ডা।

দ্রাবিড়

মুণ্ডার কথা পরে বলা হইবে। দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষাকে একই দ্রাবিড়গণ ব্যবহার করে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ দুই ভাষার মধ্যে পরস্পর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, বস্তুত তাহা নাই, তাহারা উভয়েই পরস্পর হইতে পৃথক্।

দ্রাবিড়ভাষাসমূহ প্রধানত দক্ষিণ ভারতে ও মধ্যভারতের অন্তর্গত পার্বত্য প্রদেশসমূহে কথিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভাষার মধ্যে দুইটি ভাষা ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণারও মধ্যে প্রচলিত আছে, এখানে ইহাদের পাশা-পাশি মুণ্ডা ভাষাও কথিত হয়। ব্রাহুঈ নামক দ্রাবিড়ভাষা বেলুচিস্থানের একস্থানে কথিত হয়, ইহা আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি।

দ্রাবিড়ভাষাসমূহের মধ্যে প্রধান চারিটি, তামিল, মালয়ালম,

কর্ণাটী ও তৈলঙ্গী বা তেলেগু। ইহাদের প্রত্যেকটিই ভিন্ন-ভিন্ন অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে।

দ্রাবিড়ভাষাসমূহের মধ্যে সর্ব বিষয়ে প্রধান তামিল (এই শব্দটি দ্রাবিড় শব্দেরই অপভ্রংশ)। স্থূলত বলিতে পারা যায়, মান্দ্রাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মহীশূর রাজ্যের পাশ দিয়া ত্রিচিনাপল্লী হইয়া ভারতবর্ষের একবারে শেষসীমা পর্য্যন্ত এবং উত্তর-সিংহলে তামিল ভাষা কথিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকাল হইতে তামিল আলোচিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সাহিত্য প্রচুর ও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহাতে রচিত তিরুবল্লুবরের কুরল (নীতি) অতি প্রসিদ্ধ।

তামিল

মালয়ালম্ তামিল হইতে উৎপন্ন। ইহা মালাবার উপকূলের ভাষা। ইহারও সাহিত্য বিস্তৃত। দক্ষিণ-ভারতে সংস্কৃত লিখিবার জন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নামক অক্ষরে ইহা লিখিত হইয়া থাকে।

মালয়ালম

কর্ণাট বা বর্তমান মহীশূর রাজ্য ও ইহার আশ-পাশের ভাষার নাম কর্ণাটী। ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কোণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার প্রাচীন সাহিত্য আছে। এবং বর্তমানেও মহীশূরের রাজার প্রভাবে ইহার প্রভূত উন্নতি হইতেছে। ইহার অনেকগুলি ছোটখাট বিভাষা আছে, যথা কোড়ন্ (কুর্গ প্রদেশে), তলু (মান্দ্রাজের কানারা জেলার দক্ষিণে), এবং তোদ ও কোত (নীলগিরিতে)।

কর্ণাটী

দ্রাবিড়ভাষাসমূহের মধ্যে সর্ববিষয়েই তামিলের পর তেলেগুর স্থান। উড়িষ্যার পর গঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া মান্দ্রাজের নিকট পর্য্যন্ত ভারত-অন্তরীপের পূর্বাংশের প্রধান ভাষা তেলেগু। নিজামের রাজ্যের পূর্বে ও মধ্যপ্রদেশের শেষ দক্ষিণপ্রান্তেও ইহা কথিত হইয়া থাকে।

তেলেগু

ছোটনাগপুর ও ইহার সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী খুরুক বা ওরাওঁদের ভাষা ওঁরাও নামে প্রসিদ্ধ। ইহাও দ্রাবিড়ভাষার অন্তর্গত। অন্যান্য দ্রাবিড়ভাষা অপেক্ষা ইহার প্রাচীন তামিল ও প্রাচীন কর্ণাটীর সহিত অধিকতর সম্বন্ধ। রাজমহলের মালের নামক পাহাড়ীদের ভাষার নাম মা ল তো অথবা রা জ ম হা লী। ইহাও দ্রাবিড়ী ভাষা। মালের ও ওরাওঁ-গণের মূলও একই ছিল বলিয়া বুঝা যায়; ভাষার দ্বারাও ইহাদের এই ঐক্য বুঝা যায়।

অন্যান্য দ্রাবিড়

মধ্যভারতের বন্যপ্রদেশসমূহের (প্রাচীন গোণ্ডবন) আদিম অধিবাসী গোণ্ডদের ভাষা গোণ্ড। ইহাতে তামিল, কর্ণাটী ও তেলেগুর মিশ্রণ দেখা যায়।

উড়িষ্যার পার্বত্য প্রদেশসমূহে, পূর্বোক্ত গোণ্ডবনের পূর্বাংশে ও গুমসর (গঞ্জাম) অঞ্চলের দ্রাবিড় অধিবাসী 'খো ন্দ বা কু-দের ভাষার নাম খো ন্দ।

ইহার পর আমরা মু ণ্ডা ভাষার কথা বলিব। মুণ্ডা ভাষা প্রধানত ছোটনাগপুরে প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া বাঙলা, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের স্থানে স্থানে ও বেরারের উত্তরে মহাদেব পাহাড়ের (সাতারা) মধ্যেও ইহা কথিত হইয়া থাকে। পূর্বে কেহ কেহ মনে করিতে ইহা দ্রাবিড়ী ভাষারই অন্তর্গত, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুণ্ডানামে প্রচলিত ভাষাসমূহ ও দূরতর ভারতের (Farther India) মোন্‌খমার ভাষাসমূহে মালাক্কা ও অষ্ট্রেলোনেসিয়ার অর্থাৎ বর্মা, শ্যাম, আনাম ও কাম্বোডিয়ায় কোনো কোনো বন্য জাতিদের ভাষার আর নিকোবরের ভাষার মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান আছে। ইহাতে মনে করা যায়, এককালে ভারতের কতক অংশে এ ঐ-সকল

মুণ্ডাভাষা

স্থানে একটা সাধারণ ভাষা কথিত হইত। ভারতের মুণ্ডা ভাষা তাহারই নিদর্শন; আর দূরতর ভারতে পরবর্তী অপর ভাষার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় ঐ প্রাচীন ভাষার কিঞ্চিন্মাত্র নিদর্শনস্বরূপ কিছু অবশেষ থাকিয়া গিয়াছে।

মুণ্ডাবর্গের মধ্যে প্রধান খে র বা রী। ইহার অনেকগুলি বিভাষা আছে, যথা সাঁ ও তা লী অথবা হা র, মু ণ্ডা রী, কো ড়া, হো, ভূ রী ইত্যাদি। সাঁওতালী প্রধানত সাঁওতাল পরগণায় এবং হো সিংহভূমের

খেরবারী

পড়কা বা কোলদের মধ্যে প্রচলিত। অন্যান্যগুলি ছোটনাগপুর ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য স্থানসমূহে কথিত হয়। মহাদেব-পাহাড়ে প্রচলিত মুণ্ডার নাম কূ র কূ। রাঁচির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ও তৎসংলগ্ন জাশপুর ও গাঙ্গপুর রাজ্যে যে মুণ্ডাভাষা কথিত হইয়া থাকে তাহার নাম খ ড়ি য়া। ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। উড়িষ্যার পার্বত্য প্রদেশে জু আ ঙ নামে মুণ্ডাভাষা প্রচলিত। আর উড়িষ্যার মান্দ্রাজের শেষপ্রান্তে প্রচলিত মুণ্ডাভাষার নাম শ ব র ও গ দ ব। মুণ্ডাভাষাগুলি লিখিবার কোনো স্বতন্ত্র অক্ষর নাই, আজকাল রোমক অক্ষরে ইহা লিখিত হইতেছে।

বর্মার মোন্, পলৌউ, ও বা জাতিদের, আসামের খাশী বা খাশিয়াদের, মালয় উপদ্বীপের আদিম নিবাসীদের ও নিকোবর দ্বীপের অধিবাসীদের ভাষাকে মো ন-খ মা র নামে কথিত ভাষার বর্গের মধ্যে গণ্য করা হয়। বর্মার সন্নিহিত আনাম ও কাম্বোডিয়ার প্রদেশগুলিতে

মোন-খমার

এই ভাষা সবিশেষ প্রচলিত আছে। বৃটিশভারতে প্রচলিত মো ন-খ মা রের মধ্যে আসামের খাশিয়াদের খা শী ভাষাই প্রধান। মিশনারী সাহেবদের চেষ্টায় ইহা লিখিত হইতেছে। এজন্য রোমক অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাশী ভাষা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষণীয় ভাষাসমূহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

তিব্বতী-চীনা বর্গের অন্তর্গত তিব্বত-বর্মীয় ভাষায় দুইটি প্রধান ভাষা রহিয়াছে, তিব্বতী ও বর্মী। ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ও সাহিত্য আছে। তিব্বতকে পূর্বে এদেশে ভোট বলা হইত, ইহা হইতে ভোটিয়া (ভুটিয়া) শব্দ হইয়াছে। কতকগুলি ভাষাকে লইয়া 'ভো টি য়া নামে একটি অবান্তর বর্গ করা হয়। ইহার মধ্যে তিব্বতের তি ব্ব তী, বালতিস্থানের বালতী, লদাখেবরের ল দা খী ও সিকিম ও ভুটান প্রভৃতির ভাষাকে ধরা হইয়া থাকে। হিমালয়ের কতকগুলি এমন ভাষা আছে যাহাদের ভোটিয়ার সহিত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহারা বিভাষা নহে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে নে বা রী (নে ব্ র বা নেপালের ভাষা), রোং বা লে প চা, ম ঙ্গ র ও মূ র্মী। ইহারা অধিকাংশই নেপালের ভাষা। হিমালয়ের ভাষার আর একটা বর্গ আছে, ইহার মধ্যে ক না ব রী, লি ম্বু ও কি রা ন্তী প্রধান।

তিব্বতী-চীনাবর্গ

তিব্বতী-বর্মীর অন্তর্গত আরো কতকগুলি ভাষা ভারতে কথিত হয়, সংক্ষেপে তাহা উক্ত হইতেছে। আসামের উত্তরে আ কা, দ ল ফা, অ বো র, মিরি, ও মি শ্ মী জাতিরা যে-সকল ভাষা বলে তাহারা ইহারই অন্তর্গত। আসাম উপত্যকার নিম্নভাগে ও ইহার দক্ষিণে (খাশিয়া পাহাড় বাদে) বো দো নামক ভাষাগুলিও এইরূপ। গা রো পাহাড় ও পার্বত্য ত্রিপুরার ভাষাও এই বো দো বর্গের মধ্যে। তা ছাড়া না গা ও কু কি-চি ন নামে প্রসিদ্ধ ভাষাগুলিও তিব্বতী বর্মীর মধ্যে। না গা ভাষাগুলি মিকির ও নাগা পাহাড়ে, আর কু কি-চি ন ভাষাগুলি মণিপুর ও কাছাড়ের স্থানে স্থানে কথিত হইয়া থাকে। কুকিচিনের অন্যতম বিভাষা মে ই থে ই মণিপুরের রাষ্ট্রভাষা। ইহার স্বতন্ত্র অক্ষর ও কিছু সাহিত্যও আছে। কুকি-চিন ভাষা দক্ষিণে বর্মার মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে।

তিব্বতী-বর্মী

ভাষা ও ভাষাভাষীর তালিকা, ১৯২১ সাল।

মূল	ভাষার সংখ্যা	জনসংখ্যা
১। অষ্ট্রোনেশিয়া	২	৫,৫৬১
২। অষ্ট্রো-এশিয়াটিক	১৭	৪,৫২৩,০০০
(ক) মোন্‌খমার	১০	৫৪৯,০০০
(খ) মুণ্ডা	৭	৩,৯৭৩,০০০
৩। তিব্বতী-চীনা	১৪৫	১২,৮৮৫,০০০
(ক) তিব্বতী-বর্মন	১৩৪	১১,৯৫৯,০০০
(খ) তাই-চীনা	১১	৯২৬,০০০
৪। দ্রাবিড়	১৪	৬৪,১২৮,০০০
(ক) তামিল		১৮,৭৭৯,০০০
(খ) তেলেগু		২৩,৬০১,০০০
(গ) মালয়লাম		৭,৪৯৭,০০০
(ঘ) কানাড়ী		১০,৩৭৪,০০০
(ঙ) তুলু		৫৯২,০০০
(চ) বাহুই		১৮৪,০০০
(ছ) মুণ্ডা দ্রাবিড় ভাষা	৫	৩,০৫৬,০০০
(জ) অন্যান্য		১৮৪,০০০
৫। কারেন	১৫	১,১১৪,০০০
৬। মোন্	২	৫৯১
৭। আর্য্যভাষা	২৫	২৩২,৮৪৬,০০০
(ক) বাঙলা		৪৯,২৯৪,০০০
(খ) আসামী		১,৭২৭,০০০
(গ) হিন্দী পশ্চিমী		৯৬,৭১৪,০০০
(ঘ) ঐ পূবী		১,৩৯৯,০০০

	(ঙ) পঞ্জাবী		১৬,২৩৩,০০০
	(চ) পশ্চিমী পঞ্জাবী		৫,৬৫২,০০০
	(ছ) রাজস্থানী		১২,৬৮০,০০০
	(জ) কাশ্মীরি		১,২৬৮,০০০
	(ঝ) পশ্চিম পাহাড়ী		১,৬৩৩,০০০
	(ঞ) পূর্ব পাহাড়ী বা নেপালী		২৭৯,০০০
	(ট) সিন্ধী		৬,৩৭১,০০০
	(ঠ) বালোচি		৪৫৮,০০০
	(ড) পস্তো		১,৪৯৬,০০০
৮।	বিবিধ	২	১৫,০০০
	মোট ভারতীয় ভাষা—	২২২	৩১,৫৫,২৫,০০০
	এশিয়ার ও আফ্রিকার অন্যান্য ভাষা	১১	২,১১,০০০
	য়ুরোপীয় ভাষাভাষী	১৮	৩,১৯,০০০
	মোট ভারতের ভাষা—	২৫১	৩১৬,০৫৬,০০০

দ্বিতীয় ভাগ

১। আয়তন ও জনসংখ্যা

ভারতবর্ষ যে কত বড় দেশ তাহা বাংলাদেশের গৃহকোণে বসিয়া, কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণ পড়িয়া ও মানচিত্র দেখিয়া আদৌ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সংখ্যা দিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় এই বিশাল দেশের পরিমাণফল ১৮,০৫,৩৩২ বর্গ-মাইল; কিন্তু ইহাতে কি ইহার বিশালত্ব অনুভব করা যায়? এদেশ উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় দুই হাজার মাইল লম্বা এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমেও প্রায় ততখানি। পায়ে হাঁটিয়া এই মহাদেশ পার হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাস লাগে। য়ুরোপের সহিত তুলনা করিলে আমরা বুঝিব এদেশ কত বৃহৎ। রুশিয়া বাদে সমগ্র য়ুরোপ ভারতের সমান। একা ব্রহ্মদেশই অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সমতুল্য; বোম্বাই-এর সহিত স্পেনের তুলনা চলে; মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, বেলুচিস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং রাজপুতানা—প্রত্যেকটিই বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে বৃহৎ। ইতালি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যা হইতে ক্ষুদ্র; নিজামের হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীররাজ্য গ্রেট্‌বৃটনের সমান। এমনি করিয়া তুলনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি ভারতবর্ষের আয়তন কত বড়।

আয়তন

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ১৯২১ সালের স্নমারানুসারে ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার ছিল। সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি পাঁচজনের মধ্যে ভারতবাসী একজন। রুশ ব্যতীত অবশিষ্ট য়ুরোপের জনসংখ্যা ভারতের সমান, এবং আমেরিকার মার্কিনদেশের জনসংখ্যার প্রায় তিন-গুণ। যুক্তপ্রদেশ ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃটীশদ্বীপেরই সমান;

জনসংখ্যা

বিহার-উড়িষ্যার জনসংখ্যার সহিত ফ্রান্সের, বোম্বাই-এর সহিত অষ্ট্রিয়ার, পঞ্জাবের সহিত স্পেন-পর্টুগালের, আসামের সহিত বেলজিয়ামের তুলনা চলে।

বৃটীশ-শাসিত ভারতের আয়তন ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩০০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ সমস্ত ভারতের শতকরা ৬৩ ভাগ। জনসংখ্যা ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩ হাজার ২৯৩ অর্থাৎ সমগ্র সংখ্যার শতকরা ৭৭½ অংশ। দেশীয় নরপতিগণের রাজ্য সমগ্র ভারতের শতকরা চব্বিশ ভাগ, জনসংখ্যা ৭,১৯,৩৯,১৮৭।

দেশীয় রাজ্য

ভারতে লোকের বসতি ও জনসংখ্যা সর্বত্র সমান নহে। মোটামুটি ভাবে ভারতের প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১৭৭ জন লোকের বাস ধরা হয়। বৃটীশ-অধিকৃত ভারতে ২২৬ জন ও দেশীয় রাজ্যে ১০১ জন গড়ে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে। কিন্তু স্থানবিশেষে ইহার তারতম্য অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। কোনো কোনো স্থলে বর্গমাইলে ১ জন লোক, কোথায়ও ১,৮৮২ জন লোক বাস করে! *

ভারতের লোক বসতি

---

* তুলনার জন্য আমরা পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের বর্গমাইল প্রতি লোক বসতির তালিকা দিতেছি ঃ—

বেলজিয়াম	৬৫৪	অষ্ট্রিয়া	১৯৯
ইংলণ্ড-ওয়েলস্	৬৪৯	স্পেন	১০৭
ফ্রান্স	১৮৪	জাপান	২১৫
সুইটজারল্যাণ্ড	২৩৬	ভারতবর্ষ	১৭৭
জারমেনী	৩৩২	আমেরিকা যুক্তরাজ্য	৩২
হল্যাণ্ড	৫৪৪	নিউজিল্যাণ্ড	১১·৮

(Census Report 1921. vol. 1 p. 5)

এক্ষণে আমরা প্রদেশ-অনুযায়ী আয়তন, জনসংখ্যা, জনবসতি ও জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমেই আমাদের দেশ বাংলার কথা পাড়া যাউক। বাংলাদেশ ১৯১২ সালের রাজনৈতিক ভাগ অনুসারে ৮২,২৭৭ বর্গ মাইল ছিল। ইহা রাজনৈতিক বাংলাপ্রদেশ—বাঙালীর বাংলাদেশ বলিতে সমগ্র সুরমা উপত্যকা, আসামের গোয়ালপাড়া জেলার কিয়দংশ, বিহারের অন্তর্গত মানভূম প্রভৃতি স্থান পড়ে। বাংলাপ্রদেশের জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ। ১৮৭২ সাল হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ৪৯ বৎসরে এখানকার জনসংখ্যা শতকরা ৩৭.২ জন হারে বাড়িয়াছে। সমগ্র ভারতের বাড়িয়াছে ৪০%।

বাংলার জনসংখ্যা

আদমসুমারের জন্য প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে বাংলাদেশকে চারিটি ভাগ করা হইয়াছে; উহা অনেকটা পাঁচটি বিভাগের সহিত এক। বর্দ্ধমান বিভাগ বা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরে শতকরা ৫.৯ হারে, প্রেসিডেন্সি বিভাগ বা মধ্যবঙ্গে ২৭.৮ হারে, রাজসাহী বিভাগ বা উত্তরবঙ্গে ২৫.১ হারে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ বা পূর্ববঙ্গে ৭২.৫ হারে লোক বাড়িয়াছে। শেষোক্ত জনসংখ্যাবৃদ্ধির একটি কারণ প্রথম দুই তিনবার চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশ ও ত্রিপুরার মধ্যভাগে জন-গণনা ভাল করিয়া হয় নাই। পূর্বের গণনায় ভুল ছিল বলিয়া পরে বৃদ্ধি এত বেশী দেখাইতেছে। তবুও চরের মুসলমানরা অন্যান্য বিভাগ হইতে বর্দ্ধিষ্ণু ও তাহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল।

১৮৭১ হইতে ১৮৮১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিখ্যাত ম্যালেরিয়া পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হয়, এবং ঐ সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভীষণ ঝড় ও সমুদ্রের স্রোতে বহুসহস্র লোক মারা যায়; ফলে জনসংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। তারপর ত্রিশ বৎসর ম্যালেরিয়ায় বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে; তবুও জনসংখ্যা কিয়দ্‌পরিমাণে

বাড়িয়াছিল। ১৯০১—১৯১১ সালের মধ্যে সমগ্র বঙ্গতে শতকরা ৮— ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২'৮, মধ্যবঙ্গে ৫'১, উত্তর বঙ্গে ৮ ও পূর্ববঙ্গে ১২'৪—হারে জনসংখ্যা বাড়ে। কিন্তু ১৯১১ হইতে ১৯২১ সালে পর্য্যন্ত দশ বৎসরে সমগ্র বাংলাদেশে মাত্র ২'৮ হারে বাড়িয়াছে; ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪'৯% (অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫ জন) করিয়া লোক কমিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় দশবৎসরে শতকরা ১০ জন (১০'৪) ও বীরভূম জেলায় শতকরা ৯'৪ জন করিয়া কমিয়াছে। অপরদিকে নোয়াখালি প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় শতকরা ১৩ জন করিয়াও বাড়িয়াছে। এ ছাড়া অধিকাংশ জেলাতেই লোকসংখ্যা প্রায় পূর্ববৎ বা অতি সামান্য হারে বাড়িয়াছে।

বাংলাদেশের এই জনসংখ্যার হ্রাস হইবার প্রথম কারণ ম্যালেরিয়া ও তাহার আনুসঙ্গিক উপসর্গ। ম্যালেরিয়ার ফলে কয়েকটি জেলার জন্মহার কমিয়াছে ও মৃত্যুহার বাড়িয়াছে। এ ছাড়া কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর প্রভৃতি প্রতিকারোপযোগী ব্যাধি আছেই। ১৯১৮-১৯ সালের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বাংলাদেশকে ছাড়ে নাই, এবং সরকারী হিসাবমত ৬ লক্ষ লোক ঐ রোগে এদেশে মারা যায়। নিম্নস্থ তালিকা হইতে জন্ম-মৃত্যুর হার স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইবে :—

	গড় বার্ষিক	হাজারকরা
	১৯১১-১৯১৭	১৯১৮-১৯২০
জন্মহার	৩৩'৯	৩০'১
মৃত্যুহার	২৯'১	৩৫'৬
ফল	বৃদ্ধি ৪'৮	হ্রাস—৫'৫

বাংলাদেশের জনবসতির ঘনতা (Density) সর্বত্র সমান নহে। দার্জিলিঙ ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া দিলে বর্গমাইলে ৬৪০ জন করিয়া লোক বাস করে। কিন্তু সমতলভূমিতে অসমতা কিছু কম নয়। চট্টগ্রামের পার্বত্যপ্রদেশে বর্গমাইলে ৩৪ ও ঢাকা জেলায় ১,১৪৮ জনের বাস। জমির উর্বরতা, বড় শিল্প বা কলযুক্ত সহর থাকায় জনসংখ্যা সেই সব স্থানেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম প্রধান ; এ ছাড়া খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, ইহুদী, আদিম ধর্মাবলম্বী লোক আছে। সমগ্র ভারতে ১০,০০০ (দশ হাজার) জন লোকের মধ্যে—

	১৮৮১ সালে	১৯০১ সালে	১৯২১ সালে	
হিন্দু	৭,১৯৭	৬,৮৩৫	৬,৫৮৯	কমিয়াছে
মুসলমান	২,২৬০	২,৩২৪	২,৪০৭	বাড়িয়াছে
খৃষ্টান	৫৮	৮২	১২৩	„
বৌদ্ধ	১৭২	৪০৬	৪৬৫	„
শিখ	৬৩	৬৮	৯৬	„
জৈন	২৩	২১	১৮	কমিয়াছে
আদিম	২২১	২৫০	২৮০	বাড়িয়াছে

হিন্দু ও জৈনের সংখ্যা ১০,০০০ করা গত ৪০ বৎসরে ক্রমেই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে ; অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়িতেছে। বাংলাদেশে ৪০ বৎসরে দশ হাজারকরা লোকের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৪৮৮২-এর স্থলে ৪,৩৭২ ও মুসলমানের সংখ্যা ৪৯৬৯ এর স্থলে ৫৩৫৫ হইয়াছে। (১৮৮১—১৯২১ সাল পর্য্যন্ত)।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটির উপর। ইহার মধ্যে মুসলমান ২ কোটি ৫৪ লক্ষ, হিন্দু ২ কোটি ৮ লক্ষ। সমগ্র জনসংখ্যার—

মুসলমান	শতকরা	৫৩·৫
হিন্দু	”	৪৩·৭
আদিম	”	১·৭
বৌদ্ধ	”	০·৫
খৃষ্টান	”	০·৩
অন্যান্য	”	০·০৫

গত চল্লিশ বৎসরের আদমসুমারী হইতে জানা যায় যে, বাংলাদেশে ও ভারতের সর্বত্র মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে ও হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে। ১৮৮১ সালে বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা দশ হাজারে ৪,৯৬৯ ও হিন্দুর সংখ্যা দশ হাজারে ৪,৮৮২ ছিল; সুতরাং তখনো পার্থক্য তেমন ছিল না; চল্লিশ বৎসরে এ পার্থক্য কি দাঁড়াইয়াছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

বাংলাদেশে শতকরা ৫৩·৫ জন লোক মুসলমান; এবং পশ্চিমবঙ্গ ও চব্বিশপরগণা, কলিকাতা, খুলনা, দার্জিলিঙ ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ ব্যতীত সর্বত্রই মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অধিক। কুচবিহার, ত্রিপুরারাজ্য ও সিকিমে কেবল হিন্দুর আধিক্য আছে।

মুসলমান-সংখ্যা

সমগ্র ভারতের মুসলমান-সংখ্যার শতকরা ৩৭·৭ জন মুসলমান বাংলাদেশেই বাস করে। এখানে আমরা পাঠকদের অবগতির জন্য ভারতের কোন প্রদেশে কত মুসলমান বাস করে, তাহা জানাইতেছি।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯০·৩ শতকরা
কাশ্মীর	৭৬·৭
বঙ্গদেশ	৫৩·৫
পঞ্জাব	৫১·০
আসাম	২৭·২

বোম্বাই	১৭.৪
যুক্তপ্রদেশ	১৪.৪
হায়দ্রাবাদ	১০.৪
বিহার-উড়িষ্যা	৯.৭
মান্দ্রাজ	৪.৮
বর্মা	৩.৮
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩.৬

ভারতবর্ষে মুসলমানের গড় ২১.৬ জন। বাংলাদেশের মুসলমানেরা অধিকাংশ চাষী ও অশিক্ষিত হইলেও এখানকার মুসলমানদের নিষ্ঠা ও সংখ্যাধিক্যে ভারতের মধ্যে এ-প্রদেশটি ইসলামের খুব সহায় বলিয়া বিবেচিত হয়। বাংলার বাহিরে হিন্দুরাজাদের শ্রেষ্ঠ নরপতি কাশ্মীর-রাজের অধীন শতকরা ৭৬ জন ও মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজত্বে শতকরা ৯০ জন হিন্দু।

বাংলাদেশের জেলা হিসাবে দেখিলে বগুড়া জেলা মুসলমানপ্রধান—শতকরা ৮২.৪ জন লোক মুসলমান। নোয়াখালি, রাজসাহী, পাবনা, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বরিশাল জেলায় সর্বত্র শতকরা ৭০ এর উপর লোক মুসলমান। পূর্ববঙ্গে ইহাদের সংখ্যা ৪০ বৎসরে শতকরা ৬৭.৩ হারে বাড়িয়াছে। অন্যান্য বিভাগে অবশ্য বৃদ্ধি এরূপ হয় নাই। সমগ্র প্রদেশে এই সময়ের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ১৫.২ হারে বাড়িয়াছিল, কিন্তু মুসলমানদের বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার আড়াই গুণ অর্থাৎ ৩৮.৫ হার।

সমগ্র ভারতের দশজন হিন্দুর মধ্যে একজন হিন্দু বাংলার লোক; বেলুচিস্থান, সীমান্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও বর্মা ছাড়া হিন্দুর সংখ্যা এত কম অন্য প্রদেশে নয়। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৮২, মধ্যবাংলা বা প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৫১ করা, উত্তরবঙ্গে ৩৫.৫ করা ও পূর্ববঙ্গে ২৮.৪ করা হিন্দু। আমরা পূর্বেই

হিন্দুর সংখ্যা

বলিয়াছি যে ৪০ বৎসরে (১৮৮১ – ১৯২১) বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ১৫·২ হারে বাড়িয়াছে। বিভাগ অনুযায়ী দেখিলে এই বৃদ্ধি কত কম, ও জাতীয় জীবনের পক্ষে উহা কি ভয়াবহ তাহা স্পষ্ট হইবে।

	৪০ বৎসরের হিন্দুর শতকরা বৃদ্ধি।	১৯১১—১৯২১এর মধ্যে হিন্দুর বৃদ্ধি।	১৯১১—১৯২১ সমগ্র জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি।
পশ্চিম বঙ্গ	৬·৪	—৫·২ (কম)	৪·৯
মধ্য বঙ্গ	১৯·৩	২·৩	০·৪
উত্তর বঙ্গ	৭·৪	—৩·২ (কম)	১·৯
পূর্ব বঙ্গ	ঢাকা বিভাগ ২২·৪ অন্যত্র ৫·৬	৪·৬	৮·৩
সমগ্র প্রদেশ	১৫·২	—০·৭ (কম)	২·৮

হিন্দু ও বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দু যে ধ্বংসোন্মুখ একথা প্রমাণের জন্য প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন নাই। এই কয়টি তথ্য জানিলেই পাঠক চিন্তার বিষয় পাইবেন।

আসামের পরিমাণ ৬১,৪৭১ বর্গ মাইল। আসামের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিভাগ পড়ে। ব্রহ্মপুত্রের অপবহিকাতে অহোম রাজগণের রাজ্য ছিল। উহারই দক্ষিণে খাশিয়া পাহাড়; সেখানে নানা অর্দ্ধ সভ্য জাতির বাস।

আসাম

সেখানকার লোকবসতি বর্গমাইলে ১৫।১৬ জন মাত্র। আসামের তেজপুরের উত্তরদিকে বর্গমাইলে মাত্র ৭ জন বাসিন্দা। সুরমা নদীর উপত্যকা-অন্তর্গত সিলেট ও কাছাড় জেলা দুটির অধিবাসীরা অধিকাংশই বাঙালী। এ-স্থানটি নদীবহুল ও উর্বর, সেইজন্য এখানকার জনবসতি বর্গমাইলে ৪০৬ জন, কোথায়ও ৯০০ জনও বাস করে। নিজ আসামের জনসংখ্যা চা-বাগিচার প্রসারের জন্য বাড়িয়া চলিয়াছে। চুক্তি-মুক্ত কুলিরা অনেকে সেখানে বাস করিতেছে; তাছাড়া বাঙালী ও নেপালী চাষীরাও বহুস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

বাংলাদেশের পশ্চিমে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ। তিনটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক অংশ লইয়া এই প্রদেশটি গঠিত। ইতিহাসের মিথিলা, মগধ ও গঙ্গা-গণ্ডকীর পলিপাড়া দেশকে বিহার বলে; এখানে জনবসতি বর্গমাইলে ৬৫০। দ্বিতীয় প্রাকৃতিক ভাগ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। উড়িষ্যাদেশে লোক-বসতি বর্গমাইলে ৫০০। এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী পার্বত্য মাল-ভূমিকে ছোটনাগপুর বলে। এখানে বৃষ্টি কম, জমি বালুকাময়; জন-সংখ্যা কম, বর্গমাইলে মাত্র ১৮৬ জন লোক বাস করে। তবে গিরিধি প্রভৃতি স্থানে যেখানে কয়লা ও অভ্রের কাজের জন্য নানা শিল্পব্যবসায় জাগিয়া উঠিয়াছে, সে-সব স্থানে লোকবসতিও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিহার-উড়িষ্যা

বিহার-উড়িষ্যা আকারে ও জনসংখ্যায় চতুর্থ প্রদেশ; জনসংখ্যায় মান্দ্রাজ, বঙ্গদেশ ও যুক্তপ্রদেশ ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইংল্যণ্ড-ওয়েলসের অপেক্ষা বিহার-উড়িষ্যার লোকসংখ্যা কিছু অধিক, যদিও আকারে উহা দ্বিগুণ। এখানকার গড় জনবসতি বর্গমাইলে ৩৪০; কিন্তু সর্বত্র সমান নয়। ছোটনাগপুরের কোনস্থানে ১০৯, আবার বিহারের মজঃফরপুর জেলায় ৯০৭ জন লোক বর্গমাইলে বাস করে। ১৮৮১ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশের জনসংখ্যা প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া, উড়িষ্যার জ্বর

ও বন্যায় তেমনভাবে বৃদ্ধিলাভ করে নাই। ১৯১১—১৯২১ সালের মধ্যে শতকরা ১.২ হারে লোক সমগ্র প্রদেশে কমিয়াছে; উড়িষ্যায় শতকরা ৪.৬ জন লোক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯১২—১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশে জনসংখ্যা, শস্যাদি বেশ ভালই ছিল; তারপর ১৯১৮ সালের কলেরায় দুই লক্ষ লোক মারা যায়; তারপর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ ইত্যাদিতে বহু লক্ষ মারা পড়ে। এ ছাড়া বৃষ্টির অভাবে শস্য নষ্ট হওয়ায় খাদ্যাভাব হয়। আসামের চা-বাগিচায় ১৯১৭-১৮ সালে ১১,২০০ লোকের জায়গায় ১৯১৮—১৯ সালে ১,৯৬,৩০০ লোক কুলি হইয়া যায়। এই সকল কারণ মিলিয়া এ প্রদেশের জনসংখ্যার হিসাব নিকাশ এমন শোচনীয়।

অযোধ্যা-আগ্রার সংযুক্ত প্রদেশ আয়তনে (১,১২,২৪৪ বর্গ-মাইল) ষষ্ঠ হইলেও জন সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা সাড়ে চারি কোটী (৪ কোটী ৩৫ লক্ষ)। সমগ্র প্রদেশের প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ৪১৪; কিন্তু জলবায়ু, বৃষ্টির পরিমাণ ও জমির উর্বরতার পার্থক্যহেতু সব জায়গার লোকসংখ্যা সমান নহে; দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডের অপেক্ষাকৃত বারিশূন্য শুষ্ক স্থানে লোকবসতি বর্গমাইলে ২০৮ জন; আবার হিমালয়ের পাদমূলে পার্বত্য প্রদেশে কৃষিকার্য্য যেখানে সহজে হয় না, সেখানে লোকবসতি খুব পাতলা—বর্গমাইলে ৯৬ জন মাত্র। হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান শাসনকালে গঙ্গা-যমুনার এই উপত্যকাই সভ্যতার কেন্দ্র ছিল; সেইজন্য এখানে যতগুলি প্রথমশ্রেণীর সহর আছে, ভারতের আর কোনো প্রদেশে তত নাই।

সংযুক্ত প্রদেশ

যুক্তপ্রদেশের জনসংখ্যার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পঞ্চাশ বৎসরে সমগ্র প্রদেশে মাত্র শতকরা ৯.১ জন করিয়া লোক বাড়িয়াছে। ১৮৯১—১৯১১ সাল পর্য্যন্ত এই কুড়ি বৎসরে জনসংখ্যায় (০.৬) শত-করা আধ হারে বাড়িয়াছিল; ১৯০১—১৯১১ সালের মধ্যে শতকরা

১·৭০ হারে ও ১৯২১ সালে—৩·১ হারে লোকসংখ্যা কমিয়াছে! এই লোকহ্রাসের কারণ প্লেগ, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা। আদমস্রুমারী অধ্যক্ষ মনে করেন যে এক ইনফ্লুয়েঞ্জাতেই যুক্তপ্রদেশেই ২৮ লক্ষ লোক মারা যায়। এখানকার শতকরা ৫০ হইতে ৭০ জন লোক ঐ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করেন।

পঞ্জাবে প্রায় ২২ কোটি লোকের বাস; আয়তনে উহা গ্রেটব্রিটেনের চেয়ে বড়। সুতরাং জনসংখ্যা বাড়িবার মত স্থান এখনো আছে। তবে সেখানে বৃষ্টি প্রচুর হয় না, এবং জমি সর্বত্র কৃষির উপযোগী নহে বলিয়া জনসংখ্যা বাড়িবার পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার বাহাদুর কয়েকটি খাল খনন করিয়া মরুময় প্রদেশকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন; বিশ বৎসর পূর্বে যে জেলায় কয়েক ঘর যাযাবর লোক ঘুরিয়া বেড়াইত এখন সেখানকার লোকবসতি বর্গমাইলে ২৭৪ জন।

পঞ্জাব

পঞ্জাবের জনসংখ্যা চল্লিশ বৎসরে শতকরা কুড়ির উপর করিয়া বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯১১ সালে যে আদমস্রুমার গৃহীত হয় তদনুযায়ী লোকসংখ্যা শতকরা—২·৪ হারে কমিয়াছিল; গত ১৯২১ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগের ভীষণ উৎপাত সত্ত্বেও লোকসংখ্যা ৫·৫ হারে বাড়িয়াছে। ১৯১১ সালের পূর্বে ম্যালেরিয়া প্রথম এই প্রদেশে দেখা দেয় এবং লক্ষ লক্ষ সবল পঞ্জাবী ও শিখকে গ্রাস করে। কোনো জেলায় প্লেগ ও ম্যালেরিয়ার ফল শতকরা ১০ জন করিয়া লোক মরিয়া কমিয়া যায়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ১৯০১ সালে গঠিত হয়। ইহার আয়তন য়ুরোপের বুলগেরিয়ার মত; কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ২২ লক্ষ। বর্গমাইলে লোকবসতি ১৬৪ জন মাত্র। বৃটীশ অধিকৃত স্থানে জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে;

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

ধৃটীশ-শাসনের সুখ শান্তির লোভে ও সরকারের জলসেচনাদির সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া দুর্দণ্ড আফরিদী, আকাখেল প্রভৃতি জাতির লোকেরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য দলে দলে আসিতেছে।

বোম্বাই প্রদেশ বলিতে পাঁচটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভাগ বুঝায়। বোম্বাই বিভাগটি পার্বত্য,—পশ্চিমঘাট ও আরব সাগরের উপকূল বরাবর বিস্তৃত; এখানে বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হয়। স্থানের (১,৮৬,৯৯৪ বর্গমাইল) অনুপাতে বোম্বাই প্রদেশে জনসংখ্যা কম; গুজরাট, সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসী লইয়া ১৯২১ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ছিল। সিন্ধু প্রদেশটির সহিত বম্বের ভাষায়, জাতি-তত্ত্বে কোনো বিষয়ে কোনো মিল নাই। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক; বৃষ্টিপাত বৎসরে ২ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চির মধ্যে হয়। এখানে কৃত্রিম জলসেচনের দ্বারা কৃষি নির্বাহিত হয়। বম্বের লোকবসতি বর্গমাইলে ১৭ হইতে ৩৮০; গড় ১৪৩ জন।

বোম্বাই

বোম্বাই প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ৫০ বৎসরে শতকরা ১৬% হারে বাড়িয়াছে। এ বৃদ্ধি মোটেই সন্তোষজনক নহে। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের মধ্যে ১৮৭৭ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; তাহার ফল জনসংখ্যা উপর দেখা গেল ১৮৮১ সালের আদম সুমারের সময়; ঐ বৎসর মাত্র শতকরা ১ হারে লোক বাড়ে। তারপর দশ বৎসর (১৮৮১-১৮৯১) বোম্বাই প্রদেশের স্বর্ণময় যুগ—কারণ ঐ সময়ে শতকরা ১৫% লোক বৃদ্ধি পায়; মহামারি, দুর্ভিক্ষ কিছু ছিল না। তারপর ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা শতকরা ৬% হারে কমিল, কারণ ১৮৯৬ সাল হইতে প্লেগ দেখা দিল ও ১৮৯৯-১৯০১ সাল ব্যাপী তিনসালী দুর্ভিক্ষ। ১৯০১-১৯১১ সাল পর্য্যন্ত প্রদেশের অবস্থা ভালই ছিল—জনসংখ্যা ৬% হারে বাড়িল। কিন্তু ১৯২১ সালে দেখা গেল যে দশ বৎসর পূর্বে যে জনসংখ্যা ছিল—তাহা হইতে শতকরা ১ জন কমিয়া

কম ; গুজরাট ও বোম্বাই সহর ব্যতীত সর্বত্র লোক কমিয়াছে। কোঙ্কণে ৩ জন করিয়া, দাক্ষিণাত্যে ৬ জন করিয়া, কর্ণাটকে ২ জন করিয়া, সিন্ধুপ্রদেশে ৭ জন করিয়া লোক দশ বৎসরে কমিয়াছে। লোকক্ষয়ের ফলে ১ জন করিয়া শতে কমিয়াছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বোম্বাই সহরে ও গুজরাটের কাপড়ের কলে যথাক্রমে ২০ ও ৬ হারে লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া লোকসংখ্যা এখানে জড় হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ সব দেশেরই একটু একটু খণ্ড লইয়া গঠিত। পশ্চিম-অঞ্চলের মহরাট্টা, উত্তরের হিন্দীভাষাভাষী, পূর্বের ওড়িয়া তেলেগু ও প্রাচীন খন্দ জাতি প্রভৃতি সবকে মিলাইয়া এই প্রদেশটী তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯০৩ সাল হইতে বেরার হায়দ্রাবাদের নিকট হইতে খাস বৃটীশ-শাসনাধীনে আসিয়াছে। এখানকার জনসংখ্যা ১ কোটি ৫৯ লক্ষ। আয়তন ১, ৩১, ০৫২ বর্গ-মাইল ; গড় বর্গমাইলে জনবসতি ১২২ জন করিয়া। কোথায় ৬১, কোথায় বা ১৯৫ জন আছে।

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের জনসংখ্যা পঞ্চাশ বৎসরে শতকরা ৪৭ হারে বাড়িয়াছে, কিন্তু গত সুমারে উহা ·৩ হারে কমিয়াছিল। ১৮৯১-১৯০১ সালের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮ জন করিয়া লোক কমে ; কিন্তু পরের দশ বৎসরে প্রায় ১৮ হারে বাড়িয়া পুষাইয়া যায়।

দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া মান্দ্রাজের জনসংখ্যা ৪ কোটি ২৭ লক্ষ অর্থাৎ বর্গমাইলে ৩০২ জন করিয়া লোক বাস করে—দেশীয় রাজ্য-সমূহ বাদ দিলে লোকবসতি ২৯১ দাঁড়ায়। এ দেশের জলবায়ু ও জনবসতি সর্বত্র সমান নয়। পশ্চিম উপকূলের বৃষ্টির পরিমাণ ১১০ ইঞ্চি ও পূর্ব উপকূলে ৩৪ ইঞ্চি। এখানকার বৃষ্টির অভাব খালখনন ও বাঁধ-নির্মাণের দ্বারা পূরণ হইয়াছে। তাঞ্জোর নামে একটি জেলার বৃষ্টিপাত ৪৪ ইঞ্চি, কিন্তু পয়োপ্রণালীর

মান্দ্রাজ

সুব্যবস্থা থাকাতে প্রতি বর্গমাইলে ৬৩৫ জন করিয়া লোক এখানে বাস করিয়া থাকে। এখানে ১৮৯১-১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এই ত্রিশ বৎসরে জনসংখ্যা ১৮·৭ হারে বাড়িয়াছে, গত সুমারে মাত্র ২·২ হারে বাড়িয়াছে।

করদরাজ্য ভারতের সর্বত্রই আছে। ইহার মধ্যে হায়দ্রাবাদই সবচেয়ে বড়—জনসংখ্যা দেড় কোটির সামান্য বেশী। এ দেশটির আয়তন বাংলাদেশের মত হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যায় নিতান্ত কম। লোকবসতি গড়ে বর্গমাইলে ১৬২ জন মাত্র। জনবহুলতায় দক্ষিণের কোচীন রাজ্য সর্বশ্রেষ্ঠ: এখানকার লোকবসতি ৬৭৫ জন, দুইটি তহশিলে ১৮০০ করিয়া লোক বর্গমাইলে বাস করে। রাজপুতানার মরুভূমিতে ২১টি রাজ্যে মাত্র ১ কোটি ৫ লক্ষ লোকের বাস। বর্গমাইলে গড়ে ২৮২ জন লোক বাস করে; কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়—জশল্মীরে লোকবসতি ৫ জন ও ভরতপুরে প্রায় ৩০০ জন।

করদরাজ্য

ভারতবর্ষের লোকবসতির এই বৈচিত্র্যের কারণ কি? য়ুরোপের সভ্যতাও সহরে প্রতিষ্ঠিত; সেখানকার অধিকাংশ লোকের জীবন ফাক্টরী, খনি, জাহাজ, রেল প্রভৃতি স্থানে কাটে। আমাদের দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল গ্রামে। এখানকার শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবি; বৃষ্টি-প্রধান স্থান ও সমতল ভূমিতে সেইজন্য লোকের ভিড় অধিক। কিন্তু এ নিয়ম সর্বত্র খাটে নাই। গুজরাট অপেক্ষা আসামে তিনগুণ বেশী বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা গুজরাটেই বেশী; কাশ্মীরে ২৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের জন্য লোকের বাস বর্গমাইলে ৩৭ জন মাত্র। সুতরাং বৃষ্টিই একমাত্র ঘন লোকবসতির কারণ নহে। যে সমতল ভূমিতে সহজে জল-সেচনাদি করা যায়, যে-দেশ পার্বত্য নহে সেখানে লোকের বাস বেশী। সেইজন্য ভারতের জনবসতি নদী-উপত্যকাতেই অধিক।

২। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ

১৮৭২ সালে সর্বপ্রথম জনগণনা বা আদমসুমার গৃহীত হয়; তারপর নয় বৎসর পরে ও তৎপরে প্রত্যেক দশবৎসর অন্তর ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ও ১৯২১ সালে আদমসুমার গৃহীত হয়। গত ৫০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা হিসাবমত শতকরা ২০ হারে বাড়িয়াছে।* সমগ্রভারতের জনসংখ্যা ৩১, ৯০, ৭৫, ১৩২; ইহার মধ্যে বৃটীশভারতে ২৪, ৭১, ৩৮, ৩৯৬, ও করদরাজ্যে ৭, ১৯, ৩৬, ৭৩৬। ১৯১১ সাল হইতে ৩২ লক্ষ লোক অর্থাৎ শতকরা ১'২ জন লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ ইংরাজ-অধিকৃত রাজ্যে শতকরা ১'৩ ও দেশীয় রাজাদের রাজ্যে ১ হারে বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে প্রদেশ হিসাবে পঞ্জাবে ৫'৭ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও যুক্তপ্রদেশে ৩'১ হারে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯০২ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত সমগ্রভারতে ৭'১ বৃটীশভারতে ৩'৯ করদরাজ্যে ৬'৬ হারে বাড়িয়াছিল। গত ৫০ বৎসরে আসাম মধ্যপ্রদেশ ও বর্মাদেশ জনসংখ্যা হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে। ১৯১১ সালের প্রতিবেদনে প্রকাশ যে দক্ষিণ-বর্মা ১৮৭২ সাল হইতে শতকরা ১৩৫ হারে বৃদ্ধি পায়; ১৮৮৬ সালে উত্তর-বর্মা অধিকৃত হয়। ১৮৯১ সাল হইতে সমগ্র প্রদেশের জনসংখ্যা কুড়ি বৎসরে শতকরা ৩৫ হারে বাড়িয়াছিল। আসামে ৪০ বৎসরে শতকরা ৭০ ও মধ্যপ্রদেশে ৪৭ হারে বৃদ্ধি পায়।

আদমসুমার

জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি

---

* দেশ	১৮৮১-৯১	১৮৯১-১৯০১	১৯০১-১১	১৯১১-২১	মোট
ইংল্যাণ্ড ওয়েলস্	১১'৭	১২'১	১০'৫	৪ ৮	৩৯'১
আমেরিকার যুক্ত দেশ	•২৫'৫	২০'৭	২১'০	১৪ ৯	৮২'১
ভারতবর্ষ	১৩ ২	২'৫	৭'৮	১'১	২৯'৬

কিন্তু যথার্থ লোকসংখ্যা ৪০ বৎসরে শতকরা ১৫ জনের বেশী বাড়ে নাই; Wadia-Wealth of India P, 56.

কোন একটি বিশেষ প্রদেশে জনসংখ্যার অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধির কারণ অধিকাংশ স্থলেই Migration বা বাহির হইতে লোকের আগমন। এই উপায়ে আসাম, ব্রহ্মদেশ ও মধ্য-প্রদেশের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষে বাহিরের লোকসংখ্যা ১৯১১ সালে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ছিল ও ১৯২১ সালে উহা কমিয়া গিয়া ৬ লক্ষ ৪ হাজার দাঁড়ায়।

Migration
উপনিবেশ ও
অভিনিবেশ

গত দশ বৎসরে জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির নানাকারণের মধ্যে বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধ কথঞ্চিৎ দায়ী। ভারতীয় সৈন্য ও শ্রমজীবিরা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল; ইহার ফলে প্রায় ৫৮,২৩৮ জন যুদ্ধে মারা যায়। কয়েক বৎসর প্রায় ৪ লক্ষ ৮০হাজার লোক দেশের বাহিরে থাকায় জন্ম-হার কিয়দ পরিমাণে কমিয়াছিল।

যুদ্ধে লোকক্ষয়

সাধারণভাবে মৃত্যু ব্যতীত ভারতে মহামারি হইতে মৃত্যুর হার অধিক। ১৯০১ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত একমাত্র প্লেগেই ৬৫ লক্ষ ভারতে মরিয়াছিল। ১৯১১-১৯২১ সালের মধ্যে প্রায় ৩০লক্ষের উপর প্লেগে মরে। এছাড়া কলেরায় বাংলা বিহার-উড়িষ্যা আসাম অঞ্চলে বহুলক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। সমগ্র ভারতে শতকরা ১½ জন লোক ইহাতে মারা যায়। অন্যান্য ব্যাধি যেমন বসন্ত, জ্বর, ইত্যাদি আছে; তাছাড়া ম্যালেরিয়া ত আছেই। এই সমস্ত ব্যাধি নিবার্য্য অর্থাৎ অন্যান্য সভ্যদেশে নাই; এবং যেখানে ছিল সেখান হইতে উহা দূরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি হইতে মৃত্যুকে 'আকস্মিক' মৃত্যু বলিতে পারি।

প্লেগ কলেরা
প্রভৃতি মহামারি
ও লোকক্ষয়

গত দশবৎসরের মধ্যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধি পৃথিবীর অন্যত্র

যেমন ক্ষতি করিয়াছে—ভারতেরও সেইরূপ ক্ষতি করিয়াছে। ১৯১৮ সালে এই ব্যাধি দেখা দেয় এবং সেই বৎসর ও তৎপরবৎসরে বৃটীশভারতে ৮১ লক্ষ ২০ হাজার মৃত্যু হয়। আদমসুমারের সম্পাদক বলেন যে এই সংখ্যা কম করিয়া ধরা হইয়াছে; অনেক জায়গা লোকাভাবে এই তালিকা পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা বন্ধ হইয়া যায়। অন্যত্র (স্বাস্থ্য, মৃত্যু পরিচ্ছেদ) আমরা এই ব্যাধি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি; তাহাতে প্রদেশ অনুযায়ী যে মৃত্যু তালিকা দিয়াছি, তাহা স্যানিটারী কমিশনারের প্রতিবেদন হইতে গৃহীত। কিন্তু প্রাদেশিক আদমসুমারের অধ্যক্ষগণ কেহ কেহ উক্ত তালিকা উদ্ধৃত সংখ্যা অপেক্ষা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতে যথার্থ মৃত্যুসংখ্যা অধিক বলিয়া দাবী করেন। দেশীয় রাজ্যের তালিকা সর্বদা ভাল করিয়া রাখা হয় নাই। সমগ্র ভারতের এক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতে মৃত্যুর সংখ্যা দুই বৎসরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ বলিয়া ধরিলে কম করিয়া ধরা হইবে না। এতবড় একটা ক্ষতির আঘাতে জন্ম-হার যে কমিবে তাহা আশ্চর্য্যের কি?

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় লোকক্ষয়

ইহা ছাড়া দুর্ভিক্ষ, অনাহার, অনাহারজনিত পীড়ায়, জলপ্লাবনে লোকক্ষয় হইয়াছে। এতগুলি কারণ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়। এ ছাড়াও আরও কতকগুলি সামাজিক ও নৈতিক কারণে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে না।

জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির অপর প্রধান কারণগুলি নিম্নে নির্দেশ করিতেছি। (১) দেশের বিবাহিত নরনারীদের সংখ্যার অনুপাত, (২) বিবাহ-সম্বন্ধে সমাজ ও ধর্মশাস্ত্রের মতামত ও (৩) বিধবাবিবাহ। এক কথায় বিবাহ-সম্বন্ধে নিয়ম নিষেধ, আচার প্রথা জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির কারণ

আমাদের দেশের ধর্মের অনুশাসনে, পরলোকের ও নরকের ভয়ে ও সমাজের পীড়নে প্রায় প্রত্যেক নরনারীকে—সে সক্ষম হউক আর না হউক—বিবাহ করিতে হয়। হিন্দু-পরিবারে কন্যার বিবাহ অতি অল্প বয়সে না দিলে সমাজে নিন্দা ও অবশেষে পতনের ভয় যথেষ্ট। মুসলমানদের ভিতর বিবাহ-সম্বন্ধে কড়াক্কড়ি না থাকিলেও বিবাহ প্রত্যেককেই করিতে হয়। এক ব্রহ্মদেশ ব্যতীত ভারতের সর্বত্রই বিবাহ বাধ্যতামূলক একথা বলিলে ভুল হইবে না। আমাদের দেশে যাহার চালচুলা, অর্থ-পয়সা, বিদ্যা-সামর্থ্য প্রভৃতি কোনো জঞ্জাল নাই—তাহার কিন্তু একটি পত্নী ও গুটিচার পাঁচ রুগ্ন, অনাহার-শীর্ণ, মলিন-ছিন্নকন্থা-পরিহিত শিশু আছে। সমগ্র ভারতের অধিবাসীর শতকরা ৪৯ জন পুরুষ ও ৩৪ জন নারী অবিবাহিত ৪৬ জন পুরুষ ও ৪৮ নারী বিবাহিত ও অবশিষ্ট ৫ জন ও ১৭ জন যথা-ক্রমে বিপত্নীক ও বিধবা। অবিবাহিতদের অধিকাংশই অল্প বয়সের। অবিবাহিত পুরুষের বার-আনির বয়স ১৫ এর কম ও অবিবাহিত মেয়েদের ইহার চেয়ে বেশী ভাগের বয়স ১০ এর কম। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই এমন লোক খুব কম চোখে পড়ে।

ভারতের বিবাহিতের সংখ্যা.

যাহারা বিবাহ করে না, তাহাদের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসী, ভিখারী, রুগ্ন, বেশ্যা প্রভৃতি স্ত্রীলোক ও মেলে বা কূলে না মিলিয়া যাহারা বিবাহ করিতে পারে না—এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। ৪০ বৎসর বয়সের উপর শতকরা যে ৪।৫ জন ও ৩০ বৎসরের উপর বয়সের শতকরা যে একজন অবিবাহিত, তাহারা উপরি-উক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এছাড়া প্রায় সকলেই বিবাহ করে।

ধর্মানুসারে বিবাহিতের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের মধ্যে সকল বয়সের একশত জন পুরুষের মধ্যে ৪৭ জন ও নারীদের মধ্যে ৫০ জন বিবাহিত।

বিবাহিত হিন্দুর সংখ্যা

বাল্যবিবাহ এখনো দেশমধ্যে যথেষ্ট আছে; সমগ্র হিন্দুনারীর শতকরা ৮০ জন অবিবাহিত বালিকার বয়স ১০এর মধ্যে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের যত নারী আছে তাহার শতকরা ৯৬ জন বিবাহিত। দ্বারবঙ্গ জেলার ৫ হইতে ১০ বৎসরের বালকদের শতকরা ৪৮°/০ জন ও মেয়েদের ৬২ জন বিবাহিত।

বিবাহিত মুসলমানের সংখ্যা

মুসলমানদের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় কম। মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন অবিবাহিত, বিবাহিত ৪৩ ও অবশিষ্ট ৪ জন বিপত্নীক; নারীদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন অবিবাহিত, ৪৭ বিবাহিত ও ১৫ জন বিধবা। বাল্যবিবাহ হিন্দুদের অপেক্ষা ইহাদের সমাজে কম। পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্ক হিন্দু মেয়েদের শতকরা ১৩ জন বিবাহিত, মুসলমানদের সেই জায়গায় ৬ জন।

আদিম জাতিদের মধ্যে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয় এবং বিবাহ সেখানেও বাধ্যতামূলক। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে বিবাহ অধিক বয়সে হয় ও না করিলে সমাজে পতন হয় না।

বাল্য-বিবাহ

সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে বিশ বৎসর বয়সের কম পুরুষদের শতকরা ৯ জন ও মেয়েদের শতকরা ২৫ জন বিবাহিত। হিন্দুদের মধ্যে পাঁচ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের দশ হাজারে ১৮ জন বিবাহিত; ৫ হইতে ১০ এর মধ্যে দশহাজার-করা ১৩২ জন বিবাহিত; ১০—১৫ এর মধ্যে ৪৮৮ জন বিবাহিত। মুসলমানদের মধ্যে ৫ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের বিবাহ হিন্দুদের তুলনায় কম—মাত্র দশহাজারে ৫ জন।

পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে কেবল ইংল্যণ্ডের সহিত তুলনা করিলেই আমরা বুঝিব যে বিবাহের সংখ্যা এদেশে কিরূপ। সে-দেশে ১৫ বৎসরের কম কোনো বালক বিবাহিত নাই; আমাদের দেশে শতকরা

৬ জন ঐ বয়সে বিবাহিত। ২০ বৎসরের হাজার জন লোকের মধ্যে ইংলণ্ডে কেবলমাত্র ২ জন বিবাহিত, আর সেই জায়গায় আমাদের দেশে ৩২১ জন বিবাহিত এবং অনেকে দুই একটি সন্তানের পিতা। ২৫ বৎসর বয়সের সময়ে দেখা যায় দশ হাজারে ১৪২ জন ইংরাজ ও ৫৯১ জন ভারতবাসী বিবাহিত। নারীদের মধ্যে এই পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট। পনের বৎসরের নীচে ইংরাজ বিবাহিত বালিকা নাই বলিলেই চলে, আর আমাদের দেশে ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের শতকরা ২০জন মেয়ে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া সন্তানের জননী হইয়া থাকেন। ২০ বৎসর বয়সের ইংরাজ বালিকা শতকরা ১২ জন ও ভারতবর্ষে শতকরা ৮০ জন বিবাহিত। সমগ্র ভারতে ২৫ লক্ষ বিবাহিত মেয়ের বয়স দশের কম, ৯০ লক্ষের বয়স পনর এর কম।

ভারতে হাজারে ১৭৫ ও ইংলণ্ডে ৭৩.২ জন বিধবা। ২০ বছরের নীচে ইংরাজ বিধবা মেয়ে নাই; কারণ তখন তাহাদের বিবাহই হয় না। ২০-২৫ বৎসর বয়সে ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে হাজারকরা ৭১.৫ জন, বিলাতে সেইস্থানে ১.৫ জন বিধবা।

ভারতবর্ষের হিন্দু নারীদের আর একটি বিশেষত্ব তাহাদের বাধ্যতামূলক বৈধব্য। পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৯ জন বিপত্নীক, কিন্তু নারীদের মধ্যে শতকরা ১৭ জন বিধবা। য়ুরোপে ৪০ বৎসরের নীচের নারীদের মধ্যে শতকরা ৭ জন ও ভারতে সেই জায়গায় ২৮ জন বিধবা। ইহাদের মধ্যে ১৫ বৎসরের অল্পবয়সী মেয়ের সংখ্যা তিন লক্ষের উপর; শতকরা ১.৩ জন মেয়ে বিধবা।

বিধবা

উচ্চ বর্ণের মধ্যে বিধবাদের বিবাহ সমাজে প্রচলিত নাই; অনেক নীচবর্ণের মধ্যে (স্যাঙা) 'সঙ্গ' প্রথা আছে; অনেক জাতি আপনাদিগকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য উচ্চ বর্ণের প্রথাদি অবলম্বন

করে। তবে আজকাল অনেক উচ্চ বর্ণের পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোক বিধবা কন্যাদের বিবাহ দিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা প্রবাদগত। তাঁহারই চেষ্টায় এ বিষয়ে আইন হইয়াছে। বর্তমানে উত্তর-ভারতে আর্য্য-সমাজের উৎসাহে বিধবাবিবাহ অগ্রসর হইতেছে।

হাজারকরা স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন্ বয়সের ও কোন্ ধর্মের কি পরিমাণ স্ত্রীলোক বিধবা থাকে, তাহা এই নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

বয়স	বিধবা হিন্দু-স্ত্রী হাজারকরা	বিধবা মুসলমান-স্ত্রী হাজারকরা
১৫-২০	৯৪	৪১
২০-২৫	১৫৪	৬১
২৫-৩০	২৩৬	১০৫
৩০-৩৫	৩৪১	১৯৬
৩৫-৪০	৪৪৫	৩২১

মুসলমানদের মধ্যে বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বা সামাজিক কোনো বাধা নাই। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় যে-সব রমণীর সন্তানবতী বা আরও অধিক সন্তানের মাতা হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহারা সন্তানোৎপাদন করিতেছেন না। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অধিক, নারীর সংখ্যা কম। অনেক ক্ষেত্রে গরীব পুরুষকে পণ দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয় বলিয়া ৩০।৩৫ বৎসরের পূর্বে অনেকে বিবাহ করিতে পারে না; বিবাহিত স্ত্রীর বয়স ৮ বা ১০ বৎসরের অধিক হয় না। ফলে পুরুষের মৃত্যুর সময়ে স্ত্রীর বয়স ২০।২৫ মাত্র হয়। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সেই সব নারী বিবাহ করিতে পারে না ও তাহার ফলে জনসংখ্যা বাড়িতে পারে না। কোনো

কোনো বর্ণের মধ্যে জনসংখ্যা অতি সামান্যহারে বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ বর্ণের জনসংখ্যা পূর্ববৎ অর্থাৎ বাড়ে নাই, কোথায়ও বা হ্রাস পাইয়াছে। মোটের উপর ইহার ফলে হিন্দুর সংখ্যা বাংলাদেশে স্বাভাবিক ভাবে না বাড়িয়া শতকরা ০·৭ হারে কমিয়াছে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণ বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ; এবং হ্রাসের কারণ, বহু সন্তানের জন্ম, বৈধব্য ও বহুস্বামিত্ব। বহুস্বামিত্ব ভারতের সভ্য দেশে কোথায়ও নাই বলিলে চলে। তবে বহুবিবাহ বহুস্থানেই প্রচলিত আছে। যে-দেশে বিবাহ বাল্যে হয় এবং বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে সেখানে মৃত্যু-সংখ্যাও বেশী হয়। য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে সে-সব দেশে বিবাহের সংখ্যা, জন্মের সংখ্যা সবই আমাদের দেশের চেয়ে কম—সেই সঙ্গে মৃত্যু-হারও কম। ভারতে জন্ম হয় খুবই বেশী, সেই সঙ্গে মৃত্যুও হয় অস্বাভাবিক রূপে অধিক; ফলে যে জনসংখ্যা বাড়িতেছে তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্ত কম।

জন্মের ও বৃদ্ধির হার আদিম জাতিদের মধ্যেই বেশী; তার পরই মুসলমান ও হিন্দুদের। ১৯১১ সালে হিন্দু যেখানে শতকরা ৫ হারে বাড়িয়াছিল, মুসলমান বাড়িয়াছিল ৬½এর উপরে।

জন্ম মৃত্যুর বৃদ্ধির হার

ত্রিশ বৎসরে হিন্দুদের বৃদ্ধি শতকরা ১৫ ও মুসলমানদের ২৬ হারে হইয়াছিল। এই বংশবৃদ্ধির সহিত আয়ুর হ্রাসবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহার সত্যতা নিম্নের অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইবে। হিন্দুদের মধ্যে সন্তান-সংখ্যা কম বলিয়া দীর্ঘায়ু তাহাদের মধ্যে অধিক। আদিম জাতিদের সন্তান খুব বেশী হয় বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে ও অতি-বৃদ্ধ হইবার পূর্বেই মরিয়া যায়।

ধর্ম	১৯০১—১৯১১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি	দশ হাজারে ৬০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা	বৃদ্ধি অনুসারে ক্রম	আয়ু অনুসারে ক্রম
হিন্দু	৫'০৪	৫৭৩	৩	১
মুসলমান	৬'৭	৪৯৭	২	২
আদিম	১৯'৯	৪৪৭	১	৩

আমাদের দেশের লোকের আয়ু অন্যান্য দেশ হইতে কম। পূর্বে শতায়ু লোকের অভাব ছিল না—এখন দুই একজনও চোখে পড়ে না।

ভারতে আয়ু-হ্রাস

ভারতবাসীদের আয়ু প্রতি বৎসরেই হ্রাস পাইতেছে। আমরা নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি; ইহাতে দেখা যাইবে যে ইংলণ্ডে পুরুষদের আয়ুর আশা ৪৬ বৎসর ও আমাদের সেই জায়গায় ২২½ বছর; ইংলণ্ডের নারীদের ৫০ বৎসরের স্থানে আমাদের দেশের ২৩ বৎসর মাত্র। ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার গুণে লোকের আয়ু বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই দুইএর অভাবে আমাদের দেশে আয়ু হ্রাস পাইতেছে। আমাদের দেশের বড় বড় লোকেরা কচিৎ পঞ্চাশ পার হয়েন আর য়ুরোপের লোকেরা তখন জীবনের বড় বড় কাজ আরম্ভ করেন। আমাদের গতি নিম্নাভিমুখে; সুতরাং কোথায় গিয়া দাঁড়াইব তাহা বলা কঠিন। এখন হইতে সচেষ্ট না হইলে আমাদের জাতীয় চিহ্ন বজায় রাখিতে মুষ্টিমেয় দুর্বল স্বল্পপ্রাণ মানুষও অবশিষ্ট থাকিবে না।

দেশের জনসংখ্যা রাষ্ট্রের জনশক্তির পরিচায়ক নহে। রাজ্যমধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক থাকিতে পারে; যুবা অপেক্ষা শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা অধিক হইতে পারে; সে-ক্ষেত্রে যুবাদের উপর অতিরিক্ত সংখ্যা শিশু ও বৃদ্ধদের পোষণের দায়িত্ব পড়ে। শিশুর সংখ্যা অল্প হইলে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা হ্রাস পায়। জননী হইবার উপযুক্ত নারীর সংখ্যার উপর দেশের জনসংখ্যা নির্ভর করে। ব্যাধি, বিশেষ বয়সে পীড়িতের সংখ্যা, অক্ষমের সংখ্যা দেশের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক শক্তির নিয়ামক।

লোক সংখ্যা ও লোক শক্তি

য়ুরোপে সাধারণত ১৫ হইতে ৫০ বৎসর লোকে কর্মক্ষম থাকে বলিয়া ধরা হয়; ভারতের লোকের জীবনীশক্তি ও পরমায়ু অল্প, সেইজন্য ১৫—৪০ বৎসর লোকের কর্মক্ষমতার বয়স ধরা হইয়াছে। সেই হিসাবমত ভারতে ঐ বয়সের নরনারীর সংখ্যা ১২ কোটি ৬১ লক্ষ, অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে (কর্মক্ষম লোক-সংখ্যা ১৫—৬০ বয়স পর্য্যন্ত ধরা হয়) যথাক্রমে শতকরা ৫৩ ও ৬০ ভাগ লোক কর্মক্ষম। ইংলণ্ড, জারমেনী, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা ও মার্কিনদেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ভারতের অপেক্ষা অধিক। সর্বত্রই পনের বৎসরের নীচে ও ৪০ বা ৫০ বৎসরের উপরে লোকের মৃত্যুসংখ্যা মাঝের বয়সীদের অপেক্ষা অধিক। কিন্তু য়ুরোপের তুলনায় ভারতের মৃত্যুর সংখ্যা আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশী। ভারতে শিশু-মৃত্যুর কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। মোটকথা সকল দিক হইতেই দেখা যাইতেছে যে ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় উহার লোকশক্তি য়ুরোপ হইতে কম।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অধিবাসীর পরমায়ুর তালিকা।

বয়স	পুরুষ					নারী				
	ভারতবর্ষ			ইংলণ্ড		ভারতবর্ষ			ইংলণ্ড	
	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯০১	১৯১১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯০১	১৯১১
০	২৪.৫	২৩.৬	২২.৫	৪৪.	৪৬	২৫.৫	২৩.৯	২৩.৩	৪৭.৭	৫০
৩০	২৩.৬	২২.৯	২২.৪	৩৩	৩৫.২	২৪.৬	২৩.৮	২২.৯	৩৫.৪	৩৭.৮
৬০	১০.১	৯.৫	১৩.৯	১৮.৮	১৯.৮	১০.৮	১০	১০.১	১৪	১৪.৮
৯০	১.৬	১.২	১.১	২.৩	২.৩	১.৭	১.৬	১.১	২.৬	২.৫

জন্মিবার সময়ে ভারতবাসীর জীবনের আশা সাড়ে বাইস বৎসর ; ৩০ বৎসর হইলে আরও ২২ বৎসর বাঁচিবার সম্ভাবনা হয় ; ইংলণ্ডে ৩৫ বৎসর। ইত্যাদি।

ভারতের জনসংখ্যা।

বৎসর	জনসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি
১৮৭২	২০,৬১,৬২,০০০	
১৮৮১	২৫,৩৮,৯৬,০০০	২৩·২ %
১৮৯১	২৮,৭৩,১৪,০০০	১৩·২ %
১৯০১	২৯,৪৩,৬১,০০০	১·৫ %
১৯১১	৩১,৫১,৫৬,০০০	৬·৫ %
১৯২১	৩১,৯০,৭৫,০০০	১ ২ %

বাংলাদেশের জনসংখ্যা।

১৮৭২	৩,৪১,১৯,৪০০	১৯০১	৪,২১,৪১,৪০০
১৮৮১	৩,৬৩,১৬,৭০০	১৯১১	৪,৫৪,৮৩,০০০
১৮৯১	৩,৯০,৪৯,৬০০	১৯২১	৪,৬৬,৫৩,১০০

পুরুষ	২,৪১,৩০,৬২১	স্ত্রী	২,২৫,২২,৫৫৬

১৯২১ সালে বৃদ্ধি	শতকরা	২·৬
সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা	„	৫৩·৫
হিন্দুর সংখ্যা	„	৪৩·৭
আদিম ও খৃষ্টান ইত্যাদি	„	২·৭

বাংলাদেশের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি।

	১৮৮১ হইতে ১৮৯১	১৮৯১ ১৯০১	১৯০১ ১৯২১	১৯১১ ১৯২১
হিন্দু	৫·	৬·২	৩·৯	—০·৭ (কমিয়াছে)
মুসলমান	৯	৭·৭	৯·৫	৫·২
খৃষ্টান	১৩·৯	২৯·৫	২১·৭	১৪·৯
আদিম	১৬·৫	২১·৩	৬৫·১	১৬·২

৩। স্বাস্থ্য ও ব্যাধি

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে অধিবাসীর স্বাস্থ্যের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। ভারতের জলবায়ু ও তাপ এখানকার মানুষকে স্বভাবতই শ্রমবিমুখ করিয়া তোলে। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালের পচানি গরমে বা পশ্চিমের নিদারুণ তাপের মাঝে মানুষের বাস করা খুব কঠিন। প্রকৃতির সহিত লড়াই করিতে করিতে সে হয়রাণ হইয়া পড়ে। যত বড় জোয়ানই এদেশে বাস করুন না কেন, কয়েক পুরুষের মধ্যে তাহাদের সন্তানসন্ততি নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত তাহাদের কোনোই ভেদ আর চোখে পড়ে না। ইতিহাসে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য

ভারতবর্ষের বৃষ্টি বৎসরের মধ্যে একবার হয় এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় দেশের কোথায়ও একবিন্দু বারিপাত হয় না বলিলে চলে। পুষ্করিণী, কূপ ও নদী হইতে জল সরবরাহ হয়। ভারতবর্ষের বড় নগর ছাড়া কোথায়ও গ্রামের বা সহরের দূষিত জল নিষ্কাশণের ব্যবস্থা নাই। অতি-বৃষ্টির সময়ে এইসব দূষিত জল অধিকাংশ সময়ে নিকটের পুষ্করিণীতে আশ্রয় লয় বা চোঁয়াইয়া কূপের মধ্যে যায়। এইরূপেই আমাদের অধিকাংশ কূপগুলি নষ্ট হয়। এদিকে বৃষ্টির ফলে চারিদিকের খুব পরিবর্তন সাধিত হয়; বড় বড় আগাছা জন্মিয়া গ্রাম ছাইয়া ফেলে; বর্ষার আগে যেখানে খোলামাঠ ছিল বর্ষার পরে সেখানে মানুষের মাথা-সমান গাছ। দুই বৎসর না কাটিতে পারিলে সেখানে বন। এই সময়ে তাপেরও অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটিতে থাকে; কিন্তু বস্ত্রাভাবে অধিবাসী-দের অনেকেই খুব কষ্ট পায়। বাংলাদেশের প্রধান শস্য ধান; বর্ষাকালে এসব ক্ষেত হইতে জল ভালরূপে বাহির হইতে পারে না; রেলপথ মাটি

অতি-বৃষ্টির ফল

দিয়া উঁচু করার জন্যও দেশের জল সহজে চলাচল করিতে পারে না, ইহা রেলে চড়িলেই বুঝা যায়। এইরূপে জল দূষিত হইলে বর্ষাকালের প্রথমেই দেশময় কলেরা বা উদরের নানা রকমের ব্যাধি দেখা দেয়। ইতিমধ্যে বন-বাদাড় হইতে ম্যালেরিয়ার মশা আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে শয্যাশায়ী করিতে আরম্ভ করে। মোটামুটী জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত লোকের স্বাস্থ্য ও অবস্থা মন্দ থাকে না; কিন্তু ইহার পরই দেখা যায় মৃত্যুহার ভীষণরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এইরূপ চলে।

কিন্তু বৃষ্টি যদি কম হয় তবে যে বিপদ কিছু কম হয় তাহা নহে; গ্রামের ছোট ছোট পুকুর ডোবা শুকাইয়া যায়, কূপেও জল থাকে না। তখন একই পুকুরের জলে পানীয়, স্নান, কাপড়-কাছা, গরু ঘোড়া স্নান প্রভৃতি সকল রকম কাজ হইতে থাকে; ইহার ফলে দেশমধ্যে অচিরেই নানারূপ ব্যাধি দেখা যায়।

অনাবৃষ্টির ফল

তাপের তারতম্য স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। বাংলার স্যাঁত-সেতে স্থানে ছ্যাঁচার বেড়ার ঘরে লোক থাকে; পশ্চিমে মাটির ঘরে বাস করে। এই সব ঘরে বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা নাই। এমন কি দারিদ্র্যবশত কোথাও একই ঘরে মানুষ ও পশু বাস করে। ইহার উপর আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই দুঃখকে আরও বাড়াইয়া তোলে। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রবর্তিত থাকায় এই নিদারুণ গরমে ক্ষুদ্র ঘরে বহু লোকের শয়নপ্রথা এখনো বহু জায়গায় আছে। ইহার ফলে সান্নিবাতিক, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রসার হয়। সহরে এই ভিড় আরও বেশী। বোম্বাইতে ১৯০১ সালে ভাড়াটে বাড়ীর শতকরা ৮৭টার মাত্র একটি করিয়া ঘর ছিল এবং

স্বাস্থ্যের উপর তাপ ও শৈত্যের প্রভাব

এখানেই সমগ্র সহরের শতকরা ৮০ জন লোক বাস করিত; প্রত্যেকটি ঘরে গড়ে ৪ জনের উপর লোক থাকিত। এমন সব ঘর ছিল যেখানে দিনে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিত না। ইহার ফলে উক্ত নগরীতে যক্ষ্মাতে প্রতি দশ হাজারে প্রায় ১০ জন করিয়া লোক মরিয়াছিল। একটি বিভাগের যেখানে ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক বাস করিত যক্ষ্মাতে সেখানে দশ হাজারে ১৬ জনের উপর লোক মরিতেছিল; কিন্তু লণ্ডনে দশ হাজারে দুইএর কম সংখ্যা এই মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়িত।

বোম্বাইএর বাড়ী ও ব্যাধি

বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে সর্বত্রই প্রায় প্রচলিত। অপরিণত বয়সেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ বালিকা মাতা হয়; এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মেয়েদের সন্তানাদি হয় আগে এবং সন্তান-হওয়া বন্ধ হয় আগে। পুরুষেরাও অনেক সময়ে ১৮।২০ বৎসরে পিতা হয় এবং এক শতাব্দীর মধ্যে ৪।৫ পুরুষ জন্মগ্রহণ করে ও মরে। আমাদের দেশে সন্তান-প্রসবের সময়ে জননীদের জীবন-সঙ্কট হয়; অশিক্ষিত ধাত্রীদের জন্য, অশিক্ষিত জননী ও গৃহকর্তৃদের জন্য অনেক শিশু ও বালিকা-জননী অসময়ে প্রাণত্যাগ করে।

বাল্য বিবাহ

অস্বাস্থ্যের আর একটি কারণ অপুষ্ট আহার। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই এবং বাংলাদেশে বিশেষভাবে—আহার্য্য বিষয়ে লোকের জ্ঞান খুবই কম। দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ হইলেও লোকের পুষ্টিকর আহার খাইবার দিকে রুচি কম। দেশে ভাল ঘি তেল কিছুই পাওয়া যায় না, মৎস্যাদির দুর্মূল্যতার জন্য লোকে তাহাও প্রচুর পায় না ও খায় না; ফলে লোকের শরীরের তেজ হ্রাস পায় এবং সহজেই তাহারা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমরা প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য চাই নতুবা বাঁচিবার আশা কম।

পুষ্টখাদ্যের অভাব

পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সংখ্যায় অসামঞ্জস্য সর্বত্রই আছে। ভারতের পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম। ১৮৮১ সালে ১০০০ জন পুরুষের স্থানে ৯৫৪ জন নারী ছিল। ১৯০১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হাজারে ৯৬৩ দাঁড়ায়; কিন্তু ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে এই হার পুনরায় নামিয়া ৯৫৪ হইয়াছিল। ১৯২১ সালে উহা পুনরায় কমিয়া ৯৪৫ হইয়াছে। বাংলাদেশে ১৮৮১ সালে ১০০০ পুরুষে ৯৯৪ নারী ছিল। ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে সেইস্থানে ৯৭০ দেখা যায়। ১৯২১ সালে ৯৩২ দাঁড়াইয়াছে। এই নারী ক্ষয়ের ফলে সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। সমগ্র ভারতের নরনারীর মৃত্যুসংখ্যা হাজার-করা যথাক্রমে ৪০ ও ৩৮; অর্থাৎ মোটের উপর পুরুষদের মৃত্যুর হার অধিক। জন্মের প্রথম পাঁচ বৎসরে বালকের চেয়ে বালিকার সংখ্যাই অধিক—হাজারে ১০০৩; কিন্তু পরে উহা বদলাইয়া যায়। ত্রিশ বৎসরে হাজারে ৯৫৬ জন মেয়ে। ১৫ হইতে ২০ বৎসরের সময়ে এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশী; এবং ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদের মৃত্যুসংখ্যা বেশী দেখা যায়। ইহার কারণ নারীদের সন্তান-প্রসবের সময়ে তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা সর্বাধিক। প্রত্যেক ৭৫ জন প্রসূতির মধ্যে একজন করিয়া জননী অযত্ন, বিনাচিকিৎসা ও অজ্ঞতা-হেতু প্রাণত্যাগ করে। বিলাতে ২১২ জন প্রসূতির মধ্যে ১ জন মরে অর্থাৎ সেখানকার চেয়ে আমাদের নারীদের মৃত্যু হয় প্রায় তিনগুণ।

নারীক্ষয়

লোকক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ হইতেছে শিশু-মৃত্যু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুগণ জননীদের অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণ করে; ফলে তাহারা অল্প জীবনীশক্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; এই জননীদেরও জীবন সঙ্কটময় করিয়া তোলে। ১৯০২—১৯১১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে গড়ে ১০০০ জন্মের মধ্যে ২৫০টি শিশু

শিশুমৃত্যু

বৎসর ঘুরিবার পূর্বেই যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া যায়। ১৯১১—১৯২১ সালের মধ্যে (১৯১৮ বাদ দিয়া) সমগ্র ভারতে শিশুবালক হাজারকরা ২১১ ও কন্যা ১৯৯ জন মরে ; কিন্তু ১৯১৮ সালেই বালক ২৭৪ ও বালিকা ২৬০ করিয়া হাজারে মরিয়াছিল ! পৃথিবীর কোনো সুসভ্য দেশের এমন শোচনীয় অবস্থা নয়। সভ্যদেশে জন্মহার কম এবং সেইজন্য মৃত্যু-হারও অধিক নহে ; কিন্তু ভারতবর্ষ, রুশ, চীন প্রভৃতি স্থানে মৃত্যু-হার বিশেষতঃ শিশু-মৃত্যু-হার খুবই বেশী সেই সঙ্গে জন্মহারও অতিরিক্ত। *

প্রতি-হাজার জন্মে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কত শিশু প্রতি বৎসর মরে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাংলা—২৭০ পাঞ্জাব—৩২৬
মান্দ্রাজ—১৯৯ বম্বে—৩২০
বিহার-উড়িষ্যা—৩৬৪ ব্রহ্মদেশ—৩০২
যুক্তপ্রদেশ—৩৩২

* এক হাজার শিশু জন্মিবার পর এক বৎসরের মধ্যে মারা যায়।

দেশ	হাজারকরা	দেশ	হাজারকরা
চিলি	৩১৫	রুশ	২৪৫
হাঙ্গেরী	২০৪	জামাইকা	১৯১
সিংহল	১৮৯	রুশিয়া	১৬৫
জাপান	১৬৬	সার্বিয়া	১৫৪
বেলজিয়াম	১৪১	ফ্রান্স	১২৬
মার্কিনরাজ্য	১২৪	ইংলণ্ড	১১৭
ফিনল্যাণ্ড	১১২	নেদারল্যাণ্ড	১১৪
স্কটল্যাণ্ড	১১২	ডেনমার্ক	১০৮
সুইডেন	৭৮	অষ্ট্রেলিয়া	৭৮
নরওয়ের	৭০	নিউজিল্যাণ্ড	৫০

সহরের শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা ভয়াবহভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। বদ্ধগৃহে বাস, দুধ বলিয়া বার্লি বা আরারুট পান, জননীদের শুষ্ক বক্ষ শোষন ও তাঁহাদের ঘন ঘন সন্তান-সম্ভবনা প্রভৃতি অনেকগুলি কারণ এই মৃত্যু-হার বৃদ্ধির কারণ। সহরের এই মৃত্যু-হার ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বোম্বাইতে হাজারকরা ৫৫৬ জন শিশু, কলিকাতায় ৩৮৬, রেঙ্গুনে ৩০৩, মাদ্রাসে ২৮২, করাচীতে ২৯৯, দিল্লীতে ২৩৩ জন শিশু মরিয়া থাকে! কলিকাতায় কোনো পল্লীতে সংখ্যা আরও বেশী।

গ্রাম ও সহরের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুহারের তারতম্য লক্ষিত হয়। এখানকার শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে; অথচ সেখানকার স্বাস্থ্য যে কি ভীষণ খারাপ তাহা কোন বাঙালীর অবিদিত নহে। ১৯০১ সালে হাজার-করা লোকের মধ্যে সহরে ৩৯ জন; ১৯১১ সালে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়; কিন্তু গ্রামে উহা যথাক্রমে ২৮ হইতে ৩৩ দাঁড়াইয়াছিল; মাঝে ১৯০৮ সালে ৩৮ জন হয়। গত শতাব্দীর শেষ পাঁচবৎসরের মৃত্যুহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই গ্রামের যে অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়তর হইতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সে সময়ের তালিকায় দেখা যায় যে গ্রামের মৃত্যুহার সর্বত্রই কম; পরে দেখা যাইতেছে যে এ হার বাড়িয়াই চলিয়াছে। সহর ও নগরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্থানীয় মুন্সিপালটিগুলি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে। কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে সহরের উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে। দূষিত জল নানারূপ ব্যাধির কারণ; কতকগুলি সহরে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহের জন্য এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩২ কোটি টাকার উপর ব্যয়িত হইয়াছে; এবং এখনো আরও প্রায় ৩২ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু সহরে ভারতের অধিবাসীর অতি সামান্য অংশই বাস করে। অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে, তাহাদের পানীয়ের অবস্থা অত্যন্ত

গ্রাম ও সহরের মৃত্যুহার

শোচনীয়। উদরের নানাপ্রকার পীড়ার কারণ এই দূষিত জল। আজকালকার গ্রামে যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছেন বা যাঁহারা বাস করিতেছেন তাহাদের কাছে একথা অবিদিত নয়। গ্রামের বদ্ধজল নিকাশের পথ নাই; ডোবা, পুকুর ও গাছের গোড়ার জল মেলেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধির জীবাণুর বৃদ্ধির প্রধান স্থান। গ্রামের চারিদিকে পয়প্রণালী খনন করিয়া উদ্বৃত্ত জল নিকাশের পথ তৈয়ারী করার দিকে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি অল্পকাল হইল পড়িয়াছে; কিন্তু তেমন করিয়া দেশব্যাপী চেষ্টা এখনো হয় নাই। ড্রেণ ছাড়া গ্রামের জঙ্গালও ব্যাধির বৃদ্ধি ও বিস্তারের অন্যতম কারণ।

তীর্থস্থানে অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার ফলে সেখানে প্রতিবৎসর বহুসহস্র লোক ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করে। প্রথমে অনাহারে

তীর্থস্থানের অস্বাস্থ্য

বা অর্দ্ধাহারে ট্রেণে যাইতেই লোকের প্রাণশক্তি অর্দ্ধেক কমিয়া যায়; ইহার পর তীর্থস্থানগুলিতে থাকিবার ব্যবস্থা আদৌ সুন্দর নহে একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। সরকার এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং পথ ঘাটাদির উন্নতির জন্য কিছু অর্থও ব্যয় করিতেছেন। তীর্থস্থানগুলি মোহান্ত বা গুরুদের বা সেবায়েতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়াছে; তাহা দেবকার্য্যে আসে না; এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না।

এতদ্ব্যতীত গ্রামের ও সহরের অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সামান্যও বোধ না থাকাতে এই সকল ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়া

লোকের অজ্ঞতা

যায়। গৃহের পার্শ্বে আবর্জনা স্তূপ করা, গৃহের সন্নিকটেই মলমূত্রাদি ত্যাগ, গোশালার পাশেই গোময় ও মূত্রাদিমিশ্রিত খড় বিচালি জমা করা, সহরের বাড়ীর ড্রেণ ও পায়খানা যথোচিতভাবে পরিষ্কার না রাখা, খাদ্যাদি খোলা রাখা ও ঠাণ্ডা খাওয়া, রাত্রে শুইবার ঘর সিন্দুকের মত বন্ধ করিয়া

ছিদ্রাদিতে কাগজ কাপড় এবং তুলা দিয়া বন্ধ করা (পাছে হিম আসে!), সহরে খেলিবার ও মেয়েদের বেড়াইবার স্থানের অভাব ইত্যাদি দেশের স্বাস্থ্য-দূষণের অন্যতম কারণ। এছাড়া এমন কতকগুলি বদ্‌অভ্যাস্ আমাদের মর্ব্যাগত হইয়াছে যে সে-সব আর পাঁচজনের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি করিতে পারে তাহা আমাদের মনে হয় না। ট্রেণে ও ট্রামের মধ্যে থুতু ও খাদ্যাদির উচ্ছিষ্টাংশ ত্যাগ, পথের উপর থুতু ফেলা এবং এক পা সরিয়া ড্রেণে ফেলিবার আলস্য, গৃহের জানালা হইতে আবর্জনা রাস্তায় ফেলার ফলে রোগপ্রসার হয়। উত্তম নাগরিক হইবার সুশিক্ষা শিশুকাল হইতে দেওয়া প্রয়োজন।

প্রায় অধিকাংশ ব্যাধিই নিবারণ করা যায়। কিন্তু ভারতবাসীর অজ্ঞতাবশতঃ এখানে কয়েকটি ব্যাধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে; এই সমস্ত ব্যাধির মধ্যে প্রধান হইতেছে মেলেরিয়া, কালাজ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা; এছাড়া শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ রোগ ক্রমেই দেশে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।

মেলেরিয়ার কথা বাঙালীকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে না; এই ব্যাধিতে ভোগেন নাই এমন সৌভাগ্যশালী পুরুষ আজকাল নাই বলিলেই চলে। পূর্বে কেবল বাংলাদেশেই এ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ছিল এক্ষণে তাহা উত্তর-ভারতের সর্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশে গতশতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মেলেরিয়া আরম্ভ হয়। সে-সময়ের মহামারীর কথা আমাদের দেশের প্রবাদগত হইয়াছে। বহুজনাকীর্ণ গণ্ডগ্রাম সেই সময়ে উৎসন্ন যায়; এবং সেই হইতে ধ্বংসকার্য্য ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে। এখন বাংলাদেশে কেন—সমগ্র হিন্দুস্থানের কোথায়ও স্বাস্থ্যকর স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এককালে কলিকাতার লোকে নানারূপ ব্যাধিতে ভুগিয়া বায়ু-পরিবর্তনের জন্য হুগলি, বর্দ্ধমানে যাইত; কিন্তু

মেলেরিয়া

আজকাল যাঁহারা সেখানে বাস করেন তাঁহারা আর কাহাকেও সেখানে আসিতে উপদেশ দেন না। মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৬৭ জন জ্বররোগে মরে। বাংলাদেশে শতকরা ৭০ এর উপর মৃত্যুর কারণ জ্বর।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে গ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল সে-কথা আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এক শতাব্দী পূর্বেও বাঙালীর শারীরিক বল ও সুস্থতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ডমিণ্টো (১৮০৮) বলিয়াছিলেন "আমি এরূপ সুন্দর জাতি দেখি নাই; ইহারা মান্দ্রাজের লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাঙালীরা দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও পালোয়ানের ন্যায় ইহাদের শরীরের গঠন।" কিন্তু বর্তমানের অবস্থা যে কি তাহা বর্ণনা পাঠ করিয়া জানিতে হইবে না; প্রত্যেক পাঠক নিজ নিজ শরীর ও চারি-পার্শ্বের লোকের প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝিবেন। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে বাঙালীদের যে চিত্র পাওয়া যায়, ভুঁইয়াদের যে বীরত্ব-কাহিনীর লুপ্ত ইতিহাস এখনো পাওয়া যায়, তাহা হইতে বাঙালী ভীরু ও দুর্বল একথা প্রমাণিত হয় না।

প্রাচীন বাংলা দেশ

বাংলাদেশের গ্রামগুলি ক্রমশই জনশূন্য হইয়া আসিতেছে; গ্রাম-বৃদ্ধদের নিকট হইতে গ্রামের অতীত কাহিনী শুনিলে তাহা অলীক বলিয়া মনে হয়। তবে তাহাদের সমৃদ্ধ অবস্থার চিহ্নস্বরূপ ভীষণ বনের মাঝে বোসেদের বাড়ী, মিত্রদের বাড়ী, মুখুয্যেদের বাড়ী, সিংহদের বাড়ীর ভগ্নভিটা সেই করুণ কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে। নদীয়া, যশো-হর, বীরভূম, হুগলি প্রভৃতি কয়েকটি জেলার জনসংখ্যা মেলেরিয়ার উৎপাতে রীতিমত কমিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইয়াছেন।

১৯০৮ সালে উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে মেলেরিয়া দেখা দেয়।

এই ব্যাধির আক্রমণে বলিষ্ঠ পঞ্জাবী, জাঠ, পাঠানগণ হাজারে হাজারে মরিয়া যায়।

প্রতিবৎসর ভারতে কেবল মেলেরিয়া জরেই ১০ লক্ষ করিয়া লোক মরে; ইহাদের অধিকাংশই পরিণত বয়সপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ করে। যাহারা মরে না তাহারা ভুগিয়া ভুগিয়া এমন অকর্মণ্য হইয়া থাকে যে সকলপ্রকার শারীরিক পরিশ্রমের তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ধান-কাটার সময়ে বাংলাদেশে জর দেখা দেয়। বাঙালীরা একাজ করিতে পারে না, প্রথমত দেশে অত লোক পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়ত ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকই পীড়িত থাকে। সেইজন্য বিস্তর পশ্চিমা ও সাঁওতাল ধান কাটিবার সময়ে বাংলাদেশে আসে।

মেলেরিয়ার হাত হইতে কেমন করিয়া দেশকে উদ্ধার করা যায় একথা গভর্ণমেণ্ট বহুকাল হইতে ভাবিতেছেন। বিখ্যাত ডাক্তার রস্ আবিষ্কার করেন যে একপ্রকার মশা এই রোগের বীজাণুর বাহক ও কুইনাইন উহার একমাত্র প্রতিশেধক। সেই হইতে সরকার বাহাদুর গ্রামে গ্রামে পোষ্ট আফিসে কুইনাইন রাখিয়াছেন; বর্তমানে ইহার দর অত্যন্ত বাড়িলেও কিছুকাল পূর্বেও খুব সস্তায় লোকে কুইনাইন পাইত। ১৯০৬ সালে এক বৈঠক বসে এবং তাঁহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানারূপ প্রস্তাব করেন। ১৯০৮ সালে যুক্ত-প্রদেশে ভীষণভাবে মেলেরিয়া দেখা দেওয়ায় সরকার বাহাদুর সাড়ে তিন হাজার সের কুইনাইন বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ১৯১৬ সালে ভারতে প্রায় ৯৩ হাজার সের কুইনাইন ব্যবহৃত হয়।

মেলেরিয়ার প্রতিকার

গভর্ণমেণ্ট দার্জিলিঙ ও নীলগিরি পাহাড়ে নিজের তত্ত্বাবধানে সিন্‌কোনা গাছের আবাদ করিয়াছেন; সরকারী ফ্যাক্‌টরী ও জেলখানায় কুইনাইন তৈয়ারী হয়। কিছুদিন হইতে ডাক্তার বেণ্টলী সরকারের সাহায্যে ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র

কুইনাইনের চাষ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলাদেশকে মেলেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; তাঁহাদের কার্য্য যে ভাল হইবে একথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে কালাজ্বর ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে মেলেরিয়া কালাজ্বরে পরিণত হইতেছে; অনেকে তাহা জানেই না।

মেলেরিয়া ছাড়া প্লেগ ভারতের লোকক্ষয়ের অন্যতম কারণ। ১৮৯৬ সালে বোম্বাইতে এই ব্যাধি প্রথম দেখা দেয় এবং সেখান হইতে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় ১৮৯৮ সালে প্লেগ দেখা দেয়। সেই সময়কার প্লেগের চেয়ে প্লেগের চিকিৎসায় লোকের যে আতঙ্ক হইয়াছিল তাহা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। সেই হইতে প্রতিবৎসরই ভারতের কোনো না কোনো অংশে ইহা দেখা দেয়—বিশেষত বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। সেখানে কেবল সহরে নয় গ্রামেও প্লেগে হাজার হাজার লোক প্রতিবৎসর মরে। ১৯০৭ সালেই ভারতে ১৩ লক্ষের উপর লোক প্লেগে মরে। ১৯১৫ সালে এই রোগে পঞ্জাবের মৃত্যুসংখ্যা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল।

প্লেগ

১৯০৪ সালে বিশেষজ্ঞদের লইয়া প্লেগের তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য এক বৈঠক বসে। ১৯০৭ সালে এই ব্যাধির কারণ আবিষ্কৃত হইল। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন প্লেগের বীজাণু ইন্দুরের শরীরে পুষ্টিলাভ করে; একপ্রকার মাছি এই বিষ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সঞ্চারিত করে। কোন বাড়ীতে ইন্দুর মরিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে প্লেগের বিষ সেখানে আছে এবং অবিলম্বে সে-স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়। সেইজন্য সরকার বাহাদুর কোনো স্থানে প্লেগ দেখা দিলেই সেখানকার ইন্দুর মারিবার জন্য আদেশ দিয়া থাকেন। ১৮৯৬ সাল হইতে এপর্য্যন্ত কেবল প্লেগেই এক কোটির উপর লোক মরিয়াছে।

মহামারীর মধ্যে প্লেগের পরেই ওলাউঠা। বৎসরে ৩।৪ লক্ষ করিয়া লোক এই রোগে মরে। ১৯০৯ সালে ৫ লক্ষ ৭৮ হাজারের উপর লোক কলেরায় মারা যায়। দূষিত জল, দুধ ও খাদ্য হইতে

কলেরা

কলেরার উৎপত্তি। দেশের জলকষ্টের কথা সকলেই জানেন। প্রতিদিনই খবরের কাগজ কোনো না কোনো স্থানে জলাভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাবের কথা ও প্রজাগণের আকুল কণ্ঠে জমিদার ও সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে কৃপা ভিক্ষার কথা প্রকাশিত হইতেছে।

বসন্ত রোগে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ৮০ হাজার করিয়া লোক মরে। পূর্বে বাংলা-টীকা লইবার ব্যবস্থা ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

বসন্ত

টীকা দেওয়ার উন্নতি হইয়াছে। সমগ্র ভারতে প্রায় ছয় হাজার লোক টীকা দিবার জন্য নিযুক্ত আছে। প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি করিয়া লোকের টীকা হয়। টীকার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

এছাড়া ১৯০৯ সালে ২ লক্ষ ৬০ হাজার লোক পেটের অসুখ আমাশা,

অন্যান্য ব্যাধি

ও শ্বাসযন্ত্রের রোগে দুই লক্ষ ও অন্যান্য ব্যাধিতে ১৭ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর মরিয়া থাকে।

গত কয়েক বৎসর হইতে পৃথিবীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেরও এ রোগে কি পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছে

ইনফ্লুয়েঞ্জা

তাহা প্রত্যেকেই জানেন। এমন বোধ হয় একজনও নাই যাহার জানাশুনা দুই চারিজন লোক এই রোগে না মরিয়াছে। ১৯১৮ সালের জুন মাসে এই রোগ প্রথম দেখা দেয়। সমগ্র ভারতের জন সংখ্যার শতকরা দুইজন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মারা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হয়; যে সব স্থানে মৃত্যুর হিসাব রেজিষ্টারী হয় সেই এলাকায় ১৯১৮—১৯ সালে ৮১ লক্ষ

২০ হাজার লোক এই রোগে মারা যায়। আদমসুমারীর অধ্যক্ষ মনে করেন যে ইহাও যথার্থ সংখ্যা নয়, কারণ শেষাশেষি মৃতের সংখ্যা আর ভাল করিয়া লিপিবদ্ধই হয় নাই। তাঁহার অনুমান ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক এই রোগে মারা পড়ে।*

রোগে মরা ছাড়া আরও নানা রকমেও লোক মরে, যথা আত্মহত্যা। "কেরোসিন তৈলে নারীদের আত্মহত্যা করার প্রথা কয়েক বৎসর হইল বাংলাদেশে অবলম্বিত হইয়াছে। এছাড়া আফিং সেঁকোবিষ প্রভৃতি

* ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যু যাহার হিসাব পাওয়া যায়।

প্রদেশ	অনুমান মৃত্যু-সংখ্যা	হাজারকরার অনুপাত
আজমীড়	২৯,৮৩৫	৫৯·৫
আসাম	১১১,৩৪০	১৮·৬
বঙ্গদেশ	৩৮৬,৫৭২	৮·৫
বিহার উড়িষ্যা	৭০৯,৯৭৬	২০·৫
বোম্বাই	১,০৫৯,৪৯৭	৫৪·৯
বর্মা	১৩৭,৪৯১	১৩·৯
মধ্যপ্রদেশ	৯২৪,৯৪৯	৬৬·৪
কুর্গ	২,০১৪	১১·৫
দিল্লী	২৩,৬১২	৫৬·৬
মান্দ্রাজ	৬৮২,১৬৯	১৬·৭
উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ	৮৯,০৩৫	৪৩·৬
পঞ্জাব	৮৯৮,৯৪৭	৪৫·৪
যুক্তপ্রদেশ	২,০৩৪,২৫৭	৪৩·৪

Census Report India 1921, p 13;

খাইয়াও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। নিদারুণ, অসহ্য, অপ্রতিবিধেয় মানসিক ব্যাধিও অনেক সময়ে আত্মহত্যার কারণ, এবং এই মানসিক বিকৃতি কখন কখন দৈহিক ব্যাধি হইতে উৎপন্ন হয়।

অপমৃত্যু

১৯১৫ সালে বাংলাদেশে ১৪৫২ জন পুরুষ ও ২০১৮ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। পুরুষদের প্রায় দেড়গুণ অধিক স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার বিশেষ কারণ আছে। বাংলাদেশেই যে আত্ম-হত্যার প্রাদুর্ভাব বেশী, তাহা চারিটি প্রদেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

	পুরুষ	নারী		পুরুষ	নারী
মধ্য প্রদেশ—	৪৪১	৫২৩	আগ্রা অযোধ্যা—	৬৬৪	১৭৯৯
বিহার উড়িষ্যা—	৬০৫	১১০৫	বাংলা দেশ—	১৪৫২	২০১৮

"তালিকায় দেখা যাইতেছে যে চারিটি প্রদেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক আত্মঘাতী ; এই সামাজিক ব্যাধির কারণ কি ? বাঙ্গালীর মেয়েরা নিজেই নিজের প্রাণ নাশ করিলে, আদালতে গৃহীত সাক্ষ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে ঐ সব স্ত্রীলোকের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। শাশুড়ী, শ্বশুর বা স্বামী, কিম্বা সকলেই যথেষ্ট যৌতুক না পাওয়ার জন্য, কিম্বা বধূ পরমা সুন্দরী নহে বলিয়া, কিম্বা তাহার কৃত গৃহকার্য্য সন্তোষজনক নহে বলিয়া, এইরূপ কোন না কোন অজুহাতে তাহার লাঞ্ছনা হয়। তাহাতে তাহার প্রাণের আশা থাকে না। কন্যা পিতামাতার দায়স্বরূপ হয় ; সেই জন্য যে তাহাকে গ্রহণ করে, সে পিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করে। এই দুরবস্থার প্রতিকার, নারীর ব্যক্তিত্বের ও স্বাধীন-জীবন যাপনের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের উপর নির্ভর করিবে। সর্বত্রই সুশিক্ষা দ্বারা নারীর মনকে দৃঢ়তর করিবার, নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার এবং নারীর পক্ষে দুঃখজনক সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক ব্যবস্থার সংস্কার ও অন্যান্য

আত্মঘাতী নারীর সংখ্যা

উপায়ে নারীর জীবনকে অধিকতর আশা ও আনন্দপূর্ণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।" (প্রবাসী) নারীনির্যাতনের কথা আজকালকার দৈনিক কাগজে প্রায় প্রত্যহ থাকে।

বন্যজন্তুর উৎপাত

বন্যজন্তুর হাতে প্রতিবৎসর কয়েক সহস্র করিয়া লোক মরে। সর্পাঘাতে প্রতিবৎসরেই ২২।২৩ হাজার করিয়া লোক মরিয়া থাকে। ১৯২২ সালের সর্পাঘাতের মৃত্যুসংখ্যা ২০ হাজারের উপর হইয়াছিল। বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর হাতে প্রতিবৎসর দেড় হইতে দুই হাজার করিয়া লোক মরিয়া থাকে। ১৯২৩ সালে ৩৬০৫ জন লোক মরিয়াছিল। ১৯১৪ সালে ১,৭০২ জন লোক বন্য জন্তুর কবলে মরে। দশ বৎসরে এইভাবে মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণের উপর হইয়াছে। হিংস্রজন্তুর উৎপাতে নিরস্ত্র মানুষ কখনো আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ৩১ কোটি লোকের বাস যেখানে সেখানে মাত্র ১ লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশী বন্দুক নাই। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিতেছিল।

১৯০৮ সালে	১,৯৭,১০০ বন্দুক	১৯১৭ সালে	১,৩৬,৭০৭ বন্দুক
১৯১৩ "	১,৮২,৪১২ "	১৯২২ "	

বাংলাদেশে ১৯১০ সালে ২৯,৪০৬টি বন্দুক ছিল, ১৯১৩ সালে ২৫,৯৬১টি ও ১৯১৭ সালে ৮,০৪২ টি মাত্র দাঁড়াইয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশে প্রায় ২০ হাজারের স্থানে ৬৩৫৭টি, পঞ্জাবে ১৩৮৭৫টির স্থানে ৬২১৯টি ১৯১৭ সালে দাঁড়াইয়াছিল। এ অবস্থায় বন্যজন্তুর কবল হইতে অসহায় গ্রামবাসীদের প্রাণরক্ষা অসম্ভব। ১৯১১-১২ সালে সমগ্র ভারতে

বন্দুকের পাশ

প্রায় ৬ লক্ষ গ্রাম ছিল; প্রত্যেক চারিটি গ্রামের মধ্যে তিনটি গ্রামে একজন লোকের কাছেও একটি বন্দুক ছিল না। এ কয় বৎসর লোক বাড়িয়াছে কিন্তু বন্দুকের সংখ্যা কমিয়াছে।

ব্যাধি ব্যতীত অনাহারজনিত অপমৃত্যুর সংখ্যা ভারতে খুব বেশী।

লোকক্ষয়ের ইহা একটি প্রধান অঙ্গ ; সুতরাং হিসাবের মধ্যে এটিকেও ধরিতে হইবে। ভারতে ইংরাজ আসিবার পর হইতে দুর্ভিক্ষ হইতেছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পূর্বেও অনাহারে লোক মরিত তবে তাহা কেহ গণিয়া গাঁথিয়া লিখিয়া যায় নাই। ১৮৫৪ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত এই ৪৭ বৎসরে প্রায় ২ কোটি ৮২ লক্ষ লোক অনা-

দুর্ভিক্ষ ও অনাহার

হারে প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ অনুমান করেন গত শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরে অনাহার ও অনাহারজনিত ব্যাধিতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ লোক মরিয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা ১৮৯১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ, ১৯০১ সালে ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল। যথার্থ অনুপাত অনুসারে এই বৃদ্ধি হইলে ১৯০১ সালেই ৩৩ কোটি লোক হইত। ১৯২১ সালের ফল দেখিয়াও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

জন্ম মৃত্যুহার

ভারতবর্ষের মৃত্যুহার।

	জন্মহার	মৃত্যুহার হাজারকরা
১৯১৩	৩৯·৩৭	২৮·৭২
১৯১৮	৩৫·৩	৬২·৪২
১৯১৯	৩০·২	৩৫·৮
১৯২১	৩২·২	৩০·৫
বাংলাদেশ।		
১৯১৩	৩৩·৭	২৯·৬
১৯১৮	৩২·৯	৩৮·১
১৯১৯	২৭·৫	৩৬·২
১৯২১	২৮	৩০·১

অন্যান্য দেশ।

	জন্মহার ১৯১৭	মৃত্যুহার ১৯১৭	মৃত্যুহার ১৯১৯
ইংলণ্ড	২৩·৯	১৫·৭	১৪·২
অষ্ট্রিয়া	৩১·৪	২১·৯	২০·৫
বেলজিয়াম	২৩·৭	১৫·২	১৪·৮
বুলগেরিয়া	৪০·৬	২৬·৪	২১·৫
ডেনমার্ক	২৬ ৭	১৩·৪	১২·৮
ফ্রান্স	১৮·৭	১৯·৬	১৮·৪
জার্মানী	২৯·৮	১৬·২	১৫·০
হাঙ্গারী	৩৪·৮	২৪·৯	২৩·৬
ইতালী	৩১·৫	২১·৪	১৭·৭
জাপান	৩৪·২	২১·৯	১৯·৫
হল্যাণ্ড	২৭·৮	০	১২·৪
নিউজিল্যাণ্ড	২৬·৩	৯·৫	৯·১
নরওয়ে	২৫·৯	১৩·২	১৩·৩
রুমেনিয়া	৪৩·০	২৫·৭	২৩·৮
রুশিয়া	৪৬·৮	২৯·৮	২৮·৯
সার্বিয়া	৩৯·০	২২·৪	২১·১
স্পেন	৩১·৮	২৩·৭	২২·১
সুইডেন	২৩·৮	১৩·৮	১৪·৬
সুইজারল্যাণ্ড	২৫·০	১৪·১	১৩·৩

(Whitaker's Almanack 1924. Hazell's Annual 1920.)

৪। গ্রাম ও নগর

প্রাচীন ভারতের প্রাণশক্তি ছিল গ্রামে। রাজবংশের উত্থান পতন, শকহূনের উপদ্রব, পাঠান মুঘলের জয় পরাজয়, সুলতান মামুদের নগর-ধ্বংস বা লুণ্ঠন ভারতের বা হিন্দুজাতির জীবনীশক্তিকে নির্বীর্য্য করিলেও লুপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল বড় বড় নগর। রাজাদের পরাক্রমের সহিত, ব্যক্তিবিশেষের বাহুবলে নগর গড়িয়াছে, রাজ্য গড়িয়াছে, আবার সেই অস্ত্রেই উহা ধ্বংস হইয়াছে। সভ্যতা, বিদ্যা, শিল্পকলা নগরে ও রাজধানীতে বিকশিত হইত। রোমের পতনের সহিত রোমানসাম্রাজ্য নষ্ট হয়। ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি দেশময়, তাহার গ্রামের অন্তরে, সমাজের পঞ্জরের মধ্যে নিহীত; এমন কোনো সংহত শক্তি এখনো হয় নাই যাহা এই দেশব্যাপী জীবন্ত শক্তিকে লুপ্ত করিতে পারে। কালস্রোতে ও বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে ও অশিক্ষায় তাহা পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা মরে নাই।

ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে। ইংলণ্ড প্রায় শতকরা ৭৮ জন ও জারমেনী ৪৫ জন সহর ও নগরে বাস করে। বর্ত্তমানে গ্রাম বলিলেই মাঠের মধ্যে একত্র কতকগুলি চালাঘরের সমষ্টি বুঝায়; আর সহর বলিলেই পাকা বাড়ী, লালরাস্তা, দুইপার্শ্বের খোলা দুর্গন্ধময় বাঁধানো ড্রেণের কথা স্মরণ করায়। কিন্তু প্রাচীনকালের বাস্তুবিদ্যার গ্রন্থাদিতে গ্রাম-স্থাপনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ নির্দেশ আছে; হিন্দু নগর-স্থাপনের বিধি অনুসারে জয়পুর রাজধানী গঠিত। গ্রাম ছিল প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান। কিন্তু কেবল কৃষক দিয়া সমাজ গঠিত হয় না। তাই কৃষক বা বৈশ্যের ব্যবসায়ের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক ব্যবসায় জাগিয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণপল্লী, কায়স্থপল্লী, বৈদ্য-

পল্লী, কামারপল্লী, কুম্ভকারপল্লী, তন্তুবায়পল্লী, প্রভৃতি পেশা বা উপজীবিকাওয়ারী পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'কবিকঙ্কনে'র মধ্যে যে নগর প্রতিষ্ঠার বর্ণনা আছে, তাহাই যথার্থ হিন্দুগ্রামের চিত্র। এই গ্রামের বাহিরে কাহাকেও কিছুর জন্য যাইতে হইত না। জীবনের সচরাচর প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী গ্রামেই প্রস্তুত হইত।

বর্তমানে যে লোক গ্রাম ছাড়িয়া বিদেশে যায় তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত চাকুরীর জন্য লেখাপড়া শিক্ষা ও লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরীর জন্য বিদেশযাত্রা। কিন্তু তখন গ্রামের মধ্যে যেটুকু বিদ্যার প্রয়োজন তাহা হইত। ব্রাহ্মণপল্লীতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ছিল না; ভারতবর্ষে এমন ব্রাহ্মণ-বাড়ী খুব কমই ছিল যেখানে সংস্কৃত পুঁথি না পাওয়া যাইত। টোল, পাঠশালা বা মকতব প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল। শিক্ষা বলিতে তখন কেবল অক্ষরজ্ঞান বুঝাইত না। লোকশিক্ষার জন্য নাইট স্কুল ছিল না, বায়স্কোপ ছিল না; কিন্তু তাহার চেয়ে জীবন্ত করিয়া শিক্ষা দিত যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কথকতা। চিকিৎসার জন্য বৈদ্য ছিল। কৃষিই লোকের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল না; নানা শিল্পকলা, ব্যবসায় ঔষধপত্র সংগ্রহ প্রভৃতি পেশা লোককে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। তখন অধিবাসীদের কাপড়, লবণ, চিনি, ঔষধ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এদেশেই হইত; এইসব কাজ বর্তমানে একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাওয়াতে গ্রামের লোককে বাধ্য হইয়া অন্নের জন্য বাহিরে ছুটিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাংলা শিখিয়া চাকুরী মিলে না, আয়ুর্বেদ হাকিমী শিখিয়া সরকারী হাসপাতালে কাজ পাওয়া যায় না। সুতরাং সহরে যাইতেই হয়। পশ্চিমের সহিত সংঘর্ষে আসিয়া কেমন করিয়া গ্রামের জীবন ভাঙ্গিতেছে তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন গ্রাম ও নবীন সংগ্রাম

গ্রামগুলি যে আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ ছিল তাহার কারণ প্রাকৃতিক বাধা। পথঘাট সেযুগে খুব ভাল ছিল না; নদীর ধারে গ্রামগুলি বন্দরের কাজ করিত। সর্বদা গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আসিবার মতো পথ ছিল না। প্রত্যেক গ্রামকে যথাসাধ্য আপনার অভাব আপনাকে পূরণ করিতে হইত। সেইজন্য প্রত্যেক গ্রামের শিল্পকলার মধ্যে একটি বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিত। বাহিরের বাজারের দরের উঠাপড়ার সঙ্গে গ্রামের লোকের কোনো সম্বন্ধ ছিল না; লিভারপুলের ডকে কুলী ধর্মঘট করিয়াছে, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে লবণের দর চড়িল; মেক্সিকোতে ঘরোয়া লড়াই বাধিয়াছে, এখানে রূপার দর বাড়িল; মালগাড়ী রেলকোম্পানী দিতে পারিতেছে না, হাটে চিনি কয়লার দাম আগুন হইল। কিন্তু তখন এসব কোনো উৎপাত ছিল না। পথঘাট ভাল রকমের ছিল না বলিয়া গ্রামের জিনিষ বাহিরে যাইত না, আবার বাহিরের জিনিষ গ্রামে বড় বিশেষ প্রবেশ করিত না। এইরূপ ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া লোকে নিজ নিজ পৈতৃক ব্যবসায়ে মন দিত; উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা লোভ তাহাদের ছিল না; হিন্দু সমাজ কর্মভেদের বন্ধনের দ্বারা অর্থনৈতিক অনেক সমস্যার পূরণ করিয়াছিল; তাহা সেই সময়ের পক্ষে খুবই উপযুক্ত ছিল।

জগতের সহিত গ্রামের যোগ

কিন্তু বর্তমানে গ্রামের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। এখন প্রতিযোগিতা আসিয়া প্রাচীন প্রথা ও সমাজবন্ধনের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এখন ব্যবসায় অর্থের জন্য, বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহের জন্য; কিন্তু হিন্দু গ্রামের ব্যবসায়ী ধর্মের অনুগমন করিয়া কর্ম করিত; ব্যবসায় তাহার ধর্ম ছিল, অন্যের ব্যবসায় করিলে জাতি যাইত, অধর্ম হইত। সুতরাং বর্তমানের সহিত প্রাচীনের মনোভাবের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। রেলপথ খোলা হওয়ায় লোক সহজে ও

সুলভে গতায়াত করিতে পারিতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রাচীন শিল্পকলা ধ্বংস হওয়ায়, লোকে গ্রামের বাহিরে কাজ খুঁজিতে যাইতেছে। এইভাবে গ্রামসমূহ হইতে যুবা পুরুষ কেবলই বাহিরে যাইতেছে। বাংলাদেশে চাষ-বাস লোকে অযত্ন করিতেছে। কলে কাজ করিয়া অধিক পয়সা পাইবার আশায় সহরের প্রলোভনে লোকে গ্রাম ছাড়িতেছে। বড় বড় সহর যেমন কলিকাতা, বোম্বাই, কাণপুর,—তাহার চারিপাশের গ্রামে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত প্রায় পুরুষশূন্য হইয়া যায়। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা আপিসে চাকুরী করিয়া 'ডেলি প্যাসেঞ্জারী' করেন; নিম্নশ্রেণীর লোকে কলে কাজ করে

১৯২১ সালের আদমসুমারে দেখা যায় যে ভারতের বড় বড় নগর-গুলির দিকে লোক বেশী ঝুঁকিতেছে; মাঝারি সহরের জনসংখ্যা তেমনভাবে বাড়ে নাই। বোম্বাই প্রদেশে দেখা যায় যে বোম্বাই আহমাদাবাদ প্রভৃতিতে জনসংখ্যা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িতেছে; তাহার কারণ সেখানে অনেক কাপড়ের কল আছে। যে-সব সহর বা ক্ষুদ্র নগরে পূর্বে লোকবসতি অধিক ছিল, এক্ষণে সেই সব স্থানে বাণিজ্যের বা শিল্পের অনুকূল নয় বলিয়া লোকে সেগুলি ত্যাগ করিয়া বড় বড় নগরে যাইতেছে।

সহরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

বঙ্গদেশের বাঙালী বাসিন্দা অধিকাংশই গ্রামে বাস করে; সহরে বাঙালীর চেয়ে অবাঙালী নাগরিকের অনুপাত অধিক। ১৮৭২ সালে শতকরা ৫'৩ জন লোক সহরে বাস করিত; ১৯২১ সালে ৬'৭ জন। বাংলাদেশে ছোট ছোট সহরে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। কলিকাতা ও হাবড়ার জনসংখ্যা ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার; গত দশ বৎসরে এখানকার জনসংখ্যা ৪'৩ হারে ও ১৮৮১ সাল হইতে ১৯২১ এই ৪০ বৎসরে ৬০ হারে বাড়িয়াছে; ঢাকা

বাংলার সহর

পঞ্চাশ বৎসরে ৭২ লোক বাড়িয়াছে। এই জনসংখ্যার অধিকাংশই যে গ্রাম বা ছোট সহর হইতে আসিয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সহরসমূহের লোকেদের অধিকাংশই সহরে বা কাছাকছি গ্রামে জন্মিয়াছে। কলিকাতার অধিবাসীর প্রায় অর্দ্ধেক লোক উক্ত সহরের কাছাকাছি স্থানে জন্মিয়াছে। কলের লোকের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ স্থানীয় লোক। মফঃস্বল সহরের অধিবাসীদের শতকরা ৮ জন অ-বাঙালী। কলিকাতার এক তৃতীয়াংশ লোকের জন্মস্থান বাংলার বাহিরে। কলের লোকেদের মধ্যে ৬/৭ অংশ বাহিরের লোক; টিটাগড়ের কলে শতকরা ৯০ বাংলাদেশের বাহির হইতে আসিয়াছে!

সাধারণতঃ এক লক্ষের অধিক জনপূর্ণ স্থানকেই নগর বলিয়া ধরা হয়। আর প্রত্যেক ম্যুন্সিপালটিকে অথবা পাঁচ হাজার লোকের বাস যেখানে আছে এমন স্থানকে সহর বলিয়া ধরা হয়।

নগর ও সহর

এই হিসাব অনুসারে ভারতের শতকরা ১০·২ জন করিয়া লোক সহরের বাসিন্দা। এক লক্ষের উপর বাসিন্দাযুক্ত নগরের সংখ্যা ভারতে মাত্র ৩৫টি। এইসকল নগরে সমগ্র দেশের এক শতজন লোকের মধ্যে ২·৬ জন মাত্র বাস করে; পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সহিত এইখানে ভারতের খুবই একটা পার্থক্য। ইংলণ্ডের শতকরা ৪৫ জন, জারমেনীর ২১ জন ও ফ্রান্সের ১৪ জন নগরে বাস করে। ভারতের মোট নগর ও সহরের সংখ্যা ২,৩১৩ ও গ্রামের সংখ্যা ৬,৮৫,৬২২। নগরগুলির মধ্যে রেঙ্গুন, কারাচী, হাওড়া কয়েক বৎসরের মধ্যে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কলিকাতার জনসংখ্যা ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার; এখানকার অধিকাংশ লোকই বাহির হইতে আসিয়াছে; শতকরা ৩৩·৫ জন লোকও কলিকাতা তাহার জন্মভূমি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কলিকাতার প্রায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার

কলিকাতা

লোকের বাড়ী বাংলার বাহিরে; ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুবই কম। । এক হাজার পুরুষের মধ্যে ৪৭০ জন স্ত্রীলোক অর্থাৎ তিন জন পুরুষের জায়গায় একজন স্ত্রীলোক; ওড়িয়াদের মধ্যে পাঁচজনে একজন স্ত্রীলোক। ইহার ফল যে খুবই খারাপ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এইসব শ্রেণীর মধ্যে দুর্নীতি ও ব্যাধি অত্যন্ত প্রবল।

গ্রাম ও শিল্পকেন্দ্র

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতের গ্রামবাসীদের সংখ্যা কমিতেছে ও সহরবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে কিনা তাহা ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের শিল্পের উন্নতির সহিত এখানে বহুবিধ কারখানা সৃষ্ট হইতেছে। পূর্বের কুটীর-শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তাহার স্থানে সুবৃহৎ ফাক্টরীসমূহ স্থাপিত হইতেছে। এইরূপে বোম্বাই ও নাগপুরের দিকে সুতা ও কাপড়ের কল, কলিকাতার নিকট পাটের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। কাণপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানও শিল্পকেন্দ্র হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রের চারিপার্শ্বের দরিদ্রদের জীবনের সমস্যা দিন দিন ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। শিল্পোন্নতি ও মানুষের মনুষ্যত্ব বজায় রাখার মধ্যে,—এক-হাতে সমস্ত ধন পুঁজি হওয়া ও নানা হাতে তাহা অনুপাত অনুসারে থাকার মধ্যে, কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা ভাবিতে হইবে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেই কুটীরে বাস করে; সেসব কুটীরের দশা কিরূপ তাহা যাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন; অধিকাংশ বাড়ীর একটি কি দুটি করিয়া ঘর। অবশ্য মধ্য-বিত্ত ও বড় লোকদের প্রয়োজনের অনেক বেশী কোঠা কামরা থাকে। একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে; গৃহপ্রতি কয় জন করিয়া লোক বাস করে তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে।

১৮৮১	সালে	৫'৮	জন	বাড়ীপ্রতি
১৮৯১	"	৫'৪	"	"
১৯০১	"	৫'২	"	"
১৯১১	"	৪'৯	"	"
১৯২১	"	৪'৯	"	"

	১৯০১		১৯২১	
সহর, নগর ও গ্রাম	স্থান	জনসংখ্যা (হাজার)	স্থান	জনসংখ্যা (হাজার)
সমগ্র জনসংখ্যা	৭,৩০,৭৫০	২,৯৪,৩১৭	৬,৮৭,৯৩৫	৩১,৬০,১৭
নাগরিক সংখ্যা	২,১৪৫	২৯,২০০	২,৩১৩	৩,২৪,১৮
লক্ষাধিক অধিবাসী	৩১	৬৬,০৫	৩৫	৮২,১০
অর্দ্ধ লাখের উপর	৫২	৩৪,১৪	৫৪	৩৫,১৭
২০ হাজারের উপর	১৬৬	৪৯,০৪	১৯৯	৫৯,২৫
১০ হাজারের উপর	৪৭১	৬৪,৫৭	৪৫০	৬২,০৯
৫ হাজারের উপর	৮৫৬	৫৯,৩৮	৮৮৫	৬২,২৩
৫ হাজারের কম	৫৬৯	১৮,৭৯	৬৯০	২৩,৩১
গ্রাম	৭,২৮,৬০৫	২৬,৫১,১৬	৬,৮৫,৬২২	২৮,৩৫,৯৮

৮। অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য

ভারতে অক্ষম অকর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যা খুব বেশী। গত বিশ বৎসরে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্যদের সংখ্যা লক্ষকরা ২২৯এর স্থানে ২১২ হইয়াছে। নিম্নে অকর্ম্মণ্যদের একটি তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

অকর্ম্মণ্য	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৭২
উন্মাদ	৮৮,৩০৫	৮১০০৬	৬৬,২০৬	৭৪,২৭৯	৮১,১৩২
	লক্ষে ২৮	২৬	২৩	২৭	৩৫
মূকবধির	১,৮৯,৬৪৪	১,৯৯,৯৯১	৬৬,২০৫	১,৯৬,৮৬১	১,৯৭,২১৫
	লক্ষে ৬০	৬৪	২৩	৭৫	৮৬
অন্ধ	৪,৭৯,৬৩৭	৪,৪৩,৬৫৩	১,৫৩,১৬৮	৪,৫৮,৮৬৮	৫,২৬,৭৪৮
	লক্ষে ১৫২	১৪২	৫২	১৬৭	২২৯
কুষ্ঠ	১,০২,৫১৩	১,০৯,০৯৪	৩,৫৪,১০৪	১,২৬,২৫৫	১,৩১,৯৬৮
	লক্ষে ৩২	৩৫	১২১	৫৬	৫৭
মোট	৮,৬০,০৯৯	৮,৩৩,৬৪৪	৬,৭০,৮১৭	৮,৫৬,২৫২	৯,৩৭,০৬৩
	লক্ষে ২১২	২৬৭	২২৯	৩১৫	৪০৭

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে পাগলের সংখ্যা কম। ইংলণ্ডে লক্ষের মধ্যে ৩৬৪ জন উন্মাদ ও ক্ষীণশক্তি বলিয়া গণ্য হয়।

উন্মাদ

ভারতবর্ষে ক্ষীণশক্তি বা নির্বোধদের এই পর্য্যায় ফেলা হয় না বলিয়া এখানকার এই সংখ্যা এত কম। ভারতবর্ষে বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও আরোগ্য-শালার ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। বৃটীশ ভারতে তবুও কয়েকটি নাম করিবার মতো 'আশ্রয়' আছে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহে 'পাগলা-গারদ' নাই বলিলেই হয়। ১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ৮১ হাজার লোক উন্মাদ, অর্থাৎ দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৫ জন পাগল। কিন্তু ব্রিটেনের যুক্তরাজ্যে ১০ হাজারকরা ৪০ জন উন্মাদ। ইহার অর্থ এই য়ুরোপে ও আমেরিকার অনেকস্থলে মানসিক বিকৃতিগ্রস্থ লোককে এই কোঠায় ফেলিয়া চিকিৎসা করা হয়। ভারতসাম্রাজ্যে ৮১ হাজার যথার্থ উন্মাদের জন্য মাত্র ৮,০০০ জন থাকিবার মতো হাস-প্যাতাল আছে অর্থাৎ দশজন উন্মাদের মধ্যে একজন মাত্র হাসপাতালে স্থান পায়। এই সব হাসপাতাল অনেকটা গারদের মত, যথার্থ চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ খুব অল্পই হয়। সারাইবার চেয়ে সাম-লাইবার চেষ্টা বেশী হয়। পাশ্চাত্য দেশে উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে গভীর-ভাবে আলোচনা হইতেছে, সেখানে ক্ষীণবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, বুদ্ধিহীন, বায়ু-গ্রস্ত প্রভৃতি বহু প্রকারের স্তর করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এ বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিবার একটি প্রকাণ্ড ক্ষেত্র দেশী চিকিৎসকদের সমুখে পড়িয়া রহিয়াছে। স্নায়ুর দৌর্বল্য এই রোগের কারণ বলিয়া সভ্যতা বিস্তারের সহিত উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি পাই-তেছে। লক্ষকরা ৩৩ জন পুরুষ ও লক্ষকরা ২২ জন স্ত্রীলোক উন্মাদ। ১৯১১ সালে উহা যথাক্রমে ৩১.ও ২০ ছিল। সুতরাং ১০ বৎসরে উন্মাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ভারতে পাগলের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে না। যুক্ত

প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের চারিটি করদরাজ্যে উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ স্পষ্টত বলা যায় না। দেশ হিসাবে বর্মা (লক্ষে ৮৮) বেলুচিস্থান (৫৩) আসাম (৫১) বড়োদা (৪৭), বোম্বাই (৪২) বঙ্গদেশে (৪১) উন্মাদের অনুপাত বেশী।

মূক-বধির

বোবা-কালা লোকের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে বেশী নয়। সমগ্র দেশে লক্ষকরা ৭৪ জন পুরুষ ৫৩ জন স্ত্রী বোবা। দুঃখের বিষয় ইহাদের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাহা নিতান্ত সামান্য। ১৯২১ সালে ইহাদের সংখ্যা কমিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অন্ধ

অকর্মণ্যদের মধ্যে অন্ধদের সংখ্যাই বেশী, লক্ষজনের মধ্যে ১৫২ জন। য়ুরোপ ও মার্কিন দেশে সেই জায়গায় ৯০ এর অধিক নয়। কেহ কেহ বলেন গ্রীষ্ম-মণ্ডলে অন্ধতা বেশী; কিন্তু রুশ দেশে লক্ষে ১৯০ করিয়া অন্ধ; রুশ গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে নয়। অপুষ্ট আহার ও তৈলের অভাবে দেখা যায় অনেকে রাতকাণা হয়; এরূপ লোকের সংখ্যা কত জানা যায় না।

কুষ্ঠ

১৮৯১ সালের আদম-সুমারী অনুসারে ভারতে কুষ্ঠ মহাব্যাধি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার; ১৯০১ অব্দের লোক-গণনার সময়ে দেখা যায় কুষ্ঠের সংখ্যা কমিয়া ৯৭ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ইহার কারণ ভারতে সেই দশ বৎসরে কয়েকটি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং বহু লোক মরিয়া যায়। কিন্তু ১৯১১ সালের আদম-সুমারীতে দেখা যায় এই সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার বাড়িয়াছে। গত ১৯২১ সালের আদমসুমারে কুষ্ঠের সংখ্যা পুনরায় হ্রাস পাইয়াছে। বৃটীশ ভারতে ৯১,২৬৪ ও দেশীয় রাজ্যে ৯,৫০৭ জন কুষ্ঠগ্রস্থ, মোট ১,০০,৭৭১ ইহার। প্রচারের কারণ কি সে-সম্বন্ধে শেষ কথা এখনো বলা হয় নাই; তবে কেহ কেহ বলেন ছারপোকা

নাকি ইহার বাহন এবং দারিদ্র্য, অনাহার, শীতের কষ্ট, দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতি নানা কারণে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই ব্যাধি সংক্রামক —তবে প্লেগ বসন্তের ন্যায় নয়। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। বাংলাদেশে বাউরী, রাজবার, উড়িষ্যার বাগ্দী ও অজাতদের মধ্যে এই রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা অধিক। বাংলাদেশে বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠের সংখ্যা দশ হাজারে ২০ হইতে ৩০ জন করিয়া; ইহার পরেই বীরভূম ও বর্দ্ধমান। কলিকাতার Tropical Medicine and Hygiene বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আদম সুমারের ফল দেখিয়া বলিয়াছেন যে লিখিত সংখ্যার চেয়ে সত্যকার কুষ্ঠের সংখ্যা প্রায় দশগুণ অধিক। বিখ্যাত ডাঃ রজার্স বলিয়াছেন যে ভারতে খুব কম করিয়া ৫ লক্ষ কুষ্ঠগ্রস্থ আছে। লজ্জায় ভয়ে অনেকে ইহা গোপন করে।

কুষ্ঠের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ—অথচ মাত্র ৭৩১১ + ৭৯৩এর মত কুষ্ঠাশ্রম আছে। বৃটীশ ভারতে কুষ্ঠাশ্রমের সংখ্যা ৭৩ ও দেশীয় রাজ্যে ১১টি; তন্মধ্যে ৪০টি খৃষ্টান পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত; আট হাজারের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার খৃষ্টানদের নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। ইহারা কুষ্ঠদের ছেলেমেয়েদের পৃথক করিয়া রাখেন এবং যাহাতে সংস্পর্শ দোষে এই রোগ সন্তানাদির মধ্যে সংক্রামিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেন। অবশিষ্ট ৯৫ হাজার কুষ্ঠ ভারতের সর্বত্র নির্বিকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এবং চারি লক্ষ লোক সমাজের মধ্যে বাস করিতেছে। তাহাদের অবাধ ভ্রমণ সর্ব-সাধারণের ব্যবহার্য্য সামগ্রীর ব্যবহার, দূষিত শরীরের ক্লেদ যথা তথা ত্যাগ প্রভৃতির কোনো নিষেধ নাই। কোনো সভ্য-সমাজে কুষ্ঠেরা এমন অসহায় ভাবে জীবন কাটায় না। এ বিষয়ে সমাজ ও সরকারের দৃষ্টি দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি (জানুয়ারী ১৯২৫) বড়লাট বাহাদুর এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন ও ভারতের সর্বত্র আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। (প্রবাসী, মাঘ ১৩৩২)

৬। উপজীবি

ভারতবর্ষে ৩১ কোটি লোক কেমন করিয়া কি ভাবে জীবনযাত্রা করে তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে। ইংলণ্ডের একশত জন লোকের মধ্যে ৫৮ জন শিল্পকর্মে, ১৪ জন চাকুরী, ১৩ জন বাণিজ্য ব্যবসায়ে, এবং ৮জন মাত্র কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। ভারতবর্ষে সেই জায়গায় শতকরা ৭৩ জন কৃষি-গোচরণ প্রভৃতি কার্য্যে, ২৯ জন অন্যান্য কাজে নিযুক্ত। ইহার মধ্যে ১০ জন লোক শিল্পকর্মে, ২ জন জিনিষ পত্র স্থানান্তরিত করিবার কার্য্যে (যেমন মাঝি, গাড়োয়ান, রেলে), এবং কেবলমাত্র ৬ জন ব্যবসায়ে রত রহিয়াছে। * য়ুরোপের সহিত এই অসামঞ্জস্যের কারণ,

---

* সাধারণ উপজীবিকা।

পেশা--	দশ হাজারকরা লোকের মধ্যে	হ্রাস, বৃদ্ধি
ক। দ্রব্য উৎপন্ন		
১। পশুচারণ, কৃষি, শীকার	৭,২৯৮	—১৮
২। খনি ও খনি কার্য্য	১৭	—২·৩
২। শিল্প ব্যবসায়		
৩। শিল্প	১,০৪৯	—৭·০
৪। বহন	১৩৭	১৩·৮
৫। ব্যবসায়	৫৩৭	২·০
গ। ভদ্র পেশা ও চাকুরী		
৬। সরকারী সেনাবল	৬৯	৯·০
৭। সরকারী চাকুরী	৮৪	·১
৮। ভদ্র পেশা ও শিক্ষাদি	১৫৯	৭·১
ঘ। বিবিধ		
৯। স্বাধীন জীবি	১৫	—১১·১
১০। ভৃত্য	১৪৪	—·৬
১১। অশ্রেণীত	৩৫১	+২০·১
১২। অকর্ষণ ও অজন্মা	১০৪	—৫·৭

পশ্চিম শিল্প ও বাণিজ্যের যে-প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহা এখনো পারে নাই। বরং ভারতীয় শিল্পের অধঃপতন হওয়ায় দেশের লোক কৃষির আশ্রয় লইয়াছে।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ; সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭১ জন কৃষিকর্মে লিপ্ত, অর্থাৎ ২২ কোটি ৪০ লক্ষ লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। এই লোকগুলির সকলে কৃষক নহে।

১ম বর্গ কৃষি

সুবিধার জন্য এই লোকগুলিকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(১) জমিদার প্রভৃতি যাঁহারা কৃষির আয় হইতে জীবনধারণ করেন।

(২) সাধারণ কৃষক।

(৩) জমিদারের কর্মচারী, পেয়াদা, গোমস্তা, ইত্যাদি।

(৪) খামারের চাকর।

(৫) দিনমজুর।

(৬) চা, কফি, সিন্‌কোনা, রবার, নীল প্রভৃতি চাষে যাহারা কুলির কাজ করে।

(৭) ফল, ফুল, শব্জী, পান, আঙুর, বাদাম ইত্যাদি যাহারা উৎপাদন করে।

ইহার মধ্যে ৮০ লক্ষ জমিদার। বাংলাদেশে গত দশ বৎসরে (১৯২১) জমিদার ও মধ্যবর্তী ভদ্রলোক শ্রেণীর সংখ্যা শতকরা ৯ জন করিয়া বাড়িয়াছে ও কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩ হারে। ১৯১১ সালে জমিদারদের সংখ্যা শতকরা ২৩ জন করিয়া বাড়িয়াছিল। অর্থাৎ কৃষকদের অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ। এই সব বৃদ্ধি বাংলায় দারিদ্র্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসহায় অবস্থার পরিচায়ক। গড়ে প্রত্যেক জমিদার ও তৎশ্রেণীর লোকদের পরিবার-পিছু ৬২০ টাকা করিয়া আয়

পড়ে! ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ লোক নিজ নিজ জমি চাষ করে। ৪ কোটি ১০ লক্ষ চাকর বা দিনমজুর, ইহাদের নিজের কোনো জমি নাই। হাজার ৭৫ লোক নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য করে।

গড়ে ভারতবর্ষের একশ'জন কৃষি-উপজীবীর ২৫ জন করিয়া 'কৃষ্যাণ' ও দিনমজুর লাগাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি-প্রদেশের পৃথক পৃথক হিসাব করিলে দেখা যায়—আসামে গড়ে মাত্র তিনজন মজুর একশ'জন কৃষকের কাছে কাজ করে ও বেরার-মধ্য-প্রদেশে ৮২ জন। ইহার দুইটি কারণ; প্রথমত যেখানে অস্পৃশ্য বা আদিমজাতির বাস অধিক সেখানে মজুরের সংখ্যা অধিক, কারণ তাহারা কৃষিকার্য্য জানে না—(যেমন সাঁওতাল ওরাঁও প্রভৃতি জাতি)। দ্বিতীয় কারণ, দেশে জমির অভাব। জমি ভাগের পর ভাগ হইতে হইতে কোনো কোনো স্থানে ঘরের মত নিতান্ত সামান্য এক টুকরাও হইয়াছে। শিল্পকর্ম প্রচুর পরিমাণে নাই বলিয়া সকলেই জমির দিকে ঝুঁকিয়াছে, এমন কি তাঁতি তিলি লোহার প্রভৃতি জাতি জাত-ব্যবসায় লাভজনক নয় বলিয়া ক্ষেত খামার করিতেছে; ফলে জমির অভাব হইয়াছে ও ভূমিহীন দিন-মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহাদের জমি নাই তাহারা মজুরী করে; সংস্কারবশত যাহারা বাহিরে যাইতে পারে না, তাহারা অনাহারে মরে; যাহারা দেশের বাহিরে চলিয়া শিল্পকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারে তাহারা বাঁচিয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে-পরিমাণ কৃষক বা চাষী আছে, তাহাদের উপযুক্ত পরিমাণে কাজ দিবার মত জমি আছে কিনা, তাহা দেখা যাউক। ১৯১৯-২০ সালে কৃষি-বিভাগের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯৬ হাজার একার চাষের জমি ছিল, এবং ইহাতে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৬০ হাজার কৃষক, চাকর, মজুর কাজ করিয়াছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক লোক-পিছু ২½ একার করিয়া জমি বছরে পড়িয়াছে। ইহা

হইতে দারিদ্র্যের কারণ সহজে অনুমান করা যায়। ২½ একার জমির চাষে কখনো একজন লোকের বৎসরভর সময় লাগে না; বৎসরে কয়েক-দিন খাটিলেই এ কাজ হয়। ইংলণ্ডে একজন লোকপ্রতি ২১ একার জমি আছে। এখন অনেক কলকজা হইয়াছে বলিয়া যে তাহাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব তাহা নহে। ১৮৫১ সালে যখন মাঠের হাল লাঙ্গল আমাদেরই মত ছিল, তখন গড়ে একজন ১৭ একার ভুমিতে বৎসরে কাজ করিতে পারিত। দক্ষিণ-আফ্রিকায় উপনিবেশে জনপ্রতি ৮০ একার জমি আছে। ভারতের চাষী পূরা কাজ পায় না ও করিতে পারে না। পঞ্জাবে একজন চাষী যে কাজ করে তাহা বার মাসে ১৫০ দিনের বেশী কাজ নয়।

কৃষি ব্যতীত মৎস্য-ব্যবসায় ও শিকার করিয়া অনেক লোক জীবন ধারণ করে। প্রতি দশহাজার লোকের মধ্যে ৬ জন এই কর্ম্ম করে। সমগ্র ভারতের অর্দ্ধেক মৎস্য-ব্যবসায়ী বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজ প্রদেশে দেখা যায়। ভারতে মৎস্যের উন্নতির জন্য সরকার বাহাদুর নজর দিয়াছেন এবং আশা করা যায় এই ব্যবসায় ভারতের খালে বিলে নদীর ধারে ধারে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে।

সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯২১ সালে ৫ লক্ষ ৪২ হাজার লোক অর্থাৎ প্রতি দশহাজারের মধ্যে ১৭ জন খনিতে কাজ করে; সমগ্র ভারতে ১৯২১ সালে ৬২৮টি কয়লার খনিতে ১, ৮১, ৫৭৪ লোক কাজ করে। ইহার মধ্যে বাংলাদেশের ২০২টি কয়লাখনিতে ৪৭,০১৫ ও বিহার-উড়িষ্যায় ১,০৩,৩১৫ জন লোক কাজ করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুলী; খনিতে সাধারণত সাঁওতাল, বাউরী, ভুঁইয়া, চামার, কোড়া, রাজবার, দোষাদ, মুসাহার জাতির লোক কাজ করে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্যত্র খনিতে প্রায় একলক্ষ লোক কাজ করে; ইহাদের মধ্যে জামসেদপুরের লোহার

২য় বর্গ খনি

কারখানায় প্রায় ৫,০০০ শ্রমজীবী, বিহার ছোটনাগপুরের অভ্রের খনিতে ১৯১৮ সালে ২১,০০০ লোক কাজ করিত। পঞ্জাবের লবণের খনি ও মহীশূর রাজ্যের মধ্যে অনেকে কাজে লিপ্ত আছে।

১৯০১—১৯১১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে খনিজ কাজে লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ৩৫ হাজারের স্থানে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত সময়ের মধ্যে ধাতুর খনিতে কাজ করিবার লোক ২½ গুণ বাড়িয়াছিল। গত দশ বৎসরে সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই।

১৯১১ সালে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকে শিল্প কাজের উপর নির্ভর করিত; ১৯২১ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৩ কোটি ৩১ লক্ষ হইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা ৬ করিয়া লোক শিল্পে কমিয়াছে। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১০·৫ জন লোক শিল্পাদি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে।

৩য় বর্গ শিল্প

ইহার মধ্যে শতকরা ২½ এর উপরে লোক বয়নশিল্পে নিযুক্ত; কেবলমাত্র তুলার শিল্পে ৬০ লক্ষ লোক ব্যাপৃত। তুলার নানা শিল্প কাজে পঞ্জাবে দশহাজারে ৩৭ জন লিপ্ত। বাংলা ও আসামের সব চেয়ে কম—দশহাজারে কেবল ৮·১০ জন মাত্র এই শিল্প-উপজীবী। রেশমের কাজে সমগ্র ভারতে মাত্র ১৩ হাজার লোক ও পশমের কাজে মাত্র ৭ হাজার লোক লিপ্ত। অথচ বিদেশ হইতে এই সকল সামগ্রী লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী হয়। দেশ হইতে ক্রমেই হাতে সুতা-তৈয়ারী উঠিয়া যাইতেছে। ১৯০১ সালে হইতে বস্ত্র-শিল্পে শতকরা ৬ জনের অধিক করিয়া লোক কমিয়া গিয়াছে; চরকার সুতা যে কেবল উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে তাঁতের কাজও প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

চর্ম্মের ব্যবসায় যুদ্ধের পূর্বে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিল। ১৯০১ সালে চর্মকারদের যে সংখ্যা দেখা গিয়াছিল ১৯১১ সালে তাহার শতকরা ৬ জন করিয়া কমিয়া যায়। ১৯২১ সালে উহাদের সংখ্যা

৭,৩১,০০০ ; বিশ বৎসরে শতকরা ১৮হারে বাড়িয়াছে। দেশীয় চর্মকারগণের দুর্দশার অন্ত নাই ; বিদেশী রীতি-অনুসারে তাহারা চর্ম পরিষ্কার করিতে বা জুতা তৈয়ারী করিতে জানে না ; ফলে তাহাদের ব্যবসায় প্রায় ধ্বংস হইয়াছে এবং অনেকেই কলকারখানায় ও কৃষিকার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে।

চর্ম ব্যবসায়

লৌহের কাজ পিতল-কাঁসার ব্যবসায় ধাতু শিল্পের অন্তর্গত। ১৯০১ সাল হইতে দশ বৎসরে এই ব্যবসায়ের লোক শতকরা ৬½ হারের উপর কমিয়াছিল। ১৯২১ সালেও পুনরায় শতকরা ৩·১ হারে কমে। ঐ বৎসরে ১৮ লক্ষ লোক উক্ত কর্মে লিপ্ত ছিল ; ইহার কারণ বিদেশী জিনিষের প্রচলন। বিদেশ হইতে যে কেবল তামা-পিতলের চাদর আসে তাহা নহে, অবশেষে জার্মানী হইতে পিতলের গ্লাস বাটীও আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতী এনামেল ও এলুমিনিয়মের বাসন ভারতীয় পিতল-কাঁসার সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। ফলে এখানে যাহারা এই শিল্প অনুসরণ করিয়া অর্থ উপার্জন করিত তাহাদের সংখ্যা কমিতেছে। পূর্বোক্ত সংখ্যার শতকরা ৭৬ জন লোক লোহার ও ১৪ জন পিতল-কাঁসার কাজ করে।

ধাতু শিল্প

এ ছাড়া মাটীর কাজ যেমন, ইট, টালী, কুমারের কাজ, ঔষধাদি তৈয়ারী, খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত, পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী কার্য্যে কয়েক লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এক্ষণে খেলনা জার্মাণী ও জাপান হইতে আসে। দেশীয় ঔষধের আদর কমিয়া গিয়াছে ; দেশীয় সুগন্ধাদি এখন অনাদৃত ; ফলে এই সকল শিল্প অধঃপাতে যাইতেছে ; লোকে এইসকল কর্ম ছাড়িয়া কৃষির দিকে ঝুঁকিয়াছে অথবা শিল্প ও জমির অভাবে দিন-মজুর হইতেছে।

বিবিধ

যান বাহনাদির কার্য্যে প্রায় ৪৩ লক্ষ বা দশহাজারকরা

১৩২ জন নিযুক্ত আছে। এই বর্গে প্রায় দশ বৎসরে শতকরা ১৩৮ করিয়া লোক কমিয়াছে বলিয়া ১৯২১ সালে আদমসুমারীতে প্রকাশ। ইহার মধ্যে মাঝিমাল্লা আছে, রাস্তায় যাহারা কাজ করে, রেলে যাহারা চাকুরী করে, পোষ্ট-আপিসে যারা কাজ করে তাহারাও পড়ে। ৪৭১টি শিল্প কাজ Transport বা বাহনাদি কার্য্যের সহিত যুক্ত; ইহাতে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার লোক নিযুক্ত, তার মধ্যে এক রেলের কাজে ১ লক্ষ ১২ হাজার লোক নিযুক্ত।

চতুর্থ বর্গ
Transport

সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটি ৮১ লক্ষ লোক বিবিধ ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত; ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১ সালে শতকরা ২ হারে লোক এই বর্গে বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষে শিল্পী ও ব্যবসায়ী অনেক সময়ে একই ব্যক্তি; যে স্বর্ণকার গহনা গড়ে, যে ছুতার কাঠের জিনিষ বানায়, সেই আবার বিক্রয় করে। শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই সংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর লোক নানারূপ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে। বাংলাদেশে এই বর্গের অন্তর্গত ২৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৫ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬৩ জন লোক খাদ্যাদি সংক্রান্ত ব্যবসায় করে।

পঞ্চম বর্গ
বাণিজ্য

ভদ্র পেশা, চাকুরী ইত্যাদি—ভদ্র পেশাজীবী লোকের সংখ্যা ৯৮ লক্ষ। ইহার মধ্যে সেনা-পুলিশ, সরকারী কর্মচারী, ও অন্যান্য ভদ্র জনোচিত কাজ যেমন ধর্মসংক্রান্ত, আইন, চিকিৎসা, শিক্ষা, সাহিত্য-কলা, ব্যবসায়ী পড়ে। সমগ্র পুলিশ-সৈন্য বিভাগে লোকসংখ্যা ১৯১১ সাল হইতে শতকরা ৯ জন করিয়া কমিয়াছে; পুলিশ ১৭ জন করিয়া শতে, ও নৌবিভাগে শতে ৮৭·৬ জন কমিয়াছে। নৌবিভাগে

সরকারী চাকুরী ও
অন্যান্য ভদ্র পেশা

মাত্র ১০০০ জন কাজ করে। সৈন্যবিভাগে শতকরা ১৩৮ জন করিয়া লোক বাড়িয়াছে। পুলিশবিভাগে জনসংখ্যা কমিয়াছে তবে বাংলা-দেশে ও বর্মাতে কমে নাই। সরকারী কর্মচারীর মধ্যে শাসনবিভাগের কর্মচারীরা, ম্যুন্সিপালটি ও লোকাল্ বোর্ডের কর্মচারীরা পড়ে। ইহাদের সংখ্যা ২৬ লক্ষ ৪৪ হাজার। ভদ্র পেশার অন্তর্গত ধর্মকার্য্যে ২৪ লক্ষ ৫৮ হাজার (১১.২ হ্রাস), আইন ব্যবসায়ে ৩,৩৬ হাজার (১০.৯ বৃদ্ধি), চিকিৎসা ব্যবসায় ৬.৬০ হাজার (৫.২ বৃদ্ধি), শিক্ষা কার্য্যে ৪ লক্ষ ৫ হাজার (১৯.৪ বৃদ্ধি) হইয়াছে। সাহিত্য-শিল্পকলায় ৭,৬২ হাজার লোক নির্ভর করে। ইহার মধ্যে আর্থিক কারণ নৃত্যগীতাদি পেশাদারী নর্তকীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে; আর রাজনৈতিক কারণে সাময়িক সংবাদপত্র ছাপাখানা প্রভৃতিতে ১ লক্ষ ২০ হাজারের স্থানে ১ লক্ষ ১ হাজার হইয়াছে।

বিবিধ—এই বর্গে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ লোক। ইহার মধ্যে বিনাশ্রমে ও পূর্বপুরুষের উপার্জিত টাকার আয় হইতে ৪ লক্ষ ৮০ লোক জীবিকা ধারণ করে। ভৃত্যাদি প্রায় ৪৫ লক্ষ ৭০ হাজার। কেরাণী ও অন্যান্য কর্মীর সংখ্যা সমগ্র ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার; ইহার মধ্যে শিল্পী (Manufacturer) ও ব্যবসায়ী ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার (এই সংখ্যা ১০ বৎসরে শতকরা ২০০ হারে বাড়িয়াছে; ১৯২১ সালে যুদ্ধের পর অনেক লোক ব্যবসায় সুরু করেন, তাহা আমরা জানি); কেরাণী ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার (বৃদ্ধি ৭৩.১), কারিকর (Mechanic) ৮৭ হাজার (বৃদ্ধি ৩৬.৫); শ্রমজীবী ৯৩ লক্ষ (বৃদ্ধি ১২.৪)।

এ ছাড়া অকেজোভাবে যাহারা আছে তাহাদের সংখ্যা ৩২ লক্ষ ৫৩ হাজার। ইহার মধ্যে জেলে ১ লক্ষ ৪৫ (বৃদ্ধি ৯.৬) লোক আছে। ভিক্ষুক ও বেশ্যার সংখ্যা ৩০, ২১ হাজার (হ্রাস ৮.৯ %)।

৭। দেশান্তর গমনাগমন

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সর্বত্র সমান নহে একথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভূপ্রকৃতি, স্থানীয় মৃত্তিকা, বৃষ্টির পরিমাণ, নদীবহুলতা, আব-হাওয়ার তাপ ও বায়ুর চাপের উপর জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে; সেইজন্য নদীবহুল বাংলা-দেশে জনসংখ্যা সর্বাধিক এবং রাজপুতানার মরুভূমিতে সর্বাপেক্ষা কম। যে-সকল স্থানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন সেইসকল প্রদেশ হইতে আসিয়া লোকে উর্বর দেশে অথবা বাণিজ্যকেন্দ্রে বাস বা কাজ করিতে যায়। সুতরাং কোনো দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস কেবল মাত্র জন্ম-মৃত্যুর হার হইতে বুঝা যাইবে না—সেখানকার কত লোক বিদেশে এবং বিদেশের কত লোক সেই দেশে বাস করিতেছে তাহা দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া বাস করিলে প্রদেশ-বিশেষের জনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়; কিন্তু সমগ্র ভারতের তাহাতে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিলে সমগ্রদেশের জন-সংখ্যা হ্রাস পায়। য়ুরোপ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর আমে-রিকার নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যায়; এক ইতালি হইতে ১৯০০ সালে সাড়ে ছয় লক্ষের উপর লোক বিদেশে গমন করে। আমাদের দেশে এই প্রকার বহির্গমন খুবই কম; সে-বিষয়ে আলোচনা পরে হইবে। এক্ষণে ভারতের অভ্যন্তরেই প্রাদেশিক গমনাগমন কিরূপ চলিতেছে তাহা দেখা যাক্।

স্থানান্তরে গমনাগমন

ভারতবর্ষের লোক অত্যন্ত গৃহপ্রিয়। ১৯০১ সালের আদম-সুমারীতে দেখা যায় যে শতকরা কেবলমাত্র ৯ জন লোক নিজ জেলা

ত্যাগ করিয়া বাহিরে বাস করিতেছিল। ১৯১১ সালে শতকরা ৮ জন লোক ও ১৯২১ সালে শতকরা ১০ জন নিজ-জেলার বাহিরে বাস করিতেছিল এবং তাহার অধিকাংশই পার্শ্বের জেলা ছাড়িয়া যায় নাই। লোকে যে এক স্থানে বাঁধা পড়িয়া যুগযুগান্ত হইতে দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইতেছে তাহার দুইটী কারণ; একটী সামাজিক, অপরটী আর্থিক। সামাজিক বাধা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে খুব বেশী; বাহিরে গেলে জাতি যায়, শুচিতা রক্ষিত হয় না; এই সকল ভয়ে লোকে দেশের বাহির হইত না। মৎস্য-মাংসাহারী বাংলাদেশে হিন্দুস্থানের বা মহারাষ্ট্র দেশের উচ্চবর্ণ লোক আসিতে ভয় পাইত। এ ছাড়া আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক কৃষি-উপজীবী। এক কৃষিকার্য্য ছাড়া তাহারা আর কোন কার্য্য জানে না; সুতরাং বিদেশে গিয়া তাহারা কি করিবে? তাঁতির তাঁত বুনিয়া, বা কামারের লোহার জিনিষ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জনের তেমন ভরসা নাই, সুতরাং বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়। এই জন্য অধিকাংশ লোকই কৃষি বা গ্রামের শিল্প লইয়া পড়িয়া আছে। অতি সামান্য সংখ্যক লোকই গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া বড় বড় সহরের কলে কারখানায় খনিতে ও ডকে কাজ করিতেছে। রেলওয়ে বহুলোককে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজে ও সুলভে লইয়া গিয়া ও তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জীবিকার পথ খুলিয়া দিয়াছে।

ভারতের মধ্যে চলা ফেরায় প্রদেশসমূহের লাভ ও ক্ষতি

বহির্গমনে বাধা

ভারতবর্ষের মধ্যে চলাফেরার তিনটি স্রোত আছে। (১) প্রথম স্রোত বিহার-উড়িষ্যা এবং যুক্ত-প্রদেশ হইতে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সহরে; (২) দ্বিতীয় স্রোত বিহার-উড়িষ্যা, বাংলা, যুক্ত-প্রদেশ হইতে আসামের চা-বাগানে;

চলাফেরার তিনটি ধারা

(৩) তৃতীয় স্রোত মান্দ্রাজ, বাংলা ও যুক্ত-প্রদেশ হইতে ব্রহ্মদেশাভিমুখে। এ ছাড়া স্থানীয় শিল্পপ্রধান নগরে লোকের ভিড় হয়—যেমন বোম্বাই সহরের কলে পশ্চিম-ভারতের নানাস্থানের লোক জমা হইয়াছে।

যুক্ত-প্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যার লোকেরা দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হয়। দেশের সমগ্র ভূমি বিলি হইয়া রহিয়াছে, কৃষির উপযুক্ত স্থান নাই। ১৯১১ সালে যুক্ত-প্রদেশের সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ৯½ জন লোক ভূমিহীন মজুর ছিল। বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাদের কাজ থাকে না। যাহাদের জমি-জমা আছে তাহাও নিতান্ত সামান্য; ভূমি অনুর্বর, বৃষ্টি কম; এবং কাণপুর ব্যতীত অপর কোনো সহরেই কলকারখানা নাই। লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহের আদর্শ নিতান্ত নীচু হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মহামারীতে মরে; কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া লোকে আর দেশে থাকিতে পারে না। সুতরাং সামাজিক বাধা ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া বাংলাদেশের কলে, কারখানায়, খনিতে ও অন্যান্য চাকুরীতে, আসামের চা-বাগিচায়, বর্মায় চাকুরী ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতেছে। ১৯২১ সালে প্রকাশ যে যুক্ত-প্রদেশের ১৪ লক্ষ লোক বাহিরে প্রবাসী; এবং ৪ লক্ষ 'পরদেশী' এই প্রদেশে বাস করিতেছে। সুতরাং প্রদেশের মোট ক্ষতি ১০ লক্ষ লোক। বিহারের অবস্থাও তদ্রূপ। এই উভয় দেশ হইতেই লোক আসিয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বাংলাদেশে শ্রমজীবীর অতিশয় অভাব; এখানে আসিয়া পশ্চিমের লোকেরা নানা কাজ পায়। পুলিশ, দ্বারবান, ফিরিওয়ালা, মিস্ত্রী, মুচি, মাঝি, দোকানী, ব্যাপারী হিন্দুস্থানী এদেশে অনেক। অধিকাংশ হিন্দুস্থানী এদেশে স্ত্রীপুত্র আনে না; অর্থ উপার্জন করিয়া দেশে পাঠাইয়া দেয় এবং দুই চারি বৎসর অন্তর দেশে যায়। এক যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রায় ১০ লক্ষ করিয়া

বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্র

লোক প্রতি বৎসর বাহিরে যায়। বাংলাদেশে মজুরের অভাব ছোটনাগপুরের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও সাঁওতালে পূর্ণ করিতেছে। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে প্রায় ১০ লক্ষ লোক এই দেশান্তর গমনের জন্য হ্রাস পায়। ধান কাটার সময়ে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক কাটিহার লাইন দিয়া রংপুর দিনাজপুর পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায় এবং সাঁওতাল পরগণা হইতে দলে দলে লোক পশ্চিম-বাংলায় কাজ করিতে আসে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের সহিত ইহার যোগ যথেষ্ট। আশ্বিন কার্তিক মাসে মেলেরিয়ার বার্ষিক মড়ক আরম্ভ হয়। ঘরে ঘরে সুস্থ লোক শয্যাগত এবং পুরাতন রোগীরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক জায়গায় লোকাভাবে ধান কাটা হয় না। সুতরাং এই জনস্রোত বন্ধ হইলে বাংলা দেশের সমূহ ক্ষতি। তবে ব্যবসায় বাণিজ্যগুলি কেমন করিয়া মাড়োয়ারী পার্সী ও দিল্লীর মুসলমানের হাতে গেল এই সমস্যা বাঙালীকে জানিয়া তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। বাংলা দেশে ১৯১১ সালে প্রায় ১৪ লক্ষ বিদেশী ছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাড়োয়ারীরা বাংলা দেশের সকল প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্যে কি প্রকার লাভবান হইয়াছে তাহা প্রত্যেকেই জানেন। ১৯২১ সালে পরদেশীর সংখ্যা ১৯ লক্ষ উঠিয়াছিল। বিহার-উড়িষ্যা ও যুক্ত-প্রদেশ হইতে কলিকাতার চারিপার্শ্বের কল কারখানায় ও আপিষের কাজের জন্য লোক আসে। বীরভূম, মালদহ, দিনাজপুর ও উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল-পরগণার লোকে কৃষি ও খামারের কাজের জন্য আসে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির বাগিচায় নেপাল ও ছোটনাগপুরের লোকেরা যায়। এছাড়া পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে চলাফেরা আছে।

আসামের চা বাগানে

আসামের চা-এর বাগানে অনেক কুলি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রতিবৎসর প্রায় অর্দ্ধ লক্ষের উপর লোক এখানে যায়। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৬ জন বিদেশী।

পরদেশী বহু বৎসর হইতে আসাযাওয়া করিতেছে ; উহার ফলে আসামের প্রায় একচতুর্থাংশ লোক পরদেশী। অধিকাংশ এখানে বসবাস করিতেছে। লোকে যে কেবল চা-বাগিচায় যায় তাহা নহে, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কৃষি করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি জেলা হইতে লোকে যায়।

ব্রহ্মদেশের জনসংখ্যা অল্প। অথচ সেখানকার কেরোসিনের ও অন্যান্য খনি ও ধান্য ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর যথেষ্ট লোকের প্রয়োজন। বর্মনরা অনেকেই সঙ্গতিপন্ন এবং শ্রমবিমুখ। ভারতবর্ষ হইতে লোকের টান সেখানে খুব। ৭ লক্ষ ৭ হাজার পরদেশী বর্মায় আছে। ইহার মধ্যে ৫,৭৩,০০০ ভারতবাসী, অবিশিষ্ট চীনা।

বর্মার কলে গমন

১৯১১ সাল হইতে ভারতবাসীর সংখ্যা শতকরা ২৫ হারে বাড়িয়াছে : চীনা বাড়িয়াছে ৩৬% হারে। মান্দ্রাজ হইতে নিম্নজাতির সহস্র সহস্র কুলী প্রতি বৎসর সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে যায়। ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া জনশূন্য প্রদেশসমূহে লোক বসাইবার জন্য ভারত সরকার প্রথম প্রথম সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় মূলধনওয়ালা লোকে ব্যবসায় করিয়া সেখানে অর্থশালী হইতে লাগিল ; বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি জনবহুল স্থান হইতে ঔপনিবেশিক গিয়া বাস করিবে সরকারের এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তখন বর্মন ব্যতীত কেহ আর জমিদার হইতে পারিবে না—এইরূপ ধরণের একটি আইন পাশ হইলে ভারতীয়দের পূর্বের প্রতিপত্তি দূর হইল। বর্তমানে বর্মনদের নিজদের সংখ্যা যে-প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তাহাদিগের গ্রামের কৃষি কাজে সঙ্কলান হওয়া শীঘ্রই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে ; এবং ভারতবাসীরা সহরের কল কারখানায় ডকে যে-সব কাজ পাইতেছে তাহা তখন পাইবে না। ভারতবর্ষ হইতে অবাধ লোক যাওয়ার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বোম্বাই প্রদেশের বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতির জন্য সেখানকার লোকে

কাজ পাইয়া থাকে এবং বাহিরের লোকেও কিছু কম কাজ পায় না। সেই জন্য মারাঠা বা তদ্দেশীয় অন্য জাতীয় লোক বাহিরে কুলী হইয়া খুব কমই যায়।

এই দেশান্তর গমনাগমনের ফলে কোনো দেশের জনসংখ্যা হ্রাস কোনোটির বা বৃদ্ধি হয়। বাংলাদেশের মধ্যে পরদেশীর সংখ্যা প্রতিবৎসরেই বাড়িয়া চলিতেছে। ইহার কারণ যে কেবল স্থানীয় কল কারখানার বৃদ্ধি তাহা নহে। বিশ বৎসর পূর্বেও কলিকাতার সন্নিকটস্থ কলগুলিতে বাঙালী কুলিই ছিল পনের আনা; এখন সেই স্থানে ওড়িয়া বিহারীর সংখ্যা প্রবল। শ্রমসাপেক্ষ কাজে বাঙালীকে ডাকা হয় না; কয়েক বৎসর পূর্বেও কলিকাতা সহরে হিন্দু ছুতার অনেক ছিল এখন মুসলমান ও চীনা মিস্ত্রী তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে। জীবন সংগ্রামের নানা ক্ষেত্র হইতে বাঙালী সরিয়া কোথায় যাইতেছে জানিনা। তবে ক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি ধীরে ধীরে তাহাদের হস্তান্তর হইতেছে ইহা নিশ্চিত কথা।

ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের দশা যে-প্রকার শোচনীয়, এক্ষেত্রে এই বর্দ্ধিষ্ণু জাতির পক্ষে ভারতের কৃষিক্ষেত্র আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। কৃষির উপরে সকল শ্রেণীরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁতি, কুম্ভকার, কামার প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক শিল্প-পথ ছাড়িয়া কৃষি করিতেছে। কিন্তু লোকের চোখ ফুটিয়াছে তাই তাহারা বিদেশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আফিকা প্রভৃতি দেশে যাওয়ার পথও বন্ধ হইতেছে।

ভারতবর্ষের লোক যেমন বিদেশে আছে, বিদেশের লোক তেমনি এখানে আছে। ইহাদের সংখ্যা ১৯২১ সালে ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৫২৬।

বিদেশী লোক

ইহার পাঁচভাগের চারিভাগ আসে নেপাল, আফগানিস্থান, চীন, শ্যাম, সিংহল ও আরব হইতে।

অবশিষ্টের অধিকাংশ ইংরাজ। এক আফগানিস্থানের প্রায় ৯২,০০০ কাবুলী এদেশে বাস করে। প্রতিবৎসর শীতের সময়ে তাহারা হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশের সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে দেখা দেয়। তাহাদের ব্যবসায়ও ভারতবাসী লইতে পারে নাই। ৮০ হাজার চীনা ভারত-সাম্রাজ্যে বাস করে; ইহার অধিকাংশই ব্রহ্মদেশে—কিন্তু ক্রমেই বাংলাদেশে বিশেষভাবে কলিকাতা অঞ্চলে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মফঃস্বলেও চীনা ফেরিওয়ালা দেখা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় ২৩,০০০ আরব বোম্বাই অঞ্চলে বাস করে। এশিয়ার লোক ছাড়া য়ুরোপীয় নানাজাতি এখানে বাস করে—তবে অধিকাংশই অস্থায়ী। ১ লক্ষ ৪৬ হাজার বিদেশীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার য়ুরোপের লোক, তার মধ্যে ইংরাজই ১ লক্ষ ২৩,০০০। সৈন্যবিভাগে ৭৭ হাজারের কিছু বেশী ইংরাজ এদেশে থাকে; অবশিষ্ট গভর্ণমেণ্ট উচ্চ-কর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, পাদরী, শিক্ষক।

তৃতীয় ভাগ

১। ভারতের ধর্ম

ভারতের ধর্মগুলিকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিতেছি। যথা :—

ভারতের ধর্ম

(১) ভারতীয় ধর্ম, অর্থাৎ যে-সকল ধর্মের উৎপত্তি ভারতের মধ্যে—যেমন (ক) হিন্দু (খ) বৌদ্ধ (গ) জৈন। (২) আদিম ধর্ম (৩) ভারতের বাহিরের ধর্ম, যেমন (ক) ইহুদীধর্ম (খ) পার্শীধর্ম (গ) খৃষ্টানধর্ম (ঘ) ইসলামধর্ম।

(ক) হিন্দুধর্ম

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কবে কোথায় ইত্যাদি কূট তর্কের মধ্যে না গিয়া মোটামুটিভাবে বলিতে পারি বৈদিকধর্ম নানা যুগের মানুষের ইতিহাস-অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে নদী-প্রবাহের ন্যায় ভাল-মন্দ সবই বহন করিয়া চলিতেছে। হিন্দু কে একথার মীমাংসা হয় নাই—যত প্রকারে সম্ভব তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটির একটি না একটি ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হইয়াছে যে, যে বেদ ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রমকে মানে সেই হিন্দু। এই সূত্রানুসারে শিখ্‌রা, আর্য্য-সমাজী বা ব্রাহ্মেরা কেহই হিন্দু নয়; অথচ হিন্দুসমাজ ইহাদিগকে ছাড়িতেও নারাজ এবং ইহারাও আপনাদিগকে সাধারণত যাহাকে হিন্দু বলে সে শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেও অনিচ্ছুক। ১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২১ কোটি ৭ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬৯.৩ ভাগ। ১৯২১ সালে হিন্দুর সংখ্যা ২১ কোটি ৬৭

লক্ষ; অর্থাৎ শতকরা ৬৮'৪। সুতরাং দশবৎসরে সমগ্র ভারতে হিন্দু কমিয়াছে! *

* ভারতে হিন্দুর সংখ্যা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	হ্রাস ২০ বৎসরে
	লক্ষ ২০,৭০	২১,৭৩	২১,৬২	
জনসংখ্যার শতকরা	৭০'৩	৬৯'৩	৬৮'৪	প্রায় ২ জন

হিন্দুর সংখ্যা (হাজার)

মান্দ্রাজ	৩,৭৫,১১,	যুক্ত প্রদেশ	৩,৮৬,১০,
	৮৮'৬%		৮৫%
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,১৬,২২,	বিহার-উড়িষ্যা	২,৮১,৬৬,
	৮৩'৫%		৮২'৮%
কুর্গ	১,২৬,	বোম্বাই, সিন্ধু	১,৪৮,১৬,
	৭৭'৩%		৭৬'৫%
আজমীড় মেরবারা	৩,৬৪,	দিল্লী	৩,২৫,
	৭৩'৫%		৬৬'৬%
আসাম	৪১,৩২,	বঙ্গদেশ	২,০২,০৬,
	৫৪'৩%		৪৩'২%
আন্দামান	৮,	পঞ্জাব	৬৫,৭৯,
	৩২'৭%		৩১'৮%
বেলুচিস্থান	৩৮,	উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	১,৪৯,
	৯'২%		৬'৬%
বর্মা	৪,৮৫,		
	৩'৬%		

মোট বৃটিশ ভারতে ১৬,৩১,৪৪,০০০
বা শতকরা ৬৬
দেশীয় রাজ্যে ৫,৩৫,৮৯,০০০
বা শতকরা ৭৭'৪
মোট ভারতে ২১,৬৭,৩৪,৫৮৬ জন হিন্দু
অর্থাৎ শতকরা ৬৮'৫৬

বৌদ্ধধর্ম* ভারতে অতি সামান্য দেখা যায়, তবে নেপাল, ভুটান, চট্টগ্রাম ও সিংহলে এখনো ইহা বিদ্যমান। নেপাল ও বিশেষত ভুটান সিকিম অঞ্চলে প্রেতপূজা প্রভৃতির সহিত মিশিয়া বৌদ্ধধর্ম কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিয়াছে। খৃষ্ট জন্মের ৬ষ্ঠ শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রচার করেন; সহস্র বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল এই ধর্ম ভারতের নানাস্থানে প্রবল ছিল; কিন্তু ৯ম খৃষ্ট শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সহিত বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে লোপ পাইতে থাকে। ইহার মতামতের কিয়দংশ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অগ্রাহ্য করিয়াছে। বৃটীশ ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বর্মায় বৌদ্ধমতাবলম্বী লোক অধিক।

(খ) বৌদ্ধধর্ম

জৈনধর্ম † প্রাচীন ভারতে বহুকাল হইতে ছিল—মহাবীর তাহাকে আকার দান করিয়া ধর্মমতরূপে উহা প্রচার করেন। জৈনেরা ধর্ম প্রচার করিবার জন্য বৌদ্ধদের মত দেশ বিদেশে বাহির হন নাই।

(গ) জৈনধর্ম

(২) ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি চিরকালই আর একটি শক্তি কাজ করিয়া আসিয়াছে। সেটি হইতেছে এখানকার অনার্য্য শক্তি। এই অনার্য্য শক্তি যে কেবল জাতি ও বর্ণসমস্যা সৃষ্ট করিয়াছিল তাহা নহে—ধর্মের উপর ইহার প্রভাব কিছু কম হয় নাই। পুরাণগুলির অনেক

(ঘ) আদিম ধর্ম

* বর্মাপ্রদেশে ১, ১২, ০১, ৯৪৩ জন বা শতকরা ৮৫ জন লোক বৌদ্ধ। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৩·৬৬ ভাগ বৌদ্ধ।

† জৈনমতাবলম্বীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার। প্রতি জনগণনায় উহা কমিতেছে। ১৯১১ সালে ৬·৪, ১৯২১ সালে ৫·৬ হারে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল।

আখ্যায়িকা ও মত এইসব লৌকিক ধর্মের সংস্কৃত সংস্করণ। অসংখ্য অনার্য্য শাখা উপশাখা হিন্দু-সমাজের মধ্যে আসিয়াছে; কিন্তু আসে নাই এমন সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহারা হিন্দু নয়। আদম-সুমারীতে ইহারা 'আনিমিষ্ট' Animist বলিয়া উল্লিখিত। এই আদিম * অনার্য্য জাতি এখনো যেমনভাবে বর্তমান, পূর্বেও হিন্দুযুগে তাহারা তেমনি ছিল; বরং তখন তাহাদেরই সংখ্যা আর্য্যদের তুলনায় অধিক ছিল। ক্রমে তাহাদের অধিকাংশই হিন্দুদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; মধ্যযুগে মুসলমান এবং বর্তমানে খৃষ্টান সমাজের মধ্যে ইহারাই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও আদিম অনার্য্যদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি।

ভারতের বাহিরের ধর্ম

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ভারতের বাহিরের ধর্মগুলি পড়িতেছে। (ক) ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম হইতেছে ইহুদী*। দাক্ষিণাত্যে কোচীন ষ্টেটের ইহুদীগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহারা খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্যালেষ্টাইন হইতে পলাইয়া আসিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। (খ) পার্শীরা পারস্য হইতে অষ্টম শতাব্দীতে পলাইয়া আসিয়া ভারতের অধিবাসী হয়। (গ) মালাবারে সিরীক খৃষ্টানদের মধ্যে প্রবাদ যে খৃষ্টের শিষ্য সাধু তমাস্ ভারতে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন; এবং

---

* ভারতে আদিমদের সংখ্যা ১৯২১ সালে ৯৭,৭৪,০০০ জন। ১৯১১ সালে ১,০২,৯৫,০০০ ছিল; অর্থাৎ শতকরা ৫·১ হারে কমিয়াছিল। এই হ্রাসের কারণ আদিমেরা দলে দলে খৃষ্টান হইতেছে; মুসলমান ধর্মও কিছুকিছু গ্রহণ করিয়াছে।

ইহুদীদের সংখ্যা ২১,৭৭৮। পার্শীদের সংখ্যা ১,০১,৭৭৮।

আমরা এখানে খৃষ্টানদের সমগ্র সংখ্যা দিতেছি।

১৯০১ সালে ২৯ লক্ষ ২৩ হাজার

সেখানকার প্রথম খৃষ্টীয় চার্চ ৫২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।*
(ঘ) আট শত বৎসর পূর্বে মুসলমানগণ ভারত জয় করে; তাহাদের জয় কেবল রাজ্যজয় ছিল না—ধর্মেও তাহারা জয়লাভ করিয়াছিল। তাই বর্তমানে ৭ কোটীর উপর লোক মুসলমান এবং এক বাংলাদেশের শতকরা অর্দ্ধেকের উপর লোক ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী।**

ভারতবর্ষের মধ্যে যে-সব বাহিরের জাতি প্রবেশ করিয়াছিল এবং যে-সব অনার্য্য আদিম জাতি এখানে বাস করিত তাহাদের অধিকাংশ বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শক্, হুন, যিউচী, গ্রীক, প্রভৃতি বাহিরের জাতি হিন্দুদের মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে। "জাতিতত্ত্ব" পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহুদী, পারশী, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতিকে সে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই কেন? ইহার কারণ এই শেষোক্ত ধর্মগুলি পূর্ব হইতেই উচ্চভাবে পরিপূর্ণ ছিল, বহুদেবপূজক গ্রীক বা অর্দ্ধসভ্য শক্, হুনদের ন্যায় এই জাতিদের ধর্মতত্ত্ব অল্প ভিত্তির উপর নির্মিত ছিল না। এইসব জাতি যে কেবল নিজ ধর্ম লইয়া শান্তভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল

১৯১১ „ ৩৮,৭৬, „ বৃদ্ধি ৩২·৬%
১৯২১ „ ৪৭,৫৪, „ বৃদ্ধি ২২·৭%
সমগ্র জনসংখ্যার ১·৫১% মাত্র খৃষ্টান।
মান্দ্রাজে শতকরা ৩·২২ জন খৃষ্টান।

মুসলমানের সংখ্যা।
১৯০১ সালে ৬,২৪,৫৮ হাজার
১৯১১ „ ৬,৬৬,৪৭ „ বৃদ্ধি ৬·৭%
১৯২১ „ ৬,৮৭,৩৫ „ „ ৩·১
বৃটীশ ভারতের শতকরা ২৪ জন মুসলমান
দেশীয় রাজ্যের „ ১৩·৪ জন „
সমগ্র জনসংখ্যার „ ২১·৭ জন „

তাহা নহে, তাহারা হিন্দুদের কাছে আসিয়াই তাহাদিগকে ধর্ম ত্যাগ করিতে বলিল ; ইহা হিন্দুদের ইতিহাসে কখনো ঘটে নাই। ইহার ফলে এই সব ধর্ম হিন্দুদের ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যাহারা প্রবেশ করিয়াছে তাহারা নিম্নস্তর দিয়া প্রবেশ করিয়াছে— হিন্দুদের সমস্ত মানিয়া তবে মিশিয়া গিয়াছে। নূতন লোকেরা সমকক্ষ-ভাবে, আচার্য্য ও প্রচারকরূপে প্রবেশ করিয়াছিল,—সেইখানেই হিন্দুদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সকল প্রকার কঠোর নিয়ম সংযম প্রবর্তন করিল।

২। হিন্দু-সমাজ ও বর্ণভেদ

ভারতবর্ষের জনসমাজ বহু জাতিতে বিভক্ত; হিন্দু, মুসলমান, আদিম, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যেই অনেক ভেদ আছে। অন্যান্য ধর্মের সহিত হিন্দুর জাতিভেদের পার্থক্য এইখানে যে অন্যত্র 'জাত' ব্যক্তিগত, সুতরাং গুণগত, এখানে জাতি বংশগত। দৈবক্রমে সদ্ বা অসদ্ বংশে জন্মগ্রহণের উপর তাহার সামাজিক মর্য্যাদা নির্ভর করে। ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি; সেইজন্য আমরা প্রথমেই তাহাদের প্রতিষ্ঠানগুলির বর্ণনা দিব।

বর্ণ

সমগ্র হিন্দুজাতিকে শাস্ত্রমতে চারি বর্ণে পৃথক্ করা হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয়—শিক্ষা দীক্ষার গুরু; যুদ্ধাদি কর্মে লিপ্ত বীরগণ রাজন্য বা ক্ষত্রিয় পদবাচ্য। বৈশ্য বা বিশ অর্থে জনসমূহ বুঝায়; ইহারা বিচিত্র কর্মে লিপ্ত, ইহারাই People বা Masses। শূদ্র দ্বিজ

জাতির বাহিরের বর্ণ অর্থাৎ আর্য্যদের অন্তর্গত নয়—ইহারা অনার্য্য—আর্য্যদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া আচার ব্যবহার গ্রহণ ও দাসত্ব মানিয়া লইয়াছিল। এই চতুর্বর্ণের বাহিরে ছিল পঞ্চম বা অস্পৃশ্যেরা; তাহারা নিষাদ, চণ্ডাল প্রভৃতি উপজাতি বা Tribe। ইহাই গেল আর্য্য সমাজের প্রথম ভেদ।

(২) উপবর্ণ

ব্রাহ্মণ বলিতে ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণজাতিকে বুঝাইলেও ইহাদের মধ্যেও জাতি-ভেদ যথেষ্ট আছে। এইখানে জাতি শব্দের অর্থটি আমরা পরিষ্কার করিয়া দিব। কোনো জাতি বলিলে কয়েকটি পরিবার বুঝায়, ইহাদের আচার ব্যবহার ও পেশা এক; একজন মহাপুরুষ বা ঋষি হইতে তাহাদের সকলের উদ্ভব। জাতির মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান বিশেষ কোন শাস্ত্র-সম্মত বা বিশেষ কোনো স্থানের লোকাচার সম্মত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন; পরস্পরের সহিত আহারাদি ও পাকস্পর্শ সম্বন্ধে সামাজিক প্রথা মানিয়া চলিতে হয়; উচ্চ বর্ণ তাহার নিম্ন বর্ণের হস্তে পক্ব অন্ন গ্রহণ করে না; এই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলার নাম জাতি রক্ষা। এক্ষণে এই সকল নিয়ম প্রত্যেক দেশে পৃথক। উত্তর-ভারতে বা আর্য্যাবর্তে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর অনেকগুলি জাতির হাতে জল গ্রহণ করেন; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ যে অপর জাতির হাতে জলপান করিবে তাহা তাহাদের স্বপ্নের অগোচর। সেখানে (মালবারে) নায়ার জাতির সংস্পর্শে ব্রাহ্মণের জাতি যায়; কম্মান্দন বর্গের মিস্ত্রী, কামার, ছুতার ও মুচি ব্রাহ্মণের ১৮ হাতের মধ্যে আসিলে অশুচির কারণ হয়। ইলুবনেরা ২৪ হাত, পুলায়ন ৩২ হাত ও পারিয়া ৪৮ হাত তফাতে ব্রাহ্মণকে অশুচি করিতে পারে। সেইজন্য দাক্ষিণাত্যের বহু স্থলে ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে ইহারা প্রবেশ করিতে পারে না এবং রাজপথে ব্রাহ্মণ দেখিলে বহুদূর হইতে পথ ছাড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে।

উত্তরের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এইরূপ কোনো মানামানি নাই। সেইজন্য প্রাচীন লেখকগণের মতে ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণ দুই ভাগে বিভক্ত—পঞ্চ গৌড় ও পঞ্চ দ্রবিড়। মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় সংস্কৃতজ ভাষাভাষী আর্য্য বা মিশ্রিত আর্য্যগণ পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত—যথা সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় (বাংলা) উৎকল। কর্ণাট, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি পঞ্চ দ্রবিড়ের অন্তর্গত। ইহা গেল দ্বিতীয় ভাগ।

(৩) শ্রেণী

উপর্য্যুক্ত শ্রেণীভাগই চরম নহে। ইহাদের মধ্যে স্থানীয় ভাগ আছে; এই ভাগ অনেক সময়ে ভৌগলিক কারণ-জনিত। বাংলাদেশের মধ্যেই নিম্নলিখিত উপ-বিভাগ দৃষ্ট হয় যেমন—(ক) রাঢ়ি (খ) বারেন্দ্র (গ) সপ্তশতী (ঘ) মধ্যশ্রেণী (ঙ) বৈদিক (চ) গ্রহবিপ্র। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে।

(৪) গোত্র

উপর্য্যুক্ত শ্রেণীর মধ্যে পুনরায় যে ভাগ দেখা যায় তাহাকে গোত্র বলে। লৌকিক বিশ্বাস অনুসারে প্রতি গোত্র কোনো এক ঋষির বংশোদ্ভব। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণত যে দশ ঋষিকে মানবজাতির আদি বলিয়া ধরা হয়—সেই সব ঋষিকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরা তাঁহাদের আদিপুরুষ বলিয়া মানে। এক একটি গোত্র কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি; এক গোত্রের মধ্যে বিবাহ হয় না তাহার কারণ তাহারা এক আদি পুরুষের বংশধর।

(৫) পরিবার

পরিবার সমাজ ও ব্যক্তির মিলিবার স্থান। সমাজ-তত্ত্বের মূল হইতেছে পরিবার। লৌকিক ভাষায় 'জাত'*শব্দ বর্ণের স্থানে ব্যবহৃত হয় এবং সেই জাতের অর্থ কি, কি উপায়ে তাহা রক্ষিত হয় সে বিষয়ে পূর্বেই বলিয়াছি। এই জাতি-রক্ষার প্রধান জিনিষ বিবাহ। বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে যেরূপ ব্যাপক নিয়মাবলী আছে আর কোনো সমাজে সেরূপ আছে বলিয়া জানি না। বিবাহ সগোত্রে হইতে পারে না; আদিম জাতিদের মধ্যে এক গোত্রে

বিবাহ নাই। ইহার পর এক উপবর্ণের বাহিরে বিবাহের নিষেধ; এ নিয়ম সকল বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত। কিন্তু পঞ্জাব ও আসাম অঞ্চলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের কোথায় কোথায় বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিবাহ-প্রথা এখনো প্রচলিত আছে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণ পূর্ববঙ্গের বৈদ্যদের সহিত ক্রিয়া কর্ম করিতে অনিচ্ছুক।

বর্ণভেদের উৎপত্তি

বর্ণভেদ বা জাতিভেদের উৎপত্তি লইয়া বহুকাল হইতে গবেষণা চলিতেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যেমন বহুবিধ মতবাদ বা থিওরী খাড়া করিয়াছেন, এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিতে ভুলেন নাই। শাস্ত্রমতে চারিবর্ণ যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ, বক্ষ, উরু ও পদ হইতে উদ্ভূত। একথাটিকে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া বিশ্বাস করিতে গেলে প্রাচীনদের বুদ্ধির প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে না। তবে ইহাকে রূপকভাবে গ্রহণ করিলে একথাটির সত্যতা ও গভীরতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না; প্রত্যেক সমাজের পুষ্টির জন্য জ্ঞান, কর্ম, অর্থ ও সেবার প্রয়োজন। এই ভেদ কর্মগত। মনুতে ৩৬টি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহার মতে এই সব বর্ণসঙ্কর। অনুলোম বিবাহের কথা সচরাচর দেখা যায়; প্রতিলোম বিবাহ বা নীচবর্ণের পুরুষের উচ্চবর্ণের স্ত্রীকে বিবাহে সঙ্কর-বর্ণ হয়। এই মত কিয়দ পরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে নহে তাহা আমরা দেখিব। হিন্দুসমাজ বর্তমানে ২৩৭৮টি বর্ণ ও ৪৩টি জাতি বা Tribeএর দ্বারা গঠিত। জাতি সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা যে (১) বর্ণভেদ হিন্দুধর্মের বিশেষ অঙ্গ, ও ধর্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। (২) সমগ্র হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণে বিভক্ত। (৩) ধর্ম সনাতন—তাহার কোনো পরিবর্তন নাই। বিজ্ঞানের চেষ্টায় এসব ধারণা জ্ঞানীদের মন হইতে দূর

হইয়াছে। বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে দেশীয়দের ধারণা যেরূপ ভ্রান্ত, য়ুরোপীয় অনেক পণ্ডিতের ধারণাও তদ্রূপ। কাহারও মতে জাতির উৎপত্তি কর্ম, বা পেশা। মিঃ নেস্‌ফিল্ড দেখাইয়াছেন যে যুক্ত-প্রদেশের একশতটি বর্ণের মধ্যে ৭৭টি কর্মগত, ১৭টি বর্ণগত, ৬টি স্থানীয় নামানুগত ইত্যাদি। বর্ণগত নামের অধিকাংশের পেশা শীকার, মাছ ধরা প্রভৃতি। কয়েক-জন পণ্ডিত বহু শত লোকের মাথা মাপিয়া শরীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ব্রাহ্মণ ও ঝাড়ুদারদের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। আবার কেহ বলেন আহার, বিবাহাদি সম্বন্ধে যে-সব প্রাচীন বাচ-বিচার দেখা যায় তাহা আর্য্যদের আদিম অভ্যাস, গ্রীস্ ও রোমেও এইরূপ দুই একটি পদ্ধতি দেখা যাইত। এই সকল মতবাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু সত্য থাকিতে পারে; তাই বলিয়া কোনো একটি কারণকেই এই জটিল জাতিভেদের কারণ বলিতে গেলে সত্য বলা হইবে না। যে-সব উপায়ে বর্ণ গঠিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদাহরণ সমেত প্রদত্ত হইতেছে।

বর্ণভেদ কর্মগত

(১) অনেক আদিম জাতি বা উপজাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই প্রথা ভারতের ইতিহাসের গোড়া হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেক উপজাতি রাজা হইয়া রাজন্য হইয়াছেন; এ উদাহরণের জন্য আমাদিগকে বাংলার বাহিরে যাইতে হইবে না। কোচবিহারের রাজবংশীরা ও ত্রিপুরাবাসীরা এক্ষণে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করেন। ছোটনাগপুরের ভূমিজেরা এখন একটি পৃথক বর্ণ। অনার্য্য আচার ব্যবহারের সঙ্গে হিন্দু রীতিনীতি তাহারা অবলম্বন করিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের আহীর, ডোম, দোষাদ, বোম্বাইএর কোলী, মহর ও মারাঠা, বাংলার বাগ্দি, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, পোদ,

উপজাতির বর্ণভেদ

রাজবংশী কোচ, মান্দ্রাজের মাল, নায়ার, বেল্লাল ও পারিয়াগণ হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; প্রাচীনকালে ইহাদের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সকলে এক জাতীয় তাহা নহে। ভারতের আদিম জাতির মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত গুণবান্‌দিগকে অথবা স্থানীয় পুরোহিত-গণকে আর্য্যেরা ব্রাহ্মণ করিয়া লইতেন। পৌরবাদি বংশ হইতে এক একটি শাখাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লইবার উদাহরণ পুরাণে পাওয়া যায়। উত্তরভারতের সুন্দর আকৃতি ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণকায় খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণ এক জাতির নহে। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণকে অনেকে পারসিক বংশজাত বলিয়া অনুমান করেন। মণিপুরের ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ঔরসে মণিপুর রমণীর গর্ভজাত। এইরূপ নানা উপজাতির মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ সংগৃীত হইয়াছিল এবং এখনো হইতেছে। বর্তমানে নমশূদ্রেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন বৈষ্ণব পাচশ লোককে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন বলিয়া কাগজে পড়া গেল। নানা উপজাতি ও বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছে।

উপজীবিকাগত বর্ণভেদ।

নানা প্রকার পেশা বা জীবিকা অনুসরণ বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির একটি কারণ। পূর্বে যে চারি বর্ণ ছিল তাহা এক্ষণে রূপান্তরিত হইয়াছে; কর্মগত বিভাগ হইতে জন্মগত বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণেরই কোনো না কোনো বিশেষ কর্ম আছে। অনেক সময়ে এই পৈতৃক কর্মত্যাগের ফলে নূতন উপবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আহীর গোরক্ষক, চামার ও মুচি চর্মের কাজ করে, চুহাড়, দোষাদ, ডোম পরিচ্ছন্নতার কাজ করে, কায়স্থ কেরাণীর কাজ করে; গোয়ালা দুধ বেচে, কৈবর্ত ও কেওরাৎ মাছ ধরে ও চাষ করে; এইরূপ, ধোপা নাপিত, কামার, কুমার, সোণার বা স্বর্ণকার, গোঁড়,

তেলি, তিলি সকলেরই বিশেষ কোনো কাজ তাহাদের জাত ব্যবসায়। কিন্তু জাত ব্যবসায় যে সকলেই করে তাহা নহে; প্রাচীনকালে দ্রোণ যুদ্ধকার্য্য ও বিদুর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; জনক উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেন ও পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তখনো যে সকলেই নিজ নিজ জাত-ব্যবসায় করিতেন এমন নহে। বিহারের আহীরদের শতকরা ৮০ জন কৃষিকার্য্য করে; বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের শতকরা ১৭ ও বিহারের ৮ জনের পৌরহিত্য জাতব্যবসায়; চামারদের শতকরা ৮ জন চামড়া করে; অবশিষ্টেরা কেহ ইট তৈয়ারী করে, কেহ মজুরী করে। তাঁতি, কামারদের মধ্যেও এইরূপ।

কর্মান্তর গ্রহণে নূতন বর্ণ

এইসব বর্ণের মধ্যে অনেক সময়ে কর্মান্তর গ্রহণের জন্য নূতন বর্ণ সৃষ্ট হয়। বাংলার সদ্গোপেরা গোয়ালাদের হইতে পৃথক্ হইয়া সদ্গোপ নাম লইয়াছে। শিক্ষিত কৈবর্ত ও পোদগণ অশিক্ষিতদের হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিতেছে; মাহিষ্যবর্ণ নূতন দেখা দিয়াছে। মধু-নাপিতেরা জাত-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য কর্মে লিপ্ত বলিয়া তাহারা এক্ষণে পৃথক বর্ণে পরিগণিত। চাষা-ধোপারা ধোপা হইতে পৃথক্। বাংলাদেশ হইতেই এই কয়টী উদাহরণ; ভারতবর্ষে কর্মান্তর গ্রহণের জন্য এইরূপ জাতি বরাবর গঠিত হইয়া আসিতেছে। এইখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে ভারতের এক অংশের বর্ণ বা উপবর্ণের সম্মান বা মর্য্যাদার সহিত অন্য প্রদেশের মিল দেখা যায় না।

সম্প্রদায়গত ভেদ

(৩) ভারতের কতকগুলি ধর্মসম্প্রদায় পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের মধ্যেও সাধারণ হিন্দুসমাজের ন্যায় উপবর্ণ, শ্রেণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি দেখা যায়। বাংলাদেশের বৈষ্ণব, বোম্বাই অঞ্চলের লিঙ্গায়েৎ ও উড়িষ্যার

সারক সম্প্রদায় এই শ্রেণীর বর্ণ-ভেদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দাক্ষিণাত্যে পূর্বে যাহারা জৈনধর্মাবলম্বী ছিল এক্ষণে তাহারা আপনাদের মধ্যেই বিবাহাদি সম্পন্ন করে। বোম্বাইয়ের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় দ্বাদশ শতাব্দীতে জাতিভেদ ও ব্রহ্মণ্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের ভিতর ব্রাহ্মণাদি ভাগ হইয়াছে এবং তাহারা বীরশৈব-ব্রাহ্মণ, বীরশৈব-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতেছে।

দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যেও এই শ্রেণীর জাতিভেদ দৃষ্ট হয়। কোঙ্কনের রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সমাজ বাম্বণ (ব্রাহ্মণ), ছরোদ (ছত্রিয়) সুদির (শূদ্র), রেণ্ডার, গবিদ, মোদ্বল (ধোপা), কুম্বার, কাফির (মজুর) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। সীরিয়ান খৃষ্টানদের মধ্যে, জাতিভেদ খুবই বদ্ধমূল, তাহাদের উপজাতির মধ্যে বিবাহাদি হয় না বলিলেই চলে।

(৪) হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ব্যতীত সকল জাতিই বর্ণ-সঙ্কর; এইখানে আমরা সেই বর্ণ-সঙ্কর জাতির কথা বলিব না। গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে এখানকার সামাজিক জীবনও অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে। উড়িয়্যার সাগরদিপেশা নামক এক সঙ্কর বর্ণ আছে। ইহারা উচ্চবর্ণের ওড়িয়া ও বাঙ্গালী কায়স্থের ঔরসে ওড়িয়া-দাসীদের গর্ভজাত সন্তান। ইহারা নিজ নিজ পিতার জাতি অনুসারে বিভক্ত, এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে না। ইহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৫০ হাজার হইবে। এ-ছাড়া মধ্য-প্রদেশের বিদুর, মালাবারের ছক্কিয়ার, বোম্বাইয়ের ভিলাল, বরোদার গোলা, আসামের বোরিয়া জাত বর্ণ-সঙ্কর। বোরিয়ারা বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গর্ভজাত। ভারতবর্ষের ফিরিঙ্গিরা বর্ণ-সঙ্কর; তাহাদের সহিত খাঁটি য়ুরোপীয়দের সম্বন্ধ নাই বলিলেই

সঙ্কর জাতি

হয়। ব্রহ্মদেশে বহু ভারতপ্রবাসী হিন্দু ও মুসলমান গিয়া বিবাহাদি করিতেছে; সেখানেও বর্ণ-সঙ্কর জাতি সৃষ্ট হইতেছে। আসামের চা-বাগিচার কুলীদের মধ্যে, আন্দামানের কয়েদীদের মধ্যেও এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের ফলে সঙ্কর বর্ণ সৃষ্ট হইতেছে।

(৫) ভারতের ইতিহাসে যে সব জাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে জাতীয়তা-বোধ এখনো সুস্পষ্ট। এই শ্রেণীর 'নেশনে'র সংখ্যা ভারতে কম। নেপালে নেবারগণ এককালে রাজা ছিল। ইহাদের মধ্যে দেবভজ্জগণ ব্রাহ্মণ; সূর্য্যবংশী মালেরা রাজবংশীয়; শ্রেষ্ঠগণ মন্ত্রী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; জপুরা কৃষক। ইহাদের নীচে অন্যান্য অনেক বর্ণ আছে। নেবারদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ সামাজিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ের মারাঠাদের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখা যায়; সেই বোধ সমগ্র জাতিকে একটি পৃথক্ সমষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

নেশনগত বর্ণ

(৬) স্থান পরিবর্তনে নূতন বর্ণ সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। যদি কোনো বর্ণের লোক নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোনো প্রদেশে গিয়া বাস করিতে থাকে, তবে দুই এক পুরুষের মধ্যেই তাহাদের পৃথক্ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সমাজের চোখের সামনে না থাকিলে তাহারা আহার ও পাকস্পর্শাদি সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সাবধানতা রক্ষা করিয়াছে তাহার কোনো প্রমাণ নাই; এই জন্য পুত্র কন্যার বিবাহের সময়ে প্রচুর অর্থ লাগে। কিন্তু বর্তমানে রেল হওয়াতে বিবাহাদি ক্রিয়া কর্মের সময়ে দেশে গিয়া সমাজের সহিত যোগরক্ষা করা সম্ভব ও সুলভ হইয়াছে। প্রাচীনকালে স্থান পরিবর্তনের ফলে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, তিরহুতিয়া, জৌনপুরী, কনৌজিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বর্ণের মধ্যে ভেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। মালাবারের নামবুদ্রি ব্রাহ্মণ-

স্থান-পরিবর্তনে বর্ণভেদ

গণকে দেখিলে আর্য্য বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাহাদের অন্যান্য আচার অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মণের ন্যায় আদৌ নহে। নামবুদ্রি ব্রাহ্মণেরা তাহাদের কন্যার বিবাহ অল্প বয়সে দেয় না। বহুবিবাহ তাহাদের মধ্যেই খুবই প্রচলিত; জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতীত অপর কাহারও বিবাহ জাতির মধ্যে হয় না। অন্যান্য ছেলেরা নায়ার রমণীদের পতিরূপে থাকে। নায়ারদের মধ্যে বহু-স্বামী বিবাহপ্রথা বিদ্যমান ছিল এবং এখনো পূর্বোক্ত প্রথা ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে।

(৭) স্থান পরিবর্ত্তনে যেমন নূতন বর্ণ সৃষ্ট হয় তেমনি কোনো লৌকিক আচার ত্যাগ করিলে নূতন বর্ণ উদ্ভূত হয়। শাস্ত্রানুসারে যাহারা ক্রিয়া কর্ম্ম করে না তাহারা ব্রাত্য। ইতিহাসে বরাবরই ব্রাত্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়; ব্রাত্যদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষা নিন্দনীয়।

আচার পরিবর্ত্তনে জাতিভেদ

উত্তর-পশ্চিমের 'বাভন' জাতি এককালে ব্রাহ্মণ ছিল, কৃষিকার্য্য গ্রহণ করায় তাহাদের পতন হয়। মোঙ্গলীয় রাজবংশী কোচেরা বলে যে পরশুরামের ভয়ে তাহারা পলাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাহাদের পতন হয়। উগ্রক্ষত্রিয়েরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। বাংলার কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন, তারপর তাঁহাদের পতন হয় ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের সহিত ক্রিয়াদি বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বেরারের বনজারী, মাদ্রাসের বল্লুবন, জাতাপু, মধ্যপ্রদেশের চিতারী, বোম্বাইয়ের নাদোর, প্রভৃতি বর্ণ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। বিধবা-বিবাহ দিয়া একদল লোক সমাজে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলার পীরআলি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা বোধ হয় এইরূপ কোনো আচার ত্যাগ করায় এক্ষণে পৃথক বর্ণ রূপে পরিগণিত হয়।

বর্ণের মধ্যে যেমন সাত প্রকারের ভেদ দেখা গেল, উপবর্ণের মধ্যেও তেমনি পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে। ভারতের নানা স্থানে একই

কর্মের জন্য নানা বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। ধোপার প্রয়োজন সব দেশেই ছিল এবং প্রত্যেক স্থানেই একদল লোক এই কাজ আরম্ভ করে ও তাহাদের কাজ ক্রমে বংশগত হইয়া দাঁড়ায় ; কিন্তু একস্থানের ধোপার সহিত অন্য স্থানের ধোপার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ধোপা বলিলেই যে ভারতের যাবতীয় ধোপা বুঝায় এবং তাহাদের উৎপত্তি এক স্থান বা এক ঋষি হইতে হইয়াছে তাহা নহে। মগধিয়া, তিরহুতিয়া, আউধিয়া, বাঙ্গালী ধোপা সবই পৃথক। প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেকটি বর্ণ সম্বন্ধেই এই কথা কিঞ্চিদধিক খাটে।

বর্ণ বা জাতি ছিল জাতীয় জীবনের মর্মস্থল। ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা সমস্তই 'জাতে'র মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষার ভার যেমন সমাজের হাতে ছিল—শাসনের ভার সমাজ নিজ হাতে রাখিয়া ছিল, রাজপুরুষের হস্তে তাহা তুলিয়া দেয় নাই। প্রত্যেক বর্ণের বা উপবর্ণের নিজ নিজ পঞ্চায়েৎ আছে। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মধ্যে পঞ্চায়েৎ প্রথা নাই ; সমাজপতি ও বয়োজ্যেষ্ঠেরা যাহা করেন তাহাই সকলে মানিয়া চলে। অন্যান্য বর্ণের মধ্যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা প্রভূত, পঞ্চায়েৎ অপরাধীর শাস্তি বিধান করে, দুর্নীতি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে ও আচার রীতিনীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করে।

সমাজ শাসন

বর্তমানে ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণই আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ও অন্য সকলেই শূদ্র, ইহা হইতেছে লৌকিক মত। ইহা মানিতে লোক এখন রাজি নহে। বাংলাদেশের কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচারিত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতেছেন, ক্ষত্রিয়দের ন্যায় একাদশ দিন কালাশৌচ মানিতেছেন। নমশূদ্রেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া লিখাইতেছে, চাষী-কৈবর্ত মাহিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছে, আসামের হাড়িরা বৃত্তিয়াল

বেণিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। বহু জাতি আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এই সকল 'জাতে ওঠা'র জন্ত বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কয়েকজন ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিদ মুদ্রা দিলেই ব্যবস্থা সহজে মিলিত। ক্রমে এই প্রথার এমনি ব্যভিচার ঘটিতে লাগিল যে কাশীর পণ্ডিতগণ অবশেষে বাংলার পণ্ডিতদের এইরূপ ব্যবহারে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ প্রত্যর্পণ ও ব্যবস্থা উঠাইয়া লইতে বাধ্য করিলেন। এই 'জাতে ওঠা'র চেষ্টা ভারতের সর্বত্র চলিতেছে। পূর্ব পূর্ব আদমসুমারীর প্রতিবেদনে স্থানীয় রীতি অনুসারে উচ্চনীচক্রমে বর্ণের নামের তালিকা ছাপা হইত। গত ১৯১১ সালের আদমসুমারী গ্রহণের সময়ে পূর্বের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া চারিদিক হইতে আবেদন আসিতে থাকে; সকলেরই প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে 'তাহারা' জাতে বড়। এই আবেদনের ওজন হইতেছিল দেড় মণ! নীচু হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টা সর্বত্র সমভাবে চলিতেছে; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইতে এত সময় লাগিতেছে যে যাহারা নীচে পড়িয়া আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছে তাহাদের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন। সেইজন্য দাক্ষিণাত্যের অব্রাহ্মণ বর্ণসমূহ মরিয়া হইয়া ব্রাহ্মণদের শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছে।

সকল বর্ণের মধ্যে জাতে উঠার চেষ্টা।

মান্দ্রাজ ও বঙ্গে হিন্দুসমাজের মধ্যে দুইটি মাত্র বর্ণ আছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। বাংলাদেশে যে ব্রাহ্মণ নয় সেই শূদ্র, এইরূপ ধারণা প্রাচীনদের মধ্যে চলিত। কিন্তু মান্দ্রাজের উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে যে-প্রকার ভেদ এখনো বিদ্যমান ভারতের আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না। সেখানকার ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণ কাহারও হাতে কিছু আহার করেন না। পঞ্চম বা অন্ত্যজেরা ব্রাহ্মণের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; বহুদূর হইতে ব্রাহ্মণকে দেখিলেই তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়া যাইতে হয়

সমাজে কোন বর্ণের কিরূপ অবস্থা তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বর্তমানে ইংরাজী শিক্ষার ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফলে এই সকল অন্ত্যজ জাতির মধ্যে আত্মশক্তি প্রকাশ পাইতেছে। নীচবর্ণের উচ্চে উঠিবার প্রথম ধাপ হইতেছে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধে উচ্চ বর্ণের প্রথা মানিয়া চলা, বাল্য-বিবাহ প্রবর্তন, বিধবা-বিবাহ সমর্থন না করা। উচ্চবর্ণের অনুকরণে নিম্নবর্ণের মধ্যেও কুলীন প্রথা, শ্রেণী-বিভাগ, উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি ভেদও প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমানে সমস্ত বর্ণ উপবর্ণের মধ্যে আপনাকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। সকলেই ব্রাহ্মণের শক্তিকে হ্রাস করিতে ব্যস্ত; মান্দ্রাজে কোথায়ও কোথায়ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্রিয়া কর্ম করিবার প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদের নিম্নস্থ বর্ণ যখন মাথা তুলিতে চায় তখন তাহারাই উঁহাদের সব চেয়ে বড় শত্রু হয়; এই পরস্পর পরস্পরকে নীচে রাখিয়া নিজে বড় হইবার ইচ্ছা প্রত্যেক বর্ণ ও উপবর্ণের মধ্যে এত অধিক যে তাহাতে কাহারও উন্নতি পূর্ণ-মাত্রায় হইতেছে না।

ইংরাজ আগমনের পর শিক্ষা-বিস্তার, রেল ও বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের গোঁড়ামী অনেকটা ফিকে হইয়া আসিয়াছে। উপ-বর্ণের মধ্যে ভেদ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; রাঢ়ী বারেন্দ্রের ভেদ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; এবং পাটেলের সর্ব বর্ণের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ হইবার প্রস্তাব উপস্থাপিত ও সমর্থিত হইবার মত সাহস যে হিন্দু-সমাজের ভিতর হইয়াছে তাহার কারণ সে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করিতে ইচ্ছুক এবং সেইজন্যই আজ গৌরের বিবাহ সম্বন্ধে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতে পারিয়াছে।

৩। বাংলার সমাজ

বাংলাদেশের সাড়েচার কোটি লোকের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান। অর্দ্ধেকের কম হিন্দু; কারণ বাঙালী-মুসলমান ছাড়া ছাড়া বাঙালী-খৃষ্টান, বাঙালী-বৌদ্ধ আছে। এ ছাড়া আদিম জাতির লোক আছে। এখানে আমরা হিন্দু বা বাঙালী হিন্দুদের সামাজিক অবস্থাই আলোচনা করিব।

হিন্দুসমাজে নানাপ্রকার স্তর ও ভেদ সৃষ্ট হইয়াছে; তাহা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও গভীরভাবে সমাজের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্ত আমরা প্রবাদগত বর্ণ বিশ্লেষণকে অনুসরণ করিয়াছি; যদিও আমরা কাহারও একচেটিয়া শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করি না।

বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা শতকরা ৬ জন মাত্র। ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতের যাবতীয় ব্রাহ্মণজাতিকে প্রথমত দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) পঞ্চগৌড় ও (২) পঞ্চদ্রাবিড়।

পঞ্চগৌড় বলিতে বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত দেশ বুঝাইত। সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় ও উৎকল এই পাঁচটি জনপদের নাম অনুসারে পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণদের নামকরণ হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের (বা গৌড়ের) ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রধানত এই কয়টি শ্রেণী দৃষ্ট হয়—(১) সপ্তশতী, (২) রাঢ়ী, (৩) বারেন্দ্র, (৪) মধ্য-শ্রেণী, (৫) বৈদিক, (৬) গ্রহবিপ্র, (৭) পীরালি। বঙ্গ, উড়িষ্যা, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রদেশের ব্রাহ্মণগণের আকৃতি প্রকৃতি আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণের মত যে আদৌ নহে তাহা দেখিলে বুঝা যায়—মাপ

করিয়াও পণ্ডিতেরা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিকে শূদ্র আখ্যা দিয়া থাকেন; অধিকাংশের আকৃতি কিন্তু তাহাদেরই অনুরূপ। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, মৈথিলি ব্রাহ্মণ, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও বঙ্গদেশের রাঢ়ী বারেন্দ্র ও বৈদিকদের মধ্যে আকারগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই ভেদ প্রবাদ ও ইতিহাস-সম্মত।

কান্যকুব্জ হইতে প্রবাদগত পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের পূর্বে এখানে যে সকল ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাহারাই সপ্তশতী নামে পরিচিত। এক সময়ে সমাজে ইঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল; সমাজের নেতা ইঁহারাই ছিলেন। পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনে তাঁহাদের প্রভাব হ্রাস হইয়া যায়, এবং বিদ্যা ও শিক্ষার অভাবে ক্রমে তাঁহারা সমাজে হেয় হইয়া পড়েন। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে কতক রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন—কতক ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া বাস করিয়াছেন—কতক নিকৃষ্ট জাতির পৌরহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন—কতক অগ্রদানী ও ভাট হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে অতি অল্পসংখ্যক সপ্তশতী ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বংশধরে বাংলাদেশ ছাইয়া ফেলিল—অথচ সপ্তশতীর কোনো চিহ্ন নাই! এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন ইহাদের অধিকাংশই মিশিয়া গিয়াছে।

সপ্তশতী

কিম্বদন্তী আছে আদিশূরের সময়ে পঞ্চব্রাহ্মণ পশ্চিমদেশ হইতে বাংলাদেশে আগমন করিয়াছিলেন; কালক্রমে তাঁহাদের ৫৬টি সন্তান জন্মিল। সেই সন্তানগণের অধস্তন সন্ততিমধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ ঘটিলে, কতকগুলি সুহ্মগঙ্গ প্রদেশে বা রাঢ়দেশে বাস করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বরেন্দ্র-ভূমে অর্থাৎ পদ্মা-নদীর নিকটবর্তী দেশে

বসতি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র শব্দে নির্দেশ করা যায়। তাঁহাদের সন্তানগণই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত।

পঞ্চব্রাহ্মণগণ সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। এদেশে আসিয়াও তাঁহারা পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। এদেশীয় ব্রাহ্মণীদের গর্ভজাত সন্তানগণ বারেন্দ্র ভূমে বাস করেএইরূপ কিম্বদন্তী আছে।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র

এই আদি পুরুষগণের নাম—ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ এবং ছান্দড়। ইঁহাদের গোত্র যথাক্রমে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়েই উপরোক্ত পঞ্চগোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং ইঁহারা সকলেই আদি পঞ্চব্রাহ্মণকে তাঁহাদের আদি পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি বা কোনো প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। বর্তমানে এই বাধা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া আসিতেছে।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বলিলেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ভেদ শেষ হইল না। মহারাজ বল্লাল সেন আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখিয়া পঞ্চ-গোত্র হইতে ৩৩ জন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিয়া দেন।

বল্লালের কৌলিন্য

অবশিষ্ট শ্রোত্রীয় বলিয়া খ্যাত। ইঁহারা বংশ হিসাবে উচ্চ এই অভিমানে অকুলীনের সহিত ক্রিয়াকলাপ করেন না। ক্রমে কুলীনগণ আচার ভ্রষ্ট হইতে থাকিলেন কুলাচার্য্যগণ এই কৌলীন্য বজায় রাখিবার জন্য অতি কঠোর নিয়ম চালাইয়াছিলেন। তাঁহারা ২৫টি দোষে কুলহানি হইবে বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু তাহা দেশকাল অবস্থার উপযোগী হয় নাই। ইতিমধ্যে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দু-দিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং বাঁধাবাঁধির প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রসিদ্ধ কুলচার্য্য বন্দ্যঘাটিয় দেবীবর মিশ্রের অভ্যুদয় হয়। ইনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা সবিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলেন। তিনি

দেখিলেন সমাজে সে প্রভাব, সে কুলানুরাগ কিছুই নাই ; কুলীনগণেরও সম্পূর্ণ অধঃপতন হইয়াছে—অধিকাংশই নবগুণবিহীন হইয়াছিলেন। দেবীবর দোষ দেখিয়া এক এক প্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন ; তদনুসারে এক একটি 'মেল' হইল। এইরূপে সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশ মেলে বিভক্ত করিলেন। নানাদোষের একত্র মিলনহেতু মেলের উৎপত্তি। প্রকৃতি, উপাধি, দোষ ও গ্রাম এই চারি প্রকার হইতে বিভিন্ন মেলের নামকরণ হইয়াছে। ১৪০২ শকে মেলবন্ধন প্রচারিত হয়। এই মেলকাণ্ড লইয়া রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাদের লইয়া মেল তাঁহারাই মেলী ; তদ্ভিন্ন যেসকল কুলীন মেলের মধ্যে আসেন নাই, তাঁহারা ঘটকদিগের নিগ্রহে ও ঔদাসীন্যে বংশজ দলভুক্ত হইলেন। মেলবন্ধন করিয়া দেবীবর ক্ষান্ত হন নাই, এই মেলের মধ্যে আবার ভাগ, ভাব ও যূথ এই তিন প্রকার শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি পূর্বোক্ত ৩৬ মেলের মধ্যে খড়দহ মেলে ৫টি ভাগ আছে—যেমন যজ্ঞেশ্বরী, গঙ্গানন্দী, বৈদ্যনাথী, হড়সিদ্ধান্তী ও হরিমিশ্রী। এইসকল ভাগ বিভাগ অনেক সময়েই সামাজিক দলাদলি হইতে উৎপন্ন হইত।

দেবীবরের ছত্রিশ মেল

দেবীবরের মেল-প্রচলনের পর সর্বদ্বারী বিবাহ বন্ধ হওয়ায় ক্রমেই পাত্রাভাব ঘটিতে লাগিল। প্রকৃতি ও পালটীর সংখ্যা নিতান্ত কম থাকায় ক্রমে ক্রমে ঘর পাওয়া দায় হইল। মেল-ভুক্ত কোন কোন কুলীনকন্যার চিরদিনের জন্য বিবাহের পথে কাঁটা পড়িল। দেবীবর ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে মেল প্রচার করেন। প্রথম প্রথম সমাজের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হয় নাই ; যতই দিন যাইতে লাগিল, নানা ভাগ, নানা থাক, নানা ভাবের উৎপত্তি হইল। শতাধিক বর্ষের মধ্যে সমাজে

কৌলীন্যের ব্যভিচার

নানাপ্রকার পাপ প্রবেশ করিল; নুলাপঞ্চানন নামক জনৈক কুলাচার্য্য তৎকালীন সমাজের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়াছেন; তিনি স্বয়ং সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। ক্রমে কুলীনদের সমাজ ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল; বর্ত্তমানে ইংরাজী সভ্যতায় কৌলীন্য-প্রভাব অনেকটা হ্রাস হওয়ায় কুলীন বা স্বকৃতভঙ্গের পূর্ব্ববৎ সম্মান নাই, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও যশোহর জেলায় কালীপুর লক্ষ্মীপাশা, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে, বাখরগঞ্জের কলসকাঠিতে এবং ফরিদপুরে খালিয়া, আমগ্রাম, কালামৃকা প্রভৃতি স্থান গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় বা চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক জনের ৫০।৬০টি বিবাহ দেখা যাইত। অনেক কুলীনের তাঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা পত্নী বিদ্যমান; কোথাও বা চারি মাসের কন্যা ৬০।৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের করে অর্পিত হইত। অনেক পত্নীর হয়ত' বিবাহ-বাসরের পর পতিমুখ দর্শন ঘটিত না। আবার ঐসকল কুলীনের ঘরে বহুসংখ্যক প্রৌঢ়া কন্যার বিবাহ হইত না।

কৌলীন্যের কঠোরতার জন্য মেয়ে পাওয়া দায় হইয়া উঠিল; পূর্ব্ববঙ্গে নদীতে নৌকা ভরিয়া একশ্রেণীর মেয়ে গ্রামে গ্রামে আনা হইত; তাহারা নানাজাতির মধ্য হইতে অনেক সময়ে সংগৃহীত হইত। তাহাদিগকে ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া বিবাহ দেওয়া হইত। ইহাদের মধ্যে কখনো কখনো মুসলমান কন্যা থাকিত। এই 'ভরার মেয়ে'রা সমাজে চলিয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে দূরের পরিচয়ের সংবাদাদি লওয়া যাইত না বলিয়া এরূপ হইত।

ভরার মেয়ে

সমাজের এইপ্রকার অবস্থা হইলে নীতি ও জাতি কি প্রকারে বিশুদ্ধ থাকে তাহা বলা বড় কঠিন।

যাঁহারা কুলীন নহেন তাঁহাদিগকে শ্রোত্রীয় বলে।

ব্রাহ্মণগণই সমাজের শীর্ষ স্থানে অধিরূঢ়; তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের অবস্থা ও ইতিহাস বিশদরূপে বিবরণ করিলাম। ইহা হইতে হিন্দুসমাজের অবস্থা যে কি শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

পঞ্চব্রাহ্মণদিগের আগমনের পর পশ্চিম দেশ হইতে যেসকল বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক নামে অভিহিত। পূর্ববঙ্গে শিক্ষা-সম্মানে ইঁহাদের স্থান উচ্চে। রাঢ়ীদের সহিত বিবাহ আহারাদি হয় না। ইঁহাদের অপর শাখা দাক্ষিণাত্য বৈদিক; বঙ্গদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে ইঁহাদের বাস; সম্ভবত তাঁহারা দ্রাবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ।

বৈদিক ব্রাহ্মণ

রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই—তাঁহারা সমাজে হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহারা রাঢ় ও বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কৈবর্তপ্রধান মেদিনীপুর অঞ্চলে এবং মল্লপ্রভৃতি জাতির আবাসভূমি বাঁকুড়া অঞ্চলে গমন করেন। তাঁহারা উৎকল, দাক্ষিণাত্য, বৈদিক ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়েন; এজন্য তাঁহারা সমাজে একটী পৃথক্ শ্রেণীরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

মধ্য শ্রেণী

গ্রহবিপ্রগণ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ। বর্ণব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, গ্রহাচার্য্য ও মহাব্রাহ্মণ সমাজে খুবই নিম্নস্থান অধিকার করেন। ইঁহাদের জাতি কর্মগত। তাহাদের স্পৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় উচ্চ বর্ণের কেহ স্পর্শ করিবে না। নীচ জাতির পৌরহিত্য করার অপরাধে একদল ব্রাহ্মণ পৃথক্। ইহাদিগক বর্ণব্রাহ্মণ বলে। শ্মশানে যাহারা থাকে তাহাদিগকে মহাব্রাহ্মণ বলে।

গ্রহবিপ্র

এইসকল ব্রাহ্মণ ব্যতীত বঙ্গদেশে আরও অনেক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

আছে, যথা—মৈথিলী, জিঝোতিয়া, মাথুরী, উৎকল প্রভৃতি। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

পীরালি ব্রাহ্মণ

বঙ্গদেশের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার পীরালি ব্রাহ্মণ। ইহাদের সহিত আর কাহাদের সামাজিক ক্রিয়া হয় না। খুলনা যশোহরেও পীরালি আছে। কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১১।১২ ভাগ আছে। বাংলাদেশে দুই কোটি দুই লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ মাত্র ১৩ লক্ষ ৯ হাজার। ১৯১১ সাল হইতে ১৯২১এর মধ্যে শতকরা ৪·৪ হারে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিষ্ঠাবান বা গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিকেই শূদ্র বলেন। শূদ্র কথার অর্থ দাস; এইজন্য অনেক জাতি শিক্ষা পাইয়া

অব্রাহ্মণ

আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া উল্লেখিত হইলে অপমানিত বোধ করেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ সৎশূদ্র ও প্রকৃত শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, বর্ণসঙ্কর নহেন। কায়স্থ সমেত বঙ্গীয় শূদ্রগণকে সামান্যত চারি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা যায়। ১—সৎশূদ্র, ২—জল আচরণীয়, ৩—জল অচলনীয়, ৪—অস্পৃশ্য।

কায়স্থ জাতিকে সৎশূদ্র কহে। ইহাদিগের পুরোহিত এক। বসু, মিত্র, গুহ উপাধি ব্যতীত অন্যান্য উপাধিগুলি প্রায় সাধারণ।

সৎশূদ্র

গোত্রও অনেক স্থলে সমান। আচার ব্যবহার পরস্পর অনুরূপ। ইহারা পুরোহিতের গোত্র অনুসারে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক পুরোহিতের গোত্র পরিবর্তনের উপায় নাই।

যে-সকল জাতির জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন না, তাহাদিগকে জল-আচরণীয় শূদ্র বলা

জল আচরনীয় শূদ্র

হয়। [কায়স্থ, গন্ধবণিক, কাঁশারী, শাঁখারী, উগ্র, রাজপুত, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, চাষী-

কৈবর্ত, মাগধ, গোয়ালা, নাপিত, মোদক, বারুই, সূতার, মালাকর, তাম্বুলী, তিলি]।

যে-সকল শূদ্রকে স্পর্শ করিলে বর্ণ চতুষ্টয়ের উচ্চ জাতিরা আপনা-দিগকে অশুচি জ্ঞান করেন এবং তৎস্পৃষ্ট জলও অপবিত্র জ্ঞান করেন, তাহাদিগকেই জল-অব্যবহার্য্য (জল অ-চলনীয়) শূদ্র কহা হয়। [তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণ-বণিক, আভির, তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক, নাট, শাবর শেখর, জালিক]।

জল অব্যবহার্য্য

যে-সকল ব্যক্তির সংস্পর্শাক্রান্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং যাহাদিগের সংস্পর্শ মাত্রে অপবিত্রতা জন্মে, তাহারাই অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে পরিগণিত। বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান হইয়া গিয়াছে; বাংলাদেশে অর্দ্ধেকের উপরে লোক মুসলমান, তাহার কারণ যে হিন্দুসমাজের এই নিম্নতম স্তরের লোক উক্ত ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। বর্তমানে ইহারাই অধিক পরিমানে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেছে।

অস্পৃশ্য

বঙ্গদেশস্থ যেসকল লোক আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা প্রধানত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) উত্তররাঢ়ী, (২) দক্ষিণরাঢ়ী, (৩) বঙ্গজ, (৪) বারেন্দ্র। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে পঞ্চব্রাহ্মণের ভৃত্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন না। ইহারা বল্লালের কৌলীন্য স্বীকার করেন না। বাঙালী-কায়স্থদের অপেক্ষা হিন্দুস্থানের কায়স্থগণের সম্মান অধিক। উত্তররাঢ়ের কায়স্থগণকে শেষোক্ত কায়স্থদের অংশ বলিয়া মনে হয়। কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং হিন্দুস্থানের কায়স্থদের ন্যায় উপবীতাদি ধারণ করিয়া সমাজে উঠিতে ইচ্ছুক।

কায়স্থ

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ কান্যকুব্জ হইতে আগত কায়স্থদের বংশধর বলিয়া প্রবাদ। ইহাদের মধ্যে মৌলিক ও বাহাত্তুরে কায়স্থেরা বঙ্গদেশের প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া অনেকে মনে করেন।

উক্ত চারি শ্রেণী কায়স্থদের মধ্যে বিবাহাদি হয় না, ব্রাহ্মণদের ন্যায় ইহাদের মধ্যে কুলীন ও মৌলিক এই দুই শ্রেণী আছে। ১৯০১ সাল হইতে ১৯১১ এর মধ্যে কায়স্থদের সংখ্যা শতকরা ৮½ হারে ও ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ১৬·৫ হারে বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ তথাকথিত 'নীচ' জাতের মধ্যে উপরে উঠিবার যে চেষ্টা দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে অনেকে কায়স্থ হইয়াছে। ঢাকা-বিভাগে ২৯ হাজার শূদ্র গত আদমসুমারীর সময়ে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লিখাইয়াছিল। চট্টগ্রামে ঐ বৎসরে প্রায় ৪৮ হাজার কায়স্থের বৃদ্ধি, প্রায় নয় হাজার শূদ্রের কমতি দেখা যায়।

বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড় এই লইয়া বহুকাল হইতে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সে বিবাদের মীমাংসা কোনো কালে হইবে না। বৈদ্যগণের উপাধি গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, দেব, ধর, কর, নন্দী, রক্ষিত, চন্দ্র, কুণ্ড, রাজ, সোম, আদিত্য, ইন্দ্র ইত্যাদি। ইহার অধিকাংশই কায়স্থ ও নবশাখদের মধ্যে প্রচলিত উপাধি।

বৈদ্য

তাহাদের মধ্যে যে-সকল গোত্র আছে, কায়স্থদিগের মধ্যেও সেই সকল গোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈদ্যগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং তাহাদিগকে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত। ইহারা বেদধ্যায়ী, ধর্মনিষ্ঠ ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন এবং রাজনীতিকুশল কায়স্থ অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এবং কায়স্থ এক জাতি বলিয়া বোধ হয়; বৃত্তি অনুসারে পরে দুইটি ভিন্ন জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতবর্ষের অন্য কুত্রাপি বৈদ্য বলিয়া কোনো পৃথক জাতি দেখা যায়

না। সুতরাং বাংলাদেশেই যে অপূর্ব বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হইল, ইহা কিরূপে অনুমান করা যাইতে পারে ? কায়স্থের সহিত উপাধি ও গোত্রের মিল আছে একথা পূর্বেই বলিয়াছি। পূর্ববাংলায় কায়স্থ এবং বৈদ্যের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাপি আছে। বৈদ্যদের মধ্যে দুই শ্রেণী হইয়া গিয়াছে—পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ। ইহাদের মধ্যে বিবাহাদি হয় না, বা কোনো প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই। বর্তমানে সামান্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু অতি ক্ষীণ। বৈদ্যের সংখ্যা লক্ষাধিক। ৯.৩ হারে বাড়িয়াছে।

নবশাখদের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। এইখানে তাহাদের কয়েকটি শাখাজাতির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বাংলা, বিহার-উড়িষ্যায় বারুইএর সংখ্যা তিন লক্ষের কিছু বেশী। ইহাদের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, নাথান ও কোটা প্রভৃতি শ্রেণী আছে।

বারুই

পৃথক্ শ্রেণীতে বিবাহাদি কুটুম্বিতা হয় না। বন্ধুতা-নিবন্ধন আহারাদি চলে। বাংলার বারুইদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্র আছে। ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, গৌতম, আলম্যান, মৌদ্গাল্য, ব্যাস, বিষ্ণু, চন্দ্রঋষি, জৈমিনি প্রভৃতি।

বারুইদিগের মধ্যে বিশ্বাস, চৌধুরী, দাস, দে, দত্ত, কর, ধর, সেন, পাল, রক্ষিত, নন্দী, মিত্র, গুহ, নাগ, মণ্ডল, মল্লিক, লাহা, মান্না, খাঁ, চাঁদ, নন্দন, রুদ্র, ভদ্র, ভৌমিক, সরকার, মজুমদার, হালদার, কুণ্ডু, দাস, হোড়, আশ, বড়ণ প্রভৃতি উপাধি আছে। ইহারা তাম্বুলী জাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। গত ৪০ বৎসরে ইহাদের সংখ্যা শতকরা কেবলমাত্র ৭½ হারে বাড়িয়াছে।

মোদক বা ময়রা

মোদকদের মধ্যে রাঢ়াশ্রম, ময়ূরাশ্রম, অজাশ্রম, ধর্মাশ্রম, দোপট্টি, একপট্টি প্রভৃতি শ্রেণী আছে। বাংলাদেশে ১ লক্ষ ২১ হাজার ময়রা আছে; ইহাদের সংখ্যা কুড়ি বৎসরে ৫.১ হারে কমিয়াছে।

বাংলার কাঁসারিদের মধ্যে সপ্তশ্রেণী, মামুদাবাদী, মাওতা, মাইতি প্রভৃতি শ্রেণী আছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহ একরূপ হয় না।

কাঁসারি

গন্ধবণিকদের মধ্যে শঙ্খাশ্রম, ছত্রিশাশ্রম, দেশাশ্রম, এবং আউতাশ্রম প্রভৃতি ত্রিশটি শ্রেণী আছে। কেবল বঙ্গদেশেই ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার। পরস্পরের ভিতর বিবাহাদি বিষয়ে কোনো কোনো জেলায় নিয়ম কঠোর। ইহাদের সংখ্যা দশ বৎসরে শতকরা ১৮·৮ হারে বাড়িয়াছে।

গন্ধ বণিক

শাঁখারীরা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের শাখা মাত্র। কর্মগত পার্থক্যহেতু পৃথক্ জাত হইয়াছে। বিক্রমপুর, ঢাকা অঞ্চলেই শাঁখারী জাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহাদের মধ্যে চারিটি ভাগ আছে; কিন্তু বিবাহ ও আহারাদি চলে।

শাঁখারী

নবশাখ জাতির মধ্যে মালী জাতি চিরকালই স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম ও বংশবৃদ্ধি না হইয়া ক্রমে লোপ হইতেছে। ইহারা ক্রমাগত একস্থানে বসিয়া কার্য্য করে, বিবাহাদি নিতান্ত বাল্যকালে দিয়া থাকে; দারিদ্র্য, মূর্খতা, জড়তা এই জাতির অনুন্নতি, পতন ও ক্ষয়ের মূল। ইহাদের মধ্যে ফুলমালী ও দোকানী মালী প্রভৃতি শ্রেণী আছে।

মালাকার বা মালি

বঙ্গদেশেই তেলিদের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার। এই জাতি নবশাখের তৃতীয় সংখ্যায় পরিগণিত হইয়াছে; কিন্তু সংখ্যানুসারে নবশাখের কেহই ন্যূনমর্য্যাদা বা বহুমর্য্যাদা নহেন—সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ইহাদের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ আছে যথা—একাদশ তেলী, দ্বাদশ তেলী, তুঁষকোটা, তাক্‌ফেরা, সপ্তগ্রামী, স্বর্ণগ্রামী, বেতনাই, মেচো ও নিরামিষ প্রভৃতি। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েন না

তেলি বা তিলি

বা তত্তুপলক্ষেও অন্নগ্রহণ করেন না। সামাজিক একতা নাই বলিলেই চলে।

বঙ্গদেশের তাঁতিগণের মধ্যে আশ্বিনী, বলরামী, বঙ্গ, বারেন্দ্র প্রভৃতি ১১।১২০টি থাক আছে। প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক সম্প্রদায়। ১৯২১ বাংলাদেশে প্রায় ৩ লক্ষ ১৯ হাজার তাঁতি ছিল। প্রায় ৪০ বৎসরে ইহারা শতকরা ৭ হারের কম বাড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় এজাতিও ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন।

তাঁতি

বাংলাদেশে প্রায় তিনলক্ষ কুম্ভকার আছে। ইহারা প্রতিমা-নির্মাণ ও মনুষ্যাদির রূপ-নির্মাণে বিলক্ষণ পটু। হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি প্রস্তুত ইহাদের জাতীয় বৃত্তি। মুর্শিদাবাদ ও হুগলী জেলায় ইহাদিগের মধ্যে দুইটি শ্রেণী, যশোহরে চারিটি, পাবনায় পাঁচটি, ঢাকায় প্রায় পাঁচটি ভাগ আছে। এইরূপ প্রত্যেক জেলাতেই নানা শ্রেণী আছে।

কুম্ভকার

বাংলাদেশে প্রায় ৩ লক্ষ ১২ হাজার কর্মকারের বাস। লোহার, পিতলের, তামার কাজে এককালে ইহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইহারা রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সাতগেঁয়ে ও সোণার গেঁয়ে ভেদে চারি প্রকার। পাবনা অঞ্চলে রাঢ়ীদের দশটি সমাজ ও বারেন্দ্রদিগের পাঁচটি সমাজ আছে। জেলার ভিতরে ভিতরে অসংখ্য ভাগ বিভাগ আছে।

কর্মকার

নরসুন্দর জাতি—ইহাদের সংখ্যা বাংলাদেশে প্রায় ৪½ লক্ষ। বাংলাদেশেই ইহাদের মধ্যে ১৬টি ভাগ। অধিকাংশ ভাগ স্থানানুসারে হইয়াছিল। উচ্চ শ্রেণীর নাপিতে নীচ বর্ণের লোকের পরিচর্য্যা করে না। মৈমনসিংহ ও মুর্শিদাবাদ ব্যতীত আর কোথায়ও জাতিতে জাতিতে বিবাহাদি হয় না। নদীয়া ও

নাপিত

রংপুরে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাপিতে বিবাহ হয়, কিন্তু মেদিনীপুরে তাহা নিষিদ্ধ। উচ্চ বর্ণের নাপিত নিম্ন বর্ণে কন্যা সম্প্রদান করিলে তাহার পতন হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মৈমনসিংহ ব্যতীত আর কোথায়ও আহারাদি একত্র চলে না। বীরভূম ও বাঁকুড়াতে এক হুঁকায় তামাক খায় এবং অন্ন ছাড়া অন্য খাদ্য আহার করে। প্রত্যেক শাখায় নিজ নিজ পঞ্চায়েৎ আছে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণজন্য মস্তকমুণ্ডন করেন; যে নাপিতের নিকট প্রথম মুণ্ডিত হয়েন তাহার নাম মধু নাপিত। মধু নাপিত মহাপ্রভুর মস্তক স্পর্শ করিয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবান বিবেচনা করে। চৈতন্যদেবের নির্দেশমত সে জাতিগত ব্যবসায় ছাড়িয়া মোদকের কার্য্য করে। বর্তমানে ইহাদের মধ্যেই চারিটা ভাগ হইয়াছে। মধু ও জাতি শ্রেণীরা সমাজে বড়; বিশ্বাস ও রেলাতি ছোট। পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষেধ, মেদিনীপুরে এ সম্বন্ধে নিয়ম তেমন কঠোর নয়। নীচ শাখার কেহ উপরের শাখা উঠিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কৌলীন্য আছে; মৌলিককে কুলীনের সহিত বিবাহের জন্য অনেক অর্থ দিতে হয়।

সদ্গোপ—ইহারা নবশাখের অন্তর্গত। নবশাখদের মধ্যে ইহাদের ছাড়া কৃষি আর কাহারও জাতিগত ব্যবসায় নয়। বাঙালী সদ্গোপ প্রায় ছয় লক্ষের কাছাকাছি। সদ্গোপজাতি দুইভাগে বিভক্ত, পূর্বকুল ও পশ্চিমকুল। হুগলীর উভয় তীরে বাস করিবার জন্য এই নাম হইয়াছে। পশ্চিমকুলরা কৌলীন্যপ্রথা স্বীকার করে নাই। বীরভূমে অন্তর্বিবাহ নাই; বর্দ্ধমানে আজকাল বিবাহ প্রচলিত হইতেছে। এই জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক হইয়াছেন; নাড়াজোলের রাজারা এই জাতীয়।

নবশাখদের নীচেই জলচলনীয় দুইটি জাতি আছে যথা—কৈবর্ত ও

গোয়ালা। চাষী-কৈবর্তের সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। বাংলাদেশের কৈবর্তগণ আপনাদের জাতীয় উৎকর্ষ স্থাপনের জন্য অধুনা ব্যগ্র হইয়াছেন, এবং আপনাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কৈবর্তের জল কোনো কোনো স্থলে ব্যবহার আছে—কিন্তু কৈবর্তের পুরোহিতের জল অনাচমনীয়। ইহাদের মধ্যে আদি, চাষী ও জালিয়া এই তিনটি শ্রেণী আছে।

জলচরণীয় জাতি

বল্লালসেনের কৃপায় চাষীদের সম্মান অধিক। আদি, চাষী, জালিয়া তিনটি শাখা রাঢ়ী, বারেন্দ্রে বিভক্ত; কাহারও সহিত কাহার বিবাহাদি সম্বন্ধ হয় না। প্রত্যেকেই আপনি প্রধান। জেলে-কৈবর্তদের জল অচল। ইহারা আপনাদিগকে মালো শব্দে নির্দেশ করে। ঢাকা ও মৈমনসিংহ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে পরাশর দাস নামে একপ্রকার কৈবর্ত আছে। চাষী কৈবর্তদের মধ্যে উচ্চবর্ণের অনুকরণে কৌলীন্য প্রথা প্রবেশলাভ করিয়াছে। মৌলিকগণের সহিত বিবাহ হয়—তবে তাহা অর্থের জন্য। কোনো এক শাখার লোক অন্য কোনো শাখায় প্রবেশ করিতে পারে না। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পঞ্চায়েৎ আছে। ইহাদের মধ্যে গোত্র উচ্চবর্ণের ন্যায়ই। এককালে বাংলাদেশের কোথায়ও কোথায়ও কৈবর্ত রাজা ছিল।

বাংলায় গোয়ালাদিগের সংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ—বিহার উড়িষ্যায় প্রায় ৩৩ লক্ষ। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত শ্রেণী আছে—যথা পল্লব গোপ, গৌড় গোপ, মধু গোপ, আহীর গোপ, মাগধী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বাগাড়ি, ভোগ প্রভৃতি ১৬টি ভাগ আছে। বিহার ছোটনাগপুরে প্রায় ২০টি ভাগ আছে। তাহাদের মধ্যে ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্র আছে।

গোপ

এইসকল শাখা-জাতির স্থান ও সম্মান সকল জেলায় সমান নহে।

গোপদিগের মধ্যে যাহারা গরু দাগে, তাহাদিগকে ভোগা-গোয়ালা বলে; তাহাদিগের জল অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য। দধি, দুগ্ধাদিসম্ভূত গব্য বা মাহিষ্য দ্রব্য প্রস্তুতকরণ ও গোরক্ষণ ইহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়। গোয়ালাদিগের জল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রচলিত করেন।

উপরোক্ত দুই জাতির নীচে কতকগুলি জল-অব্যবহার্য্য জাতি আছে। বৈষ্ণব, ভুঁইয়া, নাথ, জুগী, কাচরু, মুরী, শারাক, শুঁড়ি, স্বুবর্ণবণিক, স্বর্ণকার, সূর্য্যবংশী, সূত্রধর। এই সকল জাতির জল সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। গ্রামের নাপিত ইহাদিগকে কামাইবে বটে, কিন্তু পায়ের নখ কাটিবে না।

জল অচলনীয় জাতি

বৈষ্ণব ও যুগী এই দুইটি জাত এক সময়ে ধর্মসম্প্রদায় ছিল। যুগী-দের মধ্যে পূর্বে অনেকে সদাচারী যোগী ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ তাহাদের সমাজভুক্ত ছিলেন। বর্তমান নেড়ানেড়ীদিগের ন্যায় 'যুগী'রা ধর্মকর্মে জলাঞ্জলি দিয়া নানাবিধ অসদাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অনেক নীচ জাতীয় নারীও তাহাদের দলে প্রবিষ্ট হয়। এইজন্য তাহারা সমাজে হেয়। এক্ষণে বস্ত্রবয়নই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২০টি ভাগ আছে। আন্তর্বিবাহ নাই। বাংলাদেশে সাড়ে তিন লক্ষের উপর যুগী আছে। কিছুকাল হইতে ইহাদের মধ্যে নূতন আন্দোলন স্বুরু হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক হইতেছে।

স্বর্ণবণিক—ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

উপরোক্ত জাতিদের নীচে ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে কতকগুলি জাতি আছে। যথা—বাগ্দী, চুনারী, ভাস্কর, ধোপা, চাষা-ধোপা, কলু, কাপালী, মাহো (কালো), নমঃশূদ্র, পাটনী, পোদ, রাজবংশী, তিপরা প্রভৃতি কতকগুলি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাংলাদেশে নমঃশূদ্রের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ভাগ আছে। কিন্তু অনেকগুলির মধ্যে বিবাহাদি হয়। বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে উন্নতি করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে। ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ নমঃশূদ্র বলিয়া আখ্যাত করিতেছে। পূর্ববাংলার নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ নমঃশূদ্র ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ধোপা বলিলে আমাদের মনে হয় একটি জাতি—কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২০টি ভাগ আছে। চাষা-ধোপাদের মধ্যেই পুনরায় উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই তিনটি ভাগ আছে। দুই একটি স্থান ও শাখা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্বিবাহ নাই। বঙ্গদেশেই প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার ধোপার বাস।

পাটনী—ইহাদের মধ্যে ১০।১১ ভাগ আছে; আন্তর্বিবাহ নাই; এক শাখার লোক অন্যশাখায় প্রবেশ; লাভ করিতে পারে না।

পোদ—বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথায়ও নাই ইহাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। ইহাদের মধ্যেও উচ্চবর্ণের ন্যায় ভাগবিভাগ প্রবেশ করিয়াছে। পাঁচটি শাখার মধ্যে আন্তর্বিবাহ নাই।

অস্পৃশ্য জাতি

নিম্নলিখিত অস্পৃশ্য জাতির ধোপা, নাপিত বা ব্রাহ্মণ নাই। যথা বাউরী, চামার, ডোম, গারো, হাড়ি, কোনাই, কোড়া, লোধা, মাল, মুচি, শিয়ালগির। ইহাদের মধ্যে ডোম ও হাড়িই সর্বনিকৃষ্ট। কিন্তু অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বীরভূমে ইহাদের অবস্থা ভাল। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় ধর্মপূজা ডোমদের মধ্যে আছে।

বাংলা বিহারে ছয় লক্ষের উপর বাউরীর বাস। ইহাদের মধ্যে ১০।১১টি শ্রেণী আছে। বর্দ্ধমান, হুগলী, বীরভূমে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষেধ; নদীয়া, ফরিদপুরে আন্তর্বিবাহ করিলে ভোজ দিতে

হয়। বাঁকুড়াতে অবাধে বিবাহ চলে। বাঁকুড়া ছাড়া আর কোথায় কোনো এক শাখার লোক আরএক শাখায় প্রবেশ করিতে পারে না।

চামার—বঙ্গ ও বিহারে ১১ লক্ষের উপর চামার আছে—ইহারা অস্পৃশ্য। ইহাদের মধ্যে ২৫টি শাখা আছে। আন্তর্বিবাহ নিষেধ।

ডোম—বঙ্গ ও বিহারে প্রায় শওয়া চারি লক্ষ ডোম বাস করে। আঁকুড়িয়া, বিশদেলিয়া, বাজানীয়া ও মঘাইয়া এই চারিটি প্রধান ভাগ। ইহাদের মধ্যে প্রায় ২৮টি শাখা জাতি আছে। তাহার অনেকগুলিই কর্মগত। দুই একটি স্থানের দুই একটি শাখা ব্যতীত পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি নাই। আহারাদি বিষয়ে উচ্চনীচ ভেদ যথেষ্ট আছে। এক শাখা হইতে অপর শাখায় প্রবেশলাভ করা যায় না। প্রত্যেকের পৃথক্ পঞ্চায়েৎ আছে।

হাড়ি—বাংলাদেশেই ৫ শ্রেণীর হাড়ি আছে। ইহাদের জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৭৪ হাজার। অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহাদের শাখা জাতিদের ভিতর আন্তর্বিবাহ হয় না, কেহ কাহারও অন্ন গ্রহণ করে না। প্রত্যেকের নিজ নিজ পঞ্চায়েৎ আছে।

মাল—১০ লক্ষ সংখ্যা। ইহাদের মধ্যে আটটি শ্রেণী আছে। বীরভূম ও বাঁকুড়াতে কয়েকটি শাখার মধ্যে বিবাহাদি হয়। অন্যত্র হয় না।

বাগ্দি—ইহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষের উপর। পশ্চিমবঙ্গেই ইহাদের বাস। ক্ষেত্রী, কুসমেতিয়া, তেঁতুলিয়া, ত্রয়োদাস, লোদা প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। বিভিন্ন স্থানে বাস, বিভিন্ন বৃত্তি অনুসরণে ইহাদের ভেদ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি সম্বন্ধে নিয়মাদি উচ্চবর্ণের অনুরূপ। ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য জাতি, শাখাজাতি আছে। তাহাদের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা বাংলাদেশের সমাজের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে চিত্রিত করিলাম; বঙ্গের বাহিরে বিহার-উড়িষ্যা

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ সর্বত্রই অবস্থা অনুরূপ। স্তরে স্তরে জাতি জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে এবং একই স্তরেই অসংখ্য ফাট লাগিয়াছে। এক কোঠা হইতে আরএক কোঠায় যাইবার কোনো উপায় নাই; কাহারও কোনো দিকে নড়িবার সাধ্য নাই।

আমাদের দেশের এই সকল জাতি-পরিচালনের ভার পঞ্চায়েতের উপর। প্রত্যেক জাতি ও শাখাজাতির পঞ্চায়েৎ লোকশাসন করেন। অনেক সময়ে রাজারা অনেক জাতিকে উচ্চ বা নীচে বসাইয়া দিয়াছেন।

পঞ্চায়েৎ

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে পঞ্চায়েৎ নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বা সমাজপতি সমাজ শাসন করেন। পঞ্চায়েৎ সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আপনার ক্ষমতা বিস্তার করেন, যেমন অপাংক্তেয়ের সহিত ভোজন, পবিত্র জন্তু যেমন গোহত্যা, পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহার, নীচ জাতীয় কর্ম অনুসরণ, সমাজের ভদ্রতা না মানা, ধর্মানুযায়ী কার্য্য না করিলে তাহার বিচার প্রভৃতি সকল সামাজিক ব্যভিচার পঞ্চায়েৎ মীমাংসা করেন। ইহাদের সাধারণ শাস্তি হইতেছে হুকা বন্ধ, ধোপানাপিত বন্ধ, ব্রাহ্মণপুরোহিত বন্ধ, গৃহে ভোজন ত্যাগ, বিবহাদি ক্রিয়াকর্মে সম্বন্ধ না রাখা—জরিমানা ও সেই অর্থ দিয়া সমাজ খাওয়ান ইত্যাদি।

বর্তমানে ব্রাহ্মণেতর প্রায় সকল জাতিই আপনার শ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদনে ব্যস্ত। পূর্বে যে স্তর নির্ণয় করিয়াছি, বর্তমানে তাহা ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা সর্বত্র দৃষ্ট হয়। কায়স্থগণ আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, উপবীত ধারণ, একাদশ দিন কালাশৌচ প্রভৃতি অনুসরণ করিতেছেন। চণ্ডালেরা নমঃশূদ্র ও পরে নমঃশূদ্র-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। চাষী কৈবর্তেরা মাহিষ্য, আসামের হাড়িরা বৃত্তিয়াল বেণিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। অনেক জাতি আপনাকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এই সকল 'জাতে ওঠা'র জন্য বিশেষ কষ্ট

পাইতে হইত না; কয়েকজন ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিলেই ব্যবস্থা পাওয়া যাইত। কাশীর পণ্ডিতগণ এই প্রকার ব্যবস্থাদান সম্বন্ধে খুব কড়াক্কড়ি করিয়াছেন; অনেককে তাঁহাদের ব্যবস্থা উঠাইয়া লইতে হইয়াছে—অনেককে টাকা ফেরত দিতেও হইয়াছে। 'জাতে' উঠিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের সর্বত্র চলিতেছে। গত আদমসুমারীর সময়ে কোন্ জাত কাহার উপর ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য চারিদিক হইতে আবেদন উপস্থিত হইতে লাগিল; সেই আবেদন পত্রগুলির ওজন দেড় মণের উপর! নীচ হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টা নিয়ত চলিতেছে—কিন্তু সে-চেষ্টা এত ধীরে ধীরে ফলবতী হইতেছে যে যাহারা নীচে পড়িয়া আছে তাহাদের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব।

নিম্নশ্রেণীর জাগরণ

ভারতবর্ষের জাতিভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় নীচ বর্ণের জাতিবিভাগ উচ্চ বর্ণের অনুরূপ। উপরের ন্যায় তাহাদের মধ্যেও ভৌগলিক ভাগ, কর্মগত ভাগ, কৌলীন্যের ভাগ—এইরূপ অসংখ্য ভেদ সমাজকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা হিন্দুজাতির সামাজিক অবস্থা কিরূপ তাহার আভাস দিবার জন্য বঙ্গদেশের জাতিভেদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছি। বঙ্গের বাহিরেও হিন্দুজাতি এমনি বিচ্ছিন্ন; অধিকাংশ স্থলে বাংলার অপেক্ষা ভীষণ। সমাজের অবস্থা কি তাহা আমরা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণজাতির উদাহরণ লইয়া নিম্নে অতি সংক্ষেপে সামাজিক ভেদের উল্লেখমাত্র করিয়া যাইব। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও উচ্চ বর্ণের আদর্শানুযায়ী অগণিত ভাগ, বিভাগ হইয়াছে। হিন্দুসমাজে ২৪৫৩টি বর্ণ ও উপবর্ণ আছে; তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ

দেশীয় কুলপঞ্জিকার বা সোশিওলজিষ্টদের মতে ব্রাহ্মণজাতি দশ

ভাগে বিভক্ত, যথা পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়। কিন্তু বর্তমানে পঞ্চগৌড় বা পঞ্চদ্রাবিড় বহুশত ভাগে বিভক্ত।

পঞ্চগৌড় ১১টি ভাগে বিভক্ত; যথা—

পঞ্চগৌড়

১। সারস্বত ব্রাহ্মণ। পঞ্জাবের সারস্বতগণ স্থানভেদে চারি ভাগে বিভক্ত; অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের মধ্যে বিবাহাদি হয় না। (১) লাহোর অমৃতসহর প্রভৃতি জেলার (ক) উচ্চ শ্রেণী ৫০ ভাগ (খ) নিম্ন শ্রেণী ১৭১টি ভাগ। (২) কাংড়ার সারস্বত (ক) উচ্চ শ্রেণী ১২ ভাগ (খ) নিম্ন শ্রেণী ২২ ভাগ। (৩) কর্তারপুর হোসিয়ারপুরের সারস্বতগণ (ক) উচ্চ শ্রেণী ৯ ভাগ (খ) নিম্ন শ্রেণী ৪৭ ভাগ। (৪) জম্মু প্রভৃতির সারস্বত (ক) উচ্চ শ্রেণী ১১ ভাগ (খ) নিম্ন শ্রেণী ১৪৪ ভাগ।

এতদ্ব্যতীত ভোজক, মণ্ডল, প্রভৃতি ৮টি শাখা আছে, যাহাদের স্থান নির্ণয় করা কঠিন।

সিন্ধুর সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে।

২। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ—ইহারা ভৌগলিক কারণে ভারতের অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাদের মধ্যে ২১৬টি উপাধি আছে।

৩। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ—ইহাদের মধ্যে অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ। (১) মিশ্র কান্যকুব্জ—অযোধ্যাতেই ইহাদের মধ্যে ৪০টি শাখা আছে। (২) শুক্ল ব্রাহ্মণ—২৬টি শাখা আছে। (৩) তিবারী বা তেওয়ারী, ৩৮টি শাখা আছে। (৪) দোবে—২২টি শাখা। (৫) পাঠক—৫টি শাখা। (৬) পাণ্ডে—১৬টি শাখা। (৭) উপাধ্যায়—১০টি শাখা। (৮) চোবে—৮টি শাখা। (৯) দীক্ষিত—৭টি শাখা। (১০) লক্ষ্ণৌ বাজপেয়ী (১১) সরযূপারী (১২) উপরি উক্তগুলি ব্যতীত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা মধ্যে আছে।

৪। গৌড় ব্রাহ্মণ—(১) কেবল-গৌড়, হরিদ্বারের নিকট বাস। (২) আদিগৌড়, (৩) শুকলবাল আদিগৌড়, (৪) ওঝা, (৫) সনাধ্য, (৬) চিংগল, (৭) দায়মিয়, (৮) খণ্ডেলবান, (৯) শ্রীগৌড়, (১০) তম্বোলি, (১১) আদিশ্রীগৌড়, (১২) গুর্জর গৌড় (১৩) ডেকবাড়া গৌড়, (১৪) চমার গৌড়, (১৫) হরিয়ান, (১৬) কির্তাঙ্গ, (১৭) স্থকুল।

৫। রাজপুত ব্রাহ্মণ—শ্রীমালী, সচোদি, পল্লিবান প্রভৃতি ২৭টি ভাগ।

৬। মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ—ইহাদের মধ্যে ৮৬টি ভাগ আছে। তবে (১) মালবী, (২) নারবাদী, (৩) রাঙ্গাগী, (৪) বাগদী; ইহারাই প্রধান শ্রেণী।

৭। মৈথিলী ব্রাহ্মণ—ওঝা, ঠাকুর, মিশ্র, স্থর, শ্রোত্রিয়, ভুইহার প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণী আছে।

৮। নেপালী ব্রাহ্মণ—ইহাদের মধ্যে ৯৫টি শ্রেণী আছে।

৯। বাঙালী ব্রাহ্মণ—(১) রাঢ়ী—কুলীন, ভঙ্গ কুলীন, (২) বারেন্দ্র, (৩) সপ্তশতী, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বৈদিক, (৬) অগ্রদানী, (৭) বর্ণ ব্রাহ্মণ, (৮) পীরালি। ফুলে, খড়দা, বল্লভী, সর্বানন্দী, পণ্ডিতরত্নী ও বংশজ, শ্রোত্রীয় প্রভৃতি অশেষবিধ ভাগ আছে।

১০। আসামী ব্রাহ্মণ—ইহারা পৃথক। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের কোনো কার্য্য হয় না।

১১। ওড়িয়া ব্রাহ্মণ—(১) শাসনী, ইহাদের মধ্যে ১২টি উপবর্ণ আছে; (২) শ্রোত্রিয়—৪টি উপবর্ণ আছে। (৩) পণ্ড, ২টি উপবর্ণ, (৪) ঘাটিয়া, (৫) মহাস্থান, (৬) কলিঙ্গ ব্রাহ্মণ।

এইবার আমরা পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণের অবস্থা সংক্ষেপে নির্দেশ করিব। পঞ্চদ্রাবিড় ১২টি ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) মহারাষ্ট্রীয়

ব্রাহ্মণ—দেশস্থ, কোঙ্কনস্থ, করহাড়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন প্রধান; ইহাদের মধ্যে আহারাদি সম্বন্ধে নিয়ম নিষেধ নাই; বিবাহাদি সম্বন্ধে বাধাও ভাঙ্গিয়া আসিতেছে।

পঞ্চদ্রাবিড়

ইহাদের মধ্যে ৩০০র উপর উপাধি আছে। বিশিষ্ট পাঁচটি ছাড়া আরও ২৮টি শ্রেণী ইহাদের মধ্যে আছে। (২) আন্ধ্র ব্রাহ্মণ বা তেলেগু দেশের ব্রাহ্মণঅধিবাসীরা বর্ণশালু, কমবুকুল প্রভৃতি ১৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত। (৩) দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বা তামিলদেশীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক শাখানুসারে বিভক্ত। ইহারা অতিশয় গোঁড়া। শূদ্রদের প্রতি এখানকার ও দক্ষিণের ব্রাহ্মণদের অত্যাচার প্রবাদগত। (৪) কর্ণাটক ব্রাহ্মণ—ইহাদের মধ্যেও কয়েকটি ভাগ আছে। এখানকার অধিকাংশ লোকই লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। লিঙ্গায়েৎগণ জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান; বর্তমানে তাহাদের মধ্যে সবই পুনরায় প্রবেশ করিয়াছে। (৫) কোঙ্কনী ব্রাহ্মণ—ইহারা কোঙ্কনস্থ হইতে পৃথক্। (৬) হবু ব্রাহ্মণ, (৭) গোকর্ণ, (৮) হৈজ, (৯) তুলব (তুলু), (১০) কাবেরী ব্রাহ্মণ (১১) নাম্বুরী ব্রাহ্মণ। ইহা ছাড়া পোটি, মুত্তঙ্গ প্রভৃতি তিন চারিটি ক্ষুদ্র শাখা আছে। (১২) গুর্জর ব্রাহ্মণ। গুজরাটের ব্রাহ্মণেরাও খুব গোঁড়া। ইহাদের মধ্যে ১৬০টি ভাগ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তর্বিবাহ নাই।

ব্রাহ্মণদের এই অতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে পাঠকগণ বুঝিবেন হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ। বৈদিক যুগে চারি বর্ণ ছিল;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। পরেও দেখিয়াছি পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। এখন বহুশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে সমাজ ছিন্ন ভিন্ন। অন্যান্য বর্ণেরও অবস্থা অবিকল ব্রাহ্মণদেরই অনুরূপ।

৪। ব্রাহ্মসমাজ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ভারতের যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় আবির্ভূত হন।

রাজা রামমোহন রায় উদার ধর্মালোচনার জন্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'আত্মীয়-সভা' নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের সংস্কারক বলিয়া পূর্ব হইতে তাঁহার খ্যাতি কিছু পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার উদার শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এই সভার সভ্য হইয়া রাজার সহিত আন্তরিক সহানুভূতি করিতে লাগিলেন। এই সভ্যদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীশঙ্কর ঘোষাল ও নন্দকিশোর বসু।

আত্মীয় সভা স্থাপন

এই সভায় হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত এবং কলিকাতার বিখ্যাত ওস্তাদ গোবিন্দলাল রাজার রচিত গান গাহিয়া শুনাইতেন। ইহা ব্যতীত রাজা নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দ্বারা এই সভাকে লোকের চিত্তাকর্ষক করিতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেই 'আত্মীয়-সভা' কোনো কারণে বন্ধ হইয়া যায়।

এই সময়ে রাজা The Precepts of Jesus নামক গ্রন্থে (Trinity) খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার করায় শ্রীরামপুর মিশনারীদিগের সহিত তাঁহার কিছুকাল ধরিয়া তর্কযুদ্ধ হয়। মিঃ এডাম বলিয়া এক-ব্যক্তি রাজার প্রভাবে ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী দলভুক্ত (unitarian) হইলেন। ইহারফলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল।

অপরদিকে রাজা তাঁহাকে লইয়া ১৮২১ খৃষ্টাব্দে Unitarian Mission নাম দিয়া একটি সভা স্থাপন করিলেন। মিঃ এডাম এই সভায় ব্রহ্মোপাসনা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। কিছুকাল ইহার কার্য্য বেশ চলিয়াছিল। ক্রমশ ইহার শ্রোতা ও উৎসাহীদল কমিয়া আসিতে লাগিল। রাজাও বুঝিতে পারিতেছিলেন ইহা তেমন ফলপ্রদ হইবে না। মিঃ এডাম এর সহিতও তাঁহার মতদ্বৈধ ঘটিতে লাগিল।

একেশ্বরবাদীগণের সভা Unitarian Mission

এইরূপ শুনাযায় যে একদিন রাজা Unitarian সভা হইতে ফিরিতেছেন তাঁহার সঙ্গে দুই শিষ্য ছিলেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের মতের অনুরূপ একটি সভা না থাকার জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে Unitarian সভায় যাইতে হয়। রাজার মনে তাঁহাদের কথাগুলি লাগিল এবং তখন হইতে নূতন করিয়া একটি সভা স্থাপনের সঙ্কল্প তাঁহার মনে লাগিল।

একটি বৃহৎ সভায় রাজা বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পরামর্শে ও উৎসাহে অসাম্প্রদায়িকভাবে এক-ঈশ্বরের পূজার জন্য একটি সভা স্থাপন করিবেন স্থির করিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট (৬ই ভাদ্র) একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ব্রহ্ম-সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

ব্রহ্ম-সভা

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এই সভা বসিত। প্রথমে বেদপাঠ হইত, ইহাতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই যোগ দিতে পারিত না। তাহার পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নামে রাজার এক বন্ধু উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। সর্বশেষে রাজার উপদেশ পাঠ করা হইত।

ক্রমশ বহুলোক ইহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর্গের সাহায্যে চিৎপুর রোড়ে রাজা এই সভার জন্য

একটি বৃহৎ বাটী ক্রয় করিলেন এবং ২৩এ জানুয়ারী (১১ই মাঘ) প্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই কয়েকজন ট্রাষ্টির হস্তে সমাজ চালনার ভার দিয়া তিনি ইয়োরোপ যাত্রা করিলেন। সেই হইতে ১১ই মাঘ বা মাঘোৎসবের আরম্ভ।

ব্রহ্মমন্দির

তিনি চলিয়া যাওয়ার পর কিছুকাল ধরিয়া তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় অপর ট্রাষ্টিগণের সাহায্যে সমাজের কার্য্য একরূপ চালাইয়াছিলেন। ক্রমশই তাঁহাদের উৎসাহ কমিয়া আসিতে লাগিল। শিশু অবস্থায়ই রাজার প্রতিষ্ঠিত সমাজ লুপ্তপ্রায় হইল। একমাত্র বৃদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশের অধ্যবসায়ে সমাজের কার্য্য কখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্রকৃত-ভাবে ইহার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন তখনই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার কার্য্য উপযুক্ত পাত্রে পড়িয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবসর গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব হইতেই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে "তত্ত্ব-বোধিনী সভা" স্থাপন করিয়া উদার শাস্ত্রা-লোচনা ও ধর্মালোচনার আয়োজন করিয়াছিলেন। 'তত্ত্ব-বোধনী পত্রিকা'য় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ এই সভার সভ্যগণ নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতেন। ক্রমশ স্বভাবতই এই সভা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক সাহায্যের ভার লইলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভার' কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে গিয়া ইহার দুরবস্থা লক্ষ্য করিলেন। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চালাইতে-ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস ও উৎসাহ তেমন ছিল না। তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিক ছিলেন। সভায় যোগদান

তত্ত্ব-বোধিনী সভা

করিবার নিমিত্ত কোনরূপ বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্র না থাকায় কেবল কৌতুহলপরবশ হইয়া অনেকে ইহার কার্য্যে যোগ দিতেন।

সমাজের কার্য্য-প্রণালীও দেবেন্দ্রনাথের মনকে তেমন স্পর্শ করিল না। অব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ বেদ পাঠ করিতে পারিবে না এইসকল নিয়ম তাঁহার ভাল লাগিল না।

প্রথমেই তিনি সভ্যদিগের জন্য একটী প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিলেন এবং সমাজের কার্য্যের জন্য একটী উপাসনা-প্রণালী গঠন করিলেন। পূর্ব্বের বেদ ও উপনিষদ্ পাঠের পরিবর্ত্তে এই উপাসনা-প্রণালীর প্রচলন হইল। ১৮৪৩ সালে ডিসেম্বর মাসে (৭ই পৌষ) আরও ২০ জন যুবকের সহিত দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহার পর হইতেই সমাজের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য তাঁহার সকল চেষ্টা নিয়োজিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান

সমাজের মধ্যে আবার নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য দূরদেশসমূহে উৎসাহী ব্যক্তিগণ প্রেরিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ রাজার রচিত পুস্তকাদি পুনর্বার মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ব্রাহ্মসমাজের মত ব্রাহ্মগণ লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহে কলিকাতার বাহিরে নানাস্থানে বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও উপনিষদাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত বহু তর্কবিতর্কের পর তিনি বুঝিলেন বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বেদাদি বর্জন না করিয়া উপনিষদ্ ও অন্যান্যগ্রন্থ হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক কয়েকটী শ্লোক সঙ্কলন করিয়া তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত করিলেন ও ব্রাহ্মধর্মের

বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ

মূল মত 'ব্রাহ্মধর্ম বীজে'র মধ্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। এই সময় হইতে পূর্বের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম' নাম পরিবর্তিত হইয়া কেবল 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম প্রচলিত হইল।

কেশবের ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিংশতি বৎসরের যুবক কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগদান করিলেন। উপযুক্ত সহযোগী পাইয়া মহর্ষির উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

কেশবচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান্ বক্তা অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার বক্তৃতায় অনেকে আকৃষ্ট হইতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কেশব কর্মত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজের কার্য্যে আপনার শক্তি নিযুক্ত করিলে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বহুল-পরিমাণে চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

কেশব তাঁহার কতিপয় অন্তরঙ্গ ধর্মবন্ধু লইয়া একটী মণ্ডলী রচনা করিলেন। এই মণ্ডলীতে নানারূপ পাঠ ও আলোচনার মধ্যে তাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থসকল পাঠ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্মের প্রভাব এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল।

সমাজে খৃষ্টীয় প্রভাব

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহের সময় প্রচলিত হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতির পরিবর্তে পৌত্তলিক অংশটুকু বাদ দিয়া ব্রাহ্ম মতানুযায়ী একটী অনুষ্ঠান পদ্ধতি সঙ্কলন করিলেন ও সেই অনুসারে কন্যার বিবাহ দিলেন। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজকে একটী ধর্মমণ্ডলী বলিয়াই লোক জানিত, এখন হইতে সমাজ-সংস্কার কার্য্যও ইহার একটী প্রধান অঙ্গ হইল। এই বৎসরেই বহু আলোচনার পর দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' নামে এক পুস্তিকা বাহির করিলেন; সেই সময় হইতে ব্রাহ্মদিগের সকল প্রকার অনুষ্ঠান ইহার অনুযায়ী হইল।

অনুষ্ঠান পদ্ধতি

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি কেশবকে 'প্রধান আচার্য্য' পদে বরণ করিয়া তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ইহার পূর্বে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন জাতি আচার্য্যপদ লাভ করিতে পারিত না। মহর্ষির এই কার্য্য কিন্তু সমাজের সকল প্রবীণ ব্যক্তি অনুমোদন করিলেন না। অপর দিকে নব্যদল ইহাতে খুবই উৎসাহিত হইলেন। এই অব্রাহ্মণ আচার্য্য হওয়া লইয়া ক্রমশ দুইটী দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত সমাজ-সংস্কার লইয়াও প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে বিবাদের লক্ষণ দেখা দিল।

অব্রাহ্মণ আচার্য্য

নব্যদল বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ, বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া আন্দোলন তুলিলেন এবং প্রকৃতই এইরূপ কতিপয় বিবাহ দিলেন। এতদূর অগ্রসর হওয়া মহর্ষিরও মনোমত ছিল না; তিনি ইহাতে মর্মাহত হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিকে আচার্য্যের পদ দান করা সম্বন্ধে মহর্ষির মত একেবারে স্থির হইয়া যায় নাই। নব্যদল যখন উৎসাহের সহিত অব্রাহ্মণদিগকে উপাচার্য্যের পদ দান করিলেন, তখন মহর্ষি তাহা অনুমোদন করিতে পারিলেন না। এই লইয়া বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল।

সামাজিক বিষয়ে মতভেদের সূত্রপাত

মহর্ষি যখন নব্যদলের আপত্তি সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদিগকেই আচার্য্যের স্থান দিলেন ও তাঁহাদিগের সকল যুক্তি উপরোধ অগ্রাহ্য করিলেন তখনই (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) প্রাচীন সমাজ হইতে নব্যদল কেশবের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলেন।

ইহার পরও কিছুদিন মহর্ষি ও কেশবের আগ্রহে এই বিচ্ছেদ যাহাতে সম্পূর্ণ না হইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিল। কিন্তু যেসকল মত লইয়া এই বিচ্ছেদ তাহার কোনও মীমাংসা হইল না।

বিচ্ছেদ

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া নব্যদল এক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের নাম তখন হইতে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' হইল। ব্রাহ্মধর্ম সকল ধর্মের সমন্বয়ক্ষেত্র—ইহাই স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য ও সকলের সমক্ষে ইহা প্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল ধর্ম হইতে উৎকৃষ্ট বাণীসকল সংগ্রহ করিয়া 'শ্লোক-সংগ্রহ' নামে এক পুস্তিকা প্রচার করিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি নব্যদলের উপর খৃষ্টীয় প্রভাব বহুল পরিমাণে আসিয়া পড়িয়াছিল। অনুতাপ প্রার্থনা ও প্রার্থনাসূচক সঙ্গীত তাহাদের মধ্যে ধর্মের উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছিল।

ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের শিষ্য অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর। তাঁহার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবভাব, খোল করতাল লইয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া সঙ্কীর্তন করিবার প্রথা প্রচলিত হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন করিলেন। এই সময় মহর্ষি-প্রণীত উপাসনা-প্রণালীর কিছু পরিবর্তন করিয়া একটী পৃথক্ উপাসনা-প্রণালী প্রণীত হইল। এই সময় হইতে নগর-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন হয়। তদবধি উৎসব উপলক্ষে এখনও ঐরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর এক সভায় ব্রাহ্মগণ 'ব্রাহ্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি আইনসঙ্গত কিনা' এই বিষয়ে বহু আলোচনা করিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিবাহ-প্রণালীর মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া কিছুই ছিল না। এস্থলে আইন অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মবিবাহ নিরাপদ নহে ইহা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন। কেশব ইহা আইনসঙ্গত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বড়লাটের আইন-সভ্য স্যর

হেনরী মেইনএর সাহায্যে 'Native Marriage Bill' ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৩ আইনরূপে পাশ হইল। এই আইন অনুসারে চৌদ্দ বৎসরের নিম্নে কোনও বালিকার বিবাহ হইতে পারে না। বর ও কন্যার সম্মতিক্রমে বিবাহ হওয়া প্রয়োজন। অসবর্ণ বিবাহ এই আইন অনুসারে সঙ্গত, বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ ও বিধবা-বিবাহ অনুমোদিত হইল। আইনত এই রূপে নিরাপদ হইয়া ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের বিবাহ ব্রাহ্ম বিশ্বাসগত অনুষ্ঠান করিলেন।

১৮৭২ সালের ৩ আইন

ব্রাহ্মদিগের সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য ইংরাজীতে 'ইণ্ডিয়ন মিরার', বাংলায় 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একটী পত্রিকা চালাইবার ভার কেশব লইলেন। নারীদিগের জন্য বিশেভাবে একটী বিদ্যালয় খুলিলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' এই সময়ে প্রকাশিত হয়।

কর্মে যখন তিনি এইরূপে ব্যাপৃত তখন কিন্তু সমাজের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সকল মত ও কার্য্য সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারিতেছিলেন না। আবার দুইটী দলের সৃষ্টি হইল। কেশব ও তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইলেও কতক পরিমাণে রক্ষণশীল ছিলেন। অপরদিকে নব্যদল স্ত্রীস্বাধীনতার সকলপ্রকার বাধা অপসারিত করিয়া দিতে চাহিলেন। কেশবের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ তাঁহাদের যথেষ্ট মনে হইল না। এই লইয়াই প্রথম বিরোধ। সংস্কারকদল নারীদিগের জন্য 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করিলেন; পরে উহার নাম 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' হইল। শেষে ইহা 'বেথুন কলেজে'র সহিত যুক্ত হইয়া যায়।

বিরোধের সূত্রপাত

এইসকল সামাজিক মতভেদ ভিন্ন নব্যদল আরও দুইটী বিষয়ে আপত্তি করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন ক্রমশ সমাজে গুরু ও অবতারবাদ প্রবেশ করিতেছে। দ্বিতীয়ত সমাজে নিয়মতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই।

একমাত্র কেশবই প্রকৃতপক্ষে সমাজ চালাইতেছিলেন। স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া ভীত হইলেন।

নব্যদল কেশব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনা করিয়া এইসকলের মীমাংসা করিতে বহু প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কোনই ফল হইল না। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মগণ জানিতে পারিলেন যে কেশবের কন্যার সহিত কুচবিহারের পঞ্চদশবর্ষী নাবালক রাজার সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে। কন্যার বয়স তখনও চৌদ্দ হয় নাই এবং রাজা ব্রাহ্ম নয় তাহা সকলেই জানিতেন; বিবাহ ব্রাহ্মমতে হইবে না তাহাও শোনা গেল। ইহা শুনিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্ম প্রকৃত ঘটনা কেশবের নিকট হইতে শুনিতে চাহিলেন; কিন্তু কোনও প্রশ্নের উত্তর তাঁহার নিকট পাওয়া গেল না।

কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। ব্রাহ্মগণ শুনিলেন পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়া কুচবিহারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে। জাতিচ্যুত বলিয়া কেশব কন্যাসম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাঁহার ভ্রাতা সম্প্রদান করিবেন। কেশব এইসকল সর্তে আপত্তি জানাইলেও তাঁহার কোনও অনুরোধ রহিল না। নামমাত্র ব্রাহ্মমতের অনুষ্ঠান হইয়া কুচবিহারের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইল।

এই বিবাহই বিরোধের চরম কারণ। তেয়িশজন ব্রাহ্ম একটী পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কেশবের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

এতদ্ব্যতীত মন্দিরে আচার্য্য হওয়া লইয়াও দুইদলে বিবাদ বাধিল; নব্যদল একটী সভা আহ্বান করিয়া এক কমিটি গঠন করিলেন। সমাজের মঙ্গল যাহাতে হয় ইহাই

বিচ্ছেদ

তাহার উদ্দেশ্য। এই সময়ে উভয় দলের মধ্যে যে অশান্তি হয়, তাহা এক্ষণে বিস্মৃত হওয়াই উচিত। মিলন হওয়া যখন অসম্ভব বোঝা গেল তখন নব্যদল পৃথক একটী সমাজ স্থাপন ভিন্ন আর উপায় দেখিলেন না।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে টাউন হলে একটী সভা আহ্বান করিয়া নব্যদল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া ভিন্ন একটী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে সমাজের সকল কার্য্য সমাজস্থ সর্বসাধারণের মত লইয়া চলিবে। এক-নেতৃত্ব কোনও ক্রমেই যাহাতে সমাজে স্থান না পায় তাহার জন্য সকলেই বিশেষ সচেষ্ট রহিলেন। আনন্দমোহন বসু সমাজের প্রথম সভাপতি, শিবচন্দ্র দেব প্রথম সম্পাদক ও উমেশচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ৪৯ জন ব্যক্তি লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইল, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মফঃস্বল সমাজগুলির প্রতিনিধি।

বিধিমতে সে কমিটিতে নিয়মতন্ত্র প্রণালী গঠিত হইল। 'সাধারণ

নিয়মতন্ত্র

ব্রাহ্মসমাজে'র ইহাই বিশেষত্ব যে ইহা সাধারণ-তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার কোনও কার্য্য কেবল একজন ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে হইবার উপায় নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে (২রা জ্যৈষ্ঠ) 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র মন্দির স্থাপিত হইল।

এদিকে কুচবিহার বিবাহের পর হইতে এবং নব্যদল বিভিন্ন হইয়া আসার সময় হইতে কেশবচন্দ্র আদেশবাদের উপর বিশেষভাবে জোর

নববিধান

দিয়া সেই অনুসারে সমাজের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের নাম পরিবর্তিত করিয়া 'নববিধান' রাখিলেন। New Dispensation বা Nava-vidhana, ধর্ম্মতত্ত্ব, Unity and the Minister এই সমাজের মুখপত্র।

অপরদিকে সাধারণ ব্রাহ্মগণ নব উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। যুবক শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ পরীক্ষাতে 'শাস্ত্রী' হইয়া সরকারী চাকুরীর প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আপনার শরীরমন সমাজের কার্য্যে লাগাইয়া দিলেন। সমাজের নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির নির্মাণ, সমাজের পত্রিকা চালান, যুবকদিগের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা, স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস সকলের মধ্যেই তাঁহার হস্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, গুরুচরণ মহলানবীশ, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ যুবকদিগের জন্য 'ছাত্রসমাজ' নাম দিয়া একটী সমিতি স্থাপন করিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাবলী

ছাত্রসমাজ

আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়সকল যুবকগণ যাহাতে আলোচনা করিয়া আপনাদের উন্নতিসাধন করিতে পারেন ইহাই ইহার উদ্দেশ্য।

পত্রিকাদ্বয়

নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য Brahmo Public Opinion বলিয়া প্রথমত একটি পত্রিকা বাহির হইত, পরে উহার নাম পরিবর্তিত করিয়া Indian Messenger রাখা হইল। এখনও ঐ নাম দিয়া প্রতিসপ্তাহে নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি চলিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত 'তত্ত্বকৌমুদী' নাম দিয়া অপর একটি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার উন্নতিসাধনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। নরনারীর সমান অধিকার এই মত সাধারণ সমাজ প্রথম হইতে ধরিয়া রাখিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে নানাস্থানে বালক ও বালিকাদিগের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এইসকল বাহ্যিক কর্মের দিকে কেবল দেখিলে মনে হইবে এই সমাজ শুধু কর্ম লইয়াই ব্যস্ত, ধর্মের দিক ইহার তেমন সরস নয়।

আমরা দেখিয়াছি যুবক শিবনাথ পার্থিব উন্নতির দিকে না তাকাইয়া সমাজের জন্য আপনার মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। কেবল বাহিরের কর্মের প্রেরণায় ইহা সম্ভব নয়। ধর্মের আকর্ষণ কতটা প্রবল হইলে সাংসারিক প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় ধর্মবীরগণের তেজোময়ী বাণীতে দলে দলে লোক আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উপাসক-মণ্ডলীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। কলিকাতার বাহিরেও এই ধর্মবীর-গণের কার্য্য নিস্ফল হয় নাই—নানাস্থানে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।

ধর্ম প্রচার

বোম্বাইএর "প্রার্থনা সমাজ" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত আদর্শ ও মতে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তথা হইতে 'সুবোধ পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মদেশে, মান্দ্রাজের কয়েকটি স্থানে, সিন্ধু ও পঞ্জাবে প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্র আছে।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা ৬,৩৮৮।

৮। আর্য্যসমাজ

আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী গুজরাটের অন্তর্গত সরফী নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮২৪ সালে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবিতকালে ইঁহার প্রকৃত নাম কেহ জানিতে পারে নাই। পরে জানা গিয়াছে ইঁহার পৈত্রিক নাম মূলশঙ্কর; ইঁহার পিতা অম্বাশঙ্কর একজন অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বাল্যকাল

প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হইতেই পুত্রের মধ্যে ধর্মে একাগ্রতা স্বজিবার জন্য পিতার যত্নের অবধি ছিল না। মূলশঙ্কর যখন চৌদ্দ বৎসরের বালক সেই সময়ে একবার শিবরাত্রির ব্রতপালন করিবার জন্য সারাদিন উপবাস থাকিয়া রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্যে পিতাপুত্র অর্ঘ লইয়া শিবমন্দির যাত্রা করেন। দিবসের অনশনে শরীর ক্লান্ত, নিদ্রায় বালক অভিভূত; তথাপি ক্ষুদ্র তেজস্বী বালক জাগিয়া থাকিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিবার পর হঠাৎ বালক দেখিল একটী ইঁদুর চুপি চুপি আসিয়া, শিবলিঙ্গটিকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে; যখন দেখিল ইহা প্রাণহীন, ইহার ক্রোধ অপরাধির শাস্তি-বিধান করিতে একান্তই অসমর্থ তখন নির্ভয়ে ইঁদুর দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বালক স্বভাবতই সকল বিষয়ে বুদ্ধি-দ্বারা বিচার করিয়া গ্রহণ করিত ও এই ঘটনা পৌত্তলিক পূজার প্রতি তাহার প্রচলিত ধর্মসংস্কারে আঘাত করিল। এই সামান্য ঘটনা হইতেই তাহার আস্থা বিনষ্ট হইয়া গেল। পিতার অশেষ অনুরোধ ও আদেশে বালকের মন পরিবর্তিত হইল না।

অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া আর কয়েক বৎসর তাঁহাকে গৃহেই থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার একটী বোন্ মারা যান; এই বোন্কে তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। ইহার মৃত্যুতে অত্যন্ত আঘাত পাওয়াতে তাঁহার মনে মুক্তির সন্ধিৎসা জাগিল। একাকী থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্মের রস আস্বাদন করিবেন ও জনমানবকে তাহার ফল বিতরণ করিবেন ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে বিবাহ দিয়া গৃহী করিবার সঙ্কল্প করাতে গৃহে বাস করা নিরাপদ নয় বুঝিলেন ও অবশেষে তিনি গৃহের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরদিনের মত তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহত্যাগের পর কয়েক বৎসর তিনি নির্জনে সন্ন্যাসব্রত পালন

করেন ; তৎপরে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে বোম্বাই সহরে আসিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন সন্যাস পালনের সময়েই মূলশঙ্কর তাঁহার গুরুর নিকট হইতে 'দয়ানন্দ সরস্বতী' নাম পাইয়াছিলেন। দয়ানন্দের নাম পূর্বেই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় বহুসংখ্যক লোক তাঁহার প্রভাবে এই সমাজভুক্ত হইলেন। সমাজে দশটী মূলমন্ত্র স্থির করা হইল ; এই মন্ত্রগুলিতে দীক্ষা লইয়া সমাজে প্রবেশ করিতে পারা যায়।

বোম্বাই সহরে সমাজ স্থাপন

১৮৭৭ সালে দয়ানন্দ লাহোরে যান। এইখানে তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করেন। লাহোরে যে সমাজ স্থাপন করা হইল তাহাই প্রকৃতপক্ষে আর্য্যসমাজের কেন্দ্র হইল। এই স্থানে পূনর্বার দশটী মন্ত্র সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এখন হইতে সমাজের কার্য্য রীতিমত আরম্ভ হয়।

লাহোরে সমাজ স্থাপন

মন্ত্রগুলির মধ্যে ধর্ম, সমাজ ও নীতির উচ্চ আদর্শ নিহিত। অজ্ঞান ও অকল্যাণ দূর করিয়া সমগ্র মানবকে জাতিনির্বিশেষে ধর্মের আলোক দান করাই আর্য্যসমাজের মূলমন্ত্র। সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যের মূলেও এই মন্ত্র।

মন্ত্র দশটীর প্রথম দুটিতে আর্য্য সমাজের ঈশ্বর সম্বন্ধে মতের আভাস পাওয়া যায়। জগৎকারণ ভগবান্ সর্বশক্তিমান্, অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী সকল জ্ঞানের আধার, ন্যায়-বান, পূর্ণ প্রেমময়, দয়াময়, জীবের আরাধ্য একমাত্র তিনিই। এই মতে একেশ্বরবাদী সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই সায় দিবেন। কিন্তু ইহার সহিত আরও দুইটী মত সমাজস্থ ব্যক্তিগণ পোষণ করেন।

ধর্মমত

দয়ানন্দ মহাপণ্ডিত ছিলেন, তিনি বেদ তন্নতন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। বেদকে তিনি সকল জ্ঞানের উৎস বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সকল আর্য্যই মনে করেন বেদ অভ্রান্ত সকল জ্ঞানের আকর। তৃতীয় মন্ত্রে আর্য্যগণ ইহাই স্বীকার করিয়া লন এবং শ্রদ্ধার সহিত নিয়মিতভাবে বেদ পাঠ করিবেন এই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হন। আর্য্যগণ বিশ্বাস করেন কর্ম্মহেতু জীব পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করে এবং এইরূপে উন্নত হইতে উন্নততর জন্ম প্রাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষীয় অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিত আর্য্য সমাজের একযোগে যুক্ত হইবার প্রয়াস কয়েকবার হইয়াছিল, কিন্তু বেদের অভ্রান্ততা ও কর্মবাদে বিশ্বাস এই দুইটি বিশেষ মতের জন্যই তাহা সম্ভব হয় নাই।

আর্য্যসমাজের আরাধনা প্রণালীর মধ্যে সর্বপ্রথমে বেদ মন্ত্রোচারণের সহিত হোম একটী প্রধান অঙ্গ। হোম সমাপ্ত হইলে যথাবিধি আচার্য্য উপদেশ ও প্রার্থনা করেন। জাতিনির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিমাত্রেই আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন।

মতভেদ ও বিভাগ

কালক্রমে আর্য্যদিগের মধ্যে কয়েকটী মতভেদ উপস্থিত হয়। একদল বলিলেন নিরামিষ আহার সর্বতোভাবে শুদ্ধ থাকিবার প্রকৃষ্ট উপায়; এই মতানুসারে তাঁহারা মৎস্য মাংস সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলিতে লাগিলেন। অপর পক্ষ নিরামিষ ভোজনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন না। এইরূপে দুইটী দলের সৃষ্টি হইল। ক্রমশ আরও একটী বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া গেল। একদল দয়ানন্দের সকল উক্তি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, অপরদিকে অধিকতর স্বাধীনচিত্ত আর্য্যগণ তাহা করিতে অসম্মত। আপনার স্বাধীন বুদ্ধিদ্বারা সকল বিষয় বিচার করিয়া গ্রহণ

করা কর্তব্য ইহাই তাঁহাদের মত। এই বাদপ্রতিবাদের ফলে দুইটী বিভাগ হয়, উন্নতিশীল যাঁহারা স্বাধীন কর্মের পক্ষপাতী—রক্ষণশীল দল যাঁহারা সর্বতোভাবে দয়ানন্দের উক্তি অনুসরণই শ্রেয়ঃ মনে করেন। নিরামিষভোজীগণ স্বভাবতই রক্ষণশীল দলভুক্ত হইলেন ও মাংসাশীগণ উন্নতিশীল দল বৃদ্ধি করিলেন। যাহা হউক প্রধানত দুইটী বিভাগ হওয়াতে দুইপক্ষ বিভিন্নভাবে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীল আর্য্যগণ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে 'দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ' নাম দিয়া এক কলেজ স্থাপন করেন। এইখানে আধুনিক শিক্ষার আদর্শানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপরদিকে রক্ষণশীল আর্য্যগণের উদ্যোগে ১৯০২ সালে হরিদ্বারের কাংড়া উপত্যকায় 'গুরুকুল' বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশ বারাণসী বৃন্দাবন ও অন্যান্য স্থানে গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচীন হিন্দু আদর্শ অনুসারে বালকদিগকে শিক্ষাদান। 'গুরুকুলে' বাস করিয়া ছাত্রেরা সকল প্রকার কর্তব্য সাধনের সহিত বিদ্যালাভ করে। আর্য্যসমাজের যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পালন করা এখানকার ছাত্রদের একটী বিশেষ কর্তব্য।

শিক্ষা বিস্তার

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি পুরোহিতগণ বর্ণদ্বারা নির্বাচিত হন না—যোগ্যতাই একমাত্র নির্দেশ। জাতিভেদের শৃঙ্খল আর্য্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর্য্যসমাজের মত শুধু মুখে বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই—সামাজিক অনুষ্ঠানদ্বারা তাহা প্রচলিত করিবার জন্য প্রয়াস পান। দ্বিজ পদ পাইবার পূর্বে অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যক্তির তিন দিন কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতে হয়; নির্দিষ্ট দিবসে যথাবিধি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া সর্বসমক্ষে তাহাকে উপবীত দান করা হয়। এই

সমাজ সংস্কার

প্রকার অনুষ্ঠানকে 'শুদ্ধিক্রিয়া' বলে। কেবল অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চ পদবীতে উঠাইয়াই আর্য্যসমাজ সন্তুষ্ট নহেন; অস্পৃশ্য নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে সমাজে স্থান দান করিতে তাঁহারা সর্বদাই তৎপর। এইরূপ নিকৃষ্ট হেয় জাতির মধ্যে আর্য্যসমাজ-কার্য্য করিবার ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। তাঁহারা মেখ্ বলিয়া এক অস্পৃশ্য জাতিকে শুদ্ধিক্রিয়া দ্বারা 'আর্য্য' করিয়া লইয়াছেন। রাজপুতানার মালখানা মুসলমানগণ শুদ্ধি-দ্বারা আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে।

সনাতন উৎকৃষ্ট সামাজিক আদর্শগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সহসা মনে হয় নারীগণের প্রতি সম্মান যেন ভারতবাসী আজকাল নূতন দিতে শিখিতেছে। কিন্তু অবরোধপ্রথা বহু প্রাচীনকালে এদেশে ছিল না, তাহার প্রমাণ আমরা প্রাচীন সাহিত্যের বহুস্থানে দেখিতে পাই। আর্য্যসমাজ নারীগণের সেই লুপ্ত মর্য্যাদা পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আর্য্যসমাজস্থ বহুসংখ্যক নারী অধুনা জ্ঞানে বীর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সমাজের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেছেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা-প্রিয় আর্য্যগণ স্বভাবতই বাল্যবিবাহ ঘৃণা করেন। যথেষ্ট শিক্ষালাভের অবসর দিবার জন্য ষোল বৎসরের পূর্বে কন্যার বিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ। অপরদিকে ২৫ বৎসরের নিম্নে কোনও ব্যক্তির বিবাহ আর্য্যসমাজে মনোনীত নহে। বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির রুচিকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া দয়ানন্দ বিভিন্ন প্রকার বিবাহের রীতিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যসমাজের মধ্যে বিবাহের পূর্বে উভয়পক্ষের পরস্পরের সহিত দেখা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কাহারও দ্বিতীয়বার বিবাহ সাধারণত আর্য্যসমাজ পছন্দ করেন না।

প্রয়োজন হইলে অবস্থাবিশেষে স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকিতেও

কিছুকালের জন্য অপর একজনের সহিত বাস করিতে পারা যায় এইরূপ একটী সামাজিক নিয়ম আর্য্যসমাজে আছে। 'নিয়োগ' বিধি অনুসারে এইপ্রকার কার্য্য সমাজে নিন্দিত নহে। বিধি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আর্য্যদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

জনহিতকর কার্য্য

জনহিতকর কার্য্যে আর্য্যসমাজের যেরূপ উত্তম ও উৎসাহ তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ১৮৯৯ সালে দুর্ভিক্ষ যখন দেশকে শূন্য করিয়া ফেলিতেছিল তখন দেশীয়দিগের মধ্যে আর্য্যসমাজই দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যের জন্য প্রথম কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এইরূপে ক্রমশ বিস্তৃতভাবে অভাবক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য আর্য্যসমাজ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বিনামূল্যে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা ও ঔষধপ্রদান, পীড়িত অক্ষম ব্যক্তিদিগের সেবাশুশ্রূষা ও মৃতব্যক্তির সংকারের জন্য আর্য্যসমাজে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে। এইসকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির কত প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্বেই বলিয়াছি অপৌত্তলিক ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে আর্য্যসমাজ ভারতবাসীর বিশেষত হিন্দু ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ করিয়াছে; তাহার কারণ আর্য্যসমাজ দেশের লোকের সহিত অধিক যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে তাহার একটী কারণ বোধ হয় ইহা প্রাচীন নামটী ত্যাগ করে নাই। আর্য্যনামের সহিত ভারতবাসীর যেরূপ শ্রদ্ধা সম্ভ্রম জড়িত আছে তাহাতে এই নামটী রক্ষা করার জন্য হয়ত কিঞ্চিৎ পরিমাণে আর্য্যসমাজ স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আর্য্যসমাজীর সংখ্যা ৪, ৬৭, ৫৭৮।

৬। রামকৃষ্ণ মিশন

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা ইতিমধ্যে শিষ্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এমনকি পণ্ডিত মোক্ষমূলর সম্পাদিত রামকৃষ্ণের জীবনীতে অতিপ্রাকৃত ঘটনা সমন্বিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে শিক্ষা বলি গদাধর সে-শিক্ষা লাভ করেন নাই। সতের বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সামান্য পূজারীর কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে লাগিলেন। ১৮৫৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী নির্মিত হইলে গদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেখানকার পূজারী নিযুক্ত হন ও গদাধরও সেখানে সহকারীর একটি কাজ পান। তিনি কালীকে নিজ মাতা ও বিশ্বমাতারূপে দেখিতেন এবং সর্বদাই যোগযুক্ত অবস্থায় বাস করিতেন—মাঝে মাঝে তাঁহার সমাধি হইত। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা ভাবিলেন যে বিবাহ দিলে গদাধরের মতিগতি ফিরিবে। ১৮৫৯ সালে ২৫ বৎসর বয়সে গদাধর ছয় বৎসরের এক বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ভক্তের জীবন এ-সব বন্ধনে মুগ্ধ হয় না। তিনি দক্ষিণেশ্বরের নিকটে একটি বনে গিয়া কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছসাধন করিতে লাগিলেন। বার বৎসর এইরূপ ভাবে কাটিল। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে যোগ ও তন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই সন্ন্যাসিনীর সমবেদনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি গদাধরের জীবনে খুবই উপকারে আসিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত বিদ্যা ইহাকে শিখাইয়া কয়েক বৎসর পরে সন্ন্যাসিনী নিরুদ্দেশ হন।

রামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কিন্তু ইহাতেও গদাধরের মন তৃপ্ত হইল না ; তিনি উচ্চতর জ্ঞানের জন্য পিপাসিত। এই সময়ে ভোজপুরী নামক জনৈক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী গদাধরের মন্দিরে উপস্থিত হন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত ইহাকে শিক্ষা দেন ও দীক্ষিত করিয়া সন্ন্যাসী করেন ; সন্ন্যাসী হইয়া 'রামকৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করেন। ভোজপুরী চলিয়া যাইবার পর কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি আত্মার গভীর আনন্দলাভ করিয়া কাটান ; কিন্তু ইহার পর সাংঘাতিক ব্যারামে তাঁহাকে কিছুকাল ভুগিতে হয়। রোগ শান্তির পর তিনি বৈষ্ণবধর্ম সাধন করেন ও আপনাকে রাধা কল্পনা করিয়া ও ঈশ্বরকে কৃষ্ণরূপে ভাবিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এইরূপ গভীর সংগ্রামে বার বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৭১ সালে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত বাস করিতে আসিলেন ; কিন্তু তিনি সংসার বন্ধনে যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার স্ত্রী চিরদিন শিষ্যারূপে বাস করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। এইবার তাঁহার জাতি অভিমান দূর করিবার জন্য সংগ্রাম সুরু হইল ; সেইজন্য চণ্ডালের ও মেথরের কাজও করিয়া তিনি আত্মশোধন করেন। মুসলমান-ধর্ম জানিবার জন্য তিনি এক ফকিরের সহিত কিছুদিন বাস করেন ও মুসলমান ধর্মানুসারে প্রত্যেকটি প্রথা পালন করিয়া ইস্‌লাম সাধন করেন। খৃষ্টকেও তিনি ধ্যানে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাহিরের লোকে তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে আরম্ভ করে। ১৮৭৩ সালে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও ১৮৭৫ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত মিলন হয়। কেশবচন্দ্র তখন দেশে বিদেশে বিখ্যাত ; তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবদের নিকট এই মহা-পুরুষের কথা বলিতে থাকেন। তখন রামকৃষ্ণ সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত ছিলেন—কোনো সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া লোকসমক্ষে প্রচারিত হন নাই। ১৮৭৯ সাল হইতে ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি নিরন্তর

ধর্ম সাধন

উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয় ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ রামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া হিন্দুধর্মকে জীবনে ফুটাইবেন বলিয়া ঠিক করিলেন।

শিষ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি কলিকাতার বি, এ। সুগায়ক ও তেজস্বী বলিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্য হন; গুরুর মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বিবেকানন্দ নাম লইয়া ছয় বৎসর হিমালয়ে বাস করেন ও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া দেশকে ভালরূপে জানেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় শিকাগো সহরে সর্বধর্মের মহা-

শিকাগোর ধর্মসভা

সভায় হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিবেকানন্দ প্রেরিত হন। সেখানে তিনি তাঁহার বাগ্মিতা ও যৌক্তিকতা দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকে বলেন যে ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা বৃথা। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বেদান্তমত প্রচারের জন্য এক সভাস্থাপন করেন। হিন্দুধর্ম যে প্রতিমাপূজা প্রচার করে না ইহা তিনি জোর করিয়া তাহাদের মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া বেলুড়ের মঠ স্থাপন করেন। তিনি বুঝিলেন ভারতের

বেলুড়ে মঠস্থাপন

একদল লোক সংসারত্যাগী না হইলে এদেশের আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা এদেশবাসী ও বিদেশ-বাসী সকলের নিকট প্রচারিত হইবে না। ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি পুনরায় য়ুরোপ ও আমেরিকায়

প্যারীনগরীর ধর্ম-সভায় যোগদান

যাত্রা করেন। ১৯০০ সালে ফিরিবার সময়ে প্যারি নগরীর ধর্মসভায় উপস্থিত হইলেন। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মাত্র দুই বৎসর জীবিত

ছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যেই অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া 'রামকৃষ্ণ মিশন'কে দৃঢ় ভূমির উপর স্থাপিত করেন। ১৯০২ সালে ৪০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে দেশে ও বিদেশে উচ্চ করিয়া ধরিয়াছেন। বিদেশের নিকট ভারতকে তিনি বড় করিয়া ধরিয়া দেশভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু দেশের মধ্যে অনেক মতামতকে তাঁহার সমর্থন করিতে হইয়াছিল, যাহা তিনি সত্যই বিশ্বাস করিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি নিজে প্রতিমা-পূজক ছিলেন না; তিনি ছিলেন বৈদান্তিক। অথচ দেশের লোকের কাছে কার্য্যত তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক মত খুবই উদার; 'ছুঁৎমার্গ' বলিয়া শব্দ তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন না এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করিতেন না। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে (সন্ন্যাসী বাদ দিয়া) হিন্দুসমাজের প্রাচীন বন্ধন ভাঙ্গিবার কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। স্বামীজির উপদেশানুসারে জীবন যাপন করা কেহই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। এই দুর্বলতার কারণ বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম ও সমাজের সমস্ত দোষ ত্রুটিগুলিকে ভালবাসার চোখে দেখিয়াছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতাও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের প্রাচীন সকল প্রথা ও আচারব্যবহারকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজির নিকট ভারতবর্ষ এক বিষয়ে ঋণী; তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে শিখাইয়া গেছেন—এক-দল শিক্ষিত যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া দেশের ও দশের সেবা করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পাঁচটি মঠ আছে—বেলুড়, কাশী, প্রয়াগ, মায়াবতী ও বাঙ্গালোর। বেলুড় সমস্ত মিশনের কেন্দ্র। কাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ ও বৃন্দাবনে সেবাশ্রম আছে। তীর্থস্থানে সর্ব-

সমাজ সংস্কারের শিথিলতা

ভগ্নী নিবেদিতা

মিশনের সেবাধর্ম

দাই অসহায়ভাবে লোক উপস্থিত হয়, তাহাদের সেবা ইহার উদ্দেশ্য। এই সব স্থানে হাঁসপাতালের খুব ভাল বন্দবস্ত আছে। দেশের যেখানে দুর্ভিক্ষ বন্যা প্লেগ মহামারি দেখা দেয় এই মিশনের যুবকগণ সেখানে প্রাণ দিয়া খাটিয়া থাকেন। এই সেবার দ্বারা খৃষ্টীয় সমাজ ভারতে বহুসংখ্যক লোকের মন ও প্রাণ পাইয়াছেন; ইহারাও সেই সেবার পথে চলিয়াছেন।

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-মিশনের শাখা আছে; তবে সেখানে উহা 'বেদান্ত সোসাইটি' নামে খ্যাত—বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য, রামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার কিনা বা স্বয়ং ভগবান কিনা এ সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ না করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শনের মত প্রচার করেন। Message of the East or the Vedanta Monthly নামে একখানি পত্রিকা আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হয়। দুইখানি ইংরাজী পত্রিকা—'ব্রহ্মবাদিন্' মান্দ্রাজ হইতে, ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' মায়াবতী হইতে প্রকাশিত হয়; কলিকাতা হইতে 'উদ্বোধন' নামে একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা মিশনের মত ও কার্য্য কলাপ প্রকাশ করে। ইহাদের সাহিত্য প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় দেশ মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে।

৭। থিওজফি

থিওজফি লোকের ধর্মমত না হইলেও ইহার মত ও বিশ্বাস হিন্দু-সমাজের শিক্ষিত লোকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৮৫ সালে যে বৎসর আর্য্যসমাজ স্থাপিত হয় সেই বৎসর আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ব্লাভাস্কি নামক একজন রুশরমণী ও কর্ণেল অল্‌কট্‌ থিওজফি সমাজ স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য কোন প্রকার ধর্ম, জাতি, বর্ণ ভেদ না করিয়া (১) বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববন্ধনের বীজ বপন করা (২) তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা (৩) মানবের মধ্যে নিহিত অজ্ঞাত শক্তিসমূহের সন্ধান। পৃথিবীর যে-কোনো ধর্মে থাকিয়া থিওজফি সমাজের সভ্য হওয়া সম্ভব হয়।

থিওজফির মত ও বিশ্বাস

সর্ব ধর্মের মূল সত্য থিওজফি। কতকগুলি মূল মত, চিহ্ন, পূজা ও উপদেশাদি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায়—বিপদ হয় ছোট ছোট মত ও বিশ্বাস লইয়া। সেগুলিকে বাদ দিলে সর্বদেশের ও সর্বকালের উপযুক্ত একটিমাত্র ধর্মমত অবশিষ্ট থাকে, এবং সে-মত সকলের কাছে দেওয়াও যায়। থিওজফি যদি এখানে থামিত তবে বোধ হয় লোকের এ সম্বন্ধে ভুল ধারণা হইত না। তাঁহারা আরও বলেন ঈশ্বর এক—ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি কর্মের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে, এছাড়া জড়ের মধ্যে আত্মার আবির্ভাব—মানুষের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের লোকের অস্তিত্ব আছে; তাঁহারা জন্মান্তরবাদ, কর্ম-বাদ ও একশ্রেণীর মহাত্মাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের বিশ্বাস যে তিব্বতে কতকগুলি মহাত্মা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে 'কুটহুমি' নামে একজন অলৌকিক মহাত্মা সর্বদা ম্যাডাম্‌ ব্লাভাস্কিকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়া তাঁহার মনোভাব প্রকাশ

করিয়াছেন। কুটহুমি তাঁহাকে থিওজফি মত শিক্ষা দেন। ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কি বহুকাল এইরূপ অসম্ভব কথা বলিয়া লোককে বিমোহিত করিতেছিলেন। তারপর ১৮৮৫ সালে বিলাত হইতে সাইকিকেল রিসার্চ সোসাইটির প্রেরিত কয়েকজন মেম্বর কর্তৃক অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার নানাপ্রকার ছলনা ধরা পড়ে।

ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কি

ব্লাভাস্কির পরে মিসেস্ আনি বেসাণ্ট এই সমাজে সভানেতৃত্ব করিতেছেন। তিনি যদিও ঐ প্রকার স্বেচ্ছাকৃত কোনোরূপ ছলনার অবতারণা করেন না, তথাচ অসম্ভব কথা বলিবার ও বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। তিনি হিন্দুদের নিকট বলেন যে তাঁহাদের ধর্মের সবই ভাল। বেদ নিত্য ও অনাদি; মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কম্পন উৎপন্ন হয়; সেই কম্পন হইতে অতিপ্রাকৃত দেহসমূহ উৎপন্ন হয়। এই সব মন্ত্র সংস্কৃতে হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন—বিশেষকালে বিশেষভাবে বলিবারও প্রয়োজন আছে; এই সব মন্ত্রাদির প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের অধঃপতন এবং জাতির অধোগতি; গর্ভাবস্থায় জননীগণ মন্ত্রাদি শ্রবণ করে না বলিয়া সন্তান দুর্বল হইতেছে। শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি প্রদান করিলে মৃত আত্মাদের পাওয়া যায়। নানারূপ আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক ব্যাপার দ্বারা মিসেস্ বেসাণ্ট হিন্দুধর্মের ভাল মন্দ সবগুলিকে সমভাবে দেখাইতে চান। মিসেস্ বেসাণ্ট প্রতিমা পূজার সমর্থক। মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে একখানি বই মিসেস্ বেসাণ্ট ও লেড্‌বিটার নামক আর একজন থিওজফিষ্ট লিখিয়াছেন; এই বই আধ্যাত্মিক যোগবলে লিখিত—এবং এমন সব অসম্ভব উক্তি আছে যে তাহা পাঠ করিয়া সামান্য লোকও হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না।

মিসেস্ বেসাণ্ট

থিওজফি সোসাইটির মধ্যে কিছুদিন হইতে ভেদ আরম্ভ হইয়াছিল

১৮৯৫ সালে আমেরিকার অধিকাংশ থিওজফিষ্ট এই সমাজ ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ স্থাপন করেন। এই ভেদের কারণ এই—ব্লাভাস্কির মৃত্যুর পর সমাজের সহকারী সভাপতি মিঃ জজ্ (Mr. Judge) 'কুটহুমি' ও অন্যান্য মহাত্মাদের অনেক সব চিঠি দেখাইয়া বলেন যে অল্‌কটের পরিবর্তে তিনি সভাপতি হয়েন। অল্‌কট্ তিব্বতীয় সাধুদের লেখা চিনিতেন—তিনি প্রমাণ করিলেন জজের চিঠিগুলি জাল। তখন জজ্ 'কুটহুমি'র পত্রাদি লইয়া পৃথক হইয়া গেলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে লেডবীটার নামক মিসেস্ বেসাণ্টের একজন প্রিয়পাত্রের নামে চারিত্র-নীতি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা উঠে ও তাহা প্রচারিত হইলে তিনি সোসাইটি হইতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু ১৯০৯ সালে মিসেস্ বেসাণ্ট পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলে ৭০০ ইংরাজ থিওজফিষ্ট সমাজ ত্যাগ করিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে জারমেন থিওজফিষ্টগণ ইহাদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া ডাঃ ষ্টাইনারের নেতৃত্বে দল বাঁধিয়া থিওজফি সমাজ ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠন করেন। এমন কি ভারতবর্ষেও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড এক দল উঠিয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে কৃষ্ণমূর্ত্তি নামক জনৈক মান্দ্রাজী ছাত্রকে বেসাণ্ট মৈত্রেয়ীর অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে কাশীর 'সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে'র মধ্যে ভীষণ দলাদলি হয় ও অবশেষে মিসেস্ বেসাণ্টকে কাশী ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজের আদৈরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। থিওজফির দিক হইতে উত্তর ভারতে তাঁহার সম্মান খুব কমিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণমূর্ত্তি যে ভাবী-অবতার 'আলসিয়ন,' ইহা সপ্রমাণিত করিবার জন্য Star of the East নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মতভেদ ও বিরোধ

কিন্তু থিওজফি একদিকে খুব বড় কাজ করিয়াছেন; শিক্ষার জন্য এই সমাজের লোকেরা প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর

মিসেস্ বেসাণ্ট জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বহুঅর্থ জোগাড় করেন এবং মাদ্রাজ, সিংহল ও ভারতের নানাস্থানে অনেকগুলি উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয়, পাঠশালা খুলিয়াছিলন। আদের একটি বৃহৎ শিক্ষা-কেন্দ্র হইয়াছে। ডাঃ কজিন্স্ এখনকার মধ্যে নামজাদা থিওজফিষ্ট।

৮। অন্যান্য সম্প্রদায়

রাধাসোয়ামী সৎসঙ্গ

যুক্তপ্রদেশে কিছুকাল হইতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাধাসোয়ামী সৎসঙ্গ ধীরে ধীরে প্রচার ও প্রসারলাভ করিতেছে। ইহারা বাহিরের প্রচারে বিশ্বাস করেন না বলিয়া কখনো সাধারণের নিকট পুস্তক প্রকাশ ছাড়া অন্যভাবে মত প্রচার করেন না। এইখানে সৎসঙ্গ প্রাচীন ভারতের হিন্দুভাব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। কেননা কোনো সামাজিক বা নৈতিক আন্দোলনে কখনো তাঁহাদের সহানুভূতি পাওয়া যায় নাই, রাজনীতির সহিতও ইহাদের কোনো যোগ নাই। ইহারা একেশ্বরপূজক, প্রতিমার বিরোধী; কিন্তু গুরুকে দেবতা বলিয়া সম্পূর্ণ-রূপে মানে।

শিবদয়াল সিংহ নামক আগ্রার জনৈক সরকারী কর্মচারী এই মতের প্রবর্তক। ইনি বহুকাল আপন মনে ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া ১৮৬১ সালে আবিষ্কার করিলেন যে তিনি ভগবানের

অবতার। আদি পরমেশ্বরের নাম কি তাহা তিনি জানিতে পারিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে কয়েকজন শিষ্য সংগ্রহ করিয়া বুঝাইলেন তিনি মানবদেহে ভগবান্। তাঁহাকে শিষ্যেরা রাধাসোয়ামী, দয়াল ও সোয়ামীজি মহারাজ বলিয়া থাকেন। ১৮৭৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। হিন্দিতে দুইখানি বই (একখানি গদ্যে) তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন।

১ম গুরু
শিবদয়াল সিংহ

দ্বিতীয় গুরুর নাম শালিগ্রাম সাহেব। ১৮২৮ সালে এক কায়স্থ পরিবারে ইঁহার জন্ম এবং শিক্ষা ও চেষ্টাগুণে ক্রমে সংযুক্ত প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা দেখিয়া তাঁহার মন পার্থিব ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া যায়। তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করিয়াও উপকৃত হইলেন না। এমন সময়ে তিনি শিবদয়ালের সন্ধান পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি গুরু ছিলেন। হিন্দিতে 'প্রেম বাণী', 'প্রেম পত্র' ও ইংরাজিতে 'রাধাসোয়ামী. মত প্রকাশ' ও এ ছাড়া হিন্দি ও উর্দুতে অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত করেন। শালীগ্রাম সাহেব ধর্মের মধ্যে তত্ত্ব আনিয়া তাহাকে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। শালীগ্রাম সাহেবের মৃত্যুর পর সৎসঙ্গের গুরু হন ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র। ইনি বাঙালী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। ১৮৮৫ সালে ব্রহ্মশঙ্কর সৎসঙ্গে যোগদান করেন এবং ১৮৯৮ সালে ইঁহার গুরু হন। ইনি রাধাসোয়ামী মতকে বৈজ্ঞানিক ধর্ম বলিয়া প্রচার করিবার জন্য প্রয়াসী হন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিভাষা দিয়া তিনি সৎসঙ্গের মতকে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে গুরুরা যাহা লিখিয়াছেন তাহা

২য় গুরু
শালিগ্রাম সাহেব

৩য় গুরু
ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র

পরমেশ্বরের বাণী। ১৯০৭ সালে ব্রহ্মশঙ্করের মৃত্যুর পর মাধবপ্রসাদ সৎসঙ্গের নেতা। তবে ইহাকে তাঁহারা পূর্ণ অবতার বলেন না। মাধবপ্রসাদের কর্মকেন্দ্র এলাহাবাদে ছিল। সেখানে তিনি অ্যাকাউণ্টেণ্ট-জেনারেল অফিসের প্রধান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

রাধাসোয়ামী মতের প্রধান কেন্দ্র আগ্রা। যুক্তপ্রদেশে প্রায় লক্ষ লোক এই মতের পোষক। তাঁহাদের মতে পরমাত্মা সর্বশক্তির মূল; জীবাত্মা তাহার অংশ। ঈশ্বর শক্তি স্বরূপ, শক্তির শব্দ শোনা যায়। এই নূতন ধর্মের গুরুগণ সেই শব্দ শুনিতে পান। রাধা এই শব্দের মধ্যে সেই অনাহত বাণী শোনা যায়। সেইজন্য রাধাসোয়ামীই পরমেশ্বরের নাম। সৎসঙ্গের লোকেরা এই শব্দ অভ্যাসের দ্বারায় শুনিতে পান। তাঁহাদের মতে বিশ্বে তিনটি লোক আছে। প্রথম লোক বা আত্মালোক সেখানে রাধাসোয়ামী বাস করেন; দ্বিতীয় লোক 'ব্রহ্মাণ্ড' ইহা আত্মা ও বস্তু উভয়ের সমাবেশে সৃষ্ট, তৃতীয় লোক বস্তু ও আত্মার লোক—মানুষ এই লোকের অধিবাসী। এই তিনটি লোকের প্রত্যেকটি ছয়টি করিয়া ভাগে বিভক্ত। যোগশাস্ত্র অনুসারে ইহারা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে ভাগ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনলাভের প্রধান উপায় নৈতিক জীবনলাভ ও সকল প্রকার উষ্ণ খাদ্য সেইজন্য নিষিদ্ধ। উত্তেজক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে প্রবেশ প্রশংসনীয় নহে। গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীত উদ্ধার নাই কারণ এই গুরুই পরমেশ্বর বা রাধাসোয়ামীর মূর্তি। তিনটি উপায়ে আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারে যথা (১) নাম উচ্চারণ (২) ধ্যান—এ ক্ষেত্রে গুরুদের ফটো পূজা করাই প্রচলিত, (৩) রা-ধা এই শব্দ মনোযোগপূর্বক শুনিবার চেষ্টা।

ধর্মমত

রাধাসোয়ামী মতের কেন্দ্র আগ্রা এলাহাবাদ ও কাশী। ইহাদের মন্দিরে কোনো দেবদেবীর মূর্তি থাকে না, কেবল প্রথম তিন জন গুরুর

চিত্র মন্দিরে আছে। গ্যালারীর একদিকে বেদী; এই বেদীর তলদেশে গুরুদের চিতাভস্ম প্রোথিত। প্রতিদিন দুইবার সকালে ও সন্ধ্যায় শিষ্যগণ মন্দিরে মিলিত হইয়া উপাসনা করেন। ইহারা গুরুদের লেখা পাঠ করেন; তাঁহাদেরই সঙ্গীত গান করেন। গুরুর প্রতি ইহাদের ভক্তি অগাধ। সেইজন্য গুরুর উচ্ছিষ্ট ও প্রসাদ আহার করিতে, চরণোদক পান করিতে তাহাদের কোনও আপত্তি নাই। এইসব অধিকার সকলের নাই—যাহারা অন্তরঙ্গ তাহারাই পারে। সৎসঙ্গ সমাজ-সংস্কারের জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন; তাঁহাদের মত আপনি ভাল না হইলে জাতিকে উদ্ধার করা যায় না। সেইজন্য কোনো সামাজিক প্রশ্ন লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত নহেন। শান্তভাবে জীবন যাপন করা ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কয়েক বৎসর হইল আগ্রায় রাধাসোয়ামী সম্প্রদায় শিক্ষা প্রচারকল্পে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

দেবসমাজ

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক। রুরকির ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ওভারসীয়ারের কাজে পাশ করিয়া তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৩ সালে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি যখন লাহোরের সরকারী স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষকের কাজ করেন ব্রাহ্মসমাজের উদার মত তাঁহার মনকে স্পর্শ করে। দুই বৎসর পরে তিনি স্থানীয় সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন ও অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার চরিত্র ও বাগ্মীতার জন্য বিখ্যাত হন। অগ্নিহোত্রী আর্য্যসমাজের ভীষণ শত্রু ছিলেন—বেদের প্রতি আর্য্য-সমাজের অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তিকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। ১৮৮০ সালে কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন সময়ে তিনি উপস্থিত

প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হন ; এবং সেই সময়ে তিনি ও আর তিনজন লোক এই নূতন সমাজের প্রচারকরূপে দীক্ষিত হন। পঞ্জাবে ফিরিয়া গিয়া অগ্নিহোত্রী ভীষণ উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিলেন। তিনি সমাজের কোনো বিধি নিষেধ মানিবার পাত্র ছিলেন না ; তাঁহার অদম্য ইচ্ছাকে দমন করিবার শক্তি কাহার ছিল না। সেইজন্য ব্রাহ্মসমাজের শান্তিপ্রিয় লোকদের ইহা সহ্য হইল না, অগ্নিহোত্রীও দেখিলেন পাঁচজনের নিয়ম নিষেধে তাঁহার কাজ করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি পৃথক হইয়া নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। ১৮৮৭ সালে এই দেবসমাজ স্থাপিত হয়। তিনি ইহাকে প্রেরিত দৈব ধর্ম বলিয়া ও নিজেকে ইহার গুরু বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন ; তবে ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যের সহিত ইহার যোগ ছিল। ১৮৯০ সালে অগ্নিহোত্রী একটা জটিল মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন ; পাঁচবৎসর ইহার জের চলিতে থাকে। এই ঘটনার পর ১৮৯৮ সালে তিনি দেবসমাজকে নিরীশ্বরবাদ সমাজ বলিয়া ঘোষণা করেন ; ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষা ও নীতির উন্নতি। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মনুষ্য-অভিব্যক্তির চরম বলিয়া বিবেচনা করেন ও দেবতার ন্যায় পূজা করেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে সত্যদেব বলে। নূতন মত প্রচারিত হইলে পূর্বের দেবসমাজীয় শাস্ত্র ও পুস্তিকা বিক্রয় বন্ধ করিয়া নূতন মতকে সমাজের ধর্ম বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করেন। ইহারা জড়-শক্তিকে মানেন এবং বলেন সমগ্র বিশ্ব চারি লোকে বিভক্ত—অজীব, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মনুষ্য। ঠিকমত অভিব্যক্তির পথে চলিতে পারিলে মানবাত্মার উন্নতি ও কল্যাণ, নচেৎ তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সৎকর্ম উন্নতির ও অসৎ কর্ম অধোগতির কারণ। কিছু দূর উঠিতে পারিলে আত্মার পতনের ভয়

ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ ও নূতন সমাজ স্থাপন

সমাজে অবতার বাদ

ধর্মমত

থাকে না। দেবগুরু সেইস্থানে উঠিয়াছেন—তিনি অভিব্যক্তির চরম পুরুষ। দেবসমাজের সভ্য হইতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদিগকে কতকগুলি নৈতিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় মাত্র—ঈশ্বর, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি কিছুই মানিতে হয় না।

অগ্নিহোত্রী দেবগুরু ক্বচিৎ সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত হন। তাঁহার চিত্র গৃহে আছে। এখানে লোকে সমবেত হইলে, সকলে দাঁড়াইয়া উঠে ও সমস্বরে গুরুর বন্দনা গান সংস্কৃতে পাঠ করেন, পরে হিন্দিতে ইহার ব্যাখ্যা করা হয়। তারপর সকলে গুরুর চিত্রের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। পুনরায় একটি গান হইলে উপদেশ হয়। ইঁহার জন্মদিন সমাজের উৎসব দিন। দেব-সমাজের প্রচারক আছে। দুইটি হাই স্কুল, অনেকগুলি প্রাথমিক পাঠশালা, অন্ত্যজ জাতির জন্য বিদ্যালয়, প্রচারকদের জন্য শিক্ষালয় দেবসমাজের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। নারীশিক্ষার প্রতি দেবসমাজে বিশেষ দৃষ্টি আছে; ফিরোজপুরের একটি বিদ্যালয় চলিতেছে। মোটের উপর সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা প্রচার ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

শিক্ষাবিস্তার

দেবসমাজের শাস্ত্রের নাম দেবশাস্ত্র; অগ্নিহোত্রীর লিখিত এই পুস্তক পৃথিবীর আর সকল ধর্মপুস্তককে দূর করিয়া দিবে ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। হিন্দি, উর্দু, সিন্ধি ও ইংরাজীতে অনেক পুস্তিকা, চারিখানি পত্রিকা, ইঁহারা প্রচার করিয়াছেন।

ধর্মশাস্ত্র

১৯১৩ সালে অগ্নিহোত্রী তাঁহার পুত্রকে তাঁহার গদীতে বসাইলে তাঁহার প্রধান শিষ্য দেবরাম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া দেবসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া "বিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব-শিক্ষা" নামক গ্রন্থ লিখিয়া আপনাকে আদর্শ পুরুষ, পরম পূজনীয়, উপাস্য, পরিপূর্ণ জীবন দাতা, সমগ্র মানবের উদ্ধারকর্তা বলিয়া প্রচার করেন। দেবরামের সহিত অনেকগুলি লোক সমাজ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

শিবনারায়ণ পরমহংস

শিবনারায়ণ পরমহংস ১৮৪০ সালে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা তিনি কখনো পান নাই; তবে নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা অনেকে অনুসরণ করিতেছে। বারবছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হন ও দেশ-ভ্রমণকালে প্রথম কয়েক বৎসর কেবল জিজ্ঞাসুভাবে কাটান; পরে কেহ তাঁহার কাছে আসিলে তাঁহার ধর্মমত ব্যক্ত করিতেন। কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণী বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিব-নারায়ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। ১৮৮৮ সালে তাঁহার সহিত মোহিনী বাবুর প্রথম পরিচয়। তিনি তাঁহার উপদেশাদি লিপিবদ্ধ করিয়া বাংলায় 'অমৃত সাগর' নামে এক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। ১৯০৭ সালে ইংরাজীতেও একখানি বই লিখিয়া বিলাতে ছাপাইয়াছিলেন।

পরমহংসের শিষ্যের মধ্যে সাধারণ লোকই অধিক। তিনি কোনো ধর্ম সম্প্রদায় স্থাপন করিতে নিষেধ করেন, তবে বাংলাদেশের ও বিশেষত কলিকাতায় নানাস্থানে তাঁহার ভক্ত শিষ্য অনেক আছে। তিনি বলেন ঈশ্বর জ্যোতিতে প্রকাশিত এবং তাঁহার ইচ্ছা সর্ববিষয়ে প্রবল। দয়ানন্দের ন্যায় তিনি হোম ও যোগে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যেরা এগুলি যথারীতি পালন করেন। তিনি দয়ানন্দের ন্যায় প্রতিমাপূজার ঘোর বিরোধী; তাঁহার মতে দেবদেবী পূজার ফলে কেবল যে ব্যক্তিবিশেষের পতন হয় তাহা নয় প্রতিমাপূজক জাতিরও সর্বনাশ হয়। মনুষ্যপূজা বা অবতারাদি তিনি মানিতেন না।

শিবনারায়ণের ধর্মমত

সামাজিক দিকে তাঁহার মত খুব উদার। তিনি জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নারীশিক্ষার সমর্থন করিয়া

সামাজিক মত

বলিতেন যে পুরুষ ও স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার প্রয়োজন। জন্মান্তরাদির সহিত মুক্তি বা আধ্যাত্মিক জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে পৃথিবীতে একটি ভাষা হউক ও সর্বশাস্ত্র হইতে সর্বোৎকৃষ্ট মত সংগ্রহ করিয়া নূতন ধর্মগ্রন্থ প্রণীত করা হউক।

শিবনারায়ণ পরমহংস দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন বলিয়া তঁহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। বিহারের দক্ষিণে 'ঈশামশি পন্থি' নামে একটি সম্প্রদায় আছে।

ধর্মবিস্তার

তাহাদের অধিকাংশই মুচি। ইহারা ছাড়া কতকগুলি শিক্ষিত সাধু এই মতাবলম্বী। তাহারা খৃষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনী মিলাইয়া বিশ্বাস করে এবং বাইবেল পাঠ করে। প্রতি শুক্রবার তাহারা একত্র হইয়া উপাসনা করে। শোনা যায় শিবনারায়ণ পরমহংসের এক শিষ্যই এই মত প্রবর্তিত করেন।

আসামের কাছাড়ীদের মধ্যে 'মেখ্' নামে একটি জাতি আছে। শিবনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কালীচরণ নামে তাঁহার এক শিষ্য কলিকাতা হইতে পরমহংসদেবের উপদেশাদি

কাছাড় বরম সম্প্রদায়

সংগ্রহ করিয়া 'সার নিত্যক্রিয়া' নাম দিয়া মুদ্রিত করেন ও কাছাড়ে লইয়া গিয়া প্রচার করেন; তিনি সেখানে গিয়া বলেন এই পথে চলিলে তাহারা 'ব্রাহ্ম' হইবে (মেখ্ উচ্চারণে বরমো বলে)। এই 'বরমো'গণ আপনাদিগকে পৃথক জাতি বলিয়া অভিহিত করিতেছে। ইহাদের কোনো মন্দির নাই এবং প্রকৃতির পূজা করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে ফলমূল নিবেদন করে ও গন্ধদ্রব্যাদি পোড়ায়।

কালীচরণ ইহাদের নেতা এবং তিনি পরমহংসের শিষ্যগণ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি প্রচারকল্পে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্তমানে 'মেখ'দের আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন।

প্রাচীন সম্প্রদায় ও সংস্কার

হিন্দুধর্ম ও সমাজনীতির সংরক্ষণের ইতিহাস আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সমগ্র হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন নূতন নূতন মত ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে লাগিল তেমনি সাম্প্রদায়িক মতগুলিকে রক্ষার জন্য পুরাতন সমাজের মধ্যে নূতন শক্তি দেখা দিল। দক্ষিণভারতবর্ষে বৈষ্ণব মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রথমে দেখা যায়। ১৮৭৭ সালে কাঞ্চি সব্বারাওজী নামক জনৈক ইংরাজী শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এক সভা স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর এই সভা আহূত হয়। তিনলক্ষ টাকার মূলধনের একটি ব্যাঙ্ক আছে এবং ইহার আয় হইতে সমিতির কাজকর্ম চলে। বর্তমানে প্রাচীন পণ্ডিত পরিবারের বালকেরা ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইংরাজীতে ইহারা পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়া আপনাদের মতকে বাহিরের পাঁচজনের মতের সঙ্গে সমানক্ষেত্রে রাখিতে চাহিতেছেন।

মান্দ্রাজে মাধ্ব-সম্প্রদায়

বাংলাদেশের মহাপ্রভু চৈতন্যের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অন্যান্য বৈষ্ণবদের হইতে পৃথক। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা ইহাদের ধর্মতত্ত্বের প্রধান অঙ্গ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজে ফিরিয়া গেলে বৈষ্ণবসমাজে প্রাণের সাড়া পড়ে। তাঁহার গভীর প্রেম ও ভক্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যই নূতন জীবন আনিয়াছিল। সাহিত্যের দিক দিয়া বৈষ্ণবসমাজ প্রচারের কাজ বিশেষভাবে করিতেছে। এই নূতন আন্দোলনের মূলে শিক্ষিত সমাজ। খৃষ্টীয় পাদরীদের দ্বারা নিরন্তর আঘাত পাইতে পাইতে হিন্দুসমাজ আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য

বাংলায় চৈতন্য সম্প্রদায়

বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পাদরী ও পণ্ডিতগণ বলিতেছিলেন যে কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিরা মিথ্যা, গীতা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নয় ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক বীর, রামায়ণ মহাভারত ইতিহাস, শ্রীকৃষ্ণের জীবন আদর্শ ও অনুকরণীয়, গীতা শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি প্রতিপাদন করা নবযুগের প্রধান চেষ্টা হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের চেষ্টা। শিশিরকুমার ঘোষ ইংরাজীতে 'লর্ড গৌরাঙ্গ' ও বাংলায় অমিয়-নিমাইচরিত নামে প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন। খৃষ্টীয় একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের ন্যায় ইংরাজীতে 'শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। গীতার অসংখ্য সংস্করণ, ব্যাখ্যা ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাণী বিলাতেও প্রচারিত হইয়াছে। ১৭৮৫ সালে সব প্রথমে গীতা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়; তাহার পরেও অনেকে এই বই তর্জমা করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী 'প্রেমানন্দ ভারতী' নাম গ্রহণ করিয়া চৈতন্যের শিষ্য হন। আমেরিকায় গিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম প্রচার, একটি মন্দির স্থাপন ও ইংরাজীতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করেন।

উড়িষ্যার উত্তর তেলেগু প্রদেশের বৈষ্ণবেরা ১৯১০ সালে এক সভা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে একত্রে কাজ করিবার ব্যবস্থা করেন। আজকাল বাংলাদেশের একদল উচ্চ শিক্ষিত লোকের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের খুব আন্দোলন হইতেছে। গান, সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতি পুনরায় দেখা দিতেছে এবং প্রাচীন অনেক জিনিষের সমর্থন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। এছাড়া প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য 'শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া পত্রিকা' বহুদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

দাক্ষিণাত্যে মহীশূরাঞ্চলে রামানুজ সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। সেখানকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা খৃষ্টীয়

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বহুকাল হইতে সজাগ হইয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে রামানুজ সম্প্রদায়

গোবিন্দাচার্য্য স্বামী নামক একজন ইংরাজী-অভিজ্ঞ পণ্ডিত রামানুজের ধর্মমত অনেকগুলি পুস্তকে লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন; বিদেশেও এইসকল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। ১৯০২ সালে 'উভয় বেদান্ত প্রবর্তন সভা' নামক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্কৃত ও তামিল ভাষার মধ্য দিয়া প্রচার, বিদ্যার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ ও বক্তৃতা দিয়া ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার।

১৯১১ সালে এলাহাবাদে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারিটি শাখা (শ্রীবৈষ্ণব, মাধ্ব, বল্লভাচারী ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়) প্রথম মিলিত হইয়া পরস্পরকে বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করেন। ইহার পরে আরও কয়েকবার এইরূপ বার্ষিক সভা হইয়াছে।

বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রচারের ভাব দেখা দিয়াছে। তামিল প্রদেশ শৈবমতের খুব বড় কেন্দ্র।

শৈব সম্প্রদায়

ইংরাজী-শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সেখানেও ইংরাজীতে নিজ সম্প্রদায়ের কথা প্রচার করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে। বহুস্থানে শৈব-সভা স্থাপিত হইয়াছে। পালামকোট্টায় শৈব-সভা ১৮৮৬ সালে স্থাপিত হয়। ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত ইহাদের সম্বন্ধে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের জ্ঞান নিতান্ত অল্প ছিল। ডাঃ জি, য়ু, পোপ, মিঃ বারনেট্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সর্ব প্রথমে শৈবমতের কথা পশ্চিমে প্রচার করেন। নল্লস্বামী পিল্লে নামক জনৈক পণ্ডিত বহু ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শৈবমতের কথা প্রচার করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে শৈবসিদ্ধান্ত মহাসমাজ স্থাপিত হয় এবং প্রতিবৎসর এক এক নগরে এই সভার অধিবেশন হয়। উত্তর তামিল দেশে ১৯০৯

সালে আর একটি অনুরূপ শৈব সভা হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের কথা বলিয়ছি এবং ইহারা বহুল পরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে খৃষ্টীয় প্রভাব বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছে।

লিঙ্গায়েৎ

দ্বাদশ শতাব্দীতে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কল্যাণে বীর সম্প্রদায় গঠিত হয়; ইহাদের অপর নাম লিঙ্গায়েৎ। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতি ভেদ ছিল না; কিন্তু চারিদিকের আবহাওয়ার গুণে ও শিক্ষার অভাবে হিন্দুসমাজের সমস্ত বিধি নিষেধ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব লিঙ্গায়েৎ-শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। বহু ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকে মিলিয়া একটি ফণ্ড তুলিয়া (২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা) লিঙ্গায়েৎ বালকদের শিক্ষার জন্য খরচ করিতেছেন। ইহার কেন্দ্র ধরবার। বৎসর পনের পূর্বে নিখিল-ভারতীয় লিঙ্গায়েৎ সমাজের এক সভা হয়; এই সভা সেই হইতে বরাবর চলিতেছে। ধর্ম সম্বন্ধে কথা উঠিল খুবই অশান্তি হইত বলিয়া নেতারা শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ে তাঁহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

শক্তি বা তান্ত্রিক পূজা সাধারণ লোকের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধর্মসংস্কারক ও খৃষ্টীয় পাদরীগণ বহুকাল হইতে ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। অধুনা শক্তিপূজার নূতন ব্যাখ্যা হইতেছে। তন্ত্রের ব্যাখ্যাতা জনৈক উচ্চপদস্থ সাহেব, (Sir John Woodroffe); তিনি Arthur Avalon নাম লইয়া অনেক তন্ত্র

তান্ত্রিক পূজা

গ্রন্থ অনুবাদ ও তত্ত্ব গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি বই ইংরাজী ও সংস্কৃতে প্রকাশিত হইয়াছে ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নূতন আলোক ও আন্দোলন আনয়ন করিয়াছে।

ভারত ধর্মমহামণ্ডল

এই সব সাম্প্রদায়িক চেষ্টা ব্যতীত সমগ্র হিন্দুধর্মকে রক্ষা ও প্রচার করিবার জন্য ভারতধর্মমহামণ্ডল নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সনাতন আর্য্যসমাজ জাতিভেদ ও দেবদেবী মানে না বলিয়া তাহারা হিন্দুসমাজের শত্রু,—রামকৃষ্ণ মিশনে কায়স্থ নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হইয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শূদ্রকে সন্ন্যাসী করা হইয়াছে—ইত্যাদি অনেক অশাস্ত্রীয় কার্য্য তাঁহারা করেন, থিওজফিও নানা অবান্তর জিনিষে বিশ্বাসী; এইসকল বিষয়ের প্রতিবাদ করার জন্যও প্রাচীন হিন্দুধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মহামণ্ডল সৃষ্ট হয়। ১৮৯০ সালের পর হইতে নানা স্থানে পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠানের অধীন এই সনাতনধর্ম রক্ষার আয়োজন হইয়াছে। আর্য্যসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী-বিদ্যালয় হরিদ্বারের ঋষিকুল। মথুরাতে নিগমাগম মণ্ডলী, বাংলায় ধর্ম-মহামণ্ডলী, দক্ষিণ-ভারতে ভারত ধর্ম-মহামণ্ডল স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও যোগ ছিল না। ১৯০০ সালে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সভানেতৃত্বে দিল্লীতে এক বিরাট্ কনফারেন্স হয়। ইহার দুই বৎসর পরে (১৯০২) সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'ভারতধর্ম মহামণ্ডলে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া মথুরাতে কেন্দ্র করা হয়। ১৯০৫ সালে কাশীতে ইহার কেন্দ্র উঠাইয়া আনা হয় এবং এখনও এই আন্দোলনের কেন্দ্র কাশীতে।

মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য

ধর্ম-মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্মসম্মত হিন্দুধর্ম-শিক্ষার বিস্তার, বেদ স্মৃতি পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার, সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যের সকল শাখার বিস্তার;—হিন্দু প্রতিষ্ঠান ও তীর্থসমূহের শাস্ত্রসম্মত সংস্কার, ভারতবর্ষের নানাস্থানের শাখা সমিতিগুলির সহিত একত্র কাজকরা; নূতন নূতন হিন্দু-কলেজ, স্কুল, গ্রন্থাগার, গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ খোলা ও পত্রাজন-

গুলিকে এই সমিতির সহিত একত্র কাজ করিবার ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া কিছুই করিবার কোনো কথা নাই। মহা-মণ্ডল হইতে ইংরাজী-হিন্দী একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সমিতির অধীন প্রাদেশিক সমিতিসমূহ এবং তাহা-দের তত্ত্বাবধানে নানা সহরে ও গ্রামে প্রায় ৬০০ সংখ্যা সভা আছে; প্রচারকের সংখ্যা প্রায় ২০০। মহামণ্ডলের টাকার অভাব নাই, অভাব হইয়াছে উপযুক্ত লোকের। বর্ত্তমানে ইহার প্রধান কর্ম্মী বিখ্যাত মদনমোহন মালব্য। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ইহার সভাপতি বলিয়া লোকবল ও অর্থবলের অনটন হয় না। মালব্যজীর উৎসাহে কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান দেখিয়া দেশের লোক খুব উৎফুল্ল হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদর্শের মত জীবন যাপন করা বর্ত্তমানের এতই বিরোধী যে সকলেই পরস্পরকে উৎসাহিত করিয়া নিরস্ত হইতেছেন। অতি অল্প-সংখ্যক প্রাচীন পণ্ডিত ব্যতীত সকল প্রকার বিধি নিষেধ মানিয়া কেহই চলিতেছেন না।

কার্য্যপ্রণালী

প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য মিসেস্ বেসাণ্ট প্রমুখ থিওজফিষ্টগণ কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ স্থাপন করেন। ক্রমে এই কলেজকে একটি পৃথক বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা সকলের মনে দেখা দিল। মিসেস্ বেসাণ্টের সহিত নানাকারণে স্থানীয় হিন্দুদের ও একদল থিওজফিষ্ট-দের বিবাদ হইলে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজের আদেয়ারে যান। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্‌যোক্তা। কাশীতে অনেক জমি কিনিয়া বিপুল আকারে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন ভারতের সাত্ত্বিকতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না ও বিলাতী বিদ্যালয়ের কুশ্রী অনুকরণ বলিয়া অনেকে নিন্দা করিতেছেন।

কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার নূতন সম্প্রদায়

বাংলাদেশে কিছুকালের মধ্যে অনেকগুলি নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা ও তাহার প্রচার ইহাদের উদ্দেশ্য। এই সাধকশ্রেণীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই প্রথম। তাঁহার পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া গিয়া নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করেন।

ঠাকুর দয়ানন্দ

কিছুদিন হইল শিলচরে ঠাকুর দয়ানন্দের প্রভাব খুবই হইয়াছে। ইনিও শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-স্রোত পুনরায় আনিবার জন্য দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী কীর্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন। পুলিশের সঙ্গে ইহাদের একবার সংঘর্ষ হয় এবং একটি বড় রকমের মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া দয়ানন্দ শাস্তি পান। বর্তমানে তিনি ও তাঁহার ভক্তেরা পৃথিবীতে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈদ্যনাথের নিকট তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

কাঙ্গাল হরিনাথ আর একজন ভক্ত-সাধু। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। পশ্চিমভারতে গুজরাট অঞ্চলে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

অল্পদিন হইল ফরিদপুরে আর একজন সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ভগবানের অবতাররূপে দেখেন। তিনি আঠার বৎসর একঘরে বসিয়া যোগ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনিও ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিতেছেন এবং ফরিদপুরের বুনো ও জেলেদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিয়া তাহাদিগকে কীর্তনাদি শিখাইয়াছেন। তাঁহার মত বা শক্তির পরিচয় তিনি ধীরে ধীরে দিবেন।

জগদ্বন্ধু

তিনি বলেন যে গোবধ ও মদ্যপান এক এক মহা-

দেশ হইতে এক একবার উঠাইবেন; তাঁহার শিষ্যেরা বলেন পৃথিবীর উদ্ধার ইঁহার দ্বারা হইবে। ফরিদপুরের গোয়ালকাঠির গ্রামে তাঁহার আশ্রম, প্রতিবৎসরে সীতানবমীর সময়ে ঐ স্থানে উৎসব হয়। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে তাঁহার অনেক শিষ্য আছে।

পাবনায় অনুকূল ঠাকুর 'সৎসঙ্গ' নামে একটি সম্প্রদায়ের গুরু। তাঁহার আশ্রমে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক শিষ্য আছেন। তাঁহারা উচ্চ ফিজিক্স ও ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এ ছাড়া প্রতি জেলায় এরূপ ছোটখাটো অনেক সাম্প্রদায়িক গুরু ও অবতার আছেন; তাঁহাদের তালিকা দেওয়া অসম্ভব।

জৈন

বুদ্ধের ধর্ম প্রচারিত হইবার কিছু পূর্বেই উত্তর ভারতে জৈন ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে জৈনগণ তীর্থঙ্করদিগকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিলেন—ধর্মের প্রাচীন বিশুদ্ধতা নষ্ট হইল। এক সময়ে ইহাদের শক্তি সমগ্র ভারতকে যে অভিভূত করিয়াছিল তাহার নিদর্শন নানাস্থানের অসংখ্য মন্দির ও ধর্মশালা। আবু পর্বতের জৈন মন্দির ভারতীয় স্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। অতি প্রাচীনকালে জৈনদের মধ্যে দুইটি ভাগ হইয়া যায়—শ্বেতাম্বর ও দিগাম্বর। শ্বেতাম্বর মন্দিরে হিন্দু পুরোহিত কাজ করেন এবং প্রায় সমস্ত জৈন পরিবারে কোনো ক্রিয়াই ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। হিন্দুসমাজের মধ্যে জৈনগণ যে ক্রমেই বিলীন হইয়া যাইতেছে তাহার প্রমাণ গত ত্রিশ বৎসরের আদমসুমারী; ১৮৯১ সালে জৈনদের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, ১৯০১ সালে ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার, ১৯১১ সালে ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার, ১৯২১ সালে ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার।

জৈনদের অবনতি

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের আহমদাবাদে জৈনদের ভিতরে সংস্কারের এক আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই নূতন দল প্রতিমাপূজার ঘোর-বিরোধী; ইহাদিগকে স্থানকবাসী বলে।

জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনেক দিন হইতে প্রবেশ করা সত্ত্বেও শিক্ষা তেমনভাবে ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই; ইহার কারণ জৈনগণ ব্যবসায়েই তাহাদের মন প্রাণ দিয়াছে অন্য কোনো উচ্চ আদর্শের সহিত যোগস্থাপন করে নাই। আধুনিক সময়ে জৈনদের মধ্যে রামচন্দ্র রবজীভাই নামক একজন কাথিবাড়বাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তি ও মুমতি (মুখের কাপড়) ব্যতীত মোক্ষলাভ হয়—স্থানকবাসী হইয়াও শ্বেতাম্বরের মন্দিরে পূজা করা যায় ইত্যাদি উদার মত তিনি প্রচার করেন। ১৯০৯ সালে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

যে সাম্প্রদায়িক জাগরণ হিন্দুসমাজের মধ্যে দেখা গিয়াছে, জৈনদের মধ্যে তাহার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৮৯৩ সালে। ঐ বৎসরে দিগম্বরগণের প্রথম বাৎসরিক কনফারেন্স হয়। বৎসর দেড়এক পরে খৃষ্টীয়-যুবক-সমিতির অনুকরণে জৈন-যুবক-সমিতি নামে এক সমিতি গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে শ্বেতাম্বরগণের প্রথম কন্‌ফারেন্স ও ১৯০৬ সালে স্থানকবাসীদের প্রথম মিলন-সভা হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা এই তিন সম্প্রদায়কে এক করিয়া এক বিপুল শক্তি সৃষ্টি করেন।

কন্‌ফারেন্স

ইহাদের সকলের উদ্দেশ্য জৈন সাধু ও পুরোহিতেদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা; জৈন ছাত্রদের জন্য পৃথক্ হোষ্টেলাদি খোলা ও সেখানে জৈন ধর্মপুস্তক নিয়মিতভাবে অধ্যাপনা, ইংরাজী ও দেশী ভাষায় জৈন-পত্রিকা প্রকাশ, প্রাচীন গ্রন্থসমূহের উদ্ধার ও প্রকাশ, নূতন করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা ও প্রচার, এবং সমাজ ও ধর্মের সংস্কার সাধন।

দিগম্বর, শ্বেতাম্বর, স্থানকবাসী সকলকেই এই সংস্কারের জন্ত বদ্ধপরিকর। দিগম্বরগণ কাশীতে "স্যাদ্‌বাদ মহাবিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া অর্হতগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন ; দিল্লীতে একটি অনাথা-শ্রম, দেশের নানা স্থানে হোষ্টেল ও বোম্বাইতে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এ ছাড়া অনেকগুলি সংবাদপত্র বহুভাষায় প্রকাশিত হইতেছে—নারীদের জন্ত বিশেষভাবে একখানি কাগজ ইহাদের আছে। শ্বেতাম্বরগণও দিগম্বরদের পথ অনুসরণ করিয়াছেন ; তা'ছাড়া ইহাদের আর একটি কার্য্য বিশেষ প্রসংশনীয়। তাঁহারা জৈন সাহিত্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। জৈনগ্রন্থ প্রকাশের প্রথম বাধা প্রাচীনপন্থী জৈন সাধুগণ ; তাঁহারা এই সকল জ্ঞানগর্ভ পুঁথিসমূহ কিছুতেই বাহিরে প্রকাশ করিতে চান না।

আত্মোন্নতির চেষ্টা

অনেকগুলি ফাণ্ড হইতে বহু জৈনগ্রন্থ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দিতে যে কত বই আছে তাহা আমরা জানিতাম না। জৈন-যুবক-সমিতি বর্ত্তমানে ভারত-জৈন-মহামণ্ডল নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সভার কেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে। ইহার প্রধান কর্মচারী একজন সম্পাদক ; তিন সম্প্রদায়ের তিনজন সহকারী-সম্পাদক তাঁহাকে সাহায্য করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য তিন শাখার মধ্যে সখ্যতা ও ঐক্য স্থাপন। ইংরাজীতে 'জৈন গেজেট' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ইহাদের মুখপাত্র। আরাতে একটি বড় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া জৈন পুস্তক ও পুঁথি রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলাতেও জৈনধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। য়ুরোপীয় জৈনশাস্ত্রবিদ ও ভারতীয় জৈন-দের লইয়া একটি সভা গঠিত হইয়াছে।

বৌদ্ধদের মধ্যেও এই নূতন আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে। য়ুরোপীয় ও আমেরিকান সুধীগণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি মনোযোগ দিবার পর হইতে এদেশে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য বৌদ্ধগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটি—ইহার প্রথম প্রয়াস। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রদেশেই কেবল বৌদ্ধ আছে। তাঁহাদের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা দেখা দিয়াছে; তাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধদের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতায় বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করিয়াছেন; ইহাদের মুখ্য পত্রিকা 'জগজ্জ্যোতি'।

বৌদ্ধ সমাজ

এই বৌদ্ধ আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা শ্রীঅনাগরিক ধর্মপাল। ইনি সিংহল দেশীয় সন্ন্যাসী। তাঁহারই চেষ্টায় 'মহাবোধি জর্ণাল' ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর এই পত্রিকা চলিয়া বন্ধ হয়। পুনরায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বৌদ্ধগণ ধর্মপ্রচার ও সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

বুদ্ধগয়া

এক্ষণে বুদ্ধগয়ার মন্দির বৌদ্ধদের হস্তে লইবার জন্য এক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বুদ্ধগয়ার মন্দির বর্তমানে হিন্দু মোহান্ত ও পুরোহিতদের হস্তে। বৌদ্ধেরা এটির ভার লইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ ও আন্দোলন করিতেছেন।

নিখিলভারতীয় রাষ্ট্রীয়সভার উপর এ বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন যে হিন্দু ও বৌদ্ধদের একটি মিলিত কমিটির উপর বুদ্ধগয়ার মন্দিরের ভার ন্যস্ত হইবে, উহা সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধদের হস্তে যাইবে না। বৌদ্ধেরা ইহাতে খুসী নহেন।

৯। শিখধর্ম্ম ও সমাজ

শিখধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব কম হইলেও ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ইতিহাসের উপর তাহাদের প্রভাব কম নয়। হিন্দুধর্মের সকল প্রকার আচার, ব্যবহার, সংস্কারের প্রতিবাদ স্বরূপ এই ধর্ম স্থাপিত হয়। অপরদিকে মুসলমানদিগকে গ্রহণ করিবার পথও প্রথমে ইহারা পরিষ্কার করে। অনেকের ধারণা যে শিখেরা মুসলমান বিদ্বেষী। একথা সম্পূর্ণ ভুল। তাহারা মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের শত্রু ছিল—ধর্মের সঙ্গে তাহাদের সম্পূর্ণ যোগ আছে। এখন পর্য্যন্ত পঞ্জাবে স্কুল কলেজে কোনো সামাজিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে শিখ ও মুসলমানছাত্রদের মধ্যে যোগ সহজে হয়—হিন্দুছাত্রদের সহিত নহে।

শিখ সমাজ

পঞ্জাব বিজয়ের পর হইতে ঐ দেশে নানা ধর্মের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৪৯ সালে সর্বপ্রথমে খৃষ্টীয় পাদরীগণ ধর্মপ্রচারের জন্য তথায় উপস্থিত হন; তৎপরে ১৮৬৩ সালে ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭৭ সালে আর্য্যসমাজ ও ১৮৯৮ সালে দেবসমাজের আন্দোলন সুরু হয়। আধ্যাত্মিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে হিন্দু বা মুসলমানদের অপেক্ষা শিখদের অবস্থা ভাল নয়। হিন্দু প্রতিমা ও পুত্তলিকা শিখদের গৃহে গৃহে এমন কি মন্দিরেও প্রবেশ করিয়াছিল। 'গ্রন্থ-সাহেব' প্রতিমার ন্যায় পূজিত হয়।

খৃষ্টানদের ও বিশেষভাবে আর্য্যসমাজের গায়ে-পড়া আক্রমণের ফলে শিখসমাজ জাগিয়া উঠিয়াছে। ১৮৯০ সালে একদল শিক্ষিত শিখ শিখধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য দলবদ্ধ হন ও অমৃতসরে 'খাল্‌শা কলেজ' স্থাপন করেন। ছোট ছোট অনেকগুলি সমিতি শিক্ষা

ও সংস্কারে মন দিয়াছে। ১৯০৩ সালে ইংরাজীতে 'খাল্‌শা অ্যাড-ভোকেট্' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'শিখ্ রিভিউ' নামে আর একখানি পত্রিকা ইঁহাদের দ্বারা পরিচলিত হইত। ১৯০৫ হইতে শিখেরা যথার্থভাবে শিখ হইবার জন্য সচেষ্ট হইতেছে। মন্দির হইতে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি তাহারা দূর করিয়াছে এবং হিন্দু প্রভাব ও আর্য্য প্রভাব ও তাহারা প্রাণপণে বাধা দিতেছে। শিখেরা বেদ বা হিন্দুদের কোনো ধর্মগ্রন্থকে অভ্রান্ত বা অপৌরেষ বলিয়া মানে না; তাহাদের কাছে বাইবেল, কোরাণ, বেদ, বেদান্ত সবই সমান। গরু তাহারা খায় না ইহার কারণ গরু দেবী বলিয়া নয়—গরু কৃষিপ্রধান দেশের উপকারী সহায় ও ধন বলিয়া খায় না। শিখদের সামাজিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিধবাশ্রম, অনাথাশ্রম স্থাপন, অন্ত্যজ জাতির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা, শিখ ছাত্রদের জন্য হোষ্টেল খোলা, প্রতিবৎসরে শিক্ষা-কনফারেন্সের অধিবেশন প্রভৃতি নানা সদ্‌কর্মে শিখেদের বহুমুখী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষে শিখদিগের যেসকল স্থানে মন্দির আছে প্রায় প্রত্যেক স্থানে তাহাদের দশজন গুরুর কোনও গুরুর কোনও কীর্ত্তির স্মৃতি রক্ষার জন্য মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরগুলিকে 'গুরুদ্বার' বলা হয়। অমৃতধারী শিখনামে তাহাদের এক সম্প্রদায় গুরু গোবিন্দ সিংহের বিধান অনুসারে লম্বা চুল ও দাড়ি রাখিত ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুঘল সম্রাট ফেরকশাহার শাসনকালে এই শিখদিগের উপর অতিশয় উৎপীড়ন হয়। উৎপীড়নের ফলে তাহাদিগকে লোকালয় ছাড়িয়া পাহাড়ে পর্বতে আশ্রয় লইতে হয়। তাহাদের অবর্তমানে মন্দিরগুলি অন্য সম্প্রদায়ের শিখগণ প্রাণপণে রক্ষা করিয়াছিল। ক্রমশ মুঘল রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শিখগণ পুনরায় আপনাদের লুপ্তশক্তি ফিরিয়া পাইল। পঞ্জাবের প্রায় সকল

স্থানে বড় বড় শিখ সর্দারগণ একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। শিখদিগের দুঃসময়ে যেসকল শিখ মন্দিরগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের হস্তেই 'গুরুদ্বার'গুলির পরিচালনার ভার রহিল; সর্দারগণ ইহার উপর মন্দিরের পরিচালকদিগকে মন্দিরের কাজের জন্য মন্দিরসংলগ্ন ভূমি কিছু কিছু প্রদান করিলেন। এই পরিচালকগণকে মোহান্ত বলা হয়। মোহান্তগণ এইরূপ ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া ক্রমশ তাহার অপব্যবহার আরম্ভ করিলেন। নিজেদের বিলাসের জন্য মন্দিরের অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন; অসজ্জীবন যাপন করিয়া মন্দিরের কাজের ক্ষতি করিতে লাগিলেন। প্রকৃত ধর্ম পিপাসু শিখগণ ইহা লক্ষ্য করিয়া স্বভাবত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শিরোমণি গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটীর উদ্দেশ্য 'গুরুদ্বার'গুলির সংস্কার করা। কমিটী মোহান্তদিগের নিকট আবেদন পাঠাইলেন যে তাঁহারা কমিটীর প্রতিনিধিস্বরূপ মন্দির পরিচালনা করুন, মন্দিরের আর্থিক ও অন্যান্য ভার কমিটীর উপর থাকিবে। যেসকল স্থানে মোহান্তদিগের নিকট হইতে মন্দিরের সকল ভার লইতে বাধ্য হইতে হইল সেখানে তাঁহাদিগকে ভরণপোষণের জন্য অর্থ সাহায্য করা হইবে কমিটী এইরূপ স্থির করিলেন। কোনও কোনও মোহান্ত কমিটীর প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন। কেহ কেহ এই বন্দোবস্ত স্বীকার করিয়া লইলেন।

গুরুদ্বার

শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী

কিন্তু ১৯২১ এর ফেব্রুয়ারি মাসে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল। নানকানা সাহেব মন্দিরের হিন্দু মোহান্তকে শিখেরা অপসারিত করিতে যায়; মোহান্তের ষড়যন্ত্রের ফলে ১৩০ জন শিখ বীভৎসভাবে নিহত হইল। এই ঘটনায় সমগ্র শিখজাতি মোহান্তদের বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠিল।

নানকানা সাহেব

অমৃতসরের উত্তরপূর্ব কোণে ১২ মাইল দূরে গুরুকা-বাগ বলিয়া

একটা জায়গা আছে। সেখানে দুটী মন্দির আছে। ষষ্ঠ গুরু অর্জ্জুন-দেবের নামে একটী, নবম গুরু তেগবাহাদুরের নামে অপরটী। তেগবাহাদুরের মন্দিরের সংলগ্ন খানিকটা জমি আছে। এই মন্দিরের মোহান্ত সুন্দরদাস। সুন্দরদাসের চরিত্র ভাল নয় ইহা জানা ছিল। কমিটীর সহিত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে ইনি কমিটীর তত্ত্বাবধানে কার্য্য চালাইবেন। কিন্তু তিনি বন্দোবস্তের কথা পরে অস্বীকার করেন। এখন সেই মন্দির সংলগ্ন জমি লইয়া মোহান্তের সহিত কমিটী ও অন্যান্য শিখদিগের বিবাদ বাধিল। মোহান্ত বলেন সেই জমি তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অপর পক্ষ বলেন উহা মন্দিরের সাধারণ সম্পত্তি। তাঁহারা বলেন ঐ জমি হইতে কাঠ কাটিয়া মন্দিরের অতিথিশালার রন্ধন কার্য্যে বরাবর ব্যবহার করা হয়; সুন্দরদাস বলেন পূর্ব্বে ঐ উদ্দেশ্যে ওখান হইতে কাঠ কাটা হয় নাই।

গুরুকা-বাগ

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট পূর্ণিমার দিনে মন্দিরের অতিথিদের রন্ধনের জন্য ঐ জমি হইতে কাঠ কাটা হয়। ৯ই আগষ্ট যাঁহারা কাঠ কাটিয়াছিল পুলিশ কর্ত্তৃক তাহারা ধৃত হন। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চৌর্য্য অপরাধে তাঁহাদের বিচার হয়। তাঁহারা কোনও প্রকার আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না। কিছুকালের জন্য তাঁহাদিগের কারাবাস হইল। এই ব্যাপারে শিখগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। দলে দলে শিখ সেই জমিতে কাঠ কাটিতে যাইলেন ও পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। প্রহার ও নির্যাতন বহুদিন ধরিয়া চলিল। পাঁচ শত আকালী শিখ পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া কারাগারে প্রেরিত হন। বহু শিখসৈন্যও এই দলে ছিল। এইরূপ আন্দোলন যখন চলিতেছে, তখন লাহোরের সার গঙ্গারাম মোহান্তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া জমিটি এক বৎসরের জন্য ইজারা লইলেন এবং তিনি সেই অধিকারে শিখদিগকে সেই জমি হইতে কাঠ কাটিতে অনুমতি

গুরুকা-বাগ সত্যগ্রহ

দিলেন। ১৯২২ সালের ১৮ই নভেম্বর হইতে এই বন্দোবস্তের ফলে শিখগণ পুনরায় জমি হইতে কাঠ কাটিবার অনুমতি পাইলেন।

ছয় মাস হইতে দুই বছর পর্য্যন্ত কারাগারে থাকিবার ব্যবস্থা যাঁহাদিগের উপর হইয়াছিল তাঁহাদিগকে ১৯২৩ সালের মে মাসে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

১৯২৩ সালের জুলাই মাসে নাভারাজ্যের ব্যাপার লইয়া নূতন একটী বিবাদের সূত্রপাত হইল। নাভার কয়েকজন কর্মচারী পাতিয়ালার রাজার কয়েকজন কর্মচারীকে অপমান করেন এইরূপ একটী জনশ্রুতি উঠায় গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলেন; ইতিমধ্যে নাভার রাজা নিজেই রাজ্যের শাসনভার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পাঠাইলেন। গভর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইয়া রাজার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে লইলেন। মহারাজার ভরণপোষণের জন্য রাজ্য হইতে তিনি নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য পাইবেন এইরূপ স্থির হইল। শিরোমণি-গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-কমিটী এই ঘটনাটী লইয়া একটী আন্দোলন তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন নাভার মহারাজাকে জোর করিয়া গভর্ণমেণ্ট পদচ্যুত করিয়াছেন। কমিটীর তত্ত্বাবধানে স্থানে স্থানে শিখদিগের সভা হইতে লাগিল; নাভার মহারাজাকে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাহাদের উদ্দেশ্য। নাভারাজ্যের অন্তর্গত জয়তোঁ (Jaiton)এর মন্দিরে একটী বিরাট সভা হয়; তাহাতে গভর্ণমেণ্টের অবিচার সম্বন্ধে উত্তেজনাপূর্ণ কতকগুলি বক্তৃতা হয়। ইহাতে নাভা সরকারের নিযুক্ত লোক আসিয়া সেই সভা ভাঙিয়া দেন ও বক্তাদিগকে অবরুদ্ধ করেন। এই ব্যাপারে শিখগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সেই মন্দিরে প্রতিদিন ২৫ জন করিয়া জাঠ গিয়া

নাভা-পাতিয়ালা ব্যাপার

ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিল। নাভা সরকার বলিলেন যে জয়তোঁর মন্দিরে কোনও প্রকার আলোচনা হইতে পারিবে না এবং গ্রন্থসাহেব পাঠও সংক্ষেপে সারিতে হইবে। শিখগণ এইরূপ কোনও সর্তে আবদ্ধ হইতে চাহিলেন না; পূর্বেকার মত ২৫ জন জাঠ প্রতিদিন গ্রন্থপাঠের নিমিত্ত আসিয়া ধৃত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভাইফরু নামক স্থানের মন্দিরে নূতন দ্বন্দ্ব বাধিল। মন্দিরের সংলগ্ন জমির কতকগুলি প্রজাকে কমিটী সরাইয়া দিতে চাহেন। তাহারা স্বেচ্ছায় যাইতে না চাওয়ায় শিখেরা তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করে বলিয়া প্রকাশ। সরকার সেই প্রজাদের পক্ষ লইয়া জবরদস্তকারী শিখদিগকে গ্রেপ্তার করিতে যাওয়াতে নূতন নূতন আকালীদল তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম-মন্দিরে সরকারের হস্তক্ষেপ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। গ্রেপ্তারও পূর্ববৎ চলিতে লাগিল।

অপরদিকে জয়তোঁর দ্বন্দ্ব সমভাবে চলিতেছিল। অমৃতসর হইতে কমিটী কর্তৃক প্রেরিত পাঁচশত "সহিদী" জাঠ জয়তোঁর মন্দিরে যাত্রা করে। পথে ইহাদের সহিত কতকগুলি দুর্বৃত্ত যোগদান করিয়া বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখায়। ফলে পুলিশের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ বাধে। শিখদলের মধ্যে প্রায় ৫০ জন হতাহত হয় এবং শতাধিক শিখকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই লইয়া দেশের সর্বত্র আন্দোলন ও আলেচনা উপস্থিত হয়।

সমগ্র শিখসমাজের মধ্যে এইরূপ অশান্তি ও চাঞ্চল্য দেখিয়া সরকার পক্ষ হইতে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। এসেমব্লীতে 'গুরুদ্বার বিল' উপস্থিত করা হইয়াছে। শিরোমণি-গুরুদ্বার-প্রবন্ধকের উপর মন্দিরাদির ভার অর্পিত হইতেছে; কারারুদ্ধ আকালীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাবে সরকার স্বীকৃত হওয়ায় শিখগণ সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

১০। বৈদেশিক ধর্ম

পার্সীধর্ম ও সমাজ

বৈদেশিক ধর্মের মধ্যে পার্সীধর্ম প্রাচীনতম। পার্সীদের সহিত বৈদিক আর্য্যদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; বৈদিক ভাষা ও পার্সীদের আবেস্তার ভাষার সহিত যথেষ্ট মিল আছে। উভয়ের দেবতাদের মধ্যে নামের ও স্বভাবের সাদৃশ্য দেখা যায়। এককালে এই উভয় শাখা একত্র বাস করিতেন, তারপর ধর্মসম্বন্ধীয় মতদ্বৈত হওয়ায় ইঁহারা পৃথক্ হন। পারসিকদের প্রধান দেবতা অহুরমজ্দ।

বৈদিক আর্য্যদের সহিত ইরাণীদের মতভেদ ও বিচ্ছেদ

বিরোধী হিন্দু-আর্য্যেরা এই অসুরকে ঘৃণা করিতেন। বৈদিক লোকেরা সোমরসকে মাদকরসে পরিণত করিয়া পান করিতেন; পারসিকেরা ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এইরূপ নানা মতভেদের ফলে তাঁহারা পৃথক হইলেন। পারসিকেরা আর একটি জিনিষকে স্বীকার করিতেন; সেটী হইতেছে অহুরমজ্দ ব্যতীত আর একটী দুষ্ট শক্তির অস্তিত্ব; তাহাকে তাঁহারা 'অহ্রিমণ' বলিতেন। এই সয়তানকে হিন্দুরা কখনো স্বীকার করেন না—বুদ্ধদেবের 'মার' কেহ কেহ মনে করেন এই পারসিক সয়তানের রূপান্তর। খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে জরথুস্ত্র নামে জনৈক ঋষি পার্সীধর্ম সংস্কার করিয়া নূতনভাবে প্রচার করেন; সেইজন্য পার্সীদের ধর্মকে জরথুস্ত্রের ধর্ম বলে।

আদিম পারসিকেরা পারস্যে বাস করিত বলিয়া তাহারা ইতিহাসে পারসিক নামে খ্যাত। মুসলমানদের দ্বারা পরাভূত হইলে অধিকাংশ পারসিক ইস্‌লাম ধর্ম অবলম্বন করে। যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করে নাই, তাহারা ৭১৭

পারসিকদের ভারতে আগমন।

খৃষ্টাব্দে ভারতের গুজরাট অঞ্চলে আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়। সেই অবধি পার্সীরা ভারতের লোক—ভারতের সুখ দুঃখের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ জড়িত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পার্সীদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা কোনো অংশে ভাল ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বহুশতাব্দী বাস করিয়া পার্সীদের ভিতর ক্রমে ক্রমে নারীঅবরোধ, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। হিন্দু পূজাপার্বন মানিয়া ও বংশানুগতিক পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া পার্সীরা প্রাচীন ধর্ম ধ্বংস করিতে বসিয়াছিল। অনেকে আবেস্তার (ইহাদের প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ) শ্লোক মুখস্ত করিত কিন্তু তাহার অর্থ অধিকাংশই জানিত না।

সংস্কার ও সংরক্ষণ

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও খৃষ্টান আক্রমণ সমভাবে ভারতের সুপ্ত মনকে জাগাইয়া তুলিল। ১৮৪৯ অব্দে পার্সীদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে রহনুমৈ কজ্‌দয়স্‌নন্‌ সভা বা ধর্ম সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দাদাভাই নৌরজী তখন যুবক; তিনি, ওয়াচা, প্রভৃতি শিক্ষিত পার্সীরা ইহার উদ্‌যোক্তা। 'রস্ত্‌ গোকাতর্‌' নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করিয়া তাহাতে সংস্কারের কথা, উদারনীতির কথা আলোচনা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতা করিয়া, সভা আহ্বান করিয়া, সাহিত্য প্রচার করিয়া তাঁহারা পার্সী সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। গোঁড়া পার্সীরা খুবই প্রতিবাদ করিল—কিন্তু এ সত্বেও উহাদের কাজ ভালই চলিয়াছে।

আবেস্তা আলোচনা

পার্সীদের ধর্ম-পুস্তক আবেস্তা য়ুরোপে বহুকাল হইতে অধীত হইতেছে। কিন্তু এই সমাজের লোকেরা তেমন করিয়া উহা কখনো অধ্যয়ন করে নাই। কামা নামক জনৈক পার্সী সর্বপ্রথম য়ুরোপে গিয়া আবেস্তা অধ্যয়ন করেন। দেশে

আসিয়া তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আবেস্তা অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ভরুচা, কংগা বিখ্যাত।

ইতিমধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের সহিত ইংরাজী ভাষাও পার্সী-দের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। তাহার ফলে এই সমাজের মধ্যে বৈদেশিক হাবভাব ও আদর্শ এমনিভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে পার্সীরা প্রাচীনের ভালটুকু হইতেও অনেক দূরে পড়িয়াছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্য তাহাদের মনকে বিশেষভাবে গ্রাস করিয়াছে।

বর্তমান আন্দোলন

পারসীকদের মধ্যে বি, এম, মালাবারীর নাম ভারতের সর্বত্র পরিচিত। তিনি ভারতের নারীজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে দহলা নামে একজন পুরোহিত য়ুরোপ ও আমেরিকায় পার্সীধর্ম ও ভাষা অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পার্সী-দার্শনিক পুস্তকখানি বিদেশেও আদৃত হইয়াছে। তিনি জরথুস্ত্রের বিশ্বাসীগণের এক কন্‌ফারেন্স স্থাপন করিয়াছেন। ১৯১০ সনে ইহার প্রথম অধিবেশনে রক্ষণশীল ও উদার দলের মধ্যে ভীষণ অশান্তি হয়। ইহার পরের সভাগুলিতে উভয় দলের উষ্ণতা কমিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। এইসব সভায় কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইহার অনেকগুলি কৃতকার্য্যতার সহিত কার্য্যে পরিণত হইতেছে। যথা,—১ পার্সীধর্ম প্রচার, ২ পঞ্জিকা সংস্কার, ৩ পার্সী পুরোহিতদের শিক্ষা, ৪ শিল্প ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা, ৫ কয়েকজন ডাক্তারকে দিয়া বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের শরীর পরীক্ষা, ৬ দরিদ্র সেবা, ৭ দুগ্ধশালা স্থাপন, ৮ কৃষির ব্যবস্থা। এই উদারপন্থীদের মধ্যে ডাঃ দহলা, স্যর মেহ্‌টা, স্যর দিন্‌শ্‌ পেটিট্, বিখ্যাত তাতা পরিবার, মোদী, ডাঃ কাট্রকের নাম উল্লেখযোগ্য। পার্সী পঞ্চায়েত নামে একটি ফাণ্ড ও সভা আছে। এই সভা সাহিত্য প্রচারকল্পে অনেক কাজ করিতেছেন।

ইসলাম ধর্ম ও সমাজ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইসলামধর্ম ভারতে প্রচারিত হইতেছে। হিন্দুদের জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক অধিকার প্রভৃতি অনেকগুলি কারণ হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের লোককে ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সহায়তা করিয়াছিল। উদার ধর্মমত, অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা, কখনো কখনো মুসলমান রাজপুরুষদের উৎপীড়ন প্রভৃতি নানা কারণ উচ্চবর্ণের হিন্দুকে ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট বা বাধ্য করিয়াছিল।

ইসলাম প্রচার

মুসলমান ধর্ম এতকাল হিন্দুদের মধ্যে থাকিয়া কোনো কোনো স্থলে যে হিন্দুভাবাপন্ন হয় নাই তাহা বলা যায় না। মুসলমানদের মধ্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন লোক আছে। হিন্দুদের মধ্যে কবীর, নানক, দাদু, রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই হিন্দুপ্রভাব মুসলমানদের মধ্যে কোনো কোনো স্থলে স্পষ্টই দেখা যায়। মান্দ্রাজের দুদেকুল সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকট হইতে ধর্মসাধন গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গদেশে ফকির ও বাউলদের মধ্যে গোঁড়ামী দেখিতে পাওয়া যায় না। বোম্বাইতে কয়েকটি সম্প্রদায়কে ১৯১১ সালের আদমসুমারকালে হিন্দু-মুসলমানের মাঝামাঝি ফেলা হইয়াছিল। গত সুমারে তাহাদিগকে মুসলমানের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। রাজপুতানার মালখানা মুসলমানেরা পুনরায় 'আর্য্য' সমাজভুক্ত হইয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশে মনযোগী নামে এক সম্প্রদায় হিন্দু বা মুসলমানের কোনো ধর্মের মধ্যই গণ্য হইতে চায় না। উত্তর ভারতবর্ষের দুই সীমান্তে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। উত্তর-পশ্চিম দিকে সীমান্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু ও কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান। সমগ্র-

হিন্দু প্রভাব

ভারতের মুসলমানঅধিবাসীর শতকরা ৩৬ জনই বাঙালী-মুসলমান। পাঠানরা এদেশে বহুকাল রাজত্ব করে। আদমসহীদ, শাহজলাল প্রভৃতি বিখ্যাত প্রচারকগণ এদেশে আসিয়াছিলেন; তাহার ফলে এখানকার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইসলাম প্রচারিত হয়। পঞ্জাবের ১ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ১ কোটির উৎপত্তি হিন্দু হইতে। তাহাদের 'জাতির' উপাধি এখনো আছে, যেমন রাজপুত, জাঠ, অরইন, গুজর, মুচি, তেলি ইত্যাদি। পাটান, বলোচ, মুঘল বলিয়া যাহারা পরিচিত তাহাদের মধ্যে বাহিরের মুসলমান ছিল।

হিন্দু উৎপত্তি

মুসলমানের সংখ্যা বাংলাদেশেই সর্বাধিক। বাঙালী-মুসলমানের অধিকাংশই পূর্বে হিন্দু বা নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ প্রভৃতি ছিল বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। কখনো উৎপীড়ন, কখনো সামাজিক অধিকার, কখনো ধর্মমতের সরলতা লোককে ইসলামে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এখনো ইসলাম প্রচার চলিতেছে, তাহা মুসলমানী কাগজ দেখিলে বুঝা যায়। মুসলমানেরা প্রায় সাতশত বৎসর ভারতে রাজত্ব করেন; সুতরাং ইতিমধ্যে ভারতের উপর তাঁহাদের ও তাঁহাদের ধর্মের উপর হিন্দুর প্রভাব যে পড়িবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অজ্ঞতা মূঢ়তা হিন্দু মুসলমান উভয়ের সমান ছিল। বাহিরের পৃথিবীর জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়; জ্ঞানবিজ্ঞান অত্যন্ত স্থূল ও মূঢ় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্যযুগের মুসলমানী জ্ঞান-ধারার চিহ্ন গত শতাব্দীতে আদৌ পাওয়া যায় না। নূতন জ্ঞানের আলোকে মুসলমান-সমাজ চক্ষু ফিরাইয়া তাকায় নাই। অবশেষে বাহিরের আঘাত এই সমাজকেও স্পর্শ করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সমাজের অবস্থা

সৈয়দ আহমদ খাঁ রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় মুসলমান সমাজের

কল্যাণের জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি বুঝিলেন যে কি মূঢ়-অন্ধতা ও কুসংস্কার দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা বুঝিবা-মাত্র তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা তাঁহার স্বধর্মাবলম্বী লোকদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং নানা উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে পশ্চিমের জ্ঞানালোক ছাড়া এদেশের মুক্তি নাই। ১৮৬৯ সালে তিনি ইংলণ্ডে তাঁহার পুত্রকে লইয়া গমন করেন ও প্রায় দেড় বৎসর কাল সেখানে বাস করিয়া সেখানকার বিদ্যাপীঠগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। দেশে আসিয়া তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য ত হ জ ই ব্ উল অ খ লা ক্ নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় মুসলমান ও য়ুরোপীয়দের একত্র ভোজন বিষয়ে (অখাদ্য কিছু না থাকিলে) ও মুসলমানদের সামাজিক রক্ষণশীলতা বিষয়ে লিখিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে একঘরে করিয়া সমাজ-চ্যুত করিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবে বলিয়াও ভয় দেখাইল।

সৈয়দ আহমদ খাঁর সমাজ সংস্কার

তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাজ হইল আলিগড়ের কলেজ স্থাপন। এখানে ছাত্রগণকে বিলাতের অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় মানুষ করিতে হইবে ইহা হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। মুসলমান ধর্মের সমস্তই এখানে শিখাইবার ব্যবস্থা হইল। একজন জ্ঞানী বিচক্ষণ মৌলবী বিদ্যার্থীগণের ধর্মনীতি শিক্ষার জন্য নিযুক্ত আছেন। শিয়া সুন্নী মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন অধ্যাপনা আরম্ভের পূর্বে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। কলেজের মসজিদে ছাত্রেরা উপস্থিত থাকিতে বাধ্য এবং রমজানের সময়ে উপবাস করিবার জন্য বলা হয়। এখানকার শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা বৈদেশিক ভাব যথেষ্ট পরিমাণে পাইতেছে।

আলিগড় কলেজ স্থাপন

মুসলমান শিক্ষা সমিতি

১৮৮৬ সালে সৈয়দ আহমদ মুসলমান শিক্ষার কনফারেন্স স্থাপন করেন। ইহার অধিবেশন প্রতিবৎসর এক এক সহরে হয়। গত কয়েক বৎসর হইতে মুসলমান মহিলাদেরও একটি অনুরূপ সভা হইতেছে।

ধর্ম সংস্কার

মুসলমান ধর্মসংস্কারে সৈয়দ পশ্চাৎপদ হন নাই। মহম্মদের ধর্মমতকে দেশ ও কালোপযোগী করা ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। দেশোপযোগী অনেক মত ও বিধান কোরাণে নিহিত আছে; সেগুলির সহিত বর্তমানের জ্ঞানবিজ্ঞানকে খাপ খাওয়াইয়া না লইতে পারিলে মুসলমান ধর্ম দুর্বল হইয়া পড়িবে। তিনি খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইতেন এবং কোরাণ ও বাইবেল উভয় গ্রন্থে মানবীয় ও দৈবভাব উভয়ের সমাবেশ হইয়াছে মনে করিতেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন এবং যুক্তির সূক্ষ্ম পথ দিয়া ধর্মকে বিচার করিয়া লইতেন। সৈয়দ গভর্ণমেণ্টের দ্বারা স্যর উপাধিতে ভূষিত হন ও বড়লাটের সভায় সদস্য মনোনীত হন।

তাঁহার যুক্তিবাদ বর্তমানে মৌলবী চিরাগ আলি ও আমীর আলি সাহেব দেশময় প্রচার করিতেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর আরবের ইসলামধর্ম ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সমাজিক অবস্থার সহিত কোনো প্রকারে মিলিত হইতে পারে না। সেইজন্য আমীর আলি সাহেব 'ইসলামের ভাব' বলিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

আলিগড় ও তদ্দেশীয় মুসলমান সমাজ ও বহু শিক্ষিত মুসলমান তাঁহাদের ধর্মকে নূতন করিয়া পাইতেছেন ও নূতনভাবে বর্তমানের উপযোগী করিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এই উদার নীতি সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমান গ্রহণ করে নাই এবং ইহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিক্রিয়া চলিতেছে।

ইসলামধর্মের মধ্যে সংস্কার ও সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা দিয়াছে আহম্মদীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে। পঞ্জাবে খৃষ্টান ধর্ম ও আর্য্যসমাজের প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া-রূপে এই ধর্মমত দেখা দেয়। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু এই তিন ধর্মের সমন্বয়ের আদর্শ লইয়া এই নূতন মত প্রচারিত হইয়াছে।

অহমদীয় ধর্মমত

পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় কাদিআন গ্রামে এক প্রাচীন স্থফী পরিবারে মির্জা গুলাম আহমদের জন্ম। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। তিনি তাঁহার প্রচার কার্য্য ১৮৬৯ সালে আরম্ভ করেন; তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯০৮ সালে।

আহমদ বলেন, "আমি খৃষ্টীয় সমাজের প্রতিশ্রুত পরিত্রাতা (মেসায়া) মুসলমান সমাজের মাহাদি ও হিন্দুদের শেষ অবতার কলি। আমার আবির্ভাব কেবল মুসলমান ধর্মসংস্কারের জন্য নহে, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান—এই তিন মহাধর্মের উদ্ধার আমারই দ্বারা সাধিত হইবে। আমি খৃষ্টান ও মুসলমানদের প্রতিশ্রুত মেসায়া মাহাদি ও হিন্দুদের অবতার।" আহমদের মতানুসারে যীশু ক্রুসে দেহত্যাগ করেন নাই; কয়েকঘণ্টা মাত্র ক্রুসে থাকিবার পর তাঁহাকে নামাইয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে তিনি চল্লিশ দিন পরে আরোগ্য লাভ করেন ও সেখান হইতে ভারতে আসিয়া বাস করেন। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের নিকটে যুস্ আসফ্ নামে কোনো মুসলমানী কবর আছে। আহমদীয় মতে 'যুস্' যীশু শব্দের অপভ্রংশ ও আসফ্ অর্থে সংগ্রহিতা। এই কবর যীশুরই কবর। আহমদ কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি হইতে ইহাই প্রমাণ করিতে চান যে তাঁহার আবির্ভাবের সময়, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সবই শাস্ত্রমত। যীশুর জীবনের সহিত তাঁহার জীবনীর সৌসাদৃশ্য আছে; ভারতের সহিত ইহুদীদের অবস্থার মিল আছে—ইহুদীরা রোমানদের অধীন, ভারতও ইংরাজদের অধিকার-

ভুক্ত ; ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন ও তৎকালীন রোমানদের তুল্য। এই সব দেখাইয়া তিনি বলেন যে খৃষ্টের মিসন তিনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন।

তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি খৃষ্টের ন্যায় অলৌকিক ঘটনার দ্বারা ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। শোনা যায় তিনি আর্য্যসমাজের পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুর কথা ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন। লেখরাম খুন হন এবং অনেকের সন্দেহ হয় যে একজন মুসলমান জিজ্ঞাসুভাবে পণ্ডিতের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন—ইহা তাহার কর্ম। কিছুদিন ধরিয়া আহমদ এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার বাণী বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয় নাই। অবশেষে ১৮৯৯ সালে পঞ্জাব সরকার আহমদের এই শ্রেণীর ভবিষ্যদবাণী ও অপরের সম্বন্ধে কোনো প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ১৮৯৮ সালে তিনি প্লেগের এক প্রকার দৈব ঔষধ প্রচার করিলেন। সরকার বুদ্ধি করিয়া সেবারও তাঁহাকে বাধা দিলেন। আহমদ স্বয়ং ১৯০৮ সালে কলেরা রোগে মারা পড়েন।

আহমদ তাঁহার জীবনের শেষভাগে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তিনি খৃষ্টের চেয়ে বড়। খৃষ্টের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার কটু উক্তি করেন। আহমদের সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র কাদিআনে। তাঁহার কৃতকার্য্যতার কারণ তিনি খুব জবরদস্ত লোক ছিলেন—চারিদিক গুছাইয়া ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি 'আলহ-কম্' নামে একখানি পত্রিকা উর্দু ভাষায় ও ইংরাজীতে "রিভিউ অব্ রিলিজন্" নামে পত্রিকা ও বহু পুস্তিকা, পত্র, আবেদনাদি প্রকাশ করেন। গোঁড়া মুসলমানেরা এই ধর্মকে খুবই নিন্দা করেন এবং তাহাদের সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া ঘোষণা করেন।

আহমদের শিষ্য হাকিম নূর-উদ্দীন্ আহমদের ন্যায় মোটেই যোগ্য

ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে এই সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শোরাপুর নামে এক স্থানে এই সমাজের একটি শাখা ছিল; সেখানকার নেতা অব্দল্লা আপনাকে গুরু বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

বিলাতে এই সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জার্মানীতেও একটি আছে। পূর্বে যেখানে মুসলমানের মস্‌জিদ্ ছিল তাহারই নিকটে খোদা কমল্ উদ্‌দীন তাঁহার প্রচার আলয় খুলিয়াছেন। লর্ড হেডলে নামক জনৈক ইংরাজ আহ্মদীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাতে ইঁহাদের উৎসাহ খুব বাড়িয়াছে এবং দিল্লী হইতে দুইজন মৌলবী সেখানে প্রেরিত হইয়াছেন। য়ুরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম প্রবেশ করিতেছে।

খিলাফৎ

গত য়ুরোপীয় সমরে তুর্কীর পরাজয় ও লাঞ্ছনার সময়ে ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন উপস্থিত হয়। মুসলমানদের নিকট ধর্ম ও রাজ-নীতি এক বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় দেশমধ্যে খিলাফৎ আন্দোলনের আশ্রয়ে মুসলমানদের মধ্যে গোঁড়ামী বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি নষ্ট হইতেছে। সামাজিক ক্ষেত্রেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতিশয় তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মুসলমানের শক্তির কারণ

মুসলমানদের মধ্যে মিলিত হইবার কতকগুলি সাধারণ উপাদান আছে; যথা—একধর্ম বিশ্বাস, এক সামাজিক অধিকার, একত্র পানাহার, এক ভাষা। ভারতের মুসলমানেরা অধিকাংশ-ক্ষেত্রে উর্দু বুঝে; ইহাই তাহাদের ভাষা। হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উর্দুকে রাজভাষা ও শিক্ষার ভাষা করায় উহা দক্ষিণেও প্রচারিত হইতেছে। বাংলাদেশে মুসলমানেরা বাংলা বলে; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ও পাঠানদের মধ্যে

খৃষ্টীয় ধর্ম ও সমাজ

প্রবাদ আছে যে সাধু থমাস্ প্রথম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর প্রামাণ্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলে একদল খৃষ্টানের বাসের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারাই ইতিহাসে সিরীয় খৃষ্টান নামে খ্যাত। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগীজদের আসিবার পূর্বে খৃষ্টধর্ম প্রচার তেমনভাবে হয় নাই। ইহারা গোয়াতে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্য-বিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সেণ্ট জাভিয়ার (যাঁহার নামে একটি বিখ্যাত কলেজ কলিকাতায় ভবানীপুরে আছে) নামে জনৈক স্পেনীয় সাধু পর্টুগীজদিগের রাজনৈতিক শক্তির সুবিধা দেখিয়া ভারতে আসেন; তাঁহার নিষ্ঠা ও উৎসাহে খৃষ্টধর্ম বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবর্তনের সহিত পর্টুগীজদের ক্ষমতা ধর্মক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া আসিল। ভারতে ও সিংহলে এখনো রোমান কাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ—প্রোটেষ্টাণ্টদের চেয়ে বেশী।

প্রাচীন ইতিহাস

প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ ১৯শ শতাব্দীর পূর্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। পলাশী যুদ্ধের কিছু পরেই খৃষ্টীয় পাদরীগণ এদেশে প্রচার করিতে আসেন; কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এইরূপ প্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা বিজিত হিন্দু মুসলমানের ধর্মবিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহু হিন্দুমন্দির রক্ষা ও পোষণের ভার লইয়াছিলেন; তীর্থস্থানগুলি সংস্কার বা পুনর্গঠনের জন্য তাঁহারা হিন্দু মোহান্তদের টাকা ধার দিতেন। মন্দিরের পুরোহিত এমন কি দাক্ষিণাত্যের নর্তকীদের পর্য্যন্ত

কোম্পানীর প্রচারে বাধা

মাস-মাহিনা দিতেন। যাগ, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি ব্যাপারেও টাকা দিতে কোম্পানী কার্পণ্য করিতেন না। এমনকি বহুকাল পর্য্যন্ত চড়কের সময়ে পেট ও পিট ফোঁড়া ও সতীদাহ সরকারী লোকের ব্যবস্থাধীনে হইত। কোম্পানী খৃষ্টীয় পাদরীগণকে তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে বাস বা প্রচার করিতে দিতেন না বলিয়া মহাত্মা কেরী প্রমুখ পাদরীগণ দিনেমারদের রাজ্য শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিলাতের লোকেদের বহুকালকার আন্দোলনের ফলে ১৮১৩ সালে কোম্পানীর সনদ পুনর্গ্রহণের সময়ে এই নিয়ম রদ করা হয়। এছাড়া কোম্পানী কোনো খৃষ্টানকে সরকারী কাজ দিতেন না এবং সৈন্য-বিভাগে কেনো লোক খৃষ্টান হইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে রীতিমত-ভাবে বাধা দেওয়া হইত ও দীক্ষিত হইলে তাহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইত।

১৮১৩ সালে বাধা রদ

১৮১৩ সালে খৃষ্টান পাদরীদের ভারতে প্রচার সম্বন্ধে বাধা দূর হইলে দলে দলে প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চের লোক এদেশে আসিয়া ধর্ম প্রচারে মন দিলেন। ১৮২৯ সালে ডাফ সাহেব কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী কলেজ খুলিয়া মহা উৎসাহে ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হন; তাঁহার চেষ্টা বহুপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

১৯১২ সালে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা ১৬ লক্ষের উপর ছিল। ঐ বৎসরে তাহাদের পরিচালিত ১৩,২০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪½ লক্ষ বিদ্যার্থী পড়িতেছিল; তবে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টান নহে। সমগ্র বৃটীশ ভারতের যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নয় ভাগের এক ভাগ খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত। ইহাদের তত্ত্বাবধানে ২৮৩টি

খৃষ্টানদের শিক্ষাদান কার্য্য

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৬২ হাজার বালক ও প্রায় সাড়ে আট হাজার বালিকা অধ্যয়ন করিতেছিল। কলেজের উচ্চ শিক্ষার জন্য খৃষ্টান সমাজ যথেষ্ট

অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতেছেন। ৩৮টি কলেজে সাড়ে পাঁচ হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী বিদ্যালাভ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সওয়া পাঁচ হাজারই অখৃষ্টান।

রোমান কাথলিকদের তত্ত্বাবধানেও ক্ষুদ্র গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চশ্রেণীর কলেজ পর্য্যন্ত আছে। ইহাদের কলেজ ও স্কুলে খৃষ্টান বিদ্যার্থীদের সংখ্যা অধিক। দেশীয় প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের চেয়ে রোমান কাথলিকদের শিক্ষা কম; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের অপেক্ষা অনেক বেশী। ধর্ম হিসাবে খৃষ্টানদের মধ্যে শিক্ষা সব চেয়ে বেশী। রোমান কাথলিকদের অধীনে প্রায় তিন হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৮ হাজার বালক ও ৪১ হাজার বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার বালক ও ৭৩ হাজার বালিকা ও কলেজে ৫০০০ বিদ্যার্থী পাঠ করিতেছে। এই সব বিদ্যার্থীদের মধ্যে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় বিদ্যার্থীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

জনসেবা খৃষ্টীয় সমাজের একটি প্রধান কাজ। ১৮৭৮ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত খৃষ্টানচার্চ শিক্ষা ও প্রচার কার্য্যে লিপ্ত ছিল। ঐ বৎসরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে বহু লক্ষ অনাথ ও নিরাশ্রয় লোক অন্নাভাবে খৃষ্টীয় সমাজের শরণাপন্ন হয়। বহু স্থানে হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারী পাদরীরা চালাইতেছেন এবং অসংখ্য লোকের উপকার করিতেছেন। কুষ্ঠদের জন্য হিন্দু বা মুসলমানদের যে-সব আশ্রয় আছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

জনসেবা ও চিকিৎসা

খৃষ্টানচার্চ কুষ্ঠদের একপ্রকার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছে। ১৯১১ সালে প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চের অন্তর্গত ১১৮জন পুরুষ ও ২১৭জন নারী চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮০টি। এইসব বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০ রকমের বিভিন্ন শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা এ-সব বিদ্যালয় দেখিয়াছেন তাঁহারাই একবাক্যে বলিয়াছেন

যে খৃষ্টীয় চার্চ শিল্পের জন্য সত্যই কাজ করিতেছেন। এক্ষেত্রে খৃষ্টীয় মুক্তিফৌজদের (Salvation Army) ত্যাগ ও উৎসাহ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এমনকি সরকার পর্য্যন্ত ইহাদের উপর কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে সভ্য করিবার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। ইহারা প্রেমে সকলকে বশ করিতেছেন।

ভারতে ধর্মপ্রচার করিবার জন্য যে কত মিশন আছে তাহার তালিকা দিতে গেলেই একখানি বই হয়। পাদরীদের এই কাজ নানা লোকে নানা ভাবে দেখিয়া থাকেন। বন্ধুহীন, সুদূর পার্বত্য প্রদেশে প্রিয়জন-শূন্য স্থানে, অশিক্ষিত অসভ্যদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘ জীবন যাপন করিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কর্মকে দুরভিসন্ধির চক্ষে দেখা সত্য দৃষ্টি নহে। ভারতের নানা প্রদেশের নিম্নস্তরের লোক-দের সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা আমরা যথাস্থানে বর্ণিয়াছি। চণ্ডাল, ডোম, পারিহা, মেথ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি যতদিন হিন্দু আছে ততদিন তাহাদের সমাজে মাথা তুলিবার অনেক অন্তরায়, অথচ খৃষ্টান হইলে বিদ্যালয়ে পড়িবার বাধা, পথে চলিবার বাধা সবই দূর হইয়া যায়। এইসব ছোটখাটো ব্যাপারেই নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মন গলে। ধর্মতত্ত্ব তাহারা বুঝে না। ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া যাহারা খৃষ্টানধর্মকে বিচার করেন তাহারা হিন্দু-সমাজে বড় এবং শ্রেষ্ঠ। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হয় নাই। তবে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রতিবৎসর প্রায় এক লক্ষ করিয়া লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেছে। হিন্দুসমাজ যতদিন না তাহাদিগকে সমানভাবে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে ততদিন অন্ত্যজ জাতির ধর্মান্তর গ্রহণ ব্যতীত সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার অন্য উপায় নাই।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের কারণ

ভারতের খৃষ্টীয় মিশনগুলির অধিকাংশই বিদেশের টাকায় চলিতেছে।

বিদেশের অনেক ধনী বিধবা তাঁহাদের সর্বস্ব প্রচার-কার্য্যে দান করিয়া যান। এইরূপ সেবা, শিক্ষা ও প্রচারের জন্ম অর্থদানকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠদান বলিয়া মনে করেন। এতদ্ব্যতীত এদেশেরা য়ুরোপীয় খৃষ্টান কর্মচারী ও সৈনিকদের জন্ম ভারত-সরকারের ধর্মযাজক নিযুক্ত আছেন। চারি সম্প্রদায়ের খৃষ্টান মিশন খৃষ্টীয় সঙ্ঘের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডীয় বা আঙ্গলিকান চার্চ ও স্কটলণ্ডীয় বা প্রেস্‌বিটার চার্চের বিশপ বা চ্যাপলেন (বড় পুরোহিত) ভারতীয় সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেট্‌স কর্তৃক নিযুক্ত হন। সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যে ১৫১ জন খৃষ্টীয় বিশপ বা চ্যাপলেন আছেন; রোমান ও মেথডিষ্ট মিশন সরকার হইতে সাহায্য পাইয়া থাকেন। চারি সম্প্রদায়ের গির্জাঘর সরকারী ব্যয়ে নির্মিত ও সজ্জিত হয়। বহু স্কুল এইসব মিশন কর্তৃক পরিচালিত; অনেকগুলি স্কুল কেবলমাত্র য়ুরোপীয় বালকবালিকাদের জন্ম নির্দিষ্ট। সরকার এই সকল বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ দান করেন। ছাত্রদের তুলনায় বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য অতিরিক্ত পরিমাণে হয়। সরকারের এইসব বিদ্যালয়ে দান ও খৃষ্টীয় মিশনের সাহায্যদান লইয়া গভর্ণমেণ্টকে এদেশীয় লোক-দের নিকট অনেক গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়; এবং এসেম্ব্লিতে এই ব্যয় হ্রাস বা উঠাইবার জন্ম কথাবার্তা হইতেছে।

ভারতীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪৭ লক্ষ ৫৪ হাজার। (পূর্বে ১৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১১। সমাজ সংস্কার

ভারতবর্ষে একত্রিশ কোটী লোকের বাস, তাহার মধ্যে ১৬ কোটী ৪০ লক্ষ পুরুষ ও ১৫ কোটী ৫০ লক্ষ নারী। সুতরাং ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে যেমন পুরুষ জাতির অবস্থা আলোচনা করা প্রয়োজন, নারীজাতির অবস্থা তেমনই আলোচনা করা উচিত। আমরা দেখিয়াছি ভারতবর্ষে ২১ কোটী হিন্দুর বাস; সুতরাং হিন্দুসমাজের সমস্যার কথাই প্রধানত আমাদের সম্মুখে আসে। বিশেষত হিন্দুসমাজে জাতিভেদ আরও সমস্যার জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। এই জাতিভেদের দরুণ সমাজের একটি অংশ অন্ত্যজ বলিয়া সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে, উচ্চবর্ণের সহিত তাহাদের কোনও প্রকার সম্বন্ধ ত নাইই, উপরন্তু বহু প্রকারে উৎপীড়িত। এই অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যের সংখ্যা ৫ কোটী ৩০ লক্ষ। সমাজের কল্যাণ যে ইহাদিগকে বাদ দিয়া কখনই সম্ভব নয় তাহা ক্রমশ সকলেই বুঝিতেছেন; ইহাদিগের মধ্যেও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ভারতবর্ষের সমাজসমস্যা তাহা হইলে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নারীজাতির উন্নতি এবং অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতির উন্নতি।

প্রথমে নারীজাতির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখি নারীর সাধারণ অবস্থার যেমন ধীরে ধীরে উন্নতি হইয়াছে তেমনি নারী-শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় আবির্ভূত হন।

নারী সমস্যা (সাধারণ)

সেই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ভারতবর্ষের সমাজকে নাড়া দিয়া-

ছিল। অপ্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা, প্রত্যক্ষভাবে রাজার প্রভাব সমাজের সকল বিভাগের দূষণীয় রীতিগুলির মূলে আঘাত করিতে লাগিল। নারীর সাধারণ অবস্থার ক্রমোন্নতি দেখিতে গিয়া প্রথমেই সতীদাহ নিবারণ উল্লেখ করিতে হয়। মৃত স্বামীর সহিত পত্নীকে একচিতায় দাহ করিবার প্রথা কিছুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। অতি অল্প ক্ষেত্রেই স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমরণে যাইতেন; জোর করিয়া দাহ করাই রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীগণ ইহা নিবারণের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রামমোহন রায় বহু উপায়ে ইহা দমন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজার সহায়তায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আইন পাশ করিয়া সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিলেন। আইন পাশ হওয়ার পর ক্রমশ ইহার প্রচলন কমিয়া আসিতে লাগিল; এক্ষণে নাই বলিলেই চলে। কদাচিৎ কোনও সতী স্বেচ্ছায় সহমরণে যাইতে চাহিলে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয়।

সতীদাহ

কন্যার বিবাহে যৌতুক দিতে যাইয়া ও বিবাহের ব্যয়ভারে পিতাকে পীড়িত হইতে হয় বলিয়া কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়াই ভারতবর্ষের অনেকাংশে অমঙ্গলজনক মনে করা হইত। ক্রমশ সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে মারিয়া ফেলা একরূপ রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে পশ্চিম ভারতে কোন কোন বর্ণের মধ্যে মেয়ে বড় দেখা যাইত না। গঙ্গানদীতে শিশুকন্যাকে ভাসাইয়া দেওয়াও রীতি ছিল। বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে এই ভয়ানক প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ইহা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া আসিল।

শিশুকন্যা হত্যা

বহুবিবাহ প্রথা ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। হিন্দু বিবাহবিধিতে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ একটী ব্যবসায়ের মত ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে নবযুগের আদর্শের আলোকে বহু-বিবাহের প্রচলন ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে।

বহুবিবাহ

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে এই বিধি ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। বালবিধবার সংখ্যা গণনা করিলে এই বিধির কঠোরতা আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি হয়। ৩ লক্ষের উপর বিধবার বয়স পনের বৎসরের নিম্নে। বিবাহের ও স্বামীর মর্ম কিছুই যাহারা বুঝে নাই, তাহাদের উপর এই ভয়ঙ্কর বিধানে ব্যথিত হইয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রথম উত্থাপন করিলেন। শাস্ত্র হইতে বিধবাবিবাহ সমর্থক বচন তিনি উদ্ধার করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহা শাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণ করিয়া বিধবাবিবাহ আইন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পাশ করাইলেন। আইনত সঙ্গত হইলেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে যথেষ্ট সময় লাগিল। এখনও ইহার প্রচলন আশানুরূপ হয় নাই।

বিধবাবিবাহ

বর্ণ, উপবর্ণ, গাঁই, মেল ও পর্য্যায় প্রভৃতি ঠিক রাখিয়া বরকন্যা নির্বাচন করিয়া বিবাহ হইতে পারিবে এই নিয়ম হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে। এই প্রকার বাদবিচারের নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্রপাত্রী মেলা প্রায়ই কঠিন হইয়া উঠে। এই নিষেধ ভঙ্গ করিবার জন্য প্রয়াসও চলিয়া আসিতেছে। এক্ষেত্রে প্রথম প্রয়াস ব্রাহ্মসমাজ করেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ আইনসঙ্গত করিবার জন্য তদানীন্তন আইন-সভ্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কৌন্সিলে Native Marriage Bill

অসবর্ণ বিবাহ

উপস্থিত হয় ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন পাশ হইয়া যায়। এই আইন অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ সঙ্গত, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ও বিধবাবিবাহ অনুমোদিত হইল। কিন্তু এই আইন অনুসারে বিবাহ করিতে গেলে একজনকে স্বীকার করিতে হয় যে সে ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মমতগুলির কোনোটাই মানে না। এইরূপ নেতিবাচক স্বীকারোক্তি অনেকের ভাল লাগিল না। তবে তখনকার মত ইহাই মানিয়া লওয়া হইল। প্রায় ৫০ বৎসর পরে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হিন্দুদিগের মধ্যেই যাহাতে অসবর্ণ বিবাহ আইনসঙ্গত হইতে পারে তাহার জন্য একটী বিল উপস্থিত করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইল। তাহার পর শ্রীযুক্ত পাটেল আর একটী বিল উপস্থিত করেন, তাহাও অগ্রাহ্য হয়। শেষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত হরিসিং গৌড়ের বিল পাশ হইল। ইহাতে কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ আইনসঙ্গত হইয়াছে। আইনত সঙ্গত হইলেও কদাচিৎ দুই একটী অসবর্ণ বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায়। তবে পূর্বকার নানাপ্রকারের গণ্ডীবন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসিতেছে।

কন্যার অতি অল্প বয়সেই তাহাকে বিবাহ দিতে হইবে এই রীতি হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। যৌবনপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই কন্যাকে যে-পিতা সম্প্রদান না করেন তাঁহাকে মহাপাতকে পতিত হইতে হয় এই ধারণা হিন্দুহৃদয়ে বদ্ধমূল। বাল্যবিবাহের কুফল কি তাহা বলা বাহুল্য। বালিকা স্ত্রীর মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। (স্বাস্থ্য পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) চতুর্দিকে বালিকা পত্নীর উপর নির্য্যাতনের কাহিনী প্রচারিত হইতে থাকায় গভর্ণমেণ্ট কৌন্সিলে একটী বিল উপস্থিত করেন, তাহাতে ১২ বৎসরের নিম্নে কোনোও বালিকা বিবাহিত জীবন যাপনের উপযোগী

কন্যার বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ

হইবে না এইরূপ স্থির হইল। এই বিলের বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র হিন্দু-সমাজ খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইল। সভা করিয়া হিন্দুগণ ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এসকল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই বিল পাশ হইয়া গেল। ইহার ব্যতিক্রম এখন যদিও কোনো কোনো স্থলে হইয়া থাকে তথাপি লোকমত আজকাল ইহারই পক্ষে। বর্তমানে এই বয়স বাড়াইয়া ১৪ বৎসর করিবার চেষ্টা হইতেছে।

মুসলমান রাজত্বকালের সময় হইতে ভারতবর্ষের অবরোধ প্রথার প্রচলন হয়। ইহার পূর্বে এই প্রথা তেমন দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইত না।

অবরোধ প্রথা

অবরোধ প্রথায় নারীগণের শরীর মন উভয়েরই ক্ষতি করে ইহা ক্রমশ উপলব্ধি হওয়ায় বর্তমান যুগে ইহা উঠাইয়া দিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ এবিষয়ে অগ্রগামী; এখন শিক্ষিত হিন্দুগণও অবরোধ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। নারীগণ আজকাল স্বাধীনভাবে সভাসমিতিতে একত্র হইয়া নানা উপায়ে আপনাদের উন্নতি ও দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

বর্ণভেদ হেতু স্ববর্ণের পাত্র মিলা কঠিন হওয়ায় কন্যার পিতা বরের উপযুক্ততা অনুসারে পণস্বরূপ তাহাকে অর্থদান করিবেন এই একটী প্রথা

পণপ্রথা

অনেক দিন হইতে রহিয়াছে। ক্রমশ এই পণের হার বাড়িয়া চলিতেছে। ফলত কন্যার পিতাকে কন্যার বিবাহের জন্য সময় সময় সর্বস্বান্ত হইতে হয়; কোনও কোনও দরিদ্র পরিবারের সামর্থ্যে ইহাও কুলায় না, অথচ কন্যার বিবাহ না দিলেও সমাজে স্থান নাই। এই প্রকারে নানারূপ মানসিক উৎপীড়নে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা জর্জরিত। শিক্ষিত বিবাহার্থী যুবকগণ অনেকেই ইহার দোষ বুঝিতে পারিলেও পিতা ও আত্মীয়স্বজনের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভীত হন। কন্যা পিতামাতার এইরূপ বোঝা

স্বরূপ হওয়ায় কত বালিকা আত্মহত্যা করিয়া থাকে তাহার সংবাদ যখনতখনই পাওয়া যায়। স্নেহলতার মৃত্যুর পর চারিদিকে পণপ্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে কিছুদিন অন্দোলন চলিয়াছিল। এখনও বিণাপণে বিবাহের সংবাদ ক্বচিৎ কখনও শুনা যায়। তবে এই প্রথা উঠিয়া যাইতে এখনো যথেষ্ট বিলম্ব আছে। তাহা নির্ভর করে দেশের যুবক-দিগের সৎসাহস ও প্রকৃত শিক্ষার উপর।

দক্ষিণ-ভারতে কোন কোন দেবমন্দিরে দেবদাসী বলিয়া কতকগুলি বালিকাকে রাখা হয়। দেবতার কার্য্যে তাহারা উৎসর্গীকৃত; তাহাদের আর বিবাহ হয় না। দেবতার ও অতিথিসেবা তাহাদের জীবনের প্রধান ব্রত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা মন্দিরস্থ পূজারী ও মন্দিরে আগত অতিথিদিগের বিলাস সামগ্রী স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর-ভারতেও প্রায় সর্বত্র পূজা ও অন্যান্য উৎসবের সময় একদল নর্তকী আনা হয়; তাহাদের কাজ গান ও নাচ প্রভৃতি দ্বারা অভ্যাগতবৃন্দকে তৃপ্ত করা। এই যে একশ্রেণীর নারীকে নিম্নস্তরের আমোদের জন্য এইরূপ হেয় করিয়া রাখা হয় ইহার বিরুদ্ধেও সমাজসংস্কারকদের হস্ত উত্থিত হইয়াছে। মন্দিরগুলিতে দেবদাসীর সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। উৎসব প্রভৃতিতে বাই-নাচের রীতিও পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহার কদর্য্যতা ক্রমশই উপলব্ধি হইতেছে।

দেবদাসী

সাধারণভাবে নারীজাতির অবস্থার উন্নতি কি কি হইয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম। এখন নারীশিক্ষার জন্য কি করা হইয়াছে সংক্ষেপে আমরা তাহা দেখি।

অতি প্রাচীনকালে নারীগণ জ্ঞানালোকে মণ্ডিত হইয়া জীবন ধন্য করিতেন তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পাই। ক্রমশ নারীশিক্ষার প্রয়োজন নাই এই ধারণা সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়। উনবিংশ শতা-

ব্দীর প্রথমদিকে নারীর এই অজ্ঞানতা চরমসীমায় উঠিয়াছিল। বাহিরের কোনও খবর তাঁহাদের নিকট পৌছাইত না; ঘরের কোণে বসিয়া আপন মনে সামান্য জ্ঞানচর্চা করিবেন এই শক্তিটুকুও তাঁহাদের ছিল না।

নারীশিক্ষা

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ কর্মচারী মিঃ বেথুন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকটি মহাপ্রাণ ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ভারতীয় নারীর শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করেন। সে-সময় ছাত্রী মিলা ভার ছিল। দুটি একটি করিয়া ছাত্রী জুটিতে লাগিল। ক্রমশ কলেজেও ছাত্রীসংখ্যা কম হইল না। শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু নারীদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট। পরে ইনি এই কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ইনি প্রথম ভারতীয় নারী অধ্যক্ষ। শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হইয়া ইংলণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। ইনি প্রথম ভারতীয় নারী চিকিৎসক। এখন প্রতি বৎসর কত নারী সসম্মানে পাশ করিতেছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী "ভারতী" পত্রিকার প্রথম নারী সম্পাদিকা। এই পত্রিকা এখন তাঁহার সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী চালাইতেছেন।

বেথুন কলেজ

ভারতীয় বিধবাদিগের অবস্থার কথা আমরা পূর্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। পরের গলগ্রহ হইয়া নীরস জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়া যাপন করা কতদূর দুঃখময় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কতিপয় মহাপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। ইহার পূর্বে খৃষ্টান মিশনারীগণ তাঁহাদের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়া বহু অসহায় বিধবাকে আশ্রয়দান করিতেছিলেন, তাহাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতেছিলেন।

কলিকাতা বিধবাশ্রম

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার নিকট

বরাহনগরে একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। বহু অনাথ বিধবা এখানে আশ্রয় পাইয়া সামান্ত লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিরানন্দময় উদ্দেশ্যহীন জীবন কতকটা সফল হইল।

সারদাসদন

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতা রমাবাই নামে একজন খৃষ্টান মহিলা বোম্বাইতে "সারদাসদন" নামে এক বিধবাশ্রম স্থাপন করেন। পরে তাহা পুণায় উঠিয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টান প্রভাবের মধ্যে হিন্দু বিধবাদিগকে রাখিতে অনেকে আপত্তি করায় ইহার কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ কার্ভে হিন্দু আদর্শানুযায়ী হিন্দুদিগের দ্বারা পরিচালিত একটি বিধবাশ্রম পুণায় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহা ক্রমশই উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ইহারই সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ কার্ভে ও তাঁহার পত্নী পুণায় যে নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার সংবাদ আমরা সকলেই জানি।

১৯০৮ সালে মিঃ মালাবারী বোম্বাইতে 'সেবাসদন' স্থাপন করিলেন। মালাবারী বহুদিন হইতে স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেছিলেন।

বোম্বাই সেবাসদন

বাল্যবিবাহ বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তিকাগুলি দেশে প্রবল আন্দোলন তুলিয়াছিল। সেবাসদনের উদ্দেশ্য ভারতীয় নারীগণকে সাধারণ শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা ও সেবা শুশ্রূষা শিক্ষা দান।

পুণা সেবাসদন

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জষ্টিস্ রাণাডের পত্নী মিসেস্ রাণাডে পুণায় একটি সেবাসদন প্রতিষ্ঠা করিলেন। নারীকে জ্ঞানে কর্মে সেবায় সর্বপ্রকারে উন্নত করিবার জন্য তিনি এখানে বিরাট ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার কার্য্যের সফলতা ক্রমশই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী নারী-দিগের মধ্যে দেশীয় শিল্পের প্রচারের জন্য কলিকাতায় নারী-শিল্পাশ্রম স্থাপন করিলেন। এখানে কতিপয় বিধবার থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; ইহা ব্যতীত শিল্প-বিদ্যালয়ও একটি আছে; বাহির হইতে ছাত্রীগণ আসিয়া ইহাতে শিল্প শিক্ষা করেন।

নারী-শিল্পাশ্রম

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য এই প্রতিষ্ঠান সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে নিযুক্ত মহিলাগণ অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে যাইয়া নারীগণকে নানাপ্রকার শিক্ষা দেন। স্ত্রীশিক্ষা বলিতে কিছুকাল পূর্বেও মনে হইত বিদ্যালয়গুলিই তাহার কেন্দ্রস্থল। যে-কয়টি নারী সেই সকল বিদ্যালয়ে যাইতে পারেন কেবল তাঁহারাই শিক্ষিত হইবার সুযোগ পান। এখন স্ত্রীশিক্ষার কেন্দ্র কতদূর বিস্তৃত হইতেছে তাহা আমরা দেখিতেছি।

ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল

১৯১৭ সালে মাদ্রাজের অন্তর্গত আদেয়ারে Women's Indian Association নামে একটি মণ্ডলী গঠিত হয়। মিসেস্ কজিন্‌স্ ইহার প্রধান উদ্যোগী। ক্রমশ নানাস্থানে ইহার শাখা সমিতি স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ভারতের সমগ্র নারীজাতির মধ্যে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা, তাঁহাদের কর্তব্যসম্বন্ধে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। ভারতীয় নারী-গণ কিরূপে একযোগে দেশের ও আপনাদের উন্নতিসাধন করিতে পারেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতে পারেন তাহার জন্য এই সমিতি চেষ্টা করিতেছেন। "স্ত্রীধর্ম" নামে একটি পত্রিকা এই সমিতি হইতে বাহির হয়। ভারতের সকল দেশীয়

Women's Indian Association

নারী তাঁহাদের মাতৃভাষায় ইহাতে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীগণ যে ক্রমশ তাহাদের যোগ্যতা দ্বারা প্রবেশলাভ করিতেছেন তাহাও আমরা দেখিতেছি। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারতীয় নারীদিগের অগ্রণী হইয়া দেশে ও বিদেশে ভারতের কল্যাণ কামনায় কার্য্য করিয়া ফিরিতেছেন। আজকাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীমতী হেমলতা মজুমদার, বাসন্তী দেবী, প্রভৃতি কতিপয় মহিলার নাম উল্লেখযোগ্য। মান্দ্রাজে ব্যবস্থাপক সভায় নারীগণ ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন।

সম্প্রতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীমতী অবলা বসু ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি ও নারীর উদ্যোগে নারী-শিক্ষা-সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই সমিতি কর্তৃক নানাস্থানে নানা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা ও নারীর বিশেষভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিখানই এই বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য।

নারীশিক্ষা সমিতি

হিন্দু নারীদিগের শিক্ষার যেমন আয়োজন হইয়াছে, মুসলমান সমাজেও নারীশিক্ষার ঢেউ গিয়া নাড়া দিয়াছে। তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের মুসলমান নারীদিগের উন্নতির বার্তা ভারতীয় মুসলমান নারীদিগের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। সরকার হইতে হিন্দুমুসলমান সমাজের পর্দ্দানসিন নারীদিগের জন্য জেনানা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত এক শতাব্দীর মধ্যে সমাজ নানাদিক দিয়া নারী-সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এখনও যে ঐ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইয়াছে তাহা বলা যায় না। শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাহেতু দুর্বৃত্তদিগের হস্তে নারীদিগের নির্যাতনের সংবাদ ক্রমাগত শুনা যায়। নারীশিক্ষার প্রসার যে আরও অধিক পরিমাণে প্রয়োজন তাহা ইহা হইতেই প্রমাণ হইয়াছে।

নারী নির্য্যাতন

সমাজের অপর সমস্যাসমূহের কতখানি সমাধান সমাজ করিতে পারিয়াছে সে-সম্বন্ধে এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বর্ণভেদ ও জাতিবিচার হিন্দু সমাজের প্রধান স্তম্ভ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোনও প্রকার আদানপ্রদান সম্ভব নয়; উচ্চবর্ণের কোনও হিন্দু নিম্নবর্ণের কাহারও সঙ্গে কোনও প্রকার যোগ রাখিলে বা কেহ ম্লেচ্ছজনোচিত কোনও আচরণ করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয়। বর্তমান যুগে এইরূপ জাতিরক্ষা করা খুবই কঠিন। হিন্দুর পক্ষে মধ্যযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ জাতিরক্ষা করিয়া সমুদ্রযাত্রা কোনো মতেই সম্ভব নয়। বর্তমান যুগে সে-নিষেধ রক্ষা করা আর চলে না, সমুদ্রযাত্রা অবাধে চলিতেছে। হিন্দু সমাজের বিধান সমুদ্রযাত্রার পরে দেশে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, না করিলে সমাজে স্থান নাই। প্রায়শ্চিত্তবিধি মানিয়া বহু বিদেশ-প্রত্যাগত হিন্দু পুনরায় সমাজে প্রবেশলাভ করেন। যাঁহারা তাহা মানিলেন না, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়া রহিলেন, অনেকে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন। ক্রমশ এই সমাজচ্যুতের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সায়েন্স এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। সেখান হইতে দলে দলে ছাত্র বিদেশে পাঠান হইতে লাগিল; সেইসব ছাত্র দেশে ফিরিয়া আসার পর প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই সমাজে আপনাদের স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব এতই অধিক হইয়াছে যে হিন্দুসমাজে এ-সকল লইয়া বিশেষ কিছু আন্দোলন হয় না।

সমুদ্রযাত্রা, প্রায়শ্চিত্তবিধি

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ভারতবর্ষে নিম্নবর্ণের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ। এই অন্ত্যজ ব্যক্তিগণ সমাজের নিম্নস্তরে অবজ্ঞার পাত্র হইয়া অজ্ঞানতা ও নিরানন্দে কাল কাটায়, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে

অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য সমস্যা

তাহাদের কোনো প্রকার সংশ্রব নাই। এই দীনতা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিবার প্রথম চেষ্টা করেন খৃষ্টান মিসনারীগণ। শত শত নিম্নজাতীয় হিন্দু খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিয়া শিক্ষায় আচারব্যবহারে উন্নত স্তরে উঠিয়াছে। নিম্নবর্ণের হিন্দু অবজ্ঞার পাত্র তাহার সহিত কোনোপ্রকার আচার ব্যবহার চলেনা। কিন্তু সেই ব্যক্তি খৃষ্টান হইলেই তাহার মর্য্যাদা বাড়িয়া যায়। অন্ত্যজ হিন্দুর পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ, তাহা খৃষ্টানের নিষিদ্ধ নয়। ইহার ফলে দলে দলে অস্পৃশ্য হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। পূর্বে ইহারাই মুসলমান সমাজে আশ্রয় লইত।

আর্য্যসমাজের কার্য্য

আর্য্যসমাজ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রথম এই অস্পৃশ্য-দিগের উন্নত করিবার চেষ্টা করেন। তাহাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য নানাপ্রকার আয়োজন হইয়াছে। উপরন্তু নিম্নজাতিয়দিগকে 'শুদ্ধিক্রিয়া' দ্বারা দ্বিজ করিয়া লইবার রীতি আর্য্যসমাজে আছে। অস্পৃশ্য 'মেথ' ও রাজপুতানার মুসলমান 'মালখানা'দিগকে এইরূপে আর্য্যসমাজ উঠাইয়া লইয়াছেন—এসম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। বর্তমানে আর্য্যসমাজ উত্তর-ভারতের নানাস্থানে এবং বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যের মালাবারে অস্পৃশ্য হিন্দুদিগের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ও ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য

রামকৃষ্ণ মিশনও এই বিষয়ে মন দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে এখন বিশেষ কিছু না হইলেও তাঁহারা জাতিভেদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া চলেন। খাসিয়া-দিগের মধ্যে ও বাংলাদেশের কোনো কোনো নগরে শ্রমজীবিদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন।

বাহির হইতে উন্নতির চেষ্টা ব্যতীত তথাকথিত নিম্নজাতির মধ্যেই আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পূর্বেই

দেখাইয়াছি যে নিম্ন জাতিদের উচ্চবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইবার চেষ্টা কিছুকাল ধরিয়া চলিতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যাপার লইয়া উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলাদেশের নমঃশূদ্রগণ ও মাদ্রাজের অব্রাহ্মণেরা উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিতেছে।

অন্যান্য অস্পৃশ্যদিগের মধ্যেও এইরূপ জাগরণ দেখা গিয়াছে। ত্রিবঙ্কুরের অন্তর্গত ভাইকমের অস্পৃশ্য জাতিদিগের প্রয়াস এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভাইকমের সত্যগ্রহ

ভাইকমের দেবমন্দিরের চারিপাশের রাস্তা দিয়া পারিয়া প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিরা যাইতে পারি না, ইহাই নিয়ম ছিল। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি অন্য সকলেই যাইতে পারিবে, কেবল ইহারা যাইলে দোষ। এই অবস্থা সহিয়া থাকিতে তাহারা আর রাজী নহে। দলে দলে নিম্নশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি মন্দিরের রাস্তায় প্রবেশ করিবার জন্য আন্দোলন তুলিল। মন্দিরের চারিদিকের পথে পুলিশ পাহারা বসিল, মন্দিরে ঢুকিবার পথ বন্ধ। যাহারা ঢুকিবার জন্য অগ্রসর হয় তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার চলিল। মহাত্মা গান্ধীর আদেশানুসারে সত্যগ্রাহীদল নীরবে অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইতে লাগিল, তাহাদের সংকল্প কিন্তু টলিবার নয়। নানাদিক হইতে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া সত্যগ্রহে যোগদান করিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপিল্লে ও কুরুবর নীলচন্দন নাম্বুদ্রীপদ নামে দুইজন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে সত্যগ্রহ দৃঢ়তার সহিত চলিতে লাগিল। ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া যাইতেছে, তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। এইরূপ দৃঢ়তায় অপর পক্ষের হৃদয় বিগলিত হইল। সম্প্রতি মন্দিরের পথে নিম্নশ্রেণীদের চলিবার আদেশ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া থামিবে না।

সমাজসংস্কারের প্রয়াস ধীরগতিতে কিছুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে Social Conferenceএর প্রথম অধিবেশন হয়। তখন হইতে প্রতিবৎসর কংগ্রেসের সঙ্গে ইহার অধিবেশন হয়, ইহার কার্য্য-ক্ষেত্রও ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছে।

Social Conference

১৯০৬ সালে অনুন্নত জাতিদিগের মধ্যে কার্য্য করিবার উদ্দেশে একটা সমিতি (Depressed Class Mission Society) গঠিত হয়। বোম্বাইতে তাহার প্রথম বৈঠক বসে। এই কর্মীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্মী শ্রীযুক্ত সিন্ধের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাসের উদ্যোগে এই সমিতির কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। ইহার অধীনে কয়েক শত নৈশবিদ্যালয় আছে।

Depressed Class Mission Society

অনুন্নত জাতির সেবা করিবার ইচ্ছা ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার ইচ্ছা নবযুগের ছাত্রদিগের মধ্যেও জাগিয়াছে। দরিদ্র দেশ-বাসীদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য ছাত্রগণের উদ্যোগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাংলা-দেশের প্রায় প্রত্যেক কলেজ ও এমনকি স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের দ্বারা পরিচালিত নৈশবিদ্যালয় আছে। ইহাদের সংখ্যা ও শক্তি নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

নৈশবিদ্যালয়

সমাজসেবার জন্য বোম্বাই মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে হিতসাধন মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কাজ উত্তমরূপে চলিতেছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশবাসীর অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য এই মণ্ডলী নানাপ্রকার প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় **Anti-malarial League** ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য

হিতসাধন মণ্ডলী

বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ডাঃ গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মাজীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন হইতে সমাজ সংস্কারের একটী বিশেষ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা দূর, মাদকতা নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন এই অসহযোগের সহিত যুক্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিল্পসংঘাতের ফলে দেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান ভীষণ বাড়িয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় রীতিমত কাজ চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল নানা রাজনৈতিক প্রতিকূল অবস্থায় স্থায়ী হইতে পারে নাই। মাদকতা নিবারণের জন্য বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, Y. M. C. A. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

মাদকতা নিবারণ

অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য গান্ধীজির প্রয়াস সর্বজনবিদিত। গত বৎসর কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন তাহাতে আংশিকভাবে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যক্ষ কার্য্য এখনও চোখে পড়িবার মত হয় নাই; তবে কুমিল্লার অভয়াশ্রমের একদল কর্মী সমাজের সকল প্রকার নিয়ম অস্বীকার করিয়া অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘের দ্বারা নানা স্থানে সমাজ সংস্কারের বীজ উপ্ত হইয়াছে।

হিন্দু মহাসভা

স্বদেশী-আন্দোলন দেশের মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা যুবকদিগের মধ্যে বিশেষভাবে জাগাইয়া দিয়াছে। যুবাদিগের মধ্যে সংহতভাবে কার্য্য করিবার প্রথম প্রয়াস Anti-circular Society করিয়াছিল। তৎপরে ঐ শ্রেণীর বহু প্রতিষ্ঠান ভারতের নানাস্থানে দেশের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। রাজনৈতিক প্রভাব ইহাদের উদ্যমের

মধ্যে প্রবল থাকিলেও সাধারণ জনহিতকর কার্য্যও তাহারা করিত।

যুবকদিগের জনহিতকর কার্য্য

স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশের দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতি দুর্দিনে অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন। এইরূপ কার্য্য সর্বপ্রথম আমরা 'অর্দ্ধোদয় যোগে'র সময় দেখিতে পাই। তৎপরে দামোদর বন্যার সময় বাঙালী যুবকদিগের দেশসেবায় নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার পর বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ, রাজসাহীর জলপ্লাবন প্রভৃতি বৃহৎ কর্মে ও অসংখ্য স্থানীয় দৈব ও মারী উপদ্রবের সময়ে তাহাদের হস্ত সাহায্যের জন্য প্রসারিত হইয়াছে। এক্ষণে ভারত-বর্ষের প্রায় প্রত্যেক তীর্থস্থানের পার্বন ও মেলার সময় স্বেচ্ছাসেবকদিগের চেষ্টা ও যত্নে কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

চতুর্থ ভাগ

১। ভারতে জাতীয় আন্দোলন

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরু একথা সকলেই স্বীকার করেন। দিল্লীর বাদসাহের কতকগুলি অধিকারী দাবী করিবার জন্ত তিনি সম্রাট কর্তৃক বিলাত প্রেরিত হন। সেখানকার পার্লামেণ্টের সমক্ষে তিনি ভারত শাসন সম্বন্ধে যে নির্ভীক ও সংবিবেচনাপূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাহার দূরদর্শীতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশ বৎসর ভারতে কোনো প্রকার আন্দোলন হয় নাই বলিলে চলে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই বিধিসঙ্গত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

রাজনৈতিক গুরু রামমোহন

কলিকাতা ও বোম্বাইতে প্রায় একইকালে (১৮৫১) বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। কলিকাতার এসোসিয়েশনের নেতাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাম চিরস্মরণীয়।

১৮৫১ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেটরিয়টে' ধারাবাহিক লর্ড ডালহৌসীর আত্মসাৎ পলিসির বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন। অযোধ্যা সাতারা নাগপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য বাজেয়াপ্তের ফল যে কি ভীষণ হইতেছিল তাহা বড়লাট না বুঝিলেও হরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ও বিদ্রোহান্তে তিনি নিরপেক্ষভাবে ও অবিচলিতচিত্তে ভালকে ভাল ও

মন্দকে মন্দ বলিয়াছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার খুবই চলিতেছিল। হরিশচন্দ্র 'পেটরিয়টে' ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করেন। নীলকর সাহেবেরা হরিশের উপর এমনি চটিয়াছিল যে অকালে তাঁহার মৃত্যু হইলে এক মোকদ্দমায় তাঁহার পরিবারের যথাসর্বস্ব নষ্ট করিয়া দেয়; দুঃখের বিষয় তখন হরিশের বিধবাকে সাহায্য করিবার কোনো চেষ্টা হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও লঙ্ সাহেবের ইংরাজী তর্জমা এই বহ্নিতে ঘৃতাহুতির মত হইল; নীল দর্পণের অনুবাদের অপরাধে লঙের কারাগার হইল। বাঙালী চাষীরা এই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে তাহাদের অভিযোগ দূর না হইলে তাহারা নীল স্পর্শ করিবে না; নিরক্ষর কৃষকগণ তাহাদের জিদ্ বজায় রাখিয়াছিল। এক কমিশন বসিয়া ইহাদের দুঃখের অনেকটা লাঘব করেন। নীলের উৎপাত সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধের অন্যতম কারণ।

বোম্বাই প্রদেশে জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ও মহাত্মা দাদাভাই নৌরজীর অদম্য চেষ্টায় ১৮৫৪ সালে বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। বাংলা বা বোম্বাই-এর আন্দোলনকারীরা কেবল রাজনীতি সংস্কারেই মত্ত ছিলেন না; রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। পার্শীদের মধ্যে পার্শীধর্ম সংস্কারসভা ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয়; নৌরজী, ওয়াচা, বাঙ্গলী, করদনজী, প্রভৃতি অনেক কৃতি পার্শীর নাম একাধারে রাজনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে দেখা যায়।

বোম্বাইতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলন

বোম্বাইএর বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন দশ বৎসর কাল নানারূপ লোকহিতকর কাজ করিয়া ১৮৬১ সালে লোপ পাইল এবং ১৮৭১ সালে উহা পুনর্গঠিত হইলেও পূর্বের ন্যায় শক্তিশালী হইতে পারিল না। বোম্বাই ছিল পার্শীদের আন্দোলনের কেন্দ্র। পুণা ছিল মহারাষ্ট্রদের

সভ্যতার কেন্দ্র। ১৮৭৫ কি ৭৬ সালে এইখানে কৃষ্ণজী লক্ষণ মুলকর, সীতারাম হরি চিপলুনকর, প্রভৃতি তেজস্বী মহরাঠাগণ "সার্বজনিক সভা" স্থাপন করেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। ১৮৮৭ সালে 'হিন্দু' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাই সেখানকার জাতীয় জীবনের প্রথম স্পন্দন। ১৮৮৪ সালে মান্দ্রাজে "মহাজন সভা" স্থাপিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে উক্ত প্রদেশের সকল শ্রেণীর লোকের অনুকূলতা ও উৎসাহ পাইয়া এই সভা মান্দ্রাজে খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৬৯ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ কয়েকটি ঘটনা ঘটিল। লর্ড মেয়োর শাসনকালে কতকগুলি সংস্কার সাধিত হয়। এ যাবৎ প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রগুলির বিশেষ কোনো স্বাধীনতা ছিল না—সামান্য ব্যয় করিতে হইলেও ভারত সরকারের অনুমতি লইতে হইত। লর্ড মেয়ো ভারত সরকার হইতে প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিকে কতকগুলি বিষয়ে পৃথক্ করিয়া দিলেন। ইহার সময়ে (১৮৬৯) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব এডিনবরা ভারত ভ্রমণে আসেন; ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সহিত ভারতের সাক্ষাৎ-ভাবে পরিচয় এই প্রথম। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে ১৮৬৫ সালে স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলস্ (পরে যিনি সপ্তম এডোয়ার্ড হন, বর্তমান সম্রাটের পিতা) ভারত পরিদর্শন করিতে আসেন। সে-সময়ে ভারতের আপামর সাধারণ রাজভক্তির যে নিদর্শন দেখাইয়াছিল তাহা দেখিয়া রাজকুমার খুবই প্রীত হইয়াছিলেন।

রাজপরিবারের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রুকের পর লর্ড লীটন ভারতের শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লর্ড লীটন ছিলেন ইহার পিতা

বড়লাট বাহাদুর পিতার সাহিত্যানুরাগ পাইয়াছিলেন; এদেশের আশা ও আদর্শের সহিত তাঁহার সহানুভূতির যোগ হয় নাই। ভারতের শাসনভার লইবার কয়েক মাস পরেই তিনি ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিল্লী নগরে মুসলমান বাদসাহের অনুকরণে বিরাট এক দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত-সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিপূর্বে বৃটীশ শাসনকালে এমন জাঁকজমক করিয়া রাজদরবার হয় নাই; সুতরাং সাধারণ লোকের মনের উপর ইহার প্রভাব খুবই ভাল হইল; বৃটীশরাজের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উভয়ই বাড়িয়া গেল। কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহাতে সুখী হইলেন না; তাহার কারণ সেই সময়ে ভারতের সর্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষে লোকে কষ্ট পাইতেছিল। ১৮৭৭ সালে মৌসুম বৃষ্টি দক্ষিণ ভারতে হয় নহে; '৭৭ সালেও বৃষ্টির অবস্থা ভাল হইল না; দুই বৎসর পর পর অনাবৃষ্টির ফলে শস্য হইল কম। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ছড়াইয়া পড়িল। সরকার রেল ও সমুদ্র পথে শস্য প্রেরণ করিলেন, ৮ কোটি টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্যয়িত হইল, তথাপি ৫২ লক্ষ লোক অনাহারে ও অনাহারজনিত পীড়ায় মারা পড়িল। মান্দ্রাজের গবর্ণরের অদূরদর্শিতার ফলে এই নিদারুণ কাণ্ড ঘটিল; লীটনের সকল প্রকার সদুপদেশ ও পরামর্শ মান্দ্রাজের গভর্ণর অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় মতলব মত চলিয়াছিলেন বলিয়া এই নিদারুণ কাণ্ড ঘটিল। দুর্ভিক্ষান্তে এক কমিশন বসিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ ও তাহার নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া এক প্রতিবেদন পেশ করিলেন। এই কমিশনের ফলে ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সুবিস্তৃত আইন-পুস্তক রচিত হইয়াছে। এখন দুর্ভিক্ষ হইলে রাজকর্মচারীকে কখন কি করিতে হইবে, কোথা হইতে সাহায্য পাইতে

লর্ড লীটনের শাসন ও দরবার

দুর্ভিক্ষ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা

হইবে, কেমন করিয়া নিরন্নদের অন্নদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে প্রভৃতি ভাবিয়া দিশাহারা হইতে হয় না; সকল প্রকার ও উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রেলপথ বিস্তারের জন্য কমিশন তাগিদ দিলেন। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ ও তাহার অসম্ভব ব্যয়ের জন্য তিনি যথেষ্ট সমালোচনা ভোগ করিয়াছিলেন।

আর দুইটি কাজের জন্য লীটন ভারতবাসীর কাছে অপ্রিয় হইয়াছিলেন। এই দুইটি কাজ তাঁহাকে সময়োপযোগী কর্তব্যবোধে করিতে হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরেও ভারতবাসী সম্পূর্ণরূপ নিরস্ত্র হয় নাই; এই সময়ে Arms Act পাশ হইলে দেশীয়দের পক্ষে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি আত্মরক্ষার সম্বল রক্ষা করা দোষণীয় বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু য়ুরোপীয়দের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ না হওয়াতে এদেশের লোকের আপত্তির যথেষ্ট কারণ হইল।

অস্ত্র আইন

এই সময়ে দেশীয় কাগজগুলি ক্রমেই সরকার বাহাদুরের কার্য্য সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছিল; তাহাদের যে-সব নমুনা পাওয়া যায় তাহা মোটেই শ্রুতিসুখকর নহে। সমালোচনা ক্রমেই বিদ্বেষের আকার ধারণ করিতেছিল। সরকার যদি প্রজার মনোভাব জানিতে না পারেন তবে তাঁহার পক্ষে সুশাসন করা অসম্ভব। ১৮৩৫ সালে স্যর চার্লস মেটকাফ ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করেন; তারপর এই অধিকার এ যাবৎকাল বরাবর অক্ষুণ্ণভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল; সিপাহী বিদ্রোহের পর মাঝে এক বৎসর মুখঠাসা আইন বা Gagging Act বাহাল ছিল; তারপর কুড়ি বৎসর পরে লর্ড লীটন ১৮৭৮ সালে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন পাশ করিয়া রাজনৈতিক সমালোচনা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই আইন পাশ হইলেই

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ

শিশিরকুমার ঘোষের "অমৃত বাজার পত্রিকা" অকস্মাৎ বাংলা পত্রিকা হইতে ইংরাজী খোলোস পরিয়া বাহির হইল।

১৮৭৬ সালে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পূর্বোল্লিখিত বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোকের সভা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নব্য বঙ্গের আশা আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এই পুরাতন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট ছিল না। যুবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কিছুদিন পূর্বেই সিবিল সার্বিস হইতে বরখাস্ত হইয়া দেশসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন; তিনি, ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা উদীয়মান ব্যারিষ্টার যুবক আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন তেজস্বী যুবক এই নূতন সভা স্থাপন করিলেন। শ্যামাচরণ সরকার ইহার প্রথম সভাপতি; তাঁহার পরে বিখ্যাত খৃষ্টান পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি হন; আনন্দমোহন ইহার প্রথম সম্পাদক।

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন
১৮৭৬

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন স্থাপিত হইবার একবৎসরের মধ্যে বিলাতের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় প্রবেশের বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। কিছুকাল হইতে ভারতবাসীরা এই পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করিয়া সিবিল সার্বিস কার্য্য পাইতেছিল। কিন্তু ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতীয় বালকদের পক্ষে এদেশের শিক্ষা শেষ করিয়া বিলাতে যাওয়া খুবই শক্ত। বিলাতে ও ভারতে এককালীন সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হইবার জন্য কিছুকাল হইতে আন্দোলন চলিতেছিল; এক্ষণে এই নিয়ম পাশ হওয়াতে বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবকগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় বিরাট সভা করিয়া ভারত-সচিবের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইল। ১৮৭৭ সালে ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন যুবক সুরেন্দ্রনাথকে

সিবিল সার্বিস
লইয়া আন্দোলন

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচারকরূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জাবের প্রত্যেকটি প্রধান নগরে গিয়া সিবিল সার্বিসের বয়স বৃদ্ধি ও একইকাল ভারতে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেন। পর বৎসরেও তিনি পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে এই উদ্দেশ্যে গমন করেন। তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন কি লইয়া হইত ভাবিলে বর্তমানে অনেকের হাসি পাইতে পারে, কিন্তু ইহাই বর্তমানের সূচনা।

ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের আলোচনা ও আন্দোলন যে কেবল এখানেই হইতেছিল তাহা নহে; ইংলণ্ডে ভারতের দুই এক জন সুহৃদ চিরদিনই দেখা যায়; তাঁহারা বরাবরই আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। বিধিসঙ্গত আন্দোলন করিতে ইংরাজেরা বাধা দেয় না। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মী জন্ ব্রাইট চিরদিন ভারতের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মিঃ ফসেট্ ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পার্লামেণ্টে লড়াই আরম্ভ করিলেন। ১৮৬৫ সালে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য হন। ভারতের শাসনকার্য্যে ভারতবাসীর সংখ্যা ও সামর্থ্য এত অল্প বলিয়া তিনি প্রতিনিয়ত তাহার তীব্র সমালোচনা করিতেন।

মিঃ ফসেটের বিলাতে আন্দোলন

সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত ভারতীয় আন্দোলনকারীদের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়াছিল; তিনি প্রস্তাব করেন যে বিলাতে এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে একই কালে সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা গৃহীত হউক। ১৮৭১ সালে তাঁহারই সভাপতিত্বে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য এক কমিশন বসিয়াছিল। ১৮৭৪ সালে মিঃ ফসেট পার্লামেণ্টের সভ্যশ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইলে কলিকাতার অধিবাসীরা তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া ৭৫০০

টাকা তাঁহাকে দিয়া পুনরায় সভ্য হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। ১৮৭৫ সালে লর্ড সেলিসবেরী ভারতের রাজকোষ হইতে অর্থ লইয়া রাজঅতিথি তুর্কীর সুলতানকে বিলাতে ভোজ দিলেন। ইহাতে মিঃ ফসেট ঘোর প্রতিবাদ করেন। সেলিসবেরীর এই কার্য্যকে তিনি 'মহৎ নীচত্ব' বলিয়া অভিহিত করেন। আবিসীনিয়া-সমরের সমগ্র ব্যয় ভারতের উপর চাপাইবার প্রস্তাব হইলে পার্লামেণ্টে এই মহাত্মাই প্রতিবাদ করেন ও অবশেষে ঠিক হয় ভারত সরকার অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিবেন, অপরার্দ্ধ বৃটীশ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। ১৮৭৯ সালে ডিউক অব্ এডিনবরা এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তিনি এদেশে ভ্রমণকালে ভারতীয় রাজাদের কিছু কিছু উপঢৌকন দিয়াছিলেন; এই উপঢৌকনের মূল্য ভারতবর্ষ হইতেই দেওয়া হয়। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে ভারতের উপর অর্পিত হইবার কথা উঠিলে ফসেট্ ঘোর প্রতিবাদ করেন। ভারতের পক্ষ হইতে কেবল তিন লক্ষ টাকা দিয়া ইহার মীমাংসা হয়। এইসব অদূরদর্শীতার জন্য তৎকালীন শাসনকর্তারা দায়ী; তাঁহারা দেশের লোকের মত বা মনোভাব গ্রাহ্য না করিয়া চলিতেছিলেন বলিয়াই অশান্তি বাড়িয়া চলিতেছিল। এমন সময়ে মহাত্মা লর্ড রীপন আসিয়া ভারতে শান্তি স্থাপন করিলেন।

১৮৮০ সালে বিলাতে রাজনৈতিক রক্ষণশীল দলের পরাজয় হইলে লীটন কাজ ছাড়িয়া দিলেন ও তাঁহার স্থানে রীপন শাসনকর্তা হইয়া এদেশে আসিলেন। রীপনের প্রথম কাজ হইল আফগানিস্থানের সহিত সন্ধিস্থাপন। আমীরের সহিত তিনি যে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বিগত যুদ্ধের দারুণ দুর্দিনের সময়েও অক্ষুণ্ণভাবে বজায় ছিল। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে যে আইন লীটনের সময়ে পাশ হইয়াছিল রীপন তাহা প্রত্যাহার করিয়া

রীপনের শাসন

দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় রীপন ঘোষণা করিলেন যে জাতীয় স্বরাজ্য পাইবার পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আগে প্রয়োজন। দেশের লোককে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ক্রমশ উপযোগী করা দরকার; ভারতবর্ষ বহুদিন পরাধীন; আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাস ও মিলিত হইয়া কাজ করিবার শক্তি তাহার নষ্ট হইয়াছে। সেই শক্তিবিকাশের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইল। তাঁহার সময় হইতে ম্যুন্সিপালটি ও লোকাল-বোর্ডের শাসনপদ্ধতি আরম্ভ হয়।

রীপন শাসনবিভাগের অন্যান্য কোটায় হস্তক্ষেপ করেন। য়ুরোপীয় ও দেশীয়দের বিচার একই ভাবে হইত না। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত সিবিল সার্বিসের লোক ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন; তিনি ১৮৮২ সালে বঙ্গীয় ছোটলাটের নিকট বিচারালয়ে বর্ণগত ভেদের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করেন। পর বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তৎকালীন (ল-মেম্বর) আইন-সদস্য মিঃ ইলবার্ট এই বিল উপস্থিত করেন। সভাতে রীপন ব্যতীত এই প্রস্তাব আর কেহই অনুমোদন করিলেন না। দেশীয়দের নিকট য়ুরোপীয়দের বিচারের প্রস্তাবে সমগ্র ইংরাজ সমাজ ক্ষেপিয়া উঠিল; চারিদিকে ভীষণ আন্দোলন সুরু হইল; য়ুরোপীয়েরা একযোগে একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু ভারতবাসীর চেষ্টা তখনো সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই। তাহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের আস্ফালনে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন তখন কেহ অনুভব করিতেন না। বিল পাশ হইতে পারিল না। দেশীয় বিদেশীয়দের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ জমিয়া উঠিল।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলন

বাংলাদেশের মনীষিগণের মনের মধ্যে প্রথমে এই কথাটি জাগে যে মিলিত চেষ্টা ছাড়া ভারতের বাঁচিবার আশা নাই। মহারাজ

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ধনে মানে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে কলিকাতায় নেশনাল লীগ (National League) স্থাপিত হয়। ১৮৮৩ সালে ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন এক জাতীয় মহাসভা (National Conference) আহ্বান করেন। কলিকাতায় বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখস্থিত আলবার্ট কলেজের হলে এই সভা হয়। আনন্দ মোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইহার উদ্‌যোক্তা। তিন দিন এই সভার অধিবেশন হয়; দুই বৎসর পরে বোম্বাইতে যে কংগ্রেস হয় ইহা তাহারই পূর্বাভাস। ইহার পরবৎসর মান্দ্রাজে মহাজন সভা ও বোম্বাইতে প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়।

১৮৮৩ নেশনাল কনফারেন্স

ভারতবাসীদের এইরূপ নানা প্রয়াস যখন অস্ফুট আকারে দেখা দিতেছিল তখন একজন সহৃদয় ইংরাজ রাজপুরুষ নীরবে এই নবজীবনের প্রতি স্পন্দন লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই মহানুভব রাজকর্মচারীর নাম মিঃ এ, ও, হিউম্। হিউম্ সিবিল সার্বিসের লোক ছিলেন। তাঁহার চারিত্র মাধুর্য্যে তিনি সিপাহী বিদ্রোহের দুর্দিনে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রজাদের শান্ত করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর আর্থিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য বহুদিন হইতে তাঁহার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। ১৮৮৩ সালে কর্ম হইতে অবসর লইয়া হিউম্ শিক্ষিত ভারতবাসীর এই সাধু চেষ্টা, সদুদ্দেশ্য ও ন্যায্য দাবীর সহিত আপনাকে অঙ্গীভূত করিলেন। রীপনের পরবর্তী শাসনকর্তা লর্ড ডাফরিন। মিঃ হিউম্ ডাফরিনের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলেন। প্রথম তিন বৎসর ডাফরিন জনসাধারণের এই কংগ্রেসকে সুদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন; তারপর ১৮৮৮ সালে চতুর্থ বৎসরে যেবার এলাহাবাদে

মিঃ হিউম্ ও কংগ্রেস

কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেইবার অকস্মাৎ বড়লাট বাহাদুরের মত ও ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষিত হইল।

১৮৮৫ সালের বড়দিনের সময়ে পুণা নগরীতে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনের কথা হয়; সেখানকার সার্বজনিক সভা ইহার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত সময়ে পুণাতে কলেরা মহামারী দেখা দিলে সভার অধিবেশন বোম্বাই সহরে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানকার প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন অল্প সময়ের মধ্যে সম্বর্দ্ধনার যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। বোম্বাইএর নেতাদের মধ্যে তেলাঙ্গ ও ওয়াচার নাম এই সভার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত। এই সভার নাম হইল **"ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস।"** সেই হইতে এই পর্য্যন্ত ভারতের শিক্ষিত সমাজের মনোভাব একপ্রকার কংগ্রেসই প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য (১) ভারতের বিচিত্র জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা; (২) এই মহাজাতির নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান; (৩) ও ভারতের উন্নতির পথের বাধাগুলিকে ন্যায্য ও বিধিসঙ্গত আন্দোলনের দ্বারা দূর করিয়া ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন।

বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস ১৮৮৫

১৮৮৫ হইতে ১৯০৫ সালের স্বদেশী-আন্দোলনের আরম্ভ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের মত ও সব একভাবে চলিয়াছিল। ১৯০৬ সালের কলিকাতার কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী নূতন কথা প্রচার করিলেন; সেটি হইতেছে এই যে ভারতবর্ষ বৃটীশ শাসিত অন্যান্য উপনিবেশাদির ন্যায় স্বায়ত্তশাসন চায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়; তখন হইতে বৃটীশমাল বর্জ্জনের জন্য বাংলাদেশে এক নূতন আন্দোলন সুরু হইল; কংগ্রেসেও তাহার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

১৮৮৫-১৯০৫ কংগ্রেস

ইতিমধ্যে ১৮৯৬ সালে বোম্বাইতে 'প্লেগ' প্রথম দেখা দিল; দেখিতে দেখিতে এই মহামারী ভারতের অল্পায়ু ও অল্পশক্তি অধিবাসী-দের লক্ষ লক্ষের প্রাণবায়ু নিঃশেষ করিয়া লইল। প্রথম কয়েক বৎসর লোকের আতঙ্ক হইত; কারণ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই অভিনব শত্রুর হাত হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাওয়া যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া নানারূপ প্রতিকারের চেষ্টা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকের কাছে ব্যাধির চেয়ে ব্যাধির চিকিৎসা অধিক আতঙ্কের হইয়া উঠিল। প্লেগ-রোগীদের পৃথক হাসপাতাল করিয়া সেখানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা সকল স্থানে যে লোভনীয় হইয়াছিল তাহা নহে। পুণাতে এক দল লোক মনে করিলেন সরকার কেবল উৎপীড়ন করিবার জন্য এই কাটাঘায়ে নুনের ছিটার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিঃ র‍্যান্ড পুণায় প্লেগ অফিসার ছিলেন; সমস্ত আক্রোশ তাঁহার উপর পড়িল; দুইজন যুবক তাঁহাকে হত্যা করিল। বোম্বাই প্রদেশের লোকে এই যুবকদিগকে তাঁহাদের পরিত্রাতা বলিয়া মনে করিল এবং জাতি ও ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ দিয়াছে বলিয়া বীররূপে পূজিত হইতে লাগিল। অনেকে মনে করেন নূতন জাতীয়তা বোধের সূত্রপাত এইখানে।

১৮৯৬ প্লেগের আবির্ভাব

লর্ড কর্জন ১৮৯৮ সালে ভারতের শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত, জবরদস্ত ও সকল বিষয়ে উপযোগী লাট ইতিপূর্বে ভারতে কখনো আসেন নাই। অনেকে মনে করেন যে কর্জন খুব রক্ষণশীল ছিলেন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করিবার জন্য তিনি যখন নূতন বিধি প্রণয়ন করিতে মনস্থ করিলেন তখন ভারতবাসীরা একবাক্যে তাঁহার এই কার্য্যের মধ্যে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদল লোক বলিলেন ভারতের উচ্চশিক্ষা

কর্জন ও শিক্ষা সংস্কার

বন্ধ করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা একটা ফিকির মাত্র, এইরূপ অনেক কথা সেই সময় শোনা গিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ভারতে যে কেবল শিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা নহে, উচ্চশিক্ষা পূর্বাপেক্ষা অনেক অংশে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে অধ্যাপিত হইতেছে ও ছাত্রদের মনে যথার্থ জ্ঞানানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপাধি বিতরণের সময়ে তিনি প্রসঙ্গচ্ছলে পূর্বদেশীদের স্বভাব সম্বন্ধে একটি অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলেন। শিক্ষিত বাঙালী তাঁহার এই উক্তিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া টাউন হলে বিরাট সভা আহ্বান করিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন। উচ্চতন রাজকর্মচারীর দোষ ত্রুটি ধরিয়া তাহার তীব্র সমালোচনা করিবার মত সাহস বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়িতেছিল। ইহার চেয়েও গুরুতর আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যে আরম্ভ হইল। তাহার কারণ এই।

লর্ড কর্জনের সময়ে বাংলাদেশ বলিতে আজকালকার বাংলা, এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বুঝাইত। একজন ছোটলাটের পক্ষে সত্যই এই কাজ অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত সরকার ১৯০৩ সালে ৩রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিভক্ত করিবার প্রস্তাব প্রচার করিলেন। বাঙালীর ইহা পছন্দ হইল না। বাংলার চারিদিকে প্রতিবাদ করিয়া সরকার বাহাদুরকে জানানো হইল যে তাঁহারা যেন এমন কার্য্য করিয়া বাঙালীর হৃদয়কে আহত না করেন। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্য আবেদন নিবেদনের অন্ত থাকিল না; পূর্ববঙ্গের ৭০ হাজার লোকের সহি দিয়া এক আবেদনপত্র ভারত-সচিবের নিকট প্রেরিত হইল। ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ২০০০ মিটিংএ সরকার বাহাদুরের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অনুরোধ

বঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা

করা হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মনে করিলেন শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বঙ্গচ্ছেদকরা তাঁহাদের কর্তব্য; সুতরাং বাঙালীর ভাবোন্মত্ততায় কর্ণপাত করিতে গেলে রাজকার্য্য করা সুকঠিন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী জিলা আসামের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গ-আসাম নামে পৃথক একটি প্রদেশ হইল—ঢাকা হইল ইহার রাজধানী। প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ পূর্বের ন্যায় বিহার-উড়িষ্যার সহিত যুক্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত থাকিবে। দুই বৎসরের ঘোর প্রতিবাদ ও সাঙ্গনয় অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সরকার যখন বাঙালী জাতিকে বিভক্ত করিলেন তখন শান্ত ভীরু বাঙালীর মনেও সরকারকে জব্দ করিবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল; ইহাই স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গচ্ছেদ বাংলার বা ভারতের এই নূতন জাগরণের কারণ নহে ইহা স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষ মাত্র। এই আন্দোলনের মূল ভারতবাসীর মনের গভীরতর প্রদেশকে বহুকালই স্পর্শ করিয়াছিল।

বঙ্গচ্ছেদ ১৯০৫

১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখ বাংলাদেশের স্বদেশী-আন্দোলনের জন্মদিন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' বা বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। প্রথমে যে আন্দোলন সুরু হয় তাহা ছিল কেবল রাজনৈতিক, অর্থাৎ যে প্রতিজ্ঞাপত্র বাহির হয়—তাহাতে লেখা ছিল যে যতদিন না বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়, ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা হইবে ইত্যাদি। কিন্তু উহাই স্বদেশী বা শিল্পোন্নতি আন্দোলনে পরিণত হইল এবং আরও পরে উহা জাতীয় বা 'নেশন্যালিষ্ট' আন্দোলনে পরিণত হইল। ৩০শে আশ্বিন বঙ্গচ্ছেদের দিন। সেই দিনকে বাঙালী একাধারে আনন্দ ও

বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন বা বয়কট

বিষাদের দিন করিয়া লইল ; বাংলার যে ভাগ হইয়াছে ইহা বাঙালী স্বীকার করিল না ; রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবানুসারে বাঙালী এই দিনটিকে পবিত্র "রাখিবন্ধনের" দ্বারা জাতীয় বন্ধনকে দৃঢ় করিল ; তিনি সেই সময়ের উপযোগী করিয়া "বাংলার মাটি, বাংলার জল" নামে অক্ষয় সঙ্গীতটি রচনা করিয়া দেশবাসীর কণ্ঠে উপহার দিলেন।

রাখিবন্ধন

ক্রমে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় লইয়া দেশের নানাস্থানে অশান্তির সৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রতি গ্রামে প্রতি সহরে বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া স্থানীয় নেতৃগণ কলিকাতার বিখ্যাত বক্তাদের লইয়া যাইতেন। বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণ, চিনি, মনোহারী সামগ্রী বর্জন করিতে তাঁহারা সকলকেই উৎসাহিত করিতেন। স্কুলের ছেলেরা 'পিকেটিং' সুরু করিল, অর্থাৎ কাহাকে বিলাতী কাপড় চিনি লবণ বা কোনো দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইতে দেখিলে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাকে অনুনয়, বিনয়, ভয় প্রভৃতি নানা উপায়ে দেশী কাপড় কিনিতে প্রবৃত্ত বা বাধ্য করিত। দেশী কাপড় মাথায় করিয়া স্কুল কলেজের ছাত্রেরা, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্বদেশী আন্দোলনের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। কোনো কোনো স্থানে স্বদেশীর নামে নিরক্ষর লোকের উপর রীতিমত জুলুম হইয়াছিল। এই দেশব্যাপী বিলাতী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলনের ফল ফলিল। ১৯০৮ সালে পূজার সময়ে লক্ষ্মীপূজার দিনে মাড়বারীরা বিলাতী কাপড় রপ্তানীর কণ্ট্রাক্ট কমাইয়া দিল ; কয়েকটি হৌস্ দেউলাও হইয়া গেল।

সরকার এই সব আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য ধীরে ধীরে নিয়মাদি পাশ করিতে লাগিলেন। স্কুলের ছাত্রদের এই সব হুজুগে যোগ দেওয়া তাহাদের পাঠ ও মনের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রিসলী সাহেব স্কুলসমূহের উপর এক সার্কুলার প্রচার করিলেন।

উৎসাহের আতিশয্যে তখনই তাহার পাল্টা Anti-circular Society খোলা হইল। কিছুকালের জন্য এই সমিতি দেশের কাজ খুব উৎসাহের সহিত করিয়াছিল। বিলাতী বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য ও দেশীয় অর্দ্ধমৃত কুটীর-শিল্পকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য যতটুকু ভাবোচ্ছ্বাস প্রদর্শনের প্রয়োজন তাহা করিতে বিজ্ঞ নেতা হইতে স্কুলের ছেলে কেহই কিছু কম করেন নাই। চারিদিকে তাঁত, মোজার কল, নিবের কারখানা, বোতামের কারবার জাগিয়া উঠিল। হঠাৎ যেন বাংলায় 'মরা গাঙে বান' আসিল।

এন্টিসার্কুলার সোসাইটি

স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদিগেকে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া সরকার বাহাদুর কড়াকড়ি আরম্ভ করিলেন ও আন্দোলনকারীদিগকে শাস্তি বিধান করিতে লাগিলেন তখনই বাঙালী উৎসাহে অন্ধ হইয়া "বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্" স্থাপন করিল। ১৯০৬ সালে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল; এম্ এ ক্লাস হইতে শিশু শিক্ষার ক্লাস পর্য্যন্ত কখন কোথায় কি কি পড়ান হইবে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত, লিপিবদ্ধ, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্

বাংলাদেশে ধনে-মানে-জ্ঞানে এমন একটি বড় লোক ছিলেন না, যাঁহার নাম এই পরিষদের সহিত যুক্ত না ছিল। দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিল, বাড়ী ভাড়া করা হইল, প্রকাণ্ড লাইব্রেরী দানে দানে ভরিয়া উঠিল—ছাত্র জুটিল। বহু গ্রামে ও সহরে জাতীয় শিক্ষালয় খোলা হইল—স্বার্থত্যাগী শিক্ষক ও কর্মীর অভাব কোথাও হইল না। কিন্তু আজ সে শিক্ষা পরিষদ্ কোথায়? কেবল মাত্র টেক্‌নিক্যাল্ বিভাগ চলিতেছে।

১৯০৬ সালের গুডফ্রাইডের ছুটিতে সেবার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স

বরিশালে হয়। পুলিশ আসিয়া এই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায় এবং কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় লোকও পুলিশের কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন। বরিশালের অপমাননায় বাংলাদেশ অপমান বোধ করিল; বয়কট ও আন্দোলন ভীমবেগে চলিতে লাগিল।

বরিশালে প্রথম সংঘর্ষ

এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই নেতাদের মধ্যে ভারতের ভাবী আদর্শ ও তাহা লাভ করিবার উপায় লইয়া মত ভেদের স্ত্রপাত হয়। কাগজপত্রে একদল 'নরমপন্থী' ও আর একদল 'চরমপন্থী' বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ ও গোখলে নরমপন্থীদের নেতা, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও টিলক চরমপন্থীদের চালক ছিলেন। 'বন্দে মাতরম্', 'স্বরাজ', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি', 'কর্মযোগীন্', প্রভৃতি কাগজগুলি চরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল। এই সবগুলিই নূতন পত্রিকা এবং ইহার একখানিও আজ নাই। 'যুগান্তর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম হইতেই বাহির হইতে থাকে; তাহার ভাব ও ভাষা অন্যসবগুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। শারীরিক শক্তির দ্বারা বৃটীশ শক্তিকে পরাভূত করিতে হইবে এইমত তাঁহারা প্রচার করেন। বাঙালী শরীরে দুর্বল এ অপবাদ ঘুচাইবার জন্য বাংলাদেশের নানাস্থানে 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হয়; গীতাপাঠ, রাজদ্রোহাত্মক সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা, বর্তমান রণনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা, লাঠি, তরবারি, ছোরা প্রভৃতি খেলিতে শিক্ষা দেওয়া এই সব সমিতির প্রধান কাজ ছিল বলিয়া প্রকাশ। যুগান্তরের লেখকগণ লোককে বুঝাইতেন যে শারীরিক শক্তিপ্রয়োগপূর্বক বৃটীশ শাসনকে উঠাইতে হইবে; হত্যা করা ধর্মের অঙ্গ এই মত ত' গীতায় স্বয়ং ভগবান প্রচার করিয়াছেন ইত্যাদি। গীতার ধর্মকে ইহারা

চরমপন্থী ও নরমপন্থী

"যুগান্তরের" বিপ্লববাদ

ইত্যাদি করিবার ধর্মের আবরণ ও বর্ম করিলেন; রাজনীতি ও ধর্ম এক হইল। ইহার বিষময় ফল অচিরেই দেখা গেল।

১৯০৬ সালে যুগান্তরের সম্পাদকের প্রথম জেল হইল। ভারতের অন্যত্রও এই শ্রেণীর সাহিত্য ও পত্রিকা প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। হিন্দিতে 'হিন্দস্বরাজ', মহরাঠি ভাষায় 'কাল' ও 'কেশরী' যে-ভাবে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে থাকিলেন তাহাতে বিদ্বেষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এইসব আন্দোলন ও অশান্তিকারীদের মধ্যে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও বিনায়ক সবরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণবর্মা ১৯০৬ সালে বিলাতে চলিয়া যান ও সেখান হইতে রাজদ্রোহ জাগ্রত করিবার জন্য নিয়মিতভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাতের সকল প্রকার বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিলেন তিনি; অবশেষে লণ্ডন হইতে পলায়ন করিয়া তিনি প্যারী নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান হইতে বিদ্রোহ, রণনীতি, ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বহুপ্রকারের পত্রিকা ভারতে প্রেরণ করেন। বাংলাদেশের ন্যায় বোম্বাই ও পঞ্জাবের ভিতরে অশান্তি ও বিদ্রোহের তুষেঢাকা-আগুন গুমরাইতেছিল।

কৃষ্ণবর্মা ও ষড়যন্ত্র

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে বড়লাট লর্ড মিণ্টো ঘোষণা করিলেন যে তিনি পার্লামেণ্টের নিকট ভারতশাসন সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। প্রায় ঠিক সেই সময়ে পঞ্জাবে নানা স্থানে অশান্তির চিহ্ন দেখা দিল; আর্য্যসমাজের নেতৃস্থানীয় লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিৎ সিং এই সব অশান্তির জন্য দায়ী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সাব্যস্ত করেন ও ১৮১৮ সালের নির্বাসন আইনানুসারে তাঁহাদিগকে দেশান্তরিত করিলেন। বাংলাদেশেও তলে তলে এই সময়ে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

পঞ্জাব নেতাদের নির্বাসন

ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। 'মরম' ও 'চরম'পন্থীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। নাগপুরের কংগ্রেস-অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির হাত হইতে কলম কাড়িয়া লইলে সভা ভাঙ্গিয়া যায়। সুরাটের কংগ্রেসে (স্যর) ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হন। তাঁহার বক্তৃতা পাঠের পূর্বেই চরমপন্থীরা সভামধ্যেও এমন কাণ্ড বাঁধাইয়া তুলিলেন যে তাহাতে সভা হইতে পারিল না। গোলমালের সময়ে একখানি মহরাঠা দেশীয় জুতা প্রবীন নেতা সুরেন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল।

এদিকে ১৯০৮ সালে ৩রা মে তারিখে মজঃফরপুরে এক ভীষণ কাণ্ড হইল। মিঃ কেনেডী নামক একজন ইংরেজ ব্যারিষ্টার তাঁহার স্ত্রী শুদ্ধ বোমার দ্বারা নিহত হন। এই অপরাধী ধরা পড়ে। ইহার নাম ক্ষুদীরাম—মেদিনীপুরের একটি স্কুলের ছাত্র। কিংসফর্দ নামক কোনো ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করায়—এই বোমা তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় মাণিকতলায় প্রকাণ্ড এক বোমার কারখানা ও ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল।

প্রথম হত্যা

মাণিকতলায় বোমার কারখানা

ইহা আলিপুর বোমার মোকদ্দমা নামে বিখ্যাত। সরকার অনুসন্ধান করিয়া জানেন যে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক দুই বৎসর ধরিয়া এই কর্মে লিপ্ত থাকিয়া নানা প্রকারে দেশের মধ্যে উত্তেজনা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র সেন, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামক একজন ষড়যন্ত্রকারী রাজসাক্ষী হওয়াতে, দুইজন অপরাধী আলিপুর জেলের মধ্যে নরেন্দ্রকে রিভলভার দিয়া গুলি করিয়া মারে। এই হত্যাকারীদের একজনের নাম কানাই-

লাল দত্ত; ইনি বিশ্ববিদ্যালের বি, এ; সকলেই ইহাকে খুবই শান্ত ছাত্র বলিয়া জানিত। বিচারে কানাইলালের ফাঁসি হয়। বোমার মোকদ্দমায় অরবিন্দ খালাস পাইয়া দেশত্যাগী হইয়া ফরাসী পন্দেচারীতে চলিয়া গেলেন। বারীন্দ্র প্রভৃতি অপরাপর অপরাধীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল এবং অনেকে নানা কালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল।

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুদীরাম দেশের বীর বলিয়া পূজিত হইতে থাকিল। তাহার ফোটো ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে টাঙ্গানো থাকিত। এই সময়ে টিলক তাঁহার পত্রিকাতে এই হত্যা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে সরকারের পক্ষে আপত্তিজনক অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের বিচারে টিলকের ছয় বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়। সরকার এখানেই শান্ত হইলেন না; বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের যে কয়জন নেতা ও কর্মী ছিলেন— তাঁহাদের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনীর সম্পাদক ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা), অশ্বিনীকুমার দত্ত (বরিশালের নেতা), পুলিনবিহারী দাস (ঢাকার অনুশীলন সমিতির নেতা, পরে ঢাকার মোকদ্দমায় সাত বৎসর কয়েদ হয় ও ছাড়া পাইয়া অন্তরীণে আবদ্ধ হন ও এখন মুক্ত), মনোরঞ্জন গুহ (নবশক্তির সম্পাদক) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতিকে ১৮১৮ সালে আইনানুসারে অকস্মাৎ দেশান্তরিত করিলেন। তিন প্রদেশের প্রধান প্রধান নেতাদের কাহাকে কারাগারে পাঠাইয়া, কাহাকে দেশান্তরিত করিয়া মুষ্টিমেয় যুবকদের রাজদ্রোহ ও বিপ্লব করিবার সকল চেষ্টা মূলেই ধ্বংস করিয়া দিলেন। এই সময়ে অনেকগুলি আইন সরকার পাশ করেন; পাবলিক মিটিং অ্যাক্‌ট্ অনুসারে সভার সময় স্থান ও ভাষা সম্বন্ধে কড়াকড়ি হইল,

টিলকের কারাবাস

বাংলার নেতাদের নির্বাসন

বিপ্লব দমন ও নূতন নূতন আইন প্রণয়ন

প্রেস অ্যাক্ট্ অনুসারে ছাপাখানার মালিককে টাকা জামিন রাখিতে হইল ; এ ছাড়া সিডিশন আইন বা রাজদ্রোহ বিষয়ক সভার আইন ও অসংখ্য হুকুমজারি করিয়া আন্দোলনকারীদিগকে দমন করিয়া দিলেন। নানা গ্রামে প্যুনিটিভ পুলিশ বসিল। শিক্ষা বিভাগ হইতে অসংখ্য পরওয়ানা বাহির করিয়া বালকদিগকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা হইল ; যাহারা শাসন মানিতে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিল কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকেই বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিলেন ; তাহারা নেশনেল স্কুলে ভর্তি হইল। উপরি উক্ত আইনসমূহ পাশ হইবার ও নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর লর্ড মিণ্টোর শাসনকালের শেষ দুই এক বৎসর বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়াছিল। কিন্তু রাজদ্রোহের বিষ একেবারে নষ্ট হয় না।

মুসলমানদের মধ্যে এক হইয়া কাজ করিবার ইচ্ছা হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক পরে দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্যে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেন স্যর সৈয়দ আহমদ ; তিনিই প্রথমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত ইসলামের সভ্যতা মিলাইবার জন্য আলিগড়ে কলেজ স্থাপন করেন। লক্ষ্ণৌএর মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল হইলেও উদারচেতা, ইংরাজীশিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ভারতের সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯২ সালে যখন ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার হয় তখন সভাতে মুসলমানদের জন্য বিশেষ কোনো পৃথক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। তখনো সাম্প্রদায়িক বা ক্ষুদ্র বর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা রাজনীতির মধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায় নিজের পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিল। ১৯০৬ সালে মোসলেম লীগ (Moslem League) স্থাপিত হয়।

মুসলমানদের আত্মশক্তিবোধ

১৯০৬ মোসলেম লীগ

প্রতিষ্ঠার সময়ে ইহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা ও বৃটীশরাজের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে মুসলমান সমাজ হিন্দুদের এই আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করিতে পারে নাই; হিন্দুরাও তাঁহাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের দলপুষ্টির জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন যথার্থ প্রীতির জন্য বা মিলনের জন্য তাহাদিগকে ডাকেন নাই। সেই সময়ের অনেক কাগজ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে সরকার হিন্দু ও মুসলমানের মিলন চান না। পূর্ববঙ্গে অশিক্ষিত মুসলমানেরা হিন্দুদের মন্দির বাজার প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে থাকে। মৈমনসিংহের জামালপুরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়; কুমিল্লাতে দাঙ্গায় লোকও মারা পড়ে! সরকার এইরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিতে পারেন একথা অশিক্ষিত মূর্খের মাথায় স্থান পাইবার কথা; তা বৈ কোনো সদ্‌বিবেচক ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু অশিক্ষিতদের মধ্যেও এই বিরোধ ও বিবাদের উপরে উঠিয়া মোসলেম লীগ ১৯১৩ সালে স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিলেন যে তাঁহাদের মতে ভারতে স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন।

হিন্দুমুসলমান বিরোধ

১৯০৭ সালে ভারত সরকার শাসনপদ্ধতির সংস্কার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তৎকালীন ভারতসচিব মর্লী ও বড়লাট মিণ্টো উভয়ে মিলিয়া শাসনবিভাগে কতকগুলি সংস্কার করেন; তাহার মধ্যে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সংস্কারের কথা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ১৯১০ সালে লর্ড মিণ্টো চলিয়া গেলে নভেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটরূপে ভারতে আগমন করিলেন।

১৯০৮ সালের শাসন সংস্কার

মর্লী-মিণ্টো সংস্কার ভারতে শান্তি আনিতে পারেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের কেহ খুসী হইলেন, কেহ বা হইলেন না।

বিপ্লবকারীদের উপদ্রব

কিন্তু বিপ্লবকারীদের কেহই কোনো প্রকার রাজনৈতিক সংস্কারে খুসী হন না। রাজনৈতিক ডাকাতি হত্যা বাংলাদেশের নানাস্থানে পুনরায় দেখা দিল। এই সময় হইতে রাজনৈতিক বিপ্লবের ঘটনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে থাকে।

দিল্লীতে সম্রাটের অভিষেক ও বঙ্গচ্ছেদ রদ

১৯১১ সাল ভারতের পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন; ঐ বৎসরের ২রা ডিসেম্বর তারিখে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী তাঁহাদের সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারত দেখিতে আসিলেন ও ১২ই তারিখে দিল্লী মহানগরীতে অভিষিক্ত হইলেন। দিল্লীর দরবারে সম্রাট ঘোষণা করিলেন যে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ রদ হইল ও সংযুক্ত বঙ্গ একজন গভর্ণরের হস্তে অর্পিত হইল। বিহার-উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একটি পৃথক প্রদেশ করিয়া একজন ছোটলাটের হস্তে প্রদত্ত হইল। বঙ্গচ্ছেদের পূর্বের মত আসাম কমিশনরের হস্তে ফিরিয়া গেল। রাজঘোষণার দ্বিতীয় বিধানে রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল; ১৫ই ডিসেম্বর সম্রাট সম্রাজ্ঞী উভয়ে নূতন দিল্লীর ভিত্তি-পাষাণ প্রোথিত করিলেন। এই সময়ে শিক্ষার জন্য সম্রাট্ বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া যান।

বঙ্গচ্ছেদ বিনা চেষ্টায় উঠে নাই। কংগ্রেস ও নরমপন্থীরা বিধিসঙ্গত আন্দোলন ও ন্যায্য পথে থাকিয়া আপনার দাবী কোনো দিন ছাড়েন নাই। বিলাতে ভারতবন্ধু হেনরী কটন, হারবার্ট পল, কে আর হার্ডি, মিঃ নেভিনসন্ প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি পার্লামেণ্টে ও পত্রিকাদিতে ভারতের অভিযোগ সর্বদাই জ্ঞাপন করিতেন। মিঃ মর্লীর পরে লর্ড ক্রু ভারত-সচিব হন। কলিকাতা হইতে ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েশন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বিলাতে প্রেরণ করেন। তিনি ভারতসচিবের সহিত দেখা করিয়া বঙ্গচ্ছেদের সকল দিকের কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে এই আন্দোলন থামে নাই। সম্রাট আসিয়া বাঙালীর ন্যায্য দাবী মিটাইলেন। কিন্তু একদলের দাবী ও আকাঙ্ক্ষা সকলপ্রকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইয়াছিল তাহাদের আশাও মিটিল না, তাহাদের দাবীও পূরণ হইতে পারিল না।

এদিকে ১৯১৪ সালের ৪ঠা জুলাই য়ুরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হয়; সেইদিন হইতেই ভারতের ধন প্রাণ সমস্তই সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য ভারতবাসী উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনেও বিপ্লবকারীদের উপদ্রব কমিল না। তখন সরকার ভারতরক্ষা আইন পাশ করিলেন। এই আইন যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের ছয় মাস পর পর্য্যন্ত বাহাল থাকিবে ঠিক হইল।

১৯১৪ যুদ্ধারম্ভ ও ভারতরক্ষা আইন

এই আইনের সাহায্যে বাংলাদেশে প্রায় ১২০০ যুবককে সন্দেহ করিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়। অন্তরীণের কার্য্য খুবই জবরদস্তভাবে যুদ্ধের কয়েক বৎসর চলিতে থাকে; ইহার ফলে চারিদিকের অশান্তি ও অরাজকতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এই সময়ের খবরের কাগজে কতকগুলি সরকারী চাকরের অদূরদর্শিতার জন্য আবদ্ধ লোকের কষ্টের কথা প্রায়ই প্রকাশিত হইত; কয়েকটি আত্মহত্যার কথাও কাগজে প্রচারিত হয়। সরকার এই সমস্ত অভিযোগের যথোপযুক্ত সদুত্তর দান করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে ঐ সকল অভিযোগের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া শাস্তিদান করিবার শক্তি বৃটীশ ভারতের আইনে নাই; সেইজন্য সরকার হইতে ভারতরক্ষার বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অন্তরীণ ও দেশে শান্তি

১৯০৭ সালের সুরাটের কংগ্রেস ভাঙ্গিবার পর 'নরমপন্থীরা' কংগ্রেসের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিলক তাঁহার ছয় বৎসরের দীর্ঘ কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, তেজ কিছুমাত্র কমে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৫ বৎসর বাসের পর ১৯১৫ সালে গান্ধীজি দেশে ফিরিলেন। অপরদিকে ১৯১২ সাল হইতে ভারতের মুসলমানেরাও স্বায়ত্তশাসন পাইবার জন্য মোসলেম লীগের সর্ত বদলাইয়া লন। বহুকাল হইতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হইতেছিল; ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌএর কংগ্রেসে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেই বোঝাপড়া হইল। কংগ্রেস মোসলেম লীগের কতকগুলি দাবী মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলে তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত এক হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিবেন বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ভারতের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ ঘটনা বলিয়া তখন লোকে ভাবিয়াছিল। ১৯১৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন বেসরকারী ভারতীয় সদস্য ভারতের ভাবী শাসন সংস্কার সম্বন্ধে এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া ভারত সরকারের নিকট পেশ করেন। কংগ্রেস ও লীগ ইহাই একটু পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করিলেন ও তাহাই আদর্শ শাসনপদ্ধতিরূপে দাবী করিলেন।

যুদ্ধারম্ভে রাজনৈতিক আন্দোলন

এদিকে শ্রীমতী আনি বেসান্ত কিছুকাল হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতেছিলেন। তিনি 'হোমরুল লীগ' নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া মান্দ্রাজে প্রকাণ্ড একটি আন্দোলনের ঝড় তুলিলেন। বোম্বাইতে তিলকও একটি পৃথক্ লীগ স্থাপন করিলেন; কংগ্রেস তখনও নির্জীব। সমগ্র ভারতবর্ষ যুদ্ধের পর নূতন কিছু পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল; সকলেই আশা করিল যুদ্ধান্তে রাজ্যশাসনে তাহাদের দায়ীত্ব বাড়িবে।

'হোমরুল লীগ'

যুদ্ধের জন্য ভারতবাসী ১৫০ কোটি টাকা নগদ দান করিল; তাহারা যাত্রীদের অসুবিধা করিয়া মালপত্র চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ গাড়ীর অভাব করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বহু রেলওয়ে সরঞ্জাম মেসোপটেমিয়ায় প্রেরণ করিল; ভারতের অধিকাংশ দেশী ও বিদেশী সৈন্য মহাসমরের সকল কেন্দ্রে প্রেরিত হইল; দেশীয় নৃপতিগণ প্রত্যেকের সাধ্যমত অর্থ ও সৈন্য দান করিলেন; ভারতীয় যুবকগণ দলে দলে সৈন্যদলে ভর্তি হইতে লাগিল। এত করিয়া ভারতবাসী ভাবিল তাহার দাবী ন্যায্য, বৃটীশ-সাম্রাজ্যে তাহার অধিকার ও স্থান আছে।

যুদ্ধে ভারতের দান

কিন্তু এমন সময়ে ভারতবাসী ইংরাজজাতির একটি ব্যবহারে বিশেষভাবে মর্মাহত হইল। কানাডা ইংরাজদের উপনিবেশ। সেখানে ভারতবাসীদের প্রবেশ সম্বন্ধে নিয়ম ছিল যে যে-জাহাজ সোজাসুজি কানাডায় না যায় এমন কোনো জাহাজে করিয়া না গেলে ভারতবাসীকে কানাডায় নামিতে দেওয়া হইবে না। অথচ কোনো জাহাজই সোজাসুজি ভারতীয় বন্দর হইতে কানাডায় যাইত না। গুরদিৎ সিং নামক জনৈক শিখ "কোমাগাটা মারু" নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া তিনশত শিখসহ কানাডায় উপস্থিত হন। সেখানে তাহাদের নামিতে দেওয়া হয় না এবং তাহাদিগকে জোর করিয়া বন্দর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহারা ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তাহাদিগকে কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয় এবং সোজা পঞ্জাবে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ হয়। তাহারা সে-আদেশ মানিতে অস্বীকার করে ও পুলিসের সঙ্গে তাহাদের দাঙ্গা হয়। এই ঘটনায় পঞ্জাবের লোকে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়। সাধারণ লোকে জানে ইংরাজ-রাজ্যের সর্বত্র তাহাদের অধিকার আছে এবং তাহাদের প্রতি অবিচারের জন্য ইংরাজই

"কোমাগাটা মারু"

দায়ী। কিন্তু বস্তুত উপনিবেশগুলির ব্যবস্থার মধ্যে বেশী হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার বৃটীশ পার্লামেণ্টের নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতবাসীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট খুবই প্রতিবাদ করিতে পারেন, পার্লামেণ্ট অপচ্ছন্দ করিতে পারেন; কিন্তু উপনিবেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারো নাই। তাহা লোকে ভাল করিয়া বুঝে না। কিন্তু এই সবের ফল বিষময় হইল।

বেসান্তের অন্তরীন

এদিকে ভারতের নানা স্থানে শ্রীমতী বেসান্তের "হোমরুল লীগ" দিনদিন অগ্রসর হইতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমে বাংলা-দেশের স্কুল কলেজের ছাত্রেরা যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল, মান্দ্রাজের হোম্‌রুল লীগেও সেইরূপ ছাত্রেরা যোগদান করিতে সুরু করিল। সরকার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করায় বেসান্ত জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। আদেরে পূর্বেই থিওজফি সমাজের স্কুল কলেজ ছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেসান্ত ক্রমেই তাঁহার প্রবন্ধ বক্তৃতাদির মধ্য দিয়া ইংরাজ সরকারের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময়ে চারিদিকে বিপদ, সুতরাং এ প্রকার মত প্রকাশের দায়ীত্ব কতখানি তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সরকার তাঁহাকে বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও তিনি সে-সবে কর্ণপাত করেন নাই। তখন মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার দুজন সহকর্মীকে অন্তরীনে আবদ্ধ করিলেন। ইহারই কিছুকাল পূর্বে মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় মহম্মদ আলী তদীয় ভ্রাতা সৌকৎ আলীর সহিত ভারতরক্ষা আইনানু-সারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সব ঘটনার জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমাজ একযোগে আন্দোলন সুরু করিল।

১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে তৎকালীন ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু পার্লামেণ্টে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে বিখ্যাত ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। ভারতকে ক্রমে ক্রমে দায়ীত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পথে লইয়া যাইতে হইবে ইহাই ঘোষণাপত্রের মর্ম।

মিঃ মণ্টেগুর ঘোষণা ২০শে আগষ্ট

ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে বেসান্তকে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু মহম্মদ আলী কোনো প্রকার সর্তের মধ্যে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সরকারও তাঁহাদের ছাড়িতে পারিলেন না। সেবার কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা; বাংলার অভ্যর্থনা সমিতিতে সভাপতি কে হইবেন তাহা লইয়া অত্যন্ত অশান্তি হয়। চরমপন্থীদের জিদ্ বজায় থাকিল—বেসান্ত সভানেত্রী হইলেন। এই বৎসর হইতে কংগ্রেস প্রাচীন নেতাদের হস্ত হইতে চলিয়া গেল; কংগ্রেসে নূতন প্রাণ দেখা দিল।

১৯১৬ সালে লক্ষৌতে কংগ্রেস ও লীগের রাজনীতি সম্বন্ধে যে বোঝাপাড়া হয় তাহা অনেকটা পরিমাণে পুঁথির ব্যাপার হইয়াছিল; গভীরভাবে মিলন হইবার পক্ষে উভয় দলের বাধা বিস্তর ছিল। উদার ধর্মনীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে যেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, আলিগড়ের মুসলমানদের ও হিন্দুমুসলমান মিলনের বিরুদ্ধে লক্ষৌএর মৌলবীদের জিদ্ তেমনি প্রবলভাবে দেখা দিল। মুসলমানী কাগজ ও সমাজ হোম-রুলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের সহিত লীগকে জড়িত করায় মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দুদের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে, এইরূপ অভিযোগ কোনো কোনো দিক হইতে শোনা গেল। কংগ্রেস যে হিন্দুর প্রতিষ্ঠান নয় ইহা যে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি একথা অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমানের কাছেই অস্পষ্ট। লক্ষৌতে মুসলমানদের দাবী মিটাইলে হিন্দুদের অনেকেও খুসী হন নাই। ইতি-

মুসলমানদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়

মধ্যে য়ুরোপের যুদ্ধে তুর্কীর পরাজয় আরম্ভ হইল। এশিয়াতে মেসোপটেমিয়া সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের হাতে আসিল; আরবের শেরিফ তুর্কীর সুলতানের শাসন হইতে পৃথক্ হইয়া ইংরাজদের সাহায্যে নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন; প্রাচীন খিলাফৎ দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুসলমানদের কাছে ধর্ম ও রাজনীতি এক। পৃথিবীর যাবতীয় মুসলমানধর্ম ও সমাজের গুরু তুর্কীর সুলতান। তুর্কীর ধ্বংসকার্য্য দেখিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ সহজেই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছ হইতে এ বিষয়ে আশানুরূপ সহানুভূতি পাওয়া গেল না; কাহারো মত ভারতের রাজনীতির সহিত ভারতের বাহিরের রাজনীতি যুক্ত করিলে এদেশের মঙ্গল হইবে না, এরূপে ভারতের নেশন গড়িবে না। আবার কেহ কেহ রাজনীতির দিক হইতে খিলাফতে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই সময় হইতে 'খিলাফৎ' আন্দোলনের সূত্রপাত। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা আরও স্পষ্ট আকার ধারণ করিল।

নেতাদের মধ্যে মনের মিলন যেখানে গভীর নয়—সেখানে মিলনটা কেবল রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সেখানে নিরক্ষর মূর্খদের মধ্যে মিলন আশা করা যায় না। কিছুকাল হইতে গো-বধ লইয়া হিন্দুমুসলমানে বিরোধ উত্তর-ভারতের কয়েকটি স্থানে দেখা দিয়াছিল। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বকর-ইদের গো-বধ লইয়া বিহারপ্রদেশের নানাস্থানে অশান্তি সুরু হইল। এই প্রদেশে কিছুকাল হইতেই গো-বধ লইয়া দাঙ্গা মারামারি হইতেছিল। এ বৎসরে হিন্দুরাই প্রথমে মুসলমানদের উপর কোরবাণী লইয়া জুলুম আরম্ভ করে। ছয়দিন ধরিয়া একরূপ অরাজকতা চলিল। অবশেষে সৈন্য আসিয়া শান্তি স্থাপন করে। ভারতরক্ষা আইনানুসারে প্রায় এক হাজার অপরাধীকে নানারূপ শাস্তি

বিহারে বক্‌র-ইদের অশান্তি

দেওয়া হয়। কিন্তু বাহিরের অশান্তি থামিলে ত অন্তরের মিল হয় না ; হিন্দু খবরের কাগজে লুণ্ঠন ও উৎপীড়নকারীদের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন বটে কিন্তু গো-বধ সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না : ধর্মের স্বাধীনতা দিবার বেলায় তাঁহাদের সুর বদলাইয়া গেল। মুসলমানেরা হিন্দুদের এই প্রকার দোটানা ভাবের অর্থ সহজেই বুঝিলেন।

ভারতসচিবের আগমন

এদিকে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু শীঘ্রই ভারতে আসিবেন জানিয়া চারিদিকের নানা প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি আবেদনপত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন ; ১৯১৯ সালের শেষাশেষি মণ্টেগু ভারতে আসিলেন ও শাসন সংস্কার সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন দেশীয় সভ্য সংস্কার সম্বন্ধে যে এক খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই কিছু পরিবর্তন করিয়া কংগ্রেস ও লীগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা কংগ্রেস-লীগের সংস্কার দাবী করিলেন।

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসে শ্রীমতী বেসান্ত সভানেত্রী হইলেন ; এই সভায় আলীভ্রাতাদের জননীকে আনয়ন করা হয় ; এরূপ অপূর্ব সভা পূর্বে কখনো হয় নাই।

যুদ্ধের জন্য আয়োজন

এদিকে যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল, ভারতবর্ষের কাঁচামাল বিদেশে বিক্রয় হয় ও তৈয়ারী সামগ্রী বিদেশ হইতে আমাদিগকে কিনিতে হয়। সুতরাং রপ্তানীতে তাহার পয়সা আসিল না, আমদানীতে অসম্ভব দাম দিতে হইল। যুদ্ধের আরম্ভ হইতে জিনিষপত্রের দাম অসম্ভবরূপে বাড়িতে ছিল ; সরকার বাহাদুর কয়েকবার দাম সম্বন্ধে নিয়ম বাঁধিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে মিত্ররাজ্য সমূহের খুব একটি বড় রকমের সঙ্কট

রুস সাম্রাজ্য অন্তরবিপ্লবের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। জার্মানী তখন পূর্ব সীমান্তে প্রবল,—অনেকের ভয় হইল রুসের ভিতর দিয়া জার্মানেরা এদেশে আসিবে। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে বড়লাট দিল্লীতে সরকারী বেসরকারী বড় বড় লোকদের ও দেশের নেতাদের আহ্বান করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। দেশের যুদ্ধোপযোগী সমস্ত সামগ্রী ও শক্তি সরকারের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য, সৈন্যসংগ্রহ ও সমরঋণে অর্থদান করিবার জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হইল। প্রত্যেকটি বিষয়ে দেশের নেতারা সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

গান্ধীজির কার্য্যাবলী

এই সময়ে ভারতের সকল কর্মের মধ্যে গান্ধীজির নাম উল্লেখ যোগ্য। গান্ধীজি চিরকাল ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে চম্পারণের চাষাদের পক্ষ লইয়া তিনি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; এবং তাহার ফলে কমিশন বসাইয়া তিনি তাহাদের দুঃখের অনেক পরিমাণে লাঘব করেন। ১৯১৮ প্রথম ভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কায়রা জেলায় অজন্মাবশত জলকষ্ট দেখা দেয়। ফলে অনেক প্রজা সরকারী খাজনা দিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে। গুজরাটি-সভা কমিশনরের নিকট 'ডেপুটেশন' প্রেরণ করিলে তাঁহারা প্রজার কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ২২শে মার্চ গান্ধীজি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া 'সত্যগ্রহ' লইতে বলিলেন; অর্থাৎ সরকার কর্মচারী যতই উৎপীড়ন করুন তাহারা খাজনা দিবে না; জুনমাস পর্যান্ত আন্দোলন চলিল। দলে দলে প্রজা উৎসন্ন যাইতেছে দেখিয়া সরকার খাজনা মুলতুবী দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

১৯১৮ খালের ৮ই জুলাই শাসন সংস্কার সম্বন্ধে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড

প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। তাঁহারা কি কি পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

শাসন সংস্কার প্রকাশ

ভারতসচিব বলিয়াছিলেন ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের পথে লইয়া যাওয়া হইবে, অধিক আশার কথা তিনি বলেন নাই। চরমপন্থীরা কংগ্রেসে প্রবল বলিয়া নরমপন্থীরা ইহা ত্যাগ করিলেন ও 'মডারেট কনফারেন্সে' আহ্বান করিয়া সরকারের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। জার্মানের পরাজয় হইল যুদ্ধের পর সন্ধি আলোচনার সময়ে ভারতবর্ষ হইতে স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ), স্যর জন মেষ্টন ও বিকানীরের রাজা প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন।

উপর্য্যুক্ত ঘটনা ঘটিবার কয়েকদিনের মধ্যেই রাজদ্রোহ বিষয়ক কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। এই প্রতিবেদনে ভারতের নানাস্থানে বিপ্লবকারীদের ষড়যন্ত্রের যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতি ভীষণ। দেশময় রাজদ্রোহ প্রচার করিবার জন্য, রীতিমতভাবে লুণ্ঠন ও অর্থ

রৌলট কমিশনর ও বিল

সংগ্রহাদির জন্য, এক প্রদেশের সহিত আরএক প্রদেশের নেতাদের যোগস্থাপন হইয়াছিল; দেশীয় সৈন্যগণকে বিদ্রোহী করিবার জন্য প্রবাসী ভারতবাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অর্থ ও অস্ত্র আনয়নের জন্য বহু প্রকার আয়োজন দেশ মধ্যে হইতেছিল। ভারতরক্ষা-আইন যুদ্ধের পর ছয়মাস মাত্র কার্য্যকরী; অথচ সাধারণ দণ্ডবিধির দ্বারা বিপ্লবকারীদের অতিসতর্ক ব্যবহার ও কার্য্যাবলীকে শাসনের মধ্যে ফেলা যায় না। এইজন্য ভারতের দণ্ডবিধির পরিবর্তনের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে মহাযুদ্ধ শেষ হইল; কাজেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার ছয়মাস পরে ভারতরক্ষা-আইন পরিত্যক্ত হইলে রাজদ্রোহিগণকে আটক করা সম্ভব হইবে না। এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট রৌলট কমিশনের প্রতিবেদন

অনুযায়ী দুইটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। প্রথম বিলটির স্থূল মর্ম এই যে সকৌন্সিল বড়লাট প্রয়োজন বোধ করিলে বৃটীশ ভারতের যে কোনো স্থানে ভারতরক্ষা আইনের অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বিলের উদ্দেশ্য ভারতের ফৌজদারী আইনের বাঁধন আরও দৃঢ় করিয়া পুলিসের উপর অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা।

১৯১৯ সালের প্রারম্ভে প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রত্যেক স্থানেই এই বিলের বিরুদ্ধে সভা হইল। জননায়কগণ একবাক্যে বলিলেন যে প্রস্তাবিত বিল দুইটি ন্যায় ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্রবিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী। সরকার বলিলেন নির্দোষ ব্যক্তির ভয়ের কোনো হেতু নাই; এগুলি বিপ্লবকারীদের দমন করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে উল্লিখিত বিল দুইটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে বেসরকারী দেশীয় সদস্যগণ একযোগে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে উহার বিরুদ্ধে লড়িলেন; কিন্তু সরকার কিছুতেই মূল বিল প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করিলেন না। শেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য হেতু বিল দুইটি বেসরকারী সদস্যগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাশ হইয়া গেল। তবে গভর্ণমেণ্ট এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্রথম আইনটি কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না এবং উহা তিন বৎসর পরে পরিত্যক্ত হইবে।

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যাপারে আন্দোলন আরম্ভ হইল। গান্ধীজি এই বিল দুটিকে অন্যায় বিবেচনা করিয়া প্রচার করিলেন যে তাঁহারা এই আইন নিরুপদ্রবে অমান্য করিবেন। বোম্বাইতে পথে প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধ পুস্তিকা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের

বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন

আদেশ অমান্য করিতে লাগিলেন। ৩০শে মার্চ দিল্লীতে সত্য-গ্রহ পালনের দিন ভীষণ দাঙ্গা বাঁধিল; ৬ই এপ্রিল কলিকাতা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর, করাচী প্রভৃতি বড় ছোট অনেক সহরে সত্যগ্রহ দিবস মহোৎসাহে সাধিত হয়। সর্ব্বত্রই দোকান পাট বন্ধ থাকে। এমন সময়ে ৯ই এপ্রিল গান্ধীজিকে দিল্লী যাইবার পথে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল, বড় বড় সহরে 'হরতাল,' ঘোষিত হইল। ১১ই হইতে ১৩ই এপ্রিল সারা হিন্দুস্থানের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত অশান্তি দেখা দিল। পঞ্জাবের হাঙ্গামা ভীষণ অশান্তিতে পরিণত হইল। এই সময়ে সাধারণ হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে খুবই প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল। লাহোর, আমেদাবাদে অনর্থপাত ঘটিল।

এই সময়ে পঞ্জাবের ছোটলাট ছিলেন স্যর মাইকেল ও'ডায়ার। তিনি এই উত্তেজনার সময়ে হিন্দুমুসলমান প্রীতির অভিনয় দেখিয়া খুবই আতঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং পঞ্জাবের লোকদিগকে সায়াস্তা করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। দেশীয় কাগজে প্রকাশ পঞ্জাবী প্রজাগণের নিকট হইতে সরকারপ্রিয় লোকেরা সমরঋণ আদায় করাতে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৈনিক করিবার চেষ্টা করাতে লোকের মন পূর্ব্ব হইতে অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল। তাহার উপর অজ্ঞাতকারণে মুসলমান সমাজের অন্যতম নেতা ডাঃ কিচলু ও হিন্দুদের নেতা সত্যপালকে সহসা নির্বাসিত করা হইল। ইহাতে উত্তেজিত জনসাধারণ স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা করায় পঞ্জাবের শাসকগণ ধরিয়া লইলেন ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। অতএব সাধারণ আইন রদ করিয়া পঞ্জাবে 'সামরিক আইন' জারি হইল। ইহার পর পঞ্জাবের বহু সহরে পুলিশ ও সৈনিকগণ যেভাবে অত্যাচার করে তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পঞ্জাবে ও'ডায়ার ও ডায়ার শাসন

অমৃতসহরে জালিয়ানওয়ালা বাগে নিরস্ত্র লোকদিগকে একত্র পাইয়া সেনাপতি ডায়ার সাহেব যে কাণ্ড করিলেন তাহার কলঙ্ক ইংরাজ সভ্যতার ইতিহাস হইতে সহজে মুছিবে না। ৩৭৯ জন লোক কোনো-প্রকার বাধা না দিয়া, পলাইতেও না পারিয়া গুলিতে মরিল। অন্যান্য স্থানেও পঞ্জাবীদের উপর যথেষ্ট অপমান হইয়াছিল। সে সকল কথা বিস্মৃত হওয়াই ভাল।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসহরেই কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু সভাপতি। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে ভারতের এত বড় দুর্দিনেও বিভিন্ন মতাবলম্বী রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা যোগদান করিবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। কংগ্রেসের পূর্বে গভর্ণমেণ্ট সামরিক আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত ও বধ্য ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দেন। কিন্তু ডায়ার ও ও'ডায়ার প্রভৃতির কোনো প্রকার শাস্তি হইল না। এই অত্যাচারের কথা ইংলণ্ডে পৌছিবার পর তথাকার গভর্ণমেণ্ট ইহার তথ্য সংগ্রহের জন্য লর্ড হাণ্টারের নেতৃত্বে এক তদন্তসমিতি গঠন করেন। এই কমিটি অত্যন্ত একপেশে রকমের তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং তাহা হইতে সত্য আবিষ্কৃত হইবে না বুঝিয়া অমৃতসহরে কংগ্রেস হইতে এক বেসরকারী তদন্তসমিতি গঠন করিলেন।

১৯১৮ অমৃতসহরে কংগ্রেস

কংগ্রেসের পর হাণ্টার-কমিটি ও কংগ্রেস-কমিটির পঞ্জাবের অশান্তি ও অত্যাচার বিষয়ক দুই প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। পঞ্জাবের সমস্ত তথ্য দেশময় প্রচারিত হইল। বিলাতে লর্ডসভায় ডায়ার ও'ডায়ারের অনুষ্ঠিত কর্মের নিন্দা বা প্রতিবাদ হইল না। সুতরাং এদেশে অসন্তোষ বাড়িতে লাগিল।

যুদ্ধের সময়ে বিলাতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড-জর্জ মুসলমানদের বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধান্তে ভারতীয় মুসলমানদের মনে বেদনা

দিয়া তুর্কীর সাম্রাজ্যকে অপমানিত করা হইবে না। তুর্কীর সুলতান মুসলমানদের 'খলিফ' বা ধর্মগুরু; তথাচ ভারতীয় মুসলমানেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যথেষ্ট রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিল; কিন্তু আশা করিয়াছিল যুদ্ধের পর তুর্কীর সম্মান রক্ষিত হইবে। ইহা না হওয়াতে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে নিরতিশয় উত্তেজনা দেখা দিল; এবং ধর্মান্ধ মৌলবীদের প্ররোচনায় একদল মুসলমান বিধর্মী ইংরাজদের রাজ্যে বাস করিবে না স্থির করিয়া পঞ্জাব হইতে আফগনিস্থানে যাত্রা করে। ইহাকে 'মুহজরিণ' বলে। আমীর তাহাদিগকে স্থান দিলেন না, তখন হতভাগ্যের পুনরায় কপর্দকহীন হইয়া দেশে ফিরিল। ভারত সরকারই পুনরায় তাহাদিগকে গৃহস্থ হইতে সাহায্য করেন।

খিলাফৎ ও মুহজরিণ

পঞ্জাবের অনাচার ও খিলাফৎ সম্বন্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা না করায় দেশ মধ্যে অসন্তোষ বাড়িতে লাগিল। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিলেন যে 'অবিচার, ও সুবিচার, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোনো সহযোগিতা থাকিতে পারে না; যতদিন গভর্ণমেণ্ট আমাদের আত্ম-মর্য্যাদাকে সম্মান ও রক্ষা করিয়া চলিবেন, ততদিনই সহযোগিতা আমাদের কর্তব্য; আবার গভর্ণমেণ্ট যখন সেই সম্মান রক্ষা করিবেন না, তখন তাঁহাদের সহিত অসহযোগিতা করাও সমপরিমাণে কর্তব্য। ইহাই অসহযোগ।'

অসহযোগ ঘোষণা

১৯২০ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে (১) পঞ্জাবের অত্যাচার, (২) খিলাফৎ সমস্যা, (৩) শাসন সংস্কার ও (৪) অসহযোগ বিষয় আলোচনা হইল। গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব দুই দিন বিষয়-নির্দ্ধারণ সভায় আলোচিত হয় ও পরে মহাসভায় গৃহীত হয়। কলি-

কাতার বিশেষ কংগ্রেসের পর গান্ধীজি, মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকৎ আলী প্রচারকার্য্যে বাহির হইলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও ইহাতে যোগদান করিলেন। ভারতের প্রবীণ অনেক নেতা ও কর্মী গান্ধীজির এই প্রস্তাবের সহিত একমত হইলেন না।

ইহার পর ১৯২০ সালে ডিসেম্বরে কানপুরে কংগ্রেস হইল; মান্দ্রাজের পণ্ডিত বিজয় রাঘবাচার্য্য সভাপতি। সমগ্র ভারত হইতে ২,৩০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভা দেশবাসীকে সরকারী চাকুরী ছাড়িতে, সরকারী কাছারী, সরকারী স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বলিলেন; হিন্দুমুসলমান ঐক্য, হিন্দুদের মধ্যে ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করিতে আহ্বান করিলেন। গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গ্রামোন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলিলেন। সহযোগিতাবর্জ্জন প্রস্তাবসহ মোট সতেরটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচারে ও দেশসেবা কার্য্যের সহায়তার জন্য 'তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার' নামে এক জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইল; কথা হইল এককোটি টাকা এই ভাণ্ডারে তুলিতে হইবে। বঙ্গদেশ হইতে এত দিন অসহযোগ বিষয়ে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নাই। নাগপুরের কংগ্রেসে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও দেশসেবক চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অসহযোগে যোগ দিলেন।

১৯২০ নাগপুরের কংগ্রেস

কংগ্রেসের আদর্শে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে জেলা, মহকুমা এমনকি বহু গ্রামে কংগ্রেস-কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্মীগণ দেশসেবায় ব্রতী হইলেন। স্কুল ও কলেজ হইতে বহুসহস্র ছাত্র গ্রামে এই উত্তেজনার সময়ে ফিরিয়া গিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। বাংলায় চিত্তরঞ্জন, বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মজহরুল হক্ ও যুক্তপ্রদেশে মতিলাল নেহেরু, পঞ্জাবে লালা লাজপত রায়, মাদ্রাজে ইয়াকুব হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দেশের নগরে নগরে

গিয়া স্বরাজের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশে এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে একদল মহাপ্রাণ কর্মী দেশসেবায় ব্রতী হন ; তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অসহযোগের কার্য্য দেশময় চলিবার কিছুকাল পরেই সরকার ধর্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলেন। প্রথমে জেলা-কংগ্রেস কমিটির কর্মীদের, পরে প্রাদেশিক কর্মীদের উপর দৃষ্টি পড়িল ; ও একে একে বহুশত কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ১৯২১ সাল অর্থাৎ অসহযোগ ঘোষনায় এক বৎসরের মধ্যেই চিত্তরঞ্জন ও ভারতের বহুশত কর্মী কারাগারে গেলেন। অসহযোগ-আন্দোলন-কারীগণের দুর্বলতাও যথেষ্ট প্রকাশ পাইল ; বহুস্থানে অসহযোগ নিরুপদ্রব থাকিল না। এই সময়ে আসামে চা-বাগিচার কুলীদের ধর্মঘটকে রাজনৈতিক আকার দিয়া আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মঘট সৃজন করিয়া তাঁহারা বিশেষভাবে অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। মুসলমানকে ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ করিয়া দিবার ফলে তাহাদের মধ্যেও গোঁড়ামী বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল ; এবং তাহারই ফলে মালাবারে মোপলারা স্থানীয় হিন্দুদের উপর অকথিত অত্যাচার করিল, খিলাফৎরাজ স্থাপন করিল ইত্যাদি। তবে অসহযোগ বিশেষভাবে কাজ করিয়াছিল নূতন সংস্কারে। ১৯২১ সালে কৌন্সিল বা এসেম্‌ব্লির নির্বাচনে দেশের খুব বড় একটি অংশ যোগদান করে নাই।

ধর্ষণনীতি

আহমাদাবাদের (১৯২১) কংগ্রেসের চিত্তরঞ্জনের সভাপতি হইবার কথা। তিনি তখন জেলে। হাকিম আজমল খাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। বিভিন্ন প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভার বহুসংখ্যক কর্মী গ্রেপ্তার

১৯২১ আহমাদাবাদ কংগ্রেস.

হওয়ায় এবং কংগ্রেসে সাধারণ কার্য্যপ্রণালী অব্যাহত রাখিবার আকাঙ্ক্ষায় এই কংগ্রেস দ্বিতীয় ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত গান্ধীজির উপর ভারত রাষ্ট্র মহাসভার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলেন ও তাঁহাকে একমাত্র নায়করূপে নির্বাচন করিলেন। গান্ধীজি অতঃপর প্রয়োজন হইলে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন এবং নিখিল কংগ্রেস-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন; প্রয়োজন হইলে স্বীয় ক্ষমতা অপর কাহাকেও অর্পণ করিয়া স্বপদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এককথায় তাঁহাকে Dictator করিয়া দেওয়া হইল। তবে সরকারের সহিত কোনো বোঝাপড়া বা কংগ্রেসের মূল মত পরিবর্ত্তন তিনি একাকী করিতে পারিবেন না।

আহামাদাবদে কংগ্রেসে মৌলানা হসরৎ মোহানী "স্বাধীনতা-ঘোষণা" করিবার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

বরদৌলী প্রস্তাব

কংগ্রেসের পর ১৯২২ সালের প্রথম হইতে দেশের সর্বত্র আইন অমান্য চলিতেছিল। অবশেষে গান্ধীজি স্বয়ং গুজরাটে বারদৌলী তালুকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে যুক্তপ্রদেশে এক দুর্ঘটনা ঘটিল। চৌরাচরবাসীরা অসহযোগের মূলমন্ত্র নিরুপদ্রবতার কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের উৎপীড়নকারী পুলিসদিগকে আক্রমণ করিল ও থানা পোড়াইয়া কয়েকজন পুলিসকে মারিয়া ফেলিল। এই ব্যাপারের পর গান্ধীজি অসহযোগ-রণ বন্ধ করিয়া দিলেন ও দেশমধ্যে সেইরূপ ইস্তাহার প্রচার করিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই দেশের অবসাদ লক্ষ্য করিয়া সরকার গান্ধীজিকে 'সিডিশনের' অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া গ্রেপ্তার করিলেন। বিচারে গান্ধীজির ছয় বৎসর কারাবাসের হুকুম হইল; তিনি

চরকা কাটা, গ্রামোন্নতি, মাদকতা ত্যাগ, অস্পৃশ্যতা ত্যাগ প্রভৃতি গঠনকার্য্যমূলক কয়েকটি কার্য্যের তালিকা দেশবাসীকে দিয়া গেলেন। ইহাই বরদৌলীর সিদ্ধান্তরূপে জাতীয় ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে।

গান্ধীজির কারাগার

গান্ধীজি যখন কারাগারে তখন কংগ্রেস-সমিতি দেশ নিরুপদ্রব প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত কিনা তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিলেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু, রাজগোপালচারিয়ার, পাটেল, আনসারী, আজমল খাঁ, ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ছিলেন কমিটির সদস্য। কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ পাইলে দেখা গেল তিন জন আইন অমান্যের পরিবর্তে নূতন কৌন্সিলে প্রবেশের পক্ষপাতী। চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতাবৃন্দ কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া কৌন্সিল প্রবেশে মত দিলেন।

সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়ার কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন সভাপতি হইলেন। তিনি কৌন্সিল প্রবেশের কথা উত্থাপন করিলে দেখা গেল কংগ্রেসে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে। গয়া কংগ্রেস পুনরায় নাগপুরের পঙ্ক-বর্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। চিত্তরঞ্জন, নেহেরু প্রভৃতি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়া গয়াতেই 'স্বরাজ্য'দল গঠন করিলেন। ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহাদের মুখপত্র দৈনিক Forward প্রকাশিত হইল।

১৯২২
গয়ার কংগ্রেস ও
কৌন্সিল প্রবেশ

দলাদলির পর কংগ্রেসের কার্য্য অচল হইয়া পড়িল; উভয়দলের আপোষের চেষ্টার জন্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল ও অবশেষে দিল্লীতে বিশেষ অধিবেশন হইল; এই সভায় সদ্যকারামুক্ত মহম্মদ আলী ছিলেন; তাঁহার চেষ্টায় ইহা স্থির হইল যে স্বরাজ্যদল সরকারকে বাধা-

প্রদান করিবার জন্য কৌন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ১৯২৩ সাল হইতে স্বরাজ্যদল ভারতে সর্বত্র প্রবল হইতে থাকে; অপরদিকে হিন্দুমুসলমান বিরোধও বাড়িতে থাকে।

১৯২৩
কোকনদ-কংগ্রেস
হিন্দুমুসলমান সমস্যা

১৯২৩ সালে কোকনদে (অন্ধ্রদেশে) কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। মৌলানা মহম্মদ আলী সভাপতি। দেশে হিন্দুমুসলমান বিরোধ ক্রমশই দেখা দিতেছে। পূর্বের রাজনৈতিক প্রেম এখন আর নাই। স্বরাজ্য-দল ও পরিবর্তন-বিরোধীদিগের মধ্যে একপ্রকার মিলনের চেষ্টা হইল; কিন্তু দেখা গেল কংগ্রেসের শক্তি যথার্থভাবে চলিয়া গিয়াছে।

স্বরাজ্যদল ও প্রতিরোধ

ইতিমধ্যে গান্ধীজি দুই বৎসর কারাগারবাসের পর মুক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া দেশের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন দেশের প্রতিষ্ঠাবান্ নেতাগণ সকলেই অসহযোগনীতির বিরোধী, স্বরাজ্যদল বহু স্থানের ম্যুন্সিপালটি, জেলাবোর্ড, প্রাদেশিক কৌন্সিল প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া সরকারকে অচল না করিতে পারেন, তাঁহাদের দোষ ত্রুটি ধরিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। কলিকাতায় কার্পোরেশন স্বরাজ্যদলের হাতে সুন্দরভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। চিত্তরঞ্জন ইহার মেয়র ও সুভাষচন্দ্র ইহার প্রধান কর্মচারী হইলেন।

বিপ্লব চেষ্টা ও অর্ডিনান্স

এই সময়ে বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে ও কলিকাতার মধ্যে বিপ্লবকারীদের হস্ত পুনরায় দেখা গেল। কয়েকটি হত্যাও হইল। সরকার বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন ও দেশকে বিপ্লব হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক Ordinance জারি করিলেন। ১লা অক্টোবর এই নিয়ম জারি হইল ও সেই দিন বাংলাদেশের নানাস্থান হইতে প্রায় ৭০ জন কর্মীকে অন্তরায়িত

করা হইল। ইহার মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকুট্যিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তুইজন সভ্য অনিলবরণ রায় ও সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র, মানিকতলার বোমার ও দ্বীপান্তর-ফেরত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরযুগের বিপ্লবকারীদের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে পড়িলেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবহারে সকলে বিস্মিত হইলেন এবং সেইজন্য সরকারকে কেহই ভালর চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না। সরকার বলেন যে তাঁহাদের হস্তে প্রমাণাভাব নাই, তবে তাহা প্রকাশ্য নহে এবং তাঁহারা তুই একজন বিশিষ্ট বাঙালীকে তাঁহাদের দলিলাদি দেখাইয়া অন্তরায়িতদের দোষ প্রমাণ করিয়াছেন। তবে জনসাধারণ তাহাতে সুখী হয় নাই।

১৯২৪ বেলগামে কংগ্রেস

১৯২৪ সালে বেলগামে কংগ্রেস হইল; সভাপতি গান্ধীজি। তিনি বলিলেন যে দেশ প্রস্তুত নহে, সুতরাং অসহযোগনীতি স্থগিত থাকুক; তিনি দেশকে গঠনকার্য্যের জন্য অনুরোধ করিলেন ও বিশেষভাবে চরকা-কাটা ও খদ্দর পরিধানের উপর ঝোঁক দিলেন। ইতিপূর্বে চিত্তরঞ্জন ও নেহেরুর সহিত গান্ধীজির এক সন্ধি হয়, তাহাতে স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের জন্য সুতা কাটিলে সভ্য হইবার যোগ্য এ সম্বন্ধে প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লন; গান্ধীজিও স্বরাজ্যদলকে বিশেষ অধিকার দিলেন। কংগ্রেসে অসহযোগ-নীতি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হইল ও স্বরাজ্যদলের কৌন্সিল প্রবেশ সমর্থিত হইল। ইহার পর নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির পাটনার অধিবেশনে গান্ধীজি কংগ্রেসকে স্বরাজ্যদলের হস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং কংগ্রেসের দায়িত্ব ত্যাগ করিলেন।

১৯২০ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস গান্ধীজির নির্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালী নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে মানিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কংগ্রেস ভারতের সকল মতকে প্রকাশ করে না। মুসলমানেরা

তাহাদের 'খিলাফৎ' সভা লইয়া ব্যস্ত। তাহা ছাড়া হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি দিন দিন নষ্ট হইতেছে। মহারাষ্ট্র নেতারা কংগ্রেসের কার্য্য হইতে দূরে। রাজনৈতিকক্ষেত্রে গান্ধীজির শক্তি কমিয়া আসিয়াছে; তিনি এখন চরকার উপর তাঁহার সমগ্র মনোযোগ দিয়াছেন এবং রাজনীতির উপর তাঁহার প্রভাব যে হ্রাস পাইয়াছে তাহা তিনি দেখিতেছেন।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অধিবেশন কাণপুরে হইল। সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু; ভারত রমনী কংগ্রেসের এই প্রথম সভানেত্রী হইলেন। হিন্দুমুসলমান অপ্রীতি, প্রবাসী-ভারতবাসীদের দুর্দশা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। তবে কংগ্রেস একপেশে রকমের হইয়া পড়িয়াছে; সমগ্র জাতির সকলপ্রকার মতের সমবেত চেষ্টায় ইহা গঠিত হয় নাই বলিয়া ইহা এখনো শক্তিহীন; ফলে ইহার কোনো গৃহীত প্রস্তাব সরকারকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারে না, দেশবাসীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না।

১৯২৫ কাণপুর কংগ্রেস

স্থির হইয়াছে ১৯২৬ সালের কংগ্রেস আসামের গৌহাটিতে হইবে। অসমীয়ারা নিজ দেশে এই প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করিতেছেন।

পরিশিষ্ট

কংগ্রেসের অধিবেশন

	স্থান	বৎসর	প্রতিনিধিসংখ্যা	সভাপতি
১	বোম্বাই	১৮৮৫	(৭২)	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২	কলিকাতা	১৮৮৫	(৪৩৬)	দাদাভাই নৌরজী
৩	মান্দ্রাজ	১৮৮৭	(৬০৭)	বদরুদ্দিন তায়েবজী
৪	প্রয়াগ	১৮৮৮	(১২৪৮)	জর্জ্জ উইল
৫	বোম্বাই	১৮৮৯	(১৮৮৯)	সার উইলিয়াম ওয়েডরবার্ণ
৬	কলিকাতা	১৮৯০	(৬৭৭)	ফিরোজ শাহা মেঠা
৭	নাগপুর	১৮৯১	(৮১২)	আনন্দ চার্লু
৮	প্রয়াগ	১৮৯২	(৬২৫)	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৯	লাহোর	১৮৯৩	(৮৬৭)	দাদাভাই নৌরজী
১০	মান্দ্রাজ	১৮৯৩	(১১৬৩)	মিষ্টার ওয়েব
১১	পুণা	১৮৯৫	(১৫৮৪)	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২	কলিকাতা	১৮৯৬	(৭৮৪)	রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী
১৩	অমরাবতী	১৮৯৭	(৬৯৩)	শঙ্কর নায়ার
১৪	মান্দ্রাজ	১৮৯৮	(৬১৪)	আনন্দমোহন বসু
১৫	লক্ষ্ণৌ	১৮৯৯	(৭৩৯)	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৬	লাহোর	১৯০০	(৫৬৭)	নারায়ণ চন্দ্রভারকর
১৭	কলিকাতা	১৯০১	(৮৯৬)	দীনশাহা ওয়াচা
১৮	আহামদাবাদ	১৯০২	(৪৭১)	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯	মান্দ্রাজ	১৯০৩	(৫৩৮)	লালমোহন ঘোষ
২০	বোম্বাই	১৯০৪	(১০১০)	স্যর হেনরী কটন
২১	বারাণসী	১৯০৫	(৭৫৮)	গোপালকৃষ্ণ গোখলে

২২ কলিকাতা	১৯০৬	(১৬৬৩)	দাদাভাই নৌরজী
২৩ { সুরাট	১৯০৭	(১৩০০)	রাসবিহারী ঘোষ
মান্দ্রাজ	১৯০৮	(৬২৬)	রাসবিহারী ঘোষ
২৪ লাহোর	১৯০৯	(২৪৩)	মদনমোহন মালব্য
২৫ এলাহাবাদ	১৯১০	(৬৩৬)	স্যর উইলিয়ম ওয়েডরবার্ণ
২৬ কলিকাতা	১৯১১	(৪৪৬)	পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধর
২৭ বাঁকিপুর	১৯১২	(২০৭)	আর, এন্, মুধলকার
২৮ করাচী	১৯১৩	(৫৫০)	নবাব সৈয়দ মামুদ
২৯ মান্দ্রাজ	১৯১৪	(৮৬৬)	ভুপেন্দ্রনাথ বসু
৩০ বোম্বাই	১৯১৫		সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
৩১ লক্ষ্ণৌ	১৯১৬		অম্বিকাচরণ মজুমদার
৩২ কলিকাতা	১৯১৭	(৪৯৬৭)	শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট
(বিশেষ) বোম্বাই	„	(৪৯৬৭)	সৈয়দ হাসান ইমাম
৩৩ দিল্লী	১৯১৮	(৪৮৬৯)	মদনমোহন মালব্য
৩৪ অমৃতসহর	১৯১৯		মতিলাল নেহেরু
(বিশেষ) কলিকাতা	„		লালা লাজপত রায়
৩৫ নাগপুর	১৯২০		বিজয়রাঘবাচার্য্য
৩৬ আহামদাবাদ	১৯২১	(৪৭২৮)	হাকিম আজমল খাঁ
৩৭ গয়া	১৯২২	...	চিত্তরঞ্জন দাশ
(বিশেষ) দিল্লী	„	...	আবুলকালাম আজাদ
৩৮ কোকনদ	১৯২৩	...	মহম্মদ আলী
৩৯ বেলগাম	১৯২৪	...	মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী
৪০ কাণপুর	১৯২৫	...	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

২। প্রবাসী ভারতবাসী

ভারতের বাহিরে এশিয়ার নানা স্থানে, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ও অন্যান্য অনেক দ্বীপে ভারতের শ্রমজীবিগণ বাস করিতেছে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলে পৃথিবীর নানা স্থানে য়ুরোপীয় জাতিসমূহের অনেকগুলি উপনিবেশ আছে। সে-সকল স্থানে ইক্ষু, নানা ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দারুণ তাপে য়ুরোপীয়দের পক্ষে সেখানে শারীরিক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। তাঁহারা চিরদিন মূলধন খাটাইয়া ব্যবসায় করিয়াছেন, কাজ করিত আফ্রিকার নিগ্রো ও কাফ্রিগণ। দাসপ্রথা উঠিয়া গেলে ১৮৩৪ সালে প্রথমে চুক্তিবদ্ধ কুলি বৃটীশ পশ্চিম-ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জে যায়। আমাদের গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগ করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে এই সকল ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে ভারতীয় কুলিরা প্রায় প্রতিবৎসরই দলে দলে নানা উপনিবেশে গিয়াছে। এই চুক্তিবদ্ধ প্রথা নানা কারণে মরিশাস দ্বীপে, ষ্ট্রেট্‌ সেটেল্‌মেণ্টে, মলয় ষ্টেটে, এবং আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানে এখনো বহু সহস্র ভারতবাসী স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছে; অনেকে তথায় স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

দেশান্তর গমন

মহাত্মা গান্ধীজির দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যগ্রহের পর হইতে আমাদের দেশে বিদেশপ্রবাসী ভারতবাসী সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল বৃদ্ধি হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ এসম্বন্ধে দেশে বিদেশে যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে, এই আন্দোলন ও বিতর্ক এখনও থামে নাই এবং ক্রমশই ইহা বৃটীশ সাম্রাজ্যের একটি বড় রকম সমস্যা হইয়া উঠিতেছে। ভারতে ও বিলাতে এই প্রথাকে অনেকে ক্রীতদাস প্রথার সহিত তুলনা করিয়া ইহার ঘোর বিরোধী।

চুক্তিবদ্ধ কুলী

পাশ্চাত্য জগতে ক্রীতদাসপ্রথা উঠিয়া যাইবার পরেই ভারতে চুক্তিবদ্ধ কুলী প্রেরণের প্রথা প্রচলিত হয় বলিয়া লোকের এই সন্দেহ। ভারতীয় কুলিকে উপনিবেশে লইয়া গিয়া বাগিচাওয়ালাদের সমিতি যে-বাগানে যত লোকের প্রয়োজন সেইখানে তাহা পাঠাইয়া দিতেন। পাঁচ বৎসরের মতো তাহার প্রভুকে সে সেবা করিতে বাধ্য হইত। প্রভু যেমনই হউন্ সে বিষয়ে কুলির কোন মতামত বা আপত্তি প্রকাশের অধিকার থাকে না।

উপনিবেশসমূহে দুইটী কারণে ভারতীয় কুলীর স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন সম্বন্ধে আপত্তি হয়—(১) ভারতীয় কুলীদের জীবনযাত্রার আদর্শ অত্যন্ত হীন বলিয়া তাহারা অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া বাজার দর কমাইয়া দেয়। এই জন্য স্থানীয় শ্রমজীবিদের ঘোর আপত্তি। (২) চুক্তি-মুক্ত কুলীদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাধীনভাবে চাষবাস দোকান প্রভৃতি করে এবং কেহ কেহ দেশে ফিরিয়া আসে; যাহারা নানা কারণে পুনরায় চুক্তিগ্রহণ করে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। চুক্তিবদ্ধ যাইয়া তাহারা উপনিবেশগুলি হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশে চলিয়া আসে ইহাই তদ্দেশীয় শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবি ও ঔপনিবেশিকদের অসহ্য।

কুলীদের জন্য প্লান্টাররা গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দেন। বাজারের দর অনুসারে তাহাদিগকে মজুরী দিয়া থাকেন। গৃহ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য তাহাদিগকে কোন অর্থ দিতে হয় না। তাহাদের সন্তানাদির জন্য অবৈতনিক বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। চুক্তি শেষে তাহাদিগকে ভূমি দেওয়া হয়, ইচ্ছা করিলে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকিতে পারে; অথবা দেশে ফিরিয়া আসিতে চাহিলে বিনা ব্যয়ে আনা হয়। জমিদানের ব্যবস্থা দক্ষিণ আমেরিকায় ট্রিনিডাড ও বৃটীশ গিয়েনায় এখনো আছে।

একটি বা কয়েকটি উপনিবেশের প্লানটাররা মিলিয়া ভারতবর্ষে মাহিনা করিয়া এজেন্ট রাখিয়াছেন। ভারত-সরকার ইহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ; এই এজেন্টদের অনেক-গুলি সাব্-এজেন্ট আছে। প্রত্যেক সাব্-এজেন্টের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি করিয়া আড়কাটি আছে। ভারতের সবত্রই পুরুষ ও স্ত্রী আড়কাটি দৃষ্ট হয়, তাহারা লোকদিগকে বুঝাইয়া কুলীশ্রেণী ভূক্ত করিয়া লয়। ভারত-সরকারের তরফ হইতে এই সকল কুলীকে রক্ষা করিবার জন্য একজন কর্মচারী প্রত্যেক প্রদেশে নিযুক্ত আছেন। আড়কাটিদের লাইসেন্স তিনি দেন। এই লাইসেন্স ছাড়া কেহ কুলী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলে দণ্ডণীয় হয়। প্রতি-বৎসর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই পত্র দেখিয়া অনুমতি দেন। উপনিবেশ হইতে এজেন্টের হাত দিয়া সাব-এজেন্টগণ প্রতি পুরুষ-কুলীর জন্য ২৫৲ ও স্ত্রী-কুলীর জন্য ৩৫৲ পাইয়া থাকে। এই টাকা হইতে আড়কাটিগণ ভাগ পায়। অনেক সময়ে অশিক্ষিত লোক দুষ্ট আড়কাটির হাতে পড়িয়া বিশেষ দুঃখ পায়, এরূপ কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায়। সেইজন্য আমাদের দেশে আড়কাটি বলিতে লোকের এককালীন ঘৃণা ও ভয়ের উদ্রেক হয়। দেশের নানাস্থানে সাব্ডিপো আছে ; সেইখানে প্রথমে কুলীদের আনা হয় ; সেইখান হইতে প্রধান ডিপোসমূহে তাহাদের চালান করা হয়। এই ডিপোগুলি ভারত-সরকার হইতে নিযুক্ত কুলীরক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে থাকে ; তাঁহারা দেখেন কুলীরা সর্ত বুঝিয়া যাইতে ইচ্ছুক কিনা, যে জাহাজ উপনিবেশের এজেন্টগণ ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে কতগুলি লোক ধরিবে এবং কুলীদের থাকিবার যথাযথ বন্দোবস্ত আছে কিনা,—জাহাজে চড়িবার পূর্বে প্রত্যেক কুলীকে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া-ছেন কিনা ইত্যাদি। উপনিবেশের বন্দরে পৌছিলে ইমিগ্রেশান

কুলীচালান ও আড়কাটি

এজেণ্ট জেনারেল তাহাদের তদ্‌বির করেন। তিনি উপনিবেশের কর্ম-চারী ; ভারতের কুলী-রক্ষক যাহা করেন তাঁহার কর্তব্যও তাই ; এছাড়া বাগানে (Plantation) তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয় তাহাও তিনি পরিদর্শন করেন। কোনো উপনিবেশের বাগানে কুলীদের মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অথবা তাহাদের যথেষ্ট যত্ন না হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট সেখানে কুলী প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেন। নাটালে কুলীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে ভারত সরকার সেখানে কুলী-চালান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে কুলী সংগ্রহ ও চালান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও করাচী বন্দর হইতে কুলীরপ্তানী হয়। ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত ফরাসী-অধিকার পন্দিচেরী ও কারিকাল হইতে কুলী চালান হইত ; মাঝে দুই বৎসর ছাড়া কুলীসংগ্রহ সেস্থানে বন্ধই ছিল। ১৯১২ সালে কুলীর শতকরা ৬৫জন কলিকাতা হইতে চালান হয় ; এখান হইতে ৮২০৮জন কুলী গিয়াছিল তাহার মধ্যে প্রায় ৬৫০০ যুক্তপ্রদেশেরই লোক। কলিকাতা হইতে প্রধানত দক্ষিণ-আমেরিকায় ট্রিনিডাড, ফিজি, ডেমেরারা, পশ্চিম ইণ্ডিস্‌ অন্তর্গত জামাইকা দ্বীপে কুলী চালান হয়। সমগ্র চালানের প্রায় শতকরা ২৯জন মান্দ্রাজ হইতে যায়। বোম্বাই অঞ্চল হইতে খুব অল্প লোক যায় ; সেখানকার লোকে স্থানীয় কাপড়ের ও অন্যান্য কারখানায় কাজে লাগে। আফ্রিকার উগাণ্ডা রেলওয়ে অনেক লোকের প্রয়োজন হয় ; করাচী বন্দর হইতে পঞ্জাবী ও সিন্ধি অনেক লোক যায়।

ভারতবর্ষের এই কুলীদের বিদেশগমন স্থানীয় অভাব বা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির উপর মোটেই নির্ভর করে না ; এমনও দেখা দিয়াছে অজন্মার দিনে কুলীর চালান কম হইয়াছে। মোট কথা উপনিবেশ হইতে যেমন কুলীর প্রয়োজন হয় এখানকার এজেণ্টগণ সেইমত কুলী চালান করেন। ভারতের প্রয়োজন অপ্রয়োজন লক্ষিত হয় না।

গত ২৭ বৎসরের গড়ে ১৫,৬৫১ জন লোক প্রতিবৎসর বিদেশে গমন করে, ও ৭,২৪২ জন দেশে ফিরিয়া আসে। মরিশাস দ্বীপেই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর বাস। ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২, লক্ষ ৬৪ হাজার ভারতবাসী। এই দ্বীপে বহুকাল হইতে ভারতবাসী যাইতে স্থুরু করিয়াছেন। ১৮৩৪ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয় কুলী বিদেশে গমন করে। মরিশাসে ভারতবাসীদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহাদের সম্বন্ধে স্থানীয় আইন যথেষ্ট অনুকূল না হইলেও তাহারা অনেকে বাগিচার ম্যানেজার এবং কেহ কেহ বা মালিক হইয়াছেন। ১৯১২ সালে উপনিবেশসমূহের সচীব মরিশাসে কুলিগমন বন্ধ করিয়া দেন। তাহা না হইলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে মরিশাসের অধিকাংশ লোকই ভারতবাসী হইয়া দাঁড়াইত—এখনই শতকরা ৭০ জন এদেশীয় লোক। মরিশাসের পরেই জনসংখ্যার হিসাবে মালয় উপদ্বীপ; বর্তমানে প্রায় ২,১০,০০০ ভারতবাসী সেখানে নানাকর্মে লিপ্ত আছে। ঘরের কাছে সিংহলকে আমরা বাদ দিতেছি।

মরিশাস দ্বীপ

নাটাল আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বস্থিত একটি দেশ। ইংরাজ ও বুয়রগণ এখানকার সভ্য বাসিন্দা, আর সবই বন্য জাতি। স্থানীয় লোক কোনো প্রকার কাজ জানিত না। বর্তমানে নাটালে ভারতবাসীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার; গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই জন-বৃদ্ধি হইয়াছে। সাধারণ শ্রমজীবি মাসিক ১৫৲ আর রেলওয়েতে ২০৲ টাকা পাইত। ১৮৯১ সালে ৭৭৪ জন কুলী, দেশে ফিরিবার সময়ে প্রায় ১৩,৩৮৭ পাউণ্ড আনিয়াছিল। টাকা আনাতেই ভারতবাসীদের সহিত স্থানীয় বাগিচাওয়ালা ও সরকারের বিবাদ বাঁধে।

নাটাল

দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরে ডেমেরেরা (বৃটীশ গিয়েনা) নামে এক

উপনিবেশ আছে। ১৮৫১ সালে এইখানে প্রায় আট হাজার ভারতীয় কুলী ছিল; য়ুরোপীয় তখন দুই হাজারের অধিক ছিল না। ১৮৩৮ সালে প্রথম ৪০০ কুলী চালান হয়। বর্তমানে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ভারতবাসী ডেমেরেরাতে আছে। এখানে কাজ ফুরণে হয়; কর্মিষ্ঠ কুলী প্রতিদিন ১৷৷০ দেড় টাকা রোজগার করিতে পারে। প্রায় ৬,৫০০ ভারতীয় ছাত্র বিদ্যালয়ে পড়ে, ধনী ভারতবাসীর সন্তানেরা জর্জটাউনে কলেজের পাঠ করিয়া কৃতি হইতেছে।

ডেমেরেরা

বৃটীশ গিয়নোর উত্তরেই ট্রিনিডাড দ্বীপে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভারতবাসী; বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ, ২১ হাজার ভারতবাসী সেখানে বাস করিতেছে। এখানে অন্যান্য স্থানের ন্যায় চুক্তির কাল পাঁচ বৎসর; কুলীদের দৈনিক আয় ১০।১২ আনা। চিনি এখানকার প্রধান কারবার। ভারতবাসীদের গমনের পর হইতে সেখানকার বাণিজ্য আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করিয়াছে। কুলীদের সম্বন্ধে আইন অন্যান্য স্থানের ন্যায়ই কঠিন ও নির্মম। কোনো কুলী নিজ বাড়ীতে গরু রাখিতে পারে না। তবে সরকার ভারতবাসীকে অনেক জমি দিয়াছেন। অনেকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া উচ্চপদ ও সম্মানলাভ করিতেছে।

ট্রিনিডাড

দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ট্রান্সভালে ১৯ হাজার উপর ভারতবাসী। কয়েক বৎসর হইতে এই প্রদেশে ভারতবাসীদের সহিত স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের বিরোধ চলিতেছে।

এই সকল উপনিবেশে ভারতবাসীদের দুর্গতির কথা কাহারও অবিদিত নয়। ট্রান্সভাল, কেপকলোনী পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এদেশীয় লোক পথে ঘাটে অপমানিত হয়। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ যাইবার হুকুম

বাহিরে ভারতবাসীর দুরবস্থা

নাই, অথবা যাইতে হইলে প্রচুর অর্থ দিতে হয়। সহরের ভিতরে তাহাদের থাকিবার স্থান দেওয়া হয় না, ব্যবসায়ীদের প্রতিবৎসর লাইসেন্স লইতে হয়; বৎসরান্তে সেই লাইসেন্স পাওয়া দুষ্কর। এ-ছাড়া রাস্তা দিয়া চলা সম্বন্ধে, গাড়ীতে চড়া সম্বন্ধে নিয়ম, রাত্রি ৯টার পর বাহির হওয়া সম্বন্ধে নিয়ম। মান্দ্রাজে অস্পৃশ্য পরিহা জাতি সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম ভারতে প্রচলিত আছে এযেন সেইগুলিরই প্রতিরূপ। বহু বৎসরের আবেদন, নিবেদন, আলোচনায় কোনো ফল হয় না। অবশেষে গান্ধীজির প্ররোচনায় ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান সকলে গভর্ণমেণ্টের অযথা নিয়মের প্রতিবাদ-স্বরূপ সত্যগ্রহ গ্রহণ করিলেন। মিঃ গোখ্‌লে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন করিয়া সেখানকার হিন্দুমুসলমানগণের অবমাননা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলেন ও ১৯১০ সালে বড় লাটের সভায় এই পাপ-প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় নাটালে চুক্তিবদ্ধ কুলী প্রেরণ বন্ধ হইল। ১৯১২ সালে এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্ট বাধা দিলেন। এ দিকে ভারতের নানাস্থানে এই প্রথা দাসপ্রথার সহিত তুলনা করিয়া লোকে ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিল। দেশেও শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবির প্রয়োজন হইতে লাগিল। উপনিবেশ সমূহে চুক্তিবদ্ধ কুলির * আত্মহত্যার হার দেখিয়া,

* স্থানীয় মুক্ত-চুক্তি কুলীদের ও ভারতবর্ষের সাধারণ আত্মহত্যার অনুপাত উপনিবেশ সমূহে অনেক বেশী।

ট্রিনিডাডে—চুক্তিবদ্ধদের মধ্যে—১০ লক্ষে			৪০০
মুক্তচুক্তি	—	„	১৩৪
বৃটিশ গিয়েনা—চুক্তিবদ্ধ	—	„	১০০
মুক্ত-চুক্তি		„	৫২

পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় ভীষণ নৈতিক দুর্গতির কথা শুনিয়াও অনেক 'ভদ্রঘরের মেয়েদের ভুলাইয়া বিদেশে লইয়া যাওয়ার গুজব শুনিয়া এদেশে ভীষণ প্রতিবাদ সূত্রপাত হইল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দুইজন ইংরেজ অধ্যাপক মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুস্ ও মিঃ পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। তখন সত্যগ্রহ পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল। তাঁহারা সেখানে গিয়া এই বিরোধ মিটাইবার জন্য অনেক করিয়াছিলেন। এদিকে ১৯১২ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট একজন সাহেবও একজন ভারতবাসীকে উপনিবেশগুলির অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা কুলীদের অবস্থা দর্শন ও সেই অবস্থার উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা প্রায় এক বৎসর ধরিয়া ট্রিনিডাড্, বৃটীশ, গিয়েনা, জামাইকা, ফিজি, সুরিনাম (ওলন্দাজ উপনিবেশ) প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কুলীদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিয়া বলেন যে যদিও অনেক নিন্দনীয় ঘটনা সেখানে ঘটিতেছে তথাচ এ দেশের অপেক্ষা সেখানে লোকে সুখে থাকে; সেইজন্য অধিকাংশ কুলি চুক্তি শেষেও দেশে না আসিয়া উপনিবেশসমূহ বাস করিতেছে।

কুলীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের সমস্যা অতি তীব্র। ১৯১৪ সালে

সুরিনাম—চুক্তিবদ্ধ	"	৯১
মুক্ত-চুক্তি	"	৪৯

জামাইকায় উভয়ে মিলিয়া ৩৯৬; পৃথক্ হিসাব পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের সহিত তুলনা করিলে বুঝিব যে উপনিবেশগুলির দশা কি ভয়ানক। বোম্বাই প্রদেশে ১০ লক্ষ প্রায় ২৯ জন, যুক্ত প্রদেশে ৬৬, ও মাদ্রাজে ৪৫ জন আত্মঘাতী।

আফ্রিকার সত্যগ্রাহীদের সহিত স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের একটা বুঝা পাড়া হইল। ইহাকে গান্ধী-স্মাট্‌স্‌ সন্ধি বলে। ভারতবাসীদের কতকগুলি দাবী মিটিল; ভারতবাসীদের বিবাহিত স্ত্রীকে আইনের চক্ষে হীন করা হইয়াছিল, তাহা রদ হইল। ভারতীয় পুরোহিত বিবাহ দিলে সে-বিবাহ সিদ্ধ হইবে স্থির হইল; ৪৫৲ টাকার জিজিয়া কর উঠিয়া গেল। সত্যগ্রহ শেষে গান্ধীজি ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৪ — ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত বিদেশে ভারতবাসী

কিন্তু তাহার পর হইতে গত দশ বৎসর ভারতবাসীদের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকগণ অবিচারের নূতন নূতন বিধি প্রস্তুত করিতেছেন। যুদ্ধের সময়ে ভারতবাসীরা কোনো প্রকার আন্দোলন করে নাই শ্বেতাঙ্গেরাও কোনোপ্রকার উপদ্রব করে নাই। যুদ্ধান্তে বিরোধ পুনরায় দেখা দিল। এক্ষণে শ্বেতাঙ্গেরা আফ্রিকাকে তাহাদেরই উপনিবেশ বলিয়া দাবী করিতেছে; ভারতবাসীকে সেখানে তাহাদের আর প্রয়োজন নাই; ভারতবাসীদেরই চেষ্টায় দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ব-আফ্রিকা, কেনিয়া প্রভৃতি দেশ উপনিবেশোপযোগী হইয়াছে। ভারতবাসীদের তাড়াইবার জন্য কেনিয়া, টাঙ্গানিকা, ট্রান্সভাল, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেতাঙ্গেরা নানারূপ চেষ্টা করিতেছে। অনেক কমিশন বসিয়াছে; বিশেষ ফল হয় নাই। নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ভারতবাসীদের ভদ্ররূপ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও কানাডা ভিন্ন অন্যান্যস্থানে ভারতবাসীদের অবস্থা কিরূপ তাহা নিম্নে বলা হইল :—

ভারতবাসীকে তাড়াইবার চেষ্টা

যে সকল প্রধান অভিযোগের জন্য গান্ধীজির সহায়তায় তথাকার ভারতবাসীগণ সত্যগ্রহ অবলম্বন করিয়াছিলেন, ১৯১৪ সালের রিলিফ

একৃট্ (Relief Act) ও 'স্মাট্‌স্ গান্ধী' বন্দবস্তের দ্বারা সেগুলির কতকটা মীমাংসা করা হইল। এই বন্দবস্তের ফলে সরকার জানাইলেন যে ন্যায়সঙ্গত আইন অনুসারেই তাঁহারা শাসন কার্য্য চালাইবেন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা এবং ভারতবাসীদিগের ন্যায্য অধিকারের প্রতি যথোচিত আস্থা প্রদর্শন করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা

গান্ধীজি জানাইলেন যে তিনি 'ন্যায্য অধিকার' বলিতে এই বুঝেন যে ভারতবাসীগণ যে-সকল স্থানে থাকিয়া বাণিজ্য করিতে চান, উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সকল স্থানে থাকিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য করিবার অধিকার থাকিবে।

১৯২০ সালে এশিয়াবাসীদিগের অবস্থা জানিবার জন্য একটী তদন্ত বৈঠক বসে (Asiatic Enquiry Commission)। ইউনিয়ন রাজ্যে ভারতবাসীদিগের বাণিজ্য করিবার ও জমির স্বত্ব উপভোগ করিবার অধিকার সম্বন্ধে তদন্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই বৈঠক হইতে কয়েকটি প্রস্তাব পাঠান হয়। তাহার মধ্যে এই কয়টী প্রধান।

এশিয়াবাসীদিগকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে না। তবে স্বেচ্ছাপূর্বক চলিয়া আসার অধিকার থাকিবে। নির্দিষ্ট স্থানে এশিয়াবাসীদিগকে আবদ্ধ করা হইবে না, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত বিভিন্ন দল সৃষ্টি ও বাসস্থান নির্দেশ তাহারা করিতে পারিবে এবং ম্যুন্সিপালটির দুটী অধিকার থাকিবে :—

এশিয়াবাসীদের বাসস্থানের চতুঃসীমা নির্দেশ করিয়া সেই স্থানের কতক গুলি রাস্তা ও কতিপয় নির্দিষ্ট পাড়া এশিয়াবাসী বণিকদিগের জন্য স্থির করিবে ; সেই সকল স্থানে বণিকদিগকে ক্রমশ আসিবার জন্য আকৃষ্ট করা হইবে। ইউনিয়ন রাজ্যের সমস্ত স্থানে সম্ভব হইলে এক রকম আইন (License Law) হওয়া দরকার। যদি তাহা সম্ভব না হয় ত

কেপ প্রভিন্স, ট্রান্সভাল ও নেটালের বাণিজ্য সংক্রান্ত আইনগুলি পার্লামেন্টের একটী সাধারণ আইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবগুলির একটী ভিন্ন আর কোনোটিই কার্য্যে পরিণত করেন নাই। এশিয়াবাসীগণ কেবল স্বেচ্ছাপূর্বক চলিয়া আসার অনুমতি পাইয়াছেন। চারি বৎসরের মধ্যে তথাকার অফিসারদের চেষ্টায় ৭৪৩০ জন ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়াছে এবং ইহাদের অনেকেই সেখানকার নাগরিকের অধিকার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কেপ প্রভিন্সে ভারতবাসীগণ রাজনৈতিক ও মিউনিসিপ্যাল অধিকার পাইয়াছে ও নেটালে তাহাদের কেবল ম্যুন্সিপাল অধিকার আছে। অন্য দুই স্থানে কোনও অধিকার নাই। নেটালে এশিয়াবাসীদিগের বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ট্রেণে ভারতবাসীদিগের জন্য ভিন্ন কামরা, কোনও কোনও স্থানে ট্রামে চড়া নিষেধ, ঘোড়দৌড়ের জায়গায় যাওয়া নিষেধ এবং কোনও কোনও ক্লাবে যাওয়া নিষেধ এইরূপ নানা সামাজিক শাসন দ্বারা তাহারা পীড়িত।

এইরূপ অনুশাসন কমা দূরে যাক্ বাড়িয়াই চলিতেছে, এবং এশিয়াবাসীদিগকে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত করিবার নিমিত্ত একটী বিল পাশ হইতে যাইতেছে; ইহার ফলে আফ্রিকার নাগরিক, এমন কি সাধারণ মানুষ বলিয়াও কোনো অধিকার ভারতবাসীর থাকিবে না।

কেনিয়ার ভারতবাসীদের অভিযোগ প্রধানত কয়েকটী বিষয়ে ছিল, যেমন:—ভোট দিবার অধিকার তাহাদের ছিল না; তাহাদের অন্ত্যজশ্রেণী ভুক্ত থাকিতে হইত; মালভূমিগুলির উপর ভারতবাসীদিগের অধিকার ছিল না, এশিয়াবাসীগণ যাইয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিবে না ইত্যাদি।

কেনিয়া উপনিবেশ

১৯২৩ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে পার্লামেণ্টে এই মীমাংসা হয় যে কেনিয়ার ব্যবস্থাপক সভায় ১৮ জন নির্বাচিত সভ্যের মধ্যে ৫ জন ভারতবাসী থাকিবে। গভর্ণরের কর্ম-সমিতিতেও একজন ভারতবাসী থাকিবে। ভারতবাসীদিগকে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখা হইবে না। উপনিবেশ স্থাপনে কোনও প্রকার জাতিগত পার্থক্য থাকিবে না; তবে অফ্রিকাবাসীদিগের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সাধারণভাবে উপনিবেশস্থাপনকে নিয়মিত করিতে হইবে।

ফিজি ও বৃটীশ গিয়েনা

ফিজির ভারতবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমজীবি। সুতরাং ইহাদের সমস্যা প্রধানত অর্থনৈতিক। ইহাদিগের মজুরী অতিশয় কম। বর্তমানে ব্রিটীশ গিয়েনাতে ভারতবাসীদিগকে বাস করিবার জন্য তথাকার সরকার আহ্বান করিতেছে। ভারত-সরকারও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

অন্যান্য স্থানের অবস্থা

বাণিজ্যসংক্রান্ত লাইসেন্স; করদান প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় লইয়া টাঙ্গানিকা রাজ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতবাসী-দিগকে লাইসেন্স পাইবার জন্য মোটারকমের কিছু কর দিতে হইত ও তাহাদিগের হিসাবপত্র ঐদেশীয় ভাষা অথবা ইংরাজীতে রাখিতে হইত। তথাকার ভারতবাসীগণ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। সিংহল, মরিসাস্ ও মালয়দ্বীপে ভারতবাসীদিগের অবস্থা মোটের উপর ভালই। সিংহল ও মালয়দ্বীপে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজেদের এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। সিংহলে তথাকার সরকার জীবনধারণোপযোগী ব্যয়ের তুলনায় ভারতবাসীদিগের মজুরীর একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

প্রবাসী ভারতবাসীর সংখ্যা

সিংহল	৭,৫০,০০০	অষ্ট্রেলিয়া	২,০০০
ষ্ট্রেট্স সেটলমেণ্ট	১,০৪,০০০	নিউজিল্যাণ্ড	৬০৬
মালয় ষ্টেট্স্	৩,০৫,২১৯	নেটাল	১,৪১,৩৩৬
বৃটীশ মালয়	৬১,৮১৯	ট্রান্সভাল	১৩,৪০৫
হংকং	২,৫৫৫	কেপকলোনী	৬,৪৯৮
মরিশাস	২,৬৪,৫২৭	অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট্	১০০
সিকিলিস	৩৩২		——————
জিবরালটার	৫০	বৃটীশ সাম্রাজ্যে মোট	২০,৩০,২৪১
নিগেরিয়া (আফ্রিকা)	১০০		
কেনিয়া	২২,৮২২	মাদাগাসকার	৫,২৭২
উগাণ্ডা	৩,৫০০	মার্কিনরাজ্য প্রায়	২,০০০
নিসাল্যাণ্ড	৪০৭	রিউনিয়ন	২,১৯৪
জাঞ্জিবার	১২,৮৪১	ওলন্দাজ পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ	৫০,০০০
টাঙ্গানিকা	৯,৪১১	সুরিনাম	৩৪,৯৫৭
জামাইকা	১৮,৪০১	পারস্য	৩৮২৭
ট্রিনিডাড্	১,২১,৪২০		——————
বৃটীশ গিয়েনা	১,২৪,৯৩৪	বিদেশে মোট	১,০০,৫২৫
ফিজিদ্বীপ	৬০,৬৩৪		——————
কানাডা	১২০০	প্রবাসী ভারতবাসী মোট	২১,৩০,৭৬৬

৩। ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষার ইতিহাস।

দেওয়ানী কার্য্যের ভার কোম্পানীর হাতে আসিবার পরেও অনেক দিন ফৌজদারী কার্য্যভার মুসলমান কর্মচারীদের উপরেই ছিল। তখন বিচারকার্য্যে ইংরাজ জজদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এক একজন মৌলবী সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইত। এই অভাব দূর করিবার জন্য এবং মৈত্রী প্রদর্শন দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমান সমাজকে প্রীত করিবার আশায় প্রথম গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ সালে কলিকাতায় এক মাদ্রাসা বা মুসলমানী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতের সাহিত্য দর্শন আইনের উপর ওয়ারেন হেষ্টিংসের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে বৃটীশ ক্ষমতা ভারতে চিরস্থায়ী করিতে হইলে ইহা ভারতীয় ভাবাপন্ন হওয়া চাই; বৃটীশ শাসনাধীনে ভারতের যাহা কিছু ভাল তাহা বড় হইয়া উঠিবে।

কোম্পানীর মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপন

কাশীর রাজ্য জয়ের পর সেখানে ১৭৯১ সালে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। তখন সংস্কৃত, আরবী, ফার্শীশিক্ষা প্রচারের জন্য কোম্পানীর খুব উৎসাহ।

কলিকাতায় মাদ্রাসার খরচ চালাইবার জন্য বার্ষিক ৩০ হাজার টাকার একটি সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। ছাত্রগণ ৭ বৎসর কাল কলেজে পড়িত; কাহারও বেতন লাগিত না, উপরন্তু প্রথম তিন শ্রেণীর বালকেরা ৫৲ ৮৲ ১০৲ টাকা হিসাবে জলপানী পাইত। আরবী,

ফার্সী ভাষার সাহিত্য, ন্যায়, অলঙ্কার, দর্শন, আইন, গণিত শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। এছাড়া য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থসকল ফার্সী ও আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া হাকীমি ও উনানী পুস্তকের সহিত পাঠের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ইংরাজী, ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

লর্ড ওয়েলেসলী এদেশে প্রথমে (১৮০০ খৃঃ) ইংরাজী কলেজ খুলেন; তবে এ কলেজ সাধারণের জন্য ছিল না। সে-সময়ে সিবিলিয়ান কর্মচারীগণ ১৫।১৬ বৎসর বয়সে এদেশে আসিত; তাহাদের শিক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি নিতান্ত সামান্য। তাহাদিগকে কর্মক্ষম করিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই কলেজের অধ্যাপকগণ সাতবৎসর কাজ করিয়া পুরাবেতনে পেনশন্ পাইতেন, এবং কর্মচারীদের বেতনও খুব মোটা হইত। এই সব কারণে অজস্র টাকা এই খাতে ব্যয়িত হইত। কোম্পানী বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্থে (১,৫০,০০০৲) দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। ইহাতে ১১৪ ছাত্রকে মাসিক ৩০০৲ ভাতা দিয়া তিন বৎসর করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। ১৮২৫ হইতে ১৮২৮ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে ৭,৫৪,৮৬৫৲ টাকা ব্যয়িত হয়। অর্থাৎ কোম্পানীর ১১৪ জন সাহেব ছাত্রের জন্য গড়ে ৬,৬২১৲ টাকা করিয়া খরচ করা হয়। (Basu, Education in India, p. 23)। মান্দ্রাজেও উক্তরূপ ব্যবস্থা ছিল; নূতন সিবিলিয়ান যুবকেরা ১৭৫৲ হইতে ৩৫০৲ টাকা করিয়া ভাতা পাইয়া শিক্ষা পাইত। এখানকার ছাত্রদের জন্য মাথাপিছু তিন হইতে চারি হাজার টাকা করিয়া বৎসরে খরচ হইত। বোম্বাই হইতে অনুরূপ কলেজ স্থাপনের জন্য স্থানীয় সরকার বিলাতে পরিচালক সঙ্ঘের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহার অনুমোদন না করায় ভারতের অর্থকোষ হইতে আরও ৩০।৪০ হাজার টাকায়

লর্ড ওয়েলেস্লীর কলেজ

৩০৷৪০টি য়ুরোপীয় সিবিলিয়ানের জন্য ব্যয়িত হইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। (ibid., p. 25—29).

এই সময়ে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বিলাতে খুব একটি শক্তিশালী দল গঠিত হইয়াছিল। ১৭৯৩ সালে কোম্পানীর সনদ নূতন করিয়া লইবার সময়ে একদল লোক এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শিক্ষক পাঠাইবার কথা তোলেন। তাহাতে ডিরেক্টরগণ ও পার্লামেন্টের সদস্যগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠেন। তাঁহারা আমেরিকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের ঘোর আপত্তি করিলেন। এ ছাড়া কোম্পানীর পরিচালকগণ ধর্মপ্রচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা খৃষ্টান পাদরীদের এদেশে আসিতে উৎসাহ দিলেন না; বরং যাহাতে তাঁহারা এদেশে না আসেন তাহাই তাঁহারা চাহিতেন। সেই জন্য মহাত্মা কেরী প্রমুখ পাদরীগণ ১৭৯৯ সালে এদেশে আসিয়া ইংরাজ মুলুকে বাস করিলেন না, দিনেমারদের অধিকৃত শ্রীরামপুরে তাঁহাদের মিশন খুলিলেন। কেরী সাহেবের নিকট বাংলাভাষা যে কত ঋণী তাহা এখানে বর্ণন করা সম্ভব নয়, তবে বাংলাভাষার ইতিহাস-অভিজ্ঞের নিকট ইহা খুবই সুপরিচিত।

খৃষ্টধর্ম প্রচারে কোম্পানীর আপত্তি

ভারতের লোককে য়ুরোপের জ্ঞানে জ্ঞানী করিতে হইবে একথা প্রথমে এখানকার শাসনকর্তা বা বিলাতের পরিচালকদের কাহারও মনে উদয় হয় নাই। একথা প্রথম বিলাতের পূর্বোল্লিখিত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কয়েকজন ভক্তের মনে হয়। চার্লস গ্রাণ্ট ভারতবর্ষে কিছুকাল কাজ করেন ও পরে কোম্পানীর একজন পরিচালক হন। ১৭৯৩ সালে তিনিই প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার কথা বলেন। বিশ বৎসর পরে ১৮১৩ সালে নূতন সনদ লইবার সময়ে তিনি ও তাঁহার বন্ধুদের চেষ্টায়

১৮১৩ সালের প্রদত্ত শিক্ষার ব্যয়

কোম্পানী বৎসরে এক লক্ষ টাকা ভারতে শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন ঠিক করেন। ইহার উদ্দেশ্য প্রাচীন সাহিত্যের উন্নতিবিধান, পণ্ডিত ও মৌলবীদের উৎসাহবর্দ্ধন, বৃটীশ ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা ও তাহার উৎকর্ষসাধন। কিন্তু সে-অর্থের দ্বারা বিজ্ঞানের জন্য কিছুই করা হয় নাই, টাকাগুলি পণ্ডিত ও মৌলবীর বেতনে ও পুরানো পুঁথি ছাপায় ব্যয়িত হইতে লাগিল। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি একখানি আরবী গ্রন্থ ছাপিতে ২০ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়! আরবী কেহ বুঝিত না বলিয়া ফার্সীতে ইহার অনুবাদ করা হইল; কিন্তু দেখা গেল ছাত্রদের পক্ষে তাহা খুবই দুর্বোধ্য, সুতরাং অবশেষে স্বয়ং অনুবাদককে ৩০০৲ টাকা বেতন দিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য রাখা হইল। ১৮২০ সাল পর্য্যন্ত টাকাগুলি এমনিভাবে নষ্ট হইতে লাগিল।

এদিকে বাংলাদেশের একদল লোক পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইবার ও দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদরীগণের খৃষ্টানী শিক্ষায় বাঙালী যুবকদের মন বিকৃত হইয়া যাইতেছিল; এই স্রোত হইতে বাঙালীকে রক্ষা করা তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল। অপরদিকে সরকার উদার শিক্ষা প্রচারে বিমুখ; সুতরাং আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির জন্য আত্মনির্ভর করা ছাড়া লোকের আর গতি নাই একথা তাঁহারা বুঝিলেন। সেইজন্য রাজা রামমোহন রায় ও মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপন করিলেন। হেয়ার সাহেব প্রচলিত খৃষ্টানধর্মে আস্থাবান ছিলেন না, তাই তিনি পাদরীদের সহিত কখনো এক হইয়া কাজ করেন নাই। উদারচেতা রামমোহনের সঙ্গে তিনি যোগদান করিয়া এই নূতন ও প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। হিন্দুকলেজের সহিত রাজা রামমোহন রায় যুক্ত ছিলেন বলিয়া গোঁড়া হিন্দুগণ ইহার সহিত মন খুলিয়া যোগদান না করায় তিনি উহার

১৮১৭ হিন্দুকলেজ

সহিত সংশ্রব ছিন্ন করেন, কিন্তু অন্তরের যোগ তাঁহার কোনোদিন নষ্ট হয় নাই।

এই বিদ্যালয় স্থাপনে কলিকাতার হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। সরকারী তরফ হইতে প্রথমে এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু হিন্দুদের উৎসাহ ও অর্থব্যয় করিবার প্রবল ইচ্ছায় সরকার অবশেষে ১৮১৭ সালে আর একটি জনহিতকর অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন; সেটি হইতেছে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপন। এই সমিতির উদ্দেশ্য শিক্ষাপ্রদ পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন মুদ্রন ও স্বল্প বা বিনামূল্যে বিক্রয় বা প্রচার। এই সকল গ্রন্থ প্রথমে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান পাদরীগণই লিখিতেন ও তাঁহাদের ছাপাখানাতেই ছাপা হইত। তখনো বাংলা-দেশে বাঙালী গদ্যলেখকের সংখ্যা খুবই কম। ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত এই সমিতি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ ছাপাইয়া কাজ বন্ধ করিয়া দেন।

স্কুলবুক সোসাইটি

পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দুকলেজ ও রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শ্রীরামপুরের পাদরীগণ। হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইবার পরবৎসরেই তাঁহারা শ্রীরামপুরের কলেজ স্থাপন করেন; তাঁহাদের কতকগুলি বিদ্যালয়ের এই কলেজ হইল কেন্দ্র। ইঁহারা ১৮২৭ সালে ডেনমার্কের রাজার নিকট হইতে উপাধি দিবার সনদ আনয়ন করেন। ১৮২৪ সালে ইঁহারা সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীরামপুরের কলেজ

১৮২০ সালে কলিকাতার শিবপুরে আংগলিকান খৃষ্টানগণ সর্ব প্রথম কলেজ খুলেন (Bishop's College)। ১৮৩০ সালে আলেক্‌জেণ্ডার ডাফ নামক স্কটল্যাণ্ডের জনৈক পাদরী এদেশে আসিয়া (General Assembly's Institution) এক বিদ্যালয় স্থাপন করে। ইহাই পরে 'স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ' নামে অভিহিত হইয়াছে। বাংলাদেশের

ইতিহাসে ডাফের স্থান খুব উচ্চ। যদিও তিনি গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন তথাচ রাজা রামমোহন রায় শিক্ষাপ্রচার কল্পে তাঁহাকে সাহায্য করিতে কোনো দিন বিমুখ হন নাই। ডাফের সময় হইতে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে খৃষ্টীয় অধ্যাপকগণের একটি বিশেষ স্থান হইয়াছে।

১৮৩০-৩২ সালে বিলাতের ইতিহাসে খুব একটা বড় পরিবর্তন হইয়া যায়। শেষোক্ত বৎসর রিফর্ম বিল পাশ হয়; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে অধিকার অনেকখানি বাড়িয়া যায়। ১৮৩৩ সালে সনদ লইবার সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ হইতে বাণিজ্য করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় এবং বৃটীশ প্রজাদের ভারতে অবাধ প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে কোম্পানীর নিকট হইতে পাশ লইয়া তবে কেহ ভারতে আসিতে পারিত। এই বাধা দূর হওয়াতে দলে দলে পাদরী এদেশে আসিতে লাগিলেন। সেই হইতে জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, দিনেমার, সুইড, মার্কিন, অষ্ট্রেলিয়ান সকলেই এখানে ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন এবং শিক্ষা-প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। মান্দ্রাজের উচ্চশিক্ষা একপ্রকার খৃষ্টানদের হাতেই ছিল। বাংলাদেশে খৃষ্টানপাদরী ও দেশীয়দের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে চারিদিকে ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে অনেক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ-পর্যন্ত শিক্ষার জন্য কোম্পানী কোনই উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই। ইতিমধ্যে ১৮২৩ সালে সাধারণ শিক্ষা-সমিতি (General Committee of Public Instruction) নামে একটি বোর্ড গঠিত হয়। ১৮২৪ সালে কোম্পানী কলিকাতা সহরে ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই ব্যাপারে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ

১৮৩৩ হইতে খৃষ্টান পাদরীদের অবাধ আগমন

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ১৮২৪

খুবই ক্ষুন্ন হন ; ইংরাজী শিক্ষার জন্য লোক লালায়িত অথচ কোম্পানী সেই সময়ে সরকারী তহবিল হইতে ২৫ হাজার টাকা সংস্কৃত কলেজে ব্যয় করিলেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যতীত, সামান্য ইংরাজী, গণিত, শারীরতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত ; বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি হাসপাতাল ছিল।

বাংলাদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি মত ক্রমেই তীব্র ও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতেছিল। কোলব্রুক, উইলসন প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবগণ ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রাদির অধ্যাপনার পক্ষপাতী ; অপরদিকে রাজা রামমোহন রায় ও খৃষ্টীয় পাদরীগণ ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ডাফ প্রমুখ পাদরীগণ কলেজে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিতেন ; তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন খৃষ্টানধর্ম ইংরাজী ভাষার প্রসার ব্যতীত প্রচারলাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন দেশের লোকের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও জড়বুদ্ধি য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা না জানিলে দূর হইবে না। সেই মর্মে তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি পত্র লেখেন ; সেই পত্রখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত এই মসিযুদ্ধ চলিল।

শিক্ষিত সমাজের দুই দল

ইতিমধ্যে লর্ড মেকলে বড়লাটের মন্ত্রী-সভায় আইনসদস্য হইয়া আসিলেন। ১৮৩৫ সালে তিনি শিক্ষা-বিষয়ক এক প্রতিবেদন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন। এই দেশের ভাষা সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে মেকলের জ্ঞান সামান্যই ছিল ; তিনি আমাদের অতীত কীর্তিকলাপ ও তৎকালীন চরিত্রের অত্যন্ত জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক ভারতের শিক্ষা ও ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা

লর্ড মেকলের মন্তব্য

সভ্য হইয়াছে। ভারতবাসী ইংরাজীশিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজের মহত্ব, স্বদেশপ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী লাভ করিয়া আপনার পায়ে আপনি যাহাতে দাঁড়াইতে পারে, য়ুরোপীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশমধ্যে স্থাপিত করিতে পারে, ইহাই ছিল মেকলের প্রাণের ইচ্ছা।

ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে কোম্পানীর স্বার্থ।

এছাড়া কোম্পানীর ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের বিশেষ স্বার্থ ছিল। সরকারী আপিষের কাজকর্ম ক্রমেই জটিল হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিলাত হইতে পরিচালকগণ লিখিলেন 'এইরূপ একশ্রেণীর লোক প্রস্তুত করা প্রয়োজন যাহারা বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে দেশের দেওয়ানী সংক্রান্ত কাজ করিতে পারিবে। ইহা করিতে গেলে য়ুরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের সহিত তাহাদিগকে ভালরূপে পরিচিত হওয়া উচিত। এদেশের লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কোম্পানী সংস্কৃত আরবী ও ফার্সী পড়াইবার কলেজ খুলিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট প্রাচীন শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিল; বিশেষত মৌলবী ও পণ্ডিতগণ খুব খুসী হইয়াছিল। তখন আমাদের রাজ্য নূতন; সে সময়ের পক্ষে এইরূপ রাজনীতি অনুমোদিত ছিল; কিন্তু এখন ইহার তত আবশ্যকতা নাই।' ১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে গভর্ণমেণ্ট বলিলেন অতঃপর ইংরাজী শিক্ষা দেশময় প্রচারিত হইবে।

বাংলায় দেশীয় শিক্ষার অবস্থা।

এই সময়ে মিঃ আডাম নামক জনৈক ইংরাজ বাংলাদেশের নানাস্থান ঘুরিয়া এখানকার দেশীয় শিক্ষার অবস্থা ও প্রণালী লিপিবদ্ধ করেন। তখন অধিকাংশ গ্রামেই শিক্ষার কোনো না কোনো বন্দবস্ত ছিল। তবে শিক্ষার আদর্শ খুব উচ্চ না হইলেও কাজচলা বিদ্যা গ্রামের অধিকাংশ ছেলেই পাইত; সংস্কৃত শিক্ষা দেশব্যাপী ছিল এবং এক একটি স্থানের পণ্ডিত একত্র করিলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে

পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের এই ভিতরকার জিনিষগুলির প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িল না। সরকার ইংরাজীশিক্ষা লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলেন যে দেশের পাঠশালা চতুষ্পাঠীগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সব বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে কেবলমাত্র ভারতের জ্ঞানের ধারা বজায়ের চেষ্টা ছিল; বাহিরের সহিত তাহার যোগ ছিল না এবং যোগস্থাপন করিতেও ইঁহারা ইচ্ছুক ছিলেন না।

বাংলাদেশে বেণ্টিঙ্ক যেমন শিক্ষার জন্য করিয়াছিলেন, মান্দ্রাজের তৎকালীন গভর্ণর স্যর টমাস মন্‌রো দেশীয় শিক্ষার অবস্থা জানিবার জন্য রীতিমত তদারক করেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে প্রকাশ পায় ১৮২৬ সালে প্রায় ১২½ হাজার বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার (অর্থাৎ ৬৭ জন লোকের মধ্যে ১ জন) শিক্ষা পাইতেছিল। বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী ছাত্রের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে গমন করিতেছিল। বর্তমানে সমস্ত ভারতে ঐ বয়সী বালকদের এক-পঞ্চমাংশ অধ্যয়ন করে।

মান্দ্রাজের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা

বোম্বাইতে সেই সময়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব গভর্ণর। তিনি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহারই মধ্যে য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশের প্রাণ তাহার সাহিত্যে ও দর্শনে; সেই সাহিত্যাদির আলোচনা উঠাইয়া ইংরাজী সাহিত্য দর্শনের প্রবর্তনের তিনি বিরোধী ছিলেন।

বোম্বাইতে প্রাচীন শিক্ষা

১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত সরকার শিক্ষার জন্য যাবতীয় টাকা স্কুল ও কলেজের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। এই বিশ বৎসর সরকার শিক্ষা বিষয়ে খুব উৎসাহ দেখান এবং তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে সব চলিতে থাকে। পাদরী ও দেশীয়দের বিদ্যালয়গুলিরও খুব উন্নতি হইয়াছিল। সাধারণ লোকের জন্য প্রাথমিক ও মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়

গুলির দিকে সরকারের দৃষ্টি তখনো যায় নাই। তাঁহারা ভাবিতেন সমাজের উপরের স্তরে শিক্ষাবিস্তার করিলে তাহা নিম্নস্তরকেও স্পর্শ করিবে।

ইংরাজী শিক্ষা যে কেবলমাত্র জ্ঞানের জন্য লোকের প্রিয় হইয়াছিল তাহা নহে; লোকে শীঘ্রই দেখিল ইংরাজী জানিলে সরকারী চাকুরী সহজে মিলে। এছাড়া ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করিলেন যে যাহারা সরকারী বিদ্যালয় হইতে পাশ করিবে তাহাদিগের মধ্য হইতে কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে। ইহা একটা কম প্রলোভন নয়। এতকাল হিন্দু মুসলমান উভয়েই ফার্সী শিক্ষা করিত, কারণ ফার্সী ছিল রাজভাষা। হিন্দুগণের পক্ষে ফার্সীও যেমন ইংরাজীও তেমন। সুতরাং একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিতে ও শিখিতে সময় বেশী লাগিল না। মুসলমানগণ এ বিষয়ে পিছাইয়া রহিল। ফার্সী তাহাদের জাতীয় ভাষা, এক প্রকার ধর্মেরও ভাষা—তাহাদের হৃতসর্বস্ব রাজার ভাষা। মুসলমানগণ পাশ্চাত্য জ্ঞান হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন। ফলে মুসলমানগণ বাংলাদেশে হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইয়াও বিদ্যার ক্ষেত্রেও কর্মের ক্ষেত্রে পিছাইয়া গেলেন।

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের কারণ

১৮৩৬ সালে বাংলাদেশ হইতে সংযুক্ত প্রদেশ পৃথক করিয়া একজন ছোটলাটের উপর দেওয়া হয়। সেখানেও শিক্ষার হাওয়া বহিয়াছিল, তবে তাহা নিতান্ত ক্ষীণ। অধিবাসীদের মধ্য হইতে তেমন করিয়া প্রাণের সাড়া পড়ে নাই। সরকার প্রত্যেক তহশীলে একটি করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এবং চতুর্পার্শ্বস্থ পাঠশালাগুলির উন্নতি করিবার জন্য তদারকের, এবং অর্থসাহায্য ও উপদেশাদির ব্যবস্থা করেন।

মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ১৮৪১ সালে মান্দ্রাজে একটি ও মফঃসলের দুই

চারিটি জায়গায় কয়েকটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রাথমিক শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। পাদরীগণ কর্তৃক স্থাপিত পাঠশালাগুলি অর্থসাহায্য পাইত।

বোম্বাই প্রদেশে সুবিখ্যাত এলফিনষ্টোন সাহেব ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য জেলায় জেলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনেকগুলি দেশী ভাষার স্কুল সরকারী সাহায্য পাইতে লাগিল এবং পাঠশালাগুলি তদারকের ব্যবস্থা হইল। এইরূপে ধীরে ধীরে ভারতের নানা স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা

১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনদ লইবার সময়ে পার্লামেণ্ট তদারক কালে ভারতের শিক্ষার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ করিলেন। তাহারই ফলে ১৮৫৪ সালে কোম্পানীর বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যর চার্লস্ উড * এদেশের শিক্ষোন্নতিকল্পে নূতন এক প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। এই প্রতিবেদন অনুসারে ভারতের শিক্ষা আগাগোড়া নূতন করিয়া গঠিত হইল। এতদিন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতে ছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। বিশ বৎসর যাবৎ

স্যর চার্লস উডের প্রস্তাব সমূহ

সরকার নিজ অর্থব্যয়ে স্কুল কলেজ স্থাপন ও পরিচালন করিয়াছিলেন, দেশীয়দের সাহায্য তাঁহারা চান নাই। কিন্তু এমন করিয়া শিক্ষা দেশব্যাপী হইতে পারে না; সেইজন্য বেসরকারী চেষ্টায় ও অর্থে যাহাতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেইদিকে তাঁহারা দৃষ্টি দিলেন। মহামতি উডের প্রস্তাবা-

---

* বর্তমান বড়লাট লর্ড আরভিনের পিতামহ।

-নুসারে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সাধিত হইয়াছিল। (১) শিক্ষা সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করিবার ব্যবস্থা হইল। (২) প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক পৃথক সাধারণ শিক্ষা সমিতি বা Department of Public Instruction গঠিত হইল। (৩) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব এই সময়ে হয়, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। (৪) বেসরকারী বিদ্যালয় যাহাতে অধিক পরিমাণে স্থাপিত হয় সেজন্য সাধারণকে উৎসাহিত করা ও সেগুলিকে যথাযথভাবে তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য অর্থসাহায্য করিয়া বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনিবার কথা হয়। (৫) সরকারী স্কুল ও কলেজের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হয়। (৬) মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপনের কথা তিনি ঐ সঙ্গে উপস্থিত করেন।

১৮৫৭ সালে বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সংযুক্ত-প্রদেশে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ পাঠশালাতেই পড়িতেছিল; চারি প্রদেশে প্রায় ৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু

শিক্ষাসেস্

ইতিমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ হওয়ায় রাজকোষে অর্থের অত্যন্ত টানাটানি হয়; সুতরাং শিক্ষার জন্য পৃথক কর বা সেস্ গ্রহণ ছাড়া শিক্ষা প্রচার করা অসম্ভব হইল। ১৮৬৫ সালে সিন্ধুপ্রদেশে ও পর বৎসরে মান্দ্রাজে ও ১৮৯৬ সালে, বোম্বাইতে, ও আরও দুই বৎসর পরে যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে এই কর ধার্য্য করা হয়।

ইহার পর পঁচিশ বৎসর ভারতের শিক্ষানীতির মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন হয় নাই। এই কয় বৎসরে শিক্ষা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল; ১৮৫৫ সালে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যাতে যেখানে কেবলমাত্র ৪৭টি স্কুল ছিল— গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত চাপ হ্রাস করিয়া দেওয়াতে দেড় বৎসরের মধ্যে

৭৯টি বিদ্যালয় অর্থ-সাহায্য পাইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করে। ১৮৭১ সালে উচ্চ ইংরাজী স্কুল ১৩৩টি ও মধ্য ইংরাজী স্কুল ৫৫১ হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে স্কুলের সংখ্যা ২০৯টি হয়। ২৫ বৎসরে ৪৭টির স্থানে ২০৯টি বিদ্যালয় হইয়াছিল। ১৮৮২ সালে ভারতে ৯০ হাজার সরকারী বেসরকারী সকল প্রকার বিদ্যালয়ে ২৫ লক্ষ বিদ্যার্থী পাঠ করিত ও ৬৭টি কলেজের বিদ্যার্থী সংখ্যা ছিল ৬ হাজার। ১৮৫৭ হইতে ১৮৮১ সালের মধ্যে ৩,২৮৪ জন বি. এ. ও ৫৩৬ জন এম. এ. পাশ করেন।

১৮৮২ পর্যন্ত শিক্ষার অবস্থা

১৮৮২ সালে ভারতের শিক্ষার অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য এক কমিশন বসে। ইহার পূর্ববর্তী আর দুটি সরকারী কমিশনের (১৮৩৫ ও ১৮৫৪ সালের) মন্তব্যের ফলে শিক্ষাবিভাগে যেরূপ যুগান্তর হইয়াছিল এই বৈঠকের ফল সেরূপ হয় নাই।

ভারতের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এত বাড়িয়াছিল যে তাহা শিক্ষা-বিভাগের আয়ত্তের মধ্যে আর ছিল না। এই কমিশন একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁহারা আরও উৎসাহ দিলেন; গভর্ণমেণ্ট যাহাতে অতিরিক্ত চাপ দিয়া দেশের চেষ্টাকে নিরস্ত না করেন ইহাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য। পঞ্চাশ বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতের এমন এক শ্রেণীর লোক হইয়াছিল যাঁহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা য়ুরোপীয় ধরণের; য়ুরোপের স্বাধীন চিন্তা, য়ুরোপের স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থা সমস্তই তাঁহাদের আদর্শ হইয়াছিল।

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন

১৮৮২ সালের কমিশনের তদারকের ফলে দেশের সর্বত্র নূতন নূতন কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল। বাংলাদেশের অনেকগুলি স্কুল

বাড়িতে বাড়িতে কলেজে পরিণত হইয়াছিল ; এই স্কুল ও কলেজের মধ্যে কোনো প্রকার ভেদ ছিল না, একই পরিচালক, একই তহবিল। একই বাড়ীতে সবই হইত। অধিকাংশ স্থলে বাঙালী জমিদারগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক ব্যয় করিতেছিলেন। কলেজ বিভাগে প্রথম প্রথম লোকসান হইত বটে ; কিন্তু স্কুল বিভাগের আয় হইতে তাহা পূরণ হইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে কলেজের ছাত্র সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কলেজগুলিও প্রথমে আত্মনির্ভরশীল ও পরে লাভজনক হইয়া উঠে।

১৮৮২ হইতে ১৯০২ পর্য্যন্ত ভারতের শিক্ষা বিভাগের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ১৯০১ সালে সকল প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার—বিশ বৎসরে ২৫ হাজার স্কুল বাড়িয়াছিল। এ ছাড়া বেসরকারী ৪৩ হাজার পাঠশালায় প্রায় ৬ লক্ষ বিদ্যার্থী ছিল। ১৮৮১ সালের তুলনায় বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৪১% এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রায় চারি গুণ বা ১৮০% হারে বাড়িয়াছিল। এক বাংলাদেশে ২০৯টি স্কুলের স্থানে ৫৩৫টি উচ্চ বিদ্যালয় হইয়াছিল এবং মধ্য-বিদ্যালয় ইংরাজী ত্রিশ বৎসরে ৫৫১টি স্থানে ১,৩৮১টি হইয়াছিল। এবারেও দেখা গেল প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দ্বিগুণের উপর বাড়িয়াছে। কলেজ বিভাগের উন্নতি প্রাথমিক শিক্ষার অনুপাতে খুবই বেশী হইয়াছিল। ১৮৮১ সালে সমগ্র ভারতে সকল শ্রেণীর ৬৭টি কলেজ ছিল ১৯০১ সালে ১৪৫ হয় ; ছাত্র সংখ্যা ৬ হাজারের স্থানে ১৭½ হাজার হইয়াছিল। এছাড়া ৬৪টি আইন, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রকারের কলেজে প্রায় ৫½ হাজার বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিত। বাংলাদেশে সরকারী কলেজে ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল এবং বেসরকারী কলেজে

১৮৮২—১৯০২ পর্য্যন্ত শিক্ষার অবস্থা

বাড়িতেছিল। শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা পাশ ও উপাধি গ্রহণ—তা' সে যেমন করিয়াই হউক। ভাল মন্দ কলেজ, ভাল পড়ানো মন্দ পড়ানো প্রভৃতি চিন্তা গরীব ছাত্রের মনে আসিত না। তাহার মনে আসিত কোথায় সস্তা হইবে। স্কুল ও কলেজে সর্বত্রই পড়ানো হইত পাশ করাইবার জন্য। সরকারী স্কুলে শিক্ষকদের বেতন ২৫৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইত। বেসরকারী বিদ্যালয়ে ৫৲ টাকা হইতে ৭৮৲ টাকা মাসিক বেতন হইত। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার খরচ বাংলা দেশেই সব চেয়ে কম পড়িত—মাথা পিছু মাত্র ১৮৲; বোম্বাই ৩৮৲, যুক্ত প্রদেশে ৩৬৲, মান্দ্রাজে ২৩৲। ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা সস্তা ছিল বলিয়া উহা খারাপ হইত এবং খারাপ হইত বলিয়াই উহা সস্তা পড়িত।

গত শতাব্দীর শেষভাগে এবিষয়ে চারিদিক হইতে নানারূপ সমালোচনা হইতে লাগিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যেসকল ছাত্র উপাধি লইয়া বাহির হইত তাহারা উপাধির যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে কিনা, শিক্ষার আদর্শ নীচু হইয়াছে কিনা, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক কিনা, য়ুনিভার্সিটির সিনেট সভার সদস্য সংখ্যা অত্যন্ত অধিক কিনা ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। ১৮৯৮ সাল হইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান, বিচার, দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। ঐ বৎসরে সমগ্র ভারতের শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শনের জন্য একজন কর্মচারী বিলাত হইতে আনীত হন। ১৯০১ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জন শিমলা পাহাড়ে য়ুরোপীয়দের লইয়া এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন। ১৯০২ সালে পুনরায় এক কমিশন বসানো হয়। উহার প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে, ১৯০৪ সালের য়ুনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাশ হয়। সেই সময়ে এই কমিশনের বিরুদ্ধে খুবই তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। দেশের লোকের আতঙ্ক হইয়াছিল যে লর্ড কর্জন দেশের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতে চান।

ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার সিনেটের উপর ন্যস্ত ছিল। সিনেটের সভ্য হওয়া সম্বন্ধে কোনো প্রকার নিয়ম ছিল না বলিলেই হয়; সরকার সম্মান দিবার জন্য এমন সকল লোককে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতেন শিক্ষার সহিত যাহাদের কোন প্রকার যোগ ছিল না। সভ্যেরা আজীবন সিনেটের সদস্যরূপে মনোনীত হইতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী কর্মচারী বা হাইকোর্টের উকিল। অধ্যাপকগণ ক্বচিৎ সভায় মনোনীত হইতেন; অনেক বড় বড় নামজাদা অধ্যাপক কখনো সিনেটের সভ্য হইতে পারেন নাই। শিক্ষা বা শিক্ষকতার সহিত সম্বন্ধ নাই, এমন লোকের সংখ্যা সিনেটে অধিক ছিল; তাঁহারা নূতন নূতন বিধি ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ও সকল প্রকার উদারনীতির পরম শত্রু ছিলেন।

১৯০৪ সালের য়ুনিভার্সিটি অ্যাক্ট অনুসারে সরকারী বেসরকারী সকল কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা হইল। সিনেটের সভ্য সংখ্যা একশত করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৮০ জনই সরকারী মনোনীত; ১০জন রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট্ (বি. এ. পাশ করিয়া পাঁচ বৎসর পরে যে কেহ বার্ষিক দশ টাকা দিলেই রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট্ হইতে পারেন) কর্তৃক নির্বাচিত ও ১০ জন বিভিন্ন শিক্ষার ফ্যাকালটী হইতে নির্বাচিত হন। এত বড় সমিতিতে কোনো কাজ করা কঠিন; সেইজন্য ইহাদের মধ্য হইতে ১৫ জন সভ্যকে নির্বাচন করিয়া একটি কার্য্য-নির্বাহক সভা বা সিণ্ডিকেট গঠিত হইয়াছে। এই সিণ্ডিকেটে কলেজের ৭ জন অধ্যাপক থাকেন। কোনো প্রস্তাব সিনেট হইতে উঠিয়া সিণ্ডিকেটে পাস্ হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদনের জন্য যায়। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পাস্ না হইলে কোনো প্রস্তাব কার্য্যকরী হইতে পারে না। পূর্ব হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অনেক পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে। ১৯০৪ সালে

১৯০৪
য়ুনিভার্সিটি অ্যাক্ট

বড়লাটের সভায় মহামতি গোখলে য়ুনিভার্সিটিকেও সরকারী বিভাগের অন্তর্গত করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জনের সময়ে এই আইন মোটেই লোকপ্রিয় হয় নাই। কিন্তু এখন সকলেই দেখিতেছেন যে ইহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যদা অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। বর্তমানের পর্য্যবেক্ষণ ও তদারকের ফলে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা দুইই উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্বে সরকারী স্কুল কলেজে লাইব্রেরী, লাব্রোটারী, অধ্যাপক, শিক্ষক, বাড়ীঘর, স্বাস্থ্য, ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা সম্বন্ধে কোনোই বাঁধাবাঁধি ছিল না। যেসব নিয়ম ছিল তাহা পালন হইতেছে কিনা তাহা কেহই দেখিত না বা জানিত না; বর্তমানে এই সমস্ত বিষয়ে কড়াকড়ি হইয়াছে; এক্ষণে লাব্রোটারীতে পরীক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান পড়ানো সম্ভব হয় না, উপযুক্ত গ্রন্থাগার রাখিতে হয়। এই সব কারণে খরচ বাড়িয়া গিয়াছে ছাত্রদেরও বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে বেসরকারী স্কুল কলেজগুলি স্বত্বাধিকারীগণের সাধারণত একটি কারবার ছিল। এখনো যে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় নাই তাহা নহে; তবে নূতন আইনের ফলে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

নূতন অ্যাক্টের ফলে শিক্ষার উন্নতি

১৯১৩ সালে গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি করিবেন বলিয়া মনস্থ করেন। কলেজ ও স্কুলগুলির সংলগ্ন হোষ্টেল বা ছাত্রাবাস রাখিবার ব্যবস্থা, প্রাথমিক পাঠশালার সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া জনশিক্ষার প্রসার করিবার ইচ্ছা করেন। পাঠশালার গৃহাদির উন্নতি ও শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি সাধু কর্মানুষ্ঠানে তাঁহারা মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু পর বৎসরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে সরকারের অনেক সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইল না।

১৮৫৭ সালে ভারতের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ব

বিত্থালয়—স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ হইতে ১৮৮৭ সালের মধ্যে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর ও এলাহাবাদ এই চারিটি নূতন বিশ্ববিত্থালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৪ সালের য়ুনিভার্সিটি অ্যাক্ট অনুসারে এই সব বিশ্ববিত্থালয়গুলি একভাবে গঠিত ও নিয়মিত হয়। সে-সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এই পাঁচটি বিশ্ববিত্থালয়ের প্রধান কাজ ছিল কতকগুলি সরকারী, বেসরকারী, স্থানীয় বা মফঃস্বলের কলেজের উপর সামান্য একটু খবরদারী করা ও ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও উপাধি বিতরণ ইত্যাদি কার্য্য। কোন বিশ্ববিত্থালয়ের অধীনে কতগুলি কলেজ থাকিবে, ছাত্র থাকিবে সে-সম্বন্ধে কোনো বিধি ছিল না। ১৮৮৭ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একটিও বিশ্ববিত্থালয় বাড়িল না; ১৯১৭ সালে ভারতের পাঁচটি বিশ্ববিত্থালয়ের সংযুক্ত কলেজের সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছিল তাহা নিম্নে দিতেছি।

বিশ্ববিত্থালয় ও পরীক্ষা

কলিকাতার	অধীন	৫৮	কলেজ
বোম্বাই	"	১৭	"
মান্দ্রাজ	"	৫৩	"
পঞ্জাব	"	২৪	"
এলাহাবাদ	"	৩৩	"

বিশ্ববিত্থালয় বলিতে কোনো বিত্থাকেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল না। পরীক্ষা করাই ছিল য়ুনিভার্সিটিগুলির প্রধানতম কাজ। ১৯০৮ সালে কলিকাতার বিশ্ববিত্থালয় স্বয়ং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার ভার লইলেন; ভারতীয় বিশ্ববিত্থালয়গুলির নূতন দিক খুলিয়া গেল, ; ইহার উদ্যোক্তা প্রাতঃস্মরণীয় স্তর আশুতোষ। কিন্তু একটি বিশ্ববিত্থালয়ের কর্তৃপক্ষের পক্ষে এতগুলি কলেজে শিক্ষার আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে কিনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সুব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব। ১৯১৩ সালে ভারত

সরকার এ বিষয়ে পুনরায় মনোযোগ দিলেন ও পরীক্ষাকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সীমানা সীমাবদ্ধ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন; এছাড়া তাঁহারা প্রদেশে প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও বিলাতের অনুকরণে বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রদের বাসের ব্যবস্থা (Residential University) করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে উত্তরভারতে শিক্ষিত হিন্দুরা 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য ইহার প্রধান উদ্‌যোক্তা; তাঁহারই অদম্য কর্ম প্রচেষ্টার ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে। ১৯১৫ সালে তাঁহারা উপাধি দান করিবার অধিকার পাইলেন। ১৯১৭ সালে পাটনার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৬ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৮ সালে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

১৯১৭
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কমিশন

১৯১৭ সালে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি কমিশন বসে। ১৯১৯ সালে উহার প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল; ও ভারত সরকার বিচার করিয়া দেখিলেন ও কমিশনের আদর্শানুরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে ১৯২০ সালে ঢাকা, আলিগড় মুসলমান, রেঙ্গুন, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯২২ সালে দিল্লী, ১৯২৩ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত সরকার এদেশের উচ্চশিক্ষা ও বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়া য়ুনিভার্সিটি কমিশন বসান। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ইংলণ্ডের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন ভাইস্-চানসেলার স্যার মাইকেল স্যাডলার। সেই জন্য এই কমিশন স্যাডলার কমিশন নামেও খ্যাত। এই কমিশন দুই বৎসর কলিকাতা বাংলা ও ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে বহুলোকের

মৌখিক ও লিখিত মন্তব্য গ্রহণ করিয়া অনেক বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া দ্বাদশ খণ্ডে সুবৃহৎ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাঁহারা শিক্ষা, ছাত্র-জীবন, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য প্রাণালী পর্য্যালোচনা করিয়া সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নূতন পন্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম ইচ্ছা ঢাকায় খাশ বিদ্যালয় (Unitary Teaching university) স্থাপন; কলিকাতার কলেজগুলির মধ্যে আরও সংহতি; মফঃস্বল কলেজের জন্য একটি বিশেষ বোর্ড প্রতিষ্ঠা; কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন করিয়া 'পাণ্ডিত্য' কর্মের (academic) পরিচালন (Executive) কার্য্য পৃথক করিয়া দেওয়া। এছাড়া ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজ গুলিকে পৃথক্ করিয়া দিয়া তাহা পৃথক্ বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেওয়া। এই ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ডে সরকারের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক, কলেজের ও হাইস্কুলের লোক সদস্য থাকিবেন। এই বিভাগের পরিচালনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর না দিয়া সরকারী শিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত হইবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এইরূপ পৃথক্ ইণ্টারমিডেয়েট বোর্ড আছে। য়ুনিভারসিটি বি. এ. ও এম. এ. (বিজ্ঞান সমেত) অধ্যাপনার ভার লইয়াছেন।

১৯১১ সালে বঙ্গচ্ছেদ রদ হওয়াতে, ঢাকা পূর্ববঙ্গ-আসামের রাজধানী আর থাকিল না। ভারত সরকার এই সময়ে ঢাকায় একটি খাশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরে একটি কমিটি বসে; এই কমিটি (Nathan Committee) শিক্ষা সম্বন্ধে একটি আদর্শ খশড়া করেন। ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে ইসলাম সংস্কৃতি (Culture) আলোচনার ব্যবস্থা হইবে স্থির হয়; ছাত্রদের শারীরিক উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবার কথা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় একপ্রকার সরকারী জিনিষের ন্যায় চলিবে, তবে আভ্যন্তরীন ব্যবস্থার জন্য কোর্ট (Executive

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Committee, Academic Council) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। স্থির হইল যে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। এমন সময় যুদ্ধ বধিল। সরকারের শুভ ইচ্ছা বন্ধ হইয়া গেল। ১৯২০ সালে উহা খোলা হইল। জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজ লইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা হইতে রাজধানী উঠিয়া যাওয়াতে সরকারী সমস্ত ইমারত, জমিজমা বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়াছে।

স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহারই আদর্শে পরে অনেকগুলি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। নূতন য়ুনিভার্সিটি পরিচালনার জন্য তিনটি সভা আছে—যথা (১) কোর্ট বা সাধারণ সভা; ইহা একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান; নানা সম্প্রদায়, নানা শ্রেণী হইতে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য দ্বারা গঠিত; (২) কার্য্যাধ্যক্ষ সভা (Executive Committee), অর্থ ও নিয়োগাদি ব্যাপার ব্যবস্থার জন্য; (৩) শিক্ষা পরিষদ বা Academic Council, ইহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পরীক্ষা, উপাধি বিতরণ প্রভৃতি যাবতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার ন্যস্ত।

হিন্দু ও মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা যখন চলিতেছিল সেই সময়ে উত্তর ভারতে কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড়ে মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হয়। অনেক বাদানুবাদের পর অবশেষে ভারত সরকার এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। হিন্দুধর্মের কেন্দ্র কাশীতে শ্রীমতী বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত 'সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ'কে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড়ে সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত 'এংগ্লো ওরিয়েণ্টাল কলেজ'কে কেন্দ্র করিয়া মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় য়ুনিভার্সিটিই ভারত সরকারের

সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, অন্যান্য য়ুনিভার্সিটির ন্যায় প্রাদেশিক শাসন বিভাগের অধীন নহে।

ব্রহ্মদেশে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এযাবৎকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত উহা যুক্ত ছিল। ১৯২০সাল হইতে এইখানে পৃথক য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে সাহিত্য বিজ্ঞান, অধ্যাপনা, আইন, ইঞ্জিনীয়ারিং, বনতত্ত্ব চিকিৎসা, সুকুমার শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিত হইতেছে। বর্মনদের মধ্যে জাতীয়তার নব চেতনা আসিয়াছে এবং তাহারা পাশ্চত্য শিক্ষা অতিদ্রুত গ্রহণ ও অনুকরণ করিতেছে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তপ্রদেশের অযোধায় ১৯২০ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত। তদনন্তীন গভর্ণর হারকোর্টে বাটলার সাহেবের চেষ্টায় তালুকদার ও রাজারা তের লক্ষ টাকার উপর উঠাইয়া দেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার আদর্শে গঠিত। তথায় একটি সাধারণ কলেজ, একটি মেডিক্যল কলেজ ও একটি নারী কলেজ আছে। বাণিজ্য ও আইন শিক্ষার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুসারে এলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটি ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সংস্কার সাধন করেন। এলাহাবাদ সহরের মধ্যে ইহার ব্যবস্থা ঢাকা, লক্ষ্ণৌএর মত ; কিন্তু ইহা আবার কলিকাতার মত পরীক্ষাও গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার তত্ত্বাবধানে যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-ভারত ও মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতনার কলেজগুলি আছে।

ঢাকা, লক্ষ্ণৌ, রেঙ্গুন ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুসারে অল্প বিস্তর সংগঠিত ; বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে বি. এ. হইতে উর্দ্ধতন শিক্ষার ভার পড়িয়াছে। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলি পৃথক একটি বোর্ডের হাতে দিয়া সরকারী তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থার অধীন ফেলা হইয়াছে।

পাটনা, দিল্লী, নাগপুর, প্রভৃতি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলি ছাড়া দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদের নিজাম ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ওসমানিয়ার বিশেষত্ব এই যে সেখানে যাবতীয় অধ্যাপনা উর্দুর সাহায্যে হয়; নিজাম বড় বড় পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি উর্দুতে ভাষান্তরিত করাইতেছেন। দেশীয় ভাষার সাহায্যে য়ুরোপীয় বিজ্ঞান অধ্যাপনা করা যায় তাহা ওসমানিয়া দেখাইতেছে। তবে হায়দ্রাবাদের অধিবাসীর শতকরা ৯০ জন হিন্দু ও তেলেগু তামিলভাষাভাষী। অতি অল্প সংখ্যক লোকই মুসলমান ও উর্দুভাষাভাষী।

মহীশূররাজ তাঁহার রাজ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনেক করিতেছেন। কর্ণাট ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। মান্দ্রাজের মধ্যে তামিল, তেলেগু, মালয়লাম ভাষা প্রধান। তেলেগু জাতির মধ্যে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত বহুকাল হইতে চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত সরকার এ বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। বর্তমানে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি সরকার দিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে মহারাষ্ট্রেদের, গুজরাটিদের ও সিন্ধিদের তিনটি পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় অনায়াসে হইতে পারে; কিন্তু সে-বিষয়ে অধিবাসীদের উৎসাহ নিতান্ত অল্প। বোম্বাই য়ুনিভার্সিটির প্রধান কাজ পরীক্ষা গ্রহণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ অধ্যাপনার কার্য্য অতি সামান্য, কেবল মাত্র সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি ব্যতীত আর কিছুই য়ুনিভার্সিটি পড়ান না; সমস্ত অধ্যাপনা কলেজ সমূহের উপর ন্যস্ত

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণ ছাড়িয়া আরবী, সংস্কৃত, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষাভার স্বয়ং গ্রহণ

করিয়াছে। পরীক্ষা গ্রহণই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কার্য্য এ ধারণা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে উচ্চশিক্ষা প্রদান বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমনটি করিয়াছে, এমনটি ভারতের কোথাও হয় নাই। সেইজন্য আমরা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

কলিকাতা বোম্বাই ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন ও ব্যবস্থাপদ্ধতি অনেকটা এক রকমের। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট ইহার স্থায়ী চানসেলার বা সভাপতি ও গভর্ণর ইহার রেক্টর বা পরিদর্শক। ভাইস-চান্‌সেলার সাধারণত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হইয়া থাকেন। সিনেটের সভ্য সংখ্যা ১০০। এই সভ্যদের মধ্য হইতে ১৫ জনকে লইয়া একটি কার্য্যনির্বাহক সভা গঠিত আছে; ইহার নাম সিণ্ডিকেট। ভাইস-চানসেলার সিনেটের অধিবেশনে সভাপতির কাজ করেন ও প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কাজের জন্য তিনি দায়ী। সিনেট কর্তৃক নিযুক্ত সম্পাদককে রেজিষ্ট্রার বলে।

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির খাশ তত্ত্বাবধানে একটি আইন-কলেজ ও সায়েন্স বা বিজ্ঞান কলেজ আছে। এছাড়া কলিকাতাস্থিত যাবতীয় এম্. এ. পড়াইবার ভার এখন য়ুনিভার্সিটি স্বয়ং লইয়াছে। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত প্রোফেসারশিপগুলি আছে—(১) আইনের প্রসন্নকুমার ঠাকুর-অধ্যাপক (২) অর্থনীতির মিণ্টো-প্রোফেসার (৩) দর্শনের পঞ্চম্ জর্জ-অধ্যাপক (৪) উচ্চগণিতের হার্ডিংঞ্জ-প্রোফেসার (৫) ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের কারমাইকেল-প্রোফেসার (৬) রসায়ন ও জড় বিজ্ঞানের পালিত-প্রোফেসর (৭) গণিত ও জড়বিজ্ঞানের, রসায়ন, ও উদ্ভিদ বিদ্যায় রাসবিহারী ঘোষ-প্রোফেসর (৮) ইংরাজীর

দুটি প্রোফেসর। কয়রার রাজা কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ ৫½ লক্ষ টাকা দিয়া ভারতীয় শিল্প, শব্দতত্ত্ব, ফিজিক্স রসায়ন ও কৃষিসম্বন্ধে ৫টি আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় খনির কাজ শিখাইবার জন্য জমি ও অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এছাড়া অনেক সহকারী অধ্যাপক, লেক্‌চারার, রীডার আছেন।

গত পনের বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষায় যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে, এখানকার কৃত অধ্যাপকগণ দেশে বিদেশে মৌলিক গবেষণায় যেরূপ নাম করিয়াছেন, ভারতের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ করিতে পারে নাই।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য ও য়ুনিভার্সিটির উন্নতির জন্য স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বাঙালী চিরদিন ঋণী থাকিবে। তাঁহার আট বৎসর কাল ভাইস-চান্‌সেলারীর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থই বিশ্ববিদ্যার কেন্দ্র হইয়াছে। য়ুনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপকগণ অনেক সময়, সুযোগ ও উৎসাহ পাইয়া নানা বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। এম্‌. এ. তে বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার এত আদর ইতিপূর্বে হয় নাই। বহু গ্রন্থ ইঁহারা প্রকাশিত করিয়াছেন; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ও বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থরাজি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সহিত, ইহার প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত আশুতোষের অমর নাম যুক্ত।

মাতৃভাষা ব্যতীত আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওড়িয়া, আসামী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, তেলেগু, তামিল, কানাড়ী, মালায়লাম, সিংহলী, উর্দু, তিব্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ও গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ইতিহাস নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বহু নূতন নূতন বিষয় অধীত হইতেছে। ইহার ফলে অধ্যাপক

সংখ্যা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২১-২২ সালে য়ুনিভার্সিটিতে ১২৩৪ ছাত্র ছিল, তাহাদের ২৩৪ জন অধ্যাপক ছিল। ১৮৯ জন বিজ্ঞানের ছাত্রের জন্য ৫০ জন অধ্যাপক। কোনো কোনো বিষয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রসংখ্যা প্রায় সমান। এই সব কথা তুলিয়া সরকারী পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর খুব জুলুম চলিতেছে। স্যর আশুতোষের মৃত্যু হওয়াতে যদিও য়ুনিভার্সিটির অসুবিধা হইতেছে, তথাচ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের যে আদর্শ ও Tradition দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় কলিকাতা শ্রেষ্ঠস্থান রক্ষা করিতে পারিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আর একটি আন্দোলন চলিতেছে, সেটি হইতেছে দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন। ম্যাট্রিকুলেশনে ইংরাজী ছাড়া অন্য সকল বিষয় দেশীয় ভাষায় অধীত হইবার কথা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রস্তাবিত হয়। কলিকাতা ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে ইতিহাসাদি দেশীয় ভাষায় লিখিতে পারে। কলিকাতায় বর্তমানে বাংলা ভাষায় সমস্ত অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইতেছে। হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত বিষয়ই সর্বোচ্চ ক্লাস পর্য্যন্ত উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় সুতরাং বাংলার মধ্য দিয়া প্রবেশিকা কেন উচ্চতম শিক্ষাও দেওয়া যাইতে পারে।

সমগ্র বৃটীশ ভারতে ১৯২১-২২ সালে ১৫১টি ইংরাজী কলেজ ছিল ও তাহাতে ৪৫,২২৪ জন ছাত্র ছিল। মান্দ্রাজে ৩৯টি কলেজ ও বঙ্গদেশে ৩৬টি। ছাত্রসংখ্যা বঙ্গদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক ১৬,৯৪২ মান্দ্রাজে ইহার অর্দ্ধেক, যদিও কলেজ সংখ্যা তথায় অধিক।

ভারতীয় কলেজে ছাত্রদের বার্ষিক বেতন গড়ে ৮২॥০ টাকা। ইহা ছাড়াও ছাত্রদের অনেক ব্যয় হয়। সরকার গড়ে প্রত্যেক কলেজ ছাত্রের জন্য ১০৭॥০ টাকা ব্যয় করেন। সরকারী ও বেসরকারী কলেজে

ব্যয়ের তারতম্য অত্যন্ত অধিক। বাংলাদেশের সরকারী কলেজে ছাত্র পিছু ৩৭৫৲, সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে ১২৭৲, ও বেসরকারী কলেজে ৮৯৲ টাকা করিয়া ব্যয়িত হয়। এ প্রদেশের বেসরকারী কলেজে বি. এ. পাশ করিতে একটি ছেলেকে যেখানে বৎসরে ৪০০৲ লাগে, সরকারী কলেজে সেখানে ১৫০০৲ টাকা লাগে।

মধ্যশিক্ষা

কলেজ ও পাঠশালার মধ্যে তিনশ্রেণীর বিদ্যালয়কে মধ্যশিক্ষা (secondary) বলা হয়। সমগ্র বৃটীশ ভারতে ৮,১৫৩টি বিদ্যালয় আছে, ইহার মধ্যে ২,২৪৮টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ২,৮৬৪টি ও মধ্যবাংলা (হিন্দী ইত্যাদি) ৩,২৪৯টি। মধ্য বিদ্যালয় পাঁচ বৎসরে ১,১০০টি বাড়িয়াছে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা যদিও বাড়িয়াছে ছাত্রসংখ্যা অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ৫৬,০০০ কমিয়াছে। ২২৪৮ উচ্চ বিদ্যালয়ে গড়ে ছাত্রসংখ্যা ৩১২টি ছিল, কিন্তু উহা কমিয়া ১৯২১ সালে ২১৭ জন করিয়া গড়ে হইয়াছিল।

কাহাকে বলে

ইংরাজীশিক্ষা বিদ্যালয়ে ক্রমশই মহার্ঘ হইতেছে। বেতন বৃদ্ধি, পরীক্ষার ফী বৃদ্ধি, পুস্তকবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে ইহা ঘটিতেছে। কিন্তু লোক সন্তানগণকে শিক্ষিত বা চাকুরীক্ষম করিবার জন্য প্রাণান্ত হইয়াও এই ব্যয় ভারবহন করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বল্পবেতন প্রবাদগত। সরকারী বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট বেতন, ভবিষ্যতে উন্নতি, পেনশন প্রভৃতি আছে। কিন্তু বহুকাল যাবৎ বেসরকারী স্কুলগুলি প্রোপ্রাইটারদের অর্থাগমের একটি পন্থা মাত্র ছিল। শিক্ষকগণ অতি অল্প বেতনে কাজ করিতেন। এখনো সর্বত্র যে তাহার প্রতিকার হই-

আয় ব্যয়

য়াছে তাহা নহে। শিক্ষকগণকে এখন নির্দিষ্ট বেতন না দিতে পারিলে য়ুনিভার্সিটি এফিলিয়েট করেন না। অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয়ে এখন 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড' হওয়ায় শিক্ষকদের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ কিঞ্চিৎ মেঘমুক্ত হইয়াছে।

সরকারী বিদ্যালয় ব্যতীত বেসরকারী স্কুলসমূহে গভর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করেন। ইহাকে Grants-in aid বলে। গড়ে প্রত্যেক স্কুল বার্ষিক ১,৭৬১ টাকা করিয়া পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশের বিদ্যালয় সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইয়া থাকে, অর্থাৎ ৬,৬৯৮৲ এবং বঙ্গদেশ সর্বাপেক্ষা কম পাইয়া থাকে, অর্থাৎ ৭৫৬৲ টাকা। বঙ্গদেশ সরকারের কৃপাচক্ষে কেন পড়ে নাই বলা যায় না। অবশ্য সাহায্য-দান সম্বন্ধে সরকারের অতি বিস্তৃত নিয়মাবলী আছে।

মধ্যশিক্ষার মধ্যে যে তিনটি ভাগের কথা বলিয়াছি তাহা যে সকল প্রদেশের সকল স্কুলে একরূপ তাহা নহে। মধ্যবাঙলা বিদ্যালয় হইতে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, আবার মধ্যইংরাজী হইতে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার বাধা নাই। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রীতি অনুসৃত হয়। পরীক্ষা হইতেছে বিদ্যার একমাত্র মাপকাটি। ফলে বিদ্যালাভ অপেক্ষা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার দিকে ঝোঁক অধিক। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ না করিলে, কোনো কলেজে

ম্যাট্রিকুলেশন

বা উচ্চশ্রেণীর টেক্‌নিক্যাল স্কুলে বা চাকুরীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ১৯২১-২২ সালে ৪৫,১১৪ জন ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয় ও ইহাদের মধ্যে পাশ করে বা বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার সার্টিফিকেট (School learning certificate) পাইয়াছিল ২৯,৪৭২ জন। ইহার মধ্যে বাংলা দেশে ১৪,২০০ জন পাশ করিয়াছিল অর্থাৎ শতকরা ৭৮ জন। কিন্তু এই যে উনত্রিশ হাজার ছাত্র ম্যাট্রিক পাশ করিল ইহার মধ্যে প্রায়

অৰ্দ্ধেক ১৫,০০০ কলেজে ভর্তি হইয়াছিল; অবশিষ্ট অৰ্দ্ধেক উচ্চ শিক্ষার জন্য যায় নাই।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ছাত্রদের যথার্থ শক্তি ও চরিত্রের কোনো পরীক্ষা হয় না; বর্তমানে অনেক প্রদেশে সেইজন্য ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছে। School Leavning Certificate-এর ব্যবস্থা হইয়াছে; ইহাতে বালকের সর্বাঙ্গীন উন্নতি পরীক্ষিত হয়। কোনো বিষয়ে উত্তীর্ণ না হইলে তাহাকে এক বৎসর পুনরায় নষ্ট করিতে হয় না এবং সকল বিষয়ই পুনরায় পরীক্ষা দিতে হয় না। বহু প্রদেশ এই সব কারণে S. L. C. পছন্দ করিতেছে।

বর্তমানে দেশের মধ্যে শিক্ষার উপর অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি খুলিবার চেষ্টা এই অসন্তোষের অন্যতম কারণ। সর্বত্রই দেশীয় ভাষার প্রতি অত্যধিক জোর দেওয়া হইতেছে, হাতের কাজ শিখাইবার জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের মানসিক আবহাওয়ার উপযুক্ত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রি-কুলিশন শিক্ষার অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন; যেমন ইতিহাস ভূগোল বাধ্যতামূলক হইয়াছে; কৃষি, বাগিচা, সূত্রধরের কার্য্য, কর্মকার কর্ম, টাইপরাইটিং, হিসাব, শর্টহ্যাণ্ড, বয়ন, সীবন, সঙ্গীত, গৃহস্থালী, টেলিগ্রাফী, মোটরের কাজ প্রভৃতি বিষয় শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই সব শিক্ষা কিরূপভাবে ছাত্রেরা গ্রহণ করিবে, তাহা বিচার করিবার সময় এখনো আসে নাই।

নূতন ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতবর্ষে এককালে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পাঠশালা ছিল। এই পাঠশালাসমূহে সামান্য লেখাপড়া গণিত হিসাব শিক্ষা দেওয়া হইত।

তবে ইহার আয়োজন ও আসবাব অতি দীন রকমের ছিল। ১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আদেশানুযায়ী মিঃ আডাম বঙ্গদেশের গ্রামশিক্ষার অবস্থা তদন্ত করেন। তিনি চারি বৎসর দেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বাংলা শিক্ষার অবস্থা দেখিলেন ও সরকারকে এই সব পাঠশালায় সাহায্য দান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই সময়েই মেকলের ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছিল। দুইটি বিরুদ্ধ মতের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের দল জয়ী হইল। বাংলা শিক্ষা সেই হইতে কোণ ঠাসা হইয়াছে।

প্রথম অবস্থা

১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশনের পর হইতে প্রাথমিক পাঠশালাগুলিকে অধ্যাপনার 'ফল' দেখিয়া টাকা সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হয়; কিন্তু সরকারের টাকা তাহাতে ঘাটতি পড়ে, অবশেষে ১৯০১ সাল হইতে পাঠশালা-পণ্ডিতদের জন্য 'জীবনধারণের উপযোগী বেতনে'র ব্যবস্থা হয়।

ভারতের জনশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জনশিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতি পৃথিবীতে বড় হয় নাই। পৃথিবীর কয়েকটি জাতির জনশিক্ষার অবস্থা নিম্নে প্রদত্ত* হইতেছে; তাহা হইতে ভারতের শিক্ষার দুরবস্থা সহজেই বুঝা যাইবে।

ভারতের শিক্ষাভাব

মার্কিন দেশ শতকরা	১৯·৮৭	সিংহল	৮·৯৪
ইংলণ্ড ওয়েলস	১৬·৫২	রুমেনিয়া	৮·২১
জারমেন সাম্রাজ্য	১৬·৩০	রুশিয়া	৩·৭৭
ফ্রান্স	১৩·৯০	ব্রেজিল	২·৬১
জাপান	১৩·০৭	ভারতবর্ষ	২·৩৮

* Progress of Education in India 1912-17 p 4.

ষাট বৎসরের উপর হইল ভারতবর্ষ ইংরাজ পার্লামেণ্টের হাতে গিয়াছে। এই কয় বৎসরে শিক্ষার উন্নতি কিরূপ হইয়াছে তাহাই এখন দেখা যাক্।

ভারতে এখন ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। প্রাচীন পাঁচটি য়ুনিভার্সিটির সহিত ১৮৫টি কলেজ যুক্ত আছে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ২,২৪৮, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৬,৭৩৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৬০,০৭২।

শিক্ষা বিস্তার

১৯২১ সালে কলেজে ৪৪ হাজার ও সমস্ত পাঠশালায় স্কুলে ছাত্র ৭৫ লক্ষ ৪৯ হাজার বিদ্যার্থী পাঠ করিতেছিল।

এই সংখ্যাগুলি দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে ভারতের লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু ভারতের ৩১ কোটি লোকের তুলনায় যে ৭৬ লক্ষ লোক স্কুলকলেজ ও পাঠশালায় পড়িতেছে তাহা অধিক নহে। ১৯১১ সালে জনসংখ্যার শতকরা ৬০ জন লোক বা ছেলেদের মধ্যে ৫.৩% ও মেয়েদের ১% জন বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিল। স্কুলে যায় না বা স্কুলকলেজ ত্যাগ করিয়াছে এমন লোকও অনেক আছে। ইহাদের লইয়া ভারতের লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা ১৯২১এ পুরুষদের মধ্যে ছিল একশতের মধ্যে ১২.২ জন ও মেয়েদের মধ্যে ১.৮ জন—অর্থাৎ মেয়েদের প্রায় ৯৯ জন নিরক্ষর। বারজন পুরুষের জায়গায় একজন মাত্র মেয়ে লেখাপড়া জানে। ১৯২১ সালের আদমসুমারী অনুসারে সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৬ জন লোক লেখাপড়া জানিত।

শিক্ষার অনুপাত

ভারতবর্ষ শিক্ষা বিষয়ে জগতের সকলের নীচে। বিদেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই বুঝা যাইবে। ফিলিপাইনদ্বীপপুঞ্জ ত্রিশ বৎসর মার্কিনের অধীন হইয়াছে; ইহার মধ্যে সেখানে যে-প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহা খুবই বিস্ময়কর। জাপান অল্প

কয়েক বৎসরে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। ১৮৭২ সালে তাহাদের দেশে জনশিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়। ১৮৭৩ সালে শিক্ষা-উপযোগী ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ২৮ জন, ১৮৮৩ সালে ৫১ জন, ১৯০৪ সালে ৯৩ জন, ও ১৯১২-১৬ সালে ৯৮·২% জন বিদ্যালয়ে যাইত; কিন্তু ভারতে সে জায়গায় ১৮% জন মাত্র বিদ্যালয় শিক্ষা লাভ করিত। অর্থাৎ পনের বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের শতকরা ৮২ জন লেখাপড়া শিখিতেছে না, আর জাপানে সে-বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিরক্ষর কেহ নাই বলিলেই চলে। ভারতের ঐ বয়সের বালকদের মধ্যে ২৩ জন ও বালিকাদের মধ্যে ৩ জন মাত্র বিদ্যালয়ে যায়। এমন কি বড়োদা ও মহীশূর বৃটীশ ভারতের শিক্ষা হইতে আগাইয়া গিয়াছে।

শিক্ষার দুরবস্থা

ভারতবর্ষের এই মূঢ়তা দূর করিবার জন্য ১৯১০এ গোখলে বড় লাটের সভায় শিক্ষা বিষয়ক এক বিল উপস্থিত করেন। তিনি পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির সহিত ভারতের তুলনা করিয়া দেখান যে এই অজ্ঞানতা বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছাড়া দূর হইতে পারে না। ১৮৭০ সালে বিলাতে ও ১৮৭২ সালে জাপানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পর উভয় দেশ কি প্রকার উন্নতি করিয়াছে তাহা দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণ লোক বা সরকার তখন তাঁহার কোন যুক্তিই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু সুখের বিষয় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট উভয়েই মন দিয়াছেন এবং কোন কোন ম্যুন্সিপালিটির সীমানার মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বোম্বাই সর্বপ্রথমে এই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। অন্যত্রও সেই চেষ্টা চলিতেছে।

১৯২১-২২ সালে তৎপূর্বের পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৩,৩৫৬টি প্রাথমিক

বিদ্যালয় ও ৩,৪১,৭২৭ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বৃদ্ধির প্রথম কারণ স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাবিস্তার; দ্বিতীয় হইতেছে ভারতের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। রিফর্মের ফলে শিক্ষা ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে প্রাদেশিক শাসনবিভাগের হস্তে ও দেশীয় মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে অর্পিত হইয়াছে। নূতন শাসনে সংযুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের লোকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু শিক্ষার জন্য অর্থাভাবে জনশিক্ষা আশানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে না। ১৯২৩ সালে বোম্বাই শাসনবিভাগ সহরের প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

রিফর্ম ও শিক্ষা

এছাড়া এই জড় জাতির মধ্যে শিক্ষার জন্য উৎসাহ এখনো তেমন ভাবে দেখা দেয় নাই। বাংলাদেশে তিন হাজার পাঠশালা বাড়িয়াছে কিন্তু সেইখানে মাত্র পাঁচ হাজার ছাত্র বাড়িয়াছে। ভারতের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি সেইজন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচার সম্বন্ধে বিল পাশ করিতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বড়োদা সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচার করিয়া ভারতে নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। এক্ষণে নূতন অ্যাক্ট অনুসারে বহু প্রদেশের ম্যুন্সিপালটির মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচারের কথা হইয়া রহিয়াছে। বোম্বাইতে উহার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার কর্পোরেশন এ বিষয়ে চেষ্টা সুরু করিয়াছেন। বাধ্যতামূলক শিক্ষা না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলি যত ছাত্র লইয়া আরম্ভ করে চতুর্থ বৎসরে এক ষষ্ঠাংশও থাকে না। *

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সমগ্র বৃটীশ ভারতে ব্যয় হয় ৪,৮৩,৪৭,১১৪

(Indian Education 1922-23, p. 15).

টাকা ; ইহার মধ্যে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ সরকারী দান। সমগ্র দেশের পক্ষে এই ব্যয় অতি সামান্য। যদিও বৎসরে পাঠশালাপ্রতি ৩১৫ টাকা করিয়া ব্যয় সরকার হইতে করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ তথাচ বাংলা-দেশের পণ্ডিতদের দুর্দশা অতি শোচনীয়।

বয়স্কদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার কথা সরকার ভাবিতেছেন। বহুস্থলে বেসরকারী নৈশ বিদ্যালয়ে বয়স্কদের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

নারীশিক্ষা

ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার অবস্থা পুরুষশিক্ষা অপেক্ষা অধিক শোচনীয়। ১৯১৯ সালে ভারত সরকারের এক সার্কুলার হইতে জানা যায় সেই সময়ে বৃটীশ ভারতে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে শতকরা ০·৯ জন লেখাপড়া শিখিতেছিল, অর্থাৎ ৯৯ জন হিন্দু মেয়ে স্কুলে যাইত না। মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ১·১ জন শিক্ষাধীন ছিল। অপরদিকে প্রবাসী য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের মধ্যে ২৩ জন, দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে ৮·৩ জন ও পার্শীদের মধ্যে ১৪·৬ জন মেয়ে শিক্ষা পাইতেছিল।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে মতভেদ

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে দেশে উৎসাহ খুবই কম। যাহা আছে তাহা ভদ্রসমাজে আবদ্ধ; এবং সেখানেও প্রাথমিক শিক্ষার বাহিরে উচ্চশিক্ষার কথা অতি অল্প লোকই চিন্তা করেন। জেনানা শিক্ষার বন্দবস্ত কিছু কিছু হইয়াছে, তবে তাহা যে কৃতকার্য্য হইয়াছে বলা যায় না।

স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা। ১৯২১-২২ সালে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ১০টি নারীকলেজ, ৩০৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১,২০০ প্রাথমিক পাঠশালা ও বিশেষ শিক্ষালয় ১৩১, এই মোট ১,৬৪৪টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছিল। এই বিদ্যালয়-

গুলিতে ১,৩১,৩৮৭টি ছাত্রী ছিল। খৃষ্টানদের ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্য-সমাজ স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন। অধুনা সনাতন হিন্দু-দের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা সুরু হইয়াছে। মুসলমানেরাও আর পিছাইয়া নাই।

উচ্চশিক্ষা মেয়েদের প্রয়োজন একথা অভিভাবকেরা যে এখনো বুঝেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে সমগ্র ছাত্রীসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮৮ জন নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণীতে পাঠ করে, তাহার মধ্যে আবার শতকরা ৪০ জন ছাপার বই পড়িতে পারে না।

বেথুন কলেজ

উচ্চশিক্ষার জন্য ১৮৪৯ সালে কলিকাতাতে সর্বপ্রথম মহিলা বিদ্যালয় খোলা হয়। ইহাই বেথুন কলেজ। ১৯২২ সালে সমগ্র বৃটীশ ভারতে ১১৪টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৩৬টি বিদ্যালয় বাড়িয়াছে। কলেজের প্রতিবেদনে প্রকাশ যে মেয়েদের 'বাসে' স্থান হয় না, হোষ্টেলেও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। কিন্তু সমগ্র ভারতের নারীদিগকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখাইয়া বর্তমান জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞাত করাইবার দুরাশা কেহ রাখেন না। ভারতের নারীদিগকে দেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। সেইজন্য বোম্বাইতে মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯১৫ সালে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; শ্রীযুক্ত কারভে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। মারাঠী ভাষার মধ্য দিয়া উচ্চশিক্ষা দান করা হয়। মহারাষ্ট্রদেশে নারীশিক্ষার জন্য পুণার সেবা-সদন বিশেষভাবে দায়ী। বাংলাদেশে স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাস প্রতিষ্ঠিত ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডল ও শ্রীযুক্তা অমলা বসু (Lady J. C. Bose) প্রবর্তিত নারীশিক্ষা সমিতি বাংলার অন্তঃপুরে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে।

ভারতের নারীশিক্ষার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, একথা ভারতের

শিক্ষিত পুরুষেরা ধীরে ধীরে বুঝিতেছেন ; তাঁহারা আরও বুঝিতেছেন যে একটি জাতির অর্দ্ধেক জনসংখ্যা ও ভবিষ্যত জাতির জননীরা নিরক্ষর থাকিলে জাতির কল্যাণ হইবে না, জাতির মর্য্যাদাও রক্ষিত হইবে না।

বৃত্তি শিক্ষা

সাধারণ লেখাপড়া স্কুলকলেজে শিখিয়া অধিকাংশ লোকই কোনো না কোনো বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করে। এই সকল বৃত্তিতে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন বৃত্তির শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন গুণ থাকা চাই। নিম্নে আমরা কতকগুলি পেশা ও তাহার শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বিবৃত করিতেছি।

শিক্ষক বিদ্যালয়

১। শিক্ষকের শিক্ষা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে শিক্ষপদ্ধতি শিখিবার জন্য নানাস্থানে বিদ্যালয় ও কলেজ আছে। যথা (ক) প্রাথমিক শিক্ষালয়ের জন্য গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়। (খ) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য ট্রেনিং কলেজ বা স্কুল আছে। (গ) ড্রয়িং শিক্ষক, নর্মাল শিক্ষক, কৃষি শিক্ষক প্রভৃতির জন্য বিদ্যালয় আছে। দুঃখের বিষয় সরকারের অর্থের অনটন হইলেই প্রথম ছাঁট পড়ে শিক্ষা বিভাগের উপর এবং তাহার মধ্যে অবশেষে বাদ পড়ে শিক্ষক-স্কুল ও কলেজগুলি।

আইন শিক্ষা

২। আইন শিক্ষা। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আইন কলেজ আছে। ১৯২১ সালে ২১টি কলেজে আইন অধ্যাপিত হইত। বি. এ. পাশ না করিলে কেহ আইন পড়িতে পারে না। তবে মুক্তিয়ার হইতে হইলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হইলেই চলে। ওকালতীর জন্য ছাত্রসংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২২ সালে ভারতে ১,২৫৫ জন উকীল হন।

এইরূপ অনুপাতে প্রতি বৎসর পাশ হইতেছে। ওকালতীর ক্লাসগুলি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আয়ের একটি বিস্তৃত পথ।

৩। চিকিৎসা বিদ্যালয়। ভারতে ছয়টি মেডিক্যাল কলেজ আছে। কলিকাতা (২টি), বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী (মহিলাদের)। মেডিক্যাল স্কুল মাত্র ১৫টি আছে। এতবড় মহাদেশতুল্য দেশের পক্ষে এই কয়টি চিকিৎসা বিদ্যালয় অতি সামান্য।

চিকিৎসা শিক্ষা

তা ছাড়া পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষভাবে এলোপাথী সরকারী সাহায্য ও উপাধি বিতরণের অধিকার পাইয়াছে। দেশের আয়ুর্বেদ সরকারের গ্রাহ্যের মধ্যে আসে নাই। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ। এ ছাড়া বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত। School of Tropical Medicine কয়েক বৎসর মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৪। ভারতবর্ষে ইঞ্জিনীয়ারিং অতি সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে। এদেশে

ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা

পাঁচটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজ আছে—যেমন শিবপুর, রুরকী, পুণা, গুইণ্ডী (মান্দ্রাজ), কাশী। এছাড়া অনেকগুলি ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয় আছে ; রেলওয়ে কারখানায় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাতা প্রতিষ্ঠিত জামসেদপুরের লৌহকারখানার সঙ্গে একটি Technological Institute আছে। ভারতের নানা প্রাদেশিক সরকার ইহার পোষণের জন্য কিছু অর্থ দেন। প্রত্যেক ছাত্র ৬০৲ টাকা করিয়া মাসহারা পায় ; তিন বৎসর পরে তাতা কোম্পানীতে ২০০৲ টাকা মাহিনার চাকুরী পায়।

ভারতে বহু প্রকারের ধাতু আছে। অথচ কোথায় একটি উল্লেখ-যোগ্য খনি-বিদ্যালয় (Mining Engineering) নাই। ঝরিয়া ও সিজুয়াতে সামান্য কয়লাখনির কাজ শিখানোর মত স্কুল আছে।

ভারতের খনি তাহার প্রধান ঐশ্বর্য্য। অথচ সে-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় ভারতে নাই।

৫। ভারতের শিক্ষিত যুবকদের কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ১৩টি বিদ্যালয় আছে। এছাড়া প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া কৃষি কলেজ আছে। পুণা, লায়লপুর (পঞ্জাব), কাণপুর, কোয়েমবটার (মান্দ্রাজ), নাগপুর, ঢাকা। বিহারের সাবুর কলেজ ছাত্রাভাবে ও উৎসাহের অভাবে ১৯২০ সালে উঠিয়া গিয়াছে। বিহারের পুসা হইতেছে কৃষিসম্বন্ধে গবেষণা করিবার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এখানে অন্যান্য প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষি ছাত্রগণ গবেষণা করিবার জন্য যাইতে পান। এখানে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক মতানুসারে গবেষণা হইতেছে। কৃষি শিক্ষা সরকারী কৃষি বিভাগের অন্তর্গত হইলেও, কয়েকটি কলেজ য়ুনিভার্সিটি উপাধি পাইয়া থাকেন।

কৃষি শিক্ষা

কিছুকাল হইতে গ্রামে কৃষি শিক্ষার জন্য চেষ্টা হইতেছে। তবে অর্থাভাব ও বিশেষ নির্দিষ্ট পথ আবিষ্কৃত না হওয়ায় কৃষি শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। মার্কিণ রাজ্যে কৃষি শিক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা, যেসব আয়োজন হইতেছে, তাহা ভারত সরকারের ও ভারতবাসীদের কল্পনার অগোচর। সুতরাং তুলনা নিষ্প্রয়োজন।

৬। বন-বিভাগের জন্য দেরাদুনে একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণা বিদ্যালয় আছে। সেখানে একটি বিদ্যালয়ও আছে। ইহা ছাড়া কোয়েমবেটর (মান্দ্রাজ) একটি বিদ্যালয় আছে।

৭। পশু চিকিৎসা শিক্ষা দিবার জন্য লাহোর, পারেল (বোম্বাই), বেলগাছিয়া (কলিকাতা), ভেপেরীতে (মান্দ্রাজ) বিদ্যালয় আছে। কয়েক বৎসর হইল মুক্তেসর নামক একটি স্থানে Imperial Bacteriological Laboratory স্থাপিত হইয়াছে।

শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা

১। এ দেশের য়ুনিভার্সিটিগুলি ছাত্রদের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার বন্দোবস্ত তেমনভাবে করেন নাই বলিয়া দেশের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বহুবার অভিযোগ হইয়াছে। শিক্ষা পাইয়াও ছাত্রগণ নিরন্ন থাকে ইহার প্রতিকারের জন্য বারবার আন্দোলন হই-য়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিরুদ্ধে ১৯০৫ ও ১৯২১ সালে যে রাজ-নৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে আর্থিক কারণ ছিল বেশী। কারণ জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের অর্থকরী শিল্পবিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা লোপ পাইয়া Technical শিক্ষা বা বাণিজ্য শিক্ষাই প্রধান হইয়াছে। স্যাডলার কমিশন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন ও বলেন যে শিল্পশিক্ষা স্কুলপ্রভৃতিতে বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার পরে ও বিশেষভাবে নন-কো-অপারেশনের পরে অনেক বিদ্যালয়ে বয়ন, সীবন, সূত্রধর-কর্ম প্রভৃতি প্রবর্তিত হই-য়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন ম্যাট্রিকুলেশন নিয়মের মধ্যে বিবিধ শিল্পকলা অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা

১৯২১ সাল পর্য্যন্ত উচ্চাঙ্গের শিল্পশিক্ষার জন্য ভারত সরকার দশজন করিয়া ছাত্রকে বিদেশে পাঠাইতেন। উক্ত বৎসর হইতে ভার-তীয় ও প্রাদেশিক ধনভাণ্ডার পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু এই সময়ে বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা সম্বন্ধে এক কমিশন বসে (Lytton Commission)। তাঁহারা বলিলেন যে ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বিলাতে শিল্পশিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করা সম্ভব নহে।

ভারতে উচ্চ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার জন্য জামসেদজী তাতা বাঙ্গা-

লোরে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ দান করেন। এইখানে বহু কৃতি ছাত্র নানা বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করিতেছেন। কাণপুরে ১৯২০ সালে একটি Technological Institute স্থাপিত হয়। সেখানে ব্যবহারিক রসায়নের নানা কোঠায় গবেষণা হয়; যেমন চর্ম্ম, তৈল, রঙ্গ ইত্যাদি বিষয়।

বোম্বাইএর ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় সাধারণ শিল্প শিক্ষার কেন্দ্র। এছাড়া কলিকাতার Bengal Technical Institute উল্লেখযোগ্য। ইহা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা National Council of Educationএর দ্বারা পরিচালিত। তবে এখানে শিল্প শিক্ষা হয় না, ছাত্রগণ ইলেকট্রিক, মেকানিক্যাল প্রভৃতি ইঞ্জীনিয়ারিং বিষয়ে শিক্ষা পায়।

বৃটীশ ভারতবর্ষে ২৭৬টি নানা শ্রেণীর শিল্প ও টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় আছে।

২। গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত পাঁচটি আর্ট স্কুল আছে—কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ ও লাহোরে। বর্ত্তমানে দেশের মধ্যে আর্ট বা সুকুমার শিল্পের উন্নতির জন্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। বঙ্গদেশে চিত্রকলার নূতন আন্দোলন সমগ্র দেশে নূতন ভাবস্রোত আনয়ন করিয়াছে। বাংলাদেশের আর্ট স্কুলগুলি ও ভারত শিল্প সমিতি সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে।

আর্ট স্কুল

দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের চারিটি স্কুলে সরকারী সাহায্য মাত্র ৪৯ হাজার টাকা। অথচ ছাত্রসংখ্যায় অন্য সকল প্রদেশ হইতে বাঙলার আর্ট স্কুলগুলি অধিক। অথচ অন্যান্য প্রদেশ সরকারী অর্থ সাহায্য অধিক পাইয়া থাকে, পায় না বাংলাদেশের আর্ট।

৩। বাণিজ্য শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি ক্রমেই যাইতেছে। ১৯১৭ সালে সমগ্র ভারতে ৩টি কলেজ ও ৬৭টি স্কুল ছিল। পাঁচ বৎসরের

মধ্যে ৫টি কলেজ ও ১৩৪টি স্কুল হইয়াছে। সরকারী সাহায্য বার্ষিক প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা প্রাপ্য। কিন্তু দেশের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে ছাত্র বেতন হইতে দুই লক্ষের উপর টাকা উঠে।

বাণিজ্য বিদ্যালয়

বর্তমানে বোম্বাই, লক্ষ্নৌ, মহীশূর ও কলিকাতা বাণিজ্য বিষয়ে উপাধি দিতেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বোম্বাই বাণিজ্যপ্রধান নগরী। সেখানকার (Sydenham) সিডেনহাম কলেজ বহুকাল হইতে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ছাত্রেরা পান। গুজরাত বিদ্যাপীঠেও বাণিজ্য ক্লাসে ছাত্র অধিক।

বিশেষ শিক্ষা

আমরা এতক্ষণ যে শিক্ষার বর্ণনা করিলাম, তাহা সাধারণ লোকের শিক্ষা। কিন্তু কতকগুলি লোক বা জাতির জন্য সরকার নানা কারণে বিভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজার ছেলে ও আত্মীয়দের যে

রাজকুমার কলেজ

শিক্ষার প্রয়োজন তাহা সাধারণ শিক্ষা হইতে পৃথক্। সেইজন্য আজমীর, ইন্দোর, লাহোর, রাজকোট, রায়পুরে রাজকুমারদের জন্য বিদ্যালয় আছে। এই সব বিদ্যালয় সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় ধরণে চালিত হয় ও ইংলণ্ডের বড়লোকদের ছেলেদের শিক্ষাদর্শে শিক্ষাদান করা হয়।

প্রবাসী য়ুরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় ছাত্রদের জন্য সরকার বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষা এখন প্রাদেশিক ও দেশীয় মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু য়ুরোপীয়দের শিক্ষা সরকার নিজ

হাতে রাখিয়াছেন, ইহাকে Transferred বিষয়ের অন্তর্গত হইতে দেন নাই। সমগ্র ভারতে ৪৪৪টি বিদ্যালয় (কলেজ, স্কুল, প্রাথমিক পাঠশালা ইত্যাদি) আছে; ছাত্র-সংখ্যা ১৯২২ সালে ছিল ৪৪,৬৩৮। এই বিদ্যালয়গুলির জন্য ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়; ইহার মধ্যে সরকার দেন ৪৬ লক্ষ ৭০ হাজার। সাহেবরা বড়লোক বলিয়া তাহাদের ছাত্রেরা বেতন অধিক দেয়। তাহাদের শিক্ষার জন্য পাহাড়ে বিপুল আয়োজন আছে। য়ুরোপীয় ছাত্রদের পরীক্ষা, পাঠ্য সম্পূর্ণ পৃথক। দেশীয় ছাত্রদের সহিত তাহা-দিগকে কোনো পরীক্ষার প্রতিযোগিতা করিতে হয় না। তাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াও ভারতের ভাষা শিক্ষা করে না; ভারতের অর্থে পুষ্ট হইয়াও ভারতীয় ইতিহাস সাহিত্যের খোঁজ রাখে না বা কোনো প্রকার শ্রদ্ধা বহন করে না।

য়ুরোপীয় শিক্ষা

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে এদেশের কাজে কর্মে ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে বহু য়ুরোপীয়কে এদেশে আসিতে হইয়াছে। সাহেবদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইহাদের শিক্ষার ভার সরকারের উপর। দেশীয়দের সঙ্গে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা একত্র হইতে পারে না বলিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্ করা হইয়াছে। লর্ড লিটনের সময়ে এদেশীয় য়ুরোপীয়দের শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে অধিকাংশ বালক বালিকা ভীষণ অজ্ঞতার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছে। ১৮৮১ সালে য়ুরোপীয়দের শিক্ষা বিষয়ক এক আইন পাস হয় ও সেই সঙ্গে ইংরাজী ও স্কটীশ শিক্ষালয়ের আদর্শে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশেই সাহেবদের শিক্ষা পরিদর্শনের জন্য সরকারের বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। ১৯১৭ সালে বাংলাদেশে সাহেবী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯,৬৩৪। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৯টি। এই বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী তহবিল

য়ুরোপীয়দের জন্য ব্যয়

হইতে ৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়; ইহার মোট ব্যয় প্রায় ২৭½ লক্ষ টাকা। সরকারী খরচ মাথাপিছু ৮৮৲ পড়িত; বাংলাদেশের সাধারণের শিক্ষায় মাথাপিছু খরচ ৫৲ টাকারও কম পড়িত।

এই প্রভেদ রেলওয়ে বিভাগের শিক্ষাদানের মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি যে G. I. P. রেলওয়ে ২,১৬৬ জন য়ুরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষার জন্য কোম্পানী ৮৬,৯৮২ টাকা ব্যয় করেন ও ১ লক্ষ ১১ হাজার ভারতীয় কর্মচারী শ্রমজীবিদের শিক্ষার জন্য ১৩,৪৭৮৲ টাকা দান করেন। বলা বাহুল্য রেলওয়ে কোম্পানীর লাভের টাকা এদেশের লোকের নিকট হইতেই ওঠে, সে-ক্ষেত্রে ব্যয়ের অনুপাতটার মধ্যে একটু উদারতা প্রকাশ পাইলে শোভন হইত।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সরকার সবিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃটীশ ভারতের এক চতুর্থাংশ লোক মুসলমান। এই ছয় কোটি মুসলমানের মধ্যে ২০ লক্ষ মাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ করে। হিন্দুদের অপেক্ষা ইহারা বিদ্যাশিক্ষায় অনেক পশ্চাদপদ; তবে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের মধ্যে যে নব জাগরণ আসিয়াছে, তাহার ফলে বহুস্থানে বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মুসলমানদের মধ্যে উর্দু ভাষা প্রায় তাহাদের জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর ব্রহ্মদেশেও উর্দু প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এই ভাষাই তাহাদের প্রধানতম শিক্ষণীয় ভাষা।

মুসলমানদের শিক্ষা

সরকারও মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুসলমান ইন্‌সপেকটর ও মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ, ইসলামিয়া স্কুল ও কলেজ স্থাপন, বিশেষ জলপানীর ব্যবস্থা করিয়া মুসলমানদের মধ্যে আত্মশক্তি বোধ জাগ্রত করিতে সফল হইয়াছেন। প্রত্যেক প্রদেশেই মুসলমান

দের মধ্য হইতে বিশেষ নির্বাচন পদ্ধতি করায়ও মন্ত্রীদের মধ্যে মুসলমান নিয়োগের প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায়, খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে মুসলমান-দের শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে। ইহা খুবই শুভ চিহ্ন। ভারতের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের দুইটি প্রধান উপাদান, হিন্দু ও মুসলমান; ইহাদের মধ্যে মুসলমানেরা শিক্ষায় পিছাইয়া থাকিলে ভারতের জাতীয় জীবনে পূর্ণাঙ্গ হইবে না।

উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্যতীত ভারতের অন্ত্যজ হিন্দু ও আদিম জাতিদের শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই শিক্ষাদানের সুযোগ হিন্দুরা গ্রহণ করেন নাই; খৃষ্টান পাদরীরা অন্ত্যজ ও আদিম জাতির শিক্ষার ভার এক প্রকার লইয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় আজ অনেক নিরক্ষর জাতির জাতীয় সাহিত্য হইয়াছে—যেমন, খাশিয়া, সাঁওতাল, কোল, ভিল প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত অনেক স্বভাবত দুষ্ট (Criminal tribes) জাতির মধ্যে সরকার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এছাড়াও বালকদের সংশোধনাগার, ফাক্টরী বালকদের, মূক বধিরদের জন্য বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যে চলিতেছে। মোট কথা সকল শ্রেণীর লোকে যাহাতে শিক্ষা পায় তাহার আয়োজন সরকার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।

অন্ত্যজ ও আদিম জাতির শিক্ষা

শিক্ষা পরিচালন

সরকারের শিক্ষা বিভাগ পরিচালনার জন্য অতি বিস্তৃত ও জটিল যন্ত্র আছে।

রিফর্মের পূর্বে শিক্ষা ভারতীয় শাসনবিভাগের অধীন ছিল। রিফর্মের পর উহা প্রাদেশিক শাসনের অধীন ও দেশীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে

আসিয়াছে। আয়ব্যয় সমস্তই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার উপর অর্পিত হইয়াছে।

বড়লাট সভার একজন সদস্যের উপর তথাচ সমগ্র শিক্ষা বিভাগের ভার আছে। কিন্তু তথায় কাজ সামান্যই আছে। প্রাদেশিক শাসনের অধীন Director of Public Instruction আছেন, তিনি শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর কাজ করেন। সমগ্র শিক্ষাবিভাগ তাঁহার অধীন হইলেও য়ুনিভার্সিটির যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।

সরকারী শিক্ষাবিভাগের চাকুরী তিন ভাগে বিভক্ত :—(ক) ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিস (খ) প্রাদেশিক শিক্ষা সার্ভিস (গ) নিম্ন শিক্ষা সার্ভিস। (ক) ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসে কেবলমাত্র বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রদিগকেই কাজ দেওয়া হইত। প্রত্যেক প্রদেশে যে একজন শিক্ষা পরিচালক থাকেন তিনি এই সার্ভিসের লোক। এই পরিচালক স্থানীয় গভর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। তাঁহার অধীনে তিন শ্রেণীর শিক্ষাবিভাগের কর্মচারী আছেন যথা—(১) পরিদর্শক বা ইন্সপেক্টরগণ (২) সরকারী কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণ (৩) সরকারী হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টারগণ। বর্তমানে I. E. S. এ আর নূতন ভর্তি হইতেছে না ; কারণ শিক্ষা এখন প্রাদেশিক হইয়াছে।

শিক্ষা-বিভাগ ও চাকুরী

বিলাত হইতে আমদানী অধ্যাপকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৫০০৲ টাকা মাসিক বেতনে কাজ আরম্ভ করেন এবং বাৎসরিক ৫০৲ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া ১০০০৲ টাকা হয়। কোন কোন প্রদেশের শিক্ষা পরিচালকের বেতন মাসিক ২,৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। ১৮৯৬ সাল হইতে শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের জন্য বিশেষ উদ্বৃত্ত অর্থ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সরকার বলেন একমাত্র ডিরেক্টরের বেতন ব্যতীত আর কোনো বেতন তেমন লোভনীয় নহে বলিয়া ভারতের শিক্ষা

বিভাগে উপযুক্ত লোক আসিতেছে না। ১৯১৭ সালে এই সার্ভিসে ২৫৫ জন লোক ছিলেন। দশ বৎসর পূর্বে ১৯০৭ সালে ১৫৭ জন ছিল; ১৯১২ সালে ২১১ জনের মধ্যে ৩ জন মাত্র ভারতবাসী ছিল, কিন্তু বর্তমানে অনেক ভারতবাসী এই কার্য্য পাইতেছেন।

ভারতের যাবতীয় শিক্ষাবিভাগের ভার বড়লাটের অধ্যক্ষ সভায় একজন সদস্যের উপর ন্যস্ত। এক সময়ে স্যর শঙ্কর নায়ার এই সভ্য ছিলেন। সরকারের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর হওয়ায় তিনি কর্মত্যাগ করেন ও তাঁহার স্থানে মিঃ সাফি নামক জনৈক মুসলমান ব্যারিষ্টার মনোনীত হইয়াছিলেন। পরে নরসিংহ শর্মা ঐ কার্য্য করেন।

(খ) প্রাদেশিক শিক্ষাসার্ভিস। সরকারী স্কুলের হেডমাষ্টার, কলেজের প্রোফেসর, ইন্সপেক্টার প্রভৃতি এই সার্ভিসের অন্তর্গত। এই বিভাগে সাধারণত ভারতবাসীরা নিযুক্ত হন। ইহার মাসিক বেতন ২০০৲ হইতে ৭০০৲ টাকা।

(গ) নিম্নশিক্ষা সার্ভিস। ডেপুটি-ইন্সপেক্টর, সব-ইন্সপেক্টর, সরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার নিম্নতম বেতন ৪০৲ ও উচ্চতম বেতন ৪০০৲ টাকা।

শিক্ষা বিভাগে উত্তরোত্তর বিদেশী লোকের আমদানী দেশে আদৌ প্রীতিকর হইতেছে না। দাদাভাই নৌরজী প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বেই এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অনেক ইংরাজও এবিষয়ে বলিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন স্কুলকলেজে সাহেব ও দেশীয় অধ্যাপকগণের বেতন ও সম্মানের মধ্যে পার্থক্য, বিদেশী অধ্যাপকগণের স্থানীয় অবস্থাসম্বন্ধে অজ্ঞতা ও দেশের ইতিহাস ও ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশের ফলে যুবকদের মনে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। বহু অপ্রীতিকর ঘটনারও ইহা অন্যতম কারণ।

উপরিউক্ত বিদ্যালয়গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ বা সরকারের সহিত যুক্ত। কিন্তু এ ছাড়া ৩৪,০০০ বিদ্যালয় আছে যাহার সহিত সরকারের কোনোরূপ সম্বন্ধ ছিল না। এইসব বিদ্যালয়ে ৬ লক্ষ বিদ্যার্থী পাঠ করে। উচ্চশ্রেণীর ৮১৮টি আরবী বা ফার্শী বিদ্যালয় ও সংস্কৃত ৭৮০টি বিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া পাঠশালাও ৩৩ হাজারের উপর আছে। কিন্তু এককালে এই শ্রেণীর গ্রাম্য পাঠশালা, চতুষ্পাঠি, মকতব, মাদ্রাসা দেশময় ছিল। সরকারী সাহায্য ও উৎসাহাভাবে ইহাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। বর্ত্তমানে সংস্কৃত ও মুসলমানী প্রাচীন শিক্ষাও সরকারী সাহায্য পাইয়া শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

বে-সরকারী বিদ্যালয়

১৯০৫ সালের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ায় দেশে জাতীয় বিদ্যালয় বা "ন্যাশনাল স্কুল" স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছিল। সাধারণ বিদ্যা, তদুপরি ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা, ও সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতির কয়েকটি কার্য্য শিক্ষাদান ছিল জাতীয় শিক্ষা। রাজনৈতিক আন্দোলন ও অভিপ্রায়ের জন্য অধিকাংশ সময়ে এইসব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনা আশানুরূপ হইত না। ১৯০৫ সালের পর বহুস্থলে 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কোথায়ও তাহার চিহ্ন নাই। সরকার রাজনৈতিক কারণে এইসব বিদ্যালয়ের উপর খুবই চাপ দেন; তাহার ফলে ও দেশের লোকের উৎসাহের অভাবে বিদ্যালয়গুলি টিকিতে পারিল না। কলিকাতার ন্যাশনাল

জাতীয় শিক্ষালয়

কাউন্সিল এখন মাত্র 'বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট্' পরিচালন করিতেছেন।

পুনরায় ১৯১৭ সালে হোমরুল আন্দোলনের সময়ে শ্রীমতী আনি বেসান্ত ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি মান্দ্রাজে স্থাপন করেন; কিন্তু বহু আড়ম্বরের পর উহাও উঠিয়া গিয়াছে। পুনরায় ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ফলে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে গৌড়ীয় বিদ্যায়তন হইয়াছিল; এখন তাহাও নাই। গুজরাটে 'গুজরাত বিদ্যাপীট' ও কাশীতে 'কাশীবিদ্যাপীট' ও পাটনায় 'বিহার বিদ্যাপীট' চলিতেছে। প্রথম দুইটিতে প্রচুর অর্থ আছে বলিয়া চলিতেছে, জাতীয় শিক্ষার জন্য আকৃষ্ট হইয়া বালকগণ আসিতেছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদের ভবিষ্যত কিরূপ তাহা এক্ষণে বলা যায় না। তবে সেগুলি গবেষণার ক্ষেত্র হইলে ভারতের জ্ঞানোন্মেষে বিশেষ সহায়তা করিবে; সাধারণ বিদ্যালয়ভাবে টিকিবে কিনা সন্দেহ।

বর্তমান ভারতের নানা স্থানে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা নহে; পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। একটি হইতেছে আর্য্য-সমাজের হরিদ্বার-গুরুকুল ও অপরটি হইতেছে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। প্রথমটি ভারতের বৈদিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয়টি প্রাচীন ঔপনিষেদিক আদর্শে গঠিত। আর্য্য-সমাজের চেষ্টায় ভারতের নানাস্থানে 'গুরুকুল' স্থাপিত হইয়াছে; এখানকার ছাত্রেরা শিক্ষা সমাপনের পূর্বে গৃহে যাইতে পায় না।

গুরুকুল ও শান্তিনিকেতন

আর্য্যসমাজের বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুরা 'ঋষিকুল' স্থাপন করিয়াছেন; ইহারা অত্যন্ত আচারপরায়ণ। হিন্দুধর্ম বা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী নানা শ্রেণীর 'আশ্রম' ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে; বাংলাদেশের রাঁচীতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, চট্টগ্রামের জগতপুর আশ্রম, পাবনার 'সৎসঙ্গ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বেসরকারী শিক্ষালয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই বিদ্যালয় প্রাচীন ঔপনিষেদিক আদর্শে গঠিত করেন। কিন্তু ক্রমে উহাতে নানা মতবিশ্বাসী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি আসিয়াছে। উহা আর হিন্দু প্রতিষ্ঠান নাই, উহা ভারতের জাতীয় বিদ্যায়তন হইল।

বিশ্বভারতী

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে ছাত্র ও অধ্যাপক আনয়ন করিয়া ইহার সহিত বিশ্বের যোগ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিশ্বের সহিত যোগসূত্র বন্ধন হইলে দেশের প্রতি ও স্বধর্মের প্রতি যথাযথ যোগ সুদৃঢ় হয়। বিশ্বভারতীর প্রধান কাজ এই যোগস্থাপন; ভারতের প্রাচীন ও নবীন চিন্তা, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির যথার্থ মূল্য নিরূপণ ও দেশ বিদেশে তাহার প্রচার। এখানে নানা য়ুরোপীয় ভাষা ও জ্ঞানের সহিত সংস্কৃত, পালি, চীন, তিব্বতী, জাপানী প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

শান্তিনিকেতন হইতে দুই মাইল দূরে সুরুল শ্রীনিকেতনে গ্রামসংস্কারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই দুইটি প্রতিষ্ঠান একদিকে ভারতের চিত্তস্রোতের ও সংস্কৃতির (Culture) সহিত পশ্চিমের যোগ স্থাপন করিতেছে, অপরদিকে গ্রামের সমস্যা পূরণ করিবার জন্য, আর্থিক দিক হইতে স্বাধীন হইবার জন্য পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছে। পল্লীসংস্কারের আদর্শ ও 'ব্রতীবালক' গঠন প্রণালী বাংলার নানা জিলায় অনুসৃত হইতেছে।

শিক্ষা বিস্তার

সরকারী প্রতিবেদনে প্রকাশ যে প্রায় ৮০ লক্ষ ছাত্র বিদ্যালয়ে

পাঠ করিতেছে, কিন্তু যথার্থ অবস্থা আরও একটু তলাইয়া দেখিলে বড়ই শোচনীয় মনে হইবে। উপরিউক্ত সংখ্যার প্রায় শতকরা ৭৬ জন নিম্ন প্রাথমিকে পাঠ করে, এবং তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেক পাঠশালার পাঠ সমাপন করে না এবং কখনো লিখিতে পড়িতে শিখে না। কেবল সংখ্যার দ্বারা দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো ধারণা হয় না; ছাত্রগণ গড়ে কত বৎসর করিয়া পাঠ করিয়াছে তাহাই দেখিতে হয়।

প্রাদেশিক শিক্ষার অবস্থা

১৯২১—২২ সালে সমগ্র ভারত ও প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল দেখা যাক; নিম্নে আমরা জনসংখ্যার কি অনুপাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিল, তাহার তালিকা দান করিতেছি।

বৃটীশ ভারত	৬·৩৯	শতকরা	পঞ্জাব	৩·০৩	শতকরা
মাদ্রাস	৪·৩	„	বর্মা	৪·২৬	„
বোম্বাই	৫·০	„	বিহার-উড়িষ্যা	২·৩৮	„
বঙ্গদেশ	৪·০৫	„	মধ্যপ্রদেশ	২·৩৯	„
যুক্তপ্রদেশ	২·২৭	„	আসাম	২·৮৪	„

(Indian Year Book 1924, p. 334).

আদমসুমারী (Census) মতে সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার দশ হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৫৯ জন লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে। কোনো প্রকারে পড়িতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা অবশ্য বেশী। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই হিন্দু রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া থাকে, মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে কোরাণ পড়িতে পারে। কিন্তু

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা

তাহাদের শিক্ষা এমনই স্বল্প যে তাহাদিগকে নিরক্ষর ছাড়া কিছুই বলা যায় না। পুরুষ ও নারীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত বিসদৃশ। হাজার পুরুষের মধ্যে ১০৬ জন লিখিতে পড়িতে পারে

ও নারীদের মধ্যে হাজারের মধ্যে ৯৯০ জন নিরক্ষর। আমরা যদি পনের বৎসরের নীচের শিশুদের বাদ দিই তাহা হইলেও দেখি যে পনের বৎসরের উর্দ্ধ পুরুষদের ৮৬০ জন নিরক্ষর ও পনের বৎসরের উর্দ্ধ নারীদের ৯৮৭ জন নিরক্ষর। পৃথিবীর অন্য কোথায়ও এমন অজ্ঞতা নাই তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

প্রদেশানুযায়ী শিক্ষিতের অনুপাত

প্রদেশানুযায়ী এই সংখ্যাগুলি দেখিলে বুঝা যাইবে যে এক এক প্রদেশের অধিবাসীদের অজ্ঞতা কি ভয়ানক। বর্মা প্রদেশে বহুকাল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত থাকায় ও পরদাপ্রথা না থাকায় তথাকার অধিবাসীদের হাজার জনের মধ্যে ২২২ জন লিখিতে পড়িতে পারে। পনের বৎসরের উপর বয়স্কদের মধ্যে হাজারে ৩১৪ জন শিক্ষিত। হাজার জন পুরুষের মধ্যে ৩৭৬ জন ও হাজার জন মেয়ের মধ্যে ৬১ জন বর্মন লেখাপড়া জানে। ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে ও মাদ্রাজের হাজারে যথাক্রমে ৭৭ ও ৭৫ জন শিক্ষিত। বোম্বাই প্রায় ইহাদের মত। ইহার পরে আসাম, বিহার-উড়িষ্যা ও পঞ্জাব। সর্বনিম্নে যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৩ জন শিক্ষিত। বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে উড়িষ্যাতে এক হাজারে ৬৩ জন ও ছোটনাগপুরে ২৮ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে।

দেশীয় রাজ্যের শিক্ষার অবস্থা সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে বৃটীশ ভারত অপেক্ষা শোচনীয়। অর্থাৎ এক সহস্রে মাত্র ৭৯ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী লিখিতে পড়িতে জানে ও সেই স্থলে বৃটীশ ভারতে ১১৩ জন পুরুষ ও ১১ জন নারী শিক্ষিত। কোচিন, ত্রিবঙ্কুর ও বড়োদার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বৃটীশ-ভারত হইতে অনেক অগ্রসর হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কাশ্মীরের অবস্থা সর্বাপেক্ষা মন্দ, সেখানে এক হাজারে ৯৭৯ জন লিখিতে পড়িতে পারে না। ছোটনাগ্‌-

পুরের গড়জাত মহলে মাত্র ৬ জন এক হাজারে লিখিতে পড়িতে পারে।

ধর্মানুসারে ভারতের শিক্ষার অবস্থা কি এইবার দেখা যাক। ভারতে পার্শীরাই সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত; তাহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হাজারে ৭১১ জন শিক্ষিত:

ধর্মানুসারে শিক্ষিতের অনুপাত

পুরুষদের মধ্যে $\frac{8}{5}$ অংশ, নারীদের মধ্যে $\frac{3}{5}$ অংশ লিখিতে পড়িতে জানে। ইহাদের পরে জৈনদের মধ্যে শিক্ষা অধিক বিস্তৃত। জৈনেরা ব্যবসায়ী জাত। সেইজন্য শিক্ষালাভ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাদের পুরুষদের অর্দ্ধেক লিখিতে পড়িতে পারে, কিন্তু নারীদের মধ্যে শতকরা ৯৬ জন নিরক্ষর। ইহাদের পরেই বৌদ্ধদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক; প্রায় জৈনদের সমান। ভারতীয় খৃষ্টানদের অবস্থা অনুরূপ অর্থাৎ শতকরা ২২ জন শিক্ষিত; কিন্তু ইহাদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর শিক্ষার মধ্যে অত্যন্ত বেশী পার্থক্য নাই। তাহার কারণ খৃষ্টান নারীরা যথানিয়ম শিক্ষা পাইয়া থাকে, তাহাদিগের শিক্ষা অযত্ন করা হয় না। ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা হিন্দুদের সংখ্যার তুলনায় প্রায় তিন গুণ ও মুসলমানদের অপেক্ষা চারিগুণ অধিক। মোটকথা খৃষ্টানদের মধ্যে শিক্ষার আদর ও প্রচার অনেক অধিক।

ইহার পরেই শিখরা। প্রত্যেক ১৫ জন শিখের মধ্যে একজন শিক্ষিত। পুরুষদের মধ্যে প্রতি ১০জনে একজন ও নারীদের মধ্যে প্রতি ৭০ জনে একজন শিক্ষিত। হিন্দু পুরুষদের মধ্যে প্রতি সহস্রে ১০: জন ও নারীদের মধ্যে মাত্র ৮ জন শিক্ষিত। মুসলমানদের মধ্যে এক সহস্র পুরুষে ৬৯ জন ও এক সহস্র নারীতে মাত্র ৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। মুসলমানদের শিক্ষার এই অবস্থার কারণ এই যে মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরপশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে অধিক। উত্তরপশ্চিমে

সাধারণ শিক্ষাই পিছাইয়া আছে; পূর্ববঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় অন্ত্যজ জাতি হইতে গৃহীত। যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশে হিন্দু মুসলমানের প্রায় সমান দশা; কিন্তু সিন্ধু মুসলমান-প্রধান হইয়াও অত্যন্ত অজ্ঞতার মধ্যে পড়িয়া আছে।

১৯১১ হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে দশ বৎসরে ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৮ হারে বাড়িয়াছিল; লেখাপড়া জানা অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৮৩ লক্ষ। ইহার মধ্যে শিক্ষিত পুরুষদের সংখ্যা শতকরা ১৫ হারে বাড়িয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় শিক্ষিত নারীর সংখ্যা শতকরা ৬১ হারে বাড়িয়াছে। পনের বৎসরের উপর বয়স্কা নারীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা দশবৎসরে দ্বিগুণের উপর হইয়াছে।

ইংরাজী শিক্ষা

সমগ্র ভারতে ২৫ লক্ষ লোক ইংরাজী জানে অর্থাৎ প্রতি দশ হাজার পুরুষের মধ্যে ১৬০ জন ও দশ হাজার নারীর মধ্যে ১৮ জন ইংরাজী জানে। বাংলাদেশের প্রতি ৩০ জন পুরুষের মধ্যে একজন ও বোম্বাইতে ৪৩ জনের মধ্যে একজন ইংরাজী লিখিতে পড়িতে পারে। অন্যান্য প্রদেশে বাংলার মত ইংরাজী শিক্ষার উন্নতি হয় নাই।

বাংলাদেশের শিক্ষা

বাংলাদেশের জনশিক্ষা সরকারী বেসরকারী উভয়ের চেষ্টায় হইতেছে, তবে সরকার সমস্ত শিক্ষার কর্তা; তাঁহারা কোনো বিদ্যালয়কে গ্রাহ্য না করিলে সেখানে পৃথক্ শিক্ষা চলা সম্ভব হয় না। সেইজন্য যাবতীয় পাঠশালা, স্কুল, কলেজ এই বিরাট শিক্ষাযন্ত্রের সহিত কোনো না কোনো সূত্রে গ্রথিত আছে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি সাধারণত সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে; যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে না তাহাদের

উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার তাঁহারা রাখেন। বাংলাদেশে গভর্ণমেণ্ট কলেজের চেয়ে বেসরকারী কলেজের সংখ্যাই অধিক। কলিকাতা সহরে গভর্ণমেণ্ট তিনটি কলেজ চালাইতেছেন যথা, প্রেসিডেন্সি, বেথুন ও সংস্কৃত। কলিকাতার বাহিরে হুগলী, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রামে খাশ সরকারী কলেজ আছে। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বেথুন, লরেটো ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইডেন কলেজ আছে। শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ও ঢাকায় শিক্ষাকলেজ আছে। যাঁহারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন তাঁহারা এই দুই কলেজে পড়েন। এখান হইতে L. T. ও B. T. উপাধি দেওয়া হয়। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বাংলাভাষা পড়াইবার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়; তাহাদের শিক্ষার জন্য ৫টি বিভাগের কেন্দ্রে নর্মাল স্কুল আছে। এছাড়া আরও ১০৮টি গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ে পাঠশালার পণ্ডিতেরা শিক্ষা পাইয়া থাকেন। সমগ্র ভারতে ১৯২১-২২ সালে ৯২৬টি শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষনের বিদ্যালয় ছিল।

কলেজ ও উচ্চশিক্ষা

সাধারণ শিক্ষার জন্য বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর ব্যতীত প্রত্যেক জেলাতেই সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; এগুলি অন্য স্কুলের মডেল বা আদর্শস্বরূপ। কলিকাতাতে ছেলেদের জন্য চারিটি বিদ্যালয় আছে; ইহার মধ্যে হেয়ার ও হিন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত যুক্ত; সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন একটি স্কুল আছে।

সাধারণ সরকারী স্কুল

মেয়েদের জন্য সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কলিকাতায়, ঢাকায়, মৈমনসিংহে ও চট্টগ্রামে আছে। পশ্চিমবঙ্গে এক কলিকাতা ব্যতীত আর কোথায়ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের উপায় নাই। উত্তরবঙ্গেও কোথায় হাইস্কুল নাই। এই সব

নারীশিক্ষা

সরকারী মহিলা স্কুল ব্যতীত বেসরকারী যে কয়টি স্কুল আছে তাহা খৃষ্টান ও ব্রাহ্মগণের দ্বারা পরিচালিত যেমন দার্জিলিঙের মহারাণী স্কুল, কলিকাতার ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়, ভিকটোরিয়া, গোখলে মেমোরিয়েল, সখাবৎ মেমোরিয়াল, বীণাপাণি পর্দা উচ্চ স্কুল, ডাফ, সরেটো, ডাওসিসেন, যুনাইটেড মিশন প্রভৃতি বিদ্যালয় আছে।

গ্রামের পাঠশালাগুলি অধিকাংশ স্থানে লোকাল বা জেলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। সরকারী পরিদর্শকগণ দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

বাংলার অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ জাতির মধ্যে সরকার শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্বে এখানকার অন্ত্যজ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা ছিল না বলিলেই হয়। ১৯২৪ সালে এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,৫৯,৩৭৭; ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ হাজার। নমঃ-শূদ্রদের মধ্যে শিক্ষার বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়াছে। এছাড়া নেপালী, লেপচা, গারো, খাশিয়া, চাকমা, টিপরা, মগদের শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে। তবে এসব শিক্ষার ভার খৃষ্টান মিশনারীরা গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁহারা জীবন দিয়া ইহাদের শিক্ষা-দান ও সেবা করিতেছেন। হিন্দুরা ইহাদের শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হন নাই।

অন্ত্যজ শিক্ষা

বাংলাদেশের মুসলমানদের সংখ্যা সমস্ত জনসংখ্যায় অর্দ্ধেকের উপর। শিক্ষায় ইহারা খুবই পিছাইয়া ছিল; কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের মধ্যে যে নূতন প্রাণ আসিয়াছে, তাহার নিদর্শন শিক্ষা-ক্ষেত্রেও দেখা দিয়াছে। ১৯২৪ সালে ৭,৯১,৪৫১ মুসলমান ছাত্র ও ১,৬৯,৬৫০ জন ছাত্রী ছিল। হিন্দুদের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা অধিক ছিল, ৯,১৫,৬৬৪; কিন্তু হিন্দুছাত্রীর সংখ্যা

মুসলমান শিক্ষা

মুসলমানদের অপেক্ষা কম, ১,৩১,৩৩৮ জন মাত্র হিন্দু ছাত্রী। কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রামস্থিত মাদ্রাসা সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে ; সর্বশুদ্ধ ৩৭৪টি মাদ্রাসা আছে।

বঙ্গদেশে য়ুরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় ছাত্রদের জন্য ৬৪টি বিদ্যালয় আছে। তিনটি ব্যতীত সবগুলিই খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত।

ইঙ্গ-ভারতীয় শিক্ষা

স্কুলগুলিতে ১০,৫৭৪ জন ছাত্র আছে। বাংলা সরকার হইতে ৯,২৮,৭৮১৲ টাকা তাঁহারা পান। মোট ব্যয় হয় ৩৫ লক্ষের উপর। সরকার হইতে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য প্রায় একশত টাকা ব্যয়িত হয়। *

সরকারী ব্যয় ছাড়া ম্যুন্সিপালটিগুলি তাহাদের আয়ের কিয়দংশ লোকশিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাধ্য। এই টাকা সাধারণত পাঠশালা দিতে ব্যয়িত হয়। মেদিনীপুরের ম্যুন্সিপালটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও বর্দ্ধমান বরানগর ও চট্টগ্রামের ম্যুন্সিপালটি প্রত্যেকে একটি করিয়া হাইস্কুল চালান।

১৯২২ সালে বাংলা প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা :—

আর্টকলেজ	৩৬	উচ্চ ইংরাজীস্কুল	৮৮৭ + ২৫ †
আইনকলেজ	৯	প্রাথমিক	৩৫,৬২১ + ১২,১৬২ †
মোট ছাত্রসংখ্যা			১৮,৯০,৪৫৪ ‡

* Report on Public Instruction in Bengal 1923—24 p. p. 23—24 হইতে কশিয়া বাহির করা।

† ১৯১৭ হইতে ১৯২২ এর মধ্যে এই উচ্চ স্কুলগুলির বৃদ্ধি হইয়াছে।

‡ ১৯১৭ হইতে পাঁচ বৎসরে এক লাখের উপর ছাত্র কমিয়াছে। অসহযোগের ফলে অনেকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিল।

মেডিক্যাল	২	বিশেষ স্কুল	১,৩৩১
ইঞ্জীনীয়ারিং	১	বেসরকারী স্কুল	২,২৬৯
শিক্ষাকলেজ	৫		

বাংলাদেশের সরকারী শিক্ষার ভার একজন পরিচালকের (ডিরেক্টর) উপর ন্যস্ত। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুই জন সহকারী পরিচালক আছেন; ইহাদের মধ্যে একজন মুসলমান শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এছাড়াও টেক্‌নিক্যাল ও শিল্প-শিক্ষা পরিচালনের জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগে পাঁচজন ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক আছেন। বিভাগের আয়তন ও শিক্ষানুযায়ী প্রত্যেক ইন্সপেক্টরের কয়েকজন করিয়া সহকারী ইন্সপেক্টর সাহায্য করেন। ইঁহাদের সকলের উপর স্কুলের শিক্ষা তদারকের ভার।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন ডিষ্ট্রীক্ট ইন্সপেক্টর আছেন। তাঁহার অধীনে কয়েকজন অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সবইন্সপেক্টর কার্য্য করেন। আবার সবইন্সপেক্টরদের সাহায্য করিবার জন্য কোথাও সহকারী সব-ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক-পণ্ডিত ও মৌলবী আছেন। মোটের উপর শিক্ষা বিভাগে পরিদর্শকের সংখ্যা খুব বেশী। ইহাদের বেতনেই শিক্ষা বিভাগের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়।

পরিদর্শন

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা

ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির প্রথম অন্তরায় হইতেছে এখানকার শিক্ষার গলদ; পুঁথিবিদ্যা ও হাতের কাজের সঙ্গে একটা বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভদ্রলোকে হাতের কাজ করিতে অনিচ্ছুক; পুঁথির বিদ্যা পাইবার জন্য সকলে ধনেপ্রাণে মরিতেছেন। অপরদিকে শিল্পীরা

প্রাচীন বাঁধা পথে চলিতেছে—সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করাও তাহারা নিষ্প্রয়োজন মনে করে। ফলে পুঁথির বিদ্যা ও শিল্পীর কৌশল একত্র হইবার অবসর এদেশে কখনো পায় নাই। এখানকার শিক্ষিত লোকেরা অকেজো ও কাজের লোকেরা অশিক্ষিত।

ইংলণ্ড য়ুরোপ আমেরিকা ও জাপান যে আজ এত বড় হইয়াছে ইহার কারণ সেখানকার শিল্প-শিক্ষার দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বহুকাল পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে যে যে কারণে শিল্পোন্নতি হয় নাই তাহার কারণ এই—(ক) ভাল শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ শিক্ষক কলেজে পাশ করা, যথার্থ শিল্পের সহিত দেখা সাক্ষাত তাঁহাদের খুব কম; কারণ দেশে বড় শিল্পকারখানা খুব কম। (খ) ভাল ছাত্রের অভাব। শিল্পীদের ছেলেরা গ্রাম হইতে নড়ে না; সহরে বা নিজের কারখানায় বা দোকানে তাহারা কাজ করে—আজকালকার শিল্পবিদ্যালয়গুলির প্রতি তাহাদের খুব শ্রদ্ধা নাই। তা ছাড়া এসব বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করিতে হইলে যে গুণ বা পড়াশুনা থাকার আবশ্যক তাহা নিরনব্বই জনের থাকে না। ভদ্রলোকের ছেলে শিল্পবিদ্যালয়ে আসে বটে তবে সেখানেও পুঁথির বিদ্যাটুকু সে ভাল করিয়া শিখে; কারণ সে জানে হাতে করিয়া কোনো কাজ তাহাকে করিতে হইবে না। ফলে বর্তমানে শিল্প বিদ্যালয় বলিতে ছুতার ও কামারের কাজ দাঁড়াইয়াছে। এছাড়াও যে আরও শত প্রকারের শিল্প শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে সে কথা খুব কম লোকেই মনে করে। (গ) টেক্‌নিক্যাল স্কুল যে কৃতকার্য্য হইতেছে না ইহার প্রধান কারণ দেশে লোকশিক্ষা নাই; নিরক্ষর লোকদিগকে অক্ষরজ্ঞান দিয়া তারপর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দিতে সময় যায় অনেক।

পাশ্চাত্য দেশে বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়সমূহ খোলা হইয়াছিল—তা বৈ পূর্বে বিদ্যালয় খুলিয়া পরে শিল্পোন্নতির চেষ্টা হয় নাই। দেশে শিল্প নাই বলিলে হয়; এ অবস্থায়

কাহারও শিল্প ও কারীগরী শিখিবার কোনো তাগিদ থাকে না। যাহারা বিদেশ হইতে শিল্প শিখিয়া আসিয়াছিলেন সুযোগ না পাইয়া কেহ কেহ বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছেন কেহবা দেশে আসিয়া চাকুরী করিতেছেন।

বিলাতে ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ১৪।১৬ বৎসর (কোনো স্থানে ১৮ পর্য্যন্ত) পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিতে লোকে বাধ্য; তারপরেও যাহাতে তাহারা লেখাপড়ার চর্চা করে—শিল্পকর্ম শিক্ষা করে এজন্য নৈশ বিদ্যালয় আছে। যে-লোক দিনের বেলায় সামান্য কাজ করে সন্ধ্যার পর সে নৈশবিদ্যালয়ে ইচ্ছা করিলে যে-কোনো বিষয় পড়িতে পারে। ম্যানচেষ্টারের টেক্‌নিক্যালে স্কুলে পাঁচ হাজারের উপর ছাত্র সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর স্বেচ্ছায় ও নিজব্যয়ে পাঠ করিতেছে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কোনো বিদ্যালয় নাই বলিলেই হয়।

কলিকাতার উপকণ্ঠ শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও ঢাকায় আসানুল্লা স্কুল নামে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল সরকার পরিচালিত। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিট্যুট্ (কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ কর্তৃক পরিচালিত। দার্জিলিঙের নিকট কালিম্পঙে খৃষ্টান মিশনারীদের একটি অতি সুন্দরভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়, কুমিল্লার ইলিয়ট্ আর্টিজন স্কুল উল্লেখযোগ্য। কাঁচড়াপাড়ায় ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের একটি কারখানা আছে; তাহার সংলগ্ন একটি বিদ্যালয় সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লিলুয়ার কারখানা, ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর খড়গপুর কারখানায় অনেক এপ্রেন্টিস্ লওয়া হয়। বিহারের মধ্যে জামসেদপুরের লৌহনগরীর সংলগ্ন একটি Technological Instituteএ বেশ উচ্চ বিদ্যা দান করা হয়। শ্রীরামপুরে তাঁতশিক্ষা কলেজ সরকার পোষণ করেন।

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা

পরিশিষ্ট

নিরক্ষর ভারতবাসীর সংখ্যা।

	সমগ্র বৃটীশ ভারতে	বাংলাদেশে
পুরুষ সংখ্যা—	১২,৬৮,৭২,০০০	২,৪১,৫১,০০০
নিরক্ষর পুরুষ	১১,০৩,৪১,০০০	২,০৩,০০,০০০
লেখাপড়া জানা	১,৬৫,০৮,০০০	৩৮,৫০,০০০
ইংরাজী জানা	১৯,৯৮,০০০	৭,২৮,০০০
নারী সংখ্যা—	১২,০১,৩১,০০০	২,২৫,৪৪,০০০
নিরক্ষর	১১,৭৯,৬৩,০০০	২,২১,৪০,০০০
লেখাপড়া জানা	২১,৪৫,০০০	৪,০৩,৯০০
ইংরাজী জানা	২,০২,৯৫১	৪৪,৭২০

দেশীয় রাজ্য।

	পুরুষ	নারী
সংখ্যা	৩,৭১,২৩,০০০	৩,৪৮,১৫,০০০
নিরক্ষর পুরুষ	২,২২,৮২,০০০	৩,২৮,৪৪,০০০
লেখাপড়া জানা	৩৩,৩২,০০০	৬,৩৬,০০০
ইংরাজী জানা	২,৯১,০০০	৩৫,০০০

Statistical Abstract for British India 1914—15 to 1923—24 ; p. 22—32.

প্রদেশানুযায়ী শিক্ষার অবস্থা—১৯২১ সালের আদমসুমারী অনুসারে হাজার জন লোকের মধ্যে শিক্ষিত

(৫ বৎসরের উপর সকল বয়সের অধিবাসী)।

প্রদেশ	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক
আসাম	৭২	১৩৯	২১
বাঙ্গালা	১০৪	১৮১	২১
বিহার উড়িষ্যা	৫১	৯৬	৬
বেলোচুস্থান	৪৭	৭৬	৭
বোম্বাই	৯৫	১৫৭	২৭
বর্মা	৩১৭	৫১০	১১২
মধ্যপ্রদেশ	৪৯	৮৭	৯
কুর্গ*	১০০	১৫৭	২৮
মান্দ্রাজ	৯৮	১৭৩	২৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	৫০	৮০	১০
পঞ্জাব ও দিল্লী	৪৬	৭৬	৯
যুক্তপ্রদেশ	৪২	৭৩	৭
করদ রাজ্য			
বড়োদা	১৪৭	২৪০	৪৭
হায়দ্রাবাদ	৩৩	৫৭	৮
কাশ্মীর	২৬	৪৬	৩
মহীশূর	৮৪	১৪৩	২২
কোচীন	২১৪	৩১৭	১১৫
ত্রিবাঙ্কুর	২৭৯	৩৮০	১৭৩
রাজপুতানা আজমীর	৪২	৭৪	৬
মধ্যভারত,গবালিয়ার	৩৭	৬৫	৭
সিকিম (১৯১১)	৪১	৭৮	৩
মোট	৮২	১৩৯	২১

(এক হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে)

ধর্ম হিসাবে (১৯২১ সালে)

	শিক্ষিত		নিরক্ষ
	পুরুষ	নারী	
হিন্দু	১১৫	১৪	৮৭১
মুসলমান	৮১	৭	৯১২
খৃষ্টান	৩০৯	১৮০	৫১১
শিখ	৯৪	১৪	৮২২
বৌদ্ধ	৪৮৪	৯৬	৪২০
আদিম	১৪	১	৯৮৫

অন্যদেশের সহিত তুলনা করিলেই সহজে বুঝা যাইবে আমাদের শিক্ষার কি ভীষণ অবস্থা। কোন্ কোন্ গভর্ণমেন্ট শিক্ষার জন্য যুদ্ধের পূর্বে কিরূপ ব্যয় করিতেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে প্রত্যেক দেশে ইহা অপেক্ষা ব্যয় বাড়িয়াছে; ভারতবর্ষেও বাড়িয়াছে।

দেশ	মাথাপিছু সরকারী ব্যয়	দেশ	মাথাপিছু সরকারী ব্যয়
মার্কন যুক্তরাজ্য—	১২৲	নরওয়ে—	৩৸৴০
সুইট্জারল্যাণ্ড—	১০৷০	ফ্রান্স—	৩৷৵০
অষ্ট্রেলিয়া—	৮৷৶৴	অষ্ট্রীয়া—	২৷৴১
ইংল্যাণ্ড-ওয়েলস্—	৮৲	স্পেন্—	১৷৵০
কানাডা—	৭৷৴০	ইটালী—	১৶৴১
স্কটল্যাণ্ড—	৪৶৴১০	সাইবেরিয়া—	৸৵০
জার্মানী—	৫৵০	জাপান—	৸৵০
আয়রল্যাণ্ড—	৪৸৴০	রুশিয়া—	৷৶৴১
সুইডেন্—	৪৶৴০	ভারতবর্ষ—	৴০
বেলজিয়াম—	৪৲		

৪। সাময়িক সাহিত্য

পশ্চিমের নিকট হইতে ভারতবর্ষ বহু জিনিষের জন্য ঋণী ; ইহার মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র অন্যতম। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষা, ধর্মভাব, জাতীয় ভাব সমস্তই দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ১৭৭৮ সালে স্যর চার্লস উইলকিন্স হুগলী হইতে বাংলা অক্ষরে হল্‌হেড্ সাহেবের "Grammar of the Bengali Language" নামে পুস্তক বাংলা অক্ষরে প্রকাশ করেন। উইলকিন্সের উপদেশে পঞ্চানন কর্মকার নামক হুগলীর এক ব্যক্তি কাঠে বাংলা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বাংলার ছাপার অক্ষরের ইহাই মূল।

বাংলা মুদ্রাযন্ত্র

প্রাচীন ভাষায় কবিদিগের শেষ রত্ন ভারতচন্দ্রের পর বাংলায় ভাল সাহিত্য বহুকাল সৃষ্ট হয় নাই। য়ুরোপীয়েরা আসিয়া বাংলাদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক কাহাকেও দেখেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা সাহিত্যে চারিটি ধারা দেখা যায়। প্রথমত পণ্ডিতগণ বাংলা জানিতেন না, সংস্কৃতই তাঁহাদের লেখা ভাষা ছিল ; যে-বাংলা তাঁহারা লিখিতেন তাহা সংস্কৃতের বাড়া। ইহার নমুনা মৃতুঞ্জয়ের "প্রবোধ চন্দ্রিকা।" ২য়, আদালতী ভাষা ; ফার্সীভাষা রাজভাষা ছিল ; কায়স্থ লেখকেরা এই ভাষার সহিত বাংলাভাষা মিশাইয়া এমন একটি দুর্বোধ্য খিচুড়ী ভাষা করিয়াছিলেন যে তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিত না। ফার্সী ভাষার প্রভাব কবিকঙ্কনের চণ্ডীর মধ্যেও দেখা যায়। ৩য়, চল্‌তিভাষা ও সাহিত্য। গ্রাম্য চল্‌তি ভাষায় কবিওয়ালারা সাহিত্য রচনা করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার এই গ্রাম্য চল্‌তিভাষার শেষ কবি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন "খাঁটি বাংলা

সাহিত্যের চারিটী ধারা

কথায় বাঙ্গালীর মনের ভাব ত' খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" ৩র্থ, য়ুরোপীয় লেখক। পাশ্চাত্যদের মধ্যে পর্তুগীজগণই বাংলা ভাষার প্রথম লেখক। ইহাদের লেখার নমুনাও পাওয়া গিয়াছে। তারপর শ্রীরামপুরের বিখ্যাত মিশনারী মহাত্মা কেরী, মার্শমান, ওয়ার্ড বাংলাভাষার যে কি পরিমাণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা বাঙালী মাত্রেরই অবিদিত নহে। য়ুরোপীয়গণ দুই কারণে বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। প্রথমত বাঙালীদের সহিত কাজকর্ম চালাইবার জন্য বিদেশী বণিকগণ বাংলাভাষা শিখেন এবং তন্নিমিত্ত এই ভাষায় ব্যাকরণ ও দুই চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয়ত পাদরীগণ এদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেন। ১৮০০ সালে ইংরেজ সিভিলিয়ান্‌দিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপিত হয়। মিশনারীগণ বাংলা গদ্যে নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া সর্ব প্রথমে প্রচার করেন। ১৭৪৩ সালে সর্ব প্রথম গ্রন্থ 'ব্যাকরণ ও অভিধান' মুদ্রিত হয়। পর্তুগীজ বণিকেরা চট্টগ্রামের কথ্যভাষায় ইংরেজী অক্ষরে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৬৭ সালে বেণ্টো 'প্রার্থনা মালা' ও 'প্রশ্নমালা' নামে দুই গ্রন্থ লণ্ডন সহরে মুদ্রিত করেন। ১৭৭৮ সাল হইতে এদেশে পুস্তক ছাপান আরম্ভ হয়। ১৭৪৩ হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত ৮২ খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টান পাদরীদের লিখিত। বাঙালীদের মধ্যে রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের আলোচনা

১৮১৬ সালে বাংলার প্রথম সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়। ইংরাজী প্রথম সাময়িক পত্রিকা "হিকির বেঙ্গল গেজেট" ১৭৮০ সালে প্রকাশিত হয়; সেই হইতে অনেক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইংরেজী পত্রিকার অনুকরণে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক বাঙ্গালী 'বেঙ্গল গেজেট' নামে পত্রিকা বাহির করেন। এক বৎসরের মধ্যে ইহা লোপ পায়। সে-যুগে কলিকাতার বাহিরে পত্রিকা বা পুস্তক যাইত না; সুতরাং ইহার প্রভাব দেশের উপর কিছুই হয় নাই। তা ছাড়া ইহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য ছবিসহ মুদ্রিত হইত; সাময়িক পত্রিকার কোন বিশেষত্ব ছিল না।

প্রথম সাময়িক পত্রিকা

"বেঙ্গল গেজেট" উঠিয়া গেলে ১৮১৮ সালে এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদরী পণ্ডিত মার্শম্যান "দিগদর্শন" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইত। এই প্রথার জন্য কতকগুলি ইংরাজ সম্পাদক দায়ী। ১৭৮০ সালে হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে কোনো আইন না থাকাতে লোকে যাহা খুসী তাহা লিখিত; বিশেষত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের ইতিহাস লইয়া কুৎসা ও সমালোচনা ইহাদের প্রধান অঙ্গ ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস হিকির গেজেট উঠাইয়া দেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে আইন করেন যে গভর্ণমেণ্টের কোনো কার্য্য সম্বন্ধে সমালোচনা পত্রিকাতে প্রকাশিত হইলে সম্পাদক শাস্তি পাইবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সমালোচনা শ্লেষ রীতিমত প্রকাশিত হইতে থাকিল। এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৭৯৩ সালে "কলিকাতা ম্যাগাজিন" "ওরিয়্যাণ্টাল মিউজিয়ম" ১৭৯৪ সালে "ইণ্ডিয়ান্ ওয়ারল্ড," "কলিকাতা মন্থলি জার্ণাল" ১৭৯৫ সালে "বেঙ্গল হরকরা" "ইণ্ডিয়ান্ এপোলো" "এসিয়াটিক মিরার", "কলিকাতা কুরিয়ার," "টেলিগ্রাফ", প্রভৃতি

ইংরাজী খবরের কাগজ

কতকগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। অসংযত ভাষার জন্য "ইণ্ডিয়ান ওয়ারল্ডের" সম্পাদক, "টেলিগ্রাফের" সম্পাদক, "এশিয়াটিক মিরারের" সম্পাদক নির্বাসিত হন। অবশেষে ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলিস্‌লী পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ও সংবাদ পত্র পরিচালন বিষয়ে বিশেষ কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। পরীক্ষকগণ আপত্তিকর অংশগুলি কাটিয়া দিতেন। এইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অনেক সম্পাদকের পত্রিকা প্রকাশ করিবার সখ কমিয়া আসিল।

"দিগ্‌ দর্শন" সমাচার দর্পণ

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা "দিগ্‌দর্শন" ও "সমাচার দর্পণ" নামে দুই-খানি কাগজ বাহির করেন; মারকুইস অব্‌ হেষ্টিংস "সমাচার দর্পনের" অনুবাদ পড়িয়া খুব প্রীত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস সাধারণের মতকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন; সেইজন্য তিনি পত্রিকার পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা বিষয়ক আইনের কঠোরতা কমাইয়া দিলেন।

রামমোহন রায়

"দিগ্‌দর্শনে" রামমোহন রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিন্তু ১৮১৯ সালে কলিকাতাস্থিত নবপ্রকাশিত "গস্পেল ম্যাগাজিন" পত্রিকা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে লিখিতে থাকিলে রাজা রামমোহন রায় "সংবাদ কৌমুদী" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ১৮২১ সালে "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামে মাসিক পত্র বাহির করিয়া মিশনারীদের উত্তর দিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ', প্রচার করিতে আরম্ভ করেন ও সতীদাহের বিরুদ্ধে ও লৌকিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে লিখিতে থাকেন। তখনই তাঁহার শত্রু বৃদ্ধি হইল; রাধাকান্ত দেব হিন্দুসভার পক্ষ হইতে "সমাচার চন্দ্রিকা" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিলেন। এই দলাদলিতে সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশিত হইল। রামমোহনের সমর্থনে

"বঙ্গদূত" হিন্দু সভা ও "চন্দ্রিকার" সমর্থনে "সংবাদ তিমিরনাশক"। উল্লেখযোগ্য। দশ বৎসর কাল উভয় দলের তর্কযুদ্ধ চলিল। ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ প্রভাকর" সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে রসসিঞ্চন করিল।

এতকাল সাময়িক সাহিত্য বলিতে খৃষ্টান হিন্দু ও নব্যদলের মতের সমর্থন ও প্রতিবাদ বুঝাইত। ধর্মের কথা তত্ত্বের কথায় সাময়িক সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্য পূর্ণ থাকিত। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মকথার বাদ প্রতিবাদে যোগ দেন নাই; তিনি কবিতা লিখিয়া সকল সমাজকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই সময় হইতে আরম্ভ। 'প্রভাকরে'র হাস্য ও ব্যঙ্গ রসের লেখাই ছিল লোকের আকর্ষণ। ঈশ্বরগুপ্ত একদল লেখক সৃষ্টি করিয়া গেলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম, দীনবন্ধু সকলেই এই পত্রিকাতে তাঁহাদের হাতের লেখা মক্স করেন। দেখিতে দেখিতে 'প্রভাকরে'র অনুকরণ করিয়া ২০।২৫ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইল।

ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকর'

সেই সময়কার সাহিত্যিক আন্দোলন কলিকাতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মফঃস্বলে শিক্ষার অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। শিক্ষার ইতিহাসে সে-বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে। ১৮৩৫ স্যর চার্লস মেটকাফ অস্থায়ীভাবে গবর্ণর-জেনারেল হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিলেন। এই স্বাধীনতা দানের জন্য আমরা তৎকালীন আইন-সদস্য লর্ড মেকলের নিকট ঋণী; তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় ভারতবাসীরা এই অধিকার পায়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলি অবিশ্রাম পত্রিকা প্রকাশিত করিতে লাগিল। ১৮৩৭ সালে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিলে ঐ অব্দে আদালত সমূহে

ফার্সী ভাষার পরিবর্তে বাংলাভাষা দ্বিতীয় রাজভাষা রূপে গৃহীত হইল। গভর্ণমেণ্ট ১৮৪১ সালে বাংলাদেশে ১০১টি বঙ্গ-বিদ্যালয় খুলিয়া বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে সহায়তা করিলেন।

এই সময়ে বঙ্গীয় সমাজের রুচি খুবই নীচগামী ছিল। বড় কবি দেশে ছিল না। অল্প শিক্ষিত লোকে কবির লড়াই, নিম্ন শ্রেণীর লোকে খেউড়, তরজা প্রভৃতির গান শুনিয়া তুষ্ট হইত। পাঁচালী ও যাত্রা সাধারণ লোকের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। আমরা যে পর্বের কথা বলিতেছি সে-যুগে হরু, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, নীলু, রামপ্রসাদ, আণ্টুণী সাহেব, ঠাকুরদাস সিংহ, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, ঠাকুরদাস দত্ত, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এছাড়া আরও অনেকের নাম ও কবিতা পাওয়া যায়। অশ্লীল গালাগালি, কবির লড়াই, চুটকী খেউড় সাধারণের পাঠের ও উপভোগের সামগ্রী ছিল। সুতরাং 'প্রভাকর' 'ভাস্কর' 'রসরাজ' 'পাষণ্ড পীড়ন' প্রভৃতি পত্রিকা খুবই লোকপ্রিয় হয়; এবং ইহার সম্পাদকগণ দুইপয়সা করিতেও পারিয়াছিলেন। অন্যান্য কাগজ দুই এক বৎসরের মধ্যে লোপ পাইত; কেননা কাগজ চালানো লোকশানের ব্যাপার ছিল। 'প্রভাকর' ও 'ভাস্কর' প্রভৃতিতে ভাল জিনিষও থাকিত; কিন্তু দেশের শিক্ষিত দল বাংলা পড়াকে ইতরতা মনে করিতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা চাল চলন, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে ইংরেজদের চেলা হইয়া উঠিলেন। রাজনারায়ণ বসু, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির জীবনী পাঠে আমরা সেই সময়ের খুবই সুন্দর চিত্র পাই। মোটকথা বাংলার উচ্চ-শিক্ষিত লোকদিগের অনেকেই বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

তৎকালীন সাহিত্য

১৮৪৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা প্রকাশ

করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার ১৬ বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' প্রচারের পর বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণ একে একে বঙ্গসাহিত্যে মন দিলেন। অক্ষয় কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন। লোকে বুঝিল গম্ভীর জিনিষও বাংলাভাষায় প্রকাশ করা যায়।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা

ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'তত্ত্ববোধিনী' বাহির হইলে হিন্দুসমাজ হইতে "নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা," "ধর্মরাজ," 'হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয়' "হিন্দু বঙ্গ" প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকা বাহির হয়। এই সকল পত্রিকার কাজ ছিল ব্রাহ্মসমাজ ও খৃষ্টান সমাজের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ। এই সময়ে সাময়িক উত্তেজনার বিষয় অনেক ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করিতেছিল। ১৮৪৯ সালে বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; সে সময়ের রক্ষণশীলদলের প্রতিবাদ ও শ্লেষ সাময়িক সাহিত্যকে অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন পাশ হয়। সুতরাং লোকের আন্দোলনের বিষয়ের অভাব হইল না। এই সময়ের পত্রিকাগুলির নামের তালিকা দিতেই অনেকখানি স্থান লাগিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রাশি রাশি মাসিক পত্রিকার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মহিলাদের পত্রিকা 'বামাবোধিনী' ও 'ধর্মতত্ত্ব' নববিধান সমাজের পত্রিকা মাত্র এখন জীবিত আছে।

সমাজ-বিপ্লব ও সাহিত্য-সৃষ্টি

১৮৫৬ সাল হইতে বাংলার সাময়িক সাহিত্য নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিল। "এডুকেশন গেজেট" গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বাহির হইল। মিঃ ওব্রায়ান ইহার সরকারী সম্পাদক; কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী

এডুকেশন গেজেট

ছিলেন। ১৮৬৬ সালে প্যারীচরণ সরকারের হাতে এই কাগজ খুব উন্নতি লাভ করে। প্যারীচরণের সহিত সরকারের মত মিলিল না বলিয়া দুই বৎসর পরে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক হন। ভূদেবের সমস্ত বিখ্যাত প্রবন্ধরাজি, হেমচন্দ্রের অনেক কবিতা এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এখনো এই পত্রিকা চলিতেছে—কিন্তু বর্তমানে ইহার সে রচনা সম্পদ বা বিশেষত্ব নাই।

সোমপ্রকাশ

১৮৫৮ সালে আর একখানি পত্রিকা বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইহার প্রথম সম্পাদক। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংলা ভাষায় বহুবিধ বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকার রুচি ও ভাষার স্থানে "সোমপ্রকাশ" নবযুগ সৃষ্টি করিল।

অমৃতবাজার পত্রিকা

১৮৬৮ সালে যশোহর হইতে শিশির কুমার ঘোষ "অমৃতবাজার পত্রিকা" নামে এক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার আর দুই ভাই হেমন্তকুমার ও মতিলাল তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ১৮৭২ সালে 'অমৃতবাজার' কলিকাতায় উঠিয়া আসে; ইহার লেখার ভঙ্গি, ভাষা ও তেজস্বিতার জন্য গ্রাহক সংখ্যা খুব হইয়াছিল। সরকারের সকল প্রকার ব্যবহারে ত্রুটি ধরিতে 'অমৃতবাজার' গোড়া হইতেই সিদ্ধহস্ত ছিল। ১৮৭৯ সালে লর্ড লীটনের দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে বিল পাঠ করিয়া শিশির কুমার বুঝিলেন 'পত্রিকা' ইহার মধ্যে পড়িবে। ১৪ই মার্চ তিনি বিল সম্বন্ধে পড়িলেন ও পর সপ্তাহে তাঁহারা তিন ভায়ে মিলিয়া, নিজেরাই কম্পোজ করিয়া, ছাপাইয়া, ইংরাজীতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাহির করিলেন। লীটনের Press Actএর মধ্যে ইংরাজী কাগজ পড়ে না। প্রথম ১১ বৎসর পত্রিকা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল; তারপর হইতে ইংরাজীতে বাহির হইতেছে। 'অমৃতবাজার' এখন পর্য্যন্ত স্বদেশের

প্রচুর কল্যাণ সাধন করিতেছে; সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ 'পত্রিকা' তীব্রভাবে করেন। সর্বসাধারণেরই ইহা খুব প্রিয়।

সুলভ-সমাচার

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন "সুলভ সমাচার" নামে এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা প্রকাশ করেন; ইহার মত সস্তা ও সুন্দর কাগজ সে-সময়ে আর ছিল না; সাধারণের মধ্যে নানা প্রকারের জ্ঞান প্রচারের পক্ষে ইহার কাজ নিতান্ত কম নয়।

বঙ্গদর্শন

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে বাঙলা সাময়িকসাহিত্যে যুগান্তর হইল। ১৮৭২ সালে "বঙ্গদর্শন" নামে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইল। এই সময় হইতে বাংলার গদ্য-সাহিত্যের স্বর্ণময় যুগ আরম্ভ বলা যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, অক্ষয় সরকার প্রভৃতি সেই সময়কার একদল যুবক বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিম সাহিত্যে নূতন রুচি, নূতন বিষয় প্রবর্তিত করিলেন। বঙ্কিমের সবচেয়ে বড় কাজ হইল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সকল প্রকার নীচতা, অশ্লীলতা দূর করা। সমালোচনা সাহিত্যের নূতন অঙ্গ হইল।

ইহার পর চুঁচুড়া হইতে অক্ষয় সরকারের "সাধারণী", ঢাকা হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের "বান্ধব" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ সালে "ভারতী" ঠাকুর পরিবার হইতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রথমে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়; অনেক লেখা এখন তাঁহার গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই। পরযুগে মাসিক পত্রিকার মধ্যে "সাধনা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প ও প্রবন্ধ প্রথমে ইহাতেই প্রকাশিত হয়।

ধর্ম ও সামাজিক আন্দোলনে যেমন এক সময়ে বাংলায় নূতন সাহিত্য সৃজিত হইয়াছিল ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন তেমনি করিয়া আর একবার বাংলার প্রাণে যথার্থ সাহিত্য রসের উৎস

আনয়ন করিয়া ছিল। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বহু পত্রিকা এই সময়ের যুগবার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল। "সন্ধ্যা" চলতি ভাষায় দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনীতির কথা এমন তীব্রভাবে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল যে তাহা এক প্রকার আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। "নবশক্তি" স্বদেশীর অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন গুহের সাপ্তাহিক, বিপ্লবকারীদের পত্রিকা "যুগান্তর" সে-যুগের চিন্তাস্রোতকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত "সুপ্রভাত" রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত "ভাণ্ডার" অল্পকাল স্থায়ী হইলেও বিশেষ বার্তা বহন করিয়া বাংলার সাময়িক সাহিত্য ক্ষেত্রে নামিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনে "বঙ্গদর্শন" নবপর্য্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে; ইহাতে তাঁহার উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জাতীয় আন্দোলনে বাংলায় এই সাময়িক পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলন ও সাময়িক সাহিত্য

বাংলা ছাড়া ইংরাজীতেও এই সময়ে অনেকগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রকাশিত হইতে থাকে। এই নূতন জাতীয় আত্মবোধ আনয়ন করিবার জন্য ভারতবর্ষ বিশেষভাবে ঋণী শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পরিচালিত "New India"। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই তিনি জাতীয় ভাবের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তারপর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছোট একটি সঙ্ঘ Dawn Society। তরুণ বাংলায় জাতীয় আত্মবোধের, হিন্দু মনের ঐক্য ও সম্পূর্ণতা কিরূপভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য এই সঙ্ঘ ও তাঁহাদের পত্রিকা Dawn Magazine বিশেষভাবে দায়ী। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ও সময়ে এই পত্রিকা ছিল। স্বদেশী আন্দোলন সুরু হইলে রাজনীতি ও রাজনৈতিক-দর্শন প্রচার কল্পে বহু ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়—যেমন অরবিন্দ সম্পাদিত Bande Mataram ও Karmayogin,

বিপিনচন্দ্রের Hindu Review। উপরে যে-সব কাগজের নাম করিলাম ইহার মধ্যে একখানিও আজ নাই।

বর্তমান সময়ে এত মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে যে তাহাদের নাম উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। যে-সব পত্রিকা বিশেষ কোনো মত বা মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে কতকগুলি অনেক বৎসর হইতে চলিতেছে। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য, "প্রবাসী"। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে ইহার সুযুক্তিপূর্ণ তীব্র সমালোচনার জন্য সম্পাদক অনেকের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন। "ভারতবর্ষ" তাহার বৈচিত্র ও গল্পের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। গত কয়েক বৎসর "সবুজপত্র" শিক্ষিত চিন্তাশীল যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে কাজ করিতেছে। অন্যান্য কাগজের মধ্যে "বঙ্গবাণী," "মানসী ও মর্ম্মবাণী" উল্লেখযোগ্য।

সংবাদপত্রের মধ্যে "বঙ্গবাসী" সবচেয়ে পুরাতন; ইহার পরেই "সঞ্জীবনী" "হিতবাদী", "বসুমতী।" এই সব সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ হইয়াছে। নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রামেও দুই একখানি খবরের কাগজ যায়। ইহাদের সবচেয়ে বড় কাজ উপহারের মধ্যে দিয়া সাহিত্য প্রচার। "বঙ্গবাসী" প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মূল ও অনুবাদসহ প্রচার করিয়াছেন; হিতবাদী ও বসুমতী অনেক বড় বড় সাহিত্যিক-দের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছেন। সুলভে এই সকল গ্রন্থরাজি প্রচারের জন্য দেশ তাঁহাদের নিকট যে কতখানি ঋণী তাহা বলা যায় না। দৈনিক অনেকগুলি কাগজ বাংলায় উঠিযাছে—নায়ক, দৈনিক বসুমতী, হিন্দুস্থান, আনন্দবাজার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনমত গঠন করিবার পক্ষে এই সব কাগজের স্থান ইতিহাসে আছে।

বিগত যুদ্ধের পর হইতে ভারতের নবজাগরণে যে নূতন ভাবোন্মেষ হইয়াছে তাহাতেও সাময়িক সাহিত্য বিশেষভাবে সৃষ্ট হইয়াছে।

এই নবজন্মের বিশেষ বার্তাবহ "প্রবর্তক," Standard Bearer (বর্ত-মানে নাই) "নবসঙ্ঘ," "আত্মশক্তি," "বিজলী," "লাঙ্গল" প্রভৃতি। ইহার মধ্যে "আত্মশক্তি"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা নূতন কলেবরে নূতন ভাবে (পুনরায়) ১৩৩৩ সাল হইতে বাহির হইতেছে।

সাম্প্রদায়িক কাগজের মধ্যে মুসলমানদের কাগজ গুলি উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট মাসিক মুসলমানী কাগজ প্রকাশিত হয়, যেমন 'মোসলেম ভারত', 'সাধনা' ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি সাপ্তাহিক পত্রিকা সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রকাশ করিয়া বড়ই কলঙ্কের ভাগী হইতেছেন। হিন্দুদের মধ্যেও নানা সাম্প্রদায়িক পত্রিকা আছে। কতকগুলি কাগজ গোঁড়ামী ও বিদ্বেষভাবে দেশের ক্ষতি করিতেছেন।

খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, হিন্দু সমাজের নানা সম্প্রদায়ের, নানা বর্ণের বহুশত সাময়িক পত্রিকা আছে। কাহারও উদ্দেশ্য নিজ ধর্ম প্রচার, কাহারও উদ্দেশ্য নিজ বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন ও নিজ সমাজের আত্মোন্নতি।

ইংরাজী দৈনিক কাগজের মধ্যে Statesman, Englishman ইংরাজ সম্পাদিত ; Amrita Bazar প্রাচীনতম দেশী কাগজ ; তার পরেই Bengali। নূতন দৈনিকদের মধ্যে Servant, Forward বিশেষভাবে রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হইলেও দেশের প্রভূত কল্যাণ করিতেছে। ইংরাজীতে বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক আছে। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Modern Review Calcutta Review, Hindusthan Review। বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের বহু পত্রিকা আছে।

দেশের জ্ঞানবিস্তারের আর যে সকল প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে সেগুলি নির্দেশ করিব।

ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধার, প্রাচীন ভাষা ও লেখ আবিষ্কার, প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের জন্য ভারতবাসী য়ুরোপীয়দের নিকট ঋণী।

এসিয়াটিক সোসাইটি

স্যর উইলিয়ম জোনস্ নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে এদেশে ১৭৮৩ সালে আসেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারই অনূদিত শকুন্তলা সর্বপ্রথমে য়ুরোপে প্রচারিত হয়। ১৭৮৪ সালে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে জোন্সের উৎসাহে ৩০ জন ইংরাজ ভদ্রলোক এশিয়াটিক্ সোসাইটি (Asiatic Society) স্থাপন করেন। মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করাই ইহার মোটামুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম সকল সভ্যই য়ুরোপীয় ছিলেন। দেশীয়দেব মধ্যে দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তখন কাহারও ছিল না। ইঁহারা ধীরে ধীরে নানা স্থান হইতে শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ সালে এই সমিতি একটি ছোটখাটো মিউজিয়াম খোলেন। কিন্তু এসব কার্য্য সরকারী সাহায্য ব্যতীত পরিচালন করা অসম্ভব। ১৮৩৯

মিউজিয়াম্

সালে সোসাইটি বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারের নিকট হইতে টাকা সাহায্য পাইলেন। ১৮৬৬ সালে সরকার ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও সেই হইতে কলিকাতার যাদুঘর বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান সহরে যাদুঘর খোলা হইয়াছে। লোক শিক্ষার পক্ষে ইহার মূল্য যে কত তাহা বলা বাহুল্য। ভারতের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় আমরা জিনিষ চিনিতে ও আদর করিতে জানি না বলিয়া বহুমূল্য অনেক জিনিষ ও পুঁথি এখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, বৃটীশ মিউজিয়মে, অক্সফোর্ডের বোডলিন লাইব্রেরীতে, কেম্ব্রিজে, প্যারিসের লুভেরে, বার্লিনে, বষ্টনে, হার্ভাডে রহিয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৯০ হইতে ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত বড় বড় ২০ খণ্ড প্রবন্ধ ও কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রকাশিত করেন। য়ুরোপে এই সব গ্রন্থ পৌঁছিলে সেগুলির খুবই আদর হয়, ফরাসী ভাষায় ইহার অনুবাদ পর্য্যন্ত হয়। ১৮৩২ সালে প্রিন্সেপ সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মাসিক জর্ণাল বা পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। প্রিন্সেপ সাহেব অশোকের শিলালিপি আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। এই সোসাইটি ১৮৪৮ সাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যাদি মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে দেশময় সংস্কৃত, পার্শী গ্রন্থ প্রচারিত হইতে থাকে। এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাণী-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা কোঠায় জ্ঞান-বিস্তারে যে কতটি সহায়তা করিয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

সোসাইটির কাজ

ভারতবর্ষের অন্যান্য জ্ঞানোন্নতি সমিতির মধ্যে বঙ্গের 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' বাঁকিপুরের 'বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি' পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 'ঐতিহাসিক' সভা (Historical Society), হায়দ্রাবাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, মৈশূরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পুণার 'ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট' বোম্বাইয়ের পার্শীদের 'কামা ইন্‌স্‌টিটিউট,' উত্তর বঙ্গের 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি,' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ও রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন 'বিশ্বভারতী'র নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩০১ সালে স্থাপিত হয়। বাংলার গ্রন্থ পুঁথি শিল্পকলা রক্ষা ও লেখকদিগকে উৎসাহিত করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' বাংলার সাহিত্য, ইতিহাস, শিলালিপি, বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া আচার ব্যবহার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গত ৩৩ বৎসর বহুশত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম্ দিন দিন পুষ্ট হইতেছে।

অন্যান্য সমিতি

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রগণ আজ সাহিত্যে, শিল্পে, ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, বিজ্ঞানে, সর্ব বিষয়ে নাম করিয়াছে। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির বাহিরে স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর "বসু বিজ্ঞান মন্দির" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'সায়েন্স এশোসিয়েসন' বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনাদি করিয়া অনেক কাজ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমিতির সব চেয়ে বড় কাজ এদেশ হইতে উপযুক্ত ছাত্রদের বিলাত পাঠাইয়া বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে পারদর্শী করিয়া আনা। বহুশত যুবক এই এসোশিয়েশনের কল্যাণে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারক চন্দ্রমাধব ঘোষের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের অদম্য উৎসাহের জন্য এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি চলিতেছে। সরকারের অধীন নানা বৈজ্ঞানিক বিভাগ আছে; তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি বিজ্ঞান জগতের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। এছাড়া চিকিৎসা ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনীয়ার, বণিক, ব্যবসায়ীদের নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকা আছে।

ভারতের নানাস্থানে আজকাল এতপ্রকার সমিতি ও জ্ঞানবিস্তার ও আত্মোন্নতির জন্য এত নূতন নূতন পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

তৃতীয় ভাগ

ভারত শাসনপদ্ধতি

শাসনপদ্ধতির অভিব্যক্তি।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ও ভারতের সম্রাট আকবরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডন নগরের দুই শত লোক 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটী যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা রাণী এলিজাবেথের নিকট আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে আমেরিকার দক্ষিণস্থ ম্যাগেলান প্রণালী পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের একচেটিয়া বাণিজ্যের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান কোম্পানীর জন্ম

তারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

ইংরাজ সম্বন্ধের যুগ-বিভাগ

(১) ১৬০০-১৭৫০। এই দেড়শত বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় রাজাদের অনুগ্রহে ফরাসী, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী সমূহের প্রতিযোগিতায় কোন প্রকারে কেবলমাত্র বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল।

(২) ১৭৫০-১৮৫৭। ইংরাজ বণিক ক্রমশঃ রাজ্য জয় করিতে লাগিল এবং ইংরাজ রাজার সঙ্গে অংশী বা প্রতিনিধি ভাবে এই রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য অধিকার ও উপযোগিতা চলিয়া গেল।

(৩) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজ রাজ নিজেই রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন।

এই ইতিহাসের প্রথম দেড়শত বৎসর এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়—কারণ এই সময় ইংরাজ বণিক; ভারত শাসনের কোন অধিকার পায় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে মোগল রাজত্ব টলটলায়মান; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি এবং অধীনস্থ রাজগণ এবং নব উদীয়মান যোদ্ধ্রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণায় ব্যস্ত এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভারতের এই অরাজকতা এবং বহুরাজকতার সময় ইংরাজ বণিকও আত্মরক্ষা বা আত্মোন্নতির জন্য সর্বদাই কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিতেন।

এই সময় হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৈন্য এবং সেনাপতি দ্বারা ভারতীয় প্রাদেশিক রাজাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল এবং যুদ্ধ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসনেও সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। লর্ড ক্লাইভ এই বিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক; পণ্ডিচেরী অধিকারের পরই পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭)।

ইংরাজ বণিকের রাজ্যজয়

এই সময়েই কোম্পানীর প্রধান কার্য্য-কেন্দ্র মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু তখনও নিজের নামে রাজ্যশাসন করিবার সাহস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয় নাই; একজন কাহাকেও নবাবরূপে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে হইত। কিন্তু এই বন্দবস্তে শাসন ও রাজকর আদায়ের বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর উপাধি-সম্বল সম্রাটের নিকট হইতে ক্লাইভ বাংলা বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের ভার) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ফৌজদারী ও পুলিশ ইংরাজের ক্রীড়াপুতুল নবাবের অধীনেই রহিল। রাজস্ব আদায়ের

বন্দবস্ত দেশীয় কর্মচারীদের হাতেই ছিল; কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী নিজেই সেই ভার গ্রহণ করিল এবং দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারী ও পুলিশ ক্রমশ তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িল। কার্য্যত কোম্পানীই বাংলাদেশ শাসন করিতে লাগিল।

এই সময় হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ইংরাজ শাসনের অন্তর্ভূক্ত হইতে লাগিল এবং অন্যান্য রাজারা জ্ঞাতিকলহজনিত দুর্বলতা হেতু ইংরাজরাজের সার্বভৌমিক অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কিরূপে ধীরে ধীরে ভারতে ইংরাজ শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

রাণী এলিজাবেথের অনুমতিপত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিজেদের কার্য্য-প্রণালী পরিচালনার জন্য একটি "কোর্ট" স্থাপন করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। এই কোর্টের একজন সভাপতি এবং চব্বিশজন নির্বাচিত সভ্য নিযুক্ত হইত। প্রতি বৎসর নূতন নির্বাচন হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই শাসন-যন্ত্র একটি "অংশীদার সভা" (General Court of Proprietors) "ডিরেক্টর সভায়" (Court of Directors) পরিণত হয়। প্রতিবৎসর অংশীদারগণ কর্তৃক চব্বিশজন ডিরেক্টর নির্বাচিত হইত। কিন্তু অংশীদারগণের সভা ইচ্ছা করিলে ডিরেক্টর সভা প্রবর্তিত যে-কোন নিয়ম বাতিল করিতে পারিত।

কোম্পানীর বিচার সভা

এই সময় বোম্বাই মান্দ্রাজ ও কলিকাতা এই তিন স্থানে কোম্পানীর কার্য্য-কেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক জায়গায় একজন সভাপতি এবং উচ্চতন কর্মচারি-গঠিত একটি সভার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইত। ভোটদ্বারা সমস্ত বিষয় মীমাংসিত হইত। বোম্বাই, মান্দ্রাজ কলিকাতার কেন্দ্র, সবই স্বস্ব প্রধান ছিল; তিনটি প্রদেশ কেহই কাহারও অধীন ছিল না।

ভারত শাসনের প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টিপাত

কিন্তু রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর দায়িত্ব যতই বাড়িতে লাগিল ততই বুঝিতে পারা গেল যে এই রকম বড় সভা এবং স্ব স্ব স্বাধীন তিন কেন্দ্র দ্বারা রাজ্যশাসন এবং বাণিজ্য পরিচালন অসম্ভব। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল অথচ তাহার কর্মচারীরা প্রভূত ধন সম্পত্তি লইয়া দেশে ফিরিতে লাগিল। ক্লাইভের যুদ্ধজয়, ভারত প্রত্যাগত ধনমদমত্ত ইংরাজদের ঔদ্ধত্য এবং কোম্পানীর আর্থিক অবনতি এই তিন কারণে প্রথমত পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্য-প্রণালী পরীক্ষা করার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়। তাহারই অনুসন্ধানের ফলে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে (লর্ড নর্থের মন্ত্রীত্বের সময়) কোম্পানীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য "রেগুলেটিং অ্যাক্ট" (Regulating Act of 1773) প্রবর্তিত হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট

ইহার দ্বারা পার্লিয়ামেণ্ট বাংলাদেশের জন্য একজন গভর্ণর-জেনারেল ও বারজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে মন্ত্রী-নির্বাচনের ভার কোম্পানীর হাতেই রহিল। ইহাতে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্ণরদের শক্তি খর্ব করা হইল। আকস্মিক প্রয়োজন না ঘটিলে তাহারা বাংলার গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে পারেন না। কিন্তু তখনকার দিনের যাতায়াতের অসুবিধ হেতু এই নিয়ম পালিত হওয়া শক্ত ছিল।

অন্যান্য কারণেও এই প্রকারের শাসনপ্রণালী চলা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গভর্ণর-জেনারেল নিজের মন্ত্রী-সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের সম্মতি ভিন্ন কোন কাজ করিতে পারিতেন না। মন্ত্রীসভা ও গভর্ণর-জেনারেল উভয়েই বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভার অধীন অথচ

পার্লিয়ামেণ্টের নিকট ভারত শাসনের জন্য গভর্ণর-জেনারেল ও তাহার মন্ত্রী-সভাই দায়ী। এই অসম্ভব সম্বন্ধ-সূত্রে গঠিত শাসনপ্রণালীর দোষ পদে পদে ধরা পড়িতে লাগিল। অন্যায় ও অত্যাচারের জন্য পার্লিয়া-মেণ্ট যখন ওয়ারিন হেষ্টিংসকে বরখাস্ত করিবার হুকুম দিলেন তখন ডিরেক্টর-সভা এই আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া হেষ্টিংসকে গভর্ণর-জেনারেল পদে বাহাল রাখিলেন। এই প্রকার অনিয়ম দূর করিবার জন্য পিট্ (Pitt) ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি আইন প্রস্তুত করেন।

এই আইনানুসারে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর গভর্ণরের ক্ষমতা খর্ব করিয়া বড়লাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্ণরগণের শাসন বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য তিনজন করিয়া মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণের প্রথা প্রবর্তন এই আইনের আর একটি বড় কাজ। এই আইনের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইল বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল (Board of Control) নামে একটি তত্ত্বাবধায়ক সভা গঠন। পার্লিয়ামেণ্টের নির্বাচিত ছয়জন সভ্য লইয়া সভা গঠিত হইল। ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে এই সভারই সর্বোচ্চ ক্ষমতা রহিল। কাজেকাজেই এখন হইতে ভারত শাসন-ভার পার্লিয়ামেণ্ট ও কোম্পানী এই উভয়ের হাতেই ন্যস্ত থাকিল। এই প্রকারের ডবল শাসনপ্রণালী সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

পিটের ভারত সম্বন্ধীয় আইন

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে (১৭৯৩) গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের শাসনকার্য্য, রাজ্যাধিকার প্রভৃতি ব্যবস্থার চরম মীমাংসা পার্লিয়ামেণ্টের নির্বাচিত শাসন-সভার (বোর্ড অব কণ্ট্রোল) দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। কিন্তু সাধারণ রাজকার্য্য কোম্পানীর ডিরেক্টর-দের হাতেই ছিল। প্রত্যেক কুড়ি বৎসর অন্তর পার্লিয়ামেণ্টের নিকট হইতে নূতন সনদ (charter) লইবার সময় কোম্পানীর কার্য্যা-বলী বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইবার নিয়ম হইল।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের সনদ পুনঃপ্রাপ্তির সময় কোম্পানীর কার্য্যাবলীর যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহারই ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে "চার্টার অ্যাক্‌টে" চা-এর ব্যবসায় এবং চীনদেশের সহিত বাণিজ্য ভিন্ন আর সর্বপ্রকার বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার কোম্পানীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং কোম্পানীর অধিকৃত সমস্ত রাজ্য বৃটীশরাজের এই সময়ই প্রথমবার বিজ্ঞাপিত হয়।

চার্টার অ্যাক্ট, ১৮১৩

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে কোম্পানীকে সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য ত্যাগ করিতে হইল। এই সময় হইতে কোম্পানী কেবলমাত্র রাজ্যশাসনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিল এবং বৃটিশরাজের ভৃত্য বা প্রতিনিধিরূপে ভারত শাসন করিতে লাগিল।

চার্টার অ্যাক্ট ১৮৩৩

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে ডিরেক্টর সভার ক্ষমতা আরও কাড়িয়া লইয়া পার্লিয়ামেণ্টের নিয়োজিত ভারত-শাসন-সভার (Board of Control) হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু তখনও ডিরেক্টরদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল; কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ তাঁহারাই রাখিতেন। সুতরাং কোন প্রকার নূতন অনুষ্ঠান বা পরিবর্তনের কর্ত্তা তাঁহারাই ছিলেন।

চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৫৩

ভারত-সচিব ও ইণ্ডিয়া কাউন্সিল

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয় ও তাহারই ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর হাত হইতে শাসনভার কাড়িয়া স্বয়ং পরিচালনের ভার লইলেন। ইহাতে শাসনপ্রণালীর বিশেষ কোন পরিবর্তন হইল না। গভর্ণর-জেনারেল তখন হইতে Viceroy (রাজ-প্রতিনিধি) নামে অভিহিত হইলেন। এই পর্য্যন্ত ডিরেক্টর সভার

কোম্পানীর হাত হইতে পার্লিয়ামেণ্টের শাসন ভার গ্রহণ, ১৮৫৮

এবং পার্লিয়ামেণ্টের শাসন-সভার (Board of Control) যে যে ক্ষমতা ছিল তাহা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের হাতে দেওয়া হইল।

এই হইতে পার্লিয়ামেণ্ট ভারতের শাসনের সম্পূর্ণ ভার লইলেন; এবং ভারত শাসন সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বের জুলুম এ পর্য্যন্ত কম করেন নাই। এই কর্ত্তৃত্বের এক্তিয়ার লইয়া লর্ড মেয়োর সহিত বিলাতের ভারত-সচিবের সহিত মতভেদ হয় ও তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। পুনরায় লর্ড নর্থব্রুকের সময় বড়লাট ও ভারত সচিবের ক্ষমতা লইয়া মতান্তর হইল। সেবারও পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিয়া হুকুম প্রচার করিলেন। ১৮৯৪ সালে ইহাই শেষবারের মত স্থির হইল যে বড়লাট বা প্রাদেশিক ছোটলাটদের কর্ম-সমিতির (Executive Council) সদস্যগণ সর্বতোভাবে গভর্ণমেণ্টের মতের সহিত মত দিবেন। ভারতের মধ্যে ভারত-শাসনপদ্ধতি ক্রমশই কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিতেছিল, ও ভারত-সচিবের শক্তিও ক্রমে ক্রমে বাড়িতে ছিল। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের আপিস লণ্ডনে; "সেক্রেটারী অব ষ্টেট্‌স ফর্ ইণ্ডিয়া" বা ভারত-সচিব ইহার প্রধান কর্তা। তিনি

ইণ্ডিয়া কাউন্সিল
ভারত-সচিব

ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য এবং অন্যান্য মন্ত্রীর ন্যায় নিজের কাজের জন্য অর্থাৎ ভারত-শাসনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দায়ী। ক্ষমতা হিসাবে ইনি একাধারে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভা ও পার্লিয়ামেণ্টের শাসন-সভার (Board of Control) উত্তরাধিকারী। বৃটীশ সম্রাজ্যের অন্যান্য সচিবের ন্যায় ভারত-সচিবের বেতন বৃটীশ রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত না; ভারতের রাজকোষ হইতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সম্পূর্ণ ব্যয় প্রদত্ত হইত। সেইজন্য হাউস্ অব্ কমন্সে তাঁহার কর্ম বা পলিসির নিন্দা হইলেও সভ্যেরা তাঁহার বেতন ও ব্যয় বন্ধ করিয়া তাঁহাকে জব্দ করিতে পারে না। ভারত-সচিবের এই

বেতন বৃটীশ রাজকোষ হইতে দিয়া তাঁহার কর্ম ও রীতির জন্য পার্লিয়া-মেণ্টের নিকট দায়ী করিবার জন্য বহুকাল হইতে চেষ্টা চলিতেছিল।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা দশের কম এবং চৌদ্দের অধিক হইতে পারিত না। প্রত্যেক সদস্যের কার্য্যকাল সাত বৎসর; তবে বিশেষ কোন কারণ থাকিলে পার্লিয়ামেণ্টের অনুমতি লইয়া আরও পাঁচ বৎসর বাড়াইতে পারা যায়। অধিকাংশ সদস্যেরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। দশবৎসর ভারতে অবস্থিতি এবং ইহার পর পাঁচ বৎসরের অধিক কাল ভারত হইতে অনুপস্থিতিই অভিজ্ঞতার নিদর্শন। সাধারণত ভারতের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, গভর্ণর-জেনারেলের শাসন-সভার সদস্য, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের নামজাদা লোক, ব্যাঙ্কার, প্রসিদ্ধ বণিক, রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে এই কাউন্সিলের সদস্যরূপে ভারত-সচিব কর্তৃক মনোনীত হন। ভারত-সচিব নিজে ভারতশাসনে অনভিজ্ঞ; কাজেকাজেই এই রকম লোক কাউন্সিলে না রাখিলে কাজ চলিতে পারে না। ১৯০৭ সাল হইতে দুইজন ভারতবাসীকে এই কাউন্সিলের সদস্য করা হয়।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভারত-সচিবের অনুমতি দরকার হইত। (১) গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে বা প্রাদেশিক কাউন্সিলে কোন আইন পাশকরা। (২) রাজস্বের বিশেষত শুল্কের কোন পরিবর্তন ঘটে এইরূপ কোন বন্দবস্ত। (৩) শাসনপ্রণালীর কোন পরিবর্তন। (৪) নূতন বৃহৎ ব্যয়। (৫) বড় চাকুরীর সৃষ্টি। (৬) রেলপথ নির্মাণ। (৭) নির্দিষ্ট বেতনের (মাসিক ২৫০।৩০০ টাকা) উপরের পদে কোন লোক নির্বাচন। (৮) খনি ইজারা দেওয়া। (৯) দেশীয় রাজাকে টাকা ধার দেওয়া। (১০) দেশীয় রাজার সঙ্গে নূতন সন্ধি স্থাপন।

ভারত-সচিবের ক্ষমতা

এই প্রকার অনেক বিষয়েই গভর্ণর-জেনারেলকে ভারত-সচিবের অনুমতি লইতে হইত।

কোন বৃহৎ ব্যয়, নূতন ট্যাক্স স্থাপন, শুল্কবৃদ্ধি ইত্যাদি রাজস্ব এবং আয়ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত-সচিবকে তাঁহার কাউন্সিলের অধিকাংশের মত অনুসারে চলিতে হয়, কিন্তু অপর সকল বিষয়ে সকলের মত না লইয়া করিবার অধিকার তাঁহার আছে। রাজনৈতিক গোপনীয় বিষয় ভারত-সচিব কাউন্সিলের নিকট পেশ না করিয়া নিজেই ব্যবস্থা করিতে পারেন। মোট কথা তিনি কাউন্সিলের পরামর্শ লইতে পারেন, কিন্তু পরামর্শ মত কাজ করিতে তিনি বাধ্য নহেন।

এই আপিসের খরচের জন্য ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে বৎসরে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা দিতে হইত। এজন্য ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বহুকাল হইতে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে প্রত্যেক কুড়ি বৎসর অন্তর নূতন সনদ দেওয়ার সময় পার্লিয়ামেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোম্পানীর শাসনকার্য্য পরীক্ষা করিতেন; কিন্তু বৃটীশরাজ নিজের হাতে শাসনভার লওয়ায় এই বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের আগ্রহও কমিয়া গিয়াছে,—যেন নিজের হাতে শাসনভার লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার জবাবদিহির ভাব গিয়াছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষ শাসনেও পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশী; কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট বিশেষভাবে ভারত-শাসনে হস্তক্ষেপ করেন না। ভারত-সচিব বিলাতের মন্ত্রী-সভার একজন সদস্য এবং ভারত শাসনের জন্য তিনি এবং মন্ত্রী-সভাই পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দায়ী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে কোন প্রশ্ন উঠিলে তিনি অথবা তাঁহার সহকারী সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন।

পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতা

পার্লিয়ামেণ্ট বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই রকমের আইন প্রস্তুত করেন—(১) ভারত-শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন (২) ভারতবর্ষের জন্য ভারত-সচিবকে ইংল্যাণ্ডে ঋণ গ্রহণ এবং ভারত-সীমান্তের বাহিরে যুদ্ধ ব্যয়ের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে অনুমতি দান। ভারতবর্ষের রাজস্ব এবং আয় ব্যয় সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। তবে ভারতের আয়ব্যয়ের হিসাব এবং আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতিবেদন প্রতি বৎসর পার্লিয়ামেণ্টে পেশ করিতে হয়। ভারত-সচিব এবং ইণ্ডিয়া-আপিসের কর্মচারীদের বেতন এবং সেখানকার সমস্ত ব্যয় ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইত।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইলে পার্লিয়ামেণ্টের যে কোন সভ্য প্রতিকারের আন্দোলন উপস্থিত জন্য প্রস্তাব করিতে পারেন।

বড়লাট ও অধ্যক্ষসভা

ভারত-সরকার পরিচালনের ভারত সম্রাট কর্তৃক 'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধির উপর অর্পিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করিবার পূর্বে কোম্পানী পরিচালিত ভারতবর্ষের ভার ছিল গভর্ণর-জেনারেলের উপর। সেইজন্য বর্তমানে একই ব্যক্তি রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট বা Viceroy and Governor-General. বড়লাটদের কার্য্যকাল সাধারণত পাঁচ বৎসর; তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞভাবে আসেন। এখানে আসিয়া তাঁহাকে ভারত-শাসনের এই জটিল জাল বুঝিতে ও তাহার পর এখানকার সমস্যাগুলির প্রকৃত অবস্থা জানিতে জানিতেই তাঁহার ফিরিবার সময় হইয়া যায়। সেইজন্য তাঁহাকে বহুল পরিমাণে সেক্রেটারী ও মন্ত্রীদের পরামর্শ ও তাঁহাদের তরফের কথা শুনিয়া চলিতে হয়।

সমগ্র ভারতের শাসন-কার্য্য দুইভাগে বিভক্ত, (১) ভারত গভর্ণমেণ্ট (২), প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ। ভারত গভর্ণমেণ্টে একটি কার্য্য-নির্বাহক সভা ও আর একটি ব্যবস্থাপক সভা ছিল। (Governor General's Executive Council and the Imperial Legislative Council)। এখন ইহাকে Legislative Assembly বলে।

গভর্ণর-জেনারেলের অধ্যক্ষসভার ক্ষমতা ও কার্য্য

বড়লাটের কার্য্যনির্বাহক বা অধ্যক্ষ সভার ইতিহাস এই :—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের জন্য একজন গভর্ণর-জেনারেল ও চারজন সদস্য লইয়া কার্য্য করিতে হইত। এই কাউন্সিলই গভর্ণর-জেনারেলের কার্য্যনির্বাহক সভার প্রথম অবস্থা। বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের গভর্ণরগণ গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের অধীন ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন গভর্ণর-জেনারেল তখন কাউন্সিলের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার মতের অমিল হইত। সেইজন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন তখন তিনি বিলাতের ডিরেক্টর-সভা ও পার্লিয়ামেণ্টের বোর্ড-অব কণ্ট্রোলের নিকট হইতে কাউন্সিলের অধিক সংখ্যক সদস্যের মতের বিরুদ্ধেও কাজ করিবার অধিকার লইয়া আসেন। এখনও গভর্ণর জেনারেল বিশেষ প্রয়োজনে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, ইহাকে Veto করা বলে।

গভর্ণর জেনারেল • অধ্যক্ষ সভা (Executive Council)

গভর্ণর-জেনারেলের সভা প্রত্যক্ষভাবে নিম্ন-লিখিত বিভাগগুলি হাতে লইয়াছেন। (১) বৈদেশিক সম্বন্ধ (২) সৈনিক বিভাগ (৩) রাজস্ব বিভাগ (৪) টাকশাল (৫) জাতীয় ঋণ (৬) শুল্ক (৭) ডাক ও টেলিগ্রাফ (৮) রেলওয়ে (৯) ভারতবর্ষের জরীপ

ও ভূ-তত্ত্ব বিভাগ। শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, রাজস্ব আদায়, কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য খাল নির্মাণ, পূর্ত্ত-বিভাগের কিয়দংশ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে ছিল; কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিভাগেরই কার্য্য-প্রণালী মোটামুটি বলিয়া দিতেন, এবং তাঁহাদের নির্দ্ধারিত প্রণালীঅনুসারে কাজ সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা বার্ষিক বিবরণী হইতে বুঝিতে পারিতেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত কৃষি, পূর্ত্ত, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভাগের জন্য ইণ্ডিয়া-গভর্ণমেণ্ট কয়েকজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতেন।

গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার অধ্যক্ষসভার সাধারণ (ordinary) সদস্যগণ স্বয়ং সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন। সাধারণত তাঁহাদের শাসনকাল পাঁচবৎসর। সাধারণ সদস্য সংখ্যা ছয়; ইহার মধ্যে তিন জনের নিয়োগের পূর্ব্বে অন্ততঃ দশবৎসর কাল গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করা চাই। বাঁকী তিনজনের অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের পুরাতন ব্যারিষ্টার হওয়া দরকার, অন্য দুইজনের বিষয়ে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ভারতবর্ষের প্রধান-সেনাপতি শাসন-সভার একজন বিশেষ (extraordinary) সদস্য। কাজেকাজেই গভর্ণর-জেনারেল সমেত অধ্যক্ষসভার মোট সদস্য সংখ্যা ছিল আট; এতদ্ব্যতীত বোম্বাই, মান্দ্রাজ বা বাংলাদেশে অধ্যক্ষ-সভার অধিবেশন হইলে সেখানকার গভর্ণর তখনকার জন্য অধ্যক্ষ-সভার একজন বিশেষ সদস্য ভাবে কাজ করিতেন।

অধ্যক্ষ-সভার সদস্য

লর্ড ক্যানিংএর সময় হইতে অধ্যক্ষ সভার প্রত্যেক সদস্যের উপর কয়েকটী বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। শাসন-সংস্কারের পূর্ব্বে শাসনভার কার্য্যও সেইরূপভাবে বিভক্ত ছিল।

কার্য্যবিভাগ

১। ভারতীয় (Home) আভ্যন্তরীণ কার্য্য
২। আইন (Law)
৩। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (Education)
৪। রাজস্ব (Revenue)
৫। অর্থ বিভাগ (Finance)

} ছয়জন সদস্যের অধীন

৬। বৈদেশিক (Foreign) বড়লাট স্বয়ং ইহা দেখেন।
৭। সৈনিক (Military) জঙ্গীলাট স্বয়ং ইহা দেখেন।

ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তাহারা পার্লিয়ামেণ্টের নিকট হইতে এই ক্ষমতা আনিয়াছিল যে কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারীদের বিচার বিলাতের আইন অনুসারেই হইবে। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পাওয়ার পর দেশীয় লোকদের বিচারের ভার ইংরাজদের হাতে পড়িল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের এক আইন অনুসারে স্থির হইল যে হিন্দু এবং মুসলমানের বিচার তাহাদের শাস্ত্র এবং প্রথা অনুসারেই হইবে। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য কোম্পানীকে সময়ে সময়ে নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

গভর্ণর-জেনারেলের ইতিহাস

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারে গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার অধ্যক্ষ সভা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পাইলেন; কিন্তু উহা বাহাল হইবার পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন হইত। সুপ্রিম কোর্ট উচিত মনে করিলে গভর্ণর-জেনারেল প্রবর্ত্তিত যে কোন আইন কার্য্যকারী না হইতে দিতে পারিতেন। এই

১৭৭৩

লইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের মতান্তর ঘটিতে লাগিল। এই প্রকার বিসদৃশ কাণ্ড দূর করিবার জন্য ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একটি অ্যাক্ট করা হয়। ইহা দ্বারা গভর্ণর-জেনারেল ও তাহার অধ্যক্ষ-সভা সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন ব্যতীত যে কোন নূতন আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা পাইলেন।

১৭৮১

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি অ্যাক্ট দ্বারা গভর্ণর-জেনারেলের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আরও স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইল। ১৮০০ এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর গভর্ণর ও তাঁহাদের অধ্যক্ষ সভাকেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে বৃটীশ রাজ্যের তিন প্রদেশে তিন প্রকার আইন প্রচলিত হইতে লাগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার জন্য গভর্ণর-জেনারেল, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের জন্য গভর্ণর এবং তাঁহাদের নিজ নিজ অধ্যক্ষ-সভার সহযোগে আইন প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। এই নিয়মে বিস্তর অসুবিধা হইতে লাগিল। তিন প্রদেশের তিন রকম আইন, এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের আইন, হিন্দু ও মুসলমানী আইন, কোম্পনী-প্রবর্তিত আইন, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কোন রায় দেওয়া জজদিগের পক্ষে খুব শক্ত হইয়া উঠিল।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

এই প্রকার অব্যবস্থা বা বহুব্যবস্থা দূর করিবার জন্য ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে বোম্বাই মান্দ্রাজ গভর্ণমেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তুলিয়া লওয়া হয় এবং কেবলমাত্র গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার অধ্যক্ষ-সভার হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হইল। তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য একজন 'ল'-মেম্বর (Law Member) নিযুক্ত হইলেন। লর্ড মেকলে ভারতের প্রথম

১৮৩৩ চার্টার অ্যাক্ট

আইন-সদস্য। তিনি কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন না, এবং আইন প্রণয়ন ব্যতীত আর কোন বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না। এই সভায় প্রস্তুত আইন কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশে সমান ভাবে প্রযুক্ত হইত। গভর্ণর-জেনারেল তখন বাংলাদেশে থাকিতেন এবং তাঁহার সভার সদস্যগণেরও কেবল মাত্র বাংলাদেশের শাসন সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা ছিল। কাজেকাজেই তাঁহাদের প্রবর্তিত আইনে মান্দ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশের অসুবিধা হইতে লাগিল। ইহা দূর করিবার জন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে আইন-প্রণয়ন করিবার জন্য এক ব্যবস্থাপক সভা গঠন করা হয়। এই সভা অধ্যক্ষ-সভার পাঁচজন ব্যতীত আরও বারজন লইয়া গঠিত হইত।

১৮৫৩ ব্যবস্থাপক সভা

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে Indian Councils Act, 1861 নামে একটি অ্যাক্ট পাশকরা হয়। ইহাতে আইন বা ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য ও ক্ষমতা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর প্রাদেশিক আইন-সভা প্রবর্তিত আইন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বড়লাটের বিনা অনুমতিতেও পাশ হইতে পারিত কিন্তু এখন হইতে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন আইনই পাশ হইতে পারিবে না ঠিক হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের অ্যাক্টে সমস্ত ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যের উপরে পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত গভর্ণর-জেনারেল আইন-সভার অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ছয় হইতে বারো পর্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল এবং ইহার মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বেসরকারী হওয়ার নিয়ম প্রচলিত হইল। এই বেসরকারী সভ্যদিগের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসীও থাকিতেন; তখন সমস্ত সভ্যই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইতেন। প্রত্যেক সদস্যের কার্য্যকাল দুইবৎসর ছিল। ১৯২০ পর্য্যন্ত

Indian Councils Act, 161.

ভারতীয় আইন সভার কার্য্যাবলী অনেক পরিমাণে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারেই চলিতেছিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে অ্যাক্ট পাশ হয় তাহাতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত (additional) সদস্য সংখ্যা ১৬ করা হইল।

১৮৯২

মোটের উপর অধিকাংশ সদস্য যাহাতে গভর্ণমেণ্টের লোক হয় সেইজন্য বেসরকারী সভ্যের সংখ্যা দশের বেশী করা হইল না। এই দশজনের মধ্যে চারজন চারটি প্রধান প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভার বেসরকারী সভ্য কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন; কলিকাতা চেম্বার অব্ কমার্স (Calcutta Chamber of Commerce) অর্থাৎ 'কলিকাতার বিদেশীয় বণিকসভা' একজনকে নির্বাচন করিতেন এবং বাকী পাঁচজনকে গভর্ণর-জেনারেল নিজে বাছিয়া লইতেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় যে কয়েকজন বেসরকারী সভ্য ছিলেন তাহারা সকলেই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইতেন। এই অ্যাক্ট অনুসারে অন্ততঃ পাঁচজন সভ্য নির্বাচিত হইয়া প্রতিনিধিরূপে আইন-সভায় কাজ করিতে লাগিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভার সদস্যদিগকে বাজেট সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার এবং শাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

১৯০৯
মর্লি-মিণ্টো-রিফর্ম

ইহার পর প্রায় ১৭ বৎসরের মধ্যে ভারত-শাসনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু দেশের মধ্যে জনমত স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল বলিয়া শাসন কার্য্যের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতসচিব মর্লি ও বড়লাট লর্ড মিণ্টো কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য দুইটি; (১) দেশে যে-সব বৃহৎ জনসঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদিগকে

প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা দান, (২) দেশের শাসনে ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যদের মতামত প্রকাশ ও প্রশ্নোত্থাপনেব অধিকতর ক্ষমতা দান। দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ৬০ করা হইল। এতন্মধ্যে গভর্ণর-জেনারেল নিজে ৩৫ জন বাছিয়া লইতেন এবং বাকী ২৫ জন বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত হইত। জনসারণ হইতে সদস্য নির্বাচনের কথা তখনো কেহ কল্পনা করেন নাই গভর্ণমেন্ট যে ৩৫ জন নির্বাচন করিতেন তাহার মধ্যে ২৮ জনের বেশী সরকারী কর্মচারী হইতে পারিত না; ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যগণের কার্য্যকাল তিনবৎসর।

পূর্বোক্ত সংস্কারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যদিগের ক্ষমতাও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সদস্যগণ বাজেট সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতে ও বাজেটের কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতেও পারিতেন, এবং সেই প্রস্তাবের উপর ভোট দিতে পারেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা না করিলে কোন প্রস্তাবই পাশ হইতে পারিত না, কারণ ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় গভর্ণমেণ্টের সদস্য সংখ্যাই বেশী ছিল এবং গভর্ণর-জেনারেল বিশেষ অনুমতি না দিলে সরকারী সভ্যেরা গভর্ণমেণ্টের মতের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারিতেন না।

ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা

বাজেট ভিন্ন অন্য বিষয়েও সদস্যগণ ব্যবস্থাপক-সভার যে-কোন বৈঠকে যে-কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন। শাসনসংক্রান্ত প্রশ্ন করার ক্ষমতাও বাড়ান হইল; এখন একটি প্রশ্নের সঙ্গে সে-বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই সব প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন।

পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যেসব অ্যাক্টের দ্বারা ভারত শাসন চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে বা পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতা অথবা সম্রাটের

বশ্যতার খর্ব হয় এইরূপ কোন আইন এই সভায় পাশ হইতে পারে না। গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ঋণ, ভারতীয় রাজস্ব, প্রজাগণের ধর্ম, সৈনিক বা নৌবিভাগের নিয়মাবলী ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা যায় না। বিশেষ বিশেষ সময়ে গভর্ণর-জেনারেল নিজের ও অধ্যক্ষ-সভার দায়িত্বে ব্যবস্থাপক-সভার মত না লইয়াও যে কোন আইন (ordinance) প্রচার করিতে এবং ছয় মাসের জন্য তাহা বাহাল রাখিতে পারেন।

বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ইংরাজদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। বাংলাদেশ প্রথমে বড়লাট বাহাদুরের খাশ অধীন ছিল; ১৮৫৪ সালে ইহার শাসন একজন ছোটলাটের হাতে অর্পিত হয়। ১৮৩৬ সালে যুক্তপ্রদেশকে পৃথক করিয়া একজন ছোটলাটের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শাসন কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল এবং গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে প্রদেশের আকার ও আয়তনের অনেক উলোট্ পালট্ হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে আফগানিস্থানের দিকে ইংরাজদের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিলে ১৯০১ সালে সেখানে একটি নূতন প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুটি প্রদেশে পরিণত করা হয়—পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার-উড়িষ্যা একদিকে—পূর্ববঙ্গ ও আসাম অপরদিকে। ১৯১১ সালে সম্রাট বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয় তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন যে বঙ্গচ্ছেদ রদ্ হইল। তবে আসামকে পৃথক্ করিয়া একজন চীফ-কমিশনরের হাতে দেওয়া হইল, এবং বিহার-উড়িষ্যাকে একত্র করিয়া নূতন একটি প্রদেশ গঠন করিয়া একজন ছোটলাটের শাসনাধীনে সমর্পণ করা হইল। এইবারে কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

প্রাদেশিক ভাগ-বিভাগ

২। নূতন শাসন সংস্কার।

শাসন সংস্কারের পূর্বাভাস।

ভারতে ১৯০৫ হইতে যে রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হয় ও ভারতবাসীদের মনের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও স্বায়ত্বশাসন লাভের যে ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাহাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। তাহারই ফলে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো সংস্কার। ১৯১৪ সালে য়ুরোপীয় সমর বাঁধে ও ভারতীয়েরা ধন ও প্রাণ দিয়া সাম্রাজ্য রক্ষায় সহায়তা করিল; অপরদিকে পৃথিবীর সমস্ত উৎপীড়িত, ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে Self-determinationএর কথা প্রচারিত হইতে থাকিল। ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক অধিকার পাইবার অত্যুগ্র আন্দোলন চলিতে থাকে, স্বায়ত্বশাসন বা স্বরাজ লাভের জন্য চারিদিকে যে তীব্র বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল, তাহাতে ইংরাজ সরকার আর শান্ত থাকিতে পারিলেন না; ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস-লীগ একত্র হইয়া একটি খশড়া-কনষ্টিটিউশন বা শাসনপ্রণালী লিখিয়া ভারতের অধিকার দাবী করিলেন। এই সব নানা কারণের ফলে ১৯১৭ সালে ২০শে আগষ্ট তারিখে তৎকালীন ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে ভারতকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্বশাসনের পথে চালিত করিতে হইবে। হাউস্ অব্ কমন্‌সে ভারত-সচিব যাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এই :—

ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে ভারতবাসীদের সহায়তা

ক্রমশই বৃদ্ধি করিতে হইবে; এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের মত সম্পূর্ণ এক হইয়াছে; বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তরঙ্গ অংশরূপে ও ভারতে দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্টের ক্রমিক বিকাশের জন্য স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে উন্নত করা সম্বন্ধেও উভয়ে একমত হইয়াছেন। ভারত ও বৃটীশ সরকার স্থির করিয়াছেন যে এই বিষয়ে রীতিমত ব্যবস্থা করিবার সুযোগ শীঘ্র উপস্থিত হইলেই তাহা করিবেন; এই ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা প্রথমে জানা বিশেষ প্রয়োজন, এবং সেইজন্য ভারতের ও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৃটীশ সরকার সম্রাটের অনুমোদন লইয়া স্থির করিয়াছেন ভারত-সচিবের ভারতে গমন সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের যে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে তাহা তিনি গ্রহণ করিবেন; তথায় বড়লাট ও ভারত সরকারের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও প্রাদেশিক শাসনসরকারগুলির মতামত বিবেচনা করিবেন ও উভয়ে দেশের প্রতিনিধি সভাসমিতির বক্তব্য শ্রবণ করিবেন। ভারত-সচিব বলেন যে এই নীতি অনুসারে উন্নতি ধীরে ধীরেই হইতে পারে। বৃটীশ ও ভারতীয় শাসনসরকারের উপর ভারতীয় জনসঙ্ঘের কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে বলিয়া কোন সময়ে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা তাঁহারাই বিচার করিয়া বলিবেন; যাহাদের উপর দেশ সেবার এই নূতন সুযোগ সমর্পিত হইবে তাহাদের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিয়া ইঁহারা চলিবেন; এবং যে-পরিমাণে সহায়তা পাওয়া যাইবে তাহাই দেখিয়া তাঁহাদের দায়িত্ববোধের উপর আস্থা স্থাপন করা হইবে। শাসন সংস্কার বিষয়ে প্রস্তাবসমূহের আলোচনার জন্য সাধারণকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইবে; এবং উহা পরে যথাসময়ে পার্লিয়ামেণ্টের নিকট পেশ করা হইবে।"

মিঃ মণ্টেগুর ঘোষণাপত্র ২০শে আগষ্ট ১৯১৭

পূর্বোল্লিখিত ঘোষণা অনুসারে মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ সালের শেষাশেষি ভারতে আগমন করিলেন। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় শাসনপদ্ধতি সংস্কারের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। মোটামুটি চারিটি কথা মনে রাখিয়া সংস্কারের খসড়া তৈয়ারী হয়। নিম্নে সেই-গুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রতিবেদন ১৯১৮ জুলাই

১। স্থানীয় শাসনসমিতি (Loacl Self-government) সমূহ যতদূর সম্ভব জনসাধারণের মতে চলিবে, এবং বাহিরের সকল প্রকার শাসন হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া চলিবে।

২। সর্বপ্রথমে প্রদেশগুলিতে ক্রমশলভ্য দায়িত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন করা হইবে। দায়িত্ব গ্রহণের কতকগুলি পন্থা অবিলম্বে গ্রহণীয়। বৃটীশরাজের উদ্দেশ্য এই যে অবস্থা অনুকূল হইলেই সম্পূর্ণ শাসন-দায়িত্ব ভারতবাসীর উপর অর্পণ করা। ইহার জন্য প্রদেশগুলিকে অবিলম্বে আইনপ্রণয়ন বিষয়ে, শাসন ও অর্থ সম্বন্ধীয় অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দান করিবার প্রয়োজন ; ইহাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিজ দায়িত্ব বজায় রাখিবার কোনই বাধা ঘটিবে না।

৩। পার্লিয়ামেণ্টের নিকট ভারত গভর্ণমেণ্টেই শাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন ; এবং এই দায়িত্ব ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া জনমত জানিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। পূর্বোক্ত পরিবর্তনগুলি যেমন যেমন কার্য্যে পরিণত হইতে থাকিবে ভারতীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর পার্লিয়ামেণ্টের ও ভারত-সচিবের ক্ষমতাও তেমনি হ্রাস পাইবে।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (প্রতিবেদন) ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনের ফলে দুইটি কমিটি (Franchise

Committee) ১৯১৮-১৯ সালের শীতকালে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নির্বাচন মণ্ডলী স্থির করেন। ১৯১৯ সালে পুনরায় আর একটি কমিটি বসে; তাহারা ইংলণ্ডে ভারতীয় রাজনীতি ও শাসনসম্বন্ধে কি কি উন্নতি হইতে পারে তাহার তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সেই সময়ে বিলাতের হাউস্ অব্ লর্ডসের সাত ও কমন্সের সাতজন সভ্য লইয়া আর একটি কমিটির সম্মুখে ভারতের শাসন পরিবর্তনের বিলের খসড়া পেশ করা হয়। তাহারা অনেক সাক্ষী সাবুদ লইয়া প্রকাণ্ড এক রিপোর্ট দাখিল করিলেন। ১৯শে নভেম্বর ১৯১৯ সালে পার্লিয়ামেণ্টে আলোচনা সমাপ্ত হইল ও ২৩শে ডিসেম্বর রাজসম্মতি পাইয়া বিলটি আইনে পরিণত হইল।

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে নূতন সংস্কার অনুসারে কার্য্য সুরু হয়। রাজ খুল্লতাত ডিউক অব্ কনট আসিয়া দিল্লীর প্রথম ব্যবস্থা পরিষদ স্থাপন করিলেন। নূতন ব্যবস্থায় কিকি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্টের ক্রমশ উন্নতি বিধান করাই বর্তমান সংস্কারের উদ্দেশ্য। দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট বলিতে দুইটি জিনিষ বুঝায়; প্রথমত গভর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষসভা তাঁহাদের নির্বাচকদের নিকট দায়ী থাকিবেন; দ্বিতীয়ত নির্বাচকগণ সভাতে তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে তাঁহাদের শক্তি প্রয়োগ করিবেন। এই দুই সর্তের অর্থ দাঁড়ায় এই যে প্রজাদের এমন শক্তি থাকা চাই যাহাতে তাহারা ভোট দিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে পারে ও নিজ নিজ প্রতিনিধিগণকে বিবেচনাপূর্বক নির্বাচন করিতে পারে। দ্বিতীয় কথা এই যে অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশের সহায়তা লাভ হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের কর্মত্যাগ করাই শাসন বিভাগের চল্‌তি প্রথা। ভারতে এ সর্তগুলি কার্য্যে পরিণত হইতে

সংস্কারের উদ্দেশ্য

পারে না। এই আদর্শ লাভ করিবার পূর্বে ভারতকে কিছুকাল ধরিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে দায়িত্বভার শিক্ষার চর্চা প্রয়োজন। নানা কারণে সরকার বলেন এই মুহূর্তেই ভারতবাসীদের হস্তে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য গভর্ণমেণ্ট দেশীয়দের হাতে কতকগুলি বিষয় সমর্পণ করিয়া নিজের হাতে কতকগুলি রাখিয়া দিবেন; এই সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনবিভাগের স্বাধীনতা যথেষ্ট দান করা হইবে।

প্রাদেশিক শাসন

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব লাভকেই বাস্তব করিয়া তোলাই বর্তমান শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্য; সুতরাং প্রাদেশিক উন্নতির জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা আর হইতেছে না। ভারতবাসীদের এক্তিয়ারের মধ্যে যে বিষয় পড়িয়াছে সেগুলির জন্য যে-পরিমাণ ব্যয় পড়িবে তাহা স্থিরকৃত হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ের জন্য কতকগুলি আয় বাঁধা হইয়াছে। অবশিষ্ট রাজস্ব প্রাদেশিক শাসনসরকারের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের নিজ নিজ প্রাদেশিক শাসন ও সুব্যবস্থার জন্য তাঁহারাই দায়ী। ভারতীয় ও প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের পূর্বের ব্যবস্থা আছে; ভারত সরকারের রাজস্বের মধ্যে ইন্‌কম্ ট্যাক্স ও সাধারণ ষ্ট্যাম্পের আয়; প্রাদেশিক আয়ের অন্তর্গত হইয়াছে জমির রাজস্ব, জলসেচনের আয়, আবগারী ও কোর্টফির ষ্ট্যাম্প। দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য প্রাদেশিক সরকারই দায়ী।

রাজস্বের ভাগ

উপরিউক্ত বন্দবস্তের ফলে ভারত সরকারের অনেক টাকা প্রাদেশিক সরকারের হস্তে অর্পিত হইয়াছে; ইহাতে ভারত সরকারের অর্থ অকুলান হইয়াছে। সেইজন্য প্রাদেশিক সরকার হইতে মোট আয় ও ব্যয়ের উদ্বৃত্তের কিয়দংশ ভারত সরকার দাবী করিয়া থাকেন।

ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার সমূহের সহিত এক হইয়া কোন্ কোন্ বিষয়ে ট্যাক্স করা যাইতে পারে তাহার একটি ফর্দ তৈয়ারী করিয়াছেন। এই ফর্দের অন্তর্গত বিষয়ের উপর প্রাদেশিক সরকারের ট্যাক্স করিবার অধিকার আছে। কিন্তু বিল্‌টিকে একবার বড়লাটের সভায় দেখাইয়া আনিয়া কার্য্যকারী করিতে হয়।

প্রাদেশিক কর ধার্য্য

প্রাদেশিক সরকারের অর্থ কর্জ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু সমস্ত কর্জ ভারত সরকারের মারফৎ করিতে হইবে; ভারত সরকারের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ হইতে প্রাদেশিক সরকারকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বের শাসনপদ্ধতি হইতে নূতন সংস্কারের এইখানেই পার্থক্য। প্রাদেশিক শাসনের খুঁটিনাটি কোনো বিষয়ে বড়লাট সহজে হস্তক্ষেপ করেন না।

সকল প্রদেশেই লাটসাহেব (Governor) কার্য্য-নির্বাহক সভার সাহায্যে শাসন করিতেছে। লাটসাহেব এই সভার প্রধান; তাঁহার দুই বা তিনজন মন্ত্রী সাহায্য করেন, একজন সাহেব, একজন ভারতবাসী; উভয়েই শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক মনোনীত হন ও সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। ইঁহাদের উপর সরকারের 'রক্ষিত' (Reseverd) বিষয়গুলির ভার আছে। এতদ্ব্যতীত ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত সভাশ্রেণী হইতে কয়েকজন দেশীয় মন্ত্রীকে গভর্ণর মনোনীত করিয়া লইবেন; এই মন্ত্রীগণ "অর্পিত" বিষয় সমূহের জন্য দায়ী।

প্রাদেশিক কার্য্যনির্বাহক সভা

সরকার-পক্ষীয়েরা বলেন যে ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা ও শক্তি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে শাসনদায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে সমস্ত শাসনকার্য্য এককালেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেইজন্য কতকগুলি দায়িত্ব ভারতবাসীর উপর অর্পিত হইয়াছে। কিকি বিষয়

অর্পিত হইবে ও কোন্ কোন্ বিষয় সরকারী পক্ষ হইতে রক্ষিত হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এই ভাগকে আমরা 'অর্পিত' বিষয় ও 'রক্ষিত' বিষয় বলিব। প্রাদেশিক শাসনে গভর্ণর ও তাঁহার অধ্যক্ষ সভার উপর 'রক্ষিত' বিষয়গুলির ভার ও দেশীয় মন্ত্রীদের উপর "অর্পিত" বিষয়গুলি তদারকের ভার। সাধারণ অধ্যক্ষ-সভায় সকল সদস্যের সহিত সকল বিষয়েরই আলোচনা হয়; কিন্তু প্রয়োজন মত 'রক্ষিত' বিষয়ের আলোচনা অধ্যক্ষ-সভার সরকারী মনোনীত সভ্যদের সহিত হয় ও 'অর্পিত' বিষয় সম্বন্ধে দেশী মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা হয়। এবং প্রত্যেক বিষয়ের চরম মীমাংসা লাটসাহেব নিজ নিজ বিষয়ের মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া করিয়া থাকেন।

নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর দেশীয় মন্ত্রীদের কার্য্যকালের নির্ভর। তাঁহাদের কার্য্যকালের বেতন নির্বাচকদিগকেই ঠিক করিতে হয়। "অর্পিত" বিষয়ের জন্য তাঁহারা বাহ্যত দায়ী বলিয়াই যে প্রথম হইতে তাঁহাদের পরামর্শেই গভর্ণর চলিবেন এমন নহে, কারণ শেষ পর্য্যন্ত তিনিই সমস্ত শাসনের জন্য দায়ী; আবার সকলের মত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি চলিবেন তাহাও বাঞ্ছনীয় নহে। গভর্ণরের স্থানীয় অবস্থাদির অজ্ঞতার জন্য তিনি দুই একজন অতিরিক্ত সভ্য অধ্যক্ষ-সভায় আনিতে পারেন; তবে তাঁহাদের কোন আপিসের কাজে থাকেন না, তাঁহারা কেবলমাত্র পরামর্শ দিবেন।

প্রত্যেক প্রদেশেই বৃহত্তর ব্যবস্থা-পরিষদ্ (Legislative Council) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব সভায় নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যাই অধিক এবং সভ্যগণ সাধারণ লোকের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইতেছে। পূর্বে সাধারণ লোকের মধ্য হইতে প্রত্যক্ষভাবে কোনো নির্বাচন হইত না। এক্ষণে ভারতবর্ষের লোকে তাহাদের

বৃহত্তর প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ্

মনোনীত নেতাকে প্রাদেশিক (Council) ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার (Assembly) সদস্যরূপে প্রেরণ করিতেছে। কোন্ প্রদেশের কতজন সভ্য হইবেন, কতজন নির্বাচক হইবে, কাহার ভোট দিবার অধিকার হইবে ইত্যাদি বিচার করিবার জন্য এক কমিশন বসিয়াছিল। সেই কমিশনের মন্তব্য দেখিয়া ভারত-সচিব ও বড়লাট তাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ধর্ম্মগত নির্বাচন দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পরিপন্থী, কিন্তু তথাচ মুসলমানদের জন্য পৃথক্ নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে ; শিখ্দিগকেও এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় খৃষ্টান্, অন্ত্যজজাতির স্বার্থ-রক্ষার জন্য পৃথক নির্বাচন কোনো কোনো প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রদেশের বহুবিধ সরকারী কাজের একটি বা কয়েকটি করিয়া বিষয় অধ্যক্ষ-সভার এক একজন সভ্যের উপর অর্পিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি করিয়া স্থায়ী কমিটিও গঠিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক কমিটির সদস্য নির্বাচন করিয়া থাকেন। এই কমিটি পরামর্শ দেন। অধ্যক্ষ-সভার সভ্য বা দেশীয় মন্ত্রী যাহার উপর যে বিভাগের ভার তিনিই সভাপতি।

ব্যবস্থাপক সভায় 'অর্পিত' বা 'রক্ষিত' বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া যদি কোনো প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয় তথাচ উহা যে লাট-সাহেবকে মানিয়াই যাইতে হয় তাহা নহে।

গভর্ণরের ক্ষমতা

প্রত্যেক সভ্যেরই প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা আছে এবং পূর্ব্বের অপেক্ষা নূতন নিয়মানুযায়ী সভ্যদের প্রশ্ন-বিষয়ে ক্ষমতা বাড়িয়াছে। তবে শেষ নিষ্পত্তির ভার গভর্ণরের নিজের হাতে; তিনি 'সাম্রাজ্যের কল্যাণে'র জন্য 'সার্টিফাই' করিয়া যে কোনো গৃহীত মতকে নাকোচ করিতে পারেন।

নূতন কৌন্সিল গঠিত হওয়াতে নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা অধিক হইতেছে। তখন সরকারী কোনো আইন পাশ্ করাইতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অসুবিধা হইতে পারে; এই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী "রক্ষিত" বিষয় সম্বন্ধে কোনো আইন পাশ করিবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে বলিতে হয় যে দেশের শান্তি ও সুব্যবস্থার জন্য তিনি দায়ী বলিয়া তাঁহাকে এই আইন পাশ করিতে হইতেছে। ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যগণ ভারত সরকারের কাছে ইহার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব করিতে পারেন ও সম্বহুলতার (vote) দ্বারা তাহা কার্য্যকারী করিতে পারেন। ভারত-সরকারের বিবেচনায় যদি উহা সমীচিন হয় তবে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বিলটিকে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন।

সরকারী বিল

ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার আছে। প্রত্যেক প্রাদেশিক বিল্ পাশ হইবার পূর্ব্বে বড়লাট ও সম্রাটের অনুমোদন সাপেক্ষ।

প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের খসড়া অধ্যক্ষ-সভার সকল সদস্যে মিলিয়া করেন। রাজস্বের আদায় হইতে ভারত-সরকারকে সর্বপ্রথমে টাকা দিতে হয়; তৎপরে সরকারী 'রক্ষিত' বিষয়গুলির জন্য টাকার ব্যবস্থা করিতে হয়। "অর্পিত" বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে মন্ত্রীরা ভাবিবেন; যদি উদ্বৃত্ত রাজস্ব অধিক না থাকে তবে পুনরায় ট্যাক্স করিবার কথা গভর্ণর ও মন্ত্রীগণ বিবেচনা করিয়া ঠিক করিবেন। এই খসড়া তৈয়ারী হইলে উহা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হয়; সেখানে বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা হয়; কিন্তু "রক্ষিত" বিষয়ের জন্য সরকার যে টাকা ধার্য্য করিয়াছেন সে বিষয়েও ব্যবস্থাপকসভা সম্বহুলতা বা ভোটের দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে পরাভূত করিতে পারেন। তবে লাটসাহেব তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া

রাজস্বের ব্যয়

জ্ঞাপন করিলে তাহা পূর্বোল্লিখিত উপায়ে পাশ্ হইয়া যায় ; এই লইয়া সরকারের সহিত বঙ্গীয় কাউন্সিলের অত্যন্ত মতান্তর হয়।

দেশীয় মন্ত্রীদের বেতন ও 'অর্পিত' বিষয়গুলির আয় ব্যয়ের সম্পূর্ণ ভার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার উপর। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীর বেতন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ; মধ্যপ্রদেশ ও বঙ্গদেশে 'স্বরাজ্যদলে'র চেষ্টায় মন্ত্রীদের বেতন বন্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে ১৯২৫ হইতে কোনো দেশীয় মন্ত্রী বা 'অর্পিত' বিষয় নাই। বিশেষ আইন পাশ করিয়া এখন সমস্ত কার্য্যই গভর্ণর ও তাঁহার অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ করিতেছেন।

বাহিরের কমিশন

ভারতের এই নূতন শাসনপদ্ধতিকে ঠিক পথে চালিত করিবার জন্য মাঝে মাঝে বিলাত হইতে কমিশন আসিয়া গভর্ণমেণ্টও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিবেন। এই কমিশনের নিকট উভয় পক্ষের শুনানী হইবে ; গভর্ণমেণ্ট "রক্ষিত" বিষয়গুলির জন্য অতিরিক্ত টাকা অপব্যয় করিয়াছেন কিনা, সকৌন্সিল গভর্ণর অযথাভাবে ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন কিনা অথবা ব্যবস্থাপক সভা "রক্ষিত" বিষয়গুলির জন্য অর্থাদি দিতে অত্যন্ত কার্পণ্য প্রকাশ করায় তাঁহাদের অধিক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য অর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা ইত্যাদি লইয়া আলোচনা হইবে। প্রথমে নূতন কৌন্সিল হইবার দশ বৎসর পরে এই কমিশন আসিবে। এই কমিশন পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। কোন্ প্রদেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে, কাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহা ইঁহারাই বিচার করিবেন।

ভারতবাসীরা রাজনৈতিক ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করিতে থাকিলে তাঁহাদের হাতে একটি একটি করিয়া রক্ষিত বিষয় অর্পণ করাই বর্তমান শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্য। ক্রমে 'রক্ষিত' বিষয় আর থাকিবে না,

সমস্তই ভারতীয়দের হাতে যাইবে ও সম্পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে। পাঁচ বৎসর পরে "রক্ষিত" বিষয় সম্বন্ধে আবেদন বড়-লাটের নিকট পেশ করিবার অধিকার কৌন্সিলের থাকিবে। দশ বৎসর পরে বিলাত হইতে এ বিষয়ে সবিশেষ তদন্ত হইবে। ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালে ভারতীয় রাষ্ট্রসভার কতকগুলি সভ্য ও প্রাদেশিক শাসনের সভ্যেরা দ্বৈরাজ্য (Dyarchy) কিরূপে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার জন্য এক কমিটি বসাইতে বলেন; তাহার ফলে মুডিমান কমিটি বসে। অধিকাংশ দেশীয় মন্ত্রী ও সভ্যেরা বলেন যে তাঁহাদের স্বাধীনতা নামমাত্র; কোনো দায়িত্বপূর্ণ কর্ম তাঁহারা নিসঙ্কোচে করিতে অপারগ। ১৯২৯ সালে দশ বৎসর পূর্ণ হইলে দ্বৈরাজ্য (Dyarchy) ও শাসনপদ্ধতি কিরূপ চলিতেছে সে বিষয়ে কমিশন বসিবে। কিন্তু তাহার পূর্বেই যাহাতে ভারতবাসীদের উপর আরও দায়িত্ব অর্পিত সে বিষয়ে সদস্যেরা দাবী করেন। মুডিমান কমিটি বলিয়াছেন যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শাসন সংস্কারের কোনোরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই।

ভারত সরকার (India Government)

অধিক সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করিয়া বৃহত্তর ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করা এখানেও হইয়াছে। যতদিন না প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় ততদিন ভারতসরকার পার্লিয়া-মেণ্টের নিকট সকল বিষয়ে দায়ী। পুরাতন অধ্যক্ষ-সভার ন্যায়ই বড়লাট ও তাঁহার সাতজন মন্ত্রী লইয়া নূতন সভা গঠিত। যথা, রাজস্ব ও কৃষি, অভ্যন্তর (Home), আয় ব্যয়, শিক্ষা বিভাগ। ল-মেম্বর ব্যবস্থাপক বা আইন প্রণয়ন বিভাগের জন্য দায়ী; বাণিজ্যও শিল্প বিভাগের ভার প্রায়ই একজন ভারতীয় সিবিল সার্বিসের লোকের উপর ন্যস্ত থাকে। বৈদেশিক

মন্ত্রীসভা, ব্যবস্থাপক, সমিতি

(Foreign) ব্যাপার বড়লাট স্বয়ং দেখেন। রেলওয়ের জন্য তিনজন সদস্য লইয়া একটি বোর্ড আছে। ইহা শিল্প-বাণিজ্য সচিবের অন্তর্গত। জঙ্গীলাট একজন বিশেষ সদস্য। এখন প্রায়ই দুইজন দেশীয় সভ্য অধ্যক্ষ-সভার সদস্যরূপে থাকেন।

ব্যবস্থাপক সভাকে Legislative Assembly বলা হয়। এই সভার সভ্য সংখ্যা হইবে ১৪৪ জন। ইহার মধ্যে ১০৪ জন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট বড়লাট কর্তৃক মনোনীত। এই সভায় সভ্যগণ তিন বৎসর কাল সভ্যরূপে কার্য্য করেন।

বেসরকারী সভ্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের বিশেষ "রক্ষিত" ক্ষমতার অন্তর্গত; ব্যবস্থাপক সমিতিতে অসামঞ্জস্য বা সকল প্রকারের ত্রুটি দূর করিবার জন্যই বড়লাট বাহাদুর সাধারণ নির্বাচন হইয়া যাইবার পর প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের সহিত পরামর্শ করিয়া বেসরকারী সভ্য মনোনীত করেন।

মনোনীত সভ্যসংখ্যা

মনোনীত সভ্যদের সংখ্যা ⅓ এর বেশী হইতে পারে না এবং এই সংখ্যক মনোনীত সভ্য সর্বদা আহ্বান করিবেন কিনা ইহা বড়লাট স্বয়ং বিচার করিবেন। অধ্যক্ষ-সভার সভ্যগণ ব্যতীত অপর সরকারী সভ্যদের নিজ নিজ মত দিবার ও নিজ মতানুযায়ী ভোট দিবার অধিকার আছে অবশ্য গভর্ণর সরকারী পক্ষে মত দিতে বলিলে তাঁহারা তদ্রূপ করিতে বাধ্য।

সরকারী আইন ও Council of State.

শাসন-সংস্কারের পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে ভারতের সুশাসনের জন্য সরকারের নিজ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজন। এই জন্য 'কৌন্সিল্ অব ষ্টেট্' নামক একটি দ্বিতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সভায় সভ্যসংখ্যা কতজন হইয়াছে তাহা পরে বলিব। এই সভায় সভ্যগণ পাঁচবৎসর কাল সভ্য থাকেন এবং তাঁহাদের সম্মিলিত মতই অধিকাংশ

স্থলে বড়লাট বাহাদুর গ্রহণ করেন; কারণ এই সভার সদস্যগণ সাধারণত রক্ষণশীল এবং তাঁহাদের মত সরকারের মনোমত হয়।

সাধারণত সরকারী বিল ব্যবস্থাপক সভা প্রবর্তিত হয়। সেখানে যথারীতি পাশ হইয়া গেলে কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের সমক্ষে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয়। কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ যদি প্রস্তাবিত বিলের এমন সব সংশোধন প্রস্তাব যোজনা করেন যাহা ব্যবস্থাপক সভা গ্রহণ করিতে অক্ষম তখন বিচারের ভার উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনের উপর অর্পিত হয়। আর যদি গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত তাহা হইলে বড়লাটকে ঘোষণা করিতে হয় যে সাম্রাজ্যের মঙ্গল ও সুব্যবস্থার জন্য এই আইন পাশ হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়। তখন ব্যবস্থাপক সভার আর কোনো প্রতিবাদ করিবার অধিকার থাকে না এবং উভয় সভার সম্মিলিত বিচারেরও কোন প্রয়োজন হয় না।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

বেসরকারী সভ্যেরা উভয় সভাতেই বিল বা নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারেন। সভায় প্রস্তাব পাশ হইবার পর অপর সমিতিতে তাহা সমালোচনা ও বিচারের জন্য যায়। মতান্তর হইলে উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনে তাহার বিচার হয়; এক্ষেত্রে বড়লাটের ইচ্ছানুযায়ী তাহা তদ্দণ্ডেই আইনে পরিণত হইতে পারে।

বড়লাট যে-কোনো সময়ে যে-কোনো সভা বা উভয় সভাই বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কোনো আইনে মত বা অমত দিবার সম্পূর্ণ অধিকার ভারত-সচিব ও বড়লাটের আছে।

রাজস্ব সম্বন্ধে প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে হয়; এবং বাজেট বা আয়ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে পেশ্ করা হয় কিন্তু তাঁহাদের ভোট দিবার কোনো অধিকার নাই। সভ্যেরা কোনো

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহা সম্বহুলতার দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে করিতে বাধ্য করিতে পারেন না; তাঁহাদের প্রস্তাব পরামর্শের ন্যায় গৃহীত হয়। ভারত সরকারের 'রক্ষিত' বা অর্পিত বলিয়া কোনো বিষয় নাই। সেখানে সমস্তই সরকারী।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় ভরতীয় ব্যবস্থা পরিষদ (Assembly) ও রাষ্ট্র-পরিষদে (Council of State) প্রত্যক্ষভাবে সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকে। পূর্বে পরোক্ষভাবে অতি অল্প সংখ্যক নির্বাচক কর্তৃক একটি সভার সদস্য নির্বাচিত হইত। ব্যবস্থা পরিষদ হইতে রাষ্ট্র পরিষদে সদস্য নির্বাচনের প্রথা আছে। ব্যবস্থা পরিষদ অনেকটাই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় গঠিত। সদস্য সংখ্যা কোন প্রদেশ হইতে কিরূপভাবে নির্বাচিত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

	আসেমব্লী	কাউনসিল অব্ ষ্টেট্
বঙ্গদেশ	১৭	৬
মান্দ্রাজ	১৬	৫
বোম্বাই	১৬	৬
যুক্ত প্রদেশ	১৬	৫
পঞ্জাব	১২	৪
বিহার উড়িষ্যা	১২	৩
মধ্য প্রদেশ	৬	২
আসাম	৪	১
বর্মা	৪	২
দিল্লী	১	০
	১০৪	৩৪

আসেমব্লী বা ব্যবস্থা পরিষদের ১৪৪ জনের মধ্যে ১০৪ জন নির্বাচিত; অবশিষ্ট ৪০ জন মনোনীত, কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র ২৬ জন সরকারী লোক। বড়লাটের অধ্যক্ষসভার সদস্যগণকে যথানিয়ম বড়-লাটকে মনোনীত করিতে হয়। রাষ্ট্র-পরিষদের সভাপতি বড়লাট কর্তৃক মনোনীত। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেছেন। প্রথম সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি, জে, পাটেল।

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচন প্রাদেশিক সভা অপেক্ষা বিস্তৃত ভূখণ্ডের নির্বাচক মণ্ডলীর মধ্য হইতে করিতে হয়; যেখানে প্রাদেশিক সভার ৮০ জন সদস্য নির্বাচিত হন, ব্যবস্থা-পরিষদে সেখানে ১২ জন মাত্র হয়। নির্বাচকদের ক্ষমতা ও গুণ এক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজন।

ভারতসরকারেও কয়েকটি স্থায়ী কমিটি বা Standing Committee আছে; অনেক টেক্‌নিক্যাল কাজকর্ম সকল সদস্যকে লইয়া করা সম্ভব নয়। সেইজন্য অনেক কাজকর্ম প্রথম অবস্থায় স্থায়ী কমিটির হাত দিয়া যায়।

ব্যবস্থাপক সভা ও কাউন্সিল অব ষ্টেটের অধিবেশনে সদস্যগণের যে-কোনো প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে; কিন্তু কতকগুলি প্রশ্ন সাম্রাজ্যের ক্ষতিকর বলিয়া তাহা না উঠিতে দিবার অধিকার বড়লাটের আছে; এবং প্রত্যেক বিষয়ে উত্তর দিতেও সরকার বাধ্য নহেন।

সম্রাটের আদেশক্রমে বিলাতের অনুরূপ একটি প্রিভিকৌন্সিল ভারতে স্থাপিত হইবে; এই কৌন্সিল বৃটীশভারত ও করদরাজ্যগুলির মধ্য হইতে জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইবে; সভ্যগণ চিরজীবনের মত মনোনীত হইবেন। বড়লাটকে উপদেশ ও পরামর্শ দান ছাড়া ইহার আপাতত আর কোনো কর্তব্য থাকিবে না।

ইণ্ডিয়া অপিস (India Office)

ভারতবাসীদের হস্তে যে-সকল বিষয় অর্পিত হইয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াছেন। কারণ তাঁহারা নিজেরাই ভারতবাসীকে অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু সরকারী "রক্ষিত" বিষয়গুলি সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টের দায়িত্ব ষোলআনা। সকৌন্সিল বড়লাটের উপর দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল বিষয় ভারত-সচিবের অনুমত্যনুসারে করিতে হইত বর্তমানে সেরূপ করিতে হয় না। ভারত-সচিব ক্রমে ক্রমে তাঁহার দায়িত্ব ও কর্মভার কমাইয়া আনিতেছেন।

India office ও ভারত সচিব

নূতন বিধি অনুসারে ভারত-সচিবের বেতন ভারতীয় রাজকোষ হইতে আর প্রদত্ত হইতেছে না; ইংলাণ্ডের রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর তাঁহার বেতন দিবার ব্যবস্থা পার্লিয়ামেণ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ইণ্ডিয়া অপিসের অন্যান্য ব্যয় সমস্তই ভারতকে বহন করিতে হয়।

ইণ্ডিয়া অপিসে 'হাই কমিশনর' নামে একটি নূতন পদ সৃষ্ট হইয়াছে। ভারত-সচিবের দুই রকমের কাজ ছিল, কতকগুলি ভারত-সরকারের কাজ, যেমন এজেণ্টের কাজ, জিনিষপত্র ক্রয় ইত্যাদি, ও কতকগুলি পার্লিয়ামেণ্টের ভারত হইতে শাসনবিষয়ক কাজ। বর্তমানে হাই কমিকমিশনর ভারত-সচিবের প্রথম শ্রেণীর কাজগুলির ভার লইয়াছেন। ইঁহার ও তদীয় অপিসের ব্যয় ভারতীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইতেছে।

ভারতের এই সব শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করদ রাজাদের পূর্বের সনদ সন্ধি প্রভৃতির সর্তের সহিত কোনো প্রকারে গণ্ড-গোল সৃষ্টি করিবে না। ভারতের করদ রাজাদের লইয়া একটি সভা গঠিত হইয়াছে। সাধারণত বৎসরে একবার করিয়া এই সভার অধিবেশন হয় এবং বৃটীশ ভারত বা ষ্টেট সংক্রান্ত আলোচনা সেখানে হয়। ইহাদেরও একটি স্থায়ী কমিটি হইয়াছে, বড়লাট সচরাচর সেই কমিটির সহিত আলোচনা করেন।

করদরাজ্য ও নূতনসংস্কার

দুই বা ততোধিক ষ্টেটের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অথবা কোনো ষ্টেটের সহিত বৃটীশ সরকারের বিবাদ উপস্থিত হইলে বড়লাট এবিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিশন বসাইতে পারেন; এই কমিটিতে একজন হাইকোর্টের জজ ও উভয় পক্ষের এক একজন প্রতিনিধি সভ্য থাকিবেন।

পূর্বোল্লিখিত রাজাদের সভা, প্রিভিকাউন্সিল ও কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্ কখনো কখনো একত্র মিলিত হইয়া আলোচনা আহ্বান করিতে পারিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ সভা আহূত হয় নাই।

নির্বাচন ও ফ্রাঞ্চাইজ্।

নূতন সংস্কার বিধি-অনুসারে ভারতের সাধারণ লোকে প্রত্যক্ষভাবে নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিতেছে। উক্ত কমিটির মন্তব্যানুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তি নির্বাচনকারী হইতে পারিয়াছেন; আমরা বাংলাদেশের নিয়মটি নিম্নে দিলাম :—

নির্বাচক হইবার যোগ্যতা।

(১) কলিকাতা সহরের মধ্যে যাহারা ম্যুন্সিপালটির ভোট দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; (২) হাওড়া কিম্বা কাশীপুর ম্যুন্সিপালটিতে যাহারা ৩৲ টাকা ট্যাক্স দেন; (৩) অন্যান্য ম্যুন্সিপালটি ও ক্যাণ্টন-

মেণ্টে যাঁহারা বাৎসরিক ১৷৷০ টাকা হিসাবে ট্যাক্স দেন; (৪) যাঁহারা অন্ততপক্ষে বাৎসরিক ১৲ টাকা রোড বা পাবলিক সেস্ দেন; (৫) যাঁহারা বাৎসরিক ২৲ টাকা চৌকীদারী ট্যাক্স দেন; (৬) যাঁহারা ইনকম্ ট্যাক্স দেন বা (৭) ভারতীয় সৈন্যবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সকলেই নির্বাচনের ক্ষমতা পাইয়াছেন। তবে তাঁহাদের বাসস্থান সেই জেলা বা ম্যুন্সিপালটি পরিচালিত সহরের সীমার দুই মাইলের মধ্যে হওয়া চাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্বাচনকারীর সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। জমিদারের স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক্ প্রতিনিধি আছে। নিম্নে কোন্ প্রদেশে কত লোক ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

	নির্বাচক	ব্যবস্থাপক সভ্য
বাংলাদেশ	১২,২৮,০০০	১২৫
মান্দ্রাজ	৫,৪২,০০০	১১৮
বোম্বাই	৬,৫৩,০০০	১১১
যুক্তপ্রদেশ	১৪,৮৩,৫০০	১১৮
পঞ্জাব	২,৩৭,০০০	৮৩
বিহার-উড়িষ্যা	৫,৭৬,০০০	৯৮
মধ্য-প্রদেশ	১,৫৯,৫০০	৭০
আসাম	৩,০৩,০০০	৫৩

নির্বাচন ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অল্পসভ্য সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকজন বেসরকারী সভ্য মনোনীত করিয়া থাকেন। (১) পঞ্জাব ব্যতীত সকল প্রদেশের অন্ত্যজ জাতিদের মধ্য হইতে, (২) মান্দ্রাজ ও বাংলাদেশ ব্যতীত অপর সকল প্রদেশেরই ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্য হইতে, (৩) মান্দ্রাজ ও মধ্য-প্রদেশ ব্যতীত অন্য প্রদেশের

মনোনীত সভ্য।

ভারতীয় খৃষ্টানদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। (৪) বোম্বাই, বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা, ও আসামের শ্রমজীবিদের মধ্য হইতে, (৫) পঞ্জাবের যোদ্ধ সম্প্রদায়, (৬) বাগিচা ও খনির কাজ ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের জন্য, (৭) আদিমজাতি ও প্রবাসী অধিবাসী ও (৮) বিহারের বাঙালীর জন্য পৃথক সভা। আমরা পরিশিষ্টে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভার বিষদ্ তালিকা দিয়াছি।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভূখণ্ড হইতে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্র-পরিষদ (কাউন্সিল অব্ ষ্টেট) অপেক্ষাকৃত ধনশালী ও বনিয়াদী অধিবাসীদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র-পরিষদ ইংলণ্ডের হাউস অব্ লর্ডস বা আভিজাত্যমণ্ডলীর ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান; রক্ষণশীলতা ইহাদের প্রধান গুণ।

কাহারা নির্বাচক বা সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবে না তাহার তালিকা দিতেছি।

সভা হইবার অধিকার

১। কোনো স্ত্রীলোক; ২। যিনি বৃটীশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্যের প্রজা নহেন; ৩। কোনো সরকারী কর্মচারী; ৪। যিনি আদালত হইতে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন; ৫। পঁচিশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক কোনও ব্যক্তি; ৬। সার্টিফিকেটহীন দেনাদার বা কোনো ইনসলভেণ্ট। ৭। সকৌন্সিল গভর্ণরের মতে নৈতিক অক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কিম্বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি। তবে দণ্ড রহিত হইলে বা উক্ত আদালত হইতে মুক্তি পাইলে সভ্য হইতে পারিবেন। ৮। উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কার্য্যচ্যুত বা কিছুদিনের জন্য অবসরপ্রাপ্ত কোনো আইনব্যবসায়ী। ৭।৮ দফার লিখিত ব্যক্তিগণকে কৌন্সিল গভর্ণর বাহাদুর ইচ্ছা করিলে সভ্যপদপ্রার্থী হইবার অনুমতি দিতে পারেন। নির্বাচনকারী ব্যতীত অপর কেহ সভ্য হইতে পারেন না। বর্মার

নারীরা ভোট দিতে পারে ; ভারতে প্রায় কোথায়ও সে অধিকার নাই ; তবে দেশে এ লইয়া খুবই আন্দোলন হইতেছে এবং মান্দ্রাজে নারীর ভোট গৃহীত হইতেছে।

অর্পিত বিষয়।

গভর্ণমেণ্টের করণীয় সমস্ত কার্য্য তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

১। খাশ ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিষয় আছে।

২। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণর ও অধ্যক্ষ সভায় হস্তে কতকগুলি কার্য্যভার "রক্ষিত" (Reserved) আছে।

৩। দেশীয় মন্ত্রীদের ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার উপর কতকগুলি বিষয় অর্পিত হইয়াছে। দেশীয় মন্ত্রীদের হস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি "অর্পিত" হইয়াছে।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন (Local Self-Government) অর্থাৎ ম্যুন্সিপালটি, Improvement Trust, জেলা-বোর্ড, স্বাস্থ্যবোর্ড ইত্যাদি।

পাউণ্ড (যেখানে ছাড়া গরু ছাগল আটকাইয়া রাখা হয়) ইহার অন্তর্গত হইয়াছে।

চিকিৎসা বিভাগ, হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, আতুরাশ্রম। অবশ্য চিকিৎসা বিভাগের উচ্চতন চাকুরীগুলি বর্ত্তমানে রিজার্ভ থাকিবে। সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্যানিটেশন, জন্মমৃত্যুর তালিকাদি প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্য।

বৃটীশভারতের অন্তর্গত তীর্থস্থানগুলির ভার।

প্রাথমিক ও মধ্য-বাংলা শিক্ষা ; উচ্চ শিক্ষা, য়ুনিভার্সিটি ; ইঙ্গ-ভারতীয়দের শিক্ষা 'রক্ষিত' বিষয়ের অন্তর্গত।

'অর্পিত বিষয়গুলি সংক্রান্ত সরকারী ইমারত ও পূর্ত্ত বিভাগ।

রাস্তা, সেতু, খেয়াঘাট প্রভৃতি; ইহার মধ্যে যেগুলি যুদ্ধের দিক হইতে বিশেষত্ব আছে সেগুলি "রক্ষিত" থাকিবে।

ম্যুনিসিপালটির মধ্যস্থিত ট্রামপথ। (শেষ তিনটি আসামে অর্পিত হয় নাই)।

কৃষি বিভাগ ও পশু-চিকিৎসা বিভাগ। আসাম ব্যতীত অন্য সর্বত্র মাছের কারবার অর্পিত বিষয়ের অন্তর্গত।

কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি বা সমবায়।

আসাম ব্যতীত অন্য সর্বত্র নিম্নলিখিত বিষয় অর্পিত হইয়াছে। আবগারী বিভাগ; ইহার মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের হাত দিবার অনেকখানি ক্ষমতা আছে, কারণ ইহার সহিত শুল্কাদি নানারূপ বিষয়ের সম্বন্ধ আছে।

রেজিষ্টারী (দলিল উইল ইত্যাদি) বিভাগ; জন্মমৃত্যু বিবাহের তালিকা প্রস্তুত; দান; খাদ্যাদি ভেজাল সম্বন্ধীয়, ওজন, মাপ সকল প্রদেশেই 'অর্পিত' বিষয়। কলিকাতার যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও যুদ্ধ-মিউজিয়ম ব্যতীত অন্যান্য মিউজিয়ম ও চিড়িয়াখানা প্রাদেশিক 'অর্পিত' বিষয়।

১৯২১ সালে রাজখুল্লতাত ডিউক অব্ কনট আসিয়া ভারতের নূতন ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্র পরিষদ্ (Council of State) উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট—১

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য।

ক—নির্বাচিত সভ্য

গ্রাম—	সভ্য সংখ্যা		সভ্য সংখ্যা
মুসলমান	৩৩	ভারতীয় বাণিজ্য	৩
অমুসলমান	৩৩	য়ুরোপীয় „	
সহর—		বাণিজ্য	১২
মুসলমান	৬	সাধারণ য়ুরোপীয়	৬
অমুসলমান	১১	ইঙ্গ-ভারতীয়	৩
জমিদার	৫	শ্রমজীবি	২
বিশ্ববিদ্যালয়	২		—

খ—মনোনীত সভ্য।

অন্ত্যজ জাতি	১	অন্যান্য	২
ভারতীয় খৃষ্টান	১	সরকারী সভ্য	২৩
		বিশেষজ্ঞ	২
			২৯
		মোট—	১৪৫

পরিশিষ্ট—২

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধি সভ্য।

য়ুরোপীয়—		ভারতীয়—	
বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স	৬	বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স	১
পাটের কল	২		
চা-বাগিচা	১	মাড়োবারী এসোসিয়েশন	১
খনিওয়ালাদের সভা	১		
কলিকাতা ট্রেডএসোসিয়েশন	২	মহাজন সভা	১
মোট	১২		৩

সর্বসমেত ১৫ জন।

স্থানীয় নির্বাচন।

বর্দ্ধমানবিভাগ—১৪		মুসলমান	অমুসলমান
বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া	(তিন জেলার)		১
		১	১
মেদিনীপুর			২
হুগলী হাওড়া		১	১
হুগলী হাওড়া			১
ম্যুন্সিপালটি		১	১
মোট		৩	১১

ঢাকা বিভাগ—২০	মুসলমান	অমুসলমান
ঢাকা জিলা	২	১
ঢাকা সহর	১	১
মৈমনসিংহ	৪	২
ফরিদপুর	২	২
বাখরগঞ্জ	৩	২
মোট	১২	৮

চট্টগ্রাম বিভাগ—৯	মুসলমান	অমুসলমান
চট্টগ্রাম	২	১
ত্রিপুরা	২	১
নোয়াখালি	২	১
মোট	৬	৩

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—২৬	মুসলমান	অমুসলমান
২৪ পরগণা	১	৩
ম্যুন্সিপালটি	২	১
নদীয়া	১	১
মুর্শিদাবাদ	১	১
যশোহর	১	১
খুলনা	১	১
কলিকাতা	২	৬
মোট	১১	১৬

রাজসাহী বিভাগ—১৪	মুসলমান	অমুসলমান
রাজসাহী	২	১
দিনাজপুর	১	১
রঙ্গপুর	২	১
বগুড়া	১	১ (বগুড়া ও পাবনা)
পাবনা	১	
মালদহ		১
জলপাইগুড়ি (মালদহ ও জলপাইগুড়ি)	১	১
মোট	৮	৬

সর্বসমেত	৩৯	৪৪

পরিশিষ্ট—৪

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতি

প্রদেশ	ধর্মগত			জমিদার	য়ুরোপীয় বাণিজ্য	দেশীয় বাণিজ্য	মোট
	অমুসলমান	মুসলমান	শিখ				
বঙ্গদেশ	৬	৬		১	৩	১	১৭
মান্দ্রাজ	১০	৩		১	১	১	১৬
বোম্বাই	৭	৪		১	২	২	১৬
যুক্তপ্রদেশ	৮	৬		১	১	-	১৬
পঞ্জাব	৩	৫	২	১			১১
বিহার উড়িষ্যা	৬	৩		১			১০
মধ্যপ্রদেশ	৩	১		১			৫
আসাম	২	১			১		৪
দিল্লী	১						১
বর্মা	৪						৪
মোট	৫০	২৯	২	৭	৮	৪	১০৪

সরকারী ৪৪

অমুসলমান	সভ্য	৫০
মুসলমান	"	২৯
শিখ	"	২
জমিদার	"	৭
বাণিজ্য	"	১২
বর্মন	"	৪
		১০৪

৩। প্রাদেশিক শাসন বিভাগ।

ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার বড়লাট বাহাদুরের উপর ন্যস্ত থাকিলেও সুবিচারের জন্য বৃটীশ ভারতকে ৮টি বড় প্রদেশ ও ৬টি ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমরা বর্মা, দেশীয় রাজ্য ও অন্যান্য য়ুরোপীয়দের অধিকৃত রাজ্যের কথা এখানে আলোচনা করিতেছি না।

প্রাদেশিক সরকারসমূহ বড়লাটের অধীন; অবশ্য নিজ নিজ প্রদেশ শাসনসম্বন্ধে তাঁহাদের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, তাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শাসনের প্রত্যেক বিভাগের প্রতিবেদন প্রত্যেক প্রদেশ হইতে যথা সময়ে সিমলা বা দিল্লীতে প্রেরণ করিতে হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কার্য্যকাল সাধারণত পাঁচ বৎসর।

প্রাদেশিক শাসনের সূত্রপাত

ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য বঙ্গদেশেই প্রথম আরম্ভ। সেইজন্য গভর্ণর-জেনারেল—যিনি কলিকাতায় থাকিতেন, তাঁহারই উপর বঙ্গদেশ ও 'উত্তর বা পশ্চিম প্রদেশসমূহে'র (আজকাল যাহাকে U. P. বলে) ভার ছিল। ১৮৩৬ সালে North-West Provinces (U. P.)কে পৃথক্ করিয়া এক লেফটেনেণ্ট-গভর্ণর বা ছোটলাটের হস্তে অর্পিত হয়। বড়লাট সমগ্র ভারত ও বঙ্গের শাসনকর্তারূপে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। অবশেষে ঐ বৎসরে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা সুবার উপর একজন পৃথক ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন। ১৮৩৪ সালের পূর্বে বঙ্গপ্রদেশ বলিতে বহু বিস্তৃত দেশ বুঝাইত। ১৭৫৭-৬৫ সালে যে-বঙ্গদেশ তাঁহারা দেওয়ানীরূপে পাইলেন, তাহার সহিত ১৭৭৫ সালে কাশীপ্রদেশ যুক্ত হইল; ১৮০১ সালে বঙ্গের সহিত অযোধ্যার ইজারা, ১৮০৩ সালে

বিজিত গঙ্গাদোয়াব, বুন্দেলখণ্ড ও কটক যোগ করিয়া দেওয়া হইল; ১৮১৭-১৮ সালে মহারাষ্ট্রদের দ্বারা প্রদত্ত সৌগড় (Saugor) ও নর্মদা প্রদেশ, ১৮২৬ সালে আসাম ও আরাকান যুক্ত হইল। ধীরে ধীরে এই বিপুল ও বিচিত্র দেশসমূহ একজন গভর্ণর-জেনারেলের তত্ত্বাবধানে আসিয়া পড়িল; ইহা যে একজনের পক্ষে শাসন করা অসম্ভব তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

সেইজন্য ১৮৩৪ সালে একজন গভর্ণরের হস্তে 'Upper' বা 'Western Provinces' অর্পিত হয়; দুই বৎসর পরে ১৮৩৬ সালে North-West Provinces নাম দিয়া একজন লেফনেণ্ট-গভর্ণরের হস্তে ইহার ভার প্রদত্ত হইল। ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশের ঐ নামই ছিল; কিন্তু উক্ত বৎসরে উহার নাম United Provinces of Oudh and Agra হইল।

যুক্তপ্রদেশ গঠন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যুক্তপ্রদেশ বাংলা হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার পর আর আঠার বৎসর বঙ্গ-বিহার, উড়িষ্যা আসাম, বড়লাটের খাশ তত্ত্বাবধানে থাকিল ও ১৮৫৪ সালে এই প্রদেশের জন্য পৃথক্ ছোটলাটের পদ সৃষ্ট হইল। আরাকান ১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত ছিল; ঐ বৎসরে দক্ষিণ-বর্মাও আরাকান লইয়া একটি পৃথক্ প্রদেশ গঠিত হয়। ১৮৭৪ সালে আসামকে বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্ করিয়া একজন চীফ কমিশনরের অধীন দেওয়া হইল।

বঙ্গপ্রদেশ গঠন

বঙ্গের ছোটলাটের ভার অনেক কমিল। এই ব্যবস্থা ১৯০৫ পর্য্যন্ত চলিল; কিন্তু ইতিমধ্যে শাসনযন্ত্রের জটিলতার জন্য কার্য্যভার একজন ছোটলাটের পক্ষে অত্যধিক হইয়া উঠিল। সেইজন্য লর্ড কর্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশকে পৃথক করেন। আসাম ও বঙ্গদেশের দুইটি ডিভিশন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম লইয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি পৃথক্

প্রদেশ গঠিত হয়; ঢাকা রাজধানী হইল। এই ব্যবস্থা ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত বজায় থাকিল; বঙ্গদেশ বলিতে প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান, রাজসাহী ডিভিশন ও বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা বুঝাইত। ঐ বৎসরে সম্রাট্ বাহাদুর দিল্লীতে আগমন করেন ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রদেশ গঠনে নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইল; ১ম—আসাম পূর্বের ন্যায় চীফ কমিশনরের অধীন হইল। ২য়—পশ্চিমবঙ্গ ও পূববঙ্গের বিভাগগুলি লইয়া বঙ্গভাষাভাষী বাংলা একত্র হইল; সুরমা-উপত্যকার বাঙালীর জেলা সিলেট ও কাছাড়, মানভূম, ও পূবড়ী বঙ্গের সহিত নানা আর্থিক কারণে যুক্ত করা সম্ভব হইল না। ৩য়—বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাকে এক করিয়া বিহার-উড়িষ্যা নামে প্রদেশ গঠিত হইল; পাটনা ও রাঁচী রাজধানী। শাসনভার একজন ছোটলাটের উপর অর্পিত হইল। ৪র্থ—কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। বৃটীশ সাম্রাজ্য স্থাপনের গোড়া হইতে কলিকাতায় বড়লাট বাহাদুরের রাজধানী ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি ১৮৩৬ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ গঠিত হয়; সোগড় ও নর্মদা প্রদেশগুলি মধ্যে কয়েক বৎসর ছাড়া ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশের সহিত যুক্ত ছিল। ১৮৫৬ সালে অযোধ্যা ইংরাজ অধিকারে আসে; কিন্তু তখন উহাকে একটি 'নন্-রেগুলেশন' প্রদেশরূপে খাশ ভারত সরকারের অধীন একজন চীফ কমিশনারের উপর অর্পিত হয়। ১৮৭৭ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলে। পরে ঐ বৎসর হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটই অযোধ্যার চীফ কমিশনরের কাজ করিতে থাকেন। অযোধ্যার শাসন বরাবরই এ পর্য্যন্ত আগ্রা বা অন্যান্য প্রদেশের শাসন হইতে পৃথক। অযোধ্যার জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে 'নন্-রেগুলেশন' প্রদেশের ন্যায় ডেপুটি-কমিশনর বলা হয়; এবং তাঁহাদের উপর ফৌজদারী

আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশ

বিভাগের ভার প্রচুর। অযোধ্যা এলাহাবাদ হাইকোর্টের অধীন নহে; লক্ষ্মৌতে জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালতে হাইকোর্টের ক্ষমতা অর্পিত আছে। আগ্রায় জমি বন্দবস্তও পৃথক। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর এলাহাবাদ ও লক্ষ্মৌ উভয় স্থানেই থাকেন।

শিখযুদ্ধের পর ১৮৪৯ সালে পঞ্জাব ইংরাজ অধিকৃত হয়। দিল্লী ১৮০৩ সালে ইংরাজের হাতে আসে ও ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল ও ঐ বৎসর হইতে সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত দিল্লী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (N.-W. Provinces) অন্তর্গত থাকে। ১৮৫৮ সালে উহা পঞ্জাবের সহিত যুক্ত হয়। পরে ১৯১২ সালে দিল্লী নগরী ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইলে দিল্লী জিলা একজন চীফ কমিশনরের শাসনাধীন দেওয়া হয়। পঞ্জাবের ভাগ বিভাগের ছোটো খাটো আভ্যন্তরিক পরিবর্তন কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরিবর্তন হয় ১৯০১ সালে। পঞ্জাব ও আফগানিস্থানের মধ্যে কতকগুলি পার্বত্য প্রদেশে (যেমন, স্বাট্, চিত্রল, খাইবার, কুরম, বজীরস্থান) ইংরাজদের ক্ষমতা ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। সেই পার্বত্য জিলাগুলি ও পঞ্জাবের সীমান্তের পাঁচটি জিলা লইয়া ১৯০১ সালে লর্ড কর্জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (North-West Frontier Provinces) নামে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করিলেন। ইহার শাসনভার চীফ কমিশনরের উপর আছে। ইনি ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগ বা বড়লাটের নিজ তত্ত্বাধীন। পেশোয়ার এই প্রদেশের রাজধানী।

পঞ্জাব প্রদেশ

বোম্বাই প্রদেশ বিচিত্র জাতি ও দেশের সমাবেশে গঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্থরাট, সালসিটি দ্বীপ ও দুই একটি ক্ষুদ্র স্থান ইংরাজদের অধীন ছিল। সমগ্র পশ্চিম ভারত ও বিশেষত মহারাষ্ট্র রাজ্যগুলি লর্ড ওয়েলেসলি ও হেষ্টিংসের মারাঠা সমরের ফলে ১৮০৩ হইতে ১৮২৭

এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে বিজিত হয়। আরবের দক্ষিণে এডেন ১৮০৯ সালে অধিকৃত হইয়া বোম্বাই শাসনের অন্তর্গত করা হয়। ১৮৪৩ সালে সিন্ধু প্রদেশ অধিকৃত হইয়া এই প্রদেশের শাসনাধীন করা হইল। ১৮৬১ সালে সিন্ধিয়ার নিকট হইতে পঞ্চমহল গ্রহণ করা হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে বোম্বাই প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। সিন্ধি, গুজরাতী, মারাঠী ও কানাড়ী এই চারিটি ভাষাভাষী জাতি একত্র করিয়া এই প্রদেশটি গঠিত। রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে এদেশের শাসনকর্তা 'গভর্ণর' পদবাচ্য ছিলেন। ছোট লাট-দের অপেক্ষা ইহার ক্ষমতা অধিক ছিল।

বোম্বাই প্রদেশ গঠন

মহারাষ্ট্রদের নিকট হইতে সৌগড় ও নর্মদা প্রদেশগুলি ১৮১৭-১৮ সালে ইংরাজদের হাতে আসে। পূর্বেই বলিয়াছি উহা প্রথমে বঙ্গের সঙ্গে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সহিত যুক্ত থাকে। মধ্যপ্রদেশ (Central Provinces) বলিতে আজকাল যে-স্থান বুঝায়, তাহার অন্তর্গত নাগপুর প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজ্যগুলি ১৮৫৩ সালে বংশলোপহেতু ইংরাজ-দের হাতে আসে। ম্যুটিনির পর ১৮৬১ সালে ভারতের নূতন সংগঠনের সময়ে বর্তমান 'মধ্যপ্রদেশ' প্রদেশটি গঠিত হয়। এই প্রদেশটিতেও 'নন্-রেগুলেশন' শাসন। পূর্বে এখানে চীফ কমিশনর ছিলেন। বর্তমানে গভর্ণর, মন্ত্রী, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি সবই হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

বেরার প্রদেশটি পূর্বে নিজামের ছিল। ১৮৫৩ সালে হায়দ্রাবাদ রক্ষার জন্য সৈন্যদলের খরচ বাবদ বেরার প্রদেশটি ইংরাজ সরকার গ্রহণ করেন। পরে ১৯০৩ সালে লর্ড কর্জন বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা খাজনা দিয়া এই প্রদেশটি চিরস্থায়ীরূপে নিজামের নিকট হইতে লইয়া-ছেন। সেই হইতে উহা মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত। বর্তমানে নিজাম বেরার ফিরাইয়া পাইবার জন্য খুবই আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু

উহা তাঁহার হাতে আর যাইবে না। মধ্যপ্রদেশটি মারাঠী, হিন্দী, রাজস্থানী, ওড়িয়া ভাষাভাষী লোকের দ্বারা গঠিত।

মান্দ্রাজ প্রদেশ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বিচিত্র জাতি ও দেশের সমাবেশ মাত্র। এখানে ১৬৪০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য ছয় লাইল জমি ক্রয় করা হয়। ইংরাজ ও ফরাশী শক্তি দক্ষিণ ভারতের অদৃষ্টকে লইয়া কিরূপ খেলা খেলিতেছিল, তাহা সাধারণ ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নহে; ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব চিংলীপুট জিলা ইংরাজকে জায়গীর দান করেন। তারপর বিবিধ সন্ধির ফলে ধীরে ধীরে 'উত্তর-সরকার' বা জিলাগুলি ১৭৬৫-৬৬ সালে তাঁহাদের হস্তগত হয়। ১৮০১ কর্ণাট-নবাবের রাজ্য অধিকৃত হইল; অবশিষ্ট রাজ্যাংশগুলি মহীশূর যুদ্ধের ফলে তাঁহারা পাইলেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি

এই প্রদেশটি ওড়িয়া, তেলেগু, তামিল, কার্ণাটিক, মালায়লাম ভাষাভাষী লোকের দ্বারা গঠিত। এখানকার শাসনকর্তা গভর্ণর। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে সর্ব প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন। ইহাদের বিশেষ কতকগুলি সুবিধা ও শক্তি ছিল; তাঁহারা ভারত-সচিবের সহিত প্রত্যক্ষভাবে চিঠিপত্র লিখিতে পারিতেন। অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্তারা বড়লাট ছাড়া আর কাহাকেও লিখিতে পারিতেন না। বর্তমানে ইহারা অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণরের ন্যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে এই চারটি প্রধান প্রদেশ ব্যতীত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, আজমীর-মেরবারা, দিল্লী ও কুর্গ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এই ছয়টি প্রদেশ আছে। প্রদেশগুলি চীফ কমিশনরদের অধীন। চীফ কমিশনরগণ ভারত-সরকারের খাশ তত্ত্বাবধানে থাকেন।

১৮৩৩ সালের পুর্বে যে সব আইন প্রণীত হয়, তাহাকে 'রেগুলেশন' বলিত এবং যে-সকল প্রদেশে ঐ সকল আইন প্রবর্তিত ছিল, তাহা-

দিগকে "রেগুলেশন প্রভিন্স' (Regulation Province) বলিত; বঙ্গ-বিহার, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও আগ্রাপ্রদেশ সেইজন্য 'রেগুলেশন প্রদেশ' বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার পর সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িতে থাকিলে এই সব নব অধিকৃত প্রদেশে পুরাতন প্রদেশের আইনকানুন জারি করা শাসক ও শাসিতের দিক হইতে সর্বথা অনুকূল হইত না। এইজন্য সেই সব প্রদেশগুলিকে Non-Regulation প্রদেশ বলে। প্রথম এই সকল স্থানে মিলিটারী বিভাগের লোকই শাসনকর্তা হইতেন এবং ইহাদের শক্তি প্রভূত ছিল। কিন্তু সেই সব দেশ ক্রমেই শান্ত ও সংযত হইয়া আসিতে থাকে, মিলিটারী অফিসার রাখার প্রয়োজনও হ্রাস পায়। পঞ্জাব ১৮৪৯ সালে অধিকৃত হয় ও 'নন-রেগুলেশন' প্রদেশ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু বর্তমানে উহা সাধারণ রেগুলেশন-প্রদেশের ন্যায়ই শাসিত হয়। আসাম, উত্তর-বর্মা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, প্রভৃতি প্রদেশ ছোটনাগপুরের ন্যায় বিভাগ ও সাঁওতালপরগণার ন্যায় জিলা 'নন্-রেগুলেশন' প্রদেশ।

নন্-রেগুলেশন প্রদেশ

সমগ্র ভারত যেমন কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত, এবং তাহার শাসন ভার যেমন গভর্ণর বা চীফ কমিশনরদের উপর ন্যস্ত, তেমনি প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার কতকগুলি জিলায় বিভক্ত। এই জেলাগুলিকেই শাসনের যথার্থ কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। সমগ্র বৃটীশ ভারতে ২৬৭টি জিলা ও বর্মার ৪১টি জিলা লইয়া আছে। প্রত্যেকটির পরিমাণ গড়ে প্রায় ৪,৪৩০ বর্গ মাইল ও জনসংখ্যা গড় ৯ লক্ষ। মান্দ্রাজ ব্যতীত অপর সব প্রদেশেই চারিটি হইতে ছয়টি জেলা লইয়া এক একটি বিভাগ গঠিত হইয়াছে; এই বিভাগের কর্মচারীকে কমিশনর বলে। বাংলাদেশে এইরূপ পাঁচ-জন কমিশনর আছেন।

বিভাগ ও জিলা

জেলার সর্বোচ্চ কর্মচারীকে আমরা 'ম্যাজিষ্ট্রেট' বলিয়া জানি;

তিনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধি এবং তাঁহার উপর সরকার প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। * জিলার খাজনা তিনি আদায় করেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম 'কলেক্টর' সাহেব। 'নন্-রেগুলেশন প্রদেশে'র জিলা-ম্যাজিষ্টেটকে 'ডেপুটি কমিশনর' বলে। স্থানীয় শাসন, আবগারী, আয়কর, ষ্ট্যাম্পকর, বন্দুকের পাশ, বিদেশ যাওয়ার পাশ দেওয়ার অধিকার সমস্তই তাঁহার হাতে। এছাড়া কলেক্টর সাহেব জিলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দায়ী। দেশের বড় বড় কাজ, বিদ্যাশিক্ষা, হাঁসপাতাল, স্বাস্থ্য, কৃষি, কারবার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। জিলার সমস্ত ম্যুন্সিপালটি তাঁহারই তত্ত্বাবধানে; কোনো কোনো স্থলে জিলা-বোর্ডের সভাপতিও তিনি। এইরূপে তিনি শত কর্মের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা; এক কথায় তিনিই জিলার 'হর্তা-কর্তা বিধাতা'।

জিলা ও ম্যাজিষ্ট্রেট

অন্যান্য বড় বড় সরকারী কর্মচারীর মধ্যে পুলিশ সাহেবের (স্থপা-রিণ্টেডেণ্ট) পদ খুব উচ্চ। জিলার সমগ্র পুলিশ বাহিনীর কর্তা তিনি —তাঁহারই অধীনে থানা ও ইন্সপেক্টর, চৌকি ও সব-ইন্সপেক্টরগণ। জিলার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার পর্য্যবেক্ষণের জন্য সিবিল সার্জেন আছেন। তিনি জিলার প্রধান সহরে থাকেন। এইরূপ আরও অন্যান্য বিষয় যেমন পুর্ত্ত-কার্য্য, কৃষি, বন-বিভাগ, শিক্ষা প্রভৃতি তদারক করিতে প্রতি জিলায় কর্মচারী আছেন।

অন্যান্য কর্মচারী

জিলাগুলি পুনরায় দুই বা ততোধিক মহকুমাতে বিভক্ত। প্রত্যেক

* জিলার সংখ্যা ২৭৩; পূর্ব-পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে ২৬৭ দেওয়া হইয়াছে। বর্মার ৪০টি জিলা উহার অন্তর্গত। Statistical Abstract, 1919-15 to 1923-24 দ্রষ্টব্য।

মহকুমাতে (Sub-division) একজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন, তাঁহারা হয় সিবিল সার্ভিসের লোক না হয় দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহাদিগকে সাব ডিভিশনল অফিসার (S. D. O.) বলে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে জিলাগুলি তালুক বা তহশিলে বিভক্ত। সেখানে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সাহায্যে অনেক কাজ হয়; বাংলাদেশে সে প্রকার গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রথা নাই বলিলে চলে। তবে যাহাতে গ্রামে পুনরায় পঞ্চায়েৎ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা যায় ও স্থানীয় লোকের সহায়তার দ্বারা শাসন কার্য্য সুচারুরূপে চলে তদ্বিষয়ে সরকার খুবই মনোযোগ দিয়াছেন।

স্থানীয় শাসন

প্রাদেশিক শাসন বিভাগ

প্রদেশ	ডিভিশন	জিলা	বর্গ মাইল	বৃটীশভারতের জনসংখ্যা
১৫	৫৫	২৭৩	১.০৯৪.৩০০	২৪, ৭১, ৩৮, ০০০ (১৯২৪-২৫ সালে)

গভর্ণর শাসিত

প্রদেশ	ডিভিশন	জেলা	বর্গ মাইল	জনসংখ্যা হাজার
বঙ্গদেশ	৫	২৮	৭৬,৮৪৩	৪,৬৬,৫৩,
আসাম		১২	৫৩,০১৫	৭৫,৯৮,
বিহার-উড়িষ্যা	৪	২১	৮৩,১৬১	৩,৩৯,৯৮,
যুক্তপ্রদেশ	১০	৪৮	১০,৬,২৯৫	৪,৫৫,৯০,
আগ্রা	৮	৩৬	৮,১৯৮২,১৩৭	৩,৩৪,২০,
অযোধ্যা	২	১২	২৪,১৫৮	১,২ ,৭০,
পঞ্জাব	৫	২৯	৯৯,৮৪৬	২,০৬,৭৮,
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	৪	২৯	১২৩,৬২১	১,৯৩,৮৫,
বোম্বাই	৩	২১	৭৭,০৩৫	১,৬০,০৫,
সিন্ধু	১	৭	৪৬,৫০৬	৩২,৭৮,
এডেন		১	৮০	৫৪,
মধ্যপ্রদেশ		২২	৯৯,৮৭৬	১,৩৯,১২,
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী	নাই	২৭	১,৪২,২৬০	২,০৬,৭৮,
বর্মা প্রদেশ	৮	৪০	২,৩৩,৭০৭	১,৩২,০৫,

চীফ-কমিশনর শাসিত

প্রদেশ	জিলা	বর্গমাইল	জনসংখ্যা হাজার.
আজমীড়	২	৩,১৪৩	৪,৯৫,
আন্দামান নিকোবর		৩,১৪৩	২৬,
বেলুচিস্থান	৬	৫৪,২২৮	৪,২১,
কুর্গ	১	১,৫৮২	১,৬৪,
দিল্লী	১	৫৯৩	
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫	১৩,৪১৯	৪,৮৬, ২২,৪৭,

৪। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন।

দেশীয় ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের শাসনবিষয়ে প্রধান পার্থক্য এই যে এদেশের শতকরা ৯০ জনের উপর লোক গ্রামের বাসিন্দা ও তাহাদের অধিকাংশের পেশা ও উপজীবিকা কৃষি। সেইজন্য ভারতের শাসন কেন্দ্রের মূল হইতেছে গ্রাম। তৎপরে তহশিল বা মহকুমা, জিলা ইত্যাদি। সেই জন্য আমরা গ্রাম হইতেই আরম্ভ করিব।

গ্রামিক ও নাগরিক

লক্ষাধিক লোক বাস করে এমন সহর ভারতের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রদেশে মাত্র ৬৯টি। নগর ও সহরের শ্রীবৃদ্ধির কারণ,—শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও চাকুরী লাভের উপায় সহজ। ভারতে কোন্ প্রদেশে জনসংখ্যা কিরূপভাবে ছড়ানো আছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

প্রদেশ	সহরে লোক	গ্রামে লোক	গ্রামে গড়লোক	সহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা
বঙ্গদেশ	৬'৫	৯৩.৫	৩৫৫	১৩০	৮৪,৯৮১
বিহার উড়িষ্যা	৩'৭	৯৬.৩	৩৫৫	৭৫	৮৪,৮১৪
বোম্বাই	১৯'০	৮১.০	৬১২	২০৬	২৬,৫২৮
বর্মাপ্রদেশ	৯'৩	৯০.৭	২২২	৭৯	৩৫,০৪৮
মধ্যপ্রদেশ	৮'৫	৯১.৫	৩৩৭	১১৩	৩৯,০২৪
মাদ্রাজ	১১'৮	৮৮.২	৬৭৮	৩১৬	৫২,১৯৮
পঞ্জাব	১১'৯	৮৮.১	৫৩১	১৪৬	৩৪,১৯৯
যুক্তপ্রদেশ	১০'২	৮৯০৮	৪০০	৪৩৯	১,০৪,৩৪৭
বৃটিশ ভারত	৯'৩	৯০.৭	৪১২	১,৫৬৯	৪,[illegible]৮,৫২৭

হিন্দু শাসনকালে গ্রাম শাসনের যে সুন্দর ব্যবস্থা ছিল তাহার বর্ণনা মেগেস্থানীস করিয়া গিয়াছেন্। তারপর ভারতের উপর দিয়া পাঠান মুঘলের শাসন চলিয়া গিয়াছে, তথাচ গ্রামের সেই সংহত ভাব নষ্ট হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে বাহিরের সভ্যতা ও সংঘাত আসিয়া গ্রামের সেই নিষ্ক্রিয় জড়ত্ব নষ্ট করিয়া নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতের গ্রাম দুই শ্রেণীর (১) উত্তর ভারতবর্ষের গ্রামগুলি দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশে 'মহলবারী' বা জমিদারী প্রথার ব্যবস্থা আছে। পূর্বে এইখানে সমগ্র গ্রামের উপর রাজস্ব ধার্য্য করা হইত, এবং এখন পর্য্যন্ত এই প্রথা কিয়দ্ পরিমাণে বিদ্যমান আছে। গ্রামের মালিকরা সমস্ত গ্রামের অধিপতি এবং তাহারাই চাষী, শিল্পী, কারিগর ও কৃষকদের জমি বিলি ব্যবস্থা করিয়া দেয়। পতিত জমির মালিক গ্রাম এবং উহা চাষ হইলে সকল অংশীদারই তাহার মুনফা পায়। কয়েকটি পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লইয়া প্রতি গ্রামেই একটি পঞ্চায়েৎ ছিল। ক্রমে সরকারী কার্য্যের সহিত গ্রামের যোগ আরম্ভ হইলে নূতন নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইল ; ইহার মধ্যে 'লম্বরদার' আজকাল উত্তর-পশ্চিমের গ্রামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'মহলবারী' গ্রামের কয়েক ঘর লোকের অধীনেই সমগ্র গ্রাম।

দুই শ্রেণীর গ্রাম
হিন্দুস্থানে মহলবারী

বাংলাদেশের গ্রামের মধ্যে এক প্রকার সংহত ভাব ছিল ; প্রত্যেক গ্রামে কয়েকটি পাড়া থাকিত ; বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, তাঁতিপাড়া, কামারপাড়া, চুণারীপাড়া, দুলেপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি, সকল প্রকার বর্ণেরই বাস ছিল ; প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ পঞ্চায়েৎ ছিল এবং 'জাতের পাঁচজনের' মজলিসে বিচার হইত। গ্রামে জমিদার ছিলেন দেওয়ানী ও ফৌজদারীর বিচারক। কিন্তু বর্তমানে তাহা প্রায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(২) মান্দ্রাজে ও দক্ষিণের অপরাপর স্থানে 'রায়তবারী' বন্দবস্ত প্রচলিত ; এই ব্যবস্থা ইংরাজ শাসনকালে গভর্ণর স্যর টমাস্ মন্‌রো কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এখানে সমগ্র গ্রাম শাসন বা রাজস্বের জন্য সরকারের নিকট দায়ী নহে ; প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত গভর্ণমেণ্ট রাজস্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংরাজ শাসনের পূর্বে ও এদেশে গ্রাম্য-শাসনের ব্যবস্থা ছিল ; প্রত্যেক গ্রামে বার জন করিয়া "অগ্‌গণ্ডিয়" ছিল—ইহাদের মধ্যে নানারূপ কাজ বিভক্ত থাকিত ; মুকদ্দম, পোটাইল, রাপোদ, রেড্ডি প্রভৃতি গ্রাম্য কর্মচারীর উপাধি ; রেড্ডি ছিলেন গ্রামের মোড়ল। রেড্ডিই গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তির জন্য বর্তমানে সরকারের কাছে দায়ী।

মান্দ্রাজে রায়তবারী

একশত বৎসর পূর্বে তৎকালীন গভর্ণর এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব বোম্বাই অঞ্চলের গ্রামের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে সঙ্কলিত হইল। "গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষক ; তাছাড়া কয়েক ঘর বেনিয়া ও কারিগরও গ্রামে বাস করে। গ্রামের মোড়লকে "পাটেল" বলে। ইহারই অধীনস্থ চৌগুল্লা, তাঁহার সহকারী 'কুলকরণী' গ্রামের লেখক। এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামে বারজন কর্মচারী থাকিত ; ইহারা 'বার বালুতি' নামে খ্যাত। গণক, পুরোহিত, ছুতার, নাপিত প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণের প্রতিনিধি এই 'বার বালুতি'র অন্তর্গত। সোণার বা পোদ্দার ও 'মহর' বা গ্রামের চৌকিদারকেও গ্রাম-শাসনের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ধরা হয়।

পশ্চিম ভারতে গ্রাম পদ্ধতি

"পাটেলদের উপর শাসনের সর্বপ্রকার গুরুভার অর্পিত আছে। বোধ হয় মুঘল সম্রাটদের নিকট হইতে পাঞ্জা পাইয়া তাঁহারা এই কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহাদের কাজ বংশপরম্পরায় চলে ; তবে সরকারী মত লইয়া সেই অধিকার বিক্রয়ও করা যায়। গ্রামের

চৌকিদারী ও বিচারের ভার পাটেলের উপর ; ইনি ছোটখাটো ভাবে জেলার কলেক্টর যাহা করেন তাহাই করিতেন। বর্ত্তমানে 'পাটেল'রা প্রজার প্রতিনিধি মাত্র—পূর্বের সে ক্ষমতা এখন নাই।"

ইংরাজ আমলে স্বায়ত্ত-শাসন।

ইংরাজশাসনকালে ভারতের সর্বত্রই গ্রামের পূর্বের 'পঞ্চায়েৎ' বা অন্যবিধ শাসনপদ্ধতি ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে। সরকারী নানা বিভাগ এখন নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমানে সরকারী ও বেসরকারীর মধ্যে ভেদ খুব বেশী। বর্ত্তমানে কোথায় কিরূপ গ্রাম-শাসন এখনও চলিতেছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। মান্দ্রাজে গ্রামের কর্মচারী বংশ-পরম্পরায় কার্য্য করে ; গ্রামের রেড্ডি গ্রামের রাজস্ব আদায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার ও দণ্ডের ভার প্রাপ্ত আছেন। বোম্বাইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পাটেলই রাজস্ব আদায় ও পুলিশের কার্য্যের জন্য দায়ী। ইহাদের কাজ পুরুষানুক্রমে চলে।

বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি মোড়লের কাজ করে না। তবে চৌকিদারী ইউনিয়ান আছে। আসামে গৃহস্থেরা (মেল) মিলিত হইয়া 'মণ্ডল' নির্বাচন করে। ইহাদের অস্তিত্ব ও শক্তি সরকার স্বীকার করেন ; কিন্তু রাজস্ব আদায় প্রভৃতির ভার ইহাদের উপর অর্পিত নাই। যুক্তপ্রদেশে যথার্থভাবে গ্রাম-মণ্ডল নাই ; পঞ্জাবেও তদ্রূপ। এই দুই স্থানে 'লম্বরদার'ই সরকারী পক্ষ হইতে কাজকর্ম করে। মধ্য-প্রদেশে ভূস্বামীদের প্রতিনিধি 'মুকদ্দম' গ্রামের সর্দার। বেরার মহারাষ্ট্র দেশ বলিয়া সেখানে দক্ষিণী 'পাটেল' প্রথাই চলে। মান্দ্রাজে পথঘাট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্য সরকার লোকাল ফণ্ড

বর্ত্তমানে গ্রাম-শাসন

ইউনিয়ন নামে কৃত্রিম একটি প্রতিষ্ঠান আধুনিক কালে গড়িয়াছেন ; যুক্ত-প্রদেশ, বোম্বাই ও মধ্য-প্রদেশে স্বাস্থ্যোন্নতি বোর্ড আছে।

ভারতের গ্রাম-শাসনের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া যাওয়ায় বা অর্দ্ধমৃত হওয়ায় সরকারকে ছোট খাটো অসংখ্য কাজের জন্য অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে হয় ; দেশের লোকেরও নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিবার সাহস নাই, অথচ সকল কাজ সরকারী লোক দিয়া ও সরকারী চালে করিতে গেলে যেপ্রকার অর্থ ও সামর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহা প্রাদেশিক সরকারদের নাই। সরকারী শাসন অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে ; উহাকে দেশের মধ্যে ছড়াইয়া না দিলে সুশাসন আশা করা যায় না। সেইজন্য ১৯০৮ সালে সরকার এক কমিটি বসান। তাঁহাদের প্রতিবেদনের উপর সরকার ১৯১২ সালে এক আইন প্রণয়ন করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

Decentralisation Committee 1908

এই কমিটির উপদেশানুসারে সরকার বাহাদুর ভারতের প্রাচীন গ্রাম-শাসন ও বিধি পুনঃ প্রবর্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ; অনেক মনে করেন স্থানীয় শাসন গ্রামবাসীদের সহায়তা ব্যতীত কখনই সুচারুরূপে নির্বাচিত হইতে পারে না। কমিটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, (১) পঞ্চায়েৎ জেলার কর্তৃপক্ষদের অধীন থাকিবে,—স্থানীয় বোর্ডের (Local Board) কতৃত্বাধীনে নহে। (২) প্রত্যেক গ্রামে পৃথক পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা থাকিবে। (৩) গ্রামের মাতব্বর পঞ্চায়েতের সভাপতি হইবেন। (৪) অন্যান্য সভ্যদের নির্বাচন পাঁচজনের মত লইয়া হইবে। (৫) পঞ্চায়েতের উপর খুবই সাবধানতার সহিত দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অর্পিত হইবে। (৬) ছোট খাটো ব্যাপারে পঞ্চায়েতের উপর দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পিত হইবে। তবে প্রথম প্রথম দলাদলি স্বার্থপরতা প্রভৃতির দ্বারা এই সর্ব কার্য্য বাধা

পাইবে, কিন্তু শিক্ষা-বিস্তারের সহিত এসব দূর হইবে। (৭) পঞ্চায়েতের উপর গ্রামের স্বাস্থ্য, পূর্ত বিভাগ, স্কুলবাড়ী প্রভৃতির ভার অর্পিত হইবে। (৮) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকারী কর্মচারীদের অযথা হস্তক্ষেপ হইতে বাঁচাইতে পারিলে তবে ইহা কৃতকার্য্য হইবে। (৯) কৃত্রিম গ্রাম-ইউনিয়ন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে না।

ম্যুন্সিপালটি

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

ইংরাজ-শাসনের প্রথমে শাসনতন্ত্রকে কেবলই কেন্দ্রীভূত করিবার দিকেই শাসকদের দৃষ্টি ছিল; সেইজন্য গ্রাম্য শাসনতন্ত্র অর্দ্ধমৃত হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ এদেশীয় নিজস্ব পদ্ধতি বর্জন করিয়া কৃত্রিম বিভাগাদি সৃষ্টি করিয়া দেশশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ম্যুন্সিপালটি, লোকাল-বোর্ড বা জেলা-বোর্ড ইংরাজ শাসনের ফলে হইয়াছে।

ম্যুন্সিপালটি

কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিনটি সহরে ইংরাজ আগমনের প্রথম হইতেই কোনো না কোনো প্রকারের ম্যুন্সিপালটি বন্দবস্ত ছিল; এছাড়া ১৮৪২ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত আর কোথাও কোনো প্রকার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হয় নাই। ১৮৫৬ সালের পূর্বে বাংলাদেশের কোথাও ম্যুন্সিপালটি ছিল না। এই সময় হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত সকল প্রদেশেই কতকগুলি ম্যুন্সি-পালটি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো প্রাদেশিক শাসন বিভাগগুলিকে ভারত-সরকার হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া তাহাদের নিজ নিজ ব্যয় করিবার জন্য টাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১৮৭১ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ম্যুন্সিপাল আইন পাস হয়; কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত আর কোথায়ও ইহা সুচারুরূপে পরিচালিত হয় নাই। লর্ড রীপনের শাসনকালে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন অগ্রসর হয়।

১৮৮৪ সালের আইনানুসারে ম্যুন্সিপালটিতে নির্বাচনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কমিশনর বা সভ্যদের অর্দ্ধেক নির্বাচিত হন ; সভাপতি জনসঙ্ঘের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন, অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতে পারেন। এই মনোনীত সভাপতি সরকারী কর্মচারী হইলে লোকে এক-জন ভাইস্-চেয়ারমান্ নিবাচন করিতে পারে।

ম্যুন্সিপালটির কর

ম্যুন্সিপালটির দুইপ্রকার কর সহরবাসিন্দাকে দিতে হয় ; এক ব্যক্তি-গত অর্থাৎ গৃহস্থের আয় অনুসারে স্থিরীকৃত, আর গৃহাদি সম্পত্তির মূল্যানুসারে নির্দ্ধারিত। ব্যক্তিগত করের সর্বোচ্চ পরিমাণ বার্ষিক ৮৪৲ টাকা বা প্রতি তিনমাসে ২১৲ টাকা। সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের উপর কর শতকরা ৭॥০ সাড়েসাত টাকা। ঢাকা, হাবড়া ও দার্জ্জিলিং সহরে এই কর শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রত্যেক ম্যুন্সিপালটিতেই এই দুই প্রকারের এক প্রকার কর ধার্য্য হয়।

ম্যুন্সিপালটির সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই অধিবাসীদিগের দ্বারা নির্বাচিত। সরকার সাধারণত এক-তৃতীয়াংশ মাত্র নিয়োগ করিতে পারেন। সভ্যের সংখ্যা ৯ হইতে ১০। ১২। ১৫। ১৮ এইরূপ হইয়া থাকে। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিই এই সমিতিতে থাকে গভর্ণমেণ্টের তাহাই ইচ্ছা। পূর্বে অনেক ম্যুন্সিপালটির সভাপতি বা চেয়ারম্যান গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন ; এখন অধিকাংশ স্থলেই নির্বাচিত বা নিযুক্ত সভ্যগণ দ্বারা সভাপতি মনোনীত হইয়া থাকেন।

১৯২০-২১ সালে সমগ্র বৃটীশভারতে ম্যুন্সিপালটির সংখ্যা ছিল ৭৩৯। প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোক ম্যুন্সিপাল সীমানার মধ্যে বাস করিত। ৯৭৭৫ জন সভ্যের মধ্যে ৫০৬৯ জন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত। বহু বৎসর হইতে ম্যুন্সিপালটির সংখ্যা প্রায় একইভাবে আছে ; কতক-গুলি সহর ছাড়া আর অতি অল্পস্থানেই ইহার ব্যবস্থা আছে। বাংলা-

দেশে ১৯২১ সালে ১১৬টি ম্যুন্সিপালটি ছিল। নূতন ম্যুন্সিপালটি কমই হইতেছে। বাংলাদেশের কোনো জিলায় ম্যুন্সিপালটির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, আবার কোনো কোনো জিলায় অত্যন্ত কম। ২৪ পরগণায় ২৮টি ম্যুন্সিপালটি, নদীয়া জিলায় ৯টি, হুগলী ও মৈমনসিংহে ৮টি করিয়া, ঢাকা, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি কয়েকটি জিলায় ২টি করিয়া এবং নোয়াখালি, রঙ্পুর প্রভৃতি জিলায় ম্যুন্সিপালটির সংখ্যা ১টি করিয়া।

বঙ্গের ম্যুন্সিপালটি

ম্যুন্সিপালটির কর্ত্তব্য ও আয়ের উপায়গুলি এইখানে প্রদত্ত হইতেছে —(১) সহরের পথঘাট নির্ম্মাণ, সংস্কার ও আলোকিত করিবার ব্যবস্থা; সরকারী ও ম্যুন্সিপাল গৃহাদি মেরামত। (২) সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, টীকা দেওয়া, ড্রেণ পাইখানার ব্যবস্থা ও জল সরবরাহ। (৩) শিক্ষা বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার ভার। ম্যুন্সিপালটির প্রধান প্রধান আয়ের সংস্থান :—

(১) অক্‌ট্রয়—উত্তর ভারতবর্ষ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে ইহা প্রচলিত আছে। (২) মান্দ্রাজ, বোম্বাই বঙ্গদেশে ও মধ্যপ্রদেশে বাড়ী ও জমির উপর ট্যাক্স। (৩) মান্দ্রাজ ও যুক্ত-প্রদেশে ব্যবসায় ও পেশার উপর ট্যাক্স। (৪) মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও আসামে রাস্তার টোল (৫) গাড়ীর ও অন্য সকল প্রকার যানের উপর ট্যাক্স; (৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জল সরবরাহ, হাট ও স্কুল হইতে আয়। অনেক সময়ে বড় বড় কাজ যেমন জলের কল করিবার জন্য ম্যুন্সিপালটি টাকা ধার করে।

১৯১৩-১৪ সালে ১৯২০-২১ সালে মাথাপিছু কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ ট্যাক্স পড়িয়াছিল তাহা নিম্নে দিতেছি; সমগ্র ভারতের ম্যুন্সিপালটি অধিবাসী লোকদের গড়ে মাথাপিছু প্রায় ৩৶০ ট্যাক্স পড়ে।

	১৯১৪	১৯২১		১৯১৪	১৯২১
	টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
বোম্বাই সহর		১৪॥৬	ব্রহ্মদেশ	২·৩৯	২৸/৭
রেঙ্গুন		১৩।৶৬	মধ্যপ্রদেশ	২·১৬	২৸৶১
কলিকাতা		১২।৶০	বঙ্গদেশ	২·০৪	২॥৶৭
মান্দ্রাজ সহর		৬॥৵৪	যুক্তপ্রদেশ	১·৮১	২।/৯
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৩·০৬	৬৵৯	আসাম	১·৭৬	২।/৯
দিল্লী	২·৭০		মান্দ্রাজ প্রদেশ	১·৫১	২৻৩
পঞ্জাব	২·৫৮	৩৵৮	কুর্গ	১·১৭	
বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	২·৫২	৩৸/৪	বিহার-উড়িষ্যা	১·১৬	১॥/৪

নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় ম্যুন্সিপালটির শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে ম্যুন্সিপালটি বা করপোরেশনের কমিশনরগণ তাঁহাদের মেয়র বা সভাপতি নির্বাচন করিবার অধিকার পাইয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন এবিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। বাংলার স্বরাজ্যদল ইহার নির্বাচন অধিকার করিয়াছেন। স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার প্রথম মেয়র ও রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইহার প্রথম একজিক্যুটিভ অফিসার। ভারতের সর্বত্রই ম্যুন্সিপালটি বা লোকালবোর্ডে নূতন প্রাণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

জিলা-বোর্ড (Local Board)

সহরের ব্যবস্থার জন্য যেমন ম্যুন্সিপালটি স্থাপিত হইয়াছে, তেমনি গ্রামের ব্যবস্থার জন্য জিলা-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে লোকাল ও জিলা-বোর্ডের গঠন প্রণালী পৃথক। সরকারের মূল প্রস্তাব-অনুযায়ী একমাত্র মান্দ্রাজ প্রদেশে গ্রাম্যশাসনের ব্যবস্থা আছে। উক্ত প্রদেশে কয়েকটি করিয়া গ্রাম লইয়া একএকটি ইউনিয়ান্ গঠিত হইয়াছে; ইউনিয়নের শাসন ও ব্যবস্থার ভার পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত।

বাড়ীর উপর সামান্য কর ধার্য্য করিয়া যে আয় হয় তাহা ইউনিয়নের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয়িত হয়।

ইহার উপর তালুক-বোর্ড; কয়েকটি গ্রাম-ইউনিয়ন লইয়া ইহা গঠিত; কয়েকটি তালুক-বোর্ড লইয়া জিলা বোর্ড গঠিত।

বোম্বাইতে কেবল দুই শ্রেণীর বোর্ড আছে, জিলা-বোর্ড ও তালুক-বোর্ড বাংলাদেশে পঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইনানুসারে প্রত্যেক প্রদেশে জিলা-বোর্ড স্থাপিত করিতে হইবে; কিন্তু লোকাল-বোর্ড সম্বন্ধে ব্যবস্থাভার প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর অর্পিত। বাংলাদেশে গ্রাম-ইউনিয়ন ও জিলা-বোর্ড উভয়ই আছে। যুক্ত-প্রদেশে মহকুমার বোর্ড উঠাইয়া কেবল জিলা-বোর্ড রাখে নাই, সেখানে মহকুমা-বোর্ডই প্রচলিত। বেলুচিস্থান ও বর্মায় জিলা বা লোকাল-বোর্ড কিছুই নাই। লর্ড রীপনের সময়ে বর্মাদেশে জিলা-বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্মনদের এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো প্রকার টান না থাকায় তাহা উঠিয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ব্যতীত অন্য সর্বত্রই জিলা ও লোকাল-বোর্ডের সভ্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন, তবে বিভিন্ন প্রদেশে এই নিয়ম পৃথক।

বিভিন্ন প্রদেশে জিলা-বোর্ড

লর্ড রীপনের স্বায়ত্বশাসন বিষয়ক আইন প্রবর্তিত হইলে বাংলাদেশের প্রতি জিলায় একটি জিলা-বোর্ড এবং প্রায় প্রত্যেক মহাকুমায় লোকাল-বোর্ড বা স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়। জিলার পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে বোর্ডের সভা-সংখ্যা স্থির হয়। এই সংখ্যা কোথায় ৯এর কম হইতে পারে না। সাধারণত সভ্যসংখ্যা ১২, ১৪, ১৭, ২১, ২৪ এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্তত অর্দ্ধেক বা তদধিক সভ্য সাধারণ প্রজা কর্তৃক নির্বাচিত ও অবশিষ্ট সভ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন।

সভ্য সংখ্যা ও নির্বাচন প্রণালী

প্রথমত প্রত্যেক মহাকুমায় যাহারা মত দিবার উপযুক্ত লোক তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত হয়, এবং এক এক স্থানের অথবা থানার নির্বাচনের জন্য এক একটি দিন স্থির হয়। যাহারা বৎসরে অন্তত ১৲ টাকা পথ-কর দেন অথবা কোনো প্রকার ইন্‌কম্‌ট্যাক্স বা আয়কর দেন, কিংবা যাঁহাদের আয় ২০০৲ টাকা অপেক্ষা কম নহে, তাঁহারাই নির্বাচন করিবার অধিকারী। গ্রামের কো-অপারেটিভ সভার সভ্যেরা মত দিতে পারেন। যে-কোনো একান্নবর্তী পরিবারের পূর্বোক্তরূপ আয় বা সম্পত্তি আছে, সেই পরিবারের যে কোনো যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য বা উপাধি পরীক্ষা পাশ করিলে মত দিতে পারেন।

সভ্য হইতে হইলে বৎসরে অন্তত ৫৲ পাঁচ টাকা পথকর দিবার মত সম্পত্তি অথবা এক সহস্র টাকার আয় থাকা চাই। আর পূর্বোক্ত প্রকারে শিক্ষিত যুবকও সভ্য হইতে পারেন।

নির্দিষ্ট দিনে কোনো রাজকর্মচারী বা শিক্ষিত ভদ্রলোক নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া নির্বাচনকারীদিগের মত লইয়া কে সভ্য হইবেন তাহা স্থির করেন। এই নির্বাচিত সভ্যগণের দ্বারা লোকাল-বোর্ড বা স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়, এবং এই সমিতির মধ্য হইতে কে কে জেলা-সমিতিতে যাইবেন তাহা (ভোট) সম্মতিলতার দ্বারা স্থির হয়। এইরূপ নির্বাচিত সভ্য এবং গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত সভ্যের দ্বারা জিলা-সমিতি গঠিত হয়। এতদিন সকল জেলাতেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ জিলা-সমিতির সভাপতি হইতেন। অধুনা সরকার কয়েকটি জিলার জিলাবোর্ডের সভ্যদিগকে স্বীয় সভাপতি নির্বাচন করিবার অধিকার দিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো কোনো স্থলে অযোগ্য সভাপতি নির্বাচনের ফলে সরকারকে বাধ্য হইয়া হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। সমগ্র বৃটীশ ভারতবর্ষে ২০০টি জিলা-বোর্ড ও ৫৩২টি লোকাল-বোর্ড আছে। এছাড়া মান্দ্রাজে ৩৯৫টি ও বঙ্গদেশে ৬৬টি ইউনিয়ান কমিটি আছে। সমগ্র

ভারতে ১০২২টি ইউনিয়ন কমিটি আছে। ২১ কোটী ৩০ লক্ষ লোক এই স্থানীয় শাসনের সুখ ও সুবিধা উপভোগ করিতেছে।

১৯১৫ সালে ভারত-সরকার স্থানীয়-শাসনের সর্বতোভাবে উন্নতির জন্য এক প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯১৯ সালে বঙ্গদেশে Village Government Act পাশ হইয়াছিল। সেই হইতে লোকাল-বোর্ড ও ইউনিয়নের প্রচেষ্টা খুব বাড়িয়াছে।

নূতন রিফর্মের বিশেষ মন্ত্রী

নূতন-সংস্কারে প্রবর্তিত হইবার পর হইতে গ্রামের উন্নতির প্রতি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশেই একজন দেশীয় মন্ত্রীর উপর স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ভার বিশেষভাবে অর্পিত হইয়াছে। সরকার আশা করিয়াছেন ইহার ফলে গ্রামের উন্নতি হইবে। কিন্তু ফল আশানুরূপ হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস নহে। আদর্শ লাভ না হইবার পক্ষে অন্তরায় অনেক ; প্রধান অভাব উপযুক্ত অর্থের। বড় বড় সরকারী ব্যয় করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাতে এরূপ অনুষ্ঠান সুচারুরূপে হওয়া কঠিন।

বোর্ডের অধিকাংশ (৯৫%) সদস্যই ভারতীয়। সরকারী লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমিতেছে ; সকল বোর্ডের মধ্যে মাত্র ১৭% জন সরকারী লোক। সভা-সমিতি গঠন ও পরিচালন, সংবদ্ধ হইয়া সামাজিক কাজ করিবার শক্তি প্রভৃতি দেশের মধ্যে বাড়িতেছে।

জিলা ও লোকাল বোর্ডের তালিকা।

	বোর্ডের সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা		আয়		মোট ব্যয়
		নির্ব্বাচিত	সরকারী মনোনীত	মোট	মাথা-পিছু	
				পাউণ্ড	পেন্স	পাউণ্ড
বঙ্গদেশ	৯৭	৬৪০	৭৩৪	৭০৭,৬৬১	৩¾	৭৩৩,৬৩০
বিহার উড়িষ্যা	৫৯	২৭০	৬০৮	৫৭৪,৭৪৪	৪	৫৬৭,৯৫৩
যুক্ত প্রদেশ	৪৮	৮০৭	২৭২	৭৪৪,৩৪৮	৩¾	৭৩৫,৬২৮
পঞ্জাব	৪৭	৫৭৫	৮৫২	৫৩৯,০৯৬	৮½	৫৫০,৫২৬
দিল্লী	১	×	২০	৭,৭৮৮	১০½	৭,০৯৫
উ-প সীমান্ত প্রদেশ	৫	×	২১৮	৩৯,৩৯৩	৫	৩৭,০৮৬
মধ্যপ্রদেশ	১০২	১,৩৬৮	৪৯৬	২৮২,২১৮	৫	২৮৩,০৬০
আসাম	১৯	২০২	১২১	১৪৪,২৫৬	৫½	১৪১,৮৪১
আজমীড়	১	১৬	২৫	৪,৩৬২	৩	৪,১১৮
কুর্গ	১	২	১৭	৬,১৮৩	৮½	৫,৭৬৬
মাদ্রাজ	৫৩২	১,১৭৬	৫,১৪৯	১,৬২৪,৫৪৮	৫¾	১,৫৯৮,৪২৪
বোম্বাই	২৪১	১,৭০৩	১,৯৪৮	৫৭৮,২৮৩	৭¾	৫৪৪,০০৬
মোট ১৯১৬—১৭	১,১৫৩	৬,৭২৯	১০,৪৫৯	৫,২৫২,৫৫০	৫¼	৫,২০৯,৫৪০

৮। করদ ও মিত্র রাজ্য

সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের পরিমাণ ফল ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার বর্গ মাইল ও জনসংখ্যা ৩১ কোটি ৫১ লক্ষ। এই সমগ্র দেশ ইংরাজদের খাস্ অধীন নহে; প্রায় ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গ মাইল দেশ ও ৭ কোটি লোক দেশীয় রাজাদের অধীন। এই সকল করদ-মিত্র রাজ্যের সংখ্যা ৭০৩। ১৭৯টি রাজ্য খাস সরকারের ও অবশিষ্টগুলি প্রাদেশিক শাসনের তত্ত্বাবধানে আছে। তবে ইহাদের আকার, আয়তন, জনসংখ্যা, সম্মান, সমৃদ্ধি, অধিকার এত বিচিত্র যে সবগুলিকে এক কোঠায় ফেলা যায় না। জনসংখ্যা, সম্মান ও সমৃদ্ধি অনুসারে ইহাদের পাঁচটি শ্রেণী করা হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী (১) হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্যের নিজামের রাজ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণী (২) মৈশূর দাক্ষিণাত্যে।

তৃতীয় শ্রেণী (৩) ত্রিবঙ্কুর (৪) গবালিয়র সিন্ধিয়ার রাজ্য। (৫) কাশ্মীর ও জম্মু; (৬) জয়পুর বা অম্বের; (৭) বড়োদা বা গায়কাবাড়ের রাজ্য; (৮) যোধপুর বা মেরবার; (৯) পাতিয়ালা (১০) রেওয়া (১১) উদয়পুর।

চতুর্থ শ্রেণী (১২) কোল্হাপুর (১৩) ইন্দোর বা হোলকারের রাজ্য (১৪) আলবার (১৫) কোচীন (১৬) বহবলপুর (১৭) ভোপাল (১৮) ভরতপুর (১৯) ময়ুরভঞ্জ (২০) বিকাণীর (২১) কোচবিহার (২২) কোঠা [রাজপুতানা] (২৩) রামপুর। নেপাল ও ভুটান মিত্ররাজ্য

পঞ্চম শ্রেণী—অবশিষ্ট ৬৭৮টি রাজ্য; তন্মধ্যে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অধীনে গুজরাট ও কাথিবাড়েই ৩৫৪টি রাজ্য। ভারত গভর্ণমেণ্টের

তত্ত্বাবধানে মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অন্তর্গত ১৪৮টি ; ৫২টি বর্মা সরকারের অধীন ; ৪৩টি পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের অধীনে, এবং রাজপুতানা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ২০টি। ১৯২৩ সালের ১লা অক্টোবর হইতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ত্রিবঙ্কুর, কোচীন, পুডুকোট্টে, বঙ্গলগল্লে, সন্দুর ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হইয়াছে।

উপর্য্যুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিবঙ্কুর, কোচীন, মৈশূর, ও রাজপুতানার রাজ্যগুলি প্রাচীন ; এছাড়া অধিকাংশই আধুনিক কালে উঠিয়াছে। ইংরাজদের অভ্যুদয়ের পূবে কাহারও অস্তিত্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না। ভারত-ইতিহাসের সেই ভাঙ্গাগড়ার যুগে পুরাতন অনেক রাজ্যের পতন ও নূতন অনেক রাজ্যের গঠন হইয়াছিল ; যে দেশে বিপ্লব যত দীর্ঘকাল ধরিয়া ছিল সেইখানেই দেশীয় রাজাদের প্রাদুর্ভাব তত বেশী দেখা যায়।

মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংস্এর পূব (১৮১৩-২৩) পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাগজেকলমে সবত্রই দেশীয় রাজ্যের পৃথক্ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন; তাহাদিগকে যুদ্ধে যতই অপদস্থ করুন না কেন সন্ধি করিবার সময় সমানের চোখে দেখিতেন। হেষ্টিংস বুঝিলেন যে এসকল রাজা শূন্যকুম্ভ সদৃশ, ইহাদের সহিত সহযোগীর ন্যায় ব্যবহার করা বৃটীশ শক্তির অবমাননা বৈ আর কিছুই নয়। তিনিই প্রথমে দেশীয় রাজাগুলিকে পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে তাহারা সরকারের অধীন। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে নিয়ম হইল যে অপুত্রক রাজার রাজ্য খাস বৃটীশ শাসনাধীনে আসিবে; তাহারই ফলে নাগপুর, সাতারা, অযোধ্যা প্রভৃতি অনেকগুলি রাজ্য বাজায়প্ত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন ভারতের শাসন ভার কোম্পানীর হাত হইতে পার্লিয়ামেণ্টের হাতে আসিল তখনও তাঁহারা দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর

দেশীয় রাজ্যের ইতিহাস

তাঁহাদের দাবী সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিলেন এবং যখন ঐ সব রাজ্যে অন্যায় অত্যাচার, ষড়যন্ত্র হইয়াছে তখনই কঠিন হস্তে তাহা দমন করিতে বৃটীশরাজ পশ্চাদপদ হন নাই। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত কখনো কোনো দেশীয় রাজার রাজ্য আক্রমণ বা অযথাভাবে বাজায়প্ত করেন নাই। মৈশূরের আভ্যন্তরীণ বিবাদাদির জন্য ১৮৩১ সালে ঐ দেশ ইংরাজ সরকার নিজ শাসনাধীনে লন; তারপর ৫০ বৎসর পরে ১৮৮১ সালে, লোকে যখন ইহার স্বাধীন অস্তিত্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে তখন, পুনরায় তাঁহারা প্রাচীন রাজপরিবারে যোগ্য রাজপুত্রের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। ১৯২১ সালে কাশীর রাজাকে করদ-রাজ্য বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশীয় রাজাদের ও তদীয় কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা হেতু দলাদলি, রেষারেষি, নীচতার জন্য একাধিকবার নানাস্থানে সরকার স্বয়ং শাসনভার লইয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত মনোমালিন্যের ফলে নাভার রাজা ও ইন্দোরের রাজাকে গদি ছাড়িতে হইয়াছে।

গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় উপর্য্যুক্ত শত শত রাজ্য ইংরাজ সরকারের সহিত সন্ধি সর্তে আবদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং কাহারও সর্তের সহিত কাহার সর্ত মিলিবার কথা নয়। হায়দ্রাবাদের ন্যায় প্রকাণ্ড দেশের সহিত যে সর্ত, দুই একটি গ্রামের নামে-মাত্র সর্দারের সহিত সে সর্ত নয়। কাথিবাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের কেবল খাজনা আদায় ছাড়া আর কোনো ক্ষমতাই নাই। সরকারের সহিত করদ রাজ্যগুলির রাজনৈতিক সম্বন্ধ কিরূপ তাহা প্রদত্ত হইতেছে।

১। (ক) প্রায় ১৭৯টি রাজ্যের সহিত খাস ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ। ইহার মধ্যে হায়দ্রাবাদ, মৈশূর, বড়োদা, কাশ্মীর ও ত্রিবঙ্কুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের রাজনৈতিক কার্য্যাবলী গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং পরিদর্শন করেন।

(খ) বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং সবগুলি দেখিতে পারেন না বলিয়া কতকগুলি রাজ্য একত্র করিয়া এক একটি এজেন্সী গঠন করিয়াছেন। যথা:—(১) বেলুচিস্থান এজেন্সীর অন্তর্গত ৩টি রাজ্য। (২) রাজপুতানা এজেন্সীর অন্তর্গত ২০টি করদরাজ্য; (৩) মধ্য-ভারতীয় এজেন্সীর অন্তর্গত ১৫৩টি রাজ্য। (৪) সিকিম ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন ছিল; উক্ত বৎসর হইতে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে। (৫) ভুটান ও নেপাল।

২। অবশিষ্ট ৫২৪টি করদ রাজ্যের সহিত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের সম্বন্ধ। গভর্ণর ও চীফ কমিশনরগণ নিজ নিজ প্রদেশস্থিত করদরাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রদেশস্থ সকল করদরাজ্যের সহিত লাটসাহেবদের যে সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ আছে তাহা নহে; কোথাও বা বিভাগীয় কমিশনর, কোথাও বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং বড় বড় ষ্টেটে পোলিটিক্যাল এজেণ্ট সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন।

দেশীয় রাজা ও ইংরাজ সরকারের মধ্যে পরস্পরের অধিকার ও এক্তার লইয়া বেশ বুঝাপাড়া আছে। কাহারও সন্ধির সর্ত্তের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নাই। বড় বড় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে ভারত-সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরাজের কাছারীও অতিরিক্ত আছে। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা স্থানীয় রাজাদেরই সম্পূর্ণ অধীন; বৃটীশ ভারতের প্রজাদের উপর বৃটীশ সরকারের ক্ষমতাও অসীম নহে। বৃটীশ রাজ্যের চোর ডাকাত বা অন্য কোনো শ্রেণীর অপরাধী দেশীয় রাজ্যে আশ্রয় লইলে তথাকার পুলিশ তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে বাধ্য। এইরূপ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম উভয় পক্ষই মানিয়া চলেন।

রাজাদের ক্ষমতা

বৈদেশিক বা আন্তর্জাতীয় নিয়ম বিষয়ে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর

যেসব বিধি নিষেধ আছে সেগুলি যাহাতে দৃঢ়ভাবে পালিত হয় তাহার দিকে পোলিটিক্যাল এজেন্ট, রেসিডেন্ট প্রভৃতি প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। দেশীয় রাজা অপর বিদেশীয় রাজ্যের সহিত স্বাধীনভাবে কোনো প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না; সমস্ত আলোচনাদি রেসিডেন্ট বা এজেন্টের হাত দিয়া সরকারের কাছ হইতে পাশ হইয়া নির্বাহিত হইতে পারে। বৃটীশরাজ বহির্শক্রর আক্রমণ হইতে রাজ্যগুলিকে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের স্বার্থের ও ও দেশের শান্তির কোনো প্রকার বাধা জন্মিতে পারে এমন কোনো সুযোগ নরপতিগণকে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। পার্শ্বস্থ রাজ্যের সহিত কাহারও কোনো বিষয় লইয়া মতদ্বৈত বা বিবাদ উপস্থিত হইলে বৃটীশ রাজের নিকট তাহা অবিলম্বে জানাইতে তাঁহারা বাধ্য। বড় বড় দেশীয় রাজাদের অধিকাংশেরই কিছু কিছু সৈন্য আছে, তাহাদের প্রধান কর্তব্য পুলিশ প্রহরীর কার্য্যসম্পাদন ও রাজসভার শোভাবর্দ্ধন। অধিকাংশ স্থলেই সৈন্যগণের শিক্ষা কিছুই নাই—অস্ত্রশস্ত্র এত 'সে-কেলে' ধরণের যে বাহিরে কোথায় গমন করিলে লোকে তাহাদিগকে দুই শতাব্দী পূর্বের লোক ভাবিয়া সন্দেহ করিতে পারে। বর্তমানে কোনো কোনো রাজ্যে কিছু উন্নতি হইতেছে।

বৃটীশরাজের সহিত দেশীয় রাজগণের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক হইতেছে। রাজপুত্রগণের শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিলাতের বড় বড় বিদ্যালয়ের অনুকরণে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আজমীর, রাজকোট, ইন্দোর, লাহোর ও মান্দ্রাজে রাজপুত্রদের বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। সেখানে সিভিল সার্বিসের বা বিলাতী কলেজের বিচক্ষণ শিক্ষকদের হস্তে এই রাজকুমারদের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। রণনীতি শিক্ষা দিবার জন্য দেরাদুনে ইম্পিরিয়াল কাডেট সংলগ্ন একটি কলেজে কেবলমাত্র রাজপরিবারের বালকদিগকেই

শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয়ে রাজকুমারগণ সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আব্‌হাওয়ার মানুষ হইতেছেন।

ভারতবর্ষের ভিতরে বাহিরে বা সীমান্তে যখনই কোনো অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের সমস্ত রণ-শক্তি বৃটীশরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সৈন্যকে ইম্পিরিয়াল সার্বিস ট্রুপস্ (Imperial Service Troops) বলে। বর্তমানে প্রায় বাইশ হাজার সৈন্য এই দলে আছে। প্রত্যেক ষ্টেটের উপর নিজ নিজ বাহিনী প্রতিপালনের ভার। গত যুদ্ধের সময়ে দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের ধন-জন সমস্ত বৃটীশরাজের হাতে দিয়াছিলেন। বৃটীশ-শাসনের ইতিহাসে ও সর্ব প্রথমবার দিল্লীতে বড়লাট দেশীয় রাজাদের একত্র করিয়া দেশের মঙ্গলের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সভাটি ১৯২১ সালে ডিউক অব্ কনট্ আসিয়া একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন।

বড়োদা

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বড়োদা বহু বিষয়ে অনেকের অপেক্ষা আগাইয়া চলিতেছে। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র রাজ্য কি প্রকারে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

বড়োদারাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত; কিন্তু বোম্বাই গভর্ণ-মেণ্টের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই; ইহার যোগ খাস ভারত সরকা-রের সহিত। বড়োদা রাজ্য এক-সংলগ্ন নহে, চারিটী স্থানে ছড়াইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে ইংরাজদের রাজ্য। এই চারিটি বিভাগের নাম বড়োদা, কাদি, নওসারী, অমরেলী। প্রত্যেকটি বিভাগ ১০৩২টি করিয়া

অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা

তলুকে বিভক্ত। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণ ৮,১৮২ বর্গ মাইল, ১৯২১ সালের আদমস্থমারী গ্রহণকালে এখানকার জনসংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ ২৬ হাজার কম। এদেশে বহুবার নিদারুণ দুর্ভিক্ষে বহু সহস্র লোকের প্রাণ গিয়াছিল।

বড়োদার অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জন লোক এখনো গ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে। বড়োদারাজ গ্রামের উন্নতির দিকে যে প্রকার দৃষ্টি দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় জাতির যথার্থ শক্তি জাগিবে।

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় গুজরাট মুঘলদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, মারাঠারা সেখানে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। সেই সময় পিলাজী গায়কবাড় নামে একজন বীর বহুযুদ্ধে ও অভিযানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহাকেই বড়োদা রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিতে পারা যায়। ১৭৬৬ সাল পর্য্যন্ত সোনাগড় তাঁহাদের প্রধান আবাসস্থান ছিল। পিলাজী বহুকাল ধরিয়া গুজরাটে চৌথ আদায় করেন এবং তাঁহার পুত্র দামজী ১৭৩৪ সালে বড়োদা অধিকার করেন এবং সেই হইতে গায়কবাড়রা বড়োদার অধীশ্বর। মুঘলশক্তি গুজরাট হইতে তখনো সম্পূর্ণভাবে অস্তমিত হয় নাই। আহমাদাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্য হইতে মুঘলশক্তি একেবারে লোপ পাইল; তখন কেবল মাত্র পেশোয়া ও গায়কবাড়ের শক্তি গুজরাটে নিজ নিজ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। বালাজী বাজিরাও যখন পাণিপথের শেষ যুদ্ধে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন, দামাজী সেই ভীষণ যুদ্ধে যোগদান করিয়া মহারাষ্ট্রের নাম রাখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে সমগ্র মহারাষ্ট্র শক্তি চূর্ণ হইল বটে কিন্তু গায়কাবাড়ের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। দামাজীর মৃত্যু হইল ১৭৬৮ সালে। ইহার পর ১৮০২

ইতিহাস

পর্য্যন্ত ভায়ে ভায়ে বিবাদ আত্মকলহে কাটিয়া যায়। এই সময়ে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সর্ব প্রথম গায়কাবাড়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কলহকারীদের মধ্য হইতে আনন্দরাওকে রাজগদীতে বসাইয়া দিলেন। ১৮০৫ সালে লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে বড়োদার সহিত ইংরাজ সরকারের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং বড়োদার বহিরাজনীতি ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত হইবে এই সর্ত্তে গায়কাবাড় আবদ্ধ হন।

ইংরাজের সহিত সম্পর্ক

পেশোয়ার সহিত মতদ্বৈধ ও বিবাদ মীমাংসার ভার ইংরাজের উপর অর্পিত হইল। বাজীরাওয়ের সহিত ইংরাজের ভীষণ দ্বন্দ্বের সময়ে বড়োদা ইংরাজদের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। পিণ্ডারী সমরেও ইংরাজদের প্রধান সহায় ছিলেন গায়কাবাড়.

কিন্তু ১৮২০ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সাহজীরাওএর রাজত্ব কালে উক্ত রাজ্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়; এবং বোম্বাইএর গভর্ণর শেষকালে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করিয়া দেন। ১৮৪৭ সালে গনপৎরাও রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে বড়োদার সহিত ইংরাজ সরকারের রাজনৈতিক যোগ বোম্বাই হইতে খাস ভারত সরকারের হাতে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তৎকালীন গায়কাবাড় খাণ্ডেরাও ইংরাজদের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মলহর রাও ১৮৭০ সালে গদিতে বসেন; কিন্তু তাঁহার মত অকর্মণ্য, কুচক্রী, স্বেচ্ছাচারী রাজা দেশের অকল্যাণ বলিয়া পরিগণিত হইল। অবশেষে রেসিডেণ্টকে বিষদানের চেষ্টার অপরাধে তিনি রাজ্যচ্যুত হন; কিন্তু এ-পর্য্যন্ত এই অভিযোগ সপ্রমাণিত হয় নাই। ১৮৭৫ সালে এই রাজপরিবারের বহুদূর সম্পর্কীয় একটি ১৩ বৎসরের বালককে গদীতে সায়াজীরাও উপাধি দিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল।

বর্ত্তমান গায়কাবাড়ের রাজ্য প্রাপ্তি

ইনিই বর্ত্তমান গায়কাবড়; ১৮৮১ সালে বর্ত্তমান গাওকাবাড় রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি শ্রীল শ্রীযুক্ত ফরজন্দ ইথাস্-ইদৌলত-ইংলিশিয়া মহারাজা স্যার সায়জী রাও. গায়কাবাড় সেনা খাস খেল, সমশের বাহাদুর, জি, সি, এস, আই ইত্যাদি।

বর্ত্তমান গায়কাবাড়ের সময় হইতেই বড়োদার সর্ব বিষয়ে উন্নতি আরম্ভ। যদিও মহারাজ দেশের সর্বেসর্বা তথাচ তিনি তাঁহার ক্ষমতা আপনার হস্তে আবদ্ধ রাখেন নাই। মন্ত্রী ও দুই-জন নায়েব-দেওয়ানকে লইয়া একটি কার্য্য-নির্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। বৃটীশ ভারতের ন্যায় নানা বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সেগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন হইয়াছে। সমগ্র রাজ্য চারিটী প্রান্তে এবং সেগুলি ৪২ মহল ও পেটামহলে বিভক্ত হইয়াছে।

শাসন বিধি

বড়োদার শাসন সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইয়াছে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রথার পুনরুত্থাপন। যে কারণেই হৌক গত শতাব্দীর মধ্যে গ্রামের স্বায়ত্বশাসন শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছিল। কেন্দ্রগত শক্তি দেশের সর্বব্যাপী শক্তিকে প্রায় মারিয়া ফেলিয়াছিল। মহারাজের একান্ত ইচ্ছার জোরে মৃতপ্রায় গ্রামগুলিতে প্রাণ আসিতেছে। প্রতি গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রাম্য-কর্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য গ্রামের সরকারী খাজনা কমাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল পঞ্চায়েৎ সরকারী মনোনীত ব্যক্তিরাই হইত—কিন্তু ১৯০৪ সালে মহারাজ মনোনয়ন প্রথা উঠাইয়া দিয়া নির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মহারাজের ইচ্ছা যে সমগ্র দেশে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রচলিত হয়; এই জন্য গ্রাম হইতে তালুকে, তালুক হইতে জিলায় ও জিলা হইতে রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। পঞ্চায়েতের জন্য নূতন

গ্রাম পঞ্চায়েৎ

নূতন বিধি প্রণীত হইয়াছে; সহস্রাধিক অধিবাসীর গ্রামে নিজ পঞ্চায়েৎ আছে; কিন্তু হাজারের কম হইলে কয়েকটি গ্রাম একত্র হইয়া পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া থাকে। পঞ্চায়েতে ৫ জন হইতে ৯ জন সভ্য থাকেন। ইহার অৰ্দ্ধেক স্থানীয় নায়েব-স্থবা মনোনীত করেন; অপরার্দ্ধ কৃষকেরা নির্বাচন করে। পাটেল গ্রামপঞ্চায়েতের সভাপতি; তলতাই বা হিসাবরক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয় ইহার সভ্য। এই পঞ্চায়েতের উপর গ্রামের রাস্তা, কূপ, পুষ্করিণী, বিদ্যালয়, ধর্মশালা, দেবস্থান, আদর্শ-খামার এবং সরকারী ও সাধারণের সমস্ত সামগ্রী তদারকের ভার। দুর্ভিক্ষের সময়ে পঞ্চায়েৎ সেবার ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকে; তাহারা গ্রামের মুন্সিফের সহিত মোকদ্দমায় ও সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। এক কথায় গ্রামের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্ম পঞ্চায়েৎ দায়ী। প্রতিমাসে ইহাদের সভা বসে এবং কতকগুলি গ্রাম হইতে একজন করিয়া সভ্য তালুক-বোর্ডে প্রেরিত হন।

তালুক বোর্ড

তালুক-বোর্ডে মনোনীত ও নির্বাচিত দুই শ্রেণীর সভ্য থাকে। কতকগুলি গ্রাম-পঞ্চায়েৎ হইতে ও ম্যুন্সিপালটী হইতে অৰ্দ্ধেক সভ্য নির্বাচিত হয়, অবশিষ্ট সরকারী তরফ হইতে মনোনীত হয়। নায়েব-স্থবা এই সভার সভাপতি।

জিলা-বোর্ড

বড়োদায় চারিটি জিলা আছে এবং প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া বোর্ড আছে। প্রত্যেক তালুক-বোর্ড হইতে এক বা ততোধিক সভ্য জিলা-বোর্ডে প্রেরণ করা হয়; তাঁহারা প্রজার প্রতিনিধিরূপে সেখানে উপস্থিত হন। দশহাজারী সহরের প্রতিনিধিগণ জিলা-বোর্ডে উপস্থিত হইয়া আপনাদের শাসন ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করেন। জিলা-বোর্ডের অৰ্দ্ধেক সভ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। মনোনীত সভ্যের অৰ্দ্ধেক সরকারী লোক। জিলার সরকারী কর্তা এই সভার সভাপতি এবং বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত

একজন ভাইস-চেয়ারম্যান তাঁহার সহকারী। জিলা-বোর্ডকে পূর্ত্ত-বিভাগের অন্তর্গত রাস্তা তৈয়ারী, জলাশয় ও কূপ খনন, ধর্মশালা, চিকিৎসালয় বাজার পর্য্যবেক্ষণ, টীকা দেওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বন-বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য দেখিতে হয়। লোকে যথার্থ স্বায়ত্ব-শাসনের শিক্ষা পাইয়া গ্রাম হইতে নিজেদের দায়িত্ব বুঝিতে শিখিতেছে এবং বৎসরের পর বৎসর নূতন অধিকার পাইয়া যথার্থ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এই প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য গায়কবাড় ১৯০৮ সালে ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করেন। যেমন গ্রাম-পঞ্চায়েৎ তালুক-বোর্ডে প্রতিনিধি সভ্য নির্বাচন করিয়া প্রেরণ করেন, তালুক-বোর্ড পুনরায় জিলা-বোর্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তেমনি জিলা-বোর্ড হইতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। বড়োদার ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়ানকে লইয়া ২৬ জন সভ্য। ১০ জন সভ্য জিলা-বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন, অবশিষ্ট সরকারী বেসরকারী সভ্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। ব্যবস্থাপক সভায় বিল পাশ হইয়া রাজার অনুমতি পাইলে তবেই তাহা কার্য্যকারী আইন হইবে নতুবা নহে।

ব্যবস্থাপক সভা

গ্রামে স্বায়ত্ব-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সহরে ম্যুন্সিপালটি প্রবর্ত্তিত হয়। বড়োদার ম্যুন্সিপালটি চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন সরকারী মনোনীত লোক সভাপতি হন না। বড়োদা ব্যতীত আরও ১০টি সহরে ম্যুন্সিপাল স্বায়ত্ব-শাসন প্রচলিত আছে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে বড়োদা তাহার স্বায়ত্ব-শাসন দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বঙ্গদেশের উজ্জ্বল রত্ন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রচুর পরিমাণে ঋণী।

ম্যুন্সিপালটি

বড়োদার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন কৃষিজীবি; সুতরাং তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই রাজ্যের কল্যাণ, রাজার কল্যাণ। সমবায় ঋণদান সমিতি সম্বন্ধে যে-সকল নিয়ম হইয়াছে তাহাতে প্রজার যথার্থ কল্যাণ হইতেছে। বর্তমানে প্রায় (৩০০) তিন শত সমবায়ে দশ হাজার মেম্বরের ৯ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং এক লক্ষ টাকা রিজার্ভ ভাণ্ডারে জমিয়াছে। মোটের উপর গ্রামের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, মিতব্যয়িতা এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সমবায় ঋণদান

কেবল শাসনের সুব্যবস্থা ও ঋণদান সমিতি স্থাপন করিলে প্রজার উন্নতি হইবে না একথা বর্তমান গায়কাবড় বহুকাল হইতে বুঝিয়াছেন। য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়া মহামতি গায়কবাড় ১৮৯৩ সালে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন হইতে ১২ বছরের বালক ও ৭ হইতে ১০ বছরের যাবতীয় বালিকাকে শিক্ষার জন্য বাধ্য করিলেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহাকে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। ১৮৭১ সালে বড়োদার রাজ্যে একটি ইংরাজী ও ৪টী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং শিক্ষার জন্য বছরে ১৩ হাজার টাকা মাত্র খরচ হইত। সরকারী লোকের মধ্যেও দুই চারিজন ব্রাহ্মণ ও লেখক শ্রেণীর লোক ছাড়া লেখাপড়া অতি অল্পই জানিত। ১৯২২ সালে ২৭৪৮টি বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাদান ও ৬৬ টিতে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার মধ্যে ৩৮টি মাইনর স্কুল, ২০টি হাইস্কুল, একটি কলেজ, পাঁচটি শিক্ষকদের কলেজ আছে। এছাড়া টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্য কলাভবন, সঙ্গীত-বিদ্যালয় ও নৈশ-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে; মোট ২৮১৪ বিদ্যালয় আছে। অন্ত্যজ জাতির সন্তান সন্ততি সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে; কিন্তু এ ছাড়াও তাঁহাদের জন্য

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা

বিশেষ শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। অসভ্য পার্বত্য জাতির ছেলেদের জন্য বোর্ডিংএ থাকা, খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ছাত্র সংখ্যা

১৯২২ সালের প্রায় দুই লক্ষ বিদ্যার্থী বড়োদার বিদ্যালয়ে পড়িতেছিল। ১৯২২ সালে শিক্ষা বিভাগের জন্য ২৫ লক্ষ ব্যয়িত হইয়াছিল। বড়োদার স্ত্রী-শিক্ষা ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতেছে। ১৮৯১ হইতে ১৯১১ সালে বিশ বৎসরে বৃদ্ধি হইয়াছিল ৬০% হারে, কিন্তু ১৯১১ হইতে ১৯২১ এর মধ্যে বৃদ্ধি হইয়াছে ৭০% হারে।

বালিকা বিদ্যালয়

বালিকাদের শিক্ষার জন্য বড়োদারাজ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন; ১৯২২ সালে ৩৭২ টি স্কুল বালিকাদের জন্য চলিতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ হাজার বালিকা পড়িতেছে; এবং ইহার সহিত আর ৩১ হাজার বালিকা যাহারা ছেলেদের সঙ্গে পাঠশালায় পড়িতেছে তাহাদিগকে যোগ দিলে সংখ্যা নিতান্ত মন্দ হয় না। ১৯২১ সালে হাজার লোকের মধ্যে ২১০ জন পুরুষ ও ৪০ জন স্ত্রী লিখিতে পড়িতে জানিত।

অন্ত্যজ-বিদ্যালয়

অন্ত্যজ শ্রেণীর বাস বড়োদায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজারের অধিক; ইহাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ২২১টি পৃথক্ বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে ৫টি শিক্ষালয় মেয়েদের জন্য। ১৯২২ সালে ৮,৭০০ অন্ত্যজ বিদ্যার্থী এই সকল বিদ্যালয়ে ও আরও প্রায় ৪৪ হাজার বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছিল। অন্ত্যজদের প্রায় শতকরা ৭% জন এখন বিদ্যালাভ করিতেছে।

কলাভবন
টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা

কলাভবন ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিখ্যাত টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় বলিয়া বর্তমানে গণ্য হইয়াছে। ১৯২২ সালে এই বিদ্যালয়ে ৪৭০ জন ছাত্র। এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই বাহিরের, বড়োদায় ছাত্র দেড়শত মাত্র।

কলাভবন ব্যতীত আরও দুইটি শিল্প বিদ্যালয় আছে। কলাভবনে ছাত্রপিছু সরকারী বাৎসরিক ব্যয় ১৫৮৲ টাকা।

বড়োদারাজ তাঁহার রাজস্বের বারভাগের একভাগ বিদ্যার জন্য খরচ করেন অর্থাৎ ২৫ লক্ষ টাকা। ফলে ৪০ বৎসরে নিরক্ষর দেশে শতকরা ১০ জন এখন লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং ত্রিবঙ্কুর ও কোচীন ছাড়া সমগ্র ভারতের আর কোথাও শিক্ষিতের সংখ্যা এত অধিক নয়।

মহারাজ বুঝিয়াছেন যে কেবলমাত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিলে বিদ্যা বিস্তারলাভ করিবে না। বিদ্যা প্রচারের প্রধান সহায় পুস্তক প্রচার।

পুস্তক মুদ্রণ

এইজন্য রাজকোষ হইতে বহু সহস্র টাকা খরচ করিয়া নানা বিষয়ে বই গুজরাটী ও মারাঠা ভাষায় লিখিত হইতেছে। কিন্তু আবার পুস্তক লিখিত হইলেই লোকের জ্ঞান বাড়ে না। তাহার প্রচারও প্রয়োজন। সেইজন্য গায়কাবাড় আমেরিকা হইতে মিঃ বোর্ডেন নামক জনৈক লা

লাইব্রেরী

বিশেষজ্ঞকে এদেশে আনয়ন করেন। তিনি বড়োদা রাজ্যে পুস্তক প্রচারের জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করেন। গায়কাবাড় নিজ লাইব্রেরী এখন সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই প্রকাণ্ড লাইব্রেরীতে এখন বিভিন্ন শাখা খোলা হইয়াছে; (১) পাঠাগার, সেখানে আড়াই শতের উপর কাগজ ও পত্রিকা আসে; (২) পুস্তক প্রচার করিবার জন্য একটি বিভাগ; (৩) কোষাদি দেখিবার জন্য; (৪) শিশু বিভাগ; (৫) মহিলা বিভাগ; (৬) সংস্কৃত লাইব্রেরী। রাজ্যের মধ্যে ৭২২টি শাখা-লাইব্রেরী আছে ইহার মধ্যে সহরে ৪৩টি ও ৫৮৮ গ্রাম্য-লাইব্রেরী ও অবশিষ্ট ৯১টি কেবলমাত্র পাঠাগার। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লাইব্রেরী আছে সেগুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। ৪৪৪টি বাক্স বই বোঝাই হইয়া সারা বৎসর দেশময় ঘুরিতে থাকে। এই বিভাগের জন্য প্রায় ১৪ হাজার বই পৃথক

আছে এবং প্রতি বৎসর ১০,০০০ বই লোকের মধ্যে প্রচার হইয়া থাকে।

লোকশিক্ষার চতুর্থ উপায় সচল-চিত্র প্রদর্শন বা বায়স্কোপ। বায়স্কোপের দ্বারা যে সাধারণ লোকের চিত্তের শিক্ষা হয় তাহা আমাদের দেশে এখনো কেহ জানেন না বলিলেই হয়। আমেরিকা ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ইহার যথার্থ সদ্ব্যবহার হইয়াছে; গায়কাবাড় শিক্ষার সেই সুযোগ তাঁহার রাজ্য মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১৭ সালে লাইব্রেরীর জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বায়স্কোপ।

মহারাজ নিজে শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান। তিনি নিজে পুস্তক ও চিত্র ভাল বাসেন এবং তাঁহার প্রজারা ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ পায় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগরগণের সুবিধার জন্য লাইব্রেরীতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পী কারিগরগণের তালিকা রক্ষিত হয়। বড়োদায় একটি যাতুঘর আছে।

দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বড়োদার বিশেষ দৃষ্টি আছে। বর্তমান বাণিজ্যের এই অধোগতির প্রধান কারণ আমাদের বুদ্ধি ও বল একত্র কাজ করিতেছে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের শারীরিক বল নাই ও শ্রমজীবির বুদ্ধি নাই। এই জন্যই কলাভবন স্থাপিত হয় এবং এই ২৮ বৎসর এই বিদ্যালয় ইহার কার্য্য পুরাদমে করিতেছে। অনেকগুলি শিল্পে রাজসরকার সাহায্য দান করিয়াছেন। কিন্তু শিল্পকার্য্যে সামান্য লোকই নিযুক্ত, অধিকাংশই কৃষিকার্য্যে রত। সুতরাং যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকার্য্যে লাগিয়া রহিয়াছে সেখানে কৃষির উন্নতি সর্ব প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। য়ুরোপে ও বিশেষভাবে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বড়োদার মহারাজ পাশ্চাত্য

শিল্পোন্নতি।

আদর্শ অনুসারে চারিটী 'মডেল' ফার্ম স্থাপন করিয়াছেন। এখানে বিশেষজ্ঞেরা নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল, কৃষকদিগকে দেখাইয়া থাকেন। কৃষি পর্য্যবেক্ষকগণ প্রায় দুই শত গ্রামে কৃষির উন্নতি, কৃষি সমিতি, সমবায় স্থাপন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভাল ভাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উপকারিতা দেখাইয়া কর্মচারীরা বেড়াইয়া থাকেন। কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার জন্য কতকগুলি বৃত্তি ছাত্রদের দেওয়া হইয়া থাকে।

১৯১৭ সালে বড়োদার কৃষি ও শিক্ষা প্রদর্শনী হয়; ইহাতে কৃষি, বন, বাগান, শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক প্রায় ৩০ হাজার সামগ্রী দেখানো হয়। এই প্রদর্শনীর প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে যে এখানে হাতে কলমে অনেক পরীক্ষা দেখানো হয় ও অনেক বক্তৃতাও করা হয়।

কৃষকের প্রধান সহায় গো-মহিষ; তাহাদের উন্নতি ও বৃদ্ধির দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আছে। রাজদৃষ্টি এইরূপে কৃষি বিভাগের সকল শাখায় পড়িয়াছে।

প্রজার অন্যান্য কল্যাণের জন্য রাজার মন সর্বদাই ব্যাকুল। ধর্ম বিষয়ে তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন; মন্দিরের অর্থাদি যাহাতে সদ্‌ভাবে ব্যয়িত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন; সংস্কৃত পাঠশালা, পুরোহিতদের ক্লাস, তাহাদের সার্টিফিকেট, অল্পবয়সে বালিকাবিবাহ বন্ধ বিষয়ে নিয়ম প্রনয়ণ প্রভৃতি শত জনহিতকর কর্মে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও অনুরাগ দেখা যায়।

ধর্ম্ম ও পুরোহিতদের শিক্ষা

বড়োদার আয় দুই কোটি টাকার উপর ও ১৯২১ সালে ব্যয় হইয়াছিল ১ কোটি ৯১ লক্ষ।

আয় ব্যয়।

হায়দ্রাবাদ

ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ দক্ষিণভারতে অবস্থিত। এই রাজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, য়ুরোপের ইতালীর মত বৃহৎ। আয়তন প্রায় ৮২, ৭০০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাজারের উপর। এই দেশটি ভৌগলিকভাবে দুইটি ভাগে বিভক্ত। জাতিতত্ত্বের দিক হইতেও দুইটি পৃথক্ ধারায় বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম অংশ মারাঠাদের বাস এবং দক্ষিণ-পূর্বদিক তেলেগুজাতির বাস। কিন্তু হায়দ্রাবাদ মুসলমান রাজ্য বলিয়া এখানকার রাজভাষা উর্দু।

ইতিহাস

হায়দ্রাবাদ মুসলমান রাজ্য। আরংজেব তাঁহার সেনাপতি আসফজাকে এখানকার শাসনকর্তা করিয়া দেন; সম্রাটের মৃত্যুর পর ভারতে যে অরাজকতা আরম্ভ হয় তাহারই সুযোগে যেসকল স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় হায়দ্রাবাদ তাহাদের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাশীদের সহিত যখন বিবাদ চলিতেছিল সেই সময়ে নিজাম ইংরাজদের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন; ভীষণ সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও নিজামের রাজভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। বর্তমান নিজামের নাম শ্রীলশ্রীযুক্ত স্যার উসমন আলি খাঁ বাহাদুর ফতে জঙ্গ।

বেরারের ইতিহাস

বেরার হায়দ্রাবাদের অন্তর্ভূক্ত দেশ ছিল; ১৯১২ সালে তাহা ইংরাজদের খাস হইয়া যায়। ইহার ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ। হায়দ্রাবাদের একদল সৈন্যের ভার ইংরাজদের উপর ন্যস্ত ছিল; তাহাদের পোষণ করিবার খরচ বাকি পড়ায় নিজাম ১৮৫৩ ও ১৮৬০ সালে সন্ধি করিয়া বেরারের জিলাগুলির পরিচালনার ভার ইংরাজদের উপর দিলেন। সৈন্যদের খরচ যোগাইয়া যদি কিছু টাকা বাঁচিত তবেই তাহা নিজাম পাইতেন। ইতিমধ্যে দেখা

গেলে যে হায়দ্রাবাদের ঐ সৈন্যবাহিনী রক্ষা করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; এবং বেরারকে পৃথকভাবে শাসন করা হায়দ্রাবাদের পক্ষে ব্যয় সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া বেরার হইতে বাৎসরিক আয়ের কোনো বাঁধাবাঁধি ছিল না; যে-বৎসরে যাহা পাওয়া যাইত তাহা নিজাম-সরকার উপরির মতো পাইতেন। এই সকল প্রশ্ন বিচার করিয়া ১৯০২ সালে বেরারের জিলাগুলি ইংরাজসরকারের হাতে সমর্পণ করা হইল; ঠিক হইল নিজাম বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের কাছ হইতে পাইবেন। কিন্তু কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন বলিয়া বর্তমানে এই রাজস্ব বৃটীশ সরকারকে দিতে হয় না, সেই ঋণই শোধ হইতেছে। ১৯০৬ সালে হায়দ্রাবাদ সৈন্যবাহিনীর পৃথক অস্তিত্ব আর থাকিল না, ভারতীয় সৈন্যের সহিত তাহা মিলিত হইয়া গেল। বেরার তুলার চাসের জন্য বিখ্যাত, সেখানকার আয় নিতান্ত সামান্য নয়; সুতরাং ভারত সরকার ইহাতে লাভবান হইয়াছেন। তবে হায়দ্রাবাদের হাতে থাকিলে এ প্রকার উন্নতি হইত কিনা তাহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্তমানে নিজাম পুনরায় বেরার ফিরাইয়া পাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। লর্ড রেডিং ১৯২৬ সালের প্রথম দিকে এ বিষয়ে চরম কথা বলিয়া গিয়াছেন যে এ বিষয়ের আলোচনা হইবে না এবং বেরার নিজামকে ফেরত দেওয়া হইবে না। বেরারবাসীরা নিজামের অধীন যাইতে অনিচ্ছুক।

শাসন

নিজাম রাজ্যের মধ্যে সর্বময় কর্তা, প্রজার দণ্ড মৃত্যুর কর্তা তিনিই। কিন্তু রাজ্যের ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত; তিনিই নিজামের নামে কাজ চালান। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সহকারী আছেন, তাঁহারা অর্থ-বিভাগ, বিচার, সৈনিক ও ধর্ম-বিভাগের ভার প্রাপ্ত সদস্যরূপে কার্য্য করেন। রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য কৌন্সিলে হয়; দেওয়ান সভাপতি ও অন্যান্য সহকারী

দেওয়ানগণ সভার সদস্য। কৌন্সিলতে গৃহীত প্রস্তাবাদি নিজামের নিকট প্রেরিত হয়। যদিও অধিবাসীর মাত্র শতকরা ১০ জন মুসলমান সরকারী চাকুরীর ৯০ ভাগই মুসলমানদিগকে দেওয়া হয়। নিজামের স্বজাতি প্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সকল কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য ছয়জন সম্পাদক ও তাঁহাদের অপিষ আছে। সমস্ত রাজ্য ১৫টি জেলা ও ৮৮টি তালুকে বিভক্ত।

দেশের আইন প্রনয়ণের জন্য একটি ব্যবস্থাপক আছে। ২৩ জন লোক ইহার সভ্য; ইহার মধ্যে ১২ জন সরকারী ও ১১ জন বেসরকারী সভ্য। নিজামের নিজ টাঁকশালে টাকা পয়সা তৈয়ারী হয়। তথাকার ১১৫ টাকা আমাদের ১০০ টাকার সমান। রাজ্যের নিজ ডাকঘর ও ষ্ট্যাম্প আছে এবং রাজ্যময় তাহাই ব্যবহৃত হয়। রাজ্যে ১৬,২৬৯ জন সৈনিক আছে; ইহার মধ্যে প্রায় চারি হাজার মাত্র রেগুলার।

নিজামের রাজ্য বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিয়া এক্ষণে ভাল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৮ সালের আয় ছিল ৬ কোটি

রাজস্ব

৫ লক্ষ ও ব্যয় ৫, ২০ লক্ষ। রাজস্ব হইতে ২,৯৫ লক্ষ, বেরার হইতে ২৫ লক্ষ, শুল্ক হইতে ৭০ লক্ষ আবগারী হইতে ১ কোটি ২ লক্ষ ও সুদ ৩৫ লক্ষ টাকা আয়।

হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি; কিন্তু কৃষি-বিভাগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; কর্ত্তৃপক্ষ যে সামান্য ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহ মোটেই সন্তোষজনক নহে। রাজ্যের মধ্যে খনি আছে। সিংগারলিতে যে কয়লার খনি আছে তাহা নিতান্ত ছোট নহে। গোলকুণ্ডের হীরার খনি এখন অতীতের কথা; সে-সকল স্থানের খনিতে সামান্যই লাভ হয়।

শিক্ষায় হায়দ্রাবাদ খুব পিছাইয়া আছে। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি প্রথমশ্রেণীর কলেজ হায়দ্রাবাদে ছিল। এতবড় দেশে মাত্র একটি কলেজ ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এখানে প্রাচ্য শিক্ষার জ

যে কলেজ আছে তাহাতে স্থানীয় মৌলভী ও মুন্সীরা পরীক্ষা দেয়। এত বড় রাজ্যে মাত্র ২১টি হাই স্কুল, ৮০টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল, ১০৪১টি পাঠশালা ও ২৩টি বিশেষ বিদ্যালয় আছে। বড়োদার জনসংখ্যা ইহার এক ষষ্ঠাংশ, অথচ সর্বশ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এই তুলনা হইতেই বুঝা যায় যে নিজামের এ দিকে দৃষ্টি কত কম। নিজামের নিজের বার্ষিক আয় প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। প্রাসাদের জন্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য একটি বাড়ীতে শব্দহীন রবারের মেঝে করিতে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। শিল্পোন্নতি, কৃষির উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিতান্ত কম। গত দুই তিন বৎসর হইতে হায়দ্রাবাদে শিক্ষার জন্য চেষ্টা চলিতেছে ও ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার শিক্ষা দিবার ভাষা হইয়াছে উর্দু। বহু বিদ্বান মুসলমান রাখিয়া উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় গ্রন্থাদি উর্দু ভাষায় তর্জমা করাইতেছেন। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কিছু কাজ করিয়াছে।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

মহীশূর

মহীশূরই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুরাজ্য। এখানকার শতকরা ৯২ জন অধিবাসী হিন্দু; অধিবাসীদের ভাষা কানাড়ী। সমগ্র দেশের আয়তন ২৯,৪৭৫ বর্গ মাইল, এবং জনসংখ্যা ১৯২১ সালে ৫৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ছিল। রাজ্যে ১০৫টি সহর ও ১৬,৫৬টি গ্রাম আছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু শাসন ছিল। বিজয়নগরের সম্রাটের সামন্ত নরপতি হইয়া মহীশূর বহুকাল ছিল; তারপর ১৫৬৫ সালে বিজয়নগরের ধ্বংস হইলে মহীশূর আপনার স্বাধীনতা

ঘোষণা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হায়দার আলি ও তাঁহার পুত্র তিপু সুলতান মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন সে-কথা ইতিহাসে সকলেই পাঠ করিয়াছেন। ১৭৯৯ সালে সেরিঙ্গপত্তনের পতনের সময়ে তিপুর মৃত্যু হইল; ইংরাজ হিন্দু রাজপরিবারের হাতে রাজশাসন ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল, রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; তখন বৃটীশরাজ বাধ্য হইয়া মহীশূরের শাসন ভার নিজ-হস্তে লইলেন (১৮৩১)। ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর মহীশূর ইংরাজদের খাস শাসনে ছিল। লোকে প্রায় ভুলিয়া গেল যে মহীশূর বলিয়া কোনো স্বাধীনরাজ্য ছিল। ১৮৮১ সালে মহীশূর সিংহাসনে পুনরায় প্রাচীন হিন্দু রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরাজ সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

মহীশূরের রাজধানী মহীশূর, তবে বাঙ্গলোরই রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র। মহারাজাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা; কিন্তু শাসন কার্য্যের তত্ত্বাবধান দেওয়ান ও তিনজন সভ্যের উপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রীয় বিচারের মীমাংসের ভার মহারাজ নিজের হাতে না রাখিয়া তিনজন জজের উপর তাহার শেষ নিষ্পত্তিভার সমর্পণ করিয়াছেন।

বৎসরে দুইবার করিয়া একটি প্রতিনিধি সভা মহীশূরে মিলিত হয়।

প্রতিনিধি সভা।

সর্ব শ্রেণীর লোকের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য এই প্রতিনিধি সভা আহূত হইয়া থাকে। আশ্বিনমাসের প্রতিনিধি সভায় দেওয়ান পূর্ব বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাবনিকাশ দাখিল করেন এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য শাসনপ্রণালীর মধ্যে কি কি পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করেন; দেশের লোকের অভিযোগ, আবেদন শোনা হয় এবং তা লইয়া আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলে। বৈশাখের সভায় আগামী বৎসরের ভাবী আয়ব্যয়ের খশড়া হিসাব বা বাজেট প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থিত করা হয়। লোকে

এখানে তাহাদের মতামত প্রকাশ করে। আশ্বিনের সভায় সময়াভাবে যেসকল বিষয়ের আলোচনা হয় নাই সেগুলি নূতন প্রস্তাব সমূহের সহিত ভাল করিয়া আলোচিত হয়। এছাড়া আর একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ২৫। ইহার মধ্যে ১২ জন সরকারী ও ১৩ জন বে-সরকারী সভ্য (৮ জন নির্বাচিত, ৫ জন মনোনীত)। আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় যেমন প্রশ্ন করিতে পারা যায় এখানকার সভাতেও সভ্যগণ রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়, রাজ-নীতি প্রভৃতি বিষয় প্রশ্ন করিতে পারেন। এই অধিকার পাওয়াতে প্রজাদের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। রাষ্ট্র পরিচালনের সুবিধার জন্য বিবিধ বিভাগে কাজগুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভা।

মহীশূর রাজ্য ৮টী জিলা বা ৬৮টি তালুকে বিভক্ত। প্রত্যেক জিলা এক একজন ডেপুটি-কমিশনার বা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন এবং প্রত্যেক তালুক একজন আমিলদার বা ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। সরকারী ৩৬৮০ জন সৈনিক আছে।

মহীশূর রাজ বৃটীশরাজকে বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা নগদ রাজকর রূপে দিয়া থাকেন। ১৯২৩-২৪ সালে মহীশূরের আয় ৩,৩১ লক্ষ ও ব্যয় ৩,২৯ লক্ষ টাকা।

মহীশূর সরকার দেশের আর্থিক উন্নতি করিবার জন্য খুবই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১১ সালে দেশের যথার্থ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মহারাজ এক নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহাতে দেশের জ্ঞানী, গুণী, বণিক, মহাজন, শিল্পী, সরকারের কর্মচারীগণ মিলিত হন এবং দেশের শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মহারাজের [illegible] উৎসবের সময়ে এই সভা বৎসরে একবার করিয়া মহীশূরে মিলিত হয়। দেওয়ান বাহাদুর এই সভার স্থায়ী সভাপতি। তিনটি

মহীশূর অর্থনৈতিক কনফারেন্স।

শাখায় এই সভার কার্য্য বিভক্ত যথা :—কৃষি, শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্য। প্রতি জিলায় উপর্যুক্ত বিষয়গুলির উন্নতি সাধনের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে। ঐ সকল বিষয়ে কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রতি তালুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি আছে। এই কনফারেন্সের পৃষ্ঠপোষকতায় একখানি মাসিক ইংরাজী কাগজ বাহির হয় (Mysore Economic Journal) এবং কানাড়ী ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়।

উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃষি বিভাগ।

মহীশূরের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক কৃষি করে। ধান, জোয়ার, ছোলা, আখ, তুলা, শন এখানকার প্রধান কৃষিজাত সামগ্রী। মহীশূরের রেশম বিখ্যাত। এখানে প্রায় ২৮ হাজার একার জমিতে রেশমের জন্য তুঁত গাছের চাষ হয়। কৃষি-বিভাগ মোটেই অলসভাবে দিন কাটান না। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। হেবাল নামক স্থানে সকল প্রকার রবি শস্যের উন্নতির জন্য একটা খুব বড় ফার্ম আছে, তাহা ছাড়া অল্পবৃষ্টিতে যে সকল শস্য ও গাছপালা বাড়িতে পারে সেই শ্রেণীর উদ্ভিদ ও তুলার উন্নতির জন্য বিশেষ একটি ফার্ম আছে। অধিক বৃষ্টিতে কি কি গাছ ভাল হইতে পারে, আখের চাষের উন্নতি কেমন করিয়া হইতে পারে, এজন্য দুইটি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলিতেছে।

শিল্প ও বাণিজ্য।

১৯১৩ সালে মহীশূর সরকার শিল্প ও বাণিজ্যের একটি বিশেষ বিভাগ খোলেন। এই বিভাগের উদ্দেশ্য যে যাহারা শিল্প বিষয়ে কিছু জানিতে চায় তাহাদের সাহায্য করা। কোথায় কোন্ জিনিষ পাওয়া যায়, কেমন করিয়া পাওয়া যায়, কি দরে পাইলে সুবিধা হয়, ইত্যাদি সকল প্রকারের প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা দিয়া থাকেন। কলকব্জা, যন্ত্রাদি কিনিতে যারা অক্ষম তাহাদিগকে টাকা ধার

দিবার জন্য একটি শাখা আছে। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শিল্পে ও বাণিজ্যে মহীশূর এখন সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে ৪টি কাপড়ের কল, ৩টি পশমের কল, তুলা পিঁজা কল (১৫টি), তুলা-প্রেস (৩টি), রেশমের কল (৩টি) আছে। সর্বসমেত ৯২টি কলে ১৫ হাজার লোক খাটে। তাহা ছাড়া সাধারণ সভ্য-মানুষের যাহা প্রয়োজন হয় তাহার অধিকাংশই এখন মহীশূরে তৈয়ার হইতেছে। কিছুকালে পূর্বে চন্দন তৈলের একটি কারখানা স্থাপিত হয়, এখন সেই কারবারটি খুবই ভাল চলিতেছে। বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারী উপাদান প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কোম্পানী সরকারের নিকট হইতে অনুমতি পাইয়াছে। কাঠ চোলাই, লোহার কাজও প্রভৃতি করিবার জন্য সরকার ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এক কারখানা খোলা হইয়াছে। বোতামের কারখানা খোলা হইয়াছে এবং সাবানের কারখানা যাহাতে ভালো করিয়া চালানো হয় তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুকুমার শিল্পগুলির উন্নতিসাধনের জন্য একটি ডিপো খোলা হইয়াছে। কুটীর-শিল্প ভারতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য বাঙ্গালোরে বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। মহীশূরে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক একটি যাদুঘর আছে; এছাড়া জিলার প্রধান সহরগুলিতে যাদুঘর করিবার জন্য অর্থ ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ও সমবায়।

১৯১৩ সালে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়; প্রধান প্রধান প্রায় সকল স্থানেই ইহার কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এ ছাড়া ছয়টি জিলা-ব্যাঙ্ক, ৯টি ফেডারেল ব্যাঙ্কিং, ১৫২২ সমবায় সমিতি আছে। এই সকল ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি হওয়ায় দেশের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, পরস্পরের সহিত যোগরক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৩ সালে ১০৮টি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী ছিল।

এই সকল বাহিরের জিনিষের সহিত মানুষকে যথার্থভাবে বড় করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা; সেই শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯১৬ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে বাঙ্গালোরের 'সেণ্ট্রাল কলেজ' ও মহীশূরের 'মহারাজ কলেজ' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হইয়াছে। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার জন্য ২টি বিশেষ কলেজ আছে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে মহীশূর সরকারের দৃষ্টি আছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রায় দেশব্যাপী হইয়া দাঁড়াইবে। কৃষি বাণিজ্য ইঞ্জিনীয়ারিং এবং অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বয়স্ক লোকেদের শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাবিভাগ করিতেছেন। ১৯২০।২১ সালে ৯৬৯৮টি সরকারী ও ৭৮২ টি বে-সরকারী বিদ্যালয় ছিল। প্রায় প্রত্যেক ২$\frac{1}{4}$ বর্গ মাইলে ৫৪৩ জন লোকের জন্য একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। মহীশূর শিক্ষাবিভাগের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচার। বহু মহামূল্যবান্ পুস্তক রাজ-অর্থে প্রতিবৎসর মুদ্রিত হইতেছে। তাঁহাদের সংগৃহীত পুঁথির যে তালিকা ছাপা হইয়াছে তাহা সংস্কৃত পণ্ডিতদের খুবই উপকার সাধন করিয়াছে। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ইহারা প্রকাশিত করিয়াছেন।

শিক্ষা বিস্তার

কাশ্মীর।

দেশীয় লোকের কাছে কাশ্মীর জম্মু নামে পরিচিত। পঞ্জাবের সংলগ্ন দেশ ছাড়া সমগ্র কাশ্মীর পার্বত্য। থাকে থাকে পর্বত উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে উপত্যকায় মানুষের বাস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় বাস করিয়া নানা জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক আচার ব্যবহার, রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কাশ্মীরি, পঞ্জাবী, ও ডোগরা এ প্রদেশের প্রধান ভাষা; এ ছাড়া উপভাষা অনেক আছে। প্রদেশে ৩৭টি সহর, ৮৯১৫টি গ্রাম আছে। ১৯২১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৩ লক্ষ ২০ হাজার; ইহার মধ্যে

জাতিভাগ ও সামাজিক অবস্থা

অধিকাংশ মুসলমান; কাশ্মীর বিভাগে দশ হাজার লোকের মধ্যে ৫২৪ জন মাত্র হিন্দু, লদাক ও গিলগিটে দশ হাজারে, ১০ জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট প্রায় সবই মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজপুত ক্ষত্রিয় ও ঠক্কার প্রধান জাতি; প্রত্যেক জাতিই আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-জাতিতে বিভক্ত। ডোগরা রাজপুত যুদ্ধবিদ্যায় ও সাহসিকতায় খুবই বিখ্যাত; জাতিভেদ, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহারা অত্যন্ত কড়া। কাশ্মীরের হিন্দুগণকে পণ্ডিত বলে। অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত যে বিদ্বেষ ভাব আজকাল দেখা যায় কাশ্মীরে এই উগ্রতা নাই। সেখানকার মুসলমানেরা উৎকটরূপে মুসলমান নহে, হিন্দু ও যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু নয়; সেইজন্য বিরোধ কম। কাশ্মীরি হিন্দুদের সহিত ভারতের অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের বিবাহাদি সাধারণত হয় না। পঞ্জাবের বিখ্যাত কবি ইকবাল, ও মুসলমান নেতা কিচলুর পূর্বপুরুষেরা কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কাশ্মীরের উপত্যকায় কৃষিই লোকের প্রধান উপজীবিকা। ধান

গম ভুট্টা তামাকু জাফরণ যব আফিম তুলা প্রভৃতি নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। রাজ্যের বন বিভাগ খুবই বিস্তৃত, এখানে বহুমূল্য বৃক্ষ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে শাল যে কেবল ভারতেই বিখ্যাত তা নয়, য়ুরোপে ও আমেরিকার সর্বত্র এই সামগ্রীর আদর দেখা যায়। এ ছাড়া কাশ্মীরের শিল্পের কাজও বর্তমানে খুবই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রধান শিল্পের কারখানা ১৯১২ সালে আগুনে পুড়িয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

উপজীবিকা

কাশ্মীরকে ভারতের নন্দন কানন বলা হয়; কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিরকাল রসজ্ঞ লোকদিগকে টানিয়াছে। মুঘল সম্রাট্‌গণ সেখানে বহুবার গিয়াছেন; শ্রীনগরের হ্রদের তীরে সাহজাহান মর্ম্মর প্রস্তরের গৃহ, চত্বরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে কত পরিব্রাজক কেবলমাত্র কাশ্মীর দেখিবার জন্যই আসিয়া থাকেন। কিন্তু এখানকার পথ ঘাট মোটেই এদেশের মত নয়। সমতলের উপর মাত্র ১২ মাইল রেল আছে, আর ৮৪ হাজার বর্গ মাইল পরিমাণের প্রকাণ্ড রাজ্যে আর রেল নাই। বিতস্তাই একমাত্র নৌতার্য্য নদী; শ্রীনগরে বহু লোক নৌকাতেই বাস করে। মারী (Muree) পর্য্যন্ত রেল আছে, তাহার পর মোটর বা এক্কা করিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়; কিন্তু ইহার পর আর ভিতরে প্রবেশ করা সহজ সাধ্য নয়। বহুকাল হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিবার কথা চলিতেছে; মাঝে মাঝে শোনা যায় জাম্মু হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত দড়ির সাহায্যে গাড়ী চালাইবার পথ হইবে।

ভ্রমণ ও পথ

কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী' পণ্ডিত কহ্লনের লিখিত। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। বাংলা ভাষায় এই

গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, সুতরাং পাঠকগণ কাশ্মীরের ইতিহাস কিয়ৎ-পরিমাণ ইহা হইতে জানিতে পারেন। মুসলমানদের মধ্যে আকবরই প্রথম এই দেশ জয় করেন; কিন্তু ইতঃপূর্ব বহুবার পাঠান ও অন্যান্য মুসলমান রাজারা এদেশ আক্রমণ করিয়া এখানকার অনেক প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন। সিকান্দর সাহের সময়ে কাশ্মীরের অধিকাংশই এক প্রকার মুসলমান হইয়া যায়। আকবরের উদারনীতির ফলে এই উপত্যকার ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়; তিনি স্বয়ং তিনবার কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু আরঙজেবের পর ভারত-ব্যাপী যে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয় কাশ্মীরও উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের সহিত দিল্লীর বাদসাহের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার পর ১৮১৯ সাল পর্য্যন্ত আফগনদের উৎপাতে ও পীড়নে কাশ্মীরের লোকেরা জর্জরিত হইতে থাকে। শিখরাজা রণজিৎ সিংহ ঐ বৎসরে কাশ্মীর জয় করেন। গোলাব সিং নামক একজন ডোগ্‌রা রাজপুত জম্মুর রাজা ছিলেন; শিখদের তিনি নানা সময়ে সাহায্য করেন এবং কিছু কিছু জয় করিয়া তাঁহার রাজ্য ও শক্তি দুইই বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু রণজিতের মৃত্যুর পর ইংরাজ ও শিখদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে তিনি কোনো পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। ১৮৪৬ সালের সোবরাঁওএর যুদ্ধের পর তিনি মধ্যস্থ থাকিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। এই জন্য ইংরাজ তাঁহার কাছ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা লইয়া বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্য দিয়া দেন। এই রাজ্যরক্ষা করিতে তাঁহাকে সামান্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে কাশ্মীরের খুবই বিশেষত্ব আছে। তিব্বত, আফগানিস্থান, চীন, তাতার ও রুশিয়া রাজ্যের সীমানা দূরে নয়। এই সকল কারণের জন্য ইংরাজ রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট সীমান্তে পর্য্যন্ত আছেন। বর্ত্তমান মহারাজ

কাশ্মীরের ইতিহাস

শ্রীহরি সিং ১৯২৫ সালে রাজ্য পাইয়াছেন। কুসঙ্গে পড়িয়া তিনি য়ুরোপে সর্বনাশের পথে গিয়াছিলেন ; সে-কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রাজকার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য কাশ্মীর চারিটি বিভাগে বিভক্ত। কিন্তু যথার্থ শাসক হইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মচারী তহশিলদাররা ; পূর্বেই বলিয়াছি কাশ্মীরের পথঘাট দুর্গম ; কাজেকাজেই শ্রীনগরে বসিয়া সমগ্র দেশের শাসন-শৃঙ্খল চালনা করা খুবই কঠিন। ফলে দূরের গ্রামে বিচার ভাল না হইলে প্রতীকারের আশা কমই থাকে। কাশ্মীররাজের প্রায় সাত হাজার সৈন্য আছে, তন্মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভারতীয় সার্বিস ট্রুপের অন্তর্গত।

শাসন ব্যবস্থা

কাশ্মীরের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ; ৬৬ লক্ষ টাকা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কাছেই গচ্ছিত আছে। রাজ্যের এত অর্থ অথচ দেশের উন্নতির জন্য সামান্যই ব্যয়িত হয়। শিক্ষা বিষয়ে কাশ্মীর সবচেয়ে পিছাইয়া আছে ; এবং ১০০ জন লোকের মধ্যে ২ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে। ১৮৯১ সালে ৪৫টি বিদ্যালয় ছিল ; ২০ বৎসর পরে ১৯১১ সালে ৩০৯টি হইয়াছিল ; ১৯২১ সালে বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা ৭১৬ ছিল।

শিক্ষার অভাব

ভারতীয় করদ রাজ্যের কর।

জয়পুর	২৬,৬৬৭	পাউণ্ড
কোটা	১৫,৬৩৪	,,
উদয়পুর	১৩,৩৩৩	,,
যোধপুর	৬,৫৩৩	,,
বুঁদি	৮,০০০	,,
অন্যান্য দেশ	১৫,১৭০	,,
মধ্যপ্রদেশ		
বিভিন্ন রাজ্য	১৫,৫২৪	,,
বর্মা		
শান ষ্টেটস্	২৮,৫২৪	,,
অন্যান্য	১,৩৬৭	,,
আসাম		
মণিপুর	৩৩৩	,,
রামব্রই	৭	,,
বঙ্গদেশ		
কুচবিহার	৪,৫১৪	,,
যুক্ত প্রদেশ		
কাশী	১৪,৬০০	,,
কপুরতলা	৮,৭৩৩	,,

সৈন্য রাখিবার জন্য যোধপুরের সাহায্য	পাউ ৭,৬৬৭
কোটার সাহায্য	১৩,৩৩৩
ভোপাল "	১০,৭৫৩
জাওরা "	২,২৮০
পঞ্জাব	
মন্দী	৬,৬৬৭
অন্যান্য	৩,০৮৩
মান্দ্রাজ	
ত্রিবঙ্কুর	৫৩,৩৩৩
মহীশূরের পেশকশ	২৩৩,৩৩৩
কোচীন	১৩,৩৩৩
ত্রিবঙ্কুরের	৮৮৮
বোম্বাই	
কাথিয়ার	৩১,১২৯
ছোট ছোট রাজ্য	২,৮২৫
বড়োদা	২৫,০০০
মহারাষ্ট্র দেশের জাগীরদার	৫,৭৬৫
কচ্ছদেশ	৫,৪৮৪

ভারত সরকারের মোট আয় ৮৬,৭৭,৩০৫ টাকা (১৯২৫ সাল

ষষ্ঠ ভাগ

১। জমিবন্দবস্ত

ভূমির অধিকারীকে এ লইয়া বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। একদল লোক বলেন রাজাই ভূমির মালিক, যেহেতু তাঁহার নাম ভূপতি ভূস্বামী ইত্যাদি। তাঁহাদের মতে রাজাই সর্বপ্রধান জমিদার, প্রজারা তাঁহারই জমিতে চাষ বাস করে এবং রাজস্ব বা জমির ভাড়া দেয়। আবার আর একদল বলেন জমিতে প্রজার সত্বই প্রধান, তবে দেশরক্ষা ও রাজকার্য্যাদি চালাইবার জন্য প্রজার আয়ের কিয়দংশ সরকারকে দেওয়া তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ। কিন্তু তাহা বলিয়া রাজা সমস্ত জমির মালিক হইতে পারেন না।

জমির মালিক কে ?

প্রাচীন হিন্দু সমাজে জমিজমা ও শাসনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম; গ্রামের কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর এ শাসনের ভার অর্পিত ছিল না, সমগ্র গ্রাম গ্রামের শাসন ও রাজস্বের জন্য দায়ী। অধিপতি, নিকাশ-নবীষ, চৌকিদার, পুরোহিত, গুরুমহাশয়, গণক বা পাঠক, কর্মকার, সূত্রধর, রজক, নরসুন্দর, গোরক্ষক, চিকিৎসক গায়ক প্রভৃতির উপর গ্রামের এই ভার অর্পিত ছিল। যোগ্যতা থাকিলে মণ্ডল বা মাতব্বরের পুত্র সে-কার্য্য পাইত। রাজপ্রতিনিধির হাতে মণ্ডলই গ্রামের খাজনা অর্পণ করিত। জমিদার শব্দটি পার্সী; মুসলমানদের পর্বে এ শ্রেণীর লোক ছিল না।

হিন্দুযুগে

মুসলমান শাস্ত্রানুসারে শাসনকর্তাই ভূমির একমাত্র সত্বাধিকারী।

মুসলমান আমলে জমি বন্দবস্ত

ভারতবর্ষের যে যে স্থানে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই প্রদেশের ভূমির উপর বাদশাহের সত্ব স্থাপিত হইল। কৃষকগণের নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় হইত তৎসমস্তই রাজস্ব, সমস্তই রাজকোষে প্রেরিত হইত। রাজা ভিন্ন অপর কেহ তাহার অংশীদার ছিল না।

রাজস্ব আদায় করিবার জন্য বহুবিধ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল; যেমন আমিল, জমিদার, তালুকদার, ইত্যাদি। জমিদারগণ কেবলমাত্র রায়তদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া সুবাদারের হাতে সমর্পণ করিতেন; সুবাদার তাহা পুনরায় রাজধানীতে পাঠাইতেন। মুসলমান শাসনের ভাল সময়ে এই পরগণাদারী বন্দবস্ত বেশ চলিয়া ছিল। নিজ নিজ জমিদারীর প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ জমিদারগণ মীমাংসা করিয়া দিতেন। সুতরাং প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারীর তত্বাবধান ও রাজস্ব সংগ্রহের ভার জমিদারের উপর ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু ভূমিতে তাঁহাদের কোনো সত্বাধিকার ছিল না। মুসলমানদিগের প্রবল আধিপত্যকালে বাদশাহ ও প্রজার মধ্যে কোনো মধ্যসত্বাধিকারী জাগিয়া উঠে নাই; কিন্তু রাজক্ষমতার ক্রমিক হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন ও এইরূপে প্রাচীন হিন্দু যুগের ন্যায় পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজের উদয় হয়। সেই হইতে আধুনিক জমিদার শ্রেণীর অভ্যুদয়। হিন্দুগণের প্রায় সমস্ত পদই বংশানুগত হইত বলিয়া এই জমিদার পদ্ধতিও কালক্রমে বংশানুগত হইয়া উঠিল।

মুসলমান আমলে মহামতি আকবরের সময়ে তাঁহার বিচক্ষণ হিন্দু-মন্ত্রী তোডরমল্লের চেষ্টায় রাজস্বের ও জমি বিলির সুবন্দবস্ত হয়। ভূমি পরিমাপ করিবার জন্য "এলাকা গজ" নামে এক মানদণ্ড প্রচলিত করেন ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী উহা পুনি, পরবর্তী, 'চেঞ্চর

ও বন্দর এই চারিশ্রেণীতে ভাগ করেন। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশ ১৮টি সরকার ও ৬৮২টি মহলে বিভক্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশকে বেশীকাল অধীন রাখা মুঘলদের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। মুঘল রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এবং এখনকার নদীর গতি ও মতি চিরদিন সমান থাকে না বলিয়া এখানে একদল লোক সপ্তদশ শতাব্দীতে খুব পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন; বাংলাদেশের ভুঁইয়ারা ইতিহাসে বিখ্যাত। মুঘলদের সুখশান্তি ভাঙ্গিতে পশ্চিমে ছিল মরুভূমিবাসী রাজপুত, পূর্বে ছিল জলাভূমিবাসী বাঙালী, আর দক্ষিণে ছিল পাহাড়চর মারাঠা।

ইংরাজেরা ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশের নবাবকে পলাশীর যুদ্ধে হারাইয়া দিলেন। তারপর ১৭৬৫ সালে দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে তাঁহারা এদেশের দেওয়ানী পাইলেন। বাংলাদেশের জমিদারগণের উপর যথা সময়ে খাজনা দেওয়ার ভারমাত্র ন্যস্ত ছিল; জমিতে তাঁহাদের স্থায়ী স্বত্ব ছিল না। কিন্তু এসত্ত্বেও অনেকগুলি বনিয়াদী পরিবার নানা জায়গার জমিদার হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দেওয়ানী পাইয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলেন না যে ভারতে কিরূপ ভূমি বন্দবস্ত করিলে সব দিক বজায় থাকে। হেষ্টিংসের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা সে-যুগে ও পরযুগে খুবই নিন্দিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। তিনি জমিদারী নিলামে চড়াইতেন এবং যে অধিক টাকা খাজনা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইত তাহাকেই জমিদারী দিয়া দিতেন। নূতন মালিক জানিত আগামীবারে তাহার জমিদারী নিলামে চড়িতে পারে অতএব এই কয়দিনের মধ্যে যাহা করিয়া লওয়া যায় তাহাই লাভ। প্রজার সঙ্গে তাহার হৃদয়ের কোনো

কোম্পানী আমলে জমি বন্দবস্ত

যোগ ছিল না। হেষ্টিংসের আদায় উশুল নিয়মকানুনের কড়াকড়ির ফলে অনেক বড় বড় পরিবার নষ্ট হয় প্রজারাও সর্বস্বান্ত হয়। অবশেষে ৭৬ এ মন্বন্তরে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর হইয়া আসিয়া লিখিলেন হিন্দুস্থানের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে ও হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান হইয়াছে।

ইংরাজেরা রাজস্ব আদায়ের সুনিয়ম করিবার জন্য প্রথমত প্রত্যেক পরগণায় কোন মৌজায় বা গ্রামে কত খাজনা আদায় হয়, অর্থাৎ প্রজার নিকট হইতে পাওয়া যায়, তাহার পাঁচবৎসরের একটা হিসাব প্রস্তুত করান। এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া ১৭৯০ ১লা ডিসেম্বর তারিখে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাংলাদেশের ভূস্বামী-দিগের সহিত দশশালা বন্দবস্ত করিলেন। ১৭৯৩ সাল ২২শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশে ঘোষণা করা হয় যে নূতন বন্দবস্তে যে রাজস্ব ধার্য্য করা হইল তাহা কখনও বৰ্দ্ধিত বা পরিবর্দ্ধিত হইবে না; জমিদার মহলের স্বত্বাধিকারী, সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারীগণ পাইবে; জমিদার দান বিক্রয় উইল প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় জমিদারী হস্তান্তর করিতে পারিবেন; জমিদার জমিদারীর যতই উন্নতি করুন না কেন সরকার সেজন্য কোনো অতিরিক্ত খাজনা চাহিবেন না।

চিরস্থায়ী জমি বন্দবস্ত

গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে রাজস্ব বাকী পড়িলে জমিদারী বিক্রয় করিয়া তাহা তুলিয়া লওয়া হইবে; নূতন ক্রেতা পূর্বের ধার্য্য রাজস্বই দিতে থাকিবেন। জমিদার যদি তাঁহার অধীনে কোনো মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাহা দশবৎসরের অধিককালের জন্য স্থায়ী হইবে না। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের সহিত জমিদারদের সম্বন্ধ স্থির ও পাকা হইল বটে, কিন্তু মধ্যস্বত্বের জন্য বা কৃষকদের স্থায়ী-বন্দবস্ত সম্বন্ধে কোনোই

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ব্যবস্থা

সুব্যবস্থা তখন হয় নাই। ১৮১৯ সালের আইনানুযায়ী জমিদারেরা তাঁহাদের অধীনে যেকোনো স্থায়ীস্বত্ব সৃষ্টি করিতে পারিবেন ঠিক হয়; এবং যথা সময়ে খাজনা জমিদারীর কাছারীতে না পাঠাইতে পারিলে পত্তনীদারদের পত্তনী বিক্রয় হইয়া যাইবে।

বাংলার জমিদার ও কৃষকের মধ্যে অনেক মধ্যস্বত্ব আছে। এক জমিতে জমিদার এবং প্রজার মধ্যে বহুপ্রকার স্বত্বাধিকার থাকিতে পারে যথা,—

(ক)	জমিদারের সরকারকে দেয় রাজস্ব		৪০০০৲
(খ)	পত্তনীদার	জমীদারকে দেয় খাজনা	৫০০০৲
(গ)	দরপত্তনীদার		৬০০০৲
(ঘ)	সে-পত্তনীদার	„	৭০০০৲
(ঙ)	জোতদার বা গাঁতিদার	„	৮০০০৲
(চ)	কৃষক প্রজা	„	১২০০০৲

১৭৯৩ সাল হইতে ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত জমিদার, মধ্যস্বত্ব ও কৃষকদের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক অনেক আইন জারী হয়। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনই সবচেয়ে বিখ্যাত। গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য বৎসরে চারিটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ২৮শে জুন বা তৎপূর্ব্বে, ২৮শে সেপ্টেম্বর বা তৎপূর্বে ১২ই জানুয়ারী বা তৎপূর্বে এবং ২৮শে মার্চ বা তৎপূর্বে। সকল জমিদারকে নির্দ্দিষ্ট তারিখে খাজনা কলেক্টরীতে পাঠাইতে হয়, যথাসময়ে না দিতে পারিলে জমিদারী লাঠে ওঠে অর্থাৎ নিলামে চড়ে। শেষদিনের পরেও জরিমানা দিয়া রাজস্ব দেওয়া যায় তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে কলেক্টর সাহেবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রাজস্ব আদায়ের এই আইনকে সূর্য্যাস্ত আইন (Sunset Law) বলে; অর্থাৎ নিরূপিত দিনের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত টাকা খাজাঞ্চী খানায় গৃহীত হয়।

খাজনার নিয়ম

মধ্যস্বত্ব প্রজাস্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য বহু আইন প্রণীত হইয়াছে।

মধ্যস্বত্ব

প্রথম ১৮৫৯ সালের ১১ আইন হয়; তার পর ঐ আইন পরিবর্তিত হইয়া দশ বৎসর পরে ১৮৬৯ সালের ৮ আইন বা বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট বা প্রজার ভূম্যধিকার সম্বন্ধীয় আইন পাশ হয়; ইহা পরিবর্তিত হইয়া ১৮৮৫ সালের ৮ আইন হয়। এই আইনের ফলে প্রজাদের অনেক দুঃখ লাঘব হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জমিদারদের খামখেয়াল এখনো দূর হয় নাই। কিছুকাল হইতে কাগজ পত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। নানাস্থানে রায়ত সভার অধিবেশন হইয়াছে এবং জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দবস্ত উঠাইয়া প্রজাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বন্দবস্ত করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের যথেষ্ট অভিযোগ আছে; খাজনা ছাড়া ২০।২৫ প্রকারের বে-আইনী কর কোনো কোনো জমিদার গ্রহণ করেন বলিয়া প্রকাশ। প্রজা ও ভূস্বামীর মধ্যে যাহাতে কোনো প্রকারের বিরোধ না ঘটে সেইজন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা। এই জন্যই জেলায় জেলায় সরকার সেটলমেণ্ট বা ভূমির জরিপ বন্দবস্ত করিয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক প্রজার জমির বর্ণনা, চৌহদ্দী, স্বত্ব, খাজনা প্রভৃতি বিষয় নির্দ্ধারিত থাকে।

চিরস্থায়ী বন্দবস্তে বাংলাদেশে ৯১,৮৯৫টি জমিদারী আছে এবং সরকারী আয় বার্ষিক ২,১৫,৩৮,৩৩৮, টাকা।

বাংলাদেশের পর ১৮০১ সালে মান্দ্রাজ ইংরাজদের শাসনাধীনে আসে। এখানকার ভূমিব্যবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে জটিল ভাবে ইংরাজদের সমক্ষে প্রকাশিত হইল। এখানে প্রাচীন সময়ের তিন শ্রেণীর বন্দবস্ত ছিল।

মান্দ্রাজের জমি বন্দবস্ত

(১) উত্তর-সরকারে জমিদারগণ, দক্ষিণ দেশীয় পলিগারগণ ও মহারাষ্ট্রী দেশে ছোট ছোট রাজারা ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন।

(২) কর্ণাট-প্রদেশের মিরাশ-গ্রাম আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শে গঠিত। এক একটি গ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ-তন্ত্রের ন্যায় নিজ শাসন সংরক্ষণ আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা সবই ভিতর হইতে করিত।

(৩) যে-সব স্থানে পলিগারগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা মিরাশি গ্রাম্য-তন্ত্র উদ্ভূত হয় নাই, সেখানেই প্রজারা একেবারে খোদ্ সরকারের কাছ হইতে জমি জমা ব্যবস্থা করিয়া লইত।

বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর মত ভূস্বামীদিগকে মাদ্রাজে পলিগার বলিত। তাহারা বহু শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্যের অব্যবস্থা ও অত্যাচারের মধ্যে প্রজাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। কর্ণাটের নবাব ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে ইহাদের ধ্বংস সাধন করেন। বিলাত হইতে পরিচালকগণ মাদ্রাজের শাসনকর্তাকে লিখিলেন, "ইহাদের যেন ধ্বংস করা হয় না; তাহাদের এই নিদারুণ অবস্থা মনুষ্যত্বের দিক হইতে বড়ই নিন্দনীয় হইবে।" কিন্তু কর্ণাট-নবাব সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইংরাজ তখনো রাজা হয় নাই। অবশেষে পরিচালকগণ পুনরায় লিখিলেন শিল্পীগণকে ও বিশেষভাবে তন্তুবায়দিগকে যেন আশ্রয় দেওয়া হয়; পলিগারগণ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহাদের অভাবে শিল্প যেন ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। নবাবের মৃত্যুর পর ১৮৩১ সালে মাদ্রাজ ইংরাজদের হাতে আসিল।

মাদ্রাজের পলিগার

এইবার এখানকার ভূমি-বন্দবস্তের কথা উঠিল। ইতিপূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিবার সময়ে মাদ্রাজের উত্তর-সরকারের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়কার গভর্ণর স্যর টমাস্ মন্‌রো বিচক্ষণ কর্মবীর ছিলেন; তাঁহারই প্ররোচনায় ও জিদে মাদ্রাজের প্রজাদের সহিত সরকারের খাস সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহাকে রায়তারী বন্দবস্ত বলে। তিনি প্রজাদের সহিত চি-

ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন এবং রাজস্ব যাহাতে একেবারের মতো পাকাপাকি হইয়া যায় তাহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 'পরে যতবার নূতন নূতন সেটলমেণ্ট বা বন্দবস্ত হইয়াছে প্রজাদের খাজনা ততবারই বাড়িয়াছে।

বোম্বাইএর জমি বন্দবস্ত

১৮১৭ সালে পেশোয়াদের পতনের পর বোম্বাই প্রদেশ ইংরাজদের করায়ত্ব হয়। মহারাষ্ট্রদের সময়ে বোম্বাইতে অতি সুন্দর ভূমি-ব্যবস্থা ছিল; মান্দ্রাজ বা অপর সকল স্থান হইতেই এখানকার গ্রাম্য শাসনতন্ত্র অনেক গুণে ভাল ছিল। এখানকার প্রথম গভর্ণর বিখ্যাত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব মারাঠা দেশমুখ ও গ্রামপঞ্চায়েৎদিগকে পূর্বের ন্যায় রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এসব উঠাইয়া রায়তারী বন্দবস্তের তিনি বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহার শাসনকালে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে এখানেও অস্থায়ী রায়তারী বন্দবস্ত প্রবর্তিত হইল। ১৮৩৬ সালে প্রথম সেটেলমেণ্ট হয় তাহার পর ৩০ বৎসর অন্তর অন্তর ১৮৬৬, ১৮৯৬ সালে ভূমি ব্যবস্থা নূতন করিয়া হইয়াছে এবং প্রতি-বৎসরই পূর্বতন ব্যবস্থা হইতে খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থান বা উত্তর ভারতবর্ষ নানা সময়ে ইংরাজদের হাতে আসিয়াছে। ১৮০১ সাল আগ্‌রা হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত দিল্লী পঞ্জাব ও অযোধ্যা ইংরাজ রাজত্বভুক্ত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ যখন

উত্তর ভারতের ভূমি ব্যবস্থা

ইংরাজেরা অধিকার করেন তখন সেদেশে বড় বড় তালুকদার সর্বত্রই ছিল। গ্রাম্য-শাসনতন্ত্র তখনও বেশ একপ্রকার চলিতেছিল। এখন চিরস্থায়ী বন্দবস্তের কথা প্রথমে উত্থাপিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে কাশীতে বাংলার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয়। লর্ড বেণ্টিকের সময়ে ১৮৩৩ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূমি বন্দবস্ত হয় এবং ১৮৪৯ সালে

পুনরায় ব্যবস্থা হয়। লর্ড ক্যানিং এদেশেও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাহা নানা কারণে বিশেষজ্ঞেরা পছন্দ করেন নাই।

ভারতবর্ষে স্থায়ী ও অস্থায়ী এই দুই প্রকারের ভূমি-বন্দবস্ত আছে।

১। জমির ও খাজনার স্থায়ী ব্যবস্থা বঙ্গদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে হয়; কাশী, বিহার, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের উত্তরাংশেও পাকা বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রকৃত উড়িষ্যাদেশ ১৮০৩ সালে ইংরাজদের হাতে আসে এবং সেই সময়ে যে বন্দবস্ত হইয়াছিল তাহা ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; তার পর ১৯০০ সাল হইতে নূতন ব্যবস্থানুসারে খাজনা শতকরা ৫২ হারে বাড়িয়া যায়। ১৮৫৯ সালে অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদারের সহিত জমির পাকা ব্যবস্থা হয়, কিন্তু রাজস্বের স্থায়ী বন্দবস্ত হয় নাই।

স্থায়ী বন্দবস্তি জমি

২। অস্থায়ী বন্দবস্ত দুই শ্রেণীর—

(ক) মহলবারী ব্যবস্থা—সমগ্র গ্রামের সহিত খাজনার ব্যবস্থা হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে এইরূপ সর্ত্ত। শেষোক্ত দেশ দ্বয়ে ২০ বৎসর অন্তর নূতন সেটেলমেণ্টে হয়। এই প্রথানুসারে সমগ্র গ্রামের খাজনা গ্রামের মণ্ডলদের হাত দিয়া কলেক্টরীতে যায়।

(খ) রায়তারী বন্দবস্ত—মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বর্মা ও আসামে রায়তরী বন্দবস্ত আছে। এখানে সরকারের সহিত প্রত্যেক প্রজার সম্বন্ধ—কোনো মধ্যবর্তী জমিদার, তালুকদার এইখানে নাই। রায়ত স্বয়ং কলেক্টরীতে খাজনা দিয়া আসে।

অস্থায়ী বন্দবস্তি জমি

সমগ্র বৃটীশ ভারতের এক পঞ্চমাংশ স্থানে চিরস্থায়ী-বন্দবস্ত আছে। বাংলা-বিহারের ৪/৫ অংশ; আসামের ১/৫ অংশ; যুক্তপ্রদেশে ১/১০ অংশ;

মাদ্রাজে ½ অংশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত, অপর অংশে অস্থায়ী ব্যবস্থা। ভারতের রাজস্বের শতকরা ৫৩ ভাগ চিরস্থায়ী ও মহলবারী ভূমি হইতে পাওয়া যায়; অবশিষ্ট ৪৭ ভাগ রায়তারী ভূমি হইতে উঠে।

চিরস্থায়ী বন্দবস্ত

ভারতবর্ষের সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দবস্ত প্রবর্তিত করবার জন্য লোকে বহুকাল হইতে অনেক আন্দোলন করিয়াছেন; কিন্তু সরকার বাহাদুর যে কেন সেসব কথায় কর্ণপাত করেন নাই তাহার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। (১) সরকার ১৭৯৩ সালে যে-রাজস্ব পাইতেন এখনো তাহাই পাইতেছেন; ইহার ফলে জমিদারগণের ভাগে প্রতি বৎসর ৪½ কোটি টাকা পড়িতেছে; অথচ ইহার যথার্থ মালিক সরকার এতগুলি টাকা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। (২) রাজস্বের এত ক্ষতি সরকার বাহাদুর অন্য জায়গা হইতে পোষাইয়া লইতেছেন। ফলে বাংলার বাহিরের প্রজাদের উপর খাজনার চাপ বেশী পড়িতেছে, অথচ বিনাশ্রমে জমিদারগণ অনেক অর্থ পাইতেছেন। (৩) এই প্রভূত অর্থ জমিদারগণ জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন না। কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন যে বাংলাদেশের জমিদারগণ নিজ নিজ গ্রামে বাস করিয়া গ্রামটিকে আদর্শ স্থান করিয়া তুলিবেন; তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামসমূহের পথঘাট, জলাশয়, পুষ্করিণী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প সবদিক দিয়া উন্নতি লাভ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের জমিদারগণের দ্বারা এ আশা অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ হয় নাই।

চিরস্থায়ী বন্দবস্তের অসুবিধা

কিন্তু ইহার স্বপক্ষে বলিবারও কিছু আছে। (১) অন্যান্য প্রদেশে যেখানে কোনো পাকাপাকি বন্দবস্ত নাই, রাজস্ব যেখানে প্রতিবৎসরই হ্রাসবৃদ্ধি হয় সেখানে সরকার জানিতে পারেন না কোন্ বৎসরে কি

আয় হইবে ; যে-বৎসর অজন্মা হয় সে-বৎসর সরকারকে খাজনা রদ করিতে হয়। কিন্তু বাংলা দেশের খাজনা বাঁধা। অজন্মা হইলেও সরকার নির্দিষ্ট খাজনা পাইবেন। (২) অস্থায়ী-বন্দবস্তী-প্রদেশে ২০ বা ৩০ বৎসর অন্তর সেটলমেণ্টের জন্য যে উৎপাত হয় তাহার স্থানে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে প্রজাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

চিরস্থায়ী বন্দবস্তের সুবিধা

(৩) বাংলাদেশের জমিদারগণ যথেষ্ট পতিত জমি আবাদ করিয়া থাকেন ও নূতন নূতন প্রজা বসাইয়া জলাজমি বা চর সাফ করাইয়া কৃষি সুরু করেন ; ইহাতে জমিদারের লাভ হয়। কিন্তু বেতন-ভোগী সরকারী তহশীলদারগণ এমন প্রাণ দিয়া কার্য্য করিতে পারেন না ; কারণ তাঁহাদের স্বার্থ এ-সব ক্ষেত্রে খুব কম। (৪) বর্ত্তমানে গ্রামের লোকের কাছে যেটুকু বাহিরের খবর ও সভ্যতা পৌঁছায় তাহা জমিদারের কাছারী হইতে। বাংলাদেশের প্রায় জমিদারীতে পাঠশালা, স্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও পোষ্ট আপিস আছে। জমিদারের বাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপ এখনো অনেক জায়গায় সামাজিক মজলিসের স্থান। এক কথায় বলিতে গেলে জমিদারের কাছারীবাড়ী গ্রামের সভ্যতার ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। (৫) চিরস্থায়ী বন্দবস্তের ফলে বাংলা-দেশে একদল ধনী সম্ভ্রান্ত লোক সরকার ও সাধারণ লোকের মধ্যে উঠিয়াছেন যাঁহাদের দ্বারা সরকারের প্রভূত কল্যাণ হইতেছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে, দেশের অন্যান্য অশান্তির সময়ে এবং গতযুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহের সময়ে জমিদার ও তালুকদারগণ বৃটীশ রাজকে কিরূপ সাহায্যদান করিয়াছিলেন তাহা সরকারও স্বীকার করিয়া থাকেন। দেশে শিক্ষার প্রচার, স্বাস্থ্যোন্নতি, দুর্ভিক্ষদমন, সাহিত্য ও শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি সমস্তই জমিদারগণের শুভ ইচ্ছায় ফলেই হইয়াছে। (৬) এদেশের উত্তরাধিকার আইনে জ্যেষ্ঠপুত্র সর্বস্ব পাইবে এরূপ বিধি নাই,

সকল পুত্রই সমান অংশ পায়। সেইজন্য বড় বড় জমিদারী কয়েক পুরুষের মধ্যে টুকরা টুকরা হইয়া যায় এবং মধ্যবিত্ত একশ্রেণীর লোক উঠিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ, উচ্চ শিক্ষা প্রবেশ করায় দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। বাংলাদেশ শিল্প বাণিজ্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে পিছাইয়া থাকা সত্ত্বেও অর্থে ও ঐশ্বর্য্যে যে সে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে ইহার প্রধান কারণ বাংলা-দেশের ভূমিকর একবারের মত ঠিক হইয়া যাওয়াতে জমিদারগণের হাতে যথেষ্ট টাকা জমিয়াছে; সরকারের হাতে সব টাকা গিয়া পড়ে না, কিছু টাকা জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে থাকিয়া যায়। কিন্তু রায়তারী ব্যবস্থাতে প্রজা ও সরকারের মাঝে আর কোথায়ও টাকা জমে না, ফলে সে-সব স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে সরকারী সাহায্য পাইবার পূর্বে আর কোনো সহায়তা লাভের উপায় থাকে না।

সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিবার কথা বহুকাল হইতে চলিতেছে। ১৯০০ সালে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জনকে কয়েকখানি পত্রে ভারতের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা বহুযুক্তি ও প্রমাণের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে সরকারী খাজনাদাবীর একটা কোথায় সীমা থাকা উচিত; সেটেল্‌মেণ্ট আরও দীর্ঘকাল পরপর করিলে প্রজার সুবিধা হয়; শস্যের মূল্য না বাড়িলে রাজস্ব বাড়িবে না এবং কোনো প্রজা যদি মনে করে যে তাহার রাজস্ব অযথারূপে ধার্য্য করা হইয়াছে তবে সে আদালতে গিয়া নালিশ করিতে পারিবে। এইরূপ আরও কতকগুলি প্রস্তাব ও অনেকগুলি অভিযোগ তিনি উপস্থিত করিয়াছিলেন। সরকার প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের নিকট হইতে নিজ নিজ প্রদেশের চাষীদের অবস্থা সত্যই মন্দ কি না তাহা জানিবার জন্য বিশেষভাবে

রমেশচন্দ্র দত্তের পত্র ও সরকারী জবাব

চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে যাহা জানা যায় তাহাতে তাঁহারা বলেন প্রজাদের অবস্থা তেমন শোচনীয় নহে; মুনফার শতকরা ৫০ ভাগের অধিক খাজনা কোথাও নাই, বরং কমই আছে; দীর্ঘকাল অন্তর সেটল্‌মেণ্ট ক্রমে ক্রমে প্রবর্তিত হইতেছে; অধিক খাজনা ধরা ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ নহে; চিরস্থায়ী বন্দবস্তই দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধক বলিয়া সরকার মনে করেন। তবে যাহাতে প্রজাদের কষ্ট না হয় সে বিষয়ে তাঁহারা দৃষ্টি দিবেন একথা প্রতিশ্রুত হন। তবে এ বিবাদের মীমাংসা হয় নাই, একদল সরকারকে দোষী করেন, আবার সরকার প্রতিবাদ করেন।

অস্থায়ী বন্দবস্ত

পূর্বেই বলিয়াছি ভারতে অস্থায়ী বন্দবস্ত জমি স্থায়ীর তুলনায় কম। অস্থায়ী শ্রেণীর মধ্যে মহলবারী-বন্দবস্ত অনুসারে ত্রিশবৎসরের মত জমির সেটল্‌মেণ্ট হয় এবং তখন যে-খাজনা ধার্য্য হয় তাহা ঐ পূর্বের মত পাকা। এই ব্যবস্থামত গ্রামের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। গ্রামের মাতব্বরকে পশ্চিমাঞ্চলে 'নম্বরদার' বলে। সে খাজনাপত্র যথাসময়ে কলেক্টরীতে পৌঁছাইয়া দিবার চুক্তি করিয়া লন। সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার মহলের খাজনা প্রথমে ধার্য্য করিয়া দেন; পরে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গ্রামের ব্যক্তিগত খাজনা ঠিক করিয়া দেয়; জমির দাম, শস্যের মূল্য ও পরিমাণাদি বিচার করিয়া খাজনা ঠিক হয়। তবে সে ধার্য্য ঠিক হইল কি না তাহর চরম মীমাংসা সেখানে হইয়া যায়। পূর্বে সরকার প্রজার লাভের প্রায় ৯০ ভাগ ও লইতেন কিন্তু বোম্বাই ব্যতীত সর্বত্রই ৫০ ভাগের অধিক লওয়া হয় না।

উপর্যুক্ত খাজনা ছাড়া চাষীদের নিকট হইতে (১) পথ, পাঠশালা ও চিকিৎসা বলিয়া একটি কর বা সেস লওয়া হয়; (২) দ্বিতীয় সেস

গ্রামের কর্মচারীদের পারিশ্রমিক, যেমন মাতব্বর নিকাশনবীশ চৌকি-দারের বেতন (৩) দুর্ভিক্ষের জন্য সংস্থান (১৯০৬ সালে উঠিয়া গিয়াছে)।

অযোধ্যায় ভূমি বন্দবস্তের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। কয়েক খানি করিয়া গ্রাম লইয়া একটি তালুক সৃষ্টি করা হইয়াছে,। সেই তালুকের খাজনা আদায়ের ভার ত্রিশবৎসরের জন্য তালুকদারের উপর ন্যস্ত হয়। তালুকদার রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারের হাতে সমর্পণ করেন ও সরকার তাঁহার মান ও প্রাণ রক্ষার মত মুনফা দিয়া থাকেন। বাংলার জমিদারের তুলনায় তালুকদারের সম্মান ও স্থায়িত্ব দুই কম হইবার কারণ তাঁহাদের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত এবং তালুকের উপর কোনো প্রকার অধিকারও তাঁহাদের নাই। এক হিসাবে ইহারা বড় রকমের গোমস্তা।

তালুকদারী বন্দবস্ত

রায়তারী বন্দবস্তে সরকারই স্বয়ং জমিদার, চাষী-প্রজাদের সহিত জমিজমার তিনি ব্যবস্থা করেন। ইহাদের জমি কে কি সর্তে লইয়াছে, কত করিয়া খাজনা ধার্য্য হইয়াছে, কতখানি কোন্ শ্রেণীর জমি আছে এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপি-বদ্ধ করা হইতেছে সেটল্‌মেণ্ট বিভাগেব কর্তব্য। ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই প্রতি গ্রামের প্রত্যেকটি ক্ষেত, বিলের ম্যাপ সেটল্-মেণ্ট কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা ইংরাজশাসনের সুদৃঢ় বিধি ব্যবস্থার আশ্চর্য্য ফল।

রায়তারী বন্দবস্ত

অস্থায়ী-বন্দবস্ত অনেকে পছন্দ করেন না তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কতকগুলি অসুবিধা আছে; (১) বিশ ত্রিশ বৎসর অন্তর রাজস্ব নির্ণয়ের জন্য যে তদারক চলে তাহাতে প্রজাদের খুব অসুবিধা হয়। সেটেল্‌মেণ্টের সময়ে চাষীরা খাজানা বৃদ্ধির ভয়ে জমির অযত্ন করিতে আরম্ভ করে। সেটেল্‌মেণ্টের নামে তাহাদের

আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ভয়ে অনেকে পয়সা কড়ি লুকাইয়া ফেলে, জমিজমাও ইচ্ছা করিয়া শ্রীহীন করিয়া ফেলে।

অস্থায়ী ব্যবস্থার অসুবিধা

(৩) কৃষকেরা সাহস করিয়া জমির উন্নতির জন্য বেশী পয়সা খরচ করিতে পারে না, সে জানে উন্নতি করিলেই তাহার খাজনা বাড়িবে। (৩) নিজের জিনিষ হইলে মানুষের কেমন একটা সহজ দরদ জন্মে; ত্রিশবৎসর ধরিয়া যে জমি-খামার চাষী সযত্নে গড়িয়া তুলিতেছে বৃদ্ধ বয়সে তাহা তাহার নাও থাকিতে পারে একথা ভাবিয়া সে কখনো সুখী হইতে পারে না। (৫) রাজস্ব দিয়া প্রজার হাতে যাহা থাকে তাহাতে সুবৎসর চলিয়া যায় কিন্তু দুর্বৎসর কোনো মতেই চলে না। প্রজা ও সরকারের মধ্যে মধ্যবিত্ত কোন লোক থাকিতে পারে না বলিয়া এসব দেশে কোনো বড় কাজে মূলধন পাওয়া কঠিন হয়

জমিদার, তালুকদার বা মহাজনের হাত হইতে চাষীপ্রজারা যাহাতে রক্ষা পায় এজন্য ইংরাজ সরকার অনেক আইন জারী করিয়া অসংখ্য মূক মানবকে রক্ষা করিয়াছেন।

জমিদারের সহিত সরকারের যেমন একটা পাকা রকমের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে প্রজার সহিত জমিদারের তেমন কোনো কায়েমী বন্দবস্ত হয় নাই। খাজনা যতই বৃদ্ধি হউক তাহার প্রতিবাদের বা বাধা দিবার কোনো উপায় ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দবস্তের সময়ে জমিদারগণ

জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ

প্রজাকে তাহার জমিজমার পরিমাণ ও সর্ত্তাদি উল্লেখ করিয়া এক "পাটা" লিখিয়া দিতেন ও তাহার নিকট হইতে ইহার এক 'কবুলয়েৎ' আদায় করিয়া লইতেন। কিন্তু কার্য্যত ইহা চলিত না এবং জমিদারগণ ইচ্ছা করিলেই যে কোনো প্রজার খাজনা বা ভিটা ও জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন, আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না। ১৮৫৯ সালে

জমিদারদের এই খামখেয়ালী কাণ্ড বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সরকার হইতে এক আইন পাশ। সেই আইন অনুসারে বারবৎসর বাস বা চাষ করিলে জমিতে প্রজার পাকাসত্ব হইল এবং জমিদারের স্বেচ্ছামত খাজনা বাড়াইবার অধিকারও বন্ধ হইল। ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল টেনান্সি আইনে প্রজাদের অধিকার ও স্বত্ব আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। ১৮৯৮ ও ১৯০৭ সালে আরও কতকগুলি আইন পাশ হয়। এই সব আইন পাশ হইবার ফলে জমির উপর প্রজার মন ও দরদ দুই বাড়িয়াছে। জমিদারের উৎপাতে ১৮৭৭ সালে বিহারের একটি জেলাতে স্থায়ী প্রজার সংখ্যা সামান্যই দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু ১৯০০ সালে প্রজাদের শতকরা ৮৭ জন স্থায়ী হইয়াছিল।

১৮৮৬ সালে এক আইনে অযোধ্যাতে জমিদারদের প্রজাদিগকে উচ্ছেদ করিবার বা অযথা করবৃদ্ধির ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। পঞ্জাবে

প্রজার স্বার্থ রক্ষা

দরিদ্রতার জন্য প্রজারা ক্রমেই মহাজনের হাতের মধ্যে পড়িতেছিল এবং কৃষকেরা ক্রমেই দিনমজুরে পরিণত হইয়া যাইতেছিল। মহাজনগণ জমির মালিক হইয়া কৃষকদিগকেই মজুরের ন্যায় খাটাইয়া স্বয়ং মুনফা পাইয়া থাকেন। লর্ড কর্জনের সময়ে এক আইন জারী হয় যাহাতে টাকার জন্য প্রজার জমি নিলাম হইবার নিয়ম বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বহু আইনের দ্বারা প্রজাদিগকে রক্ষা করা হইতেছে।

২। আইন ও বিচার

দেওয়ানী।

এদেশের বিচার-বিভাগ প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত—দেওয়ানী ও ফৌজদারী। এই দুইটি নাম মুসলমান শাসনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। টাকাকড়ি, জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি, চুক্তি ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি বিষয়ের বিচার পূর্বে দেওয়ানের আদালত বা কাছারীতে হইত বলিয়া ইহাকে 'দেওয়ানী' বলে। চুরি ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা, বঞ্চনা হত্যা প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধীয় বিচারের ভার ছিল ফৌজদারের উপর, সেইজন্য এখনো সেগুলিকে ফৌজদারী মাম্‌লা বলে।

দেওয়ানী ও ফৌজদারীর অর্থ

১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ বাংলাদেশের দেওয়ানী পাইলেও বিচারের ভার নবাবের উপরই ছিল। তারপর ওয়ারেন হেষ্টিংস বড়লাট হইয়া আসিয়া ইহার আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী এই উভয় প্রকার বিচারের ভার গ্রহণ করিলেন। রেগুলেটিং অ্যাক্‌ট অনুসারে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল ও চরম বিচারের ভার সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত হইল। এই সময়কার বিচারপদ্ধতির মধ্যে কি দোষ ছিল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন।

প্রথম প্রথম কোম্পানীর শাসনকর্তারা ও বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে বিলাতে যে-আইন চলে ভারতে তাহারই প্রবর্তন করা সহজ। ১৮৩১ সালে তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে মুসলমান ও হিন্দুদের বিচার উভয় ধর্মের নিজ নিজ নিয়মানুসারে হইবে। ইহার পর ১৮৬২ সালে

দেওয়ানী বিচারের ইতিহাস

হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্য্যন্ত বিচার পদ্ধতি ও গঠনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৮৩৩ সালে কলিকাতায় এক আইন বৈঠক বা 'ল-কমিশন' বসে; সভ্যদের মধ্যে লর্ড মেকলে ছিলেন প্রধান; এই কমিশন যে দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন তাহা সামান্য পরিবর্তিত হইয়া ১৮৬০ সালে আইনে পরিণত হয়। উক্ত সময়ের দেওয়ানী আইন অসম্ভবরূপে জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; হিন্দু মুসলমানের আইন, কোম্পানীর আইন, ইংরাজদের জন্য কোম্পানীকৃত বিশেষ আইন, বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ের লাট সভার বিবিধ আইন প্রভৃতি এত জমিয়া উঠিয়াছিল যে তাহা হইতে সুবিচার করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৬০ সালে এই সব আইনের সংস্কার করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক আইন সংগৃহীত হয়।

১৮৩৩ সালের ল-কমিশন

অধুনা এদেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় হাইকোর্ট। ১৮৬১ সালে কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশে হাইকোর্টের পূর্বের নাম ছিল সদর দেওয়ান ও সদর নিজামত আদালত। প্রথমভাগে দেওয়ানী, দ্বিতীয়ভাগে ফৌজদারী বিচার হইত। এখন হাইকোর্টে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ মোকর্দ্দমারই বিচার হয়। হাইকোর্টের অধীনে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ, মুন্সেফ প্রভৃতি আছেন। বর্তমানে কলিকাতা, বোম্বাই মাদ্রাজ, এলাহাবাদ ও পাটনার হাইকোর্ট আছে। ১৮৬০ সালে পঞ্জাবে ও ১৯০০ সালে বর্মাতে হাইকোর্টের অনুরূপ প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহাকে বলে চীফ কোর্ট। অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উত্তর-বর্মা, কুর্গ, বেরার ও সিন্ধু প্রদেশে জুডিশিয়াল কমিশনরদের কোর্ট আছে। ক্ষমতা প্রায় সকল কোর্টেরই সমান।

হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা

১৮৬১ সালের আইনানুসারে প্রত্যেক হাইকোর্টে একজন চীফজাষ্টিস

ও পনের জনের অনধিক জজ থাকিতেন। কিন্তু কাজের চাপ খুব অধিক হওয়ায় ১৯১১ সালে জজদের সংখ্যা ২০ জন পর্য্যন্ত হইতে পারিবে ঠিক হয়।

মুন্সেফের আদালত সর্বনিম্ন দেওয়ানী বিচারালয়। তাহার উপর সব-জজ, জেলা-জজ ও হাইকোর্ট আছে। কোনো কোনো ক্ষুদ্র জেলার স্বতন্ত্র জজ নাই। নিকটবর্তী জেলার জজ ঐ সকল জেলায় কার্য্য করেন। বাংলা দেশের মধ্যে পাবনার জজ বগুড়ার, রাজসাহীর জজ মালদহের, এবং দিনাজপুরের জজ দার্জ্জিলিংএর কার্য্য করেন। আবার ২৪ পরগণার ন্যায় বড় জেলায় একাধিক জজ আছেন।

মুন্সেফ সবজজ. জজের কর্তব্য ও অধিকার।

যে-সকল মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয়ের মূল্য ১০০০৲ টাকার অধিক নহে মুন্সেফরা তাহার বিচার করেন। জেলার সদর সহর ও মহকুমা ব্যতীত অন্য যেস্থানে মুন্সেফদিগের বিচারালয় আছে সেস্থানগুলিকে চৌকি বলে।

মুন্সেফদিগের উপরে প্রায় প্রতি জেলাতেই সব-জজ আছেন। কোনো কোনো জেলায় কাজের চাপ বেশী বলিয়া দুই জন তিন জন এমন কি চারি জন পর্য্যন্ত সব-জজ থাকেন। সব-জজেরা যে-কোনো দাবীর মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন; কিন্তু জেলার সব-জজদের ১০ হাজার টাকার বেশী দাবী মোকদ্দমার শুনানির অধিকার নাই। মুন্সেফদিগের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল শুনানীর বা পুনর্বিচার করিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে। পাচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাবীর যেসকল বিচার ইহাঁরা করেন তাহার বিরুদ্ধে আপিল জেলার জজ সাহেবের নিকট হয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চ দাবীর মোকদ্দমা হইলে তাহার আপিল হাইকোর্টে হইয়া থাকে। হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল ইংলণ্ডের প্রিভিকৌন্সিলে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১০,০০০৲ টাকার

কম দাবীর মোকদ্দমার আপিল বিলাতে হয় না; হাইকোর্টেই ইহার চরম বিচার করিয়া দেন। ইংরাজের বিচারালয়ে আপিল এক বিশেষত্ব। দেশের লোকের হাইকোর্টের বিচারের উপর খুব আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে।

কর্জ-দেওয়া টাকার দাবী, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি সাধারণ দেনা পাওনার মোকদ্দমা ছোট আদালতে (Small Causes Court) হয়। পূর্বে দেশের বহু স্থানে ছোট আদালতে জজ ছিলেন। এখন ঢাকা, হুগলী, ২৪ পরগনা এবং দুই এক স্থান ব্যতীত অন্য জেলায় ছোট আদালতে জজ নাই। মুন্সেফরাই ইহার বিচার করেন। কলিকাতার ছোট আদালতে পাঁচজন জজ আছেন। ইঁহারা কেবল সহরের মোকদ্দমা করেন। ছোট আদালতের জজদিগের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল নাই। তবে আইন সংক্রান্ত ভুল ঘটিলে হাইকোর্টে পুনর্বিচার প্রার্থনা করিয়া মোশন বা বিশেষ আবেদন করা চলে।

ছোট আদালত।

ফৌজদারী।

আমরা এতক্ষণ দেওয়ানী বিচার সম্বন্ধেই বলিলাম। ফৌ মোকদ্দমায় অপরাধীকে শাস্তি দিবার প্রধান আইনের নাম ভারতব দণ্ডবিধি। এই আইন-পুস্তক হিন্দু, মুসলমান ও ভারতের নানা জাতির দণ্ড ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, এবং প্রণয়নকারীরা এতই সুবিবেচনার সহিত ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে ১৮৬০ সালে উহা প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো পরিবর্তন সংঘটিত করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

ফৌজদারী আদালত।

বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট

অপরাধীকে দুই বৎসর কারাদণ্ড ও ১০০০্ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারেন; বেত্রদণ্ডও দিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছয়মাস কারাদণ্ড ও ২০০্ টাকা জরিমানা ও বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট একমাস কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থ দণ্ড করিতে পারেন।

তিন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

ইহার উপরেই জেলার সেশন-জজদিগের আদালত। অধিকাংশ স্থলেই জেলার জজ ফৌজদারী বিচারও করেন। সেশন-জজেরা অপরাধীর প্রতি ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডবিধান করিতে পারেন। অতিরিক্ত (Additional) সেশন-জজদিগেরও এই ক্ষমতা আছে। কেবল সহকারী জজেরা সাত বৎসর কারাদণ্ড বা নির্বাসন দিতে পারেন। ইত্যাদি ফৌজদারী বিচারে জজকোর্টে ও হাইকোর্টে জুরী প্রথা আছে।

সেশন জজ।

হাইকোর্টই সর্বোচ্চ বিচারালয় বলিয়া এখানকার জজদিগের ক্ষমতা অসাধারণ। ইহারা আইননির্দ্দিষ্ট সকল শাস্তি দিতে পারেন; আবার সেশন-জজদিগের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল শুনেন ও লঘু পাপে গুরুদণ্ড বা গুরু পাপে লঘুদণ্ড হইলে পুনর্বিচার করেন। আবার যে-সকল মোকদ্দমায় আপিলের ব্যবস্থা নাই, ইচ্ছা করিলে হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া নিম্ন-বিচারালয়ের আদেশ রহিত করিতে পারেন।

হাইকোর্ট।

হাইকোর্ট কিম্বা সেশন-জজেরা নিজে কোনো ফৌজদারী নালিশ গ্রহণ করেন না। গুরুতর অভিযোগে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটেরা প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়া যদি বুঝেন যে মোকদ্দমায় অপরাধীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা সেশন-জজের নিকটে অথবা কলিকাতায় হইলে হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন। ইহাকে দায়রা সোপর্দ করা বলে।

দায়রা সোপর্দ।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় আপিল এইরূপ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হয়। ফৌজদারী বিচারে সন্দেহে শাস্তি দিবার নিয়ম নাই; বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কাহাকেও কিঞ্চিন্মাত্র দণ্ড দেওয়া তাঁহাদের মত-বিরোধী। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার অধিকার একমাত্র রাজার আছে।

আপিল ও প্রতিকার।

সাতবৎসরের অল্প বয়সের বালক বালিকা কোনো অপরাধে অপরাধী হইতে পারে না। তদূর্দ্ধবয়স্ক বালকদিগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া শাস্তিবিধান করা হয়। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবকদিগকে প্রথম অপরাধে প্রতিভূ বা জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। অল্পবয়স্ক বালককে চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয়ে (Reformatory) পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। আলিপুরে জেলখানার একটি অংশ বালক-অপরাধীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে।

রিফর্মেটারী

সাধারণ সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত অনেক সহরে ও কলিকাতায় অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য হইতে ইঁহারা নির্বাচিত হন।

মোকদ্দমা।

দেওয়ানী মোকদ্দমা প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ করিয়া হয়। নিম্নের তালিকায় প্রতি হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে কি পরিমাণ মোকদ্দমা হয় তাহা প্রদত্ত হইতেছে। ইহার মধ্যে, আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। ১৯১৩ সালে প্রতি ১০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে এইরূপ অভিযোগ হইয়াছিল :—

বঙ্গদেশ—১৪·২	মান্দ্রাজ—১১	মধ্যপ্রদেশ—৭·২	বর্মা—৫·৩
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ—১২·৩	পাঞ্জাব—৯·৬	আসাম—৬·৪	যুক্ত প্রদেশ ৩·৮
	বোম্বাই—৭·৮	বিহার উড়িষ্যা-৫·৪	

দেওয়ানী মোকদ্দমার অধিকাংশই অর্থসংক্রান্ত; শতকরা ৪০টি মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকা মাত্র, শতকরা ১৬টির দাবী মাত্র ১০৲। বাংলাদেশে দশ টাকার কম দাবী করিয়া ১৯২৪ সালে ৯৬,০০০ মামলা রুজু হইয়াছিল। সকল শ্রেণীর দেওয়ানী লেনদেন সংক্রান্ত মামলা বাংলায় ৬.৩১,৭৯৩টি হইয়াছিল। এত আর কোথায় হয় না। দশ-হাজার টাকার দাবীর অভিযোগ ১৯১৩ সালে মাত্র ২৬৭০টি ছিল। সমগ্র অভিযোগের শতকরা ৭৬%টি একতরফা ডিগ্রি হয়; অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদীর দাবী ন্যায্য। লোকে টাকা লইয়া যে ঠিক সময়ে টাকা শোধ করিতে পারে না বা করে না তাহার দুইটি কারণ হইতে পারে; এক লোকের চারিত্র-নীতির অভাব, আর লোকের সত্যকারের অর্থাভাব। সমগ্র মোকদ্দমার শতকরা ২৫% ভাগ আপিলে যায়। ১৯১৪ সালে বৃটীশ ভারতে ২০,৫৫,২৬০টি মামলা মোট ৫১,১২,৫৫,০০০ টাকার দাবী করিয়া রুজু হয়। ১৯২৩ সালে ২১,২১,৯০৪টি মামলা ৬৭,৭৮,-৩৪,০০০ টাকা দাবী করিয়া রুজু হয়। মানুষের মোকদ্দমা করিবার ইচ্ছা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি

ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা বহুকাল তেমন বাড়ে নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে পঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে বিশেষভাবে বাড়িতেছে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ। ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১৩ সালে ফৌজদারী অপরাধের

ফৌজদারী অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি

অনুপাত শতকরা ২২ হারে বাড়িয়াছিল অথচ জনসংখ্যা বাড়িয়াছিল শতকরা ৬½ হারে। ঐ বৎসরে ১৩,৮১,৪৪৬টি মোকদ্দমা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের লোকের মোকদ্দমার প্রতি এই অনুরাগ মোটেই শুভ লক্ষণ নহে। সামান্য বিবাদ মিটাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই; ন্যায্য দাবী দিতে আমরা নারাজ; শোষণ করিয়া, পেষণ করিয়া মারিয়া আমরা সুখী হই; লোককে জেরবার করিয়া আনন্দ পাই।

য়ুরোপীয়ান আসামী বা খুনীর বিচার সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। ১৮৭২ সালের পূর্বে তাহাদের বিচার হাইকোর্ট ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারিত না। ইহাতে বাদী প্রতিবাদীর বিশেষ অসুবিধা হইত। ঐ বৎসরে আইন হইল যে য়ুরোপীয়ানদের বিচার প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা সেশন্‌স্ কোর্টের জজেরা করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাদের সাহেব হওয়া চাই। ১৮৮৩ সালে লর্ড রীপনের সময়ে বঙ্গদেশের একজন বাঙালী I. S. C ম্যাজিষ্ট্রেট্ (বিহারীলাল গুপ্ত) এ বিষয়ের অসুবিধা ও য়ুরোপীয়ানদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ করিয়া এক মন্তব্য পাঠান। বঙ্গীয়-সরকার ভারত-সরকারের নিকট মন্তব্য-লিপি পেশ করিলে ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে ইলবার্ট সাহেব এক বিলের পাণ্ডুলিপি পেশ করেন; তাহাতে বিচারালয়ে য়ুরোপীয় ও ভারতীয়ের বিচার বিষয়ে ভেদাধিকার উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। ইহাতে দেশময় ইংরাজ এমন কি এংলো-ইণ্ডিয়ান মহল হইতে ভীষণ প্রতিবাদ হয়। তাহার ফলে ইলবার্টের বিল পাশ করা সম্ভব হইল না। কিন্তু এইটুকু নিয়ম হইল, যে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট যদি জিলার ভার প্রাপ্ত হন বা সেশন্‌স্ জজ হন, তবে তিনি ঐ অধিকার প্রাপ্ত হইবেন; তবে আসামীরা ইচ্ছা করিলে জুরীর বিচার চাহিতে পারিবেন কিন্তু জুরীদের মধ্যে অর্দ্ধেক সাহেব হওয়া চাই। এই নিয়ম এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে।

য়ুরোপীয় অপরাধির বিচার

ভারতীয় সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ সাধারণ আসামী-য়ুরোপীয়ানকে সাধারণভাবে বিচার করিতে পারেন না।

আদালতে বাদী প্রতিবাদী কেহই বিচারের জন্য স্বয়ং কোনো বিষয় উপস্থিত করিতে পারেন না। নিম্ন আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমায় উকীল (ও ব্যরিষ্টার) বাদী প্রতিবাদীর মামলা ও ফৌজদারী আদালতে মোক্তার (ও উকীল, ব্যরিষ্টার) সাধারণত ফরিয়াদী ও আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্য চালান। জেলাকোর্টে উভয় ক্ষেত্রে উকীল কার্য্য করেন।

উকীল ও ব্যরিষ্টার

হাইকোর্টে ব্যরিষ্টার ও উকীলগণ মোকদ্দমা তদারক করেন। উকীলেরা (Vakil) হাইকোর্টের Original বা প্রথম মোকদ্দমায় উপস্থিত হইতে পারেন না ; ব্যরিষ্টারগণের একমাত্র অধিকার আছে। আপীল মোকদ্দমায় কেবল উকীলগণ কাজ করিতে পারেন। ব্যরিষ্টারেরা কোনো মোকদ্দমা নিজেরা গ্রহণ করিতে পারেন না ; সলিসিটর বা আর্টনীরা মোকদ্দমা মক্কেলের নিকট হইতে বুঝিয়া লন ও ব্যরিষ্টাররা তাহা কাছারীতে উপস্থিত করেন।

হাইকোর্টে Original মোকদ্দমায় একমাত্র ব্যরিষ্টারই উপস্থিত হইতে পারেন ; প্রবীন উকীল বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এই অধিকার লাভ করিতে পারিতেন না। এই বিসদৃশ নিয়মের জন্য উকীলেরা (Vakil) খুবই অসন্তোষ ও আন্দোলন করেন। তাহার ফলে এক কমিশন বসে। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে দশ বৎসর ওকালতী করার পর তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটি ফী দিয়া আড্‌ভোকেট হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। সেই পরীক্ষায় তাঁহারা উপযুক্ত মনে হইলে তাঁহাদিগকে Original Sideএ দাঁড়াইবার অধিকার দেওয়া হইবে।

উকীল হইতে হইলে প্রথমে বি, এ, পাশ করিবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর আইন পড়িতে হয়। পাশ করিয়া হাইকোর্টে যথাযথ 'ফী' দিয়া (হাইকোর্ট, জেলাকোর্ট ও মুন্সেফীকোর্টের জন্য বিভিন্ন ফী) নিজেদের নাম রেজেষ্টরী করিলে তবেই ওকালতী করিবার অধিকার জন্মে। এখান হইতে বি, এ, পাশ করিয়া বিলাতে গিয়া ব্যরিষ্টরী পাশ করিতে হয়। পাঁচ বৎসর ওকালতী করিবার পর বিলাত গিয়া এক বৎসরে ব্যরিষ্টার হইয়া আসা হয়।

মোক্তারী পরীক্ষা I. A. দিবার পর দিতে হয়। মোক্তারগণ সবডিভিশনের ডেপুটিদের আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা ছাড়া আর কোথায়ও অন্য কোনো কাব্য করিতে পারেন না।

৩। পুলিশ ও জেল

ইংরাজ শাসনে দেশ শান্তিতে আছে। অনেকে বলেন ভারতবর্ষ এমন শান্তি পূর্বে কখনো ভোগ করে নাই; এই শান্তি রক্ষা করিতে ভারতীয় প্রজাকে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হয়। এই শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ও সৈন্য বিভাগের সৃষ্টি, বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা।

চৌকিদার সর্বনিম্ন শান্তিরক্ষক। প্রত্যেক গ্রামে এক কিংবা ততোধিক চৌকিদার আছে। গ্রাম অতি ক্ষুদ্র হইলে কোনো কোনো স্থানে দুইতিন গ্রামে একজন চৌকিদার থাকে।

চৌকিদারী বন্দবস্ত

এক একজন চৌকিদারকে সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১২০ ঘর লোকের শান্তিরক্ষা করিবার কথা। বিভাগীয় কমিশনার

সাহেবের আদেশ ব্যতীত ৬০ ঘরের কম সংখ্যক ঘরের নিমিত্ত একজন চৌকিদার নিযুক্ত হইতে পারে না এক একটি গ্রাম-সমাহারের (ইয়ুনিয়ন) সমস্ত চৌকিদারের উপর এক একজন দফাদার থাকে। দফাদার গ্রাম-সমাহারের প্রধান শান্তিরক্ষক এবং তাহার অধীনস্থ চৌকিদারদিগের কার্য্য-পরিদর্শক। গ্রামের পঞ্চায়েত লোকের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন তাহা হইতে দফাদার চৌকিদার প্রভৃতির বেতন এবং পোষাকের দাম প্রভৃতি দেওয়া হয়। গ্রামের শান্তিরক্ষা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনের অন্তর্গত।

থানা, আউট-পোষ্ট, মহকুমা, জেলা, বিভাগ।

কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি থানা হয়। প্রত্যেক থানায় এক কিংবা একাধিক পুলিশ সব-ইন্সপেক্টার বা ছোট-দারোগা আছেন। ইহাদের অধীনে হেড্‌কন্‌ষ্টেবল এবং কন্‌ষ্টেবল থাকে। অনেক সময়ে থানার দূরে আউট্‌-পোষ্টে (Outpost) হেডকন্‌ষ্টেবলের অধীন কয়েকজন পুলিশ বাস করে। কয়েকটি থানা লইয়া একটি মহকুমা Sub-division গঠিত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন ইন্‌স্পেক্টর বা বড়-দারোগা থাকেন। কয়েকটি মহকুমা লইয়া একটি জেলা; সেই জেলার পুলিশ বিভাগের ভার পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর ন্যস্ত। বড় বড় জেলা হইলে দুই মহকুমার উপর একজন সহকারী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। জেলার পুলিশ সাহেব জেলার অপরাধাদির জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের নিকট দায়ী; পুলিশ বিভাগের কাজের জন্য তিনি ডেপুটি-ইন্সপেক্টর-জেনারেল ও ইন্সপেক্টর-জেনারেলের নিকট জবাবদিহি করেন। আট দশটি জেলা লইয়া একটি বিভাগ করিয়া একজন ডেপুটি-ইন্সপেক্টর-জেনারেলের অধীন দেওয়া হয়। সমগ্র প্রদেশের উপর ইন্সপেক্টর-জেনারেল; তিনি দেশের সমগ্র পুলিশ-বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত। শাসন-সংস্কারের পর হইতে পুলিশ প্রাদেশিক শাসন-বিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে।

ইহা ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগ আছে। বিচক্ষণ দারোগা, ইন্সপেক্টর প্রভৃতির মধ্য হইতে ইহাদিগকে বাহির করা হয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য ইহারা বিশেষ উপযোগী।

গোয়েন্দা-বিভাগ

ভারত-সরকারের অধীন ১৯২৩ সালে ১,৯৬,৮৪৬ জন পুলিশ ও অফিসার ছিল। ১৯১৪ সালে ২,০৩,৫৩৮ জন ছিল; সুতরাং দশ বৎসরে পুলিশের সংখ্যা সাড়ে ছয় হাজারের উপর কমিয়াছে। কিন্তু পুলিশের ব্যয় দশ বৎসরে বাড়িয়াছে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ১৯২৩ সালে ১০,৫৯,৩৩,৭৯০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। (Statistical Abstsact, 3rd Issue p. 73). উপরিউক্ত সংখ্যার উপর আরও ৩০,০০০ মিলিটারী পুলিশ আছে; ইহার অর্দ্ধেক বর্মায় থাকে।

বড় বড় সহরগুলির (কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ) শান্তিরক্ষার জন্য যে পুলিশ আছে তাহা প্রাদেশিক পুলিশ-কর্তার অধীন নহে। কলিকাতার পুলিশ বাহিনী একজন পুলিশ-কমিশনরের অধীন। প্রাদেশিক পুলিশ-বিভাগ সম্বন্ধে, দিল্লী ও শিমলার ডিরেক্টর অব্ ক্রিমিনেল ইন্‌টেলিজেন্স ও তাঁহার কর্মচারীরা খোঁজ খবর রাখেন মাত্র এবং আন্তর্প্রাদেশিক ব্যবস্থার সময়ে উপদেশাদি দিয়া থাকেন।

কলিকাতা প্রভৃতির পৃথক্ ব্যবস্থা

ভারতের কারাগার সম্বন্ধীয় শাসন ১৮৯৪ সালের কারাগার অ্যাক্ট অনুসারে চলে। ১৮৮৯ সালের জেল-কমিশনের ফলে কারাগার সম্বন্ধে অনেক নিয়ম বদল হয়। প্রত্যেক জেলায় এবং মহকুমায় কারাগার আছে। মহকুমার কারাগারগুলি ছোট; সেখানে বিচারাধীন অপরাধী ও সামান্য অপরাধে দণ্ডিত লোককে রাখা হয়; এ ছাড়া কেন্দ্রকারাগার বা সেণ্ট্রাল জেলেও প্রেরিত হয়। সমগ্র বৃটীশভারতে ৪২টি সেণ্ট্রাল জেল, ১৭২টি

কারাগার

জেলাজেল, ৫৬১টি মহকুমা বা নিম্নজেল আছে। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে তিনশ্রেণীর ৫টি ২৩টি ৬০টি জেল যথাক্রমে আছে। ১৯২৩ সালে গড়ে দৈনিক ১,২৮,৬৪৫ জন কয়েদী ছিল।

কয়েদ করা ছাড়া কোনো কোনো অপরাধীকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হইত। আন্দামানদ্বীপ এইজন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। ১৯২৩ সালে সেখানে ৯৮৯০ জন আসামী হত্যা, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের জন্য বাস করিতেছিল।

কারাবাসী অপরাধীদের জন্য সরকার বাহাদুর বহু সুনিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কারাদণ্ড দুই প্রকার হয়, এক সশ্রম আর এক বিনাশ্রম।

কারাগারে শ্রম

বিনাশ্রমে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করে তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিবার সময়ে কোনই কাজ করিতে হয় না। সশ্রম কারাদণ্ডে নানারূপ পরিশ্রম করিতে হয়। যে যে শ্রেণীর লোক যেরূপ কার্য্য করিবার উপযুক্ত তাহাদিগকে সেইরূপ কার্য্য করিতে দেওয়া হয়।

কারাগারে লেখাপড়াজানা ভদ্রলোককে লেখাপড়ার কাজ, ছাপাখানার কাজ, ঘর পরিষ্কার, আলোবাতি সাজাইবার কাজ প্রভৃতি দেওয়া হয়। অন্যান্যদের বাগানের কাজ, ছুতারের কাজ, তাঁতির কাজ, তেলপেশা প্রভৃতি নানারূপ কাজে নিযুক্ত করা হয়। কারারুদ্ধ লোকদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রায় সকল স্থানেই সরকারী চিকিৎসক কারাগারের প্রধান চিকিৎসক। বড় কারাগারে একটি চিকিৎসালয় থাকে, একজন বিশেষ চিকিৎসকও থাকেন। প্রতি রবিবারে কাজ বন্ধ থাকে ও কয়েদীদের ওজন করিয়া দেখা হয় তাহাদের ওজন কমিল কি বাড়িল। ওজন কমিলে কয়েদীকে শ্রমজনক কার্য্য কমাইয়া অথবা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্যের জন্য কারাধ্যক্ষগণকে সবিশেষ যত্ন গ্রহণ করিবার

উপদেশ আছে। নিম্নশ্রেণীর কয়েদীদের স্নানাহার শয়ন ব্যায়াম সম্বন্ধে নিয়ম থাকার ফলে জেল হইতে লোকে যখন বাহিরে আসে অনেক সময়ে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি দেখা যায়। কয়েদীরা মুক্তি পাইলে সরকার হইতে বাড়ী ফিরিবার পাশ ও পাথেয় পাইয়া থাকে।

৪। সৈনিক বিভাগ

ইংরাজদের ফ্যাক্টরী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সৈনিক বিভাগের সূত্রপাত। ফ্যাকটরীর পেয়াদা ও পিয়নেরা নিজ নিজ কাজ ছাড়া কারখানা রক্ষা করিত। তখনকার দিনে সশস্ত্র সৈন্য না রাখিলে আত্ম-রক্ষা করা সম্ভব হইত না। ইংরাজ ও ফরাশীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যথার্থভাবে এদেশে সৈনিক সংগ্রহ আরম্ভ হয়। ফরাশীরাই প্রথমে এই দেশীয় লোকদের য়ুরোপীয় ধরণে রণ-শিক্ষা দিতে থাকে।

সৈনিক বিভাগের পূর্ব ইতিহাস

ইংরাজদের দিক হইতে মেজর ষ্ট্রীন্জার লরেন্স সর্বপ্রথমে মান্দ্রাজের তৈলঙ্গীদের লইয়া এক বাহিনী গঠন করেন। বাংলাদেশের কোম্পানীর পাইক, পিয়ন ও পেয়াদারা দাঙ্গা হাঙ্গামার সময়ে যে যেমন ঢাল, তলোয়ার, বন্দুক, তীরধনুক, বর্শা, বল্লম লইয়া উপস্থিত লইত। ক্লাইভ বাংলা-দেশে সৈনিকবিভাগ গঠন করিলেন। এই সময়ে অরাজকতা হেতু রোহিল্লা, রাজপুত প্রভৃতি নানা জাতীয় সাহসিক পুরুষ দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইত; ক্লাইভ তাহাদিগকে য়ুরোপীয়ভাবে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন, এবং অচিরে তাহারাই অজেয় হইয়া উঠিল।

পলাশী যুদ্ধের পর ভারতের নানা স্থানে ইংরাজদের শক্তি বৃদ্ধি

পাইতে থাকে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশে ইংরাজ সৈন্য-বিভাগ পৃথক্‌-ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল; প্রত্যেক প্রাদেশিক সৈনিক বিভাগের কিয়দপরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। দেশীয় সৈন্যগণ ক্রমে ইংরাজ সরকারের দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৭ সালে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের একদল সিপাহী যে কোনো ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্‌ করিতে পারে। এদেশীয় সৈনিকদের মুখশ্রী দেখিয়া আমার আনন্দ হয়। কতকগুলি সৈন্যবাহিনী আশ্চর্য্যরূপে সুশিক্ষিত হইয়াছে, অফিসারদের মধ্যে নিজ নিজ উন্নতি করিবার চেষ্টাও যথেষ্ট, সৈন্যদের মধ্যে মনোযোগও আছে। ইহারা যে এককালে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

সিপাহীদের শক্তি

পলাশী যুদ্ধের পর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সৈনিক বিভাগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আর কোনো বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে উহা পুনর্গঠিত হয়; তখন য়ুরোপীয় সৈন্য ছিল ১৩,০০০ এবং দেশীয় সৈন্য ছিল ৫৭,০০০। লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারতের শাসনকর্তা হইয়া এদেশে আসিয়া রাজ্যবিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন তাহা সাধারণ ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। তাহাকে সেইজন্য সৈন্যসংখ্যা বাড়াইতে হইয়াছিল; ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা ১৮০৫ সালে ২৫,০০০ ও দেশীয় সৈন্য ১,৩০,০০০ করা হইয়াছিল।

ইহার পর ১৮২৪ সালে একবার ও সিপাহী-বিদ্রোহের পর ১৮৫৯ সালে আর একবার সৈনিক বিভাগের খুব নাড়াচাড়া হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরাজ সরকারকে অনেক বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বেঙ্গল সৈন্যবিভাগে ২১,০০০ বৃটীশ ও ১ লক্ষ ৩৭,০০০ দেশীয়, মান্দ্রাজ সৈন্যবিভাগে ৮,০০০ বৃটীশ ও

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সৈন্য সংখ্যা

৪২,০০০ দেশীয়, বোম্বাই সৈন্যবিভাগে ৯,০০০ বৃটীশ ও ৪৫,০০০ দেশীয় সৈন্য ছিল ; মোট ২,২৯,০০০।

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস এইখানে বিবৃত করার কোনো প্রয়োজন নাই ; তবে সৈন্যদের মধ্যে এইরূপ বিদ্রোহ আরও দুই একবার সৈনিক-বিভাগে হইয়াছিল। ১৮০৬ সালে মান্দ্রাজের ভেলোরে ভীষণ রকমের বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। শববাহক ডুলিরা যেরূপ রঙের পাগড়ী পরে ইহাদিগকেও সেইরূপ পাগড়ী পরিতে হয়। এছাড়া ইংরাজ উচ্চ কর্মচারীগণ সাধারণ সৈন্যদের নিকট হইতে এত দূরে দূরে থাকিতেন যে তাহাদের সহিত কোনো প্রকার সহানুভূতির যোগ ছিল না। এই

বিদ্রোহ শেষে সংস্কার।

বিদ্রোহ ব্যতীত ১৮২৯ সালের সংস্কারের পূর্বে বর্মা সমরের পর আর একবার ছোট খাটো বিদ্রোহ হইয়াছিল। কিন্তু চরম বিদ্রোহ হইল ১৮৫৭ সালে। বিদ্রোহ দমনের পর দেশে শান্তি স্থাপিত হইল ; কোম্পানীর হাত হইতে বৃটীশ-রাজ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই পুনর্গঠনের ফলে দেশীয় সৈন্যদের সংখ্যা ও সম্মান উভয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হইল। দেশীয় সৈন্য শতকরা ৪০% হারে কমানো ও বৃটীশ সৈন্য শতকরা ৬০% হারে বাড়ানো হইল। এ ছাড়া ভারতবাসীকে ভবিষ্যতে গোলন্দাজ বিভাগে কাজ দেওয়া হইবে না ঠিক হইল ; কেবলমাত্র পার্বত্য-গোলন্দাজী বিভাগ ও হায়দ্রাবাদের দেশীয় সৈন্যদের গোলন্দাজী কাজ মজুত থাকিল। ভারতে মোট সৈন্য সংখ্যা হইল ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ইহার মধ্যে বৃটীশ সৈন্য ৬৫ হাজার ও অবশিষ্ট দেশীয়।

রুষ ও ভীতি সৈন্য-বৃদ্ধি

ইহার পর বিশ বৎসর পরে ভারত-সরকারের সম্মুখে এক নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সমস্যা ভিতরের বিপ্লবের নহে, বাহিরের আক্রমণের। কিছুকাল হইতে রুষীয়েরা মধ্য-এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার

করিতেছিল ও ক্রমে ক্রমে ভারতের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। ১৮৮৫ সালে এই সব লইয়া বৃটীশরাজের সহিত রুষ সরকারের বিবাদ ঘনাইয়া উঠিল এবং অনেকে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে এই বিবাদ বোধ হয় বিগ্রহে পরিণত হইবে। তখন আবার একবার ভারতের সৈন্য বিভাগের সংস্কার হয়। অনেক যুদ্ধ-বিমুখ জাতিকে এই সময়ে সৈন্য বিভাগ হইতে বাদ দেওয়া হয়। মান্দ্রাজের অনেক জাতি যুদ্ধ বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখাইত না বলিয়া তাহাদিগকে এইবার বিদায় দেওয়া হইল। পূর্বে এক 'কোর' (corps) বা বাহিনীর মধ্যে নানা জাতি ও বর্ণের লোক ভর্তি করা হইত এই সময়ে বর্ণ ও জাতিগত ভাগ অনুসারে সৈন্যগণকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়। অপরদিকে বৃটীশ সৈন্যের সংখ্যা সাড়ে দশ হাজারের উপর বাড়ানো হইল। ১৮৭৭ সালে বৃটীশ সৈন্যের সংখ্যা ৭১ হাজার ও দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার হইল; মোট ২, ২৬, ৬৮৪। পর বৎসরে সবদা রিজার্ভ সৈন্য রাখিবার জন্য আরও ২৫ হাজার সৈন্য বাহাল করা হইল।

দেশীয় রাজাদের সৈন্য বাহিনী গঠন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে দেশীয় রাজগণকে সাম্রাজ্য সেবা করিবার জন্য একটি বাহিনী গঠন করিতে অনুরোধ করা হয়। দেশীয় নরপতিরা বৃটীশরাজের এই আহ্বানে যথোচিত সাড়া দিয়াছেন; সমগ্র ভারতের করদরাজ্য সমূহে প্রায় ২১ হাজার সৈন্য এই কার্য্যের জন্য গঠিত হইয়াছে। দেশীয় আফিসারগণ তাহাদের শিক্ষাদান করেন। কিন্তু য়ুরোপীয় কর্মচারী-গণের উপর সমস্তের তদারকের ভার।

১৮৯১ সালের সংস্কার।

১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একজন জঙ্গীলাট বা Commander-in-Chief ছিলেন না; বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশে তিনজন পৃথক জঙ্গীলাট ছিলেন। ঐ বৎসরে সমগ্র ভারতের জন্য একজন জঙ্গীলাট নিযুক্ত হইলেন ও

তিনটি পৃথক্ ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি ব্যবস্থার অন্তর্গত সকলকে করা হইল। এ ছাড়া আভ্যন্তরিন ব্যবস্থার উন্নতি-সাধনে সরকারের দৃষ্টি পড়িল। ইতিপূর্বে দেশীয় সৈনিকদের বেতন ছিল সাত টাকা মাস। এই বৎসর হইতে ৯৲ টাকা মাস হইল। যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত তাহারা ১১৲ টাকা পাইত। রিজার্ভ সৈন্যদের বেতন ২৲ টাকা মাত্র ছিল; দুই বৎসরেরর মধ্যে দুই মাস তাহারা রণশিক্ষা লাভ করে। পঁচিশ বৎসর পরে তাহারা ৩৲।৩॥ হারে পেনশন্ পাইত।

১৯০১ সালে লর্ড কিচেনার ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তিনি ভারতীয় সৈনিকবিভাগের যুগান্তর সাধন করেন। কিচেনার সৈন্যাধ্যক্ষের ভার লইয়া যখন ভারতে আসিলেন তখন সৈন্যাধ্যক্ষের কর্তব্য ছিল বড়লাট ও তাঁহার সভার নির্দেশ মত কাজ করা। সেনাপতিদের লইয়া কোনোরূপ সঙ্ঘ ছিল না; বড়লাটের মন্ত্রীসভার সমর-সচিবের হাতে সমগ্র সৈনিক বিভাগের ভার একরূপ ছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ বড়লাটের সভার বিশেষ সভ্যরূপে সভায় উপস্থিত থাকিতেন; ব্যবস্থার ভার বা অন্য কোনো প্রকারের আধিপত্য তাহার ছিল না। তাহাকে সমর বিভাগের কোনো প্রকার পরিবর্তন করিতে হইলে মন্ত্রীসভার সমর সচিবের হাত দিয়া তাহা পেশ করিতে হইত। এইভাবে সমরবিভাগ ক্রমেই দুর্বল হইয়া আসিতেছিল। এ ছাড়া সৈন্য বিভাগ নিতান্ত সে-কেলে ধরণে হইয়া উঠিয়াছিল; সৈন্য শিবির দেশময় ছড়ানো অথচ বিপদের জায়গাগুলি তেমন দৃঢ় নয়। অধিবাসীগণকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে, তাহারা শান্তিপূর্ণ সুশাসনের অধীনে থাকিয়া সাধারণ নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে, সুতরাং দেশের মধ্যে মধ্যে সৈন্য রক্ষার প্রয়োজন নাই। জঙ্গীলাট বাহাদুর লর্ড কিচেনার সৈন্য বিভাগের সংস্কার আরম্ভ করিলে

লর্ড কিচেনার ও সৈন্য বিভাগ সংস্কার।

তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জনের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে। কর্জন মিলিটারী বিভাগের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না; কিন্তু অবশেষে বিলাতের কর্তৃপক্ষ কিচেনার প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন। এই নূতন ব্যবস্থানুসারে ভারতীয় সৈনিক বিভাগকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিকে অশ্ব, পদাতিক ও গোলন্দাজ দিয়া সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি দল যাহাতে স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধে যাইতে পারে এমনি-ভাবে এইবার গঠিত হইল। সৈন্যগণকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রুত লইয়া যাইবার ব্যবস্থা ও রসদপত্র যথানিয়ম সরবরাহ করিবার সুবন্দোবস্ত হইল। এ ছাড়া (১৯০৫) সালে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া সেইস্থলে মিলিটারী-সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল, জঙ্গীলাট বাহাদুর বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রণাসভার সদস্য হইলেন। লর্ড কিচেনার ভারতীয় সৈনিকদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করিলেন।

উত্তর-ভারতের সৈন্য-বিভাগ	হেড-কোয়াটার—মারী
১ম বাহিনী	„ পেশোয়ার
২য় „	„ রাবালপিণ্ডী
৩য় „	„ লাহোর
৭ম „	„ মিরাট
৮ম „	„ লক্ষ্ণৌ
বিশেষ ব্রিগেড—দেরা জাৎ ব্রিগেড়	„ বান্নু
„ „ কোহাৎ „	„ কোহাট
দক্ষিণ ভারতের সৈন্য-বিভাগ	„ পুণা
৪র্থ বাহিনী	„ কোয়েটা
৫ম „	„ মৌ (বর্মা)
৬ষ্ঠ „	„ পুণা

৯ম বাহিনী	হেড-কোয়ার্টার বাঙ্গালোর
বিশেষ ব্রিগেড	„ বোম্বাই
বর্মা বাহিনী	„ মান্দালে

কোম্পানীর আমলে ইংলণ্ডের সৈন্য এ দেশে কাজ করিত বলিয়া ভারতবর্ষকে রীতিমত অর্থ দিতে হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমভাগে প্রত্যেক হাজার লোকের একটি রেজিমেণ্টের জন্য দুই লক্ষ টাকা দিতে হইত। ১৭৮৮ সালে এই নিয়ম বদলাইয়া ফেলা হয় ও বিলাতে সৈন্য সংগ্রহ ও এ দেশে আনিবার ও পোষণ করিবার যাবতীয় খরচ ভারত-সরকারকে দিতে হইবে ঠিক হয়। ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক সৈন্যের খরচ বাবদ কোম্পানী ইংলণ্ডে প্রায় ১৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা গড়ে পাঠাইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের জন্য বিলাতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার কি ব্যবস্থা ও ব্যয় হয় তাহা আমরা 'আয়-ব্যয়' পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

বিলাতে সৈন্য-সংগ্রহে ভারতের ব্যয়।

ভারতে একই দল বৃটীশ-সৈন্য বরাবর থাকে না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক কাল থাকিলে সৈন্যদের কার্য্য করিবার শক্তি লোপ পাইবার সম্ভাবনা আছে; ইতিহাসে দেখা গিয়াছে পাঠান মুঘলদের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ জাতিও এদেশের জল মাটির গুণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজ ইতিহাস হইতে সেই শিক্ষা লইয়াছে। এখন গড়ে কোনো সৈন্য ভারতে ৫ বৎসর ৪ মাসের অধিক বাস করে না। নূতন নূতন দল ভারতে আসে ও ভালরূপ শিক্ষালাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। এইজন্য ভারত-সরকারের ব্যয় খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে ও ভারতের শিক্ষিত সমাজ এই ব্যয়কে অপব্যয়ের সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা বলেন দেশের লোকদের ভাল করিয়া রণ-শিক্ষা দিলে তাহারাই

ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে পারে, বাহিরের সৈন্যের প্রয়োজন সামান্যই হইবে।

ভারতবর্ষের এই বিপুল সৈন্যবাহিনীর জন্য বহুপ্রকার সামগ্রীর প্রয়োজন। বৃটীশ সৈন্যদের খাদ্য ও বর্তমানে দেশীয় সৈন্যদের আহার্য্য সংগ্রহ, যুদ্ধের ঘোড়া, গাড়ী ও কামানটানা ঘোড়া ও বহন কার্য্যের জন্য বৃষভ, অশ্বতর ও এইসব ভারবাহী জন্তুদের আহার্য্য সংগ্রহ, হাসপাতালের রোগীদের ঔষধ ও পথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বিবিধ বিভাগের কাজ খুবই বিপুল। তারপর ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ, বিছানা, তাবু, কিট্‌ব্যাগ্ নির্মাণের বন্দবস্ত করা; জুতা, ঘোড়ার সাজ, বন্দুকের গুলি-বারুদ, রাখার কেস্ প্রভৃতি বিবিধ জিনিস তৈয়ারী করবার অনেকগুলি বিভাগ আছে। এই দুই লক্ষ লোকের বেতন ও আহারাদির ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা একটা বড় রকম কাজ; প্রতিবৎসর প্রায় ২৫।৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, এই হিসাব রাখিবার জন্য মিলিটারী হিসাব বিভাগ আছে। সৈন্যদের চিকিৎসার ভার সরকারের উপর ন্যস্ত। লাহোর, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও রেঙ্গুনে সামরিক বিভাগের ঔষধ ভাণ্ডার আছে। যুদ্ধের জন্য অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, ষাঁড়, গরু প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন করিবার জন্য সরকারের একটি বিভাগ আছে। বৃটীশ সৈন্যদের জন্য অষ্ট্রেলিয়ান্ ঘোড়া আসে; দেশীয় সৈন্যেরা এদেশীয় ঘোড়াই ব্যবহার করে; কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেশী ঘোড়ার জাত খুব ভাল হইয়াছে এবং এই জাতের ঘোড়া অষ্ট্রেলিয়ান্ ঘোড়ার চেয়ে নানাবিষয়ে ভাল উৎরাইতেছে। দুর্গ, পথ, ব্রিজ, বাড়ীঘর নির্মাণ করিবার জন্য একদল ইঞ্জিনিয়ার আছেন।

সৈনিক বিভাগের বিভিন্ন ভাগ।

সমর-বিভাগের সংস্কার করিবার জন্য এক কমিটি বসিয়াছিল। এই

সভার সভাপতি ছিলেন লর্ড এশার। দুই জন ভারতবাসী (ইহাদের মধ্যে স্বর্গীয় স্যর কে, জি, গুপ্ত ছিলেন) এই কমিটির সভ্য ছিলেন। এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের সৈন্যবিভাগকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সামরিক বিভাগের অন্তর্গত করা; লণ্ডনের সমর-কর্তাদের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা ও ভারতের সৈন্যবাহিনীকে সর্বদা যুদ্ধের উপযুক্ত করিয়া রাখা। ইহাদের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু চারিদিকের ঘোর প্রতিবাদ হওয়ায় প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করা হয় নাই।

এশার (Esher) কমিটি ও রণবিভাগ সংস্কার

ইঞ্চকেপ কমিটি সমর বিভাগে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা কমাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিলাতের রণবিভাগ তাঁহাদের উপদেশ মত কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস তাহাতে ভারতের সামরিক বিভাগের শক্তি হ্রাস পাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন একটি করিয়া কোম্পানী বা সৈনিক দল গঠন করিবার অনুমতি পাইয়াছে; এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এইরূপ বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

সপ্তম ভাগ

আয়-ব্যয়

১। আয়-ব্যয়ের ইতিহাস

দেশের শাসন ও সংরক্ষণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা রাজ সরকারের প্রাপ্য। তাহাকে 'কর'ই বল বা 'খাজনা' বল, তাহা ন হইলে শাসন চলে না। এই কর বা খাজনা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছা প্রত্যেক প্রজা বা বাসিন্দাকে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দিতে হয়। প্রজার হিতের জন্য, গভর্ণমেণ্টের শক্তি ও মর্য্যাদ বজায় রাখিবার জন্য সরকারকে কর আদায় ও ব্যয় করিতে হয়। আমর নিম্নে ভারতের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সাধারণভাবে বিবৃ করিব ও পরে বিষয়ানুযায়ী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

কোম্পানী আমলের প্রথম দিকে আয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিা ব্যয় হইত না। রাজ্যরক্ষার জন্য বিপুল সৈন্য সর্বদা রক্ষা করিতে হই তা ছাড়া এক একটী যুদ্ধে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া যাইত সেদিবে দৃষ্টি বড় বেশী কেহ দিতেন না।

১৮৪৩ হইতে ১৮৭৫ সালের মধ্যে আটাইশ বৎসর সরকারের তহ বিলে টাকার ঘাটতি হয়, আর পনের বৎসর ব্যয়ের অপেক্ষা আয় বেশী হয়। এই বিপুল ব্যয় বহন করিবার জন্য সরকারকে সর্বদাই ধার করিতে হইত ও ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত জাতী ঋণ ৪০ কোটি হইতে ৬০ কোটিতে উঠে। এই টাকার সবই প্রায় রণ-বিভাগেই ব্যয়িত হয়

প্রথম দিকের কথা

তারপর সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে ইংরা

সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হয় এবং সেই অর্থ তাঁহারা ভারত-সরকারের তরফ হইতে ধার করেন। বৃটীশ পার্লামেণ্ট তাহা ধার করেন নাই। এই চারি বৎসরেই ৩০ কোটি টাকা ধার হয়। ইহা ভারতেরই জাতীয় ঋণ।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরকারে অতিবড় দুঃসময়ে মিঃ জেম্‌স্‌ উইলসন্‌ নামে একজন বিচক্ষণ অর্থনীতিজ্ঞ অর্থ-সচিব হইয়া আসেন।

অর্থ সচিব মিঃ উইলসন্‌

তাঁহার দ্বারা ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগে যুগান্তর সাধিত হয়। তিনি সমস্ত হিসাব বিভাগ সুব্যবস্থিত করেন; রণ-বিভাগের ব্যয় হ্রাস করিয়া দিলেন; ও অন্যান্য সকল দিকেই ব্যয় সঙ্কোচ করিলেন। এক রণ বিভাগেই ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা কম করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারই ব্যবস্থা ফলে এই অকুল সমুদ্রে কুল মিলিল, দুই বৎসরের মধ্যে হিসাব বিভাগ পরিষ্কার হইয়া গেল।

ইহার পর অর্থ, বিভাগের ইতিহাস নিয়ত জোয়ার ভাঁটার মত বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। দুর্বৎসরে সরকারের আয় কমিয়াছে, যুদ্ধের বৎসরে ব্যয় বাড়িয়াছে; আবার সুবৎসরে কিছুটা উদ্ধার হইয়াছে। এই টানাটানির মধ্যেও দেখা যায় রাজকোষের ধনাগার যেমন বাড়িয়াছে ধনব্যয়ও তেমনি বাড়িয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে জাতীয় ঋণ ও করভার।

এই সব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বাহাদুর Revenuee বা রাজস্ব ব্যতীত Taxatibn বা রাজকর গ্রহণ করেন। ১৮৬০ সালে সর্বপ্রথম

আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন

Income Tax বা আয়কর পাঁচ বৎসরের জন্য ধার্য্য করা হয়। ১৮৬৫ সালে আয়কর উঠাইয়া ও আমদানী বাণিজ্যশুল্ক শতকরা ১০ হইতে ৭½ টাকা কমাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর সরকারী সকল বিভাগ হইতে টাকার তাগিদ আসিতে লাগিল; সৈন্যদের ছাউনীর উন্নতির জন্য ১১ কোটি টাকা

প্রয়োজন হইল। এ ছাড়া ১৮৬৫—৬৭ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৮—৭০ সালে যুক্তপ্রদেশ ও রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই সব কারণে সরকারের প্রায় ৬ কোটি টাকার ঘাটতি পড়িল। সরকার তখন পুনরায় ১৮৬৮ সালে আয় বৃদ্ধির জন্য আয়কর প্রবর্তিত করিলেন ও অন্যান্য দিকেও কর বা রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন।

১৮৭০ সালে ভারত সরকার আর একটি বিশেষ কাজে হস্তক্ষেপ করেন। এযাবৎ সমস্ত রাজস্বই ভারতীয় রাজকোষে জমা হইত; সেখান হইতে প্রতিবৎসর বাজেটের সময় প্রত্যেক প্রদেশকে টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। কোথায় কত টাকা ব্যয়িত হইবে সে সম্বন্ধে কোনো নিয়ম না থাকায়, টাকা লইয়া রীতিমত কাড়াকাড়ি চলিত এবং লাটসভায় যে যত চেঁচাইতে পারিত তাহারই জয় হইত। লর্ড মেয়ো অর্থ-বিভাগের এই বে-বন্দোবস্ত দূর করিয়া দেন; তিনি প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনসরকারকে নির্দিষ্ট অর্থ দিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া তাহাদিগকে চালাইতে হইবে; প্রয়োজন হইলে কতকগুলি বিষয়ের উপর তাঁহারা Tax বা কর ধার্য্য করিতে পারিবেন। এইরূপে ভারত সরকার অনেকখানি দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এ ছাড়া stamp কর বাড়াইয়া, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশদ্বয়ের লবণকর বাড়াইয়া আয়ের কোঠা সচ্ছল করিয়া লওয়া হয়। ১৮৭২ সালে আয়কর পুনরায় উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৮৭০ সাম্রাজ্যিক ও প্রাদেশিক ব্যয় বিচ্ছেদ

সরকার একটু মাথা খাড়া করিতে না করিতেই বিহার ও দাক্ষিণাত্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; ইহাতে সরকারের প্রায় ১৬ কোটি লোকসান হইল। এ ছাড়া Exchange এর বাজারে গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় ভারতকে বিস্তর ক্ষতির মধ্যে পড়িতে হইল। আয়ের দশা এমন

দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ ও রাজস্ব সঙ্কট

শোচনীয় অথচ সরকার বিদেশী জিনিষের সস্তা আমদানীর সুবিধার জন্ত শতকরা ৭½ হইতে ৫ হারে শুল্ক কমাইয়া দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বেও শুল্ক কমাইয়া রাজস্বের ক্ষতি করেন। ফলে ১৮৭৩,-৭৬,-৭৭ সালে আয়ে ঘাটতি পড়িল।

ইহার পর (১৮৭৭-৮৩) স্যর জন ষ্ট্রাচি ও এভেলিন বেরিং (লর্ড ক্রোমার) নামে তুইজন বিচক্ষণ অর্থসচিব ভারতের আয়-ব্যয় বিভাগকে সংস্কার করেন। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো প্রাদেশিক সরকারের জন্ত নির্দিষ্ট অর্থধার্য্য করিয়াছিলেন; এইবার স্থির হইল যে কতকগুলি বিষয়কে প্রাদেশিক সরকারদের হাতে সমর্পণ করা হইবে। এই অবস্থাই বর্ত্তমান পর্য্যন্ত চলিতেছে। এ ছাড়া শুল্ক সম্বন্ধে অনেক নিয়ম কানুন এই সময়ে হয়; শেষ পর্য্যন্ত আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু এরূপ লোকসান সহ্য করা বেশী দিন সম্ভব হইল না। ইতি মধ্যে আফগান যুদ্ধের জন্য সরকারের প্রায় ১৬ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িল। ফলে ১৮৭৭,-৭৯,-৮০ সালে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের অঙ্ক বেশী হইল। কিন্তু পরের তিন বৎসর অবস্থা ভাল থাকায় কিছু টাকা সরকারের হাতে উদ্বৃত্ত রহিল।

আয় ব্যয়
১৮৭৭-৮৩

১৮৮৪—১৮৯১ সালের মধ্যে প্রথম বৎসর ভাল থাকিয়াই সরকারের অবস্থা পুনরায় খারাপ হইতে সুরু করিল। প্রথমতঃ Exchange (বা বিনিময়ে) টাকা কমিতে লাগিল। রুশের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় যুদ্ধের সরঞ্জামের জন্ত তুই কোটি টাকা ব্যয়িত হইল। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধে ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হইল। ইহাতেই ত' ব্যয় বৃদ্ধি শেষ হইল না। ইহার পর, মিলিটারী রেলপথ নির্মাণে, কেল্লা বানাইতে, সীমান্ত রক্ষা করিবার আয়োজনে, ব্রহ্মদেশের শাসন সংস্কারে ব্যয় বাড়িয়াই চলিল।

নূতন ব্যয় ও
নূতন কর

সুতরাং পুনরায় আয় বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন কর ধার্য্য করা হইল। তখন লবণের উপর ২৲ স্থানে ২॥০ কর হইল।

১৮৮৮—১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসর আর্থিক অবস্থা ভালই চলিল যদিও রণবিভাগে খরচ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিতেছিল।

১৮৯২,-৯৩,-৯৪ সালে Exchange পুনরায় কমিতে লাগিল। ভারত-সরকারের দুঃখের দিন দেখা দিল; আবার আয় বৃদ্ধির জন্য পূর্বে পরিত্যক্ত আমদানী শুল্ক (৫ হার) পুনঃপ্রবর্তিত করিতে হইল। প্রথমত বিলাতের কাপড়ের কলওয়ালাদের চাপে পড়িয়া ভারতসরকার বিলাতি কাপড়ের উপর কর ধার্য্য করেন নাই। কিন্তু টাকার টানাটানির জন্য বাধ্য হইয়া শুল্ক বসাইতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেশী মিলের কাপড়ের উপরও শুল্ক বসিল। এই সব শুল্ক হইতে সরকারের আয় হইল ৩ কোটি টাকা।

শুল্ক বৃদ্ধি

১৮৯৬—৯৭ ও ১৮৯৯—১৯০০ সালে ভারতে দুটি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকারকে যথাক্রমে ৭ কোটি ও ৯ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। ইহার উপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পার্বত্য জাতিদের সহিত লড়াইএ প্রায় ৫ কোটি ব্যয় হইয়া গেল। মোটের উপর দুই বৎসরে প্রায় ৭ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িল। মাঝে দুই বৎসরে দুর্ভিক্ষ থাকা সত্ত্বেও পরের বৎসরগুলিতে, সরকার কিছু টাকা বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন। আর কোনো নূতন কর ধার্য্য করিতে হয় নাই। ১৯০১—০২ সালে সরকারী কোষে প্রায় ৮ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে প্রায় ১৭।১৮ বৎসর সরকারী রাজ-কোষের অবস্থা একপ্রকার ভালই ছিল; দুই এক বৎসর ছাড়া প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই সরকারী তহবিলে উদ্বৃত্ত টাকা ছিল; এমন কি মাঝে

বিংশ শতাব্দীতে রাজকোষ সচ্ছল

কয়েক বৎসর উদ্বৃত্ত টাকা হইতে প্রাদেশিক সরকারের হাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহারা টাকা দিতে পারিয়াছিলেন।

রাজস্ব হইতে দেশের উন্নতির জন্য রীতিমত ব্যয় করিবার জন্য টাকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে ভারতের রাজকোষে ভীষণ ঘাটতি পড়িতেছে; এমন ঘাটতি পূর্বে কখনো পড়ে নাই।

যুদ্ধের পর পরিবর্তন

নূতন সংস্কারের ফলে অনেক ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৮—১৯ সালে ৬ কোটি টাকার ঘাটতি পড়ে; সে বৎসর তাহা শোধ হইল না। ১৯১৯—২০ সালে ঘাটতি হইল ২১ কোটি টাকা। এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ আফগান যুদ্ধ। ১৯২০—২১ সালে আফগান যুদ্ধের জের মেটে নাই; তা ছাড়া য়ুরোপের মহাসমর ব্যয় বাবদ পুরাতন ধার লইয়া সে বৎসরেও ঘাটতি পড়িল ২৬ কোটি টাকা! ১৯২১—২২ সালের বাজেটে দেখা গেল আয় ৩৪ কোটি টাকা কম্‌তি। মোট চারি বৎসরে ৯০ কোটি টাকা অভাব পূরণ করিবার সমস্যা ভারতসরকারের সম্মুখে দেখা দিল। এই টাকার অভাব পূরণ করিবার জন্য কিছু অর্থ ধার করা হইল ও কিছুটা (Fiduciary) খাদ্‌মিশানো টাকা পয়সার প্রচলন করিয়া মিটানো হইল। ১৯২২—২৩ সালের বাজেটে নূতন কর বাড়াইয়া ২৯ কোটি টাকা উঠাইবার প্রস্তাব হইল। তথাচ ২৪ কোটি টাকার ঘাটতি থাকিয়া গেল; এ ঘাটতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অশান্তির জন্য বাড়িবে বৈ কমিবে না বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় জানাইলেন।

দেশের লোক বাজেটের এ ব্যবস্থা দেখিয়া মহা চিন্তিত হইয়া পড়িল। কর সকল বিষয়েই বাড়িয়া চলিল। সমস্ত আমদানী মালের উপর শতকরা ১১ টাকার স্থলে ১৫ টাকা হারে শুল্ক বৃদ্ধি পাইল। দেশী কাপড়ের উপর শতকরা ৪ টাকা করিয়া, লোহালক্কড়ের উপর ২৷৲র জায়গায় ১০ টাকা, চিনি ১৫ টাকার স্থলে ২৫ টাকা ধরিলেন; এইরূপে

শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সরকার প্রায় ১৫ কোটি রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার আশা করেন। এ ছাড়া আয়কর বৃদ্ধি, ও লবণের ১॥০ মণ স্থলে ২॥০ মণ করিয়া ধার্য্য হইল। এই সমস্ত মিলিয়া সরকার ২৯ কোটি পাইবেন— তথাচ ২৪ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িল!

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থাপক সভা খুবই ভীত হইয়া পড়িলেন। কর যে বাড়িয়াই চলিয়াছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমদানী শুল্ক বাড়িলে সামগ্রীর দাম বাড়িবে, সে দাম জনসাধারণকেই দিতে হইবে; রেলের ভাড়া বাড়াইয়া আয় বৃদ্ধি হইল, সে বৃদ্ধিও সাধারণে দিল; পোষ্টাপিসের পোষ্টকার্ড খামের দাম বাড়িল, মনিঅর্ডার ভি-পির খরচ বাড়িল —সে বৃদ্ধিও লোকের উপর পড়িল; চিনির উপর শুল্ক বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়িল; সে চড়া দাম লোকেই দিল। মোট কথা নূতন নূতন কর যেমন ভাবেই ধার্য্য করা হউক তাহা জনসাধারণকেই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে দিতে হয়। ভারতসরকারের ব্যয় প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে ও ব্যয় চালাইবার জন্য করও বাড়িতেছে। এই ব্যয়ভার কমাইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা বিলাতের গেডিস্ কমিটির অনুরূপ এক Retrenchment কমিটি বা ব্যয়-সঙ্কোচন-সভা গঠন করেন। লর্ড ইঞ্চকেপ ইহার সভাপতি মনোনীত হন বলিয়া এই কমিটিকে সাধারণত ইঞ্চকেপ কমিটিও বলিত। ভারতের প্রাদেশিক শাসনবিভাগগুলিতে নিজ নিজ প্রাদেশিক ব্যয় কমাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল ও কোথায় কিরূপভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হইল। সাময়িক পত্রিকাদিতে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই এক বাক্যে রণ-বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিল। যেখানে আয় ১৪২ কোটি টাকা, সেখানে শান্তির সময়ে যুদ্ধের আয়োজনের

দর বৃদ্ধি

ব্যয় বৃদ্ধি

ইঞ্চকেপ কমিটি

ব্যয় ৬২ কোটি টাকার উপর। এ ছাড়া প্রতি বৎসরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জন্ম যে কত ব্যয় হইবে তাহার কোনো ইয়ত্তা নাই। দেশের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা তাহাদের এক্তিয়ারের অন্তর্গত অনেক বিষয়ের ব্যয় কমাইয়া দেন। অনেক বিষয়ের ব্যয় সংকোচ করিয়া ও কতকগুলি বিষয়ের আয় ভারত সরকারের হাতে দিয়া ব্যবস্থাপক সভা প্রায় ৯ কোটি টাকা ঘাটতি কমাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

ইঞ্চকেপ কমিটি মিলিটারী বা রণবিভাগে বিস্তর ব্যয় কমাইবার জন্ম বলিয়াছেন। এ বিষয়ে এখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। বিলাতের সমর-সচিবদের মত নয় যে ভারতের যুদ্ধ সজ্জার ব্যয় হ্রাস করা হয়। কিন্তু রণবিভাগের ব্যয় যে কমিবেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

২। প্রাদেশিক আয়-ব্যয়

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে পূর্বে ভারতীয় রাজকোষ ও প্রাদেশিক রাজকোষ বলিতে দুটি পৃথক্ ভাণ্ডার বুঝাইত না। একই ধনভাণ্ডারে সমগ্র দেশের অর্থ জমা হইত এবং সেই কেন্দ্র হইতে প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ প্রয়োজন মত টাকা পাইতেন। পূর্বেই বলিয়াছি প্রতি বৎসর বাজেট প্রস্তুত হইবার সময় টাকা লইয়া রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত।

১৮৭১ প্রাদেশিক আয়-ব্যয়

লর্ড মেয়ো ১৮৭১ সালে এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে প্রদেশের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। প্রাদেশিক শাসনের উপর পুলিশ, জেল, শিক্ষা, চিকিৎসা বিভাগের কিয়দংশ, পথঘাট, সরকারী ইমারত প্রভৃতি ছাড়িয়া

দিয়া বলিলেন যে ঐ সব বিষয়ের আয় তাঁহাদেরই প্রাপ্য ; তা ছাড়া কিছু নির্দিষ্ট টাকাও তাঁহারা পাইবেন। এ ছাড়া তাঁহারা ব্যয় সংকোচ করিয়া ও প্রয়োজনমত নূতন কর বসাইয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। এইরূপ প্রাদেশিক সরকারী আয় ও ব্যয়ের দুইটি ভাগ হইল ; (১) প্রাদেশিক তহবিল (Provincial fund) বা যাহা ভারত সরকার প্রদেশসমূহের জন্য দিলেন ; (২) স্থানীয় তহবিল (Local funds) যাহা প্রাদেশিক সরকার নিজ ব্যয়ের জন্য উঠাইবার জন্য অনুমতি পাইলেন।

কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের উপর যে কয়টি বিষয় অর্পিত হইয়াছিল সেগুলি হইতে আয় বৃদ্ধির আশা খুবই কম দেখিয়া ১৮৭৭—৮২ সালে কিছু ভূমিকর, সাধারণ শাসনভার, আইন আদালত প্রভৃতির ব্যবস্থা অনেকগুলি প্রদেশের উপর অর্পিত হইল। এ ছাড়া নির্দিষ্ট দানের উপর অন্যান্য রাজস্বের কিঞ্চিৎ ভাগ দেওয়া হইল। ইহাতে পূর্বের অনেক অসুবিধা দূর হইল বটে ; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুবিধা তখনো পাওয়া গেল না।

১৯১৯ সালের নূতন সংস্কারানুসারে সমগ্র রাজস্বের দুইটি ভাগ হয়। আফিম, লবণ, শুল্ক, দেশীয় রাজাদের কর, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, ট্যাকশাল (mint) মিলিটারীর আয় খাস ভারত সরকারের নিজস্ব, ইহার ব্যয় ও তাঁহাদের। এ ছাড়া হোমচার্জ, ঋণের সুদ ভারত সরকারকে দিতে হয়। ভূমিকর, আবগারী, ষ্ট্যাম্প ও অন্যান্য কর ভারতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে প্রায় আধাআধি ভাগ হয়।

১৯১৯ ভারতীয় ও প্রাদেশিক আয়ের পৃথকীকরণ

বন-বিভাগের আয় সম্পূর্ণ প্রাদেশিক। মোটের উপর প্রাদেশিক সরকারের আয়ের কোঠাগুলি খুবই আঁটিসাটি বন্ধ। ইহাদের নিজেদের খাব করিবার উপায় নাই। তবে নূতন কর বসাইতে হইলে ব্যবস্থাপক

সভা ভারত-সরকারের অনুমতি লইয়া উহা করিতে পারেন। প্রাদেশিক রাজস্বের অনেকখানি ভারতীয় সরকারের ব্যয়ের জন্ম দিতে হয়; নিজেদের ব্যয়ের জন্ম যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দেশের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেইজন্ম দেশীয় নেতারা বলেন প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকারও সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

আয়

কর দুইভাবে আদায় হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। চাষা যে জমি চাষ করে তাহার জন্ম জমিদারকে সে খাজনা দেয়, জমিদার সরকারকে রাজস্ব দেন। ভারতের শতকরা ৮০ জন লোক চাষী, সুতরাং সকলেই তাহারা কর দেয়। যাহার জমি নাই অথচ ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া আয় হয়, তাহাদের অনেককেই 'আয়কর' (Income Tax) দিতে হয়। এই দুইটি প্রত্যক্ষ কর বা Direct Tax। এ ছাড়া লবণ, আবগারী, কোর্ট-ফী প্রভৃতি ব্যবহার কালে পরোক্ষভাবে সরকারকে কর দিতে হয়। কর ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়।

প্রত্যক্ষকর—(১) ভূমিকর ও প্রাদেশিক রেট (২) আয়কর।

পরোক্ষকর—(১) শুল্ক (২) লবণকর (৩) আবগারী (৪) ষ্ট্যাম্প বা কোর্টফী (৫) রেজিষ্টারী।

বিবিধ আয়—(১) আফিমের চাষ ও বাণিজ্য (২) বনবিভাগ, খনির ইজারা ইত্যাদি (৩) করদরাজ্যের কর।

এতদ্ব্যতীত আরও বিবিধ উপায়ে রাজস্ব ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া থাকে, যেমন দেশীয় রাজাদের নিকট হইতে ঋণের সুদ; পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ; মুদ্রাযন্ত্র। কোর্ট ও জেল, পুলিশ, বন্দর ও পাইলট, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রভৃতি সাধারণ সিভিল শাসনবিভাগ হইতে সরকারের

আয় হয়। রেলওয়ে এখন সরকারী লাভের কারবার হইয়াছে; পয়োপ্রণালী ও জলসেচন হইতে সরকারের রাজস্ব বাড়িতেছে। সমর-বিভাগেও কিছু আয় আছে।

এতগুলি বিষয় হইতে যে আয় হইতেছে, তাহা পরোক্ষভাবে প্রত্যেক অধিবাসীকেই দিতে হইতেছে; লোকে চিঠি লিখিতেছে, রেলে চড়িতেছে, লবণ বা মদ খাইতেছে, কাপড় পরিতেছে, বিলাতী জিনিষ ক্রয় করিতেছে, প্রত্যেক বিষয়ে সে সরকারকে 'পরোক্ষকর' দান করিতেছে। যে 'প্রত্যক্ষকর' দিতেছে সেও সমভাবে এই সব 'পরোক্ষকর' দিতেছে।

৩। প্রত্যক্ষ কর

ভূমিকর

এখন আমরা ভারতবর্ষের রাজ্যশাসনের জন্য যে যে উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ হয়, তাহাই বর্ণনা করিব। সকল প্রকার করের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের প্রথম ও প্রধান আয় হইতেছে ভূমিকর বা রাজস্ব। নূতন শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত ভূমিকর ভারত-সরকারের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহা প্রাদেশিক সরকারের হস্তগত হইলেও, বহুল পরিমাণে ইহার আয় হইতে ভারত-সরকার ভাগ পাইয়া থাকেন। এক সময়ে ভূমিকর সরকারের প্রধান রাজস্ব ছিল—প্রায় অর্দ্ধেক আয় হইত ভূমি হইতে। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই সমগ্র

আয়ের শতকরা ৪০ হার ও যুদ্ধের পূর্বে শতকরা ৩০ হার মাত্র ভূমিকর হইতে উঠিয়াছিল।

ভারতের শিল্পবাণিজ্য উন্নতি লাভ করায় ও রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় অন্য নানাদিক হইতে আয় বাড়িয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশে এবং মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা ও আসামের কোনো স্থানে ভূমিকর প্রায় একপ্রকার বাঁধা আয়।

ভূমিকরের বৃদ্ধি

অন্যান্য স্থানে ভূমিকর মাঝে মাঝে ঝালাইয়া লওয়া হয়। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশে ত্রিশ বৎসর অন্তর, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে বিশ বৎসর অন্তর ভূমিকর নূতন করিয়া ফেলা হয়। আসাম ও ব্রহ্মদেশে অনেকখানি জমি পড়িয়া আছে বলিয়া ঐ দুই প্রদেশের বন্দোবস্ত একটু দ্রুত হয়। ১৮৭৬ সালে ভূমিকর ছিল ১৭ কোটি২৭ লক্ষ, ১৯০১ সালে ২৩,৯৯ লক্ষ, ১৯০৩—৪ সালে ২৫,২৭ লক্ষ, ১৯১৩—১৪ সালে ৩১ কোটি ও ১৯২২—২০ সালে সমগ্র প্রদেশের ভূমিকর হইতে প্রায় ৩৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ওঠে।

পূর্বেই বলিয়াছি নূতন সংস্কার অনুসারে ভূমিকর প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য। বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত একবার হওয়ায় সরকারের খুবই লোকসান হইতেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জমিদার-দের আয় প্রায় বার্ষিক ১৬ কোটি টাকা। কিন্তু বাংলার সরকার পাইয়া থাকেন মাত্র ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। চিরস্থায়ী বন্দবস্ত সম্বন্ধে অন্য পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই রাজস্বকে 'কর' Tax বা 'খাজনা' Rent বলিবেন তাহা লইয়া বহুকাল হইতে তর্ক করিয়াছেন। ভারতীয় জমি বন্দবস্ত সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বেডেন-পাউএল সাহেব ইহাকে 'কর' বলিয়াছেন ; তাঁহার মতে ইহা চাষীদের আয়ের উপর কর। জমি বন্দবস্ত পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে

ভূমিকর

বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। ভারতীয় ভূমিকর সম্বন্ধে পার্লা- মেণ্টের কোনো পাকা মতামত না থাকায় ও ইহার বৃদ্ধির ভার স্থানীয় শাসনকর্তাদের উপর থাকায় অনেক সময়ে প্রজাদের উপর করের ভাগ অযথারূপে বেশী করিয়া পড়ে। কর-বৃদ্ধি সম্বন্ধে পাকা লেখাপড় থাকিলে স্থানীয় কর্মচারীদের ভুলভ্রান্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর হয়; প্রজাদের আত্মোন্নতি করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি পায়।

সমগ্র ভারতের ভূমি-রাজস্ব কিরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহ নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	মোট টাকা	খরচা বাদে আসল মুনফা	
১৮৬১—৭৪	২০,২১ লক্ষ	১৭,৮৮ লক্ষ	গড়ে বার্ষিক
১৮৭৫—৯৮	২৬,৮৬ „	২৩,৩৬ „	„
১৮৯৮—১৯১৩	৩৩,৬০ „	২৮,০৫ „	„
১৯১৪—১৯২০	৩৫,২৬ „	২৯,০১ „	„

এই রাজস্ব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জনপ্রতি কিরূপ অসমভাবে পড়িয়াছে তাহা দেখা যাউক; বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত থাকায় ও খাজনা বৃদ্ধি না করিতে পারায় এখানে অধিবাসীদের মাথাপিছু ভূমিকর সকল প্রদেশ হইতে অল্প।

নিম্ন ব্রহ্মদেশ	৫৶৩
উত্তর ব্রহ্মদেশ	৩।৶৫
সিন্ধু প্রদেশ	২৸৶৩
বোম্বাই	২।৶৩
পঞ্জাব	২।৶০
যুক্ত প্রদেশ	১।১১
আসাম	১।৶০
বঙ্গদেশ	॥৵১

১৮৭০ সালের পূর্বে ভূমিকর ব্যতীত সামান্য দুই একটি সেস বা কর প্রাদেশিক শাসনবিভাগের অন্তর্গত ছিল। ঐ বৎসরে লর্ড মেয়ো যখন প্রাদেশিক শাসন-সরকারের জন্য কতকগুলি ব্যয় নির্দিষ্ট করিয়া অর্থভাণ্ডার পৃথক্ করিয়া দিলেন। সেই সময়ে কতকগুলি প্রদেশে কয়েকটি নূতন সেস্ বসানো হইয়াছিল। জলকর, পথকর প্রভৃতি কয়েকটি করের আয় এই খাতে জমা হয়। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে তহবিলে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকায় এই কর কমাইয়া দেওয়া হয়। ১৯২০ সালে এই খাতে মাত্র চারি লক্ষ টাকা আয় ছিল।

প্রাদেশিক কর

আয়কর

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় অর্থ ভাণ্ডারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়। সেই অভাব পুরণের জন্য সরকার বাহাদুর রাজস্ব বৃদ্ধির নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তার মধ্যে এই আয়কর স্থাপন একটি। ৫০০্ টাকার উপর যে ব্যক্তির আয় তাহাকে শতকরা ৪্ টাকা করিয়া কর দিতে হইত; অর্থাৎ যে ব্যক্তির আয় ছিল বার্ষিক ৫০০্ তাহাকে আয়কর দিতে হইত বছরে ২০্ টাকা। ১৮৬০ সালে প্রথম এই কর স্থাপিত হয়। সময়ে সময়ে কাহারা কি পরিমাণে আয়কর দিবে তাহার তালিকা পরিবর্তিত হইয়াছে ও ১৮৮৬ সালে যে তালিকা হয় তাহা যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ২০০০্ টাকার আয়ে টাকায় ৫ পাই, তার নীচে টাকায় ৪ পাই করিয়া দিতে হয়। জমীদার ও চাষীদের এই আয়কর দিতে হয় না; তাছাড়া গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী, আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষক প্রভৃতি সকলকেই এই কর দিতে হয়। ১৯০৬ সালে ৫০০্ টাকা হইতে ১০০০্ টাকার আয়ের উপর এই কর ধার্য্য

আয়কর স্থাপন

করা হইল। বিলাতে ১৬০ পাউণ্ড বা ২৪৮০৲ টাকার কম যাহার আয় তাহাকে এই কর দিতে হয় না। যুদ্ধের পূর্বে এই বিভাগ হইতে আয় ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা। ভারতবর্ষ যে কত দরিদ্র তাহা সহজেই বুঝা যায়; ত্রিশকোটি লোকের মধ্যে ১০০০৲ টাকার উপর বার্ষিক আয় এমন লোকের সংখ্যা যে কত কম তাহা এই সামান্য আয় কর হইতে বুঝা যায়। ইহার মধ্যে উচ্চ-সাহেব কর্মচারীরাও পড়েন।

১৯১৬ সালে যখন সরকার দেখিলেন যুদ্ধ সহজে থামিতেছে না এবং রাজস্ববৃদ্ধি না করিলে চারিদিকের খরচ চালানো অসম্ভব, তখন তাঁহারা পুনরায় আয়করের তালিকা বদলাইলেন। পূর্বে দুই হাজারের উপর যাহাদের বার্ষিক আয় ছিল তাহাদিগকে বার্ষিক টাকায় ৫ পাই দিতে হইত। নূতন বিধি অনুসারে ৫ হাজার আয়ের উপর টাকায় ৬ পাই, ১০ হাজারের উপর টাকায় ৯ পাই, ২৫ হাজারের উপর টাকায় ১ আনা কর সাব্যস্ত হইল।

১৯১৭ সালে পুনরায় অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা হয়। পূর্বোল্লিখিত করের উপর এই কর দিতে হইতেছে। ৫০ হাজার হইতে ১লক্ষ টাকা আয়ে টাকায় এক আনা, ১ লাখের উপর টাকায় ১½ আনা, ১½ লাখের উপর টাকায় দুই আনা, ২ লাখের উপর টাকার ২½ আনা ২½ লাখের উপর টাকায় ৩ আনা কর ধার্য হইয়াছে। বাড়তি আয়কর হইতে ১৯২১-২২ সালে সরকারী রাজস্ব হইয়াছিল ৭ কোটি ৭৭ লক্ষ।

আয়কর বৃদ্ধি

আয়করের তালিকা হইতে দেশের আর্থিক অবস্থা, ধনীর সংখ্যা ও ধনের অনুপাত প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আমরা জানিতে পারি। আয়করের বৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে তাহা আমরা নিম্নের তালিকা হইতে দেখিতে পাইব।

১৮৬১—১৮৭৪	বার্ষিক গড় আয়	৮ লক্ষ
১৮৭৫—১৮৯৮	”	

১৮৯৯—১৯১৩	বার্ষিক গড় আয়	১ কোটি	৯৫ লক্ষ
১৯১৪—১৯২০ (যুদ্ধ জনিত)	„	১০ „	৭০ „
১৯২১		১৮ „	৪৮ „
১৯২২		১৭ „	৯৯ „
১৯২৩		১৯ „	০৭ „
১৯২৪		১৮ „	২২ „
১৯২৫		১৬ „	২০ „

আয়করের তালিকা হইতে আমরা দেশের দারিদ্র্য কিরূপ তাহার আভাস পাই। ১৮৬১ সালে ২০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের লোককে আয়কর দিতে হইত; সমগ্র ভারতে ১৪০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন এই কর দিত অর্থাৎ ১৩৯ জনের বার্ষিক আয় দুই শতের কম অর্থাৎ মাসিক আয় ১৬৷৷০টাকার কম ছিল। ১৮৭২সালে নিয়ম হইল হাজার টাকার উর্দ্ধে যাহার আয় সে-ই আয়কর দিবে। দেখা গেল হাজারে মাত্র এক জন লোকের আয় ছিল হাজারের উপর। বার বৎসর পরে ১৮৯৮ সালে যখন আয়কর ৫০০৲ টাকার উপর ধার্য্য করা হইল তখন ৪৫১ জন লোকের মধ্যে মাত্র একজনকে আয়কর দিতে হইত। নিম্নে আমরা একটি তালিকা প্রদান করিতেছি; ইহাতে ১৯১৫ সালে যখন পুরাতন রেট্ অনুসারে হাজার টাকায় আয়কর ধার্য্য ছিল সেই অবস্থায়—ও ১৯১৮ সালে যখন করের হার পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও দুই হাজার টাকার আয়কর গৃহীত হইতেছে—এই অবস্থায় দুই শ্রেণীর করপ্রদায়ীদের অনুপাত প্রদত্ত হইতেছে।

ধনীর অনুপাত

প্রদেশ	১৯১৫—১৬ (১০০০৲ য় আয়কর) প্রদান করে	১৯১৮—১৯ (২০০০৲-য় আয়কর) প্রদান করে
বোম্বাই	৬৯১ জনে ১ জন	৩৯৭ জনে ১ জন

পঞ্জাব ও দিল্লী	৫৮৮ জনে ১ জন		৯১৫ জনে ১ জন	
বর্মাপ্রদেশ	৬৯৭	,,	১১১৬	,,
মান্দ্রাস	৭২৩	,,	১২১২	,,
আসাম	১০৫১	,,	১৬০৫	,,
উত্তর-পশ্চিম	১১৮৪	,,	১৯৮৩	,,
বঙ্গদেশ	৭৭৯	,,	১৯৮৮	,,
মধ্যপ্রদেশ, বেরার	৯১২	,,	২০১৭	,,
বিহার উড়িষ্যা	—		৩৮৯৭	,,

উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতে বোম্বাই প্রদেশে ৬৯১ জন লোকের মধ্যে এক জনের আয় ২০০০৲ টাকার উপর। ইহা বাণিজ্য ও মিল প্রধান প্রদেশ—তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে ধনীর অনুপাতে অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা অধিক। এবং বিহার-উড়িষ্যায় ৩৮৯৭ জন লোক খুঁজিয়া একজন পাওয়া যায় যাহার বার্ষিক আয় দুই হাজার টাকা।

আর একভাবে আয়কর-প্রদায়ীদের সংখ্যা ও অনুপাত দেখা যাক্। ১৯০৩ সালে বৃটীশভারতে প্রায় ২৪ কোটি লোকের মধ্যে ২ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের অর্থাৎ শতকরা একজন লোকের আয় ছিল বার্ষিক ২০০০৲ টাকার উপর। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার লোকের আয় ছিল দুই হাজার টাকার কম। ১৯১৯ সালে আয়কর দুই হাজার টাকার আয়ের উপর ধার্য্য হইল। ১ লক্ষ ৮৫ হাজার প্রদায়ীর মধ্যে ১ লক্ষ ২২ হাজারের আয় পাঁচ হাজারের কম।

ধনীর সংখ্যা

সমগ্র ভারতে লক্ষপতির সংখ্যা অগণিত নয়। চারিদিকে ব্যবসায় বাণিজ্য দেখিয়া অনেকের মনে এই ভূল ধারণা জন্মিতে পারে যে ভারতে লক্ষপতি অনেক। কিন্তু অবস্থা এই—

বৎসর	লক্ষাধিপতি	আয়কর	সমগ্র আয়করের অনুপাতে
১৮৯৮	২৩৩ জন	১৬ লক্ষ	৮.৩%
১৯০৩	২৪৭ ,,	১৮ ,,	১০%
১৯১৯	১৩২৭ ,,	৭,৬৮ ,,	৫৩%
১৯১৯	২৮৭ ,,	৩,৪৯ ,,	৩০.৮%
	(পঞ্চলক্ষাধিপতি)		

১৯১৯ সালে আয়কর বৃদ্ধির কারণ, যুদ্ধের সময়ে বহু ব্যবসায়ী ও কোম্পানী অকস্মাৎ অত্যন্ত বড়লোক হইয়া উঠিয়াছিল। একথা সকলেই অবগত আছেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল ধনীরা কয়েক বৎসরের মধ্যে দেউলিয়া বা নির্ধন হইয়াছেন।

নূতন সংস্কারের পূর্বে আয়কর ছিল প্রাদেশিক শাসন বিভাগের প্রাপ্য। জেলার প্রধান কর্মচারী এই টাকা আদায় করিতেন। কিন্তু বর্তমানে উহা ভারত-সরকারের প্রাপ্য আয়।

আয়কর পরিদর্শন

১৯২২ সালের ইন্‌কম্ ট্যাক্স অ্যাক্ট অনুসারে প্রত্যেক জেলায় এই কর আদায়ের জন্য নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে, প্রদেশে প্রদেশে আয়করের পরিদর্শনের জন্য একজন কমিশনর আছেন। ভারত শাসনের অন্তর্গত একটি বোর্ড আছে Inland Revenue Board; ইহার প্রধান কর্তব্য আয়কর বিভাগ পরিদর্শন।

ইঞ্চকেপ কমিটির প্রস্তাবানুসারে ও ১৯২৪ সালের এক অ্যাক্টানুযায়ী বর্তমানে সেই বোর্ডটি শুল্ক, লবণ,আফিম প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় হইতে আয়ের পর্য্যবেক্ষণ করেন। (Vakil, p. 400).

৪। শুল্কের ইতিহাস

বাণিজ্যশুল্ক

দেশের আমদানী ও রপ্তানী মালের উপর যে শুল্ক সরকার ধার্য্য করেন তাহা কেবলমাত্র রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য, দেশের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা বা বিদেশের বাণিজ্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নয়। তাঁহারা বলেন, একপক্ষের লাভ আর একপক্ষের লোকসান হয়, এমন কোনো অভিপ্রায় এই বাণিজ্য শুল্ক স্থাপিত হয় নাই।

আমদানী শুল্ক দেশের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে আমদানী সামগ্রীর দামের শতকরা ৫৲ টাকা হারে শুল্ক দিতে হইত। তারপর বৃটীশ পার্লামেণ্টের হাতে ভারত শাসনের ভার যখন অর্পিত হইল তখন ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; সেই সময়ে জিনিষ বুঝিয়া শুল্ক শতকরা ১০ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হয়। ১৮৭৫ সালে শুল্ক কমাইয়া পুনরায় ৫৲ টাকা করা হয়। এই সময়ে ভারতের দেশীয় কাপড়ের মিলগুলি উন্নতি আরম্ভ করিতে থাকিলে ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টারের কল-ওয়ালারা তাহার উপর শতকরা ৫৲ টাকা কর দিতে হইত। অবশেষে ১৮৮২ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট সমগ্র আমদানী শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজস্বের খুব ক্ষতি হইতে লাগিল। লবণের উপর মণ প্রতি ২৲ টাকা কর এই বৎসর ধার্য্য হওয়াতে শুল্ক বন্ধের ক্ষতি উস্থল হইল। ১৮৯৫ সালে ভারত সরকার নিরুপায় হইয়া পুনরায় শতকরা ৫৲ টাকা করিয়া শুল্ক বসাইলেন, তবে বিলাতী সূতা ও কাপড় চোপড়ের উপর শুল্ক রদ হইল। কিন্তু রাজস্বের অবস্থা এই সময় খুব অসচ্ছল হওয়ায় সরকার নূতন আয়ের জন্য চারিদিকে হাত বাড়াইতে লাগিলেন।

ও অবশেষে পুনরায় কাপড় চোপড়ের উপর শতকরা ৩½% টাকা হারে শুল্ক বসাইলেন, সেই সঙ্গে দেশীয় মিলের উৎপন্ন কাপড়ের উপর ও ৩½ টাকা করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য হইল। দেশীয় তাঁতিদের কাপড় ইহা হইতে বাদ পড়িল। দেশীয় মিলের উপর এই কর ভারতে অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল।

১৯১৬ সালে বিদেশী সমস্ত আমদানী জিনিষের উপর সাধারণভাবে শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়; সেই সময়ে বিদেশী কাপড়ের উপর ৭½ টাকা শুল্ক হয়; ভারতীয় মিলের উপর পূর্বের ন্যায় ৩½ থাকিল। যুদ্ধের সময়ে এই শুল্ক তালিকা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করায় সরকারের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে শুল্ক হইতে আয় গড়ে ৯ কোটি টাকা ছিল; ১৯১৬-১৭ সালে ১৩ কোটি টাকা, '১৮-১৯ সালে শুল্ক হইতে ১৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমদানী শুল্ক হইতে ১৩ কোটি ৫৭ লক্ষ; রপ্তানী শুল্ক হইতে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ও ভারতের বয়নশিল্প হইতে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ আয় হয়। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি যে ভারত-সরকারের যখনই টাকার ঘাটতি পড়িয়াছে তখনই তাঁহারা শুল্ক বৃদ্ধি বিষয়ে মন দিয়াছেন। ১৯২১-২২ সালের ঘাটতি ভরাইবার জন্য সরকার আমদানী সামগ্রীর উপর ৭½ হার হইতে ১১ হারে কর বৃদ্ধি করিলেন। চিনির মূল্য শতকরা ১০ হইতে ১৫ টাকা হারে বাড়িল; সিগারেট প্রভৃতি উপর শতকরা ৫০৲ কর ধার্য্য হইল। এ ছাড়া আরও অনেক পরিবর্তন করিয়া বহু কোটি টাকা আয় হইল। ১৯২২-২৩ সালে পুনরায় শুল্ক বৃদ্ধি হইল। সাধারণ সামগ্রীর শুল্ক শতকরা ১১ হারের স্থানে ১৫ হার হইল; দেশীয় মিলের কাপড় ও সূতার উপর শুল্ক ৩½ স্থলে ৭½ হইল। চিনির শুল্ক ১০ স্থলে ২৫ হইল। এই সব উপায়ে সরকারের প্রায় ৪৫ কোটি টাকা আয় শুল্ক হইতেই হইল।

শুল্ক বৃদ্ধি হওয়াতে সরকারের আয় বৃদ্ধি হইল; কিন্তু পরোক্ষভাবে ভারতের প্রত্যেক বাসিন্দা এই টাকা যোগাইয়াছে। অধিকাংশই লোকে একই কালে কাপড় পরে, চিনি খায়, ঔষধ ব্যবহার করে, রেলে চলে। সুতরাং একই ব্যক্তি চিঠি লেখার সময়ে দ্বিগুণ দামে খাম পোষ্টকার্ড কিনিয়া সরকারকে টাকা দিয়াছে, চিনি খাইয়া, ঔষধ খাইয়া শুল্কের টাকা জোগাইয়াছে। মালপত্র আনাগোনায় লোকে বেশী মাশুল দিয়াছে, রেলে চলিয়া যাইতেও বেশী ভাড়া দিয়াছে। সকল প্রকারে সকল বিষয়ে লোকে পরোক্ষভাবে কর দিয়াছে।

কাঁচামাল রপ্তানীর উপর সামান্য কর আছে; চালের উপর মণপ্রতি তিন আনা, চায়ের উপর পাউণ্ড প্রতি সিকি পাই করিয়া শুল্ক ধার্য্য আছে; চায়ের শুল্ক হইতে যে আয় হয় তাহা চা-বাগিচার উন্নতির জন্য দেওয়া হয়; সাধারণ তহবিলে যায় না।

এদেশে আমদানী ইংলণ্ডের প্রস্তুত কাপড় ও সুতার উপর শুল্ক লইয়া বিবাদ ও বিতর্কের ফলে ভারতের বয়নশিল্প কি পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা একটু পরেই দেখিব। ভারতের চিনির কারবারও অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার ফলে উৎসন্ন গিয়াছে। ১৮৯০ সাল হইতে অষ্ট্রিয়া ও জারমেনী হইতে বীট্ চিনির রপ্তানী বাড়িতে আরম্ভ করে। তাঁহারা রপ্তানী মালের উপর সরকার হইতে একটা টাকা দিতেন, দেশের মধ্যে চিনির উপর কর চাপাইয়া প্রথম সরকার প্রদত্ত টাকাটা উঠাইয়া লইতেন ও বিদেশী চিনির উপর ভীষণ শুল্ক চাপাইয়া বন্দরে চিনি আসা এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিলেন। ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের অবাধ-বাণিজ্য-নীতি মানিয়া লইতে হইয়াছে; তাহার ফলে দেখিতে দেখিতে আখের চাষ ও চিনির কারখানা কমিতে লাগিল। ভারত-সরকার চিনির উপর শুল্ক পাইলেন কিন্তু তেমনভাবে দৃঢ় চিত্তে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

চিনির কারবার ও শুল্ক

করিলেন না ; ফলে ভারতের চিনির ব্যবসায় প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও বিদেশী চিনি এখন একচেটিয়া বিক্রয় হইতেছে; অবশ্য ইহাতে রাজকোষে শুল্ক বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু দেশে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

অন্যান্য বিষয়ে সরকারের শুল্কনীতি কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। তাঁহাদের মতে শুল্কনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য রাজস্ববৃদ্ধি; ইহার মধ্যে সংরক্ষণ বা অবাধ-বাণিজ্য-নীতির কথা নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় নাই। ভারত-সচিবকে বহুবার ম্যানচেষ্টার কলওয়ালাদের চাপে ভারতের উপর শুল্ক উঠাইয়া দিতে হইয়াছে; অথবা ভারতের দেশীয় মিলের উপর কর চাপাইতে হইয়াছে। অবাধ-বাণিজ্য-নীতি ভারতের উপর চাপানো হইয়াছে; সংরক্ষণ বা সরকারী সাহায্য দানের দ্বারা ভারতের শিল্পকে রক্ষা করার চেষ্টা হয় নাই। নূতন সংস্কারে ভারতের ব্যবস্থাপক সভার উপর রাজস্ব বিষয়ক কিছু ভার অর্পিত হইয়াছে।

বস্ত্র শুল্ক

বর্তমানে বস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে প্রতিযোগিতা তাহা কলের সঙ্গে কলের। নানা কারণে এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মিলসমূহ তাহাদের বিলাতী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু বাণিজ্য ইতিহাসের গোড়া হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত হাতে চলা তাঁতের সঙ্গে—বিলাতের হাতে-চলা তাঁত পারিয়া উঠে নাই—এমন কি নানা অনুকুল ঘটনার সংযোগ না হইলে বিলাতের মিলও পারিয়া উঠিত কি না সন্দেহ।

বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের শিল্প-ইতিহাসে মহাপরিবর্তন ঘটে। বিলাতে অনেকগুলি কলকব্জা ও ষ্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কৃত হইল।

এই সকল আবিষ্কারের ফলে বিলাতের ও পরে সমগ্র য়ুরোপের সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যে যে পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধিত হয় তাহা এখানে বিবৃত করিবার বিষয় নয়। ষ্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে হাতের তাঁত কলে চলিতে লাগিল। একটা জিনিষের জায়গায় দশটা জিনিষ প্রস্তুত হইতে লাগিল ও ভারতে বিলাতীমাল চালান সুরু হইল। ভারতীয় শিল্পের অধোগতি আরম্ভ হইল। ১৮১৩ সালেও কলিকাতা হইতে লণ্ডনে প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সূতার জিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৩০ সালে বাণিজ্যের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে—কলিকাতায় লণ্ডন হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের সূতার মাল আমদানী হইল। ১৮২৩ সালে প্রথম এ দেশে বিলাতী সূতা আমদানী হয়; ইহার পূর্বে ভারতবর্ষ কখনো বিলাতী সূতার মুখ দেখে নাই; এখন মিলের জন্য মিহি সূতা অধিকাংশ বিলাত হইতে আসে। গত এক শত বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যে এই যুগান্তর সাধিত হইয়াছে।

কোম্পানীর আমলে ইংলণ্ডের লোকে বিশ্বাস করিতেন নিজেদের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাহিরের প্রতিযোগিতা সহ্য করা অন্যায়। সেইজন্য বিলাতের কোনো শিশু-শিল্প বাড়িতে চেষ্টা করিলে আমদানী জিনিষের উপর তাহারা অত্যন্ত বেশী শুল্ক বসাইয়া দিতেন; বিদেশী বণিকেরা বেগতিক দেখিয়া তখন নূতন বাজারের চেষ্টায় চলিয়া যাইতেন। তখনো ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিষয়ে অবাধ-নীতি প্রচার হয় নাই;—যে যেমনভাবে যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবে—এই নীতির নাম অবাধ-বাণিজ্য-নীতি (Free Trade.)। ইংলণ্ড সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়া স্বদেশের বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রীর উপর শুল্ক বসাইলেন। কলিকাতায় আমদানী বিলাতী মালের উপর শুল্ক ছিল শতকরা ২½ টাকা, কিন্তু বিলাতে ভারতীয় কাপড় চোপড়ের উপর এত

ইংলণ্ডের সংরক্ষণনীতি

বেশী শুল্ক চাপানো হইল যে ব্যবসায় করা কোনো রকমে পোশাইল না।

শতাব্দী পূর্বের প্রতিযোগিতার ফল

ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিলাতে ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানী প্রথমে কমিতে লাগিল ও আরও কিছু কালের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেল। এই প্রতিযোগিতার ফল কি হইল তাহা নিম্নের আমদানী রপ্তানীর হিসাব হইতে দেখা যাইবে।

	ভারত হইতে রপ্তানী কাপড়	ভারতে আমদানী কাপড়
১৮১৪	১২,৬৬,০০০ খণ্ড	৮,১৮,০০০ গজ
১৮২১	৫,৩৪,০০০ "	১,৯১,৩৮,০০০ "
১৮২৮	৪,২২,০০০ "	৬,২৮,২২,০০০ "
১৮৩৪	৩,০০,০০০ "	৫,১৭,৭৭,০০০ "

এইরূপ প্রতিযোগিতা উভয় দেশের মধ্যে বহু দিন চলিতে পারে না। এ দেশীয় তাঁতিরা তাঁত বন্ধ করিয়া কৃষি আরম্ভ করিল, রেশমের কারিগরও তাহার সমব্যবসায়ীর পথ অনুসরণ করিল। দিন যতই যাইতেছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একা ইংরাজ বণিক ছাড়িয়া জার্মান ফরাশী প্রভৃতি শত জাতির সঙ্গে হইতেছে—দেশীয় শিল্পীরা এক কোটা হইতে আর এক কোটা এবং সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া এখন মৃত্তিকার শরণাপন্ন হইতেছে।

ইংলণ্ডের অবাধ বাণিজ্য-নীতি

কোম্পানীর হাত হইতে যখন ভারতশাসনের ভার পার্লামেণ্টের হাতে পড়িল—তখন ইংলণ্ডে সংরক্ষণ-নীতির দিন চলিয়া গিয়াছে। অবাধ-বাণিজ্য-নীতি তখনকার দিনের অর্থনীতিজ্ঞদের মূলমন্ত্র। ভারতেও সেই অবাধ-বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তিত হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে কোম্পানীর

রাজত্বকালেই আমদানী সামগ্রীর উপর শতকরা ৫% টাকা হারে শুল্ক ছিল। বিলাতে সে-সময়ে পূর্বের যুগের অসম্ভব বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়া গিয়াছিল; তখন আর সেখানে শিল্পজাত সামগ্রী লইয়া বড় কেহ উপস্থিতও হইত না। ভারতবর্ষ বহু পূর্বেই প্রতিযোগিতায় হার মানিয়াছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরকারের অর্থাভাব হইল—নূতন বিলিবন্দবস্তে অনেক টাকার ব্যয়। সেই জন্য নূতন অর্থাগমের উপায় স্বরূপ ১৮৬০ সালে বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধি করা হইল। সাধারণত শতকরা ১০ টাকা হারে ও কোনো কোনো সামগ্রীর উপর ২০ টাকাও শুল্ক বসানো হইল। ১৮৭৫ সালে সমগ্র আমদানী মালের মূল্যের উপর শুল্ক কমাইয়া ৫% করা হইল।

ভারতের বাণিজ্য শুল্ক (Custom Duties)

ইতিমধ্যে ভারতের দেশীয় কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেগুলি ধীরে ধীরে মাথা খাড়া করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালারা ভারতবর্ষ ও আমেরিকা হইতে তুলা জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়া সেখানে বস্ত্র বয়ন করিয়া পুনরায় ভারতে আনিয়া বিক্রয় করিত। তাঁহারা দেখিলেন ভারতের কলওয়ালাদের তুলা ঘরের কাছে বোম্বাইতে পাওয়া যায়; তাহাদের জাহাজ ভাড়া করিয়া তুলা আনিতে হয় না। দ্বিতীয়ত ভারতের শ্রমজীবিদের মজুরী বিলাতের অন্দাজে খুব কম। তৃতীয়ত কাপড় তৈয়ারী হওয়ার পর পুনরায় বিলাত হইতে আনিবার ব্যয় ভারতীয় মিলগুলির লাগে না। এই সব কারণে ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালারা আমদানী মালের উপর যে ৫৲ হারে শুল্ক ছিল তাহাকে সংরক্ষণ-নীতির সহায়ক বলিয়া নির্দেশ করিলেন ও তাহাও উঠাইয়া দিয়া ভারতে যাহাতে বিনাশুল্কে সূতা কাপড় আসে তদ্রূপ আদর্শে অবাধ-নীতি স্থাপন

দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উপর শুল্ক

করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। ১৮৭৯ সালে অনেকগুলি জিনিষের উপর হইতে বাণিজ্য-শুল্ক রদ হয়। কিন্তু ইহার ফলে ভারত-সরকারের রাজস্ব প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা কমে। এই সঙ্গে অনেকগুলি জিনিষের উপর রপ্তানী শুল্ক উঠিয়া গেল ও বিদেশে ভারতীয় কাঁচা মাল পূর্বাপেক্ষা আরও সস্তায় চালান হইতে থাকিল। ভারত-সরকার শুল্ক উঠাইতে একটু দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন বলিয়া তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড সেলিসবেরী খুব ধমক দিয়া ১৮৭৫ সালে এক পত্র দিয়াছিলেন ও তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী যাহাতে বিলাতী সুতা-কাপড়ের উপর শুল্ক উঠিয়া যায় সে-বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহার সহকারী সচিবকে ভারতে পাঠাইলেন। ভারত-সরকার বিলাত হইতে ভারত-সচিবের তরফ হইতে এদেশীয় আয়ব্যয় বিষয়ে এতটা গায়ে পড়িয়া জোর করার কোনো পূর্বনজির নাই বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তাহাতে ভারত-সচিব সেলিসবেরী বিচলিত হইলেন না। তিনি ১৮৭৬ সালে লিখিয়া পাঠাইলেন যে শুল্ক উঠাইবার প্রশ্নে ক্রেতা, বিক্রেতা বা রাজস্বের যে কোনো ক্ষতি হউক, ভারতের স্বার্থের জন্য এই দণ্ডেই শুল্ক উঠিয়া দেওয়া দরকার!

১৮৭৯ আমদানী শুল্ক ও রপ্তানী শুল্ক

এই সময়ে লর্ড লীটন বড়লাট হইয়া আসিলেন। তাঁহার সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হইল। অধিকাংশ সদস্য ভারতের রাজস্বের ক্ষতিতে ভদ্রতার খাতিরে, এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু বড়লাট সকল সদস্যকে অগ্রাহ্য করিয়া 'রাজ্যের কল্যাণে'র জন্য নিজ মত চালাইবার শক্তিবলে আইন পাশ করিলেন। বিলাতে ইণ্ডিয়া অপিসেও সেইরূপ ঘটিল। ভারত-সচিব তাঁহার casting vote দিয়া এই আইন পাশ করিলেন। ১৮৭৯ সালের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্সে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল "The Indian import

duty on cotton goods, being unjust alike to the Indian consumer and the English producer, ought to be abolished ; and this House accepts the recent reduction in those duties as a step towords their total abolition, to which Her Majesty's Government are pledged" (Quoted from Vakil p. 421.)

১৮৮২ সালে লর্ড রিপণের শাসনকালে লবণ ও মদ্যাদি ব্যতীত বাদ-বাকি সামগ্রীর উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইল। তারপর বারো বৎসর আর কোনো সামগ্রীর উপর বিশেষভাবে শুল্ক ধার্য্য করা হয় নাই ; সে-কয়েক বৎসর ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল বলিয়া প্রকাশ।

১৮৮২ শুল্ক রদ

১৮৯৪ সালে রূপার দাম কমিয়া সোনারূপার বাজারে একটা ভীষণ বিপ্লব হইয়া গেল। টাকার দাম কমিয়া যাওয়াতে সরকারের খুব অর্থের টানাটানি হইল—এ ছাড়া নানা কারণে সৈনিক-বিভাগের খরচ বাড়িয়া চলিয়াছিল। ১৮৯৪-৯৫ সালের বাজেট বা আয়-ব্যয়ের খসড়া করিতে গিয়া দেখা গেল ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার অভাব। এই অভাব দূর করিবার জন্য পুনরায় আমদানী-শুল্ক বসানো হইল। সাধারণ সামগ্রীর উপর ৫৲ টাকা হারে ও ইস্পাত লোহার উপর এক টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হইল। বই, সোনা, কল-কব্জা, কাঁচামাল ও শস্য সামগ্রী ও সেই সঙ্গে বিলাতী সুতা ও কাপড় বিনা শুল্কে আসিবে ঠিক হইল। কিন্তু দেখা গেল যে ইহাতে বজেটের টাকা পুরিবে না। তখন পূর্ব্বের আইন সংশোধিত করিয়া বিলাতী কাপড়ের উপর পুনরায় ৫৲ টাকা হারে শুল্ক স্থির হইল। কিন্তু বিলাতের কাপড়ওয়ালারা বলিল যে তাহাদের কাপড়ের উপর

১৮৯৪ অর্থাভাব ও শুল্ক স্থাপন

১৮৯৬ দেশী কাপড়ের উপর শুল্ক

ভারতে শুল্ক বসিবে আর ভারতের কাপড় বিনা শুল্কে বাজারে চলিবে ভারত সরকারের এ প্রকার অন্যায় সংরক্ষণ-নীতি আদর্শ অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং ভারতের কলে ২০ নম্বরী সুতার কাপড়ের উপর ৫৲ টাকা হারে শুল্ক সাব্যস্ত হইল। ২০ নম্বরী সুতার নীচে কাপড় বিলাতের কলে তৈয়ারী হইত না বলিয়া তাহার উপর কোনো কর বসানো হইল না। তৎকালীন ভারতের রাজস্ব-সচিব এই বিল প্রবর্তিত করিতে গিয়া বলেন যে ইহার মূল কথাগুলি পার্লামেণ্ট ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপর চাপাইয়াছেন—তাহা না হইলে হাউস অব্ কমন্স কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। ইহার পর এযাবৎকাল এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। অনেক অপ্রিয় কথার আলোচনা, অনেক বাদবিবাদ চলিয়াছে। ১৮৯৬ সালে ঠিক হইল ভারতে সকল প্রকার সুতা—তাহা বিলাতী হউক বা দেশী মিলে প্রস্তুত হউক—বিনা শুল্কে বাজারে চলিবে। আর বিদেশী আমদানী কাপড় ও দেশী কলের তৈয়ারী কাপড়ের উপর ৩½ টাকা হারে শুল্ক দিতে হইবে। বিলাতী সুতার শুল্ক বন্ধ হওয়াতে সরকারী আয় প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা কমিল; কিন্তু দেশী কাপড়ের উপর নূতন শুল্ক হইতে ১৯০১ সালে সরকারের প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা লাভ হয়।

এই শুল্ক স্থাপনের পর দেশী কলওয়ালাদের খুব অসুবিধা হইতে লাগিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে চীনে বিদ্রোহ হওয়াতে এবং নানারূপ গোলযোগ বাঁধাতে সেখানে ভারতীয় কাপড় রপ্তানী হ্রাস পাইল; তা ছাড়া জাপান আসিয়া কাপড়ের বাজারে পূর্বসাগরে ভারতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করিল। এমন সময়ে ১৯০৫ সালে বঙ্গচ্ছেদের ব্যপদেশে বঙ্গদেশে

বঙ্গচ্ছেদ ও বস্ত্রশিল্পের রক্ষা

স্বদেশী-আন্দোলন দেখা দিল; প্রথমে 'বয়কট' বা বিলাতী জিনিষ

বর্জনের জন্য লোকের উৎসাহ হয় ; কিন্তু ক্রমে উহা স্বদেশী-আন্দোলনে পরিণত হইল এবং সেই হইতে দেশীয় কাপড়ের কলের শুভ দিন দেখা দিল। ১৯০৫ সালে ভারতে ১৯৭টি কল ছিল—পর বৎসরের মধ্যে আর ২০টি নূতন কল স্থাপিত হইয়াছিল। তারপর যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত নূতন নূতন কাপড়ের কল প্রায় প্রতি বৎসরেই স্থাপিত হইয়াছে। আট বৎসরে ৭৫টি নূতন কল হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে ২৭২টির স্থানে ২৬০টি কল হইয়াছিল—অর্থাৎ ৯টি কল কমিয়াছিল।

১৯২৬ সালের শেষাশেষি হইতে ভারতের কাপড় কলের দুর্দিন স্বরু হইয়াছে। জাপান স্বদেশে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে, ও ভারতে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা পাইয়া, সস্তায় কাপড় আনিয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। টোকিও হইতে কলিকাতায় মাল আনিতে যে খরচ পড়ে, ভারতের রেলপথের ভাড়া অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোম্বাই হইতে কলিকাতায় মাল আনিতে খরচ তাহা অপেক্ষা অধিক পড়ে। তা ছাড়া জাপানী কোম্পানীরা দেশে নানা প্রকার সুবিধা পাইয়াছে, শ্রমজীবিদের কাজ কমানো সম্বন্ধে যে নিয়ম ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে, সে-সব নিয়ম জাপানে নাই ; তাহারা রাষ্ট্রের সাহায্যে, সংরক্ষণ-নীতির সাহায্যে, ভারতের অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া, শ্রমজীবিদের খাটাইয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে মাল প্রস্তুত করিতেছে ও বিদেশে চালান দিতেছে। বোম্বাই মিল সমূহের ভীষণ দিন আসিয়াছে। ১৯২৫ সালে দেশীয় মিলে প্রস্তুত কাপড়ের উপর শুল্ক উঠিয়া গিয়াছে।

লবণ শুল্ক

লবণের উপর শুল্ক ভারতে ইংরাজ আসিবার পূর্বেও ছিল। ভারতে চারি উপায়ে লবণ পাওয়া যায়। (১) পঞ্জাবের সল্ট পর্বত-শ্রেণী ও কোহাটের সৈন্ধব লবণের খনি (২) রাজপুতনার মধ্যস্থিত সম্বর হ্রদের লবণ (৩) গুজরাটের কচ্ছের

লবণের সরবরাহ

রণ হ্রদের পাশে জমাট-বাধা লবণ ও (৪) বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও সিন্ধুর মোহনায় সমুদ্র জলের লবণ।

পঞ্জাবের লবণ পাহাড়ে অফুরান্ত সৈন্ধব পাথর পাওয়া যায়। লবণের স্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর কাটিয়া এই লবণ তোলা হয়।

লবণ সংগ্রহের উপায়

রাজপুতনায় সম্বর হ্রদে বছরে নয়মাস কাজ চলে; বর্ষাকালে হ্রদে জল বাড়ে তখন কাজ করা যায় না। হ্রদের মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়া চৌবাচ্ছা বানানো হয়। সেই জলের উপর সরের মত করিয়া লবণ জমাট বাঁধে। কচ্ছের রণসাগরেও অনেকটা উপর্য্যুক্ত উপায়ে লবণ সংগ্রহ করা হয়। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে সমুদ্রের তীরে খাল কাটিয়া লোণাজল আনা হয় এবং সেই জল শুকাইয়া লোকে লবণ করে। ভারতের অধিকাংশ স্থলে এই লবণ ব্যবহৃত হয়। নদীবহুল বাংলাদেশের ভিজামাটিতে সমুদ্রের জল হইতে লবণ করা যায় না বলিয়া এখানে লিভারপুল, জারমেনী ও এডেন হইতে বিদেশী লবণের আমদানী অধিক।

ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক লবণ সরকারী লোকেরা তৈয়ারী করে। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক লাইসেন্স-প্রাপ্ত লোকে বা আবগারী বিভাগের

লবণ কর

তত্ত্বাবধানে হয়। লবণ গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া বলিয়া ইহার উপর শুল্ক আছে। ইহার উপরে শুল্ক থাকায় ধনী নির্ধন সকলকেই এই কর দিতে হয়। ১৮৮২ হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত লবণের কর মণ প্রতি ২॥০ টাকা ছিল। ১৯০০ সাল হইতে গোখলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই লইয়া খুব আন্দোলন চালাইতে থাকেন এবং তাঁহার চেষ্টার ফলে ঐ বৎসরে শুল্ক ২৲, ১৯০৫ এ ১॥০, ও পরে ১৯০৭ সালে ১৲ টাকায় পরিণত হয়। যুদ্ধের সময়ে ১৯১৬ সালে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য লবণের শুল্ক পুনরায় বাড়াইয়া ১।০ করা হয়। ১৯২৩ সালে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ভারত-সরকার পুনরায় লবণ কর

বাড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। ব্যবস্থাপক সভা ইহার প্রতিবাদ করেন ও সরকারী পক্ষ ভোটে পরাজিত হন। কিন্তু বড়লাট বাহাদুর বিলটি 'সার্টিফাই' করাতে উক্ত কর বাহাল হইল। লবণের শুল্ক হ্রাস বৃদ্ধির ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে যখনই লবণের দাম কমিয়াছে তখনই ইহার ব্যবহার বাড়িয়াছে। লবণ কর হইতে সরকারে কিরূপ আয় হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে।

১৮৫৬—১৮৭৫	গড়ে	৫	কোটি	৫০	লক্ষ
১৮৭৫—১৮৯৮	,,	৭	,,	৪০	,,
১৮৯৯—১৯১৩	,,	৬	,,	৬০	,,
১৯১৮—১৯২০	,,	৬	,,	৫০	,,
১৯২১—১৯২২	,,	৬	,,	৩৪	,,
১৯২২—১৯২৩	,,	৬	,,	৮২	,,
১৯২৩—১৯২৪	,,	১০	,,	২১	,,
১৯২৪—১৯২৫	,,	৭	,,	৩৯	,,

১৯২৩—১৯২৪ সালে খরচখরচা বাদে সরকারের লাভ হইয়াছিল ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

আবগারী

মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, ভাঙ, আফিম প্রভৃতি সকল প্রকার মাদক পদার্থ আবগারী বিভাগের অন্তর্গত। আফিম আবগারীর মধ্যে পড়িলেও আফিমকে পৃথক করিয়া ধরা হয়।

আবগারী বিভাগ

সরকার প্রতি বৎসর আবগারী বিভাগ হইতে বহু কোটি টাকা আয় করেন এবং এই আয় বরাবরই বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা দেখিয়া দেশের চিন্তাশীল লোকেরা খুবই ভীত হইয়া উঠিতেছেন; সরকার বলেন শুল্ক বৃদ্ধি করিলে লোকে মদ কম খাইবে।

কিন্তু যে-পরিমাণ মদ দেশে তৈয়ারী ও বিদেশ হইতে আমদানী হয় তাহা দেখিয়া কাহারও মনে হয় না যে এই অভ্যাস দেশমধ্যে কমিতেছে। ভূমিকরের পরেই সরকারের সবচেয়ে বেশী আয় আবগারী হইতে হয়। মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে লাইসেন্স লইতে হয় এবং প্রতিবৎসর সরকারকে সেজন্য টাকা দিতে হয়। দেশীয় ভাঁটি-দারেরা মদ চোলাইএর জন্য টাকা দেয়।

ভারতে মদ্যপানের প্রচার সাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া দেশীয় নেতারা উহা কমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কোনো চেষ্টাই এ পর্যন্ত কৃতকার্য হয় নাই। সরকার রাজস্বের জন্য এত ব্যস্ত যে তাঁহারা দেশের নীতি ও স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইবার অবসর পান না, এমন কি তাহার যৌক্তিকতাও স্বীকার করেন না। ১৯০৫ সালে ৭ই সেপ্টম্বর ভারতের রাজস্ব-সচিব লিখিলেন যে 'যাহারা সামান্য পরিমাণে মদ্যপান করে, তাহাদের অভ্যাসে আঘাত দিবার ইচ্ছা সরকারের নাই এবং একপ করা সরকার তাহার এক্তিয়ারের বাহিরে মনে করেন এবং যাহাতে সেই সব লোক মদ্য পায় তাহার ব্যবস্থা করা সরকারের কাজ। সরকারের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে যাহারা মদ্যপায়ী নহে তাহারা যাহাতে মদিরাসক্ত না হয় এবং যাহারা পান করে তাহাদের মধ্যে উহা অতিরিক্ত পরিমাণে যেন ব্যবহৃত না হয় সে-বিষয়ে সজাগ থাকা হইতেছে তাঁহাদের কর্তব্য, রাজস্ব বৃদ্ধি এই পলিসির অভিপ্রায় নয়।', সরকারের অভিপ্রায় যাহা হউক কার্যত দেখা যাইতেছে মদ্যপান দেশে বাড়িয়াছে; ঘাটে, বাজারে, মিল ফাক্টরীর কাছে মদের দোকান খুলিতে দেওয়ায় মদ সহজ-প্রাপ্য হইয়াছে।

বৃটীশ ভারতে ১৯১২—১৩ সালে লাইসেন্স-প্রাপ্ত মদের দোকান ৫৯,৯৮৬ ও গাঁজা ভাঙের দোকান ১৮,১৬৬ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ইহার বিক্রয় ছিল ১২ কোটি টাকার উপর। কিন্তু ঐ বৎসরের পর হইতে

সমগ্র ভারতে দোকানের সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু কয়েকটি প্রদেশে দশ বৎসরের মধ্যে বাড়িয়াছে যেমন—

	১৯১২—১৩	১৯২১—২২
বোম্বাই	৫৬০২	৬২০৭
আসাম	২৮৩	৩২৬

অন্যান্য প্রদেশে দোকান কমিয়াছে। ভাঙ ও গাঁজার দোকান ১৮,১৬৬ স্থানে দশ বৎসর পরে ১৯২২ সালে ১৬,-৬৭১ হইয়াছিল। গত ৬০ বৎসরে আবগারীর রাজস্ব কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেখা যাক্।

মদ্য বিক্রয়

গড়ে বার্ষিক			রাজস্ব			খরচা বাদে আয়		
১৮৬১—১৮৭৪	„	„	১ কোটি	১০	লক্ষ	১ কোটি	৯০	লক্ষ
১৮৭৫—১৮৯৮	„	„	৫ „	৭০	„	৫ „	৫০	„
১৮৯৯—১৯১৩	„	„	১৩ „	৩০	„	১২ „	৭০	„
১৯১৪—১৯২০	„	„	২০ „	৪০	„	১৯ „	২০	„
১৯২৪—১৯২৫	„	„	১৯ „	৫১	„			

১৯২৪—২৫ মদের দোকান ৪৪,৬৯৬ আয় ১৪,৩৩ লক্ষ

ভাঙ গাঁজার দোকান ১৪.৪২৫ ৪,৭৮ লক্ষ

মোট ১৯,২৪,৯০,৪৯১ টাকা

মাথা পিছু কর :—

১৯১৫—১৬ সালে ।।২ ; ১৯১৬—১৭ সালে ।।৶ ;
১৯১৭—১৮ সালে ।।৴৭ ; ১৯১৮—১৯ সালে ।।৵১১ ;
১৯১৯—২০ সালে ৸১ ; ১৯২০—২১ সালে ৸৮ ;
১৯২১—২২ সালে ।।৵৮ ; ১৯২২—২৩ সালে ৸১ ;
১৯২৩—২৪ সালে ৸৬ ; ১৯২৪—২৫ সালে ৸৬ ।

(Statistical Abstract, 4th Issue, p. 170—172)

ষ্ট্যাম্প আয়

সরকারের সঙ্গে কোনো কাজকর্ম করিতে হইলে বা আদালতে মোকদ্দমা করিতে হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই কাগজে ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হয়; কাজের গুরুত্ব বা টাকার পরিমাণ অনুসারে এই কোর্ট-ফি (Court Fee) কম বেশী হয়; কাহাকে রসিদ দিতে হইলে এক আনা, দলিল লিখিতে হইলে দুই আনা হইতে আড়াই টাকার কোর্ট-ফি আমরা সর্বদা দিয়া থাকি; এই প্রকার আরও অনেকগুলি বিষয়ে টাকা দিতে হয়। ইহা হইতে সরকারী আয় ১৯২৪—২৫ সালে ১৩ কোটি টাকার উপর হয়।

ষ্ট্যাম্প।

রেজেষ্টারী

কতকগুলি বিষয় পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে রেজেষ্টারী আপিষে যাইতে হয় নতুবা সে ব্যবস্থা যে-কেহ নামঞ্জুর করিতে পারে। জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সময় দলিলাদি লিখিয়া রেজেষ্টারী করিতে হয়। ইহা হইতে সরকারী আয় ৭০ লক্ষ টাকা।

রেজেষ্টারী।

আফিম

পোস্ত নামক এক প্রকার উদ্ভিদ্ হইতে আফিম প্রস্তুত হয়। বিহার ও গঙ্গাতীরে কোনো কোনো জিলায় আফিমের চাষ হয়; এ ছাড়া ইন্দোর, গবালিয়র, ভূপাল, জাওড়া, ধর, রাতলাম, মেবার, কোটা প্রভৃতি করদ রাজ্যে আফিম উৎপন্ন হয়। ইহাকে 'মালব' আফিম বলে। প্রথমোক্তকে 'বাংলা' আফিম বলা হয়। ইহার ব্যবসায় খুব লাভজনক

দেখায় বাংলার সরকার ১৭৯৭ সালে আফিমকে সরকারী চাষের অন্তর্গত করিলেন। সেই হইতে আফিম সরকারের এক-চেটিয়া কারবার। গাজীপুরে ভারত-সরকারের আফিম-বিভাগের কেন্দ্র; সেখানে একজন প্রধান কর্মচারী আছেন তাঁহারই তত্ত্বাবধানে লাইসেন্স-প্রাপ্ত চাষীরা নির্দিষ্ট কৃষিক্ষেত্রে আফিমের চাষ করে। চাষীকে নির্দিষ্ট দামে সমস্ত আফিম সরকারকে বিক্রয় করিতে হয়। ১৮৫০ সালে সের-করা আফিমের দাম ছিল ৩।৵০, ১৮৯৪ সালে হয় ৬৲ টাকা সের; যুদ্ধের পূর্বে ৭।৹ টাকা সের দেওয়া হইত; যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে সালে ৯৲ সের ও ১৯২১-২২ সালে ১৫৲ টাকা সের পাইত। (Statistical Abs. 1924 p. 150)

মালব ও বাংলা-আফিম

আফিম সরকারের একচেটিয়া কারবার; আফিম বিক্রয় করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স বা পাশ লইতে হয়; নতুবা কাহারও কাছে অসঙ্গত পরিমাণ আফিম থাকিলে তাহাকে পুলিস সোপারদ্দ করা হয়।

মালব-আফিম রপ্তানীর বন্দর বোম্বাই। বৃটীশ সরকারের রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয় বলিয়া প্রতি-সিন্ধুক পিছু পূর্বে ৬০০৲ টাকা ও বর্তমানে ১২০০৲ টাকা শুল্ক দিতে হয়।

আফিমের প্রধান খরিদ্দার ছিল চীন। কিন্তু এই জগতবিদিত 'চণ্ডুখোর' চীন জাতির মধ্যে নবজীবনের সাড়া পড়ায় তাহারা আফিম ত্যাগ করিয়াছে। ১৯১৩ সালে চীনসরকার আফিমের আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। তখন সাংহাই ও হংকংএর বন্দরে হাজার হাজার বাক্স আফিম মজুত। ভারত গভর্ণমেণ্টে অগত্যা প্রায় ১১ হাজার বাক্স আফিম কিনিয়া চারিদিকের আসন্ন গণ্ডগোল মিটাইয়া দিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে মাত্র ৮,১৭ বাক্স বিদেশে রপ্তানী হয়; ১৯১৮ সালে ৩৩৭ বাক্স মাত্র রপ্তানী

চীন আফিম বন্ধ

হয়। ফলে বিহারের আফিমের চাষ উঠিয়া গিয়াছে ও অন্যান্য স্থানে ইহার চাষ কমিয়াছে।

কিন্তু চীনের বন্দরে আফিম না গেলেও অন্যত্র আফিম বিক্রয় হঠাৎ বাড়িয়া গেল। কারণ আফিমের বদলে কোকেনের চলন সুরু হইয়াছে। ষ্ট্রেট্‌ সেট্‌লমেণ্টে ১৯১৫ সালে যেখানে ৮০০ বাক্স আফিম আমদানী হইত, ১৯১৬ সালে ২,৫৫০, ১৯১৭ সালে ৪,৭৮৯, অর্থাৎ তিন বৎসরে ৮,১৯৯ বাক্স আফিমের আমদানী বাড়িয়া গেল। ১৯২২ সালে ২,৭০০ বাক্স আফিম তথায় নীত হয়; সুখের বিষয় ১৯১৯ হইতে আমদানী কমিতেছে; পাঁচ বৎসরে আফিম আমদানী সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। এই আফিম হইতে কোকেন হয়, ও তাহাই চীনাদের নেশার খোরাক জোগানোর জন্য প্রেরিত হয়। হংকঙে, শ্যামে আফিমের আমদানী বাড়িয়াছিল। ইংলণ্ডেও কোকেন প্রস্তুত হইতেছে; ১৯১৩ সালে ইংলণ্ডে যেখানে ৫৯ হন্দর মাত্র আফিম আমদানী হইয়াছিল, সেখানে ১৯১৯সালে ৫,১৭০হন্দর আমদানী করা হইয়াছিল। এই সব কোকেন বেশীর ভাগ পূর্বদেশে রপ্তানী হয়। (Hassan, p. 102) কোকেন প্রস্তুত ও আমদানী করিতে জাপান অন্যতম। তাহারা চীনের মধ্যে কোকেন বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লাভবান হইতেছিলেন ভারত-সরকার। আফিম হইতে সরকারী আয় কিরূপ তাহা আমরা যথাস্থানে দিয়াছি। ১৯১০ সালে (চীনে আফিম বন্ধ হইবার পূর্বে) সরকারী আয় হইয়াছিল ১১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা—ত্রিশ বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকার আয় বৃদ্ধি। ইহার পর আয় কমিতে থাকে; কিন্তু হতভাগ্য চীনাদের কোকেন ব্যবহারের ফলে ১৯১৯ সালে ৪,৯৩ লক্ষ টাকা আয় হয়। সৌভাগ্যের বিষয় চীনে এ বিষয়ে আন্দোলন হইতেছে। উপরিউক্ত আফিমকে সরকারী ভাষায় provision আফিম বলে; উহা রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত

চীনে কোকেন চালান

হয়। এ ছাড়া ভারতে ব্যবহারের জন্য আফিম প্রস্তুত হয়। ইহার আয় ও ব্যবস্থা সরকারী আবগারী বিভাগের অন্তর্গত হইলেও আমরা এই স্থানেই উহা বর্ণনা করিব।

গাজীপুরে এই আবগারী আফিম তৈয়ারী হয়। এক একটি তাল এক সের, ৬০টি তালে এক বাক্স। সের-করা দাম যুদ্ধের পূর্বে ছিল

ভারতে আবগারী আফিম

৮৷৷০; ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে ১৯২২সালে ২০৲সের দাঁড়াইয়াছিল। ১৯১২ সালের আবগারী আফিম ১৪,৩৯৩ মণ ব্যবহার হইয়াছিল; উহা কমিয়া ১৯২২ সালে ৯,২৭৮ মণ হইয়াছিল। সাধারণতঃ আফিম-খোর লোকে বড়ি করিয়া খায়। কিন্তু 'চণ্ডু' বা আফিম সাজিয়া ধূমপান করিবার প্রথা ভারতে ঢুকিয়াছে। লক্ষ্ণৌতে এই প্রকার একটি আড্ডার বর্ণনা ১৮৮৮ সালে মিঃ কেন (Caine) করিয়া ছিলেন। তিনি সেই আড্ডায় ৯৭ জন লোককে দেখেন। এক একটি ঘরে আঠার উনিশ বছরের যুবতীদিগকে নেশায় বিভোর হইয়া পুরুষদের সহিত পড়িয়া থাকিতেও তিনি দেখিয়াছিলেন।

ইহার পরে ১৮৯৮ সালে আফিম কমিশন বসে; কিন্তু তাঁহারা আফিম বন্ধ করার কথা বলিতে পারিলেন না। সরকারের আয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে; এত বড় লাভজনক ব্যবসায় বন্ধ হইলে রাজস্বের বিপুল ক্ষতি। ১৯০১ সালে আফিম হইতে আয় ছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ; ১৯১৯ সালে ছিল ২ কোটি ৪২ লক্ষ; ১৯২২ সালে ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ঐ বৎসরের আফিম প্রস্তুত প্রভৃতি বাবত ব্যয় হইয়াছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ; সুতরাং ১৯২২ সালে সরকারী আয় আফিম হইতে হইয়াছিল ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। ১৯২৪—২৫ সালে রাজস্ব ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ। খরচা ২, ৩৪ লক্ষ; মোট আয় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ।

আফিমের রাজস্ব

১৮৫৬	১৬ লক্ষ	৯০	হাজার
১৮৬১	২৯ „	৫০	„
১৮৭১	৪৩ „	৬০	„
১৮৮১	৮১ „	৪০	„
১৮৯১	৯৯ „	৯০	„
১৯০১	১,০১ „	৬০	„
১৯১১	১,৫৭ „	৫০	„
১৯১৮	২,৪২ „	৩০	„
১৯২২	৩,০৭ „	৭০	„

(Vakil—Financial Developement, p. 604. also Statis. Abstract, 1924 p. 146.)

জেনেভার লীগ অব নেশনের অধিবেশনে পৃথিবীতে আফিমের ব্যবহার কমাইবার জন্য অনেক আলোচনা আন্দোলন হয়; কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হয় নাই। উক্ত সভার মতে দশ সহস্র-করা লোকের জন্য ছয় সের আফিম উৎপন্ন করা যাইতে পারে; এ প্রকার ব্যবহার মারাত্মক নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের দশহাজার জন লোকে গড়ে বার সের ও আসামের দশহাজার লোকে (৫২) বাহান্ন সের আফিম ব্যবহার করিতেছে। ভারতবর্ষের বড় বড় সহরের অবস্থা আরও শোচনীয়। কলিকাতায় দশহাজারে ১৪৪ সের, রেঙ্গুনে ১০৮, (এই উভয় স্থানে চীনালোক আছে), ফেরোজপুরে ৬০ সের, হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) ৫২ সের, বোম্বাই ৪৩ সের, লাহোরে ৪০ সের করিয়া ব্যবহৃত হয়। (Abkari, July, 1925, p. 40).

ভারতে অপরিমিত আফিম ব্যবহার

বিবিধ

বনভূমি সরকারী সম্পত্তি ; বনের কাঠ বিক্রয় বা জমা দিয়া, ঘাস বাঁশ, বেত বিক্রয় করিয়া, গোরু চরিবার অনুমতি দিয়া, সরকারের আয় প্রায় ৩২ কোটি টাকা হয়। বন-বিভাগ সম্বন্ধ শিল্প পরিচ্ছেদে সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

বনভূমি

এগুলি ছাড়া রেলপথ, ডাক, তার, মুদ্রা হইতে সরকারের যথেষ্ট লাভ হয়। এসকল বিষয় সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। করদরাজ্য হইতে ৮৮,৮০,০০০ টাকা আয় হয়।

বিবিধ

গত পঞ্চাশ বৎসরে সরকারী রাজস্ব দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই বিপুল রাজস্ব দেখিয়া নানা লোকের মনে নানা কথা উঠে। সরকার এই রাজস্ব বৃদ্ধিকে দেশের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন ; কিন্তু দেশীয় লোকেরা ইহার উল্টা কথা বলেন ; তাঁহারা বলেন দেশের লোকের পক্ষে এই রাজস্ব বহন করা দুঃসাধ্য। সরকারী হিসাব মত মাথা-পিছু ২৷৵৩ কর আমাদের দিতে হয় ; ইহা হইতে যদি ভূমিকর বাদ দেওয়া যায় ঐ কর ১৷৵০ করিয়া মাথা-পিছু পড়ে ; সরকার বলেন এই কর সমগ্র আয়ের শতকরা ৯% ভাগ মাত্র, সুতরাং ইহা আদৌ অধিক নয়।

বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় ধনশালী দেশের বাৎসরিক রাজস্বের অপেক্ষা ভারতের রাজস্ব প্রায় দেড়গুণ অধিক। বৃটীশ দ্বীপের ধনের কাছে আমাদের রাজস্ব খুবই বেশী বলিয়া অনেকে মনে করেন। সরকারী তরফের উত্তর হইতেছে এই যে ভারতের লোকসংখ্যা গ্রেট্‌ব্রিটেন হইতে প্রায় পাঁচগুণ এবং ভারত-সরকার দেশের জন্য এমন সব কাজ করেন যাহা

বিলাতে সরকারকে করিতে হয় না। কিন্তু বিলাতের জাতীয় ধনবল ও ব্যক্তিগত আয় ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক যে এখানকার রাজস্ব অতিরিক্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন। আর সরকার রেল খাল প্রভৃতি কাজ করিতেছেন তাহাতেও তাঁহাদের লাভ হইতেছে; বরং বিলাতে শ্রমজীবি ও কর্মচারীদের জন্য বৃদ্ধ বয়সের পেনশন্, বাধ্যতা মূলক জীবন-বীমা ও শিক্ষা প্রভৃতি যেসব ব্যবস্থা করিয়াছেন—এদেশে তাহা করিতে হয় নাই। সুতরাং বিলাতের সহিত ভারতে তুলনা চলে না।

৫। আয় ব্যয়

সমর-বিভাগের ব্যয়

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের সৈনিক বিভাগ পুনর্গঠিত হইল; সেই সময়ে স্থির হইল যে দুইজন ভারতীয় সৈন্যের স্থানে একজন করিয়া বৃটীশ সৈন্য থাকিবে, ইতিপূর্বে পাঁচজনের জায়গায় একজন ছিল। এখন পর্য্যন্ত সেই অনুপাতে ভারতে বৃটীশ ও দেশীয় সৈন্য আছে। ইঞ্চকেপ কমিটি ভারতে সৈন্য সংখ্যা কমাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু দেশী বিদেশী সৈন্যের অনুপাত ঠিক রাখিয়াছেন।

সৈন্য-বিভাগ সংস্কার

ভারতীয় সৈন্যের অপেক্ষা বৃটীশ সৈন্য পোষণের ব্যয় অনেক অধিক। ১৯১৩ সালে যুদ্ধের পূর্বে বৃটীশ সৈন্যের ব্যয় দেশীয় সৈন্যের অপেক্ষা তিনগুন করিয়া বেশী হইত ও ১৯২২ সালে প্রত্যেক দেশীয় সৈন্য অপেক্ষা বৃটীশ সৈন্যের ব্যয় চতুর্গুণ বেশী হইতেছিল। প্রত্যেক

বৃটীশ সেনাপতির জন্য ব্যয় দেশীয় সেনাপতিদের অপেক্ষা ছয় গুণ করিয়া অধিক। এমন কি বিলাতের সেনাপতিদের অপেক্ষা এদেশের বৃটীশ সেনাপতিদের জন্য ভারত সরকারকে অধিক ব্যয় করিতে হয়। এক-জন বৃটীশ সৈনিক পোষণ করিতে যে ব্যয় হয়, ভারতীয় সাধারণ সেনানায়ককে পোষণ করিতে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়ে না।

বর্তমানে কোনো কোনো স্থলে দেশীয়দিগকে সৈন্য-বিভাগে উচ্চপদ দেওয়া হইতেছে; কিন্তু সে গতি এতই মন্থর যে ভারতীয় সৈন্য বিভাগের কিয়দংশকেও দেশীয় করিতে বহু বৎসর লাগিবে।

মোট কথা ভারতের রণ-বিভাগের উদ্দেশ্য এই যে সৈন্যগণকে সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা। ভারতের ভিতরে বা বাহিরে কোথায়ও কোনো যুদ্ধ না থাকিলেও বার মাস এই প্রকাণ্ড সৈন্য-বিভাগকে পোষণ করিবার দারুণ ব্যয় ভারতবাসীকেই বহন করিতে হয়।

বারমাস যুদ্ধ সজ্জা

কিন্তু ভারতবাসীকে এই ব্যয়ভার বহন করিতে হইলেও ব্যয় সম্বন্ধে কোনো প্রকার বাধা দান করিবার অধিকার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেওয়া হয় নাই; এমন কি ভারতীয় সৈনিক-বিভাগের উপর সব ক্ষমতা ভারত-সরকারের পর্যন্ত নাই। তাঁহারাও এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। এখানকার রণ-বিভাগের সকল কর্মই ইংলণ্ডের (War Office) যুদ্ধ-বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এ বিষয়ে উদাহরণের অভাব নাই। সেইজন্য ব্যবস্থাপক সভাকে ও ভারতীয় সরকারকে রণ-বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থা বিষয়ে চরম নিষ্পত্তিকারক করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছে। বিলাতের যুদ্ধ-বিভাগ (War Office) যে কেবল এদেশের রণ-বিভাগকে পরোক্ষভাবে পরিচালিত করেন তাহা নহে, ভারতবর্ষকে বৃটীশ সৈন্যের জন্য নানাভাবে ইংলণ্ডের রণ-বিভাগে অর্থও প্রেরণ করিতে হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডে সৈন্য সংগ্রহ ও শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ

ব্যয়ভার বহন করিত। এই সৈন্য বাহিনী পৃথকভাবে সংগৃহীত হইত। বৃটীশ সৈন্য-বিভাগের সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। ১৮৬১ সাল হইতে স্থির হইল যে ভারতে যে-সৈন্য আসিবে তাহা ইংলণ্ডের রণ-বিভাগ ব্যবস্থা করিবেন। ইহার অর্থ এই দাঁড়াইল যে, ভারত শাসন করিবার জন্য যে-বৃটীশ সৈন্য বিলাতে সংগৃহীত ও শিক্ষিত হইবে তাহার ব্যয় ভার ভারতকেই বহন করিতে হইবে।

বিলাতি সৈন্য সংগ্রহে ভারতের ব্যয়

বিলাতের রণ-বিভাগকে এ বাবদ কি পরিমাণ অর্থ দিতে হইবে তাহা লইয়া ভারত-সরকার ও ইণ্ডিয়া অপিসের সহিত ইংলণ্ডের রণ-বিভাগের অপিসের ঘোর ও বহুকালব্যাপী তর্ক চলিয়াছে এবং ইহার যে চরম মীমাংসা হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। এই মীমাংসার জন্য এ পর্য্যন্ত বহু বৈঠক ও মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছে। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত যেসব শ্বেতাঙ্গ সৈন্য ভারতের জন্য আনীত হইয়াছিল প্রত্যেকের মাথা-পিছু শিক্ষাধীনকালে প্রতি বৎসর দশ পাউণ্ড (10£.) করিয়া ভারতবর্ষকে দিতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ সালে সিকোম্ব (Seccombe) কমিটির নির্দেশানুসারে যুদ্ধ-বিভাগ (War Office) ভারত সরকারের নিকট হইতে নিম্নলিখিত হারানুসারে টাকা দাবী করিলেন।

অশ্বারোহী সৈন্য	১৩৬ পা-	১৩ শি-	১১ পে
পদাতিক	৬৩ „	৪ „	৫ „
রয়েল হর্স আর্টিলারী (গোলন্দাজ)	৭৮ „	১৪ „	৮ „
রয়েল আর্টিলারী আরোহী	৫৯ „	২ „	১০ „
রয়েল আর্টিলারী	৫৯ „	৯ „	৩ „

সিকোম্ব কমিটি

যদি ইহারা ঘোড়ায় চড়া শিখিয়া আসে তবে আরও ১৩ পাঃ ১১ শিঃ মাথা পিছু বেশী দিতে হইত।

সিকোম্ব কমিটির প্রস্তাবে ভারত সরকার এমন কি বিলাতে ইণ্ডিয়া আপিস পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালীন ভারত-সচিব রণ-বিভাগের এই ব্যবস্থায় ঘোর প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে ভারত রক্ষার জন্য এত ব্যয় বহন করিবার শক্তি ভারত-সরকারের নাই। এ লইয়া বহুকাল বাক্ বিতণ্ডা চলিল।

ইতিমধ্যে ১৮৭০ সালে, ভারতে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের জন্য 'স্বল্পকাল চাকুরী'র (Short term service) প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাতে ইংলণ্ডের খুবই সুবিধা হইল; প্রথমত ভারতের অর্থে তাহারা ইংলণ্ডে সংগৃহীত ও শিক্ষিত হইল; ভারতের অর্থে তাহারা এ দেশে পাঁচ ছয় বৎসর সৈনিকের কাজ শিখিয়া দেশে ফিরিয়া গেল ও বিলাতে 'রিজার্ভ' সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইল। ভারত-সচিব এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে এই ব্যবস্থার ফলে ভারতে সুদক্ষ বৃটীশ সৈন্যদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, ভারতের রণ-বিভাগ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার প্রতিবাদ গ্রাহ্য হইল না। এ ছাড়া সৈন্যদের যাওয়া আসার যে বিস্তর টাকা খরচ হয় তাহা ত আছেই।

Short Term Service ও শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের জন্য ব্যয়

এদিকে সিকোম্ব কমিটির প্রস্তাব লইয়া আলোচনা ত চলিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৮ সালে পুনরায় বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বৃটীশ সৈন্যদের জন্য যে ব্যয় হইতেছে তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে দেওয়া দুঃসাধ্য। ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম পরাক্রমশালী জাতি বলিয়া তাহাকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য আয়োজনসমূহ করিতে হয়; ভারতের শান্তির পক্ষে এমন ব্যয় বহনের প্রয়োজন নাই। ভারত-সরকার আরও বলিলেন যে ইংলণ্ডের এমন কোনো কাজ করা উচিত নহে যাহাতে ভারতবাসীদের মনে ইংলণ্ডের প্রতি অশ্রদ্ধা হয়। রণ-বিভাগ ও

ভারত-সরকারের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হইল না; বিলাতের সমর সচিব বলিলেন যে ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালের জন্য ভারতের শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের খরচ বাবদ ছয় লক্ষ (৬০০,০০০) পাউণ্ডের কম কিছুতেই লইবেন না। ১৮৮৭ সালে রণ-বিভাগ ৬ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড দাবী করিলেন এবং ভবিষ্যতে এই হারে লইবেন বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ১৮৮৯ পর্য্যন্ত ঐ হারেই টাকা দিতে হইল। ১৮৯০ হইতে তাঁহারা প্রত্যেক সৈনিকের জন্য সাত পাউণ্ড দশ শিলিং ও তদ্‌ব্যতিরিক্ত সৈনিকদের মুলতুবী বেতন (deferred pay) দিতে হইবে বলিলেন। ১৯০৮ সালে স্থির হইল এই হার ১১ পাউণ্ড ৮ শিলিং হইল; যুদ্ধের পর ১৯২০ সালে বিলাতে রণ-বিভাগের নির্দ্দেশমত বিলাতী সৈন্যের জন্য মাথা পিছু ২৮ পাউণ্ড ১০ শিলিং পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৯২২ সালে ২৫ পাউণ্ড ১৩ শিলিং দিতে হইত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত চরম মীমাংসা হয় নাই।

১৯২০ সালে ভারতের জন্য Air force বা আকাশ-বাহিনী গঠিত হইল; তাহাদের শিক্ষার জন্য ভারতকে একলক্ষ পাউণ্ড দিতে হয়।

এই ত গেল ভারতের জন্য শ্বেতাঙ্গ সৈন্যবাবদ ব্যয়। ইহারা ভারতবর্ষ রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত; কিন্তু এ ছাড়াও শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের জন্য ভারতকে ব্যয় করিতে হয়। যেমন কর্মচারী, সেনাপতি ও সৈনিক ভারতবর্ষ হইতে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করে তাহাদের পেনশন্ বিলাতে পাঠাইতে হয়। ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে ৩৫০০ পাউণ্ড করিয়া প্রতি বৎসর প্রত্যেক সংস্র ব্যক্তির জন্য দিতে হইত। পরে ১৮৮৪ সালে স্থির হইল যে কর্মচারীদের কর্মকালের অনুপাতানুসারে পেনশন্ দিতে হইবে। রণ-বিভাগকে ভারত হইতে কেজো (Effective) ও অকেজো (non-effective) ব্যয় বাবদ কিরূপ দিতে হইয়াছে তাহার তালিকা দিতেছি।

১৮৬১ সাল	৭৮৮,০০০ পাউণ্ড	বার্ষিক ব্যয়
১৮৭৫ "	৮৬৩,০০০	
১৮৯৯ "	১,২৯৬,০০০	
১৯১৩ "	১,৮৪৪,০০০	
১৯২০ "	৩,০৪১,০০০	

বিলাতের সমর বিভাগের সহিত ভারতীয় সৈন্য বিভাগকে যুক্ত করিবার আর একটি ফল হইয়াছে এই যে ইংলণ্ডে বৃটীশ সৈন্যের বেতন বৃদ্ধির সহিত ভারতে অবস্থিত বৃটীশ সৈন্যের বেতন তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে ১৯০২ সালে ভারত-সরকারের বাৎসরিক (৭০০,০০০) সাত লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে সাধারণ দেশীয় সৈন্য মাসিক ১১৲ টাকা বেতন পাইত। যুদ্ধ-কাল ব্যতীত সরকারী আহার পাইত না। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময়ে তাহাদিগকে ৪৲ করিয়া বৃদ্ধি দেওয়া হয় ও মাসিক ৫৲ ভাতা বলিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধান্তে তাহাদের ভাতা বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের সরকারী আহারের ব্যবস্থা কায়েমী হইয়াছে।

দেশীয় সৈন্যদের বেতন

ইংরাজ সৈন্যের বেতন ভারতীয় সৈন্যের অপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ অধিক। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদের জীবনযাত্রার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ বলিয়া তাহাদের গৃহাদি শিবির প্রভৃতি তৈয়ারীতেও সরকারের অনেক ব্যয় হয়। বৃটীশ সেনাপতিদের বেতন ও খুব বেশী। ইংলণ্ডে ১৯১৪ সালের পর হইতে এ পর্য্যন্ত সৈনিকদের বেতন প্রায় তিন গুণ বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষের শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের সেই অনুপাতে বাড়িয়াছে। তাহার ফলে ১৯২৩ সালে ঐ বাবদুই ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা অধিক ভারতকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল, যদিও ইংরাজ সৈন্য এই সময়ে দশ বৎসর পূর্বের অপেক্ষা ৫,৫০০ জন কম ছিল।

(Sir Purushottamdas, Note on Military Expenditure, para 29)

বৃটীশ সৈন্য আমদানীর জন্য ভারতবর্ষকে আরও নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ১৮৭০ সালের পর হইতে স্বল্পকাল ব্যাপী চাকুরীর প্রবর্তন হওয়াতে সৈন্যদের আসা যাওয়াতে জাহাজ ও রেলভাড়া বাবদ বিস্তর খরচ বাড়িয়াছে। গড়ে কর্মচারীরা পাঁচ বৎসর ও সৈনিকেরা সাত বৎসর থাকিত; পুরাতন সৈন্যদের পাঠাইবার ব্যয় ও নূতন সৈন্যদের আনিবার ব্যয় সম্পূর্ণরূপেই ভারতবাসীকেই বহন করিতে হইত। অবশেষে ওয়েলবী (Welby) কমিশনের প্রস্তাবানুসারে ইংলণ্ডের রাজকোষ অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে রাজী হইলেন; ইহাতেই ১৯০০ সালে ভারতকে ১৩০,০০০ পাউণ্ড দিতে হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এ পর্য্যন্ত খরচ বাড়িয়া যাওয়া সত্বেও ইংলণ্ড উক্ত এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড আসা-যাওয়া বাবদ দিয়া আসিতেছেন, অর্দ্ধেক দেন নাই।

এসব ব্যয় ছাড়া বৃটীশ সৈন্যের জন্য অনেকগুলি সুবিধা করিতে গিয়া ভারত-সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; যেমন সস্তায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের জন্য রণ-বিভাগের সরকারী গোশালাকে বিস্তর টাকা দিতে হয়। বলা বাহুল্য লোকসান পূরণ ভারতের অর্থকোষ হইতে করিতে হয়। (২) খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পাদরীদেব বেতনাদি বাবদ যে ব্যয় হয় তাহা ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে গৃহীত হয়। (৩) কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে স্বাস্থ্য নিবাস ও ছাউনী রক্ষিত হয়। (ক) ভারতবর্ষের কয়েকটি শিক্ষার স্থান ও প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র বৃটীশ সৈন্যদের জন্যই রক্ষিত হইতেছে, এবং বৃটীশ সৈন্যদের শিক্ষাদির জন্য যে-ব্যয় হয় তাহা দেশীয় সৈন্যদের শিক্ষা-ব্যবস্থা অপেক্ষা তিন গুণ অধিক, অথচ দেশীয়

শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের সুবিধা।

সৈন্য শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের দ্বিগুণ। এই সব কারণে ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ সৈন্য পোষণ এমন ব্যয় সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং সেইজন্যই রাজনীতিক নেতারা ও ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞেরা এ বিষয়ে বরাবর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন।

পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে গত য়ুরোপীয় মহাসমরে ভারতবর্ষ হইতে বহু সৈন্য ও সমর সরঞ্জাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা নূতন নহে; ইহার পূর্বে বহুবার বৃটীশ সরকার সাম্রাজ্যের নানা স্থানে ভারতীয় সৈন্য ভারতের ব্যয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে যখন ভারত শাসনের ভার ছিল সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈন্যকে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সৈন্য বিবেচনা করিয়া যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানেই সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৮৩৮—৪২ সালে প্রথম আফগান সমরে, ১৮৩৯-৪০ সালের চীন-সমরে, ১৮৫৬ সালের পারস্য অভিযানের সাধারণ ব্যয় সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় রাজকোষ বহন করিয়াছিল,—যদি অতিরিক্ত ব্যয় ইংলণ্ড দিয়াছিলেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাহাও প্রদত্ত হয় নাই। পারস্যাভিযানের অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্দ্ধেক ভারতবর্ষকেই দিতে হইয়াছিল।

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ

কোম্পানীর হাত হইতে বৃটীশ পার্লামেণ্টের হাতে ভারত শাসনের ভার পড়িলে ভারতীয় সেনা বিভাগ এক প্রকার বিলাতের সমর-অপিসের (War office) অধীন হইয়া পড়িল। ১৮৬৭ সালে আফ্রিকার আবিসিনিয়াতে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিল। বিলাতের সমর-বিভাগ ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য প্রেরণ করিতে বলিলেন ও সমস্ত সাধারণ ব্যয় ভারতের উপর অর্পণ করিলেন। পার্লামেণ্টে মিঃ ফসেট্ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন; তাহার কোনো ফল হইল না। ভারত-সচিব ১৮৭২ সালে

আফ্রিকার আবিসিনিয়ার সমর ও ভারতবর্ষ

লিখিলেন যে এই শ্রেণীর যুদ্ধ কেবলমাত্র সাম্রাজ্য-সরকারের স্বার্থের জন্ম করা হইয়াছে—কোথাও বৃটীশ বাণিজ্য, কোথাও বৃটীশ বণিকদের কোনো অসুবিধা, অথবা বৃটীশ রাজের সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভারতের উপর এসমস্ত চাপানো ন্যায়সঙ্গত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন না। তিনি আরও বলিলেন যে যখন ভারতরক্ষার জন্ম ইংলণ্ড হইতে সৈন্ম আনয়ন করা হয় তখন তাহার ব্যয় ভারতকে বহন করিতে হয়। অথচ ভারতবর্ষ হইতে যখন অন্যত্র সৈন্য প্রেরণ করা হয় তখন ভারতবর্ষকেই সেই ব্যয় বহন করিতে হয়।

১৮৭৫ সালে পুনরায় পেরাক্ অভিযানের জন্য ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হইল ও ভারতের অর্থ ভাণ্ডার হইতে সাধারণ ব্যয় নির্বাহিত হইল; সেবারও ভারত-সচিব ও ভারত-সরকারের প্রতিবাদ বৃটীশ পার্লামেণ্ট শ্রবণ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। ১৮৭৮ লর্ড লীটনের সময়ে আফগানিস্থানের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ বাঁধিল। এবার ভারত-সরকার ও ভারত-সচিব বলিলেন যে ভারতরক্ষার জন্য ভারতকে এ ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু একদল লোক ঘোর কলরব তুলিয়া বলিলেন যে এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের জন্যই হইয়াছে। যুদ্ধের ব্যয় অসম্ভব রকম হইল। ইংলণ্ড পাঁচ মিলিয়ন পর্য্যন্ত দিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট ২২.৫ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকেই দিতে হইল। অথচ এই যুদ্ধের পর লর্ড-রীপন যে সন্ধি স্থাপন করিলেন তাহা ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

আফগান যুদ্ধে ভারতের অর্থ

আফগান যুদ্ধ শেষ হইবার এক বৎসরের মধ্যে (১৮৮২ সালে) মিশরের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্ম প্রেরিত হইল। ভারত-সরকার এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে মিশরের শান্তি রক্ষার জন্ম ভারতীয় প্রজাদের অর্থ ব্যয় করা শ্রেয় নয়। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ রক্ষায়

জন্য সুয়েজখাল নিরাপদ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু ইংলণ্ডের প্রজারা ভারতীয় প্রজা অপেক্ষা অনেকগুণ ধনী ; সে ক্ষেত্রে ধনী ইংলণ্ড দরিদ্র ভারতকে সুয়েজ খালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মিশর আক্রমণ করিতে বলা ও তজ্জন্য ব্যয় করিতে বলা আদৌ শোভন হয় নাই। তাছাড়া যুদ্ধ হইবে কিনা তাহা বিচার করিলেন ইংলণ্ড, ভারতবর্ষকে এ বিষয়ে কোনো পরামর্শে আহ্বান করা হইল না। কেবল যুদ্ধের ব্যয় ভার মোচন করিবার জন্য তাহাকে বলা হইল ; এরূপ অবস্থায় ভারতের রাজকোষের কখনো মঙ্গল হইতে পারে না। ইংলণ্ড সে-বিষয়ে কর্ণপাত করিলেন না, তাঁহারা যুদ্ধের ব্যয় বাবদ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দিলেন—ভারতকে দিতে হইল ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (15 million pounds)।

মিশর অভিযান

১৮৮৫ সালে আফ্রিকায় সুদান সমর বাঁধিল। ভারত হইতে সেনা গেল ; ভারত-সরকার ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠাইলেন যে ভারতকে এ যুদ্ধের জন্য ব্যয় ভার বহন করিতে বলা খুবই অন্যায় হইবে। মিশর-যুদ্ধের সুয়েজখাল সংক্রান্ত অজুহাত সুদান-সমরে বর্তায় না ; সুতরাং এ বিষয়ে ভারতবর্ষের দায়িত্বের কোনো সুদূর সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভারত-সরকারের মতামত পৌছিবার পূর্বেই পার্লামেণ্ট স্থির করিলেন যে সমস্ত সাধারণ-ব্যয় ভারতকেই দিতে হইবে।

সুদান সমরে ভারতীয় সৈন্য

ইতিমধ্যে রুশভীতি হেতু ভারতীয় সৈন্য-বিভাগের অনেক সংস্কার ও বৃদ্ধি হইল ; সে-কথা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। ১৮৮৫ সালে ভারত-সরকার নব বলে বলীয়ান্ হইয়া বর্মা দেশে শক্তি বিস্তার আরম্ভ করিলেন। ইঁহার ফলে কয়েক বৎসরে সমগ্র বর্মাদেশে ইংরাজের অধীন হইল। ইহাতে ভারতের ব্যয় হইল ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড। বর্মাদেশের সাধারণ

বর্মা সমর

শাসনের ব্যয় ভারত বহুকাল ভারতীয় রাজকোষ হইতে সরবরাহ করিয়াছিল।

১৮৯৬ সালের মোম্বাসাতে যে সৈন্য-অভিযান প্রেরিত হয়, তাহার ব্যয় ভারতের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা হয়; কিন্তু এবার ভারত-সচিব খুব শক্ত হইলেন বলিয়া ভারতবাসী বাঁচিয়া গেল। ঐ বৎসরেই সুয়াকিন নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য ভারতকে সৈন্য প্রেরণ ও ব্যয় বহন করিবার জন্য বলা হইল। ভারত-সরকার প্রতিবাদ করায় ভারত-সচিব লিখিয়া পাঠাইলেন যে প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবে। মোট কথা এই হইল, ভারতবর্ষকে নিজ ব্যয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

এই সব আন্দোলনের পর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য ওয়েলবী কমিশন (১৮৯৮ সালে) নামে যে সরকারী বৈঠক বসিল তাহাতেও স্থির হইল যে ভারতের আশে পাশে দেশে যুদ্ধ বাঁধিলে নিজ ব্যয়ে সৈন্য প্রেরণ তাহার স্বার্থ; চীন হইতে আফ্রিকার দক্ষিণ পর্য্যন্ত ও পারস্য প্রভৃতি দেশে ভারতের স্বার্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজড়িত। সুতরাং ভারতীয় রাজকোষ হইতে এই সব যুদ্ধাভিযানের ব্যয় ভারও তাহাকে বহন করিতে হইবে। চরম সিদ্ধান্তের ভার পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত থাকিল।

ওয়েলবী কমিশনের মন্তব্য

১৮৯৮ হইতে বিগত য়ুরোপীয় সমরের আরম্ভ (১৯১৪) পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন ও পারস্য প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ বাঁধিয়া ছিল, কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বৃটীশ পার্লামেণ্ট ভারত হইতে এই সকল যুদ্ধের ব্যয় গ্রহণ করেন।

মহা-সমরে ভারতের দান।

বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণ যুক্তশক্তি সমূহের সহিত মিলিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধ কেন্দ্রেই যুদ্ধ করিয়াছিল বিগত যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষের সকল জাতির লোক সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত না। বাঙালী ও মারাঠার উচ্চবর্ণের লোকেরা রণবিভাগে অনুপযুক্ত বলিয়া বহুকাল হইতে বাদ পড়িয়াছিল। গুর্খা, শিখ, পঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ, ডোগরা, বেলুচি, পাঠান ও খাস মারাঠারা যুদ্ধপ্রিয় জাতি বলিয়া সৈন্য বিভাগে প্রবেশলাভ করিতে পারিত। এককালে তৈলিঙ্গী সেনারাও বিখ্যাত ছিল; কিন্তু পঞ্জাব অধিকারের পর তেজস্বী শিখ সৈন্যদের সরকারী কাজে পাওয়া গেলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিদের বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যখন অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইল তখন রণবিমুখ জাতিদের মধ্য হইতেও সৈন্যসংগ্রহের রীতিমত চেষ্টা হইয়াছিল এবং বাঙালী, মান্দ্রাজী, মারাঠী, কেহই তখন বাদ যায় নাই। বাঙালী ডবল-কোম্পানীর সৈন্যেরা মেসোপটেমিয়াতেও গিয়াছিল, এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সৈনিকের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহ দেখা গিয়াছিল।

সৈন্য হইবার উপযুক্ত জাতি

ভারতীয় সৈন্যগণ কিরূপে ইংরাজ সরকারের জন্য বরাবরই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়া আসিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইতিপূর্বে শ্বেতাঙ্গে শ্বেতাঙ্গে যুদ্ধে কখনো এদেশীয় সৈনিকদের লাগানো হয় নাই। বিগত যুদ্ধে সে-ভেদ রাখা হয় নাই, ভারতবাসীরা ইংরাজ-ফরাসীদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া য়ুরোপের সমরক্ষেত্রে লড়িয়াছে; তা' ছাড়া মিশর, তুর্কি,

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সৈন্যের যুদ্ধ

মেসোপোটেমিয়া, জার্মান-পূর্ব-আফ্রিকা, পূর্ব-এশিয়াতে যুদ্ধ করিয়া খুবই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

গতযুদ্ধে ভারতের দান গত যুদ্ধের সময়ে ভারতবাসীরা যুদ্ধ জয়ের জন্ত যাহা করিয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দিতেছি।

১। যুদ্ধ আরম্ভের সময়ে ভারতের সৈন্যসংখ্যা এইরূপ ছিল :—

বৃটীশ অফিসার—৪,৭৪৪ ভারতীয় সৈন্য—২,৫৯,২০৪

বৃটীশ সৈন্যাদি—৭২,২৫৯ " রিজার্ভ ৩৪,৭৬৭

সেবক ও কর্মচারী—৪৫,৬৬০

২। যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার ৭,৫৪,৪৪৭ জন লোক যুদ্ধকার্য্যের জন্য ও ৪,০৪,০৪২ জন লোক সেবক ও কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন, মোট ১১, ৬১, ৪৮৯ জন লোক যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধে ইংলণ্ড শতকরা ৭৫ ভাগ, সমগ্র ইংরাজ-উপনিবেশ (কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার ইত্যাদি) ১২ ভাগ ও ভারতবর্ষ একাই শতকরা ১৩ ভাগ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল।*

৩। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে ভারত হইতে নিম্নলিখিত সংখ্যক সৈনিক অফিসার ও সেবকাদি প্রেরিত হয় :—

বৃটীশ সেনাপতি	২৩,০৪০
অন্যান্য বৃটীশ সৈন্য	১,৯৬,৪৯৪
ভারতীয় সেনাপতি	১৩,৬১৭
ভারতীয় সৈন্য	৫,৩৮,৭২৪
ভারতীয় সেবকাদি	৩,৯১,০৩৩
অশ্ব গরু প্রভৃতি	১,৭৪,৮৩৬

* Sir M. Visvesvaraya—Reconstructing India.

৪। সৈন্যদের কোথায় কত গিয়াছিল তাহার একটি হিসাব নিম্নে দিলাম :—

	বৃটীশ	ভারতীয়
ফ্রান্সে	১৮,৯৩৪	১,৩১,৪৯৬
পূর্ব আফ্রিকায়	৫,৪০৩	৪৬,৯৩৬
মেসোপটেমিয়াতে	১,৬৭,৫৫১	৫,৮৮,৭১৭
মিশরে	১৯,১৬৬	১,১৬,১৫৯
গ্যালিপলী	৬০	৪,৪২৮
এডেন	৭,৩৮৬	২০,২৪৩
পারস্য উপসাগর	২৬৮	২৯,৪৫৭
ইংলণ্ডে	৪২,৪৩০	——
	মোট	১২, ১৫, ৩৩৮

৫। উপর্যুক্ত সাহায্য ব্যতীত সাজ সরঞ্জাম ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের জন্য দান করিয়াছিল।—

রেলওয়ে সরঞ্জাম—

রেল	১,৮৭৪ মাইল
গাড়ী	৫,৯৯৯ খানি
ইঞ্জিন	২৩৭ ”
গার্ডার	১৩,০৭৩ ফুট

নদীপথের সরঞ্জাম—

ষ্টীমার ও গাধাবোট	৮৩৩ খানি
মোটর নৌকা ও ডিঙ্গি	৫০০ খানি
কাঠ	১ কোটি ঘনফুট

৬। ভারতবর্ষ হইতে ৭ কোটি গুলি, ৬০,০০০ রাইফেল, ৫৫০টি কামান ইংলণ্ডে যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

৭। ভারতবর্ষের দান—১৯১৮ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্তই প্রায় ১½ কোটি টাকা ভারতীয় রিলিফ ফাণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছিল; তা’ ছাড়া

অনেক হাসপাতাল-জাহাজ, মোটর গাড়ী, আম্বুলেন্স, মেশিন্‌গান্‌ এরোপ্লেন যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বয়ং যুদ্ধের কয়েক বৎসর দুইটি রেজিমেণ্টের লড়াইএর খরচ দিয়াছিলেন; ইহাতে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা তাঁহার ব্যয় হয়। ১৯১৬ সালের পূর্বে ভারতীয় দেশীয় রাজারা প্রায় ১½ কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন। সমগ্র দানের মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব; তবে খুব কম করিয়া খুচরা প্রায় ৭½ কেটি টাকা নানাভাবে ভারতবাসীরা দিয়াছিল।

১৯১৭ সালে ভারতবর্ষ যুদ্ধের সাহায্য করিবার জন্য নগদ ১৫০ কোটি টাকা ইংলণ্ডকে দান করিলেন। এই টাকা ধার করিয়া দেওয়া হইল; এবং এই ধারের আসল ও সুদ শোধ করিবার জন্য ভারতবর্ষের উপর যে সব কর ধার্য্য হইল, তাহার আয় (৯) নয় কোটি টাকা। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় ভারতবর্ষকে ৬৭,৫ কোটি টাকা যুদ্ধের জন্য দান করিবার জন্য বলা হইল। কিন্তু এই প্রস্তাবের কিছুকাল পরেই য়ুরোপীয় মহাসমর হটাৎ শেষ হইয়া গেল; কিন্তু ভারতের পশ্চিমে আফগানিস্থানের আমীরের সহিত বিবাদ সুরু হইল। এই নূতন যুদ্ধের জন্য পূর্বোক্ত দান কমাইয়া ২১.৬ কোটি করা হইল।

শ্রীযুক্ত উকিল (C. N. Vakil) হিসাব করিয়া বলেন যে ভারতবর্ষের দান যুদ্ধের জন্য খুব কম করিয়া ১৭৬.৬ কোটি টাকা; এ ছাড়া ১৫০ কোটি টাকার বার্ষিক সুদ ৯ কোটি টাকা ভারতকে বহিতে হইতেছে।

৯। সমর-বিভাগের ব্যয় যুদ্ধের সময়ে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) ১৯১৪-১৬ হইতে ১৯১৭-১৮ সালের মধ্যে যুদ্ধের ব্যয় যুদ্ধের পূর্ব্বের চেয়ে বাড়িয়াছিল—১৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড।

(খ) রাজনৈতিক বিভাগে বিশেষভাবে পারস্যদেশে ব্যয় বৃদ্ধি—১,৩০০,০০০ পাউণ্ড।

(গ) যুদ্ধের জন্য সাধারণ বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি—২৫০,০০০ পাউণ্ড।

(ঘ) ভারতবর্ষ যে টাকা ইংলণ্ডকে যুদ্ধের জন্য দান করিয়াছিল তাহা সুদ ও আসল শোধ বাবদ—৬,০০০,০০০ পর্য্যন্ত।

(ঙ) যুদ্ধের সময়ে সমুদ্রে যেসব মাল নষ্ট হয় তাহার ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬৪০,০০০ পাউণ্ড।

মোট—২৪,৭০০,০০০ পাউণ্ড × ১৫ টাকা
=৩২৩,৫০০,০০০ টাকা।

সৈন্য-বিভাগের ব্যয়

উপরি উক্ত ঘটনাসমূহ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ইংলণ্ডের শাসন সরকার ভারতের বাহিরে যুদ্ধের জন্য ভারতীয় সৈন্য সমূহ আহ্বান করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত যদি ভারতের আভ্যন্তরীন বিপদের আশঙ্কা না করিয়াও ভারতের বাহিরে প্রচুর সৈন্য পাঠানো যায়, তবে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে ভারত-সরকার তাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৈন্য রাখিতেছেন। তৃতীয়ত গত যুদ্ধ ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধাভিযানে ভারত সরকার বা সচিবের ঘোর প্রতিবাদ সত্বে ও ভারতের ব্যয়ে বাহিরে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ভারতের সৈন্য এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক যুদ্ধ করিয়াছে এবং তাহার ফলে ইংলণ্ডের রাজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের রাজস্বের অর্দ্ধেক যুদ্ধের জন্য ব্যয় হয়, অথচ এবিষয়ে মতামত বা ভোট দিয়া ব্যবস্থা করিবার ভার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নাই।

সমর-বিভাগের সৈন্য পোষণ ও বাহিরের অভিযানের জন্য যে কেবল ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তের কোনে

সুনির্দিষ্ট সীমানা না থাকায় ভারত-সরকার সে-দিকে ক্রমশই নানা কারণে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার ইতিহাস সুপরিচিত। সে জন্য ভারতকে বিস্তর টাকার দায়ে পড়িতে হইয়াছে। তারপর সৈন্য-নিবাস, দুর্গ, সামরিক রেলপথসমূহ নির্মাণে বহু কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। যুদ্ধের পদ্ধতি ক্রমশই পরিবর্তিত হইতেছে; নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক অস্ত্র শস্ত্র নিত্যই নির্মিত হইতেছে। সৈন্যগণকে সেই সব নবাবিস্কৃত অস্ত্রাদিতে সজ্জিত না করিতে পারিলে বিপদের সময়ে শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগ হইবে না। তারপরে যুদ্ধের পদ্ধতি বদলাইতেছে। বিগত যুদ্ধে দেখা গেল এরোপ্লেন বড় বড় হাউটজার কামান, ডুবো জাহাজ, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি নূতন সামগ্রী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করা হইয়াছে। এই অভিব্যক্তি একদিনে হয় নাই। যখনই কোনো উন্নতি হইয়াছে, ভারতীয় সৈন্য-বিভাগকে তদনুরূপ সাজ সজ্জায় সমকক্ষ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পৃথিবীর ধনী শক্তিশালী জাতির রণোমত্ততার জন্য ভারতের দরিদ্র কৃষককে সমভাবে ব্যয় করিয়া আসিতে হইতেছে; নতুবা ভারতীয় সৈন্যেরা পিছাইয়া পড়িবে।

অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তন ও নূতন ব্যয়

পার্লামেন্টের হাতে ভারত শাসনের ভার পড়িবার কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে সৈন্যদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতির জন্য বড় রূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার ঢেউ আসিয়া ভারত-সরকারকেও উতলা করিল। বিলাত হইতে হুকুম আসিল যে অতি সত্বর বৃটীশ সৈন্যদের ছাউনী সমূহের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ব্যয় হইবে এক কোটি মিলিয়ন বা দশ কোটি টাকা। ১৮৬৪ সালে ভীষণ বেগে কাজ সুরু হইল। ১৮৬১ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত ১৫ কোটি টাকা কেবলমাত্র সামরিক পূর্ত্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইল; ইহার অধিকাংশ কিন্তু ব্যয়িত হইয়াছিল বৃটীশ সৈন্যদের

সামরিক পূর্ত্ত বিভাগ

বারাক বা ছাউনী নির্মাণে। ভারতের রাজকোষ হইতে এই ব্যয় হইল; অথচ ভারতের দেশীয় সৈন্যদের কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা হইল না। তাহাদিগকে নিজেদের তৈয়ারী কুঁড়ে ঘরে, স্যাঁতসেতে মেজের উপরে থাকিতে হইত; তাহাদের ঘরে না জুটিত জানালা, না জুটিত রাতের বাতি। অথচ ভারতের ব্যয়ে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের জন্য সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী ছাড়া স্কুল, লাইব্রেরী, পাঠাগার, খেলিবার স্থান, ব্যায়ামের স্থান প্রভৃতি নানা সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা করা হইল।

১৮৭৫ হইতে ১৮৯৮ পর্য্যন্ত সামরিক পূর্ত্ত কার্য্য বাবদ গড় বার্ষিক ব্যয় একেকোটি টাকা হইল। এ ছাড়া পশ্চিম সীমানা বাড়াইবার জন্য যে-সব সামরিক রেলপথ নির্ম্মিত হইল সেগুলি রণবিভাগের মধ্যে না দেখাইয়া রেলওয়ে খরচের মধ্যে দেখানো হইয়াছিল। রুশভীতি হেতু ১৮৮৫ সালে পশ্চিমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুর্গাদি নির্মাণের ধুম পড়িয়া গেল; ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৮ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরে ব্যয় হইয়া ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

এই সব সামরিক রেলপথ তৈয়ারী করিতে রেলওয়ে বিভাগের ব্যয় কিরূপ পরিমাণ বাড়িয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। সে কথা যথা-স্থানে আলোচিত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্ত্ত কার্য্য বাবদ বাৎসরিক ব্যয় পূর্ব হইতে তেমন বাড়িল না। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে এই খাতে বাৎসরিক ব্যয় ৩ কোটি ২০ লক্ষ এবং যুদ্ধের পরে কয়েক বৎসরে ৪।৫ কোটি টাকা করিয়া বৎসরে খরচ হইতেছে।

১৯২৩ সালে ব্যয় সঙ্কুলনার্থে যে কমিটি (Inchcape committee) বসে তাঁহারা সামরিক বিভাগের অনেক ব্যয় কমাইয়া দিয়াছিলেন; তাঁহাদের হিসাব মত বাৎসরিক ৭৭ লক্ষ টাকা কমানো যায়। কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ।

সুখের বিষয় সরকারী ব্যয়ের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ছাউনী সমূহের উন্নতির জন্য ৪২ সাড়ে চারি কোটি টাকা ধার্য্য আছে। ইহাতে দেশীয় সৈন্যদের দুঃখের অনেক লাঘব হইবে এবং সমানের চক্ষে দেখিতে পারিলে তাহাদের মানসিক উন্নতি যে অনেক হইবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

রণ-বিভাগের সকল ব্যয়ই স্থল-সৈন্যের জন্য হয় না। ভারত সরকারের কিছু রণতরী বা তজ্জাতীয় জাহাজ আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করিতে অসিয়া ১৬২২ সালে সুরাটের বন্দরে প্রথম নৌবাহিনী রক্ষা করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফাক্টরী রক্ষা—তাহাদের একচেটিয়া বাণিজ্য যাহাতে বিনা বাধায় চলে। জলদস্যু দমনে, ক্রীত-দাস ব্যবসায়ে বহু নৌবাহিনী ব্যবহৃত হইত। বৃটীশ রাজকোষ হইতে ইহার জন্য কোনো ব্যয় কোম্পানী পাইত না।

ভারতীয় সৈন্য বিভাগ

১৮৬২ সালে ভারতীয় নৌবাহিনী (Indian Navy) উঠাইয়া দেওয়া হইল। বৃটীশ সরকার ভারতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করাতে ভারত-সাগরে পৃথক যুদ্ধ জাহাজ রাখিবার কোনো প্রয়োজন থাকিল না। বৃটীশ রণতরী বাহিনী (Royal Navy) ভারত রক্ষা, উভয় দেশের বাণিজ্য রক্ষা, প্রভৃতি যাবতীয় কাজের ভার গ্রহণ করিল। ভারত হইতে কোনো টাকা চাঁদা দিবার কথা তখনও হয় নাই।

১৮৬৯ সালে স্থির হইল যে ভারতবর্ষ তাহার উপকূল রক্ষা, তাহার বাণিজ্য রক্ষার জন্য বৃটীশ রণতরী বাহিনীর সুযোগ বিনা ব্যয়ে পাইবে না। অতএব তাহাকে বৃটীশ রাজকোষে বার্ষিক ৭০,০০০ (সত্তর হাজার পাউণ্ড) বা সাত লক্ষ টাকা করিয়া দিতে হইবে। স্থির হইল ছয়খানি জাহাজ থাকিবে, ইহার মধ্যে তিনখানি নিয়ত আরব্য উপ-

সাগরে ভারতের স্বার্থের জন্য থাকিবে। পারস্যের উপকূলে জাহাজ রাখিবার ব্যয়ভার ভারতকে কেন বহন করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না।

১৮৮৭ সালে জাহাজের সংখ্যা হ্রাস করিয়া চারিখানি করা হইল— ব্যয়ভারও কমিল—৩৮,৫০০ পাউণ্ড বার্ষিক চাঁদা ধার্য্য হইল। তবে এ ছাড়া পারস্য সাগরের জাহাজের ব্যয়ের জন্য ভারতকে শতকরা পাঁচ টাকা দিতে হইল। বৃটীশ রাজকোষ এই সামান্য চাঁদায় খুসী হইলেন না; ভারত-সরকার ৫০,০০০ পাউণ্ড দিলেন। অনেক তর্ক, লেখালেখি চলিল। অবশেষে লর্ড রোজবেরী মধ্যস্থ হইয়া স্থির করিয়া দিলেন যে রণতরী রক্ষা প্রধানত ভারতের স্বার্থ; সুতরাং স্থানীয় নৌবাহিনীর ৪,০০০ পাউণ্ড ব্যতীত ১০০,০০০ পাউণ্ড বৃটীশ সৈন্য-বিভাগে দিতে হইবে। পুরাতন লেনদেন বাবদ (১৮৯৩—৯৫) ভারতবর্ষ এককালীন ১৮৩,০০০ পাউণ্ড দিলেন। তারপর হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ পাউণ্ড বা পনের লক্ষ টাকা দিতে হইতেছে। ইঞ্চকেপ কমিটি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু বোধ হয় ইহা গ্রাহ্য হয় নাই; কারণ এখনো ভারতকে লক্ষ পাউণ্ড বৃটীশ রাজকোষে নৌবাহিনী বাবদ দিতে হইতেছে।

ভারতের নিজস্ব কোনো রণতরী বাহিনী নাই। ইহার ফলে বিগত যুদ্ধের সময়ে জার্মান ক্রুজার এমডেন্ ভারতের উপকূলে আসিয়া জাহাজ ডুবাইয়াছিল। অবশেষে অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজ তাহাকে ধরে। তারপর ভারতীয় সৈনিকদের জলযুদ্ধে কোনো প্রকার শিক্ষা হইতেছে না; জাহাজ ও তাহার আসবাব পত্র সমস্ত বিদেশে নির্মিত হইতেছে বলিয়া শিল্পের দিক হইতে বহু টাকা ভারতের লোকসান হইতেছে।

ভারতীয় নৌবাহিনী এ পর্য্যন্ত বরাবর ভারতের বাহিরে এশিয়া

আফ্রিকার যেখানে কোনো যুদ্ধ বা অশান্তি হইয়াছে, সেইখানে গিয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময়ে ভারত-সাগরের যাহা কিছু পুঁজিপাটা ছিল তাহাও যুদ্ধের জন্য লাগানো হইয়াছিল।

যুদ্ধের নব নব আবিষ্কারের সহিত সমভাবে চলিতে গিয়া আজ ভারতকে এরোপ্লেন রক্ষা করিতে হইতেছে। সুতরাং ভারতের সমর-বিভাগের ব্যয় এই বাবদ বাড়িয়াছে এবং হয়ত উত্তরোত্তর বাড়িবে।

বিমানচারী সৈন্য

ভারত রক্ষার জন্য সামরিক ব্যয়।

১৮৬১—৭৪	গড়ে	১৬ কোটি	২০	লক্ষ	বার্ষিক
১৮৭৫—৯৮	"	২১ "	৫০	"	"
১৮৯৯—১৯১৩	"	২৭ "	৪০	"	"
১৯১৪—১৯২০	"	৫৩ "	৮০	"	"
১৯২১	"	৬৯ "	৯০	"	"
১৯২২	"	৬৫ "	৩০	"	"
১৯২৩	"	৫৯ "	৭০	"	"
১৯২৪	"	৬০ "	৩০	"	"

বৃটীশ সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যের তুলনামূলক ব্যয়।

	১৯১৩	১৯২২	১৯১৩	১৯২২	
	টাকা		টাকা		
বৃটীশ সেনাপতি					ভারতীয় সেনাপতি
বৃটীশ অশ্বারোহী বাহিনীর					
সেনাপতি	৮,৩১২	১১,২৯৪	...	...	...
বৃটীশ পদাতিক	৬,৩৯৩	১০,২৭৭			
দেশীয় অশ্বারোহীর			...	...	..
বৃটীশ সেনাপতি	৯,৩৩২	১৪,২০৭			
দেশীয় পদাতিকের			১,৫৩৯	২,৫২৪	
বৃটীশ সেনাপতি	৮,৬৯১	১০,২৭৭	১,১৯৭	২,১২৪	পদাতিকের
বৃটীশ নন্‌কমিশন কর্মচারী					
বৃটীশ অশ্বারোহীতে	১,৫১২	৩,৫৮৯			
বৃটীশ পদাতিকে	১,৩৮৬	৩,৩০৭			
বৃটীশ সাধারণ সৈনিক					দেশীয় সৈনিক
অশ্বারোহী	১,০৩৬	২,৫২৬	৩১৩	৬৬৯	সওয়ার
পদাতিক	৯৬৫	২,৫০৩	২৮৩	৬৩১	সিপাহী

ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আনিবার জন্য ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ তথাকার সমর-বিভাগকে দান।

১৮৬১—১৮৭৪	১৪ বৎসরে গড়ে	৮৩২,০০০	পাউণ্ড	বার্ষিক
১৮৭৫—১৮৯৮	২৪ ” ”	১,১১১,০০০	”	”
১৮৯৯—১৯১৩	১৫ ” ”	১,৪৮৫,০০০	”	”
১৯১৪—১৯২০	৭ বৎসরে গড়ে	২,০৩১,০০০	”	বার্ষিক
১৯২১		৩,১২২,০০০	”	১৯২১
১৯২২	”	২,৭৭০,০০০	”	১৯২২

৬। শাসন-বিভাগের ব্যয়

ভারত-সরকারের ব্যয় খাতে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় সেনা বা সমর বিভাগে; গত পরিচ্ছেদে আমরা তাহার বর্ণনা করিয়াছি। সমর-বিভাগের পরেই সরকারী খরচ বেশী হয় শাসন-বিভাগে বা Civil Expenditure।

শাসন-বিভাগের প্রধান দুটি ভাগ, যথা (১) সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও শাসন-বিভাগের অন্যান্য ব্যয় (২) বিবিধ বিষয়। প্রথম দফার মধ্যে সাধারণ শাসনব্যবস্থা বা General Administration, আইন ও বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ঐ জাতীয় জনহিতকর কর্মবিভাগগুলি পড়ে; দ্বিতীয় দফায় প্রধানত পেনসন, ফার্লো ছুটি, সরকারী অপিষ আদালতের সামগ্রী, ইত্যাদি বিষয়। 'এক্সচেঞ্জ' বা বিলাতের সহিত বিনিময় এই কোঠার অন্তর্গত।

১৮৬১ সালে বিচক্ষণ অর্থনীতিজ্ঞ উইলসন সাহেব ভারতের আয় ব্যয়ের মধ্যে যুগান্তর আনয়ন করেন; তাঁহার চেষ্টায় সমস্ত finance বা আয়ব্যয় বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত হয়। সেই হইতে এই পর্য্যন্ত ভারত সরকারের সাধারণ শাসন বিষয়ে Civil Administrationএ কিরূপ ব্যয় বাড়িয়াছে তাহা দেখা যাউক।

সিভিল বিভাগ

সিভিল বিভাগের ব্যয়ের মধ্যে কোন কোন কোঠায় কিরূপ ব্যয় হয় তাহা এক্ষণে দেখা যাক।

বেতন ও সিভিল বিভাগের অন্যান্য ব্যয়—যথা সাধারণ শাসন বা Genral Administration। ইহার মধ্যে বড়লাটের বেতন, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও তাঁহাদের কর্মচারীদের বেতন; ভারতীয়

ব্যবস্থাপক ও কর্ম-সভার ব্যয়; সেক্রেটেরিয়েটের ব্যয়, কমিশনরদের মাহিনা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় পড়ে।

সিভিল বিভাগের ব্যয়

বৎসর	সিভিল বিভাগ	বিবিধ বিভাগ	মোট
১৮৬১			৮ কোটি ৫৮ লক্ষ
১৮৭৫	৯ কোটি ৪ লক্ষ	৩ কোটি ৯ লক্ষ	১২ ” ১৩ ”
১৮৮৫	১০ ” ৮১ ”	৩ ” ৫৬ ”	১৪ ” ৩৭ ”
১৮৯৮	১৪ ” ০ ”	৪ ” ৭২ ”	১৮ ” ৭২ ”
১৯১৩	২৪ ” ৭৫ ”	৬ ” ৯০ ”	৩১ ” ৬৫ ”
১৯২০ *	৪১ ” ৪০ ”	০ ” ৪০ ”	৪১ ” ৮০ ”

এই ব্যয় ১৮৭৫ সাল হইতে কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা নিম্নে দিতেছি :—

১৮৭৫	১৮৮৫	১৮৯৮	১৯১৩	১৯২০
১ কো ৫৬ ল	১ কো ৭৩ ল	১ কো ৯৬ ল	২ কো ৯৭	৩ কো ৮৩ ল

এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ আমরা পরে আলোচনা করিব। প্রত্যেক সংস্কার ঘোষণার সহিত শাসন সংস্থিতির মধ্যে অনেক উন্নতির প্রয়োজন হইয়াছে, সেইজন্য ব্যয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২০ সালের পর হইতে এই কোঠার অনেকগুলি ব্যয় প্রাদেশিক শাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ভারত-সরকার ১৯২৫ সালে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

এখন দেখা যাক ভারতের রাজস্ব ও তাহা আদায় করিতে সরকারে কিরূপ ব্যয় হয়।

* ১৯০০ সাল হইতে বিবিধ বিভাগের অধিকাংশ ব্যয় প্রাদেশিক সরকারের উপর অর্পিত হয়।

রাজস্ব আদায়ের ব্যয়

ভারতের রাজস্বের শতকরা ব্যয়

১৮৬০—৬১	১০·৪%	১৮৯০—৯১	৯%
১৮৭০—৭১	১০%	১৯০০—০১	১৪%
১৮৮০—৮১	৯·৫%	১৯১০—১১	১৪%

ইংলণ্ড ও যুক্তরাজ্যে

রাজস্বের শতকরা ব্যয়

১৮৯০—৯১	৩·৫%	১৯১১—১২	২·২%
১৯০০—০১	২·৬%	১৯১৩—১৪	২·৯%

মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে ভারতের রাজস্বের শতকরা ১০৲ টাকা যায় রাজস্ব আদায়ের ব্যয়ে; আর বিলাতে সেই স্থানে যায় শতকরা ৩৲ টাকা। শাসন-বিভাগের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হইয়া আসিতেছে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে অনেক বেশী। বর্মা জয় ও শাসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ গঠন প্রভৃতিতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল তাহা সমস্তই দেশের জনসাধারণের উপর পড়িয়াছিল।

১৮৭১—১৮৮১	জনসংখ্যা বৃদ্ধি	৭%	ব্যয় বৃদ্ধি	৫%
১৮৮১—১৮৯১		১১%		২৮%
১৮৯১—১৯০১		৫%		১১%
১৯০১—১৯১১		৫·৫%		৬০%
১৯১১—১৯১৬				১৫%

১৯২৪ সালে যে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয় তাহা ভারত-সরকারের ব্যয়, বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসের ও তথাকার হাই-কমিশনের বাবদ ধরা হইয়াছে।

নূতন শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে হিসাব পরীক্ষা বা অডিট সাধারণ শাসনের অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে উহা পৃথক্; ইহার ব্যয় ১৯২৪ সালে ছিল ৮৫ লক্ষ টাকা। ইঞ্চকেপ কমিটি এই বিভাগকে প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

অডিট বা হিসাব পরীক্ষা

আইন ও বিচারের জন্য সরকারকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এই ব্যয় জনসংখ্যার বৃদ্ধি অনুপাতে অধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা আমার পূর্বেই দেখাইয়াছি। দেওয়ানী, ও ফৌজদারী আদালত, জজকোর্ট হাইকোর্ট বা চীফকোর্ট, জেলখানার ব্যয় প্রভৃতি এই কোঠায় পড়ে। এই বিভাগের আয় হইতে প্রায় এই বিভাগের ব্যয় চলিয়া যায়; কোর্ট ফী, রাজস্ব ফী প্রভৃতি হইতে সরকারের প্রচুর আয়। কিন্তু এত ব্যয় করিয়াও সরকার প্রজাদের পক্ষে বিচার সুগম করিতে পারেন নাই। একটি মোকদ্দমার বিচার হইতে বহুমাস কাটিয়া যায়, আপিল প্রভৃতিতে বাৎসরিক কাল অতীত হয়। আইন ও বিচারে সরকারের আয় কিরূপ তাহা নিম্নে দিতেছি :—

আইন ও বিচার

১৮৭৫	১৮৮৫	১৮৯৮	১৯১৩	১৯২০
২ কো ৫১ ল	২ কো ৭৭ ল	২ কো ৪৩ ল	৫ কো ১০ ল	৭ কো ৮০ ল

ইহার পর হইতে আইন ও বিচার প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত হয়; সুতরাং ১৯২৪ সালে ভারতীয় শাসনের মধ্যে মাত্র ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়।

আমরা অন্যত্র পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এখানে আমরা উক্ত বিভাগের ব্যয় বিষয়ে কেবল আলোচনা করিব।

মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রয়োজন। ভারতের পুলিশদের বেতন অতি অল্প; অধিকাংশ কনেষ্টবল অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। এদেশে এখন পর্য্যন্ত পুলিশ দেশের লোকের সহায় ও মিত্র হয় নাই। কেহ পুলিশে কাজ করে, এমন কি পুলিশ-কোর্টের উকিল শুনিলেও লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করে। বিশেষত গত বিশ বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের উপর সাধারণ পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের ব্যবহারে দেশের লোকের মন অতিশয় বিরক্ত। ইহার জন্য সরকার কি প্রকার ব্যয় করেন তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়।

পুলিশ ব্যয়

১৮৭৫	১৮০৫	১৮৯৮	১৯১৩	১৯২০
২ কো ৩০ ল	২ কো ৫০ ল	৩ কো ৮০ ল	৫ কো ৯০	১ কো ৬০ ল

১৯২১ হইতে পুলিশের ব্যয় প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত হইয়াছে। সিভিল খরচার মধ্যে পুলিশের ব্যয় এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আইন ও বিচারের জন্য ও পুলিশের জন্য ব্যয় প্রায় একই ছিল; কিন্তু ১৯২০ সালে আইন ও বিচারের জন্য ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; আর ঐ বৎসরে পুলিশের জন্য সকল প্রকারে ১২ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল।

১৯১২ সাল হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে পুলিশের ব্যয় ও সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দিতেছি।

সমগ্র ভারত

	ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রভৃতি	সুপারিণ্টেডেণ্ট সহকারী প্রভৃতি	ইন্সপেক্টর সব্‌ইন্সঃ	সার্জেণ্ট হেড-কনষ্টেবল	অশ্বারোহী পুলিশ	সাধারণ পুলিশ	মোট
১৯১২	৫৩	৮৫২	১১৮৭৬	২৮,০৬৬	২৭৬৭	১,৫৭,৮৫৫	২,০২,৪৫৮
১৯২১	৬৪	৯৮৫	১৩,১২১	২৩,২৮৭	২৬৫৮	১,৫৪,০৮৮	১,৯২,৮১৪

মোট ব্যয়

১৯১২—৫.৭৫ ২৮,৫০৬ টাকা

১৯২১—১০,৫৯,৫৭,৪৫৪ "

বাংলা দেশ

	ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রভৃতি	সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সহকারী প্রভৃতি	ইন্সপেক্টর সব্‌ইন্সঃ	সার্জেণ্ট হেড-কনেষ্টবল	অশ্বারোহী পুলিশ	সাধারণ পুলিশ	মোট
১৯২১	১৫	১৩৬	২.২৫৭	৩,৩৫৫	৪৮	২৩,৯৩৭	২৯,৭৪৮

ব্যয় ১,৮৫,২৭,০৯২

অশ্বারোহী পুলিশ ব্যতীত প্রত্যেকটি কোঠায় বাংলায় পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা ও ব্যয় অধিক। পুলিশের জন্য ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা সরকার ব্যয় করেন। কিন্তু শিক্ষার জন্য খাশ সরকার হইতে ব্যয় হইয়াছিল ১ কোটি ৩৫ লক্ষ; অবশ্য অন্যান্য পথ দিয়া সর্ব সমেত ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ শিক্ষায় জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। তথাচ ইহা অপর্য্যাপ্ত বলিয়া লোকের ধারণা।

বৃটীশ সৈন্যদের ধর্মকর্ম দেখিবার জন্য যেসব পাদরী আছেন তাহাদের বেতন ও খরচা ভারতের অর্থ ভাণ্ডার হইতে দান করিতে হয়। এই খাতেও ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে; যেমন ১৮৭৫ সালে ১৬ লক্ষ ছিল, ১৯২৫ সালে হইয়াছে ৩৩ লক্ষ। যথার্থভাবে ইহাকে সিভিল খরচা বলা যায় না; ইহাকে দেশ রক্ষার মধ্যে ফেলিলেই চলিত।

ধর্ম

রাজনৈতিক খরচ বলিতে বিবিধ জিনিষ বুঝায়। যেমন পারস্য কাবুল প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ কন্সালের জন্য ব্যয়, ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজ্যে রেসিডেণ্ট ও পোলিটিক্যাল এজেণ্টদের ব্যয়; মিলিটারী পুলিশ; সার্বসিডি বা আর্থিক সহায়তা, রাজবন্দীদের ব্যয়, পারস্য সাগরের বোয়া ও বাতির খরচ ইত্যাদি। আফগান যুদ্ধের পূর্বে আমীর ও অন্যান্য সর্দারদিগকে যে টাকা দিতে হইত তাহাও এই খাতে পড়িত। এমন কি মেসোপটেমিয়ার নেভিগেশন কোম্পানীকে ভারতের রাজকোষ হইতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল।

রাজনৈতিক খরচ

আরবের দক্ষিণস্থিত এডেনের রক্ষা ও পোষণের ভার ১৯০০ সালের পূর্বে সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপরই ছিল। সেই সময়ে স্থির হয় যে বৃটীশ সরকার এডেনের কিছু ব্যয় দিবেন; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে হইতে ভারতের উপর এডেনের জন্য ব্যয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে ও ভারতকে

সেই ব্যয় বহন ও করিতে হইতেছে। ইঞ্চকেপ কমিটির মত যে বৃটীশ সরকার অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করেন।

পারস্যের মধ্যে ইংরাজের রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বৃটীশ ও ভারতীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়। কিন্তু এত দূর প্রদেশের স্থায়ী খরচ ভারতবর্ষকে বহন করিতে হইতেছে বলিয়া দেশের রাজনীতিকেরা খুবই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ইঞ্চকেপ কমিটি খরচ কমাইতে বলিয়াছেন মাত্র, ভারতের স্কন্ধ হইতে এই ব্যয় নামাইবার কথা বলিতে পারেন নাই।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ

ভারতের সার্ভে, জলবায়ু পর্য্যবেক্ষণ, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য ভারত সরকার অর্থ ব্যয় করেন; এই সব গবেষণার ফলে ভারতের ভূতত্ত্ব, তাহার গর্ভে কোথায় কি ধাতু খনি আছে, তাহা জগতের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে; ভারতের বনে কত প্রকার উদ্ভিদ্ আছে তাহাদের গুণ আজ পরিক্ষিত; ইহাদের সাহায্যে ভারতের ভূপ্রকৃতি তাহার অতি বিস্তারিত মানচিত্রসমূহ প্রস্তত হইয়াছে। ১৯২০ সালে ইহার ব্যয় ছিল ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। ঐ বৎরের পর কয়েকটি বিষয় প্রাদেশিক শাসনের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

১৯২১ সাল হইতে রিফর্মের সহিত শিক্ষা প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত হইয়াছে। শিক্ষার জন্য ভারতের ব্যয় অন্যান্য সুসভ্য দেশের

শিক্ষার ব্যয়

তুলনায় অতি নগণ্য। শিক্ষার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩০ সালে প্রথম ব্যয় করেন। ১৮৩১ সালে সরকার হইতে ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; তার পর ১৮৭৫ সালে ৮৭ লক্ষ, ১৮৮৫ সালে ১ কোটি ৪ লক্ষ, ১৮৯৮ সালে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৯১৬ সালে ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ, ১৯২০ সালে ৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। অবশ্য ইহা ছাড়া জেলা বোর্ডের ফাণ্ড, মাহিনা, প্রভৃতি

হইতে আয় হয়। ১৯২১-২২ সালে ভারতের শিক্ষার জন্য সর্ব সমেত মোট ব্যয় হইয়াছিল ১৮,৩৭,৫২,৯৬৯, টাকা। বৃটীশ-ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১৯২১ সালে ছিল ২৪ কোটি ৭১ লক্ষ। সুতরাং মাথা পিছু ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা করিয়া শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকার নিজস্ব রাজস্ব হইতে দিয়াছেন ৯,০২ লক্ষ। (Progress of Education in India, 1917-1922 see p. 15) এই ব্যয় ভারতের অধিবাসীদের তুলনায় অতি সামান্য।

ভারতের জনপ্রতি খাশ সরকারী খরচ কি পরিমাণ এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে দেখা যাক্।

১৮৭৫	মাথা পিছু	৯ পাই,
১৮৮৫		১০ "
১৮৯৮		১১·৩ "
১৯১৩		৵১০
১৯২০		।৭
১৯২১-২২		।৵০

ইংলণ্ড-ওয়েলসে ১৯২১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ; শিক্ষার জন্য তথাকার শাসন সরকার ব্যয় করিয়াছিলেন ৮ কোটি ৩১ লক্ষ পাউণ্ড বা ১২৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। (Statesman Year Book 1923, p. 32)। ইহার মধ্যে রাজস্ব বা ট্যাক্স হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সেখানে সরকার প্রদত্ত টাকা জনসংখ্যা প্রতি ১ পাঃ ¾ শিঃ করিয়া পড়ে ও শিক্ষার সমস্ত ব্যয় মাথা পিছু ২ পাঃ ৪ শিঃ বা প্রায় ৩৩৲ টাকা করিয়া পড়ে। সে জায়গায় ভারতের পড়ে ।৵০ আনা।

উত্তম শিক্ষা ও সুন্দর স্বাস্থ্য জাতিকে বড় করে। ভারতের শিক্ষার জন্য যেমন স্বল্প ব্যয় হয়, স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় তদপেক্ষা আরও কম হয়।

'চিকিৎসা বিভাগ' পরিচ্ছেদে আমরা এবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। এত বড় মহাদেশের এই জনসংখ্যার তুলনায় ১৯২০ সালে মাত্র ৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল অর্থাৎ আট জন লোকের জন্য এক টাকা পরিমাণ ব্যয় বৎসরে সরকার হইতে হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর হইতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত হইয়াছে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ

ভারতের শতকরা ৮০ জন লোক চাষী; ভারতের প্রধান আয় ভূমি হইতে; কাঁচা মাল প্রস্তুত করিয়া ও তাহাই চালান দিয়া ভারতকে অর্থ উপার্জন করিতে হয়। অথচ এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতির জন্য যে ব্যয় হয় তাহা নগণ্য। ১৯২০ সালে মাত্র ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা কৃষি বিভাগে ব্যয়িত হয়; অবশ্য বড় বড় চাকুরে ও কর্মচারীদের বেতন ইহারই অন্তর্গত। যথার্থ ভূমির উন্নতির জন্য যাহা পৌঁছায় তাহা সামান্য।

কৃষি

১৯১৮ সালে ভারত-সরকার যুদ্ধের মাল সংগ্রহের জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র কোথায় কিরূপ সামগ্রী উৎপন্ন করিতে পারা যায় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ইচ্ছায় কমিশন বসান। ভারতেও অনুরূপ কমিশন বসিয়াছিল ও যাহাতে এ দেশের শিল্পের উন্নতি হয়, তজ্জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ আয়োজন সুরু করিয়াছিলেন। যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হইয়া যাওয়াতে সরকারের উৎসাহ মন্দা পড়িয়া আসিল। রিফর্মের পর হইতে শিল্পোন্নতি প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ভারতীয় সরকারের ব্যয় এ খাতে সামান্য।

শিল্প

ভারতের সহিত ইংলণ্ডের আকাশপথে যোগ হইতে পারে কি না তাহার বিচার চলিতেছে, এবং হয়ত এখানে ব্যয় শীঘ্রই বাড়িবে। ১৯২৪ সালে ২২ হাজার টাকা এজন্য ব্যয়িত হইয়াছিল।

আকাশযান

এই সব খরচ বাদে বিলাতের হাই-কমিশনরের অপিষের ব্যয়, ভারতীয় দ্রব্য-ভাণ্ডার (বিলাতের Indian stores department) প্রভৃতির জন্য ১৯২৪ সালে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

বিবিধ সিবিল ব্যয়

দুর্ভিক্ষ বীমা

এই বিভাগের মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্যয়, রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক পেনশন, অন্যান্য পেনশন, ষ্টেশনারী ছাপাখানায় খরচ পড়ে।

রাজনৈতিক পেনশন

ভারতবর্ষ জয় করিবার সময়ে বহু রাজা, সামন্তদের সহিত সন্ধির সময়ে কাহাকে কাহাকে কিছু টাকা দিবার সর্ত হয়; সেই সর্তানুসারে ১৮৭৫ সালে ৮১ লক্ষ টাকা দিতে হইত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব পেনশন ব্যক্তিগত ছিল বলিয়া উহা কমিয়া ১৯২৪ সালে ৩০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল।

পেনশন

সরকারী চাকুরীর পেনশন আছে। রিফর্মের পূর্বে ভারতীয় সার্বিস বা ইম্পিরিয়েল চাকুরেদের পেনশন বিলাতী টাকায় বা পাউণ্ডে ধরা হইত; প্রাদেশিক চাকুরেদের পেনশন টাকায় ও প্রদেশের হিসাবের মধ্যে ফেলা হইত। ১৯২০ সালের পর হইতে হিসাব অন্যপ্রকার হইয়াছে। পেনশন কিরূপ ভাবে বাড়িতেছে নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে।

১৮৭১	১৮৭৫	১৮৮৫	১৮৯৮
৭০ লক্ষ	১,৩০ লক্ষ	২,৫০ লক্ষ	৩,৭০ লক্ষ
১৯১৩	১৯২০	১৯২৪	
৪,৮০ লক্ষ	৪ ৭০ লক্ষ	১ ২৯ লক্ষ।	

এই পেনশনের ব্যয় ৬০ বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বাড়িয়াছে। এই টাকার মধ্যে মোটা মাহিনার সাহেবরা বিলাতে থাকেন ও

পাউণ্ডে তাঁহাদের টাকা দিতে হয় বলিয়া ভারতকে বিনিময়ে অনেক টাকা লোকশান দিতে হয়। বিনিময় আমাদের দিকে সুবিধাজনক থাকিলে বিলাতের জন্য তাহা পূরণ করিয়া দিতে হয়। সিভিল সার্ভিসের চাকুরেদের পেনশন ১০,৬৬৬ টাকা; কিন্তু ১০০০ পাউণ্ডের নীচে হইতে পারিবে না অর্থাৎ বিনিময়ের অসুবিধার জন্য আমাদিগকে প্রত্যেক ১০,৬৬৬৲ টাকার পেনশনে ১৫,০০০৲ টাকাও দিতে হয়। এমনও হইয়াছে যে ২,৫০০৲ টাকা যার পেনশন, সে বিনিময়ের সুযোগে ৩২৮১৲ টাকা বা ১৪৮১৲ টাকা বেশী পাইয়াছে। (Dr K. T. Shah. Sixty Years of Indian Finance, p 119 etc)

সরকারী চাকুরীয় পেনশন অনেক রকমের আছে, যেমন কোনে চাকুরেকে টাকার অভাবে ছাড়াইয়া দিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পেনশন দিতে হয়। অসুস্থ হইয়া বা অক্ষম হইয়া পড়িলে কার্য্যানুপাতে একটা পেনশন দেওয়া হয়; বয়স হইয়া গেলে অনেককে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়; তাহারাও তদনুপাতানুসারে পেনশন পান; নির্দ্ধারিত সর্ব কার্য্য করিয়া যাহারা অবসর গ্রহণ করেন তাঁহারা তাঁহাদের বেতনের অর্দ্ধেক পেনশন পান। কিন্তু এখানেও নিয়ম আছে। অনেক বড় বড় কর্মচারী শেষ জীবনে বহু হাজার টাকার চাকুরী করিতে করিতে অবসর লন; সে-ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পেনশন হইতেছে ৫।৬ হাজার টাকা। সিভিল সার্বিসে কর্মচারীদের ১০০০ পাউণ্ডের অধিক পেনশন দেওয়া হয় না; হাইকোর্টের জজেরা ১,২০০ পাউণ্ড বাৎসরিক পান। বড়লাট, ছোটলাট নির্বাচিত বা মনোনীত মন্ত্রীদের পেনশন নাই।

কর্ম কাল শেষ হইলে পেনশন হয়; কিন্তু বহুকাল চাকুরী করিতে করিতে কর্মচারীরা ক্লান্ত হইয়া ছুটি গ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরীতে যাহাদের ছুটি কম তাঁহারা এই ছুটি পাইয়া থাকেন। এই ফার্লোতে

বিশেষভাবে য়ুরোপীয় চাকুরেদের সুবিধা। কর্মচারীরা কার্য্যকালের এক-চতুর্থাংশ বা ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক বেতনে 'ছুটি পান। বিলাতে সাহেব কর্মচারীদের অবস্থান কালে টাকা পাঠানো হয়; এবং বিনিময়ের কোনো অসুবিধা হইলে ভারতীয় রাজকোষ হইতে পূরণ করিয়া দেওয়া হয় "in periods of falling exchange, the offiicers are given a further concession in the shape of favourable rate of exchange at which there allowances are given." (Vakil, op 175). এই বাবদ ১৯২০ সালে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়; ৪৫ বৎসর পূর্বে সেখানে ব্যয় ছিল ২৫ লক্ষ টাকা।

এই সব ব্যয় ছাড়া বিবিধ ও বিনিময় খাতে কিছু ব্যয় হয়; কখনো এই বাবদ ভারত সরকারের লাভও হয়।

৭। জাতীয় ঋণ ও সুদ

সভ্য জগতে ভারতবাসীর কোনো 'জাতি' বা nation বলিয়া পরিগণিত না হইলেও ভারতবর্ষের 'জাতীয় ঋণ' আছে। ভারতবর্ষ নিজের জন্য দেশ জয় করে না, নিজের রাজ্য নিজে শাসন করে না, যুদ্ধ করে না—জাতি বলিয়া সমাদর পাইবার মত যে-সব গুণ থাকা উচিত তাহা তাহার কিছুই নাই, অথচ 'জাতীয়ঋণে'র দায়ে সে কেমন করিয়া পড়িল, তাহা দেখা যাউক।

জাতীয় ঋণ ইংরাজ আগমনের পূর্বে ছিল না। ঋণ করিয়া রাজ্য চালানো যায়, এমন বুদ্ধি বোধ হয় তৎকালীন রাজনীতি-বিশারদদের

মাথায় আসে নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ শাসন করিতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ জাতির হইয়া এশিয়ার সর্বত্র যুদ্ধ করিত; আয় ব্যয় সম্বন্ধে কড়াক্কড়ি হিসাব পত্র ছিল না। প্রয়োজন হইলেই তাঁহারা ধার করিতেন; কারণ কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থিত অংশীদারদিগকে নিয়মিত টাকা দিতে হইত।

কোম্পানীর ঋণ

এইরূপে ১৮৩৪ সালে 'ভারতের ঋণ' হইল ৩৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। তারপর আর পনের বৎসরের মধ্যে আফগান ও শিখযুদ্ধের জন্ত ১৮৫০ সালে জাতীয় ঋণের পরিমাণ হইল ৪৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। ইহার পর সিপাহী বিদ্রোহের দমনের জন্য যে ব্যয় হইল তাহাও ভারতের ঋণ। জয় করিয়া রাজ্য যাঁহারা পাইলেন, ব্যয়টা তাঁহাদের রাজকোষ হইতে না হইয়া ভারতের উপর পড়িল। ১৮৬০ সালে জাতীয় ঋণ ৬৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কোম্পানীর হাত হইতে ভারত শাসনের ভার নিজে লইলেন, কিন্তু ঋণের ঝুঁকি পড়িল ভারতবাসীর উপর। এ ছাড়া কোম্পানীর অংশীদারগণ যাহারা এতকাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, তাঁহাদের অংশের মূল্য কোথায় যাইবে? সুতরাং স্থির হইল অংশীদারগণকে ১২ মিলিয়ন পাউণ্ড বা ১২০ কোটি টাকা দিতে হইবে। ইংলণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষ একরূপ ক্রয় করিলেন। অথচ সেই টাকাটা ভারতবর্ষকেই দিতে হইল; উক্ত টাকাটি ভারতের জাতীয় ঋণের মধ্যে ধরা হইল। (Shah-Sixty years, p. 34) বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া অংশীদারদের এই টাকা শোধ করা চেষ্টা হইল; ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত টাকা দিয়াও ৪৫ লক্ষ পাউণ্ডের ঝুঁকি থাকিয়া গেল; সুতরাং ঐ টাকাটা ভারতে স্থায়ী জাতীয় ঋণের মধ্যে যোগ করিয়া দেওয়া হইল। ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞেরা কোম্পানীর ঋণ বা ভারত জয় করিবার খরচ জোগাইয়া তাহাকেই পুনরায় জাতীয় ঋণ নামে অভিহিত করিতে একেবারে

নারাজ। কোম্পানীর আমলে মোটা সুদে অনেক টাকা ধার করা হইয়াছিল; কিন্তু জাতীয় ঋণ শোধ করিতে বা কমাইতে তেমন চেষ্টা কখনো পরিচালকগণ করেন নাই। ইংলণ্ডের খাস অধীন হইবার পর হইতে হিসাবপত্রের দিক হইতে অনেক জিনিষ পরিষ্কার হইয়াছে এবং জাতীয় ঋণ শোধ বা কমাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে।

মানুষ ঋণ করে দুই কারণে; এক ঋণ করিয়া ব্যবসায় করে, কারবার খোলে, কোম্পানী গড়ে; আর এক ঋণ করিয়া ইমারত করে, বিলাসিতা করে, মারামারি করিবার জন্য লাঠিয়াল রাখে ইত্যাদি। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে যেমন একথা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও

'কেজো' ঋণ ও বাজে ঋণ

সেই কথা খাটে। প্রথম শ্রেণীয় ঋণে দেশের ক্ষতি হয় না, তাহাকে আমরা 'কেজো' ঋণ (Productive) বলিব; দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋণে দেশের লোককে সুদ গণিতে হয়, তাহাকে 'অকেজো ঋণ' বলিতে হয়। সরকার ঋণ করেন কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া, পোষ্টাল সার্টিফিকেট দিয়া যুদ্ধবণ্ড বিক্রয় করিয়া। এদেশের ঋণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকেজো ঋণ ছিল। আমরা দেখিয়াছি যে কেজো অকেজো উভয় শ্রেণীর ঋণ বাড়িতে বাড়িতে যুদ্ধের পূর্বে ২৭৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা হইয়াছিল; ইহার সুদ বৎসরে দিতে হইত ৯ কোটি ৫০ লক্ষ। কিন্তু সরকারের বরাবর চেষ্টা যে অকেজো ঋণ কমাইয়া ফেলা। ১৮৮৮ সালে অকেজো ঋণের পরিমাণ ছিল ১০৯ কোটি টাকা; তাহা সরকারের চেষ্টায় ১৯১৪ সালে কমিয়া মাত্র ১৯ কোটি টাকায় দাঁড় করানো হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে পূর্বোল্লিখিত ২৭৪ কোটি টাকায় জাতীয় ঋণের মধ্যে সরকারী পূর্ত্ত বিভাগ (Public works), যথা রেলপথ নির্মাণ, খাল বা পয়ো প্রণালী খনন, দিল্লীসহর নির্মাণ ইত্যাদি কর্মে ২৬১ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। কেজো কাজে যে-সব টাকা সরকার ধার করিয়া ব্যয়

করিয়াছেন তাহর মধ্যে রেলওয়ে ও পয়োপ্রণালী হইতে সরকারের আয় হয় ও সেই হইতে 'অকেজো' দেনার সুদ ও আসল শোধে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। তবে রেলওয়ে হইতে আয় আরম্ভ হইয়াছে বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে। ভারতের রেলপথ নির্মাণে উনবিংশ শতাব্দীতে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল; তখন সরকারের লোকসানের পালা; ঐ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৫০ বৎসরে সরকারকে ৫২ কোটি টাকা গচ্ছা দিতে হয়; বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরে কিন্তু সরকারের লাভ হয় ১১ কোটি টাকা; এবং এখন দেখা যাইতেছে যে রেলওয়ের আর লোকসান হইবে না। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর ভারতবাসীকে সমুদয় লোকসানের ঝুঁকি, সুদের দায় ভোগ করিতে হইয়াছিল। তবে রেলওয়ের মূলধন বিদেশের, তাহার ফল ভারতের অর্থনীতির উপর কি হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

যুদ্ধের সময়ে ভারতের তথাকথিত জাতীয় ঋণ বাড়িয়া যায়। ভারত সরকার ইংলণ্ডের বিপদের সময়ে ১৫০ কোটি টাকা সাহায্য দান করেন; ১৯১৮ সাল হইতে ছয় বৎসর নূতন সংস্কার প্রভৃতির জন্য ভারত সরকারে ব্যয় বাড়িয়া চলে; নূতন নূতন আয়ের অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় রাজকোষে টাকা কমতি হয়। এই ঘাটতি মিটাইতে প্রথমত নূতন নূতন ট্যাক্স বা কর ধার্য ও তাহাতেও সব না কুলাইলে ধার করিয়া সরকারী কাজ চালানো হয়। ইহার ফলে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ধার হয়।

কিন্তু ভারতের জাতীয় ঋণ দেশের পক্ষে পীড়াদায়ক কেন হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। ভারত সরকার এদেশে টাকা ও ইংলণ্ডে পাউণ্ড ধার করিয়াছেন। পাউণ্ডের এক পেনিও ভারতবাসীর নয়; কিন্তু এদেশের অনেক টাকা সাহেবরা ধার দিয়াছেন। ১৮৬৯ সালে ভারত-সচিব দুঃখের

ভারতে টাকা ঋণ ও পাউণ্ড ঋণ ইংলণ্ডে

সহিত বলিয়াছিলেন যে ভারতের অধিবাসীদের সরকারী ঋণের অংশ দিন দিন কমিতেছে। ১৮৪৭ সালে কোম্পানীর কাগজের শতকরা ৩৬ ভাগ ছিল দেশীয়দের, ১৮৬১ সালে ৩৪ ভাগ ও ১৮৬৭ সালে মাত্র ২৪½ ভাগ। ভারত-সচিব ভারতে যাহাতে টাকা অধিক পরিমাণে তোলা যায় তাহার জন্য বলেন। ভারতবর্ষের কর্মচারীদের চেষ্টায় দেশীয়দের দ্বারা কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছিল। কিন্তু তেমন করিয়া আন্তরিক ভাবে দেশের মধ্যে টাকা তুলিবার চেষ্টা হয় নাই; কারণ যুদ্ধের সময়ে দেখা গিয়াছে যে চেষ্টা করিলে দেশের মধ্যে মূলধন মেলে। টাকা পাওয়া যায় না বলিয়া বিলাতে প্রচুর পরিমাণে পাউণ্ড তোলা হইতে লাগিল; সরকারী ইমারত, কেল্লা, রেলপথ নির্মিত হইয়া চলিল। ১৮৯৮ হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত টাকা-ঋণ (Rupee-debt) ১১২ কোটি হইতে ১৪৫ কোটি উপরে বা ৩৩ কোটি টাকা বাড়িল; কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে বিলাতে সংগৃহীত পাউণ্ড-ঋণ ১২৪ মিলিয়ন্ হইতে ১৭৭ মিলিয়ন্ বা ৫৩ মিলিয়ন্ অর্থাৎ ৭৯½ কোটি টাকা বাড়িল। যুদ্ধের সময়ে দেখা গেল যে চেষ্টা করিলে ভারতে প্রচুর টাকা ধার পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে বৎসরে তিন কোটি টাকা গড়ে টাকা-ঋণ উঠিত, সেই স্থানে ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে যথাক্রমে ৫৩ ও ৫৭ কোটি টাকা সরকার ধার পাইলেন। ইহার পরেও বহু কোটি টাকা এদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ১৯২১ সালে পুনরায় ভারত সচিব ৭½ মিলিয়ন্ পাউণ্ড বিলাতে ধার করিলেন। শতকরা ৭ হারে সুদ—দশ বৎসরে প্রদত্ত, প্রভৃতি অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়াতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় টাকার এগার গুণ টাকা উঠিয়া গেল। এই ব্যাপারে ভারতে তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল।

ভারতের জাতীয় ঋণ কিরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছি। (Vakil, p. 296)

	সাধারণ ঋণ	Productive			মোট ঋণ
		রেলওয়ে	জলসেচন	মোট	
১৮৯৮	১০৫.৫	১৫৯.০	৩২.৫	১৯১.৫	২৯৬.৫
১৯১৪	১৯.২	৩৩৩.০	৫৯.১	৩৯২.১	৪১১.৩
১৯২০	১১৯.৭	৩৭৮.৬	৬৭.৫	৪৪৬.১	৫৬৫.৪
১৯২২	১২০.৬	৪২৬.১	৬৬.১	৪৯২.২	৬১২.৮

	১৮৭২	১৮৯৮	১৯১৩
(১) টাকা-ঋণ ভারতে তোলা (কো)	৬৬.৪	১১২.৬	১৪৫.৭
(২) পাউণ্ড-ঋণ বিলাতে তোলা (মি)	৩৯.	১২৪.২	১৭৯
(৩) ১ম-এর সুদ (কোটি)	২.৮	৩.৯	৫.১
(৪) ২য়-এর সুদ (পাঃ মিঃ)	১.৮	৩.৮	৫.৬
(৫) ১-এর য়ুরোপীয়ানদের অংশ(কো)	৪৮.	৫৫.৯	৬৯.১
(৬) ১-এর দেশীয়দের অংশ (কোটি)	১৭.১	৪৬.৪	৭৬.৬
(৭) টাকা-ঋণ ইংলণ্ডে বাঁধা (কোটি)	১৩.	২১,৪	১০.১

ভারতীয় ও প্রাদেশিক শাসন-বিভাগ সমূহের মোট ঋণ

	ভারতে	ইংলণ্ডে	মোট
১৯২২	৪৩০.৫ কোটি	২০৫.১ কোটি	৬,৩৫,৭২,২০,৪৭৭ টাকা
সুদ	২২,৬৩,২১,৩৫৬	১০,৯৪,৭২,৮০৬	৩৩,৫৭,৯৪,১৫২ টাকা

৮। ব্যয় বৃদ্ধির কারণ

ভারত সরকার প্রয়োজন অনুসারে ও অনুপাতে ব্যয় করেন না বলিয়া তাঁহাদের বদনাম আছে। যেখানে অল্প ব্যয়ে কার্য্য চলে সেখানে অতিরিক্ত ব্যয় ও যেখানে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন সেখানে কৃপণতা হইতেছে বার্ষিক বাজেটের প্রধান দোষ। সরকারের ব্যয় কেন বাড়িতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই অনুপাতে কাজের বৃদ্ধি, (২) বিস্তৃত ভূখণ্ড শাসন (৩) শাসন যন্ত্রের উন্নতি জনিত কর্মচারী বৃদ্ধি (৪) বিবিধ বিভাগ স্থাপন, (৫) মহার্ঘ্যতা ও অন্যান্য কারণে বেতনাদির বৃদ্ধি ও (৬) বিদেশী কর্মচারী নিয়োগ হইতেছে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ।

ব্যয় বৃদ্ধির কারণ

একদল লোক বলেন যে সুশাসনের জন্য ভারতবর্ষকে বৃটীশ কর্মচারী পোষণ করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহার জন্য ভারতীয় করদাতাকে যে পরিমাণ অর্থ যোগাইতে হয় তাহা সুশাসনের নামেও দেওয়া যায় কিনা এ প্রশ্ন আজ শিক্ষিত ভারত করিতেছে। ইংরাজ শাসনের প্রথম অবস্থায় ও ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে সুদক্ষ কর্মচারী নাও পাওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু শতাধিক বৎসর য়ুরোপীয় সাহিত্য পাঠ ও সভ্যতা লাভ করিয়া ভারতবাসী স্বকর্ম স্বল্প বেতনে করিতে পারে না এ-কথা তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়।

১৮৩৪ সালের আক্ট প্রথম ঘোষণা করিল যে ভারতের কাজকর্মসমূহ জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রদত্ত হইবে। ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাও সেই কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিল যে শিক্ষা,

সামর্থ ও চরিত্র গুণই রাজকর্ম পাইবার একমাত্র নিদর্শন হইবে; জাতি, বর্ণ, ধর্ম প্রভৃতি ভেদবুদ্ধি প্রাধান্য লাভ করিবে না। কিন্তু কাগজে যাহা ঘোষিত হইল, কর্মে তাহা প্রতিপালিত হইল না। লর্ড লীটন লিখিয়াছেন (১৮৭৮ সালে) যে পূর্বোক্ত আক্ট্ পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার কেমন করিয়া ভারতবাসীকে ফাঁকি দেওয়া যায়, তাহার ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন, "no sooner was the Act passed than the Government began to devise means for practically evading the fufilment of it" * * Since I am writing confidentially, I do not hesitate that both the Government of England and of India appear to be, up to the present moment, unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear." (Quoted from the Poverty and Un-British Rule in India, by Naoriji pp. 317-318).

১৮৩৪ ও ১৮৫৮ সালের ঘোষণা

লীটনের ডেসপ্যাচ

ভারতশাসন ও সংরক্ষণ কর্মে দেশীয় ও বিদেশীয়দের নিয়োগ কিরূপভাবে হইয়াছে তাহার তালিকা দেখিলেই আমরা বুঝিব যে লর্ড লীটন ১৮৭৮ সালে যে-কথা গোপনে বিলাতে জানাইয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে সকলেই প্রকাশ্যে জানে। ১৯১৬ সালে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাহাতে ১৯১৩ সালের পাব্লিক সার্ভিস বা সরকারী চাকুরীর হিসাব নিকাশ কিছু পাওয়া যায়। ১৯১৩ সালে ২০০৲ ও তদূর্দ্ধবেতনের মোট চাকুরী ভারতে ছিল ১১,০৬৪টি। ইহার মধ্যে—

দেশীয় ও শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর বেতন ও অনুপাত

ইংরাজ ও আংলোইণ্ডিয়ান্	৬,৪৯১	অর্থাৎ	৫২%
ভারতবাসী ও আংলোইণ্ডিয়ান্	৫,৫৭৩	„	৪৮%

আরও দেখা যাক্—

বেতনে	ইংরাজ	আংলো	ভার
২০০৲—৩০০৲	১২%	২৪%	৬৪%
৩০০৲—৪০০৲	১৯%	১৯%	৬২%
৪০০৲—৫০০৲	৩৬%	১৫%	৪৯%
৫০০৲—৬০০৲	৫৮%	১১%	৩১%
৬০০৲—৭০০৲	৫৪°/.	১০°/.	৩৬°/.
৭০০৲—৮০০৲	৬৮°/.	৮°/.	১৪°/.
৮০০৲—৯০০৲	৭৩°/.	৬°/	২১°/.
৯০০৲—১০০০৲	৯২°/.	৪°/.	৪°/.

১৯১৩ সালে য়ুরোপীয় পাবলিক কর্মচারীরা—

বেতন পাইতেন	৪৫,৬৮	হাজার	টাকা
আংলো-ইণ্ডিয়ান্	৬,২০	„	„
ভারতবাসী	১৬,৯৫	„	„

গড়ে এক একজন		ইংরাজ কর্মচারীর	বেতন ছিল	৯৯৩৲
„	„	আংলো-ইণ্ডিয়ান্	„	৩৯০৲
„	„	ভারতবর্ষীয়	„	৩৭১৲

বড় বড় সরকারী কর্ম প্রায় এক প্রকার ইংরাজদের একচেটিয়া; যেমন ১৮৮৭সালে হাজার টাকা মাসিক বেতনের উপর সরকারী কাজের শতকরা ৯৮°/. ছিল সাহেব ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের হাতে; অবশিষ্ট শতকরা ২°/. ছিল ভারতবাসীদের। ১৮৯৭ সালে শতকরা ৯৫°/. সাহেব ও ইঙ্গভারতীয়দের, ৫°/. ভারতীয়দের; ১৯১৩ সালে যথাক্রমে

৯৩°/. ও ৭°/.। বর্তমানে রিফর্মের পর ভারতীয়দের চাকুরী বাড়িয়াছে।

ভারতশাসনের জন্য ইংরাজদের পক্ষে দেশীয় লোক নিযুক্ত না করিয়া বৃটীশ কর্মচারী নিয়োগ করা নানাদিক হইতে অসমীচিন হইয়াছে। প্রধানত ভারতে ইংরাজ কর্মচারীরা কাজ শিখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া শেষজীবনে বিলাতে গিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। ইহাতে লাভ হয় বিলাতে ইংরাজ জাতির; এতগুলি সুদক্ষ কর্মচারীর অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষ পায় না। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষ যে-টাকা পেনশন বলিয়া তাহাদের দেয় তাহা বিলাতে ব্যয়িত হয়। তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকা বিলাতের ব্যাঙ্কে খাটে, সেখানকার শিল্প বাণিজ্য নানা ভাবে এই টাকার সাহায্যে বড় হয়। তাহারা এসব বিষয়ে যতখানি বড় হয়, ভারতবাসীরা এখানে ততখানি দরিদ্র হয়; কারণ সেই সব টাকা দেশীয় লোক পাইলে টাকাটা দেশেই থাকিত, দেশের ব্যাঙ্কে খাটিত, দেশের শিল্প বাণিজ্য উদ্বৃত্ত টাকার সাহায্যে বড় হইত।

বৃটীশ কর্মচারী নিয়োগের ফল

১৯১২ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিবেদন ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের গোলমালে সেটি কিছুদিন চাপা পড়িয়া যায়। নূতন শাসন সংস্কার ঘোষণার সময়ে ১৯১৭ সালে ভারত-সচিব সেই পুরাতন কথাই বলিলেন যে সরকারী চাকুরীতে কোনো প্রকার বর্ণ বিচার হইবে না। তাঁহাদের মতে বিলাতে যেমন ভারতীয় চাকুরীর জন্য কর্মচারী জোগাড় করা হয়, ভারতেও তদ্রূপ করা উচিত। প্রত্যেক সার্ভিসে কি অনুপাতে ভারতীয় প্রতি বৎসর নিযুক্ত হইবে এবং কি হারে তাহার বৃদ্ধি হইবে সে-বিষয়ে তাঁহারা মীমাংসা চাহিলেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের সংখ্যা শতকরা ৩৩ জন হইবে, এবং বাৎসরিক ১½ হারে সেই বৃদ্ধি হইবে। বেতন সম্বন্ধে বলিলেন যে

সামগ্রীর মূল্যের ও জীবনযাত্রায় আদর্শ পরিবর্তনের সহিত উহা নির্দ্ধারিত হইবে। বাঁধা সময়ের মধ্যে বেতন বাড়িবে এবং প্রত্যেকে যাহাতে সর্বোচ্চ বেতন পায় তাহার সুবিধা দিতে হইবে। সাধারণ সর্বোচ্চ পেনশন হইবে বাৎসরিক ৬০০০৲ টাকা,—১ শিঃ ৯ পেঃ টাকার বিনিময় দিতে হইবে। বড় বড় কর্মচারীদের বিশেষ পেনশনের ব্যবস্থা হইবে। এ ছাড়া ছুটি, ছুটির বেতন সম্বন্ধে অনেক সুবিধা এই সময়ে সিভিলিয়ান-দের দেওয়া হইল।

সিবিল সার্বিস ও ভারতবাসী

মোট কথা পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট উভয়ই ভারতবর্ষের দিক হইতে চাকুরীকে বিচার করেন নাই, ইংরাজদের চাকুরীর দিক হইতে ভারতবর্ষকে বিচার করিয়াছিলেন। স্যর আবদার রহিম কমিশনে যে পৃথক নোট দিয়াছিলেন তাহাতে যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহাই সিভিল সার্ভিসের সমস্যার একমাত্র সমাধান: তিনি-লিখিয়াছিলেন—

"The importation of officials from Europe should be limited to case of clear necesity, and the question therefore should be asked in which services and to what extant should appointments be made from England"

আবদার রহিমের পৃথক মন্তব্য

কোন্ কোন্ সার্ভিসে কি পরিমাণ ভারতবাসী নিযুক্ত করা হইবে তাহা নহে, কোন্ কোন্ কর্মে কয়জন ইংরাজ লাগিবে তাহা বিচার করিয়া কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে।

নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর নানা বিভাগে ভারতবাসীরা উচ্চ কর্ম পাইয়াছেন; দেশীয় মন্ত্রীদের হস্তে কতকগুলি বিষয় অর্পিত হওয়ায় একদল ইংরাজ কর্মচারীও দেশীয় মন্ত্রীদের অধীনে কাজ

করিতে হইতেছে। কতকগুলি সাহেব কর্মচারী দেশীয়দের অধীনে কাজ করিবেন না বলিয়া উপযুক্ত পরিমাণ পেনশন্ লইয়া কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আর একদল যাহাদের চাকুরীর প্রতি মায়া অধিক তাহারা দল বাঁধিয়া যাহাতে আরও অধিক বেতন ও সুবিধা পাওয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিল। ভারতীয় আসেমব্লীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহারা পুনরায় এক কমিশন বসাইলেন। এই কমিশন লী-কমিশন (Lee Commission) নামে খ্যাত হইয়াছে।

সিবিল সার্বিসের অসন্তোষ

এই কমিশনের প্রস্তাবানুসারে সিভিলিয়ানদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। তাহাদের চাকুরী রক্ষিত বা Reserved বিষয়ের অন্তর্গত; স্বয়ং ভারত-সচিবের ফারমনে তাঁহাদের নিয়োগ; প্রাদেশিক বা ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহারা আপীল করিতে পারিবেন। পূর্বোক্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্দেশ মত তাঁহাদের পোষণের জন্য ভারত-সরকারেব ব্যয় ১½ কোটি টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল; ইহাতে তাঁহারা খুসী নহেন। তাঁহারা সমুদ্রপারে আসিতেছেন বলিয়া আরও বেতন চান; এই সমুদ্রপারের উপরি (oversea allowances) তাঁহারা বিলাতে পাঠাইতে পারিবেন, কিন্তু তাহার বিনিময় বা Exchange ১ শিঃ ৪ পেন্সের স্থানে টাকায় ২ শিলিং করিয়া দিতে হইবে।

১৯২৪ লী-কমিশনের সুপারিশ

এতদ্ব্যতীত সাহেব কর্মচারী ও তাঁহাদের পত্নীদের জন্য বিলাত হইতে যাওয়া আসার সময়ে ৪ খানি রিটার্ণ টিকিট এবং প্রত্যেক শিশুর জন্য একবারকার পাথেয় খরচ দিতে হইবে। কোনো কর্মচারী এদেশে মারা গেলে ভারতীয় রাজকোষের ব্যয়ে তাঁহার পরিবারকে বিলাতে পৌছাইয়া দিতে হইবে। এই জন্য প্রত্যেক কর্মচারীকে মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া

আরও দিতে হইবে ; সেই টাকা 'Passage Fund' নামে অভিহিত হইবে। সরকারী বাসার জন্য শতকরা দশ টাকার বেশী দেওয়া হইবে না ; কিন্তু যদি সরকারী বাসা না পাওয়া যায় এবং কর্মচারীকে বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে হয় তবে শতকরা দশটাকা হিসাব ছাড়া অতিরিক্ত যাহা লাগিবে সরকারকে তাহা দিতে হইবে।

চিকিৎসার জন্য সাহেব ডাক্তারের প্রয়োজন। তাহাও সরকারকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য ভারতীয় রাজকোষের কিছু ব্যয় বাড়িয়াছে। এইরূপ অনেক সুবিধা সুযোগ লী-কমিশন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহার বিচার হয়। দেশীয় সদস্যগণ একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে ইঞ্চকেপ কমিটি বসাইয়া সেদিন ব্যয় কমানো হইল, ইহারই মধ্যে লী-কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী এত লক্ষ টাকার ব্যয় বাড়াইতে তাঁহারা নারাজ। কিন্তু তর্কের শেষ হইয়া গেল যখন বড়লাট বাহাদুর তাঁহার শক্তি বলে এই সরকারী বিলটিকে 'সার্টিফাই' করিলেন।

ভারতের শাসন ব্যবস্থা মাথাভারী। গুণের আদর ও গুণীর সম্মানের একমাত্র মাপকাটী অর্থ। ফলে ভারতের সমাজের মধ্যে ধনী নির্ধন মধ্যবিত্ত এই তিনটি 'জাতি' বা শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। দরিদ্র কৃষক ও

মোটা মাহিনা ও অপব্যয়

শ্রমজীবিদের প্রদত্ত অর্থ হইতে কয়েকজন দেশী হউক আর বিদেশী হউক লোককে অতিরিক্ত অর্থ দিয়া পোষণের ফলে তাহাদের মধ্যে বিলাসীতা, বিচ্ছিন্নতা, আত্মসুখপ্রিয়তা আসিয়াছে। ভারতের রাজপুরুষদের বেতন অসম্ভব রকমের বেশী। পৃথিবীর আর কোথায় সরকারী কর্মচারীরা এত বেশী বেতন পান না। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী পাইতেন বৎসরে ৫,০০০ পাউণ্ড বা ৭৫,০০০ টাকা ; ফ্রান্সের সভাপতি পান ৪,০০০ পাউণ্ডে বা ৬০,০০০৲ টাকা। বেশীর মধ্যে পান 'লর্ড চীফ

জাষ্টিস ও লর্ড হাই-চানসেলার ১০,০০০ পাউণ্ড করিয়া; ফ্রান্স ও জার্মেনীয় বিচারকেরা বৎসরে দুই হাজার পাউণ্ডের কম করিয়া পান। সেইস্থানে ভারতের মন্ত্রীরা পান ৮০,০০০৲ ও প্রাদেশিক মন্ত্রীরা ৬০,০০০৲ করিয়া। ভারতে বিচারকেরা পান ৪২ হাজার হইতে ৬০,০০০৲ করিয়া। অথচ ঐ সব দেশে ভারতবর্ষ হইতে বহুগুণে ধনী।

৯। 'হোমচার্জ'

ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া ভারতবর্ষকে কতকগুলি কারণের জন্য ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসর কিছু টাকা দিতে হয়। ইংরাজদের দেশ বা 'হোমে' সেই টাকা পাঠাইতে হয় বলিয়া তাহার নাম 'হোমচার্জ'। বিলাতে ভারতের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট এবং হাই-কমিশনরের ব্যয়, মিলিটারী ও সিভিল বিভাগের জন্য সৈনিক ও কর্মচারী সংগ্রহ, শিক্ষা ও পেনশন বাবদ ব্যয়, সরকারী নানা বিভাগের জন্য দ্রব্যসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি ক্রয়, রেলওয়ে ও অন্যান্য বাবদ ধারের সুদ প্রভৃতির জন্য যে-টাকা বিলাতে প্রতি বৎসর পাঠাইতে হয়, তাহাকে হোমচার্জ বলে। এই টাকা ১৮৫৬ সালে ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড ১৮৬১ সালে ৮০ লক্ষ, ১৮৭৫ সালে ১ কোটি ২৮ লক্ষ, ১৮৯৮ সালে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ, ১৯১৩ সালে ২ কোটি পাউণ্ড ও ১৯২০ সালে ৩ কোটি পাউণ্ড বা ৪৫ কোটি টাকা ছিল।

কাহাকে বলে

বাণিজ্য ছাড়া রাজনৈতিক সম্বন্ধহেতু ভারতকে কি ভাবে এই

টাকাগুলি দিতে হইতেছে তাহা আমরা সংক্ষেপে বর্ণিব। ১৮৩৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর বণিক থাকিল না; তাহারা ইংরাজ জাতির হইয়া ভারত শাসন করিবার অধিকার পাইল। ১৮৩৪ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত ভারত ক্রয় বাবদ ৬,৩০,০০০ পাউণ্ড কোম্পানীকে দিতে হয়। ইংলণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতকে ক্রয় করিলেন, অথচ টাকাটা ভারতকে দিতে হইল। ইহার পরেও ৪½ মিলিয়ন্ পাউণ্ড ভারতের জাতীয় ঋণে গাঁথা হইয়া যায়।

কোম্পানীর পাওনা শোধ

মিউটিনীর পর ভারতবর্ষ খাশ পার্লামেণ্টের হাতে গেল; মিউটিনী-দমনের খরচ ৪০ মিলিয়ন্ পাউণ্ড ভারতকে দিতে হইল। তারপর বড় বড় দুর্ভিক্ষের খরচ, দ্বিতীয় তৃতীয় আফগান যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যয়ের সুদ বিলাতে দিতে হয়। এই সুদ বাবদ ভারতবর্ষকে ১৮৬১-১৮৭৫ পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ পাউণ্ড, ১৮৭৫-১৯১৩ পর্য্যন্ত ২৫ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯১৩ হইতে ১৯২০ পাউণ্ড ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইয়াছে।

সুদ

রেলওয়ে পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে সরকার বিলাত হইতে গারান্টী দিয়া টাকা তোলেন; রেলওয়ে হওয়ায় ভারতবর্ষের অনেক সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডের এই মূলধনের জন্য ভারতবর্ষকে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা সুদ দিতে হইতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে রেলওয়ে পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

ভারতের জন্য সিভিল শাসনের কতকগুলি মোটা ব্যয় ইংলণ্ডে হয়। ভারত-সচিব, ইংলণ্ডের ক্যাবিনেটের একজন মন্ত্রী। তাঁহার বেতন ও সহকারী সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সদস্যগণের এবং ভারত সংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগের খরচপত্র সমস্ত ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়। ১৯১৪

ইণ্ডিয়া আপিস ও হাই-কমিশনর

সালে ইণ্ডিয়া আপিষের ব্যয় ছিল ২ লক্ষ পাউণ্ড; ১৯২১ সালে উহা হইয়াছিল ৩,৬৫,৮০০ পাউণ্ড। ইণ্ডিয়া আপিষের ব্যয় ভারতবর্ষকে কেন দিতে হয় ইহার রহস্য আজ পর্য্যন্ত কেহ উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। কাবিনেটে বৈদেশিক-সচিব আছেন, ঔপনিবেশিক-সচিব আছেন, কাহারও বেতন কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা দেয় না। এ বিষয়ে অনেক আলোচনার ফলেই বোধ হয় নূতন সংস্কারের সময় স্থির হয় যে ভারত-সচিবের বেতন পার্লামেণ্ট দিবেন। পার্লামেণ্ট ১,৩৬,০০০ পাউণ্ড প্রথম চারি বৎসরের বার্ষিক ব্যয় বলিয়া মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইণ্ডিয়া আপিষের ব্যয় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী; ১৯২১ সালে ৩,৬৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছিল অর্থাৎ অবশিষ্টটি ভারতকেই দিতে হইয়াছিল।

সংস্কারের ফলে হাই-কমিশনর নামে একটি নূতন পদ ইংলণ্ডে সৃষ্ট হইয়াছে। ভারত-সচিবের কতকগুলি কাজ হাই-কমিশনরের উপর অর্পিত হইয়াছে। তাঁহার বেতন আপিষের খরচ ইত্যাদি সবই ভারতবর্ষ হইতে যায়; ১৯২১ সালে সে-বাবদ ২,৭৯,০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। মোট কথা ইণ্ডিয়া আপিষ ও হাই-কমিশনরের আপিষ উভয় মিলিয়া পূর্ব হইতে অনেক খরচা বাড়িয়া গিয়াছে;

১৯১৩ সালে ২,০৬,৮৩৬ পাউণ্ড।

১৯২২ সালে ৫,৩৩,৩০০ পাউণ্ড।

মোট কথা ভারত শাসন করিতে, পালন করিতে যাহা কিছু ব্যয় হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে ভারতকেই দিতে হয়। এমন কি ইণ্ডিয়া অপিষের যে বাড়ী লণ্ডনে হইয়াছে তাহা ৫,৮৮,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৮৮ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ভারতের অর্থে নির্মিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে পারস্য ও চীনের সহিত বৃটীশদের রাজনৈতিক সম্বন্ধের জন্য যে ব্যয় হইত, তাহা ভারতকে বহুকাল বহন করিতে হইয়াছে;

১৯০১ সালের পর চীনের ও ১৯০৫ সালের পর পারস্যের ব্যয় আর ভারতকে দিতে হয় নাই।

পূর্বে আমরা বলিয়াছি যে ফার্লো পেনশন সার্ভিস-ফাণ্ড বাবদ অনেক টাকা ভারতকে প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়। প্রায় পাঁচ বৎসর অন্তর প্রত্যেক ইংরাজ উচ্চ কর্মচারী ফার্লো লইয়া থাকেন, বিলাতে বসিয়া তাঁহারা এই টাকা পান; সুতরাং ইহাও 'হোমচার্জের' অন্তর্গত। কেননা দেশী কর্মচারী হইলে ও তাহারা ছুটি লইয়া দেশে থাকিলে ঐ টাকা বিদেশে যাইত না।

ইংলণ্ডে এই বাবদ কি পরিমাণ টাকা গিয়াছে তাহার একটা ধারণা পাঠকগণ নিম্নলিখিত তালিকা হইতে করিতে পারিবেন :—

১৮৬১—১৮৭৪	গড়ে বার্ষিক	৯,৫৩,০০০ পাউণ্ড
১৮৭৫—১৮৯৮	... ...	১৭,০৩,০০০ ”
১৮৯৯—১৯১৩	... ...	২৩,৬৬,০০০ ”
১৯১৩—১৯২০	... ...	২৪,২০,০০০ ”

বর্তমানে এই টাকাগুলি বিদেশে যাইবার যুক্তি সঙ্গত আর কোনো হেতু নাই। ভারতবাসীরা জ্ঞানে বিদ্যায় এখন ইংরাজের সমকক্ষ হইয়াছে; তাহারা যে অপদার্থ নহে, তাহা বহু ক্ষেত্রে সুপ্রমাণিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাংশে উপযুক্ত লোকের অভাব সত্যই ছিল; কিন্তু বর্তমানে সে অজুহাত আর চলে না।

বিলাতি সামগ্রী ক্রয়

ভারতবর্ষের সরকার বহু সামগ্রী—যেমন অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের সরঞ্জাম—বিলাতে ক্রয় করেন। ভারতের তরফ হইতে এই সব সামগ্রী কি পরিমাণ প্রতি বৎসর ক্রয় করা হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দিতেছি :—

১৮৬১—১৮৭৪	গড়ে বার্ষিক	১০ লক্ষ	পাউণ্ড
১৮৭৫—১৮৯৮	... ...	১২ "	পাউণ্ড
১৮৯৯—১৯১৩	... ...	১৬ "	পাউণ্ড
১৯১৩ সালে	৪৮,৮৬,০০০	পাউণ্ড	
১৯১৮ "	১,১৩,৯৩,০০০	"	
১৯২০ "	১,৩২,৯২,০০০	"	

হোমচার্জের অন্তর্গত যেসব খরচ ধরা হয়, তাহার মধ্যে একমাত্র (store) সামগ্রী ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ কিছু জিনিষ পায়। এখন প্রশ্ন এই ভারতবর্ষ কি এইসকল সামগ্রী উৎপন্ন করিতে পারে না? কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত সরকার কখনো আন্তরিকতার সহিত এ বিষয়ে মন দেন নাই; তাঁহারা ইংলণ্ডে সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্ম যতটি ইচ্ছুক ভারতে জিনিষ ক্রয় করিবার জন্ম সেরূপ আগ্রহ বা উৎসাহ দেখান নাই। ১৯২০ সালে (Stores Purchase Committee) সামগ্রী-ক্রয়-বৈঠক বলেন যে এ বিষয়ে ভারত সরকারও যেমন উদাসীন, বিলাতের ইণ্ডিয়া অপিষ ও তেমনি উদাসীন। ভারতের শিল্পোন্নতির চেষ্টা হইলে আজ এই খাতে প্রায় ২০ কোটি টাকা ভারত সরকার এ দেশের শিল্পী কারিগর ও ফাক্টরীকে দিতে পারিতেন।

৮১ বৎসরে ১১৮২ কোটি টাকা হোমচার্জ

১৮৩৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বাণিজ্যের এক-চেটিয়াত্ব চলিয়া যায়। সেই হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত এই ৮১ বৎসরে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সম্বন্ধহেতু ১১৮,২৫,০০,০০০ পাউণ্ড বা ১১৮২ কোটি টাকা ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়াছে। নৌরজী, রমেশচন্দ্র, গোখলে, জোশি প্রভৃতি, ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞেরা ইহাকে 'শোষন' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর দিকে স্তর থিওডর মরিসন তাঁহার 'Economic Transition in India' নামক গ্রন্থে এই প্রথা

সমর্থন করিয়া দেখাইয়াছেন যে ১৮৯৯-১৯০৮ সালে বাৎসরিক ৮০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া ভারত হইতে গিয়াছে। (Vakil p 322).

ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যয় অত্যন্ত বেশী বলিয়া অনেকে সমালোচনা করেন। এই বিপুল ব্যয় কমাইবার দিকে সরকার বাহাদুরের এখন সকল মনোযোগ দেওয়া উচিত, নতুবা ভারতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত।

দুর্ভিক্ষ বৈঠকে একদল সভ্যের মত

১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষের বৈঠকে অল্প যে-কয়জন সভ্য প্রতিবেদনে পৃথক অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

১। ভারতের রাজস্ব কেবল মাত্র বা প্রধানত ভারতের সুখ সুবিধার দিক হইতে তাকাইয়া ব্যয়িত হয় না ; ইহার উদাহণ—

(ক) ভারত রক্ষা ;—ভারতের সীমান্ত-নীতি বহুবার পরিবর্তিত হইয়া উহা ভারতের প্রাকৃতিক বাধা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং যুদ্ধের ব্যয় ও দায়িত্ব অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। [পূর্ব্বে সিন্ধু প্রদেশের পর্ব্বত-মালা পশ্চিম-সীমান্তের চরম পংক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। পরে বেলুচিস্থান ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে এবং দক্ষিণ পারস্যের মধ্যে ঠিক রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা না হইলেও ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া সেখানে স্বার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময়ে মেসোপটেমিয়ায় প্রায় সমস্ত ভারই ভারতবর্ষ বহন করিয়াছিল। সীমান্ত বৃদ্ধির ফলে ১৯০১ সালে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ নূতন সৃষ্টি করা হয়]

(খ) ভারতের রেলপথ বিস্তার দেশের প্রয়োজন বা তাহার সাধ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কখনো হয় নাই। [১৯১৮-১৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতের রেলপথে ব্যয় হইয়াছে ৫৮০ কোটি টাকা, ১৯১৯-২০ সালে পুনরায় ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। রেলওয়ে হইতে লাভ সরকার কয়েক বৎসর হইতে পাইতেছেন। গত শতাব্দীতে রেলপথ খাতে

৫২ কোটি টাকা লোকশান হইয়াছিল অর্থাৎ গড়ে বৎসরে ১ কোটি টাকা। ১৯০৯ সালে অর্থাৎ রেলপথ সৃষ্টি হইবার ৬০ বৎসর পরে রেলওয়ে হইতে শতকরা ১২ ভাগেরও কম আয় হইত। গত কয়েক বৎসর যে-লাভ হইতেছে তাহা ৬০ বৎসরের বিপুল লোকশানকে এখনো পূরণ করিতে পারে নাই।

(গ) সৈনিক বা শাসন বিভাগের য়ুরোপীয় কর্মচারীদের বেতন, প্রমোশন, পেনশন, ফার্লো সম্বন্ধে যে-সকল নিয়ম আছে তাহাতে সাধারণ লোকের ভ্রম হইতে পারে ভারতবর্ষ কর্মচারীদের জন্য, কর্মচারীরা ভারতবর্ষের জন্য নহে।

[ভারতের ব্যয়-বৃদ্ধির প্রাধন কারণগুলি উপরে প্রকাশ পাইয়াছে। সাম্রাজ্যবৃদ্ধি, বৃটীশ বাণিজ্য-বিস্তার এবং য়ুরোপীয় কর্মচারীদের সুবিধা সুযোগ দিবার দিকে সরকারের অধিক দৃষ্টি সম্বন্ধে অপবাদ যে কোনো কোনো স্থলে নিতান্ত মিথ্যা নয় তাহা যুদ্ধের পূর্বে দেখা যাইত। পাব্লিক সার্বিস কমিশনের প্রতিবেদন সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইলে এ ধারণা আরও দৃঢ় হইত। কিন্তু বর্তমানে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি ও নীতি উদারপথ অবলম্বন করিয়াছে।]

২। ভারতের ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহার উদারণ প্রদত্ত হইতেছে:—

(ক) শাসন-বিভাগ পরিচালনের জন্য দেশের উপযুক্ত শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ না করিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী বেতন দিয়া বিদেশী কর্মচারী পোষণ করায় অনেক টাকা ব্যয়িত হইতেছে।

(খ) যথার্থ কর্মের অপেক্ষা কর্মচারীদের তদারক ও প্রতিবেদন প্রেরণ এবং শাসন কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণের বাহুল্য অধিক।

(গ) যুদ্ধ না থাকিতেও সর্বদা যুদ্ধের উপযোগী করিয়া স্থায়ী সৈন্য রক্ষা করার বৃথা ব্যয় বহন; ইহার বদলে স্থানীয় লোককে যুদ্ধবিদ্যা

শিক্ষাদান অধিক প্রয়োজনীয়। য়ুরোপে এত স্থায়ী সৈন্য রক্ষা করার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ইহার ফল বিগত যুদ্ধের সময়ে দেখা গিয়াছিল। শিক্ষিত সৈন্য মরিয়া গেলে তাহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্য আর কেহই ছিল না; তখন তাড়াতাড়ি সৈন্য সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল]

(ঘ) দেশীয় সৈন্যের অনুপাতের অনেক বেশী বিদেশী সৈন্য রক্ষার ব্যয় সহজে হ্রাস করা যায়। [যুদ্ধের সময়ে কেবলমাত্র ১৫,০০০ সৈন্য ভারতে ছিল; কিন্তু সে-সময়েও ভারতবাসীরা কোনো প্রকার উপদ্রব করে নাই।]

(ঙ) দেশীয় সৈন্য-বিভাগে য়ুরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ; এবং ভারতীয়দের উচ্চ কর্মচারী হইবার অধিকার না থাকায় অনেক য়ুরোপীয়কে অধিক বেতন দিয়া পোষণ করিতে হয়। ইহাতে ব্যয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। [গত যুদ্ধের সময়ে কয়েকজন ভারতবাসীকে উচ্চ কর্মচারী হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।]

(চ) কোম্পানীর সাহায্যে রেলপথ খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া ও তাহাদিগকে বিবিধ প্রকারের সুযোগ দিয়া সরকারের লোকসান হয়। ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বেসরকারী রেল কোম্পানীগুলিকে খাস সরকারী করিবার জন্য বহুকাল হইতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

৩। ভারতীয় রাজস্বের বণ্টন ঠিক ভাবে করা হয় না।

(ক) তথাকথিত দেশরক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ ব্যয়িত হয়; দেশের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য (যেমন শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা) যে-অর্থ ব্যয় হয় তাহা নিতান্ত সামান্য।

(খ) প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রদেশের প্রয়োজনীয় কাজে অপেক্ষাকৃত কম অর্থ ব্যয়িত হয়; ভারতীয়-সরকারের ব্যয়ের কথা প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রগুলিকে সর্বপ্রথম ভাবিতে হয়। [উদাহরণ

স্বরূপ নূতন দিল্লীর স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়ের সহিত সমগ্র ভারতের স্বাস্থ্যের জন্য খরচ তুলনা করিতে পারা যায়।]

(গ) ভারতবর্ষের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির চেয়ে যাওয়া-আসার রেলপথ প্রভৃতির উন্নতির দিকে সরকারের দৃষ্টি অধিক। [অথচ দেশের মধ্যে বড় বড় রাস্তা নাই বলিলেই হয়; এবং গ্রামের পথঘাটের কথা সকলেরই জানা আছে; এদিকে সরকারের দৃষ্টি দিলে দেশের যথার্থ উপকার হইত।]

ভারতের বর্তমান রাজ্যশাসনের ব্যয়ভার বহন করা ভারতবাসীদের সামর্থের বাহির।

১০। রেলপথ

ইংলণ্ড রেলপথের আবিস্কর্তা। সেখানে প্রথম গাড়ী চলিবার দশ বৎসরের মধ্যেই (১৮৪৫ সালে) ইংলণ্ডের তদকালীন বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ আর, এম, ষ্টীফেন্‌স্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাদের কাছে ভারতে রেলপথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন। কোম্পানীর কর্তারা ভয়ে ভয়ে

প্রথম রেলওয়ে স্থাপনের চেষ্টা

ভারতের কয়েকটি বড় বড় জায়গা হইতে রেলপথ নির্মাণের অনুমতি দিলেন। সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ ১২০ মাইল রেলপথ প্রথম খুলিবার অনুমতি পান। এ ছাড়া বোম্বাই হইতে কল্যাণ ৩৩ মাইল, মান্দ্রাজ হইতে আরকোনাম্‌ ৩৯ মাইল রেলপথ

নির্মাণ সুরু হয়। কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর সময়ে যথার্থভাবে রেলপথ বিস্তার আরম্ভ হয়। বেসরকারী কোম্পানীর হাতে রেলপথ নির্মাণের ভার সমর্পণ করিবার জন্য তিনি বিলাতের বোর্ডের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার পত্রে বেসরকারী মূলধন উঠাইবার সপক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা দরকার। তিনি বলেন সরকারী অথবা বেসরকারী ইঞ্জিনীয়ারগণ উভয়েই যথাসাধ্য স্বল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন, অথচ একদল সুদক্ষ কর্মচারীকে সাম্রাজ্যের অন্যান্য গুরুতর কার্য্য হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিলে দেশের কল্যাণ হইবে না; বাণিজ্য বিস্তারের সহায়তা করা কোনো গভর্ণমেণ্ট কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; বিশেষতঃ ভারতবর্ষের লোক স্বভাবতই সরকারী সাহায্য মুখাপেক্ষী। এই সব পরমুখাপেক্ষা দেশের উন্নতি ও অগ্রসরের বিষম অন্তরায়। এইজন্যই ভারতের পক্ষে ইংরাজের অর্থ ও সামর্থ্য উভয়ই নিয়োজিত হইবার প্রয়োজন আছে; ইংলণ্ডের মূলধনে রেলওয়ে নির্মিত হইলে ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে এবং নানা ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকর্মে ইংরাজের শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত হইবে। লর্ড ডালহৌসীর এই যুক্তি ইংলণ্ডের মূলধনওয়ালাদের মনোমত হইবার আরও কারণ ছিল। যেসব কোম্পানী বিলাতে টাকা তুলিতে চেষ্টা করেন তাহারা বলিল যে ভারত-সরকার যদি তাহাদের মূলধন লোকসান হইবে না এইরূপ কোনো ব্যবস্থা করেন তবেই তাহারা টাকা ব্যয় করিবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বলিলেন যে তাহারা টাকা তুলিলে সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে নিষ্কর জমি দিবেন ও মূলধনের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ গারাণ্টি দিবেন। কোম্পানীর তহবিলে খরচপত্র বাদে যাহা থাকিবে তাহার অর্দ্ধাংশ গভর্ণমেণ্ট পাইবেন, অপরার্দ্ধ কোম্পানীর

লর্ড ডালহৌসীর প্রতিবেদন Report

অংশীদারগণের হস্তগত হইবে —ইহাই ছিল চুক্তিপত্রের সর্ত্ত। এই সকল সর্ত্তানুসারে কোম্পানী নিজ নিজ কর্ম্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই সরকারী রেলওয়ে-বোর্ডের অধীন। কোম্পানী ইচ্ছামত খরচপত্র বাড়াইতে পারেন না; সামান্য ব্যয়বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে বোর্ডের অনুমতি লইতে হয়। কোম্পানীর রেলপথ, ব্রিজ, গাড়ী, ইঞ্জিন, কারখানা, ভাড়া, সময়সূচী প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার সরকারের আছে। এই সকল রেলওয়ে কোম্পানী ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা পাইয়াছে; তাহার পর কোম্পানীর জিনিসপত্রের ন্যায্য মূল্য দান করিলে এই সকল রেলপথ একেবারে খাস সরকারী সম্পত্তি হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া ২৫ বা ৫০ বৎসরের শেষে সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা হইলে রেলকোম্পানীকে জিনিষের দাম ছাড়া এই কয় বৎসরের মূলধনের সুদ দিয়া রেলসম্পত্তি খাস করিয়া লইতে পারিবেন। ১৮৫৯ সালের মধ্যে ভারতে ৫০০০ মাইল রেলপথ বিস্তারের জন্য বিলাতে ৫২ কোটি টাকা মূলধন উঠিল।

কোম্পানীর গারাণ্টী

১৮৬২ সালে মাঝে একবার ভারত সরকারের মত বদলাইল; সিপাহী বিদ্রোহের পর তাঁহারা রেলপথ নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা খুব ভাল করিয়া বুঝিলেও 'গারাণ্টী' দিয়া সুদ গণিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন। গভর্ণমেণ্ট বলিলেন এবার হইতে যাহা প্রয়োজন একেবারে দিয়া দিব বছর বছর 'গারাণ্টীর' টাকা দিতে পারিব না। সরকার বিনা খাজনায় জমি দিলেন, ও মাইল পিছু ১৫০০ টাকা ব্যবস্থা করিলেন। এছাড়া যে-সেতু নির্ম্মাণের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার উপর খরচ পড়িবে তাহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৩ সালে মাত্র দুইটি কোম্পানী রেলপথ খুলিল। প্রতিবৎসর বিনা আয়াসে শতকরা ৪।৫ টাকা হারে সুদের গারাণ্টী পাইয়া

গারাণ্টী দিতে সরকারের অনিচ্ছা।

ও যদৃচ্ছা ব্যয় করিয়া কোম্পানীরা এতই অতিলোভী হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা ভারত সরকারের ন্যায্য প্রস্তাবে সম্মত হইল না। ১৮৬৯ সালে স্যর জন্ লরেন্স তৎকালীন রেলওয়ের অবস্থা লিখিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া মূলধনদাতাকে নিজেদের দায়িত্বে ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু এই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে; এবং সরকার বাহাদুর যদি মূলধন দাতাগণকে 'গারাণ্টী' না দেন ত' কেহ তাহাদের অর্থ ভারতবর্ষে ব্যয় করিতে আসিবে না।"

ভারত সরকার শক্ত হইয়া থাকিলেন; তাঁহারা কিছুতেই 'গারাণ্টী' দিবেন না। ১৮৬৯ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লরেন্স লিখিলেন,

১৮৬৯-১৮৮০
সরকারী চেষ্টায়
রেলপথ

"বর্ত্তমান রেলপথগুলি তৈয়ারী করিবার সময়ে ব্যয় সম্বন্ধে যদি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিত তবে তাহারা কোন্ কালে গারাণ্টী হইতে মুক্তিলাভ করিতেন এবং উপরন্তু কোম্পানীরাই ভারত-সরকারকে শতকরা ৫ টাকা হারে মুনফা দিত।" লর্ড লরেন্স কোম্পানীদের যদৃচ্ছব্যয়-বাহুল্য দেখিয়া খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক মাইল রেলপথ নির্মাণে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। ১৮৬৯ সালে দেখা গেল যে ষোল বৎসরের মধ্যে রেল নির্মাণ খাতে ভারত সরকারের ১ কোটি ৬৬½ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছিল। ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে কোম্পানীগুলিকে ৬০ কোটি টাকা সুদ বাবদই প্রেরণ করা হইয়াছিল।

১৮৬৯ সাল হইতে রেলপথ নির্মাণের খরচ বেশী হয় বলিয়া সরকার স্বয়ং মিটার মাপের (৩ ফিট্ ৩ ইঞ্চি) পথ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পর্বটিতে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। অনেকগুলি বড় বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; এ ছাড়া

সামরিক কারণের জন্য সিন্ধু ও পঞ্জাবের রেলপথগুলিকে মিটার মাপ হইতে প্রশস্ত পথে পরিণত করিতে হইল। ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইল এবং অন্যদিকে নূতন পথ নির্মিত হইতে পারিল না। ১৮৬৯ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সরকার নিজ ব্যয়ে সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরবঙ্গ ও বর্মাতে প্রায় ২১৭৫ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ সালে মোট ৬১২৮ মাইল রেলপথ ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লর্ড লরেন্সের শাসনকালের পর হইতে কয়েক বৎসর ভারত রাজকোষের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠে। ১৮৬৯ সালে সরকারের মত বদলাইতে স্থরু হইল এবং তাঁহারা পুনরায় বিলাতী কোম্পানীদের আহ্বান করিলেন। প্রথমত সরকার বাহাদুর বলিলেন যে তাঁহারা কোনো সর্তে বাঁধা পড়িবেন না—কোম্পানীদের নিজের দায়িত্বে কাজ করিতে হইবে। চারিটি মাত্র কোম্পানী গঠিত হইল; কিন্তু কেহই টিকিল না; কেহ দেউলা হইল, কাহারও অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাড়াতাড়ি 'গারাণ্টী' দিলেন। ১৮৭৮ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পর, ইহার কারণ ও নিরাকরণের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার সদস্যগণ প্রতিকারের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে রেলপথ প্রসারের জন্য বলিলেন। সুতরাং সরকার বাহাদুর পুনরায় গারাণ্টী দিয়া কোম্পানীদের ডাকিতে লাগিলেন। দেশীয় রাজগণের মধ্যে হায়দ্রাবাদ রেলপথ খুলিবার জন্য গারাণ্টী দিয়া কোম্পানীর কাজ আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে রুশের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। ১৮৮০ সালের পর হইতে এই দুই জাতির মধ্যে মনান্তর চলিতেছিল; সেই মনান্তর যতই পাকা হইতে লাগিল ভারত-সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে পথঘাট ততই দৃঢ় করিবার দিকে

পুনরায় গারাণ্টী প্রদান।

রাজনৈতিক কারণ ও দুর্ভিক্ষ দমন।

মন দিতে লাগিলেন। সমরকুশল মন্ত্রীগণ বলিলেন যে ভারতবর্ষের রেলপথের সহিত বেলুচিস্থানের রাজধানী কোয়েটা ও সীমান্ত নগর চমনের সহিত যোগ স্থাপন না করিলে বিপদ আসন্ন, এই রেলপথ নির্মাণে অসংখ্য টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। বোলন হরনাই প্রভৃতি গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া রেলনির্মাণে যে পরিমাণ টাকা লাগিয়াছিল তাহা দিয়া রূপার পথ হইত।

লর্ড রীপনের সময় হইতে পুনরায় কোম্পানীদের গারান্টী দিয়া কাজ করানো সুরু হয়। তবে পূর্বের গারান্টী অনুসারে গ্রেট্ পেনিনসুলার রেলওয়ের অনেকখানি পথ (১৮৮২-৮৫), বেঙ্গল-নাগপুর (১৮৮৩-৮৭) দক্ষিণ-মহরাট্টা (১৮৮২) ও আসাম-বেঙ্গল (১৮৯১) নির্মিত হইল।

১৮৯৩ সালে সরকার পুরাপূরি গারান্টী-প্রথা না রাখিয়া রিবেট-প্রথা করেন। সোনা রূপার বাজারে খুব গণ্ডগোল হওয়ায় ভারত-সরকারের টাকা লোকসানের পালা সুরু হয়। তখন তাঁহারা আর পূর্ব্বের গারান্টী না দিয়া রেল কোম্পানীদের মোট খরচের শতকরা ১০ ভাগ টাকা দেওয়া স্থির করিলেন। গভর্ণমেণ্ট জমি বিনা খাজনায় পূর্বের ন্যায় দিতে থাকিলেন। ছোট খাট তিনটা কোম্পানী কাজ সুরু করিল বটে, কিন্তু এ সর্তে বড় বেশী কেহ রাজি হইল না। ১৮৯৬ সালে রেল আরও লোভনীয় করিবার জন্য সরকার বলিলেন তাঁহারা শতকরা তিন টাকা হারে গারান্টী দিতে রাজি আছেন; এ ছাড়া লাভের ভাগ দিতেও রাজি অথবা রিবেট ভাল সর্তে দিতে তাঁহারা প্রস্তুত। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না।

রিবেট প্রথার চেষ্টা

সরকার এযাবৎ বরাবর রেলওয়ে নির্মাণের জন্য ব্যয় করিয়াছেন; কোম্পানীরা বিলাতে কিছু টাকা তুলিতেন এবং ভারত সরকার

তাহাদের হাতে অবশিষ্ট টাকা দিতেন; ইহারা মধ্যবর্তিত্ব করিয়া রেলপথ চালাইত। সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামরিক দিক হইতে যেসব স্থানে রেলপথ খোলা প্রয়োজন সেই দিকেই দৃষ্টি দিতেন; দেশের মধ্যে যেসব পথে ভবিষ্যতে বাণিজ্য বাড়িতে পারে ও আয় হইতে পারে সরকার সেগুলি কোম্পানীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরা পূর্বেই দুর্ভিক্ষ কমিশনের রেল সম্বন্ধে তাগিদের কথা ও রুশের সহিত বিবাদে বিষয় বলিয়াছি। সরকার প্রতিবৎসর রাজস্ব হইতে ৩.৩১/২ কোটি টাকা রেলপথ নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা করিতেন। এই ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া আসিতেছে এবং ১৯১৯ সালে ২৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রেল-বিভাগের জন্য ধার্য্য হইয়াছিল। এক বৎসরে এত ব্যয় ইতঃপূর্বে আর কখনো হয় নাই।

সরকারের ব্যয়

ইতিমধ্যে দেশের আভ্যন্তরীন বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এতদিন বৈদেশিক বাণিজ্য তেমনভাবে বাড়ে নাই বলিয়া মোটের উপর রেলকোম্পানীদের লাভ কম হইতেছিল। লাভ হইতেই সরকারের ভাগ পাইবার কথা; কিন্তু সরকার সেই টাকা নগদ না লইয়া কোম্পানীর প্রাপ্য গারান্টীর সুদ ও মূলধন শোধ বাবদ দিতেন। এই টাকা বরাবর দেওয়া হইতেছে বলিয়া সরকারের লাভ বহুকাল হয় নাই; কিন্তু এইভাবে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় রেলপথই এখন খাস সরকারী সম্পত্তি; তবে সরকার বাহাদুর কোম্পানীদের হাত হইতে রেল চালাইবার ভার তুলিয়া না লইয়া তাহাদের হাতেই বহাল রাখিয়াছেন। ১৯০০ সালে অর্থাৎ রেলপথ নির্মাণ সুরু হওয়ার ৪৭ বৎসর পরে সরকার রেলপথ হইতে প্রথম লাভ করেন। ১৯০৭ সালে দেখা যায় যে পূর্বের বৎসরে গড়ে প্রায় দুই মিলিয়ন পাউণ্ড (তিন কোটি টাকা) করিয়া সরকারের লাভ হয়। পর বৎসর ভারতের দুর্বৎসর ছিল; সরকারের

সরকারের লাভ লোকসান

১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা লোকসান হইল। কিন্তু তারপর হইতে সরকারের আর লোকসান হয় নাই। ১৯১৯ সালে লাভ হয় ১৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

সরকার বাহাদুরই সমস্ত রেলপথের মালিক। সমস্ত রেল একদিন সম্পূর্ণরূপে সরকারী হইয়া যাইবে। ১৯০৫ সালে সরকারী রেলওয়ে-বোর্ড স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর রেলওয়ে-বোর্ড ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ক সরকারী-সচিবের তত্ত্বাবধানে থাকে; কিন্তু তাঁহাদের অতিরিক্ত বাঁধাবাধির জন্য কাজের ক্ষতি হইতে লাগিল; তখন ১৯০৮ সালে রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতির মন্ত্রীসভায় বিশেষ স্থান পাইবার অধিকার পাইলেন।

রেলওয়ে বোর্ড

বে-সরকারী রেল-কোম্পানীদের পরিচালক-বোর্ড লণ্ডনে; ভারতবর্ষে তাঁহদের এজেণ্ট আছেন। কোম্পানীর সকল চাকর এজেণ্টের অধীনে। ইহাঁরই অধীন ট্রাফিক ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন বা লোকো-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ষ্টোর বা ভাণ্ডার রক্ষক, রেল-পুলিশ অধ্যক্ষ (ইনি সরকার হইতে নিযুক্ত) এবং একজন হিসাব-পরীক্ষক। সরকারী রেলওয়েরও ব্যবস্থা এইরূপ।

রেলওয়ে পরিচালন

কিছুকাল হইতে আমাদের দেশে সরকারী ও কোম্পানী পরিচালিত রেলপথের মধ্যে কোনটি ভাল ও কোনটি আমাদের দেশের উপযোগী তাহা লইয়া ঘোর তর্ক চলিতেছে। সুসভ্য জাতিদের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে রেলপথ জাতীয় ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত করাই অনেকের অভিপ্রায়। কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষকে লাভের অংশী না করিয়া রাষ্ট্র সেই লাভটা পাইলে বেশী ভাল হয়। পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি লোকহিতকর সামগ্রীগুলি যেমন ব্যক্তিগত লাভের সম্পত্তি করিয়া রাখা হয় নাই, রেলপথকেও তেমনি ব্যক্তিগত বা কোম্পানীগত সম্পত্তি করিতে

সরকারী ও বেসরকারী রেল

দেওয়া উচিত নয়। সরকার রেলের মালিক হইবেন ও সরকারই রেলের পরিচালক হইবেন। সরকার বাহাদুর স্বয়ং ভারতীয় রেলপথের ভার লন ইহাই অধিকাংশের ইচ্ছা।

যে যে কারণে রেলপথ সরকার পরিচালিত হওয়া উচিত তাহা এই।

মধ্য ও তৃতীয় শ্রেণী হইতে আয়

(১) তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদের উপর সদ্ব্যবহার। ৩য়. ও মধ্যম শ্রেণীর আরোহীদের পয়সায় রেলের লাভ; তাহারাই বৎসরে ৩৪ কোটি টাকা দেয়; আর ১ম ও ২য় শ্রেণীর আরোহীদের নিকট হইতে আয় ৩½ কোটি টাকা। যে পরিমাণ গাড়ী আছে ও যে সংখ্যক আরোহী প্রতি বৎসর রেলে চড়ে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত বিসদৃশ; ১ম ও ২য় শ্রেণীর গাড়ীপ্রতি ১,৪৩০ জন ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীপ্রতি ১৮,০০০ লোক। য়ুরোপে, আমেরিকায় বা কোনো সভ্য দেশে গাড়ী ভাড়া দিয়া লোকে এমন নষ্ট করিয়া যায় না।

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও অবনতি

(২) ভারতীয় বাণিজ্যের ও শিল্পের ক্ষতি। প্রথমত ভারতের কাঁচামাল সহজে দেশ হইতে বাহির করিয়া লইবার প্রধান সহায় রেল; আবার বিদেশী আমদানী মাল বাজারে বাজারে সস্তায় চালান করিবার উপায় এই রেলপথ। ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণ বিলাতী সামগ্রীর আকস্মিক আক্রমণ। ইংলণ্ডে যেমন লোকে কলের সঙ্গে হাতের প্রতিযোগিতা হওয়া সত্ত্বেও ধীরে ধীরে মানাইয়া লইতে পারিয়াছিল ভারতকে সে-অবসর দেওয়া হয় নাই। ইহার জন্য দ্রুত রেলপথ নির্মাণই দায়ী। পুরাণো কুটীর-শিল্প নষ্ট হইয়াছে বটে, তাহার স্থানে ভারতের অন্যান্য শিল্পের উন্নতিও হইয়াছে; ইহার সহায় রেলপথ। সরকারের কর্তব্য হইবে ভারতবাসীর স্বার্থ, তাহাদের

বাণিজ্য কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের রেলপথের ভাড়া অত্যন্ত বেশী, কাঁচামাল একস্থান হইতে অন্যস্থানে আনিয়া প্রস্তুত করিতে গেলে যে-খরচ হয় তাহাতে ব্যবসায় মোটেই পোষায় না। ইহার চেয়ে বিদেশীমাল আমদানী করা সহজ। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি কাগজের জন্য যে-ঘাস লাগে তাহা হিমালয় হইতে আনিতে যে-ব্যয় পড়ে তাহার চেয়ে অনেক সস্তায় হামবুর্গ (জারমেনী) হইতে কাগজ আনা যায়।

(৩) ভারতবাসীরা রেল কোম্পানীতে বড় বড় চাকুরী খুব কমই পাইয়া থাকে। তা ছাড়া বড় বড় কর্মচারীদের বেতন নিম্নস্তরের কর্মচারীদের তুলনায় অনেক বেশী। শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা প্রসাদ প্রায় ৪৪ বৎসর রেলওয়েতে বড় কাজ করিয়াছেন; তিনি পৃথিবীর সমস্ত রেলের অবস্থা খুব ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া এক প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতের সর্বনিম্ন কর্মচারী বা কুলি মাসিক ৭৲ টাকা বেতন ও সর্বোচ্চ কর্মচারী বা এজেণ্ট ৩,৫০০৲ টাকা বেতন পাইত অর্থাৎ ৫০০ গুণ অধিক। ফরাশীদেশে ২১, বেলজিয়ামে ৮, সুইট্‌জারলাণ্ডে ১১, জার্মেনীতে ১১, নরওয়েতে ৮, সুইডেনে ২২ ও ডেনমার্কে ১২ গুণ তফাৎ। সর্বোচ্চ কর্মচারীর বেতন ৪৫০৲ হইতে ১৩৮৭৲ টাকা। রেলের দুইধারে ভদ্রলোক কর্মচারীদের জন্য সরকারী বাড়ীর নমুনা দেখিয়া মনে হয় যে দেশীয়দের সুখের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি এখনো পড়ে নাই।

রেলের বড় বড় চাকরী ও অন্যান্য দেশ

(৪) ১৮৫৩ সালে ভারতে রেলওয়ে সুরু হইয়াছে; কিন্তু এত বৎসরের মধ্যেও ভারতবর্ষে লোহার কারখানার উন্নতির দিকে বা রেলের বড় বড় কলকজাগুলি এখানে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা তেমন হয় নাই। ইহাতে কত কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে তাহার

ইয়ত্তা করা যায় না। ১৯১৪-১৫ সাল হইতে ১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত বেসরকারী রেলকোম্পানীরা এগার বৎসরে ৮৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার ও সরকারী রেলওয়ে ঐ সময়ের মধ্যে ২০ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার রেলওয়ে-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছিল। অর্থাৎ এগার বৎসরে প্রায় ১০৩ কোটি টাকায় মাল রেলওয়ের জন্যই আসিয়াছে। এই মালের পনের আনা মাল ইংলণ্ড সরবরাহ করিয়াছে। আন্দাজ করা ভুল হইবে না যে ৭৩ বৎসরে অন্তত ৩৬৫ কোটি টাকার বিদেশী মাল রেলওয়ের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে। সরকার বাহাদুরের উচিত এবং আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত যাহাতে এই সব সামগ্রী এদেশেই তৈয়ারী করা যায়। তাতা কোম্পানী রেল লাইন তৈয়ারী করিতেছে। রেলওয়ে স্লিপারও তৈয়ারী হইতেছে।

লৌহ শিল্প ও কলকজা তৈয়ারী চেষ্টার অভাব

(৫) রেলপথ বিস্তারের সহিত দেশে ম্যালেরিয়া বাড়িতেছে, লোকের এ বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন নহে। দেশের স্বাভাবিক জলপথ মাটি উঁচু করিয়া প্রায়ই বন্ধ দেখা যায়। সেতু কম। তা ছাড়া রেলপথের পাশে যে মাটি তোলা হয় তাহা একটু যত্ন করিলে সুন্দর জলপথে বা জলসেচনের খালে পরিণত করা যায়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও রেল লাইনের এই দুর্দশা।

স্বাভাবিক জলপথ রোধ

(৬) রেল গাড়ীতে সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যে অত্যন্ত পার্থক্য করা হয়। রেল-কোম্পানীরা দেশীয় আরোহীদের ও যাত্রীদের সুবিধার দিকে তত দৃষ্টি দিতেন না যতদৃষ্টি তাঁহারা য়ুরোপীয় ও ইঙ্গ ভারতীয় যাত্রীদের প্রতি দিতেন। এই কারণে দেশীয় লোকেরা রেলপথের সংস্কারের জন্য বহুকাল হইতে চেষ্টা করিতেছে।

সাহেব ও দেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য

(৭) রেলপথের জন্য সরকার যাহা ব্যয় করেন তাহাতে করিয়া

দেশের দুট কার্য্য সিদ্ধ হয়; প্রথম আমদানী রপ্তানীর সুবিধা; দ্বিতীয় ভারতবর্ষকে আভ্যন্তরীন বিপ্লব বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা। কিন্তু যেখানে দেশের শতকরা ৭২ জন লোক কেবল চাষের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করে তাহাদের ক্ষেতে জলসেচনের ব্যবস্থাটা করা বেশী দরকার।

জলসেচনের ব্যয় কম

তা ছাড়া জলসেচন হইতে সরকারের লাভ রেলের তুলনায় অনেক বেশী।

(৮) বে-সরকারী কোম্পানীদের আয়ব্যয়, রেল, ব্রিজ দেখিবার জন্য একপ্রস্ত বিশেষজ্ঞ আছেন, আবার সরকারী পক্ষ হইতে তদারক করিবার জন্যও লোক আছেন।

বহুপ্রস্ত কর্মচারী

সরকার বাহাদুর যদি সমস্তটাই নিজে করেন তবে আর বহু তদারকের ব্যয়টা হয় না। ১৯২৫ হইতে ই, আই রেলওয়ে খাশ সরকারে তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে।

রেলওয়ে সমূহ সরকার বাহাদুরের খাস তত্ত্বাবধানে চলিবে, না কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইবে এই লইয়া আজ প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া কাগজে বাদানুবাদ চলিতেছে। দেশের নেতারা চান সরকার বাহাদুর নিজে সমস্তের ভার লন। এই বিষয়ের তদারক করিবার জন্য সরকার বাহাদুর এক কমিশন বসাইয়াছেন। ইহার মধ্যে ছয় জন ইংরাজ ও তিনজন মাত্র দেশীয় লোক। ভারতবর্ষের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে ভারত-বাসীর সংখ্যা অধিক থাকা উচিত ছিল। সাহেব বণিকেরা কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথের পক্ষপাতী; দেশীয় লোকেরা চান সরকার বাহাদুর স্বয়ং ভারগ্রহণ করিয়া সকলের প্রতি সমান ব্যবহার ও সদ্বিবেচনা প্রকাশ করেন।

রেলওয়ে কমিশন

এপর্য্যন্ত রেল বাবদ সরকার বাহাদুর রেলকোম্পানীদের সম্পত্তি

ক্রয় করিতে, নূতন রেলপথ নির্মাণে ও সকল প্রকার ধার শোধের জন্য ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত ৬৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহার পরিবর্তে ভারতবর্ষ মাত্র ৩৭,০০০ মাইল রেলপথ পাইয়াছেন। অর্থাৎ জমির দাম বাদেও প্রতি মাইলের জন্য ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে জায়গায় ইংলণ্ডের রেলপথ করিতে মাইল প্রতি ৪০০০ পাউণ্ড বা ৬০ হাজার টাকা করিয়া পড়িয়াছে। এই দরিদ্র দেশের প্রতি এ খরচ দুঃসহ ইহার কারণ গারাণ্টী পাইয়া ইংরাজ কোম্পানীরা খরচ কমাইবার দিকে কোনো দৃষ্টি দেয় নাই। আর রাজ্যরক্ষার অছিলায় রেলপথে কিরূপভাবে জলের মত টাকার অপব্যয় হইয়াছিল তাহাও বিবেচ্য। রায় সাহেব চন্দ্রিকাপ্রসাদ অনুমান করেন যে গারাণ্টী প্রথা ও সুদ প্রভৃতি বাবদ ১৯১৯-২০ সাল পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে রেলের জন্য ৩৪৬ কোটি টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে। অধ্যাপক সাহ এই মত সমর্থন করেন।

মূলধন ও রেলের জন্য ব্যয়

রেলওয়ে হইতে আদায় ১৯১৩-১৪ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে ছিল ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ভাড়া ও মাশুল বাড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা সফল হইয়াছে। ১৯১৮-১৯ সালে রেলের মোট আদায় হয় ৭৬,২৫,৭০,০০০ টাকা। ঐ বৎসরে ব্যয় হয় ৩৭,০৭,৬৭,০০০ টাকা অর্থাৎ রেল কোম্পানীদের মোট লাভ হয় ৩৯,১৮,০৩,০০০ টাকা। সকল প্রকার সুদ, বন্দবস্তী টাকা, ঋণশোধ, কিস্তিবন্দী টাকা দিয়াও সরকারের লাভ হয় ১০,৮৫৮,৩৭৯ পাউণ্ড বা ১৯,৮৩,৭৫,৬০০ টাকা।

রেলের আয় ব্যয়

যাত্রীর সংখ্যা প্রতিবৎসরই বাড়িয়া চলিতেছে। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অন্যদেশের তুলনায় আমাদের রেলওয়ের অনেক দোষ ত্রুটি অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও লোকে তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণ, ব্যবসায়

বাণিজ্যের জন্য অনেক বেশী চলাফেরা করে। এখন প্রায় বৎসরে সব শ্রেণীর ৬০ কোটি টিকিট বিক্রীত হয়। যাত্রীর অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর। কিন্তু তাহাদের অসুবিধা প্রবাদানত; এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই।

যাত্রীর সংখ্যা

১৯২৩-২৪ সালে মালপত্র প্রায় ৯৮ মিলিয়ন টন চলাফেরা করে—১৯০৮ সালে ৬২ মিলিয়ন টন্ ছিল। মাশুল প্রতিমাইলে টনকরা ১৯০৮ সালে ৫'০৯ পাই এর জায়গায় কমিয়া ৪০২৬ পাই হইয়াছিল; ১৯২৩-২৪ সালে ৬'১৩ হইয়াছে।

মালপত্র

ভারতবর্ষের মধ্যে এখন আর এমন একটি জেলা নাই যেখানে রেলে করিয়া না যাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের পূর্বদিকে প্রায় চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত, আবার কাশ্মীরের দক্ষিণ হইতে ভারতের সর্বদক্ষিণ স্থান ধনুস্কোটি পর্য্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। দেশের মধ্যে বিপ্লব, বিদ্রোহ হইলে তাহা তদ্দণ্ডেই সরকার দমন করিতে পারেন, আবার দেশের বাহির হইতে শত্রু আসিলে সমগ্র বৃটীশশক্তি সেখানে লইতে পারেন। তা ছাড়া ডাক বিভাগ সম্পূর্ণরূপে রেলের অধীন। পোষ্টাপিসের অর্দ্ধেক কাজ রেলের ডাকগাড়ীতে হয়।

রেলের উপকারিতা

ভারতবর্ষের রেলপথ ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ। এশিয়ার অন্যান্য অংশের সহিত রেলপথে আনাগোনার বাধা অনেক; তার মধ্যে প্রধান বাধা প্রাকৃতিক। ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে যাইতে এখন সমুদ্র ষ্টীমারে করিয়া পার হইতে হয়। ভারতের দক্ষিণতম ষ্টেশন ধনুস্কোটি; সেখান হইতে সিংহলের নিকটতম রেলষ্টেশন ২১ মাইল দূরে। এইখান দিয়া রেল

সিংহলের সহিত রেল-পথ যোগের চেষ্টা

লইতে গেলে মাঝে মাঝে কতকগুলি দ্বীপ পড়ে; ১৯১৩ সালে এখানকার মাপজোখ হয়। প্রায় আট মাইল পথ রেল স্থল দিয়া লওয়া যাইবে, অবশিষ্ট ১৩ মাইল সমুদ্রের উপর দিয়া লইতে হইবে। এই সব করিতে ব্যয় আনুমানিক ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা পড়িবে। ইহা কবে আরম্ভ হইবে তাহা ঠিক হয় নাই।

বর্মার সহিত রেলপথ যোগ

ভারতবর্ষের সহিত ব্রহ্মদেশের রেলপথে যোগ নাই। এই রেলপথ নির্মাণের কথা ঠিক ঠাক হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে আরাকানের ভিতর দিয়া এই পথ চলিবে। পথের মাপ হইয়া গিয়াছে। ব্যয় আনুমানিক ১০½ কোটি টাকা পড়িবে।

য়ুরোপের সহিত রেলে যোগ

ভারতের কাছাকাছি দেশের সঙ্গে যেমন রেলপথে যোগস্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে; য়ুরোপের সহিত স্থলপথে যোগস্থাপনের ইচ্ছা ইংরাজ সরকারের অনেক দিন হইতেই প্রবল। রুশেরা এশিয়াতে রাজ্যবিস্তার করিতে করিতে রেলপথ বিস্তার করিয়াছে; তাহাদের রেল পেটরোগ্রাড হইতে প্রশান্ত মহসাগরের উপকূলস্থিত ভ্লাডিভোষ্টক পর্য্যন্ত। আর একটি পথ দক্ষিণ-রুশ দিয়া কাশ্যপ হ্রদের তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে; হ্রদের এপার হইতে পুনরায় আর একটি রেল মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়া অসিয়া আফগানিস্থানের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে। রুশ হইতে বাহির হইয়া স্থলপথে প্রায় ভারতের কাছে আসা যায়। অপরদিকে এশিয়া মাইনরে জার্মেনরা তুর্কী সরকারের নিকট হইতে জমি লইয়া বহুশত মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া মেসোপটেমিয়ার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজ সরকার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে খুব উৎসাহের সহিত মাপজোখ করাইয়া, কমিশন বসাইয়া রেলনির্মাণ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে তাহা সম্ভব

হয় নাই। বর্তমানে অনেকগুলি পথ মাপা আছে; একটি মধ্যএশিয়া হইতে পারস্য ভেদ করিয়া বেলুচিস্থান দিয়া; আর একটি কনষ্টান্টি-নোপল হইতে এশিয়া-মাইনর দিয়া দক্ষিণ পারস্য দিয়া। এই রেল করাচীর সহিত মিলিত হইবে। মধ্য-য়ুরোপের মধ্য দিয়া আসিলে কনষ্টান্টিনোপলের সম্মুখের প্রণালী পার হইতে হইবে না। ইঞ্জিনীয়ারদের কল্পনা এখানে ক্ষান্ত হয় নাই। তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ করিয়া এক রেলপথ নির্মাণের কথা ভাবিয়াছেন। এই পথ সমুদ্রতল হইতে তিন শত ফিট নীচে দিয়া যাইবে ও দৈর্ঘ্য ৩১ মাইল হইবে। সুতরাং লণ্ডন হইতে বাহির হইয়া সমস্ত য়ুরোপ ও এশিয়া পার হইয়া আট দিনের মধ্যে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে আসা যাইবে। কবে এ পথ নিৰ্মিত হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কারণ ইহার মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি আছে।

অষ্টম ভাগ

১। চিকিৎসা বিভাগ

ভারতের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটি সরকারী বিভাগ আছে। এই বিভাগে ১৯২২ সালে ৮০৩ জন চিকিৎসক ছিল; বিলাতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঁহারা এদেশে আসেন। ভারতের ইংরাজ ও দেশীয় সৈনিকদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-রক্ষাই ইঁহাদের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এ ছাড়া ক্রমে ক্রমে নানারূপ কর্ত্তব্য ইহাদের কাজের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে। যথা সাধারণ হাসপাতাল ও বে-সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের পর্য্যবেক্ষণ, জেল তত্ত্বাবধান ইত্যাদি।

চিকিৎসা-বিভাগ

১৭৬৬ সালে এই বিভাগ গঠিত হয়; তখন ইহার মধ্যে মিলিটারী ও সৈনিক এই দুইভাগ ছিল। ১৮৫৩ সালে ইহাতে দেশীয়দের প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। প্রথম দেশীয় ডাক্তার যিনি মিলিটারী বিভাগে কাজ পান তিনি একজন বাঙালী; তঁহার নাম গুডিভ চক্রবর্ত্তী। ১৮৫৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত মাত্র ৮৯ জন ভারতবাসী এই বিভাগে কর্ম পাইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের উপাধি সেনাপতিদের ন্যায় লেফ্‌নাণ্ট কর্ণেল, মেজর ইত্যাদি। গত যুদ্ধের সময়ে অনেক ভারতবাসীকে অস্থায়ীভাবে এই বিভাগে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

সমগ্র চিকিৎসা বিভাগের পরিচালক ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন কর্মচারী,—চিকিৎসা বিভাগের পরামর্শ দাতা তিনিই। কর্মচারীদের প্রমোশন ও সাধারণ বিভাগের লোক নির্বাচন প্রভৃতি আপিষী কাজই

তাঁহাকে বেশী করিতে হয়। তাঁহারই অধীনে ভারতের স্যানিটারী বা স্বাস্থ্য বিভাগ।

প্রত্যেক দেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য একজন করিয়া বড় ডাক্তার কর্মচারীর উপর ন্যস্ত; তিনি সমস্ত হাসপাতালের পরিদর্শক। জেলার সাধারণ হাসপাতাল প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার সিভিল সার্জেনের উপর। তিনি সাধারণত জেলার মধ্যে চিকিৎসা সম্বন্ধে সুপণ্ডিত। জেলার প্রধান সহরের সরকারী হাসপাতালে তিনিই চিকিৎসাদি করেন। অনেক জেলায় তিনিই স্যানীটারি ইন্সপেক্টরের কার্য্য করেন।

বিলাত হইতে যাঁহারা ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগে কর্মচারী হইয়া আসেন তাঁহাদের সম্মান ও বেতন দুইই অধিক। লেফ্‌নাণ্টরা ৫০০৲ ক্যাপ্টেনরা ৫০০৲ হইতে ৬৫০৲, মেজরেরা ৭০০৲ হইতে ৮০০৲ ও লেফ্‌নাণ্ট-কর্ণেল ৯০০৲ হইতে ১৪০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। এখন নিম্নলিখিত হারে বাড়িয়া গিয়াছে; কাপ্তেনরা ৬৫০৲—৯৫০৲; মেজর ৯৫০৲—১,৫০০৲; লেফ্‌নাণ্ট-কর্ণেল ১,৫০০৲—২১০০৲।

মিলিটারী উপাধিভূষিত চিকিৎসক ছাড়া সাধারণ বিভাগে ৩৫০ জন কর্মচারী আছেন; ইঁহারা ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্যানিটারী কমিশনর, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, জেল সুপারিটেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির কাজ করেন। সকলের বেতন মাসিক হাজারের উপরই ১২০০৲ হইতে ২৫০০৲এর মধ্যে।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল

১৯১৬ সালের শেষে ভারতে ৩,০৫১টি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র ও রোগ-বহুল দেশের পক্ষে ইহা নিতান্তই কম। গ্রামের মধ্যে চিকিৎসার দুর্দশার কথা কাহার অবিদিত নাই। হাসপাতাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া

চলিতেছে। ১৯১৬ সালে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষের উপর রোগী সরকারী ঔষধালয় হইতে ঔষধ লইয়াছিল।

ভারতে ৫টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ আছে—কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর ও লক্ষ্ণৌ। ১৯১৯ সালে সবগুলি কলেজে ৩০৪৩ জন বিদ্যার্থী পাঠ করিতেছিল; ইহার মধ্যে প্রায় ১০৯ জন মহিলা। এ ছাড়া ১৮টি মেডিক্যাল স্কুল আছে; এগুলিতে তিন হাজার ছাত্র পাঠ করিত। দেরাদুনে একটি এক্স-রে পরীক্ষাগার আছে।

আমাদের দেশে খ্যাপা কুকুর ও শেয়ালে কামড়াইলে যে দেশীয় চিকিৎসা ছিল তাহা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; সেসব প্রণালী সত্য কি মিথ্যা তাহাও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে শিম্‌লা শৈলের কসৌলী নামক স্থানে, মান্দ্রাজের কুন্নুরে আসামের শিলংএ এবং বর্মায় রেঙ্গুনে হাসপাতাল নির্মিত হইয়াছে। বৎসরে প্রায় ৮।৯ হাজার করিয়া রোগীর চিকিৎসা হয়। কলিকাতায় বর্ত্তমানে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯১৯ সালে ভারতে ২৩টি পাগ্‌লা গারদ ছিল। সবগুলিতে ১০ হাজারের উপর রোগীর চিকিৎসা হয়। বাংলাদেশের মধ্যে বহরমপুরের পাগলাগার বিখ্যাত ছিল; এখন উহা রাঁচিতে উঠিয়া গিয়াছে। সমগ্র ভারতে প্রায় ২৫০০ করিয়া লোক প্রতি বৎসর পাগ্‌লা গারদে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকেদের জন্য খাঁটি সরকারী কাজ খুব কমই আছে। অধিকাংশই খৃষ্টান পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত। মান্দ্রাজের সরকারী কুষ্ঠাশ্রম, বোম্বাইএর মাতুঙ্গ কুষ্ঠালয়, ত্রিবঙ্কুরের সরকারী কুষ্ঠাশ্রয়, ও কলিকাতায় কুষ্ঠগৃহ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টানদের ৫০টি কুষ্ঠালয়ে সরকারী সাহায্য প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হয়।

পুরুষদের ন্যায় মেয়েদের জন্য ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগ খোলা হইয়াছে। এ দেশের নারীদের চিকিৎসা ও সেবা যাহাতে ভালরূপ হইতে পারে তাহার জন্য এই বিভাগের সৃষ্টি।

নারীদের বিশেষ ব্যবস্থা

লেডী হার্ডিংজের নাম অনুসারে দিল্লী সহরে ১৯১৬ সালে মেয়েদের একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হইয়াছে। পুরুদের সঙ্গে একত্র কলেজে পড়িবার অনেক অসুবিধা। দেশীয় রাজাদের অর্থেই ইহা স্থাপিত হইয়াছে; ইহার সংলগ্ন হাসপাতালে ১৬৮টি রোগী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ধাত্রী ও সেবিকার কাজ ভালরূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এখানে আছে।

১৮৮৬ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফ্রিনের পত্নীর উদ্যোগে ভারতের সর্বত্র মেয়েদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। লেডী ডাফ্রিন যখন ভারতে আসেন তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া এদেশের নারীদের শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য বিশেষভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। লেডী ডাফ্রিন ভারতে আসিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন ও চারিদিক হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি সমিতি গঠন করেন। তাঁহারাই নাম অনুসারে ইহার নাম "ডাফরিন ফাণ্ড" হয়। ভারতবর্ষে বাসকালে তিনিই ইহার নেত্রী ছিলেন। ভারতবর্ষময় এই সভার শাখা-সভা স্থাপিত হইল এবং তহবিলের ব্যবস্থা স্থানীয় লোকের উপর ন্যস্ত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ১—চিকিৎসা শিক্ষা; ভারতীয় নারীরা যাহাতে চিকিৎসক, ধাত্রী ও সেবিকার কর্ম শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা। ২—সেবা; স্থানে স্থানে হাসপাতাল ও ঔষধালয় খুলিয়া মেয়েদের চিকিৎসা বিশেষভাবে করিবার বন্দবস্ত করা। কলিকাতার "ডাফরিন হাসপাতাল" এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩—শিক্ষিত ধাত্রী ও সেবিকা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা।

'ডাফরিন ফাণ্ড

চারি বৎসরের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে ১২টি হাসপাতাল ও ১৫টি ঔষধালয় স্থাপিত হয়। দেশীয় লোকের উৎসাহের ফলে অর্থের অনটন হয় নাই। এই অর্থ হইতে চিকিৎসা শিখিবার জন্য সেবিকার কার্য্যের জন্য ১২টি ও হাসপাতালের সহকারী কার্য্য শিখিবার জন্য ২ টি স্কলারশিপ মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৫৮ টি হাসপাতাল, ওয়ার্ড ও বহু শ্রেণীর ঔষধালয় আছে; বৎসরে ১ লক্ষ স্ত্রীলোকের ঔষধ ও শুশ্রূষাদি করিবার মত ব্যবস্থা আছে। ইহা সরকারের নিজ তত্ত্বাবধানে চালিত হইতেছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ফণ্ড

লেডী কর্জন ১৯০২ সালে আর একটি তহবিলে নয় লক্ষ টাকা তুলিয়া দেশীয় ধাত্রীদের সুশিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপম করেন। ইহার কল্যাণে প্রায় দুই হাজার দেশীয় ধাত্রী কাজ শিখিয়াছে।

ডাফরিন ফাণ্ডে পরিচালকদের হস্তে সরকার বাহাদুর এপর্য্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার পাউণ্ড দিয়াছেন।

মহিলা মেডিক্যাল সর্বিস

ভারতে যে সব মহিলা-চিকিৎসক আছেন, তাহাদের জন্য একটি পৃথক মেডিক্যাল সার্বিস আছে; ইহাতে উচ্চ ডিগ্রিধারী ৩৭ জন মহিলা আছেন; ভারতে ও ইংলণ্ডে উভয়ত্র এই চাকুরীতে লোক সংগৃহীত হয়। চিকিৎসকদের বেতন ৪৫০৲ টাকা হইতে পঁচিশ বৎসরে ৮৫০৲ পর্য্যন্ত হয়; এছাড়া সাগরপারের ভাতা বাবদ্ মাসিক ১০০৲।১৫০৲ টাকা, বিনা ভাড়ায় বাড়ী ও নানাপ্রকার ছুটির সুবিধা ইত্যাদি পাইয়া থাকেন।

স্বাস্থ্য বিভাগ

১৮৯৬ সালের মারাত্মক প্লেগ মহামারীর পর যে বৈঠক (Commission) বসে তাহার প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি পড়ে। ইতিপূর্বে সরকার ম্যুন্সিপালটি স্থাপন করিয়া নগর ও সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যুন্সিপাল-নগরের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। লর্ড কর্জন বড়লাট হইয়া এদেশে আসিবার পর, তিনি একজন স্যানিটারী কমিশনরের পদ সৃষ্টি করেন ও নানা স্থানে স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণার বন্দবস্ত করেন। ১৯০৮ সালে ভারত-সরকার প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্র গুলির হাতে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ৩০ লক্ষ টাকা অর্পণ করেন। ১৯১০ সালে ভারত-কৌন্সিলে শিক্ষা-সচিবের পদ সৃষ্ট হয় ও উক্ত সদস্যের উপর স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার অর্পিত হয়। লর্ড কর্জন যে স্বাস্থ্য-কমিশনর নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার কাজ এ পর্য্যন্ত ভালরূপ চলে নাই; সুতরাং ১৯১২ সালে এই বিভাগকে পুনর্গঠন করা হয়। বর্তমান স্বাস্থ্য-কমিশনর দেশের যাবতীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে উপদেশ দেন; তবে চিকিৎসা ও ভেষজ গবেষণাদির ভার ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রধান অধ্যক্ষ বা Director Generalএর তত্ত্বাবধানে আছে। বর্তমানে মেডিক্যাল সার্ভিসের অন্তর্গত স্যানিটারী বা স্বাস্থ্য-সার্ভিস সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(১) সমগ্র ভারতের জন্য একজন প্রধান অধ্যক্ষ বা স্যানিটারী কমিশনর আছেন; তিনি ভারতীয় সরকারের প্রধান পরামর্শ দাতা ও Director Generalএর Staff Officer.

(২) জীবাণুবিদ্যার অনুশীলনের জন্য ১৩ জন পণ্ডিতকে বীক্ষণাগারের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে: এ ছাড়া আরও ১৫ জনকে নানাস্থানে ঘুরিয়া গবেষণার কাজে নিয়োগ করার কথা আছে।

উপরিউক্ত পদগুলি ভারতীয় সার্ভিস অর্থাৎ ভারত সরকারের খাস নিয়োগ। এ ছাড়া প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্রসমূহে কতকগুলি কাজ আছে। (১) প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া স্যানিটারী কমিশনর আছেন; ১১টি প্রদেশে ১১জন নিযুক্ত। (২) ২৬জন ডেপুটী স্যানিটারী কমিশনর। (৩) Health officer বা স্বাস্থ্য তদারককারী প্রথম শ্রেণীতে ৪৫ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৯৪ জন নিযুক্ত; (৪) স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়ার ১০ জন ও ডেপুটী ইঞ্জিনীয়ার ১৬ জন আছেন। প্রাদেশিক সরকার এখন অনেক ম্যুন্সিপালটির জন্য Health officer রাখিতে বাধ্য করিতেছেন।

বর্তমানে স্যানিটারী কমিশনর বা ডেপুটি কমিশনরের পদপ্রার্থীকে বিলাত হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া উপধি গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আশা হয় কলিকাতার School for Tropical Medicineটির চিকিৎসাগার সুগঠিত হইলে, এদেশেও উচ্চ কর্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। বর্তমানে ২৬ জন ডেপুটি কমিশনরের মধ্যে মাত্র ৯ জন ভারতবাসী (১৯২০)।

ভারতবর্ষে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে; ইহার মধ্যে রোনাল্ড রস সাহেবের মেলেরিয়ার মশক বীজাণু ও প্লেগের বীজাণু আবিষ্কার, রজার্স সাহেবের কলেরার চিকিৎসা ও কুষ্ঠের প্রতিশেধক ঔষধ, কালাজ্বরের ঔষধ প্রভৃতি আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য; অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় ভারতে ইংরাজ চিকিৎসক ও দেশীয় চিকিৎসকগণের আবিষ্কার নিতান্তই নগণ্য।

কসৌলী ভারতের প্রধান গবেষণার কেন্দ্র। প্লেগের গবেষণার জন্য বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত পারেলে এক বীক্ষণাগার আছে। কলিকাতার গ্রীষ্মমণ্ডলের ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য যে বিদ্যালয় আছে, তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এ ছাড়া কসৌলী

শিলং, কন্নুর, রেঙ্গুনে Pasteur Institute আছে। এ সব স্থানে যে কেবল পাগলা কুকুর শেয়ালের কামড়ানোর চিকিৎসা হয় তাহা নহে। বহু প্রকারের vaccine যেমন বসন্ত, কলেরা টাইফয়েড, প্লেগের ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া দেশ মধ্যে প্রচার করা হয়।

১৯১১ সালে Indian Research Fund Association নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্থাপিত হয়। ভারত সরকারের শিক্ষা-সচিব ইহার কর্তা। উচ্চপদস্থ চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারীগণ ইহার পরিচালক। এই সমিতি হইতে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একখানি গবেষণাপূর্ণ পত্রিকা প্রকাশিত হয়; পত্রিকার নাম Indian Journal of Medical Research.

২। কৃষি*

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ একথা আমরা সর্বদাই শুনিয়া থাকি। কৃষির উপর সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোকের জীবিকা নির্ভর করিতেছে; আর গ্রামের শতকরা ৯০ জনের উপর লোক কৃষিজীবি। পৃথিবীর এমন আর একটি দেশ নাই যেখানকার অধিবাসীরা এমন করিয়া মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। গত তিন আদমসুমারীর প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় কৃষিজীবির সংখ্যা বাড়িতেছে। এ ছাড়া আর একটি বিষয়

জনসংখ্যা ও কৃষির জমি

---

* কৃষি জলসেচন ও গোধন সম্বন্ধে প্রবন্ধ কয়টির অধিকাংশই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের 'ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতি' পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এই বইখানি সকলের আদ্যোপান্ত পাঠ করা উচিত।

কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে; ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। জমি অফুরন্ত নয়—অথচ জনসংখ্যা কিছু কিছু বাড়িতেছে; পতিত জমি আর পড়িয়া থাকিতেছে না। এমন কি পূর্বে প্রতি গ্রামের পাশে যে গোচারণ ভূমি ছিল তাহা এখন লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অপরদিকে কর্ষণোপযোগী স্থানসমূহ এখনো কর্ষিত হয় নাই; এবং কর্ষিত স্থান ও বহু স্থানে পুনরায় অনাবাদী হইয়া যাইতেছে। (Das-Production in India,p21-22) এই শেষোক্ত ঘটনার সহিত দেশের শ্রম সমস্যা ও স্বাস্থ্য সমস্যা বিশেষভাবে জড়িত।

ভারতবর্ষে যে জমি আছে তাহার মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ জঙ্গলপূর্ণ, ২৩ ভাগ কৃষির জন্য পাওয়া যাইবে না, ১৮ ভাগে কৃষি হইলেও হইতে পারে, ৯ ভাগ পতিত ও অবশিষ্ট ৩৬ ভাগ কৃষির অন্তর্গত। সুতরাং এখনো ২৭ ভাগ জমি চাষের মধ্যে আনা যাইতে পারে দেখা যাইতেছে। ত্রিশ বৎসরে ভারতের কর্ষণোপযোগী জমি প্রায় শতকরা ৩০ হারে বাড়িয়াছে। বর্তমানে জনপ্রতি সমগ্র ভারতে ১½ একার (৪½ বিঘা) করিয়া জমি আছে। কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে জনপ্রতি এই জমি নিতান্ত সামান্য। ফ্রান্স শিল্পপ্রধান, তথাচ সেখানে জনপ্রতি ১'৪ একার জমি আছে। আর্জেণ্টাইনে ৬'৮ একার, কানাডায় ৬ একার, মার্কিন রাজ্যে ৩'৩ একার, অষ্ট্রেলিয়াতে ৩'১ একার করিয়া জমি জনপ্রতি পড়িয়াছে। ইতালি ('৯), জারমেনী ('৮), অষ্ট্রিয়া ('৬), বেলজিয়ম ('৪), ইংলণ্ড ও জাপান ('৩) শিল্পপ্রধান; তাহারা অপর দেশ হইতে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করে। এ সব দেশে চাষের জমি নিতান্ত কম। কিন্তু ভারতের দশা সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। যেহেতু সে কৃষি-প্রধান দেশ।

জমির উপর যে কেবল বংশগত কৃষিজীবিরা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা নহে; শিল্পের প্রতিযোগিতায় হার মানিয়া তাঁতি কামার কুমার মুচি

ধোপা সকলেই জমির দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইহার কারণ তাঁতির তাঁত বুনিয়া লাভ নাই, বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় সে হারিয়াছে; কামার দেখিতেছে নিজ ব্যবসায় লাভজনক নয়, কারণ বিলাতী ছুরি কাঁচির আদর বেশী, সুতরাং তাহার ব্যবসায় চলে না। এইরূপে সকলেই কৃষিতে লাগিয়াছে। পূর্বে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল—আর্থিক জীবনে কোনোটাই উৎকট আকার ধারণ করে নাই। লোকে শিল্প করিয়াও বাঁচিত, কৃষি করিয়াও চালাইত। এখন দেশের কুটীর শিল্প-সমূহ নষ্ট হইয়াছে—কাজে কাজে জীবন যাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে কৃষি। তবে বর্তমানে ভারতের বহু স্থানে বহুবিধ শিল্প ও কারখানা হওয়াতে ভূমিহীন লোকদের সুবিধা হইয়াছে। তবে তাঁতির ছেলের তাঁত নষ্ট করিয়া চটের কলে তাহাকে কাজ করিতে ঢুকাইলে তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশ পাইবে না। কলে সে চাকর, পূর্বে সে গৃহী ছিল।

শিল্পধ্বংসে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি

ভারতবর্ষে জমির যে ঠিক অভাব আছে তাহা নহে। যেখানে লোক বেশী সেখানে জমির অভাব—যেখানে জমি পড়িয়া আছে সেখানে লোক নাই। অথচ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যে লোকে যাইবে সে সাহস তাহাদের হয় না। বর্তমানে অনেক মরুসদৃশ স্থান জলসেচনের ব্যবস্থা হওয়াতে লোকের বাসোপযোগী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সমগ্র জমিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করিতে পারি; যেমন চাষের জমি, পতিত জমি, চাষের যোগ্য, চাষের অনুপযোগী, জলসেচনের যোগ্য ও অযোগ্য; একফশলী ও দোফশলী। এ ছাড়া ভারতবর্ষকে প্রাকৃতিক দিক হইতে আমরা দুইটা ভাগ করিতে পারি; যেমন (১) পলিমাটির দেশ অর্থাৎ সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অপবাহিকা ভূমি ও (২)

জমির শ্রেণীবিভাগ

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। প্রাকৃতিক অবস্থা প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের কৃষি-উন্নতির জন্য কয়েকটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন: প্রথমত জলের আবশ্যকতা। জমি হইতে পূরা ফসল পাইতে হইলে জলের ব্যবহারও পুরাপুরি করা চাই। জলের জন্য আমাদের প্রধানত নির্ভর করিতে হয় বৃষ্টির উপর। যে বায়ু বৃষ্টি বহন করিয়া আনে তাহাকে মৌসুম বায়ু বলে। জলবায়ু পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মৌসুম বায়ু খুবই খামখেয়ালী ধরণে চলা ফেরা করে। কোন বৎসর ইহা কমিলে চাষের অসুবিধা ঘটে। আবার ভারতবর্ষের সকল স্থানে সমান পরিমাণ বৃষ্টি হয় না তাহাও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। কৃষি কর্মের সুবিধার জন্য বারিপাতেরও একটা সামঞ্জস্য প্রয়োজন। একদিকে যেমন অবিশ্রান্ত বর্ষনে ফসল পচিয়া যাইতে পারে, আবার বিনাবর্ষণে ইহার রোদে পুড়িয়া যাইবার সম্ভবনা আছে। যেখানে অল্প বৃষ্টিপাত হয় সেখানে কৃষি কার্য্যেরও কোনো স্থিরতা নাই; যেঅঞ্চলে যখন যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহার উপর সেই অঞ্চলের ফসলের রকম নির্ভর করে। দক্ষিণ বর্মায় ১২৩ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, বাংলা দেশের গড়ে বৃষ্টি ৯০ ইঞ্চি; সুতরাং এই সব দেশে ধান উৎপন্ন হয়। রাজপুতনা ও সিন্ধুপ্রদেশে বাষিক বারিপাত ৬ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি মাত্র; সেখানকার ফসল জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি; এসব জায়গায় একবার মাত্র ফসল হয়। ইহাকে বলে 'খরিফ'। বর্ষাকালেই ইহা জন্মে, কিন্তু জল সেচনের ব্যবস্থা না করিলে বৎসর-মধ্যে আর কোনো ফসল পাওয়া যায় না। শীতের সময়ে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাকে রবিশস্য বলে। জলাভাবের দরুণ যে-প্রদেশকে একটি ফসলের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেখানকার কৃষিজীবির দারিদ্রতা কখনও ঘুচে না।

কৃষি ও জলবায়ু

ভারবর্ষে বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র নাই; অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বিভক্ত। সেই জন্য কৃষিকার্য্য ছোট আকারে হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড মহাদেশের কৃষি-প্রথা বর্ণনা করা এইানে অসম্ভব। বাংলাদেশের

কৃষকের শিক্ষার অভাব

ন্যায় নদীবহুল ও অধিকবৃষ্টির দেশের চাষ, রাজ-পুতনার মরুময় দেশের চাষ, পঞ্জাবের কঠিন মাটির চাষ, দাক্ষিণাত্যের কালো মাটির অবস্থা যে সব সমান নয়—তা বলাই বাহুল্য। ভারতের চাষীদের অধিকাংশ লোকই বর্ণজ্ঞানহীন; কিন্তু তাহারা নিরক্ষর হইলেও নির্বোধ নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথম প্রথম এ দেশের কৃষি-সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা রকমের অনুসন্ধান করিয়া ভারতবাসীদের চাষবাসকে অত্যন্ত আদিম ধরণের বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তাহাদের সম্বন্ধে আরও অভিযোগ শোনা যায় যে, তাহারা নূতন কিছু লইতে চায় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সকলেই জানেন আমাদের দেশে আখ-মাড়া কল একজন সাহেবের তৈয়ারী। লোকে যখন দেখিল যে এই কলে তাহাদের উপকার হইতেছে, তখন তাহারা উহা গ্রহণ করিল। কিন্তু কৃষি-বিভাগ যেরূপ ব্যয় করিয়া যেরূপ ফসল পাইয়া থাকেন তাহা করিতে হইলে চাষাকে দেউলা হইতে হইবে। ভারতীয় কৃষক দরিদ্র বলিয়া তাহার কাছে স্বল্প ব্যয়সাধ্য প্রণালী ব্যতীত আর কিছু গ্রহণীয় হইতে পারে না। আমাদের দেশের কৃষকেরা বিলাতী-লাঙল, কোদাল প্রভৃতি ব্যবহার করে না বলিয়া অভিযোগ শোনা যায়; কিন্তু যেখানে কলকব্জা মেরামত করিবার জন্য কথায় কথায় কলিকাতায় ছুটিতে হয়, যেখানে দেশ খুঁজিয়া একজন ভাল ইঞ্জিনীয়ার-মিস্ত্রি পাওয়া যায় না, সেখানে লোহালক্কড়ের জিনিষ ব্যবহার করিতে বলা বাতুলতা। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা, সহজে মেরামতের উপায়, স্বল্পব্যয়ে কিনিবার ব্যবস্থা না করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উন্নতি করিবার পথ নির্দেশ করিয়া কোনো

লাভ নাই। এখন গ্রামে গ্রামে কামার হাল তৈয়ারী করে, ছুতার গাড়ী মেরামত, লাঙল তৈয়ারী প্রভৃতি সব কাজ করে। বর্তমানের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা আছে। ইহার উন্নতি কিরূপে হইতে পারে, দেশের অবস্থার উপযোগী উন্নতির পথ সংস্কারককে বলিয়া দিতে হইবে, নিছক অনুকরণের পথ বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষা বিস্তার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল প্রদর্শন করিতে পারিলে দেশের উন্নতি হইতে পারে এবং ধান, তিল, তিসি প্রভৃতি শস্যের উৎপন্ন প্রায় দ্বিগুণ করা যায় ও পাট প্রায় শতকরা ৭০ হারে বাড়ান যায়।

১৮৯৩ সালে ডাঃ ভোয়েলকার নামে য়ুরোপের একজন বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ্ ভারতের কৃষিসম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাঁহার মহামূল্যবান্ গ্রন্থে তিনি যে কয়টি সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। (১) সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষভাবে কৃষি-শিক্ষা প্রচার ও সেই উদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশ, (২) প্রয়োজনমত স্থানে খাল ও জল-সরবরাহের প্রণালী নির্মাণ; (৩) সরকার হইতে টাকা অগ্রিম দিয়া কূপ খননাদি কার্য্যে উৎসাহ দান; (৪) সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে প্রত্যেক জেলার জলসেচনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদারক; (৫) স্থানীয় বন যাহাতে কাটিয়া লোকে নষ্ট না করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রক্ষা ও নূতন বনভূমি সৃষ্টি করা; গোচারণের ভূমি যাহাতে লোকে কৃষির জন্য আত্মসাৎ না করে; (৬) নূতন ফশল, অভিনব কৃষি পদ্ধতি নূতন সারের পরীক্ষা সরকারী কৃষি-বিভাগে হইবে; (৭) নূতন যন্ত্রপাতি সরকারী ফার্মে পরীক্ষিত হওয়া উচিত এবং তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি চাষাদের মধ্যে প্রচার; (৮) ফার্ম হইতে ভাল বীজ প্রচার। ভাল ও মন্দ জাতের শস্য সর্বদাই এক সঙ্গে মাড়া হয় এবং বাজারে ক্রয়ের সময়ে তাহাদিগকে চিনিয়া

ডাঃ ভোয়েলকারের প্রতিবেদন

পাওয়া যায় না। এই সমস্যা পুরণের চেষ্টা প্রয়োজন। (৯) সরকারী ফার্মে ভাল জাতের ষাঁড় রক্ষা করিয়া জেলার গোজাতির উন্নতি করা।

ডাঃ ভোয়েলকারের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলে ভাল হয়। আমরা দেশের জল-সেচন ও গোষ্ঠ-সমস্যা লইয়া সবিশেষ আলোচনা পরে করিব; এইখানে সার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। শিল্প পরিচ্ছেদে পাঠকগণ দেখিবেন যে আমাদের দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ তৈলশস্য প্রতি বৎসর রপ্তানী হইয়া যায়। এই তৈল-শস্যের খৈল খুব ভাল সার।

সারের অভাব ও সারের রপ্তানী

দুঃখের বিষয় এ দেশে শস্য মাড়িয়া তৈল বাহির করিয়া রপ্তানী করিতে গেলে চাষীদের পোষায় না বলিয়া তাহারা বীজ সমেত শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলে। জার্মানী ও অন্যান্য দেশ ছিল এই সব তৈল-শস্যের প্রধান খরিদ্দার। তাহারা সস্তায় কাঁচামাল পাইত, অধিকমূল্যে তৈল বিক্রয় করিত, এবং তা ছাড়া খৈলগুলি নিজ ক্ষেতের জন্য পাইত। আমাদের চাষীরা সস্তায় তৈল-শস্য বিক্রয় করে, সেই তৈলই অন্য আকারে এ দেশে দশগুণ দামে ফিরিয়া আসিলে ক্রয় করে; ফলে ক্ষেতগুলি সারের অভাবে ক্রমেই উৎপাদিকা শক্তি হারাইতেছে। এ ছাড়া হাড় গুঁড়া খুব ভাল সার; অথচ প্রতিবৎসর এখানকার গরুর হাড় এদেশের কলে সস্তায় পেশা হইয়া বিদেশের শস্য ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য রপ্তানী হইতেছে। ইহার উপর আবার ভারতবর্ষেই বিদেশী সার বিক্রয়ের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা চলিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি দেশের সাগর উপকূলে সামুদ্রিক গাছ পচিয়া একরূপ সার তৈয়ারী হইয়াছে; সেই সার আজকাল ভারতে খুব আসিতেছে, এবং চিলি গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রচারের জন্য খুবই চেষ্টা করিতেছেন। দেশের মধ্যে আরও অনেক রকম সার আছে; তাহা লোকের সংস্কারের জন্য নষ্ট হইতেছে। সহরের ময়লা, বিষ্ঠা, প্রস্রাব খুব ভাল সার; সেগুলির

সদ্ব্যবহার হইলে দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িবে। দুঃখের বিষয় দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি উপযুক্ত সারের অভাবে দিন দিন শক্তি হারাইতেছে। অন্যান্য দেশ উপযুক্ত সার দিয়া, নানা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার সাহায্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি চতুর্গুণ করিয়াছে।

১৯১১ হইতে ১৯২০ সাল এই দশ বৎসরে ভারত হইতে চীনাবাদাম, সরিষা, মশিনা রেড়ি, নারিকেল, তুলাবীজ, পোস্ত বীজ, ও হাড় গুঁড়া ১ কোটি ২৩ লক্ষ টন্ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। গড়ে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টন্ করিয়া সার বিদেশে যাইতেছে। এ বিষয়ে কৃষি বিভাগ ১৯১৯ সালে একবার রপ্তানী-শুল্ক ধার্য্য করিতে বলেন; হাড় গুঁড়া মাছের সার একেবারে রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতে বলেন। কিন্তু পরে এ বিষয়ে সরকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে ইহার ফলে ভারতের কাঁচা মালের কাটতি বাহিরে কম হইবে। সার দিলে জমিব উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় একথা কোনো চাষাকে বুঝাইতে হয় না। কোনো স্থানে দেখা গিয়াছে যে এক একার জমিতে সাধারণত যে শস্যের মূল্য ২৩৲ টাকা হয়, সার দিবার পর শস্যের মূল্য ৫২৲-র বেশী হইয়াছে। কোনো জমিতে সোরা দিবার পর উৎপাদিকা শক্তি দ্বিগুণ হইয়াছে। তাতাদের লৌহকারখানায় যে সালফেট্ অব্ আমোনিয়া নামে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয় তাহা সাহেবী বাগিচাওয়ালারা ক্রয় করেন, কারণ তাহারা তার ব্যবহার জানে। চাষীরা তার নামও জানে না, কিনিবার সঙ্গতিও তার নাই।

কৃষি ভারতের প্রধান অবলম্বন একথা একাধিকবার পূর্বে বলিয়াছি। অন্যান্য দেশে কৃষির সহিত লোকে নানাবিধ শিল্প ও বাণিজ্য করে। আমাদের শতকরা ৭২ জন লোক চাষী বা চাষ সংক্রান্ত কর্মে লিপ্ত। কৃষিজাত দ্রব্য হইতে যদি আমরা শিল্প সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া নিজেরাই তাহার ব্যবসায় চালাইতে পারিতাম তবে বোধ হয় দেশের অবস্থা এমন

শোচনীয় হইত না। এখন আমাদের কাজ হইয়াছে কোনো প্রকারে মাটি চষিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করা এবং বিদেশীর হাটে যে যে কৃষিজাত কাঁচা মালের কাটতি হয় তাহা রপ্তানী করিবার জন্য বিদেশী বণিকের শরণাপন্ন হওয়া।

পৃথিবীর সর্বত্রই জীবিকার্জনের যে-সমস্যা উপস্থিত আমাদের সম্মুখেও তাহা দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়িতেছে; আহার্য্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে লোকের বেতন-হার বৃদ্ধি পাইতেছে না। বিদেশী বাণিজ্য হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে দেশীয় কুটির-শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। শিল্পীরা জীবিকা নির্বাহের অন্য পথ খুঁজিয়া না পাইয়া জমি চাষ করিয়া বা অপরের জমিতে 'কৃষাণী' করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে। আবাদী জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। যাহারা জীবনধারণের নিমিত্ত কেবলমাত্র চাষবাসের উপর নির্ভর করে, গড়ে হিসাব করিলে তাহাদের ভাগে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং কমিতেছে; আবার আবাদী জমিতেও শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না। ১৯০১-২ সালে গড়পড়তায় প্রত্যেক কৃষকের অংশে ৩ বিঘা ১৭ কাঠা করিয়া জমি পড়িত; ১৯১১-১২ সালে ৩ বিঘা ১৪ কাঠা করিয়া ও ১৯১৪-১৫ সালে ৩ বিঘা করিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কৃষির সমস্যা কিরূপ জটিল হইতেছে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

কৃষকের সংখ্যা ও গড়পড়তায় জমির পরিমাণ

ইহার উপর এদেশের শস্যক্ষেত্রে অন্য দেশের তুলনায় শস্য পরিমাণ কিরূপ অল্প হয় তাহা দেখিলে সমস্যাটিকে স্পষ্টতর বুঝিতে পারিব। বোধ হয় সভ্যজগতে একার প্রতি ১২বশেল গম আর কোথাও হয় না।

কানাডায় হয় ২৩'৭ বুশেল। ডেনমার্কে যেখানে হয় ১০ মণ ৩৫ সের, এদেশে সেখানে ২ মণ ৩০ সের; কিছুদিন পূর্বে একজন সরকারী উচ্চ কর্মচারী (K. L. Dutta—Prices & Wages of India, 1914) ভারতের বাজারদরের মহার্ঘতা বিষয়ে এক সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

এদেশের জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস

তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও আবাদী জমির পরিমাণ তেমন বিস্তার হয় নাই, এবং খাদ্যশস্যের প্রয়োজন যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার উৎপন্ন শস্য তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। আমরা পরিশিষ্টে তাঁহার হিসাবটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

খাদ্য-শস্য জনসংখ্যার অনুপাতে কম

এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হইবার পর সম্প্রতি জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় আবাদী জমি বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং খাদ্যশস্যের জমিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এখনো অবস্থা উন্নত করিবার অনেক রহিয়াছে; অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবাসীর ন্যায় দরিদ্র কৃষক পৃথিবীতে আর কোথায় আছে কি না সন্দেহ। এই অপবাদ দূর করিবার জন্য সরকার বাহাদুরও কৃষিবিভাগের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং ১৯২৬ সালে কৃষি বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য এক রয়েল কমিশন বসিয়াছে।

১৯২৪-১৯২৫ সালে সমগ্র ভারতে ২২ কোটি ৬৯ লক্ষ একার জমি কৃষি উপযোগী ছিল। ইহার মধ্যে ২০ কোটি একার জমিতে খাদ্যশস্য ও ৩,৮০লক্ষ একারে পাট, তুলা প্রভৃতি অন্যান্য ফসল দেওয়া হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট ১

কৃষিই প্রধান পেশা।

জনসংখ্যা (১৯২১)	৩১,৬০,৫৫,০০০
কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ	২,৩০,৬৫,০০০
কৃষিকর্ম শতকরা	৭১ জন

(তন্মধ্যে ৬৯ জন চাষবাস ও তিনজন সবজী বাগান ও হাঁস মুরগী পালন প্রভৃতি কর্মে লিপ্ত)।

কৃষকদের মধ্যে শতকরা	৪৫ জন	কর্মী
	৫৫ জন	আশ্রিত
বাংলাদেশে শতকরা	৩২ জন	কর্মী
	৬৮ জন	আশ্রিত

চাষের উপর নির্ভর	২১,৭০,০০,০০০
ভূস্বামী	৮০,০০,০০০
কর্মচারী	১০,০০,০০০
কৃষি মজুর	৪,১০,০০,০০০
কৃষক	১৬,৭০,০০,০০০

পরিশিষ্ট ২

ভূমিহীন দিন-মজুরের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৮৯১	১,৮৬,৭৬,২০৬
১৯০১	৩,৩৫,২২,৬৮১
১৯১১	৪,১২,৪৬.৩৩৫

কৃষকের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ।

	ঠিক যে পরিমাণ জমিতে শস্য উৎপন্ন হয় (একর)	কেবল মাত্র চাষবাসের উপর যাহাদের জীবিকা নির্ভর তাহাদের সংখ্যা	গড়পড়তায় প্রত্যেক কৃষকের অংশে কত জমি পড়ে
১৯০১-২	১৯৯,৭০৮,৪২২	১৫,৫৪,৭৬,৭৮৮	১·২৮ একর অর্থাৎ ৩/দ২
১৯১১-১২	২১৫,৯৮৯,৬০৫	১৭,৩৯,৯৫০২২	১·২৪ " " ৩/॥৪
১৯১৪-১৫	২২৭,৬১১,১৩২	২২,৪৬,৯৫,৯০০	১·০১ " " ৩/০
১৯১৯-২০			০·৮৯ " " ২/॥৩

১৯২৩-২৪ সাল

	একার (হাজার)
ভারতের বর্গফল	৬৬,৭৭,১৯
বনভূমি	৮,৫৯,৭৯
কৃষির অযোগ্য	১৫,১৮,৪১
কৃষির যোগ্য	১৫,৪৬,০২
পতিত জমি	৪,৯৬,১৯
শস্যের জমি	২২,২৪,৯০
জলসিঞ্চিত ভূমি	৪,৪৯,২৪

অন্যান্য

তুলা	১,৫৩,৮৫
পাট	২৩,২৯
অন্যান্য আঁশাল	৭,০৩
নীল	১,৭৬
আফিম	১,৪২
তামাকু	১০,২৫
পশুখাদ্য	৮৭,৬৪

Statistical Abstract from 1914-15 to 1923-24 p. 329.

খাদ্য শস্য—	একার (হাজার)
ধান	৭,৭২,০০
গম	২,৪২,৯৪
যব	৭১,৮১
জোয়ার	২,১১,৩৮
বজরা	১,৩৬,৭৪
রাগি	৪২,২০
ভুট্টা	৫৮,৪১
ছোলা	১,৪৪,৩৭
অন্যান্য ডাইলাদি	২,৯০,১০

মোট খাদ্য শস্য—১৯,৭০,০০

১৯১৪-১৫ সালে—২০,৫৫,০৪

অর্থাৎ—৭৫,০৪,০০০

একার জমি কমিয়াছে।

অন্যান্য খাদ্য

তরকারী মশলাদি	৭৯,৫৪
ইক্ষু চিনি গুড়	৩০,৪৪
কফি	৯৫
চা-বাগিচা	৭১,৩[illegible]
তৈল বীজ	১,৪২,[illegible]

পরিশিষ্ট ৩

একারপ্রতি জমির উৎপন্ন শস্যের অনুপাত।

	বুসেল (প্রতি একারে) ১ বুসেল—৯৷৷০ সের	যে বৎসর এই পরিমাণ ফসল পাওয়া গিয়াছে।
ক্যানাডা	২৭'৭০	১৯১৪-১৫
মার্কিণদেশ	১৬'৬	১৯১৩-১৪
অষ্ট্রেলিয়া	১৩'৭	১৯০৮-৯
রুষিয়া	১৩'৫	১৯১২-১৩
ভারতবর্ষ	১২'৮	১৯০৯-১০

আর একটি গমের হিসাব।

	প্রতি বিঘায়
ডেনমার্ক	১০৸৫ মণ
বেলজিয়াম	৮৷৷৮ মণ
জার্মাণী	৭৷২ মণ
ফ্রান্স	৫৷১ মণ
জাপান*	৪৷৷৪ মণ
ইতালী	৩৷৷৪ মণ
ভারতবর্ষ	২৸০ মণ

* জাপানে ধানই অধিক জন্মে। প্রতি একারে গড়ে জাপানীরা ৩৭ বুশেল ধান জন্মাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ স্থানে ৬০ বুশেল পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

পরিশিষ্ট ৪

[নিম্নে যে তালিকাটি প্রদত্ত হইল তাহা ১০০এর অনুপাতে দেওয়া হইল]

	১৮৯০ হইতে ১৮৯৬	১৮৯৫ হইতে ১৯০০	১৯০০ হইতে ১৯০৫	১৯০৫ হইতে ১৯১১	১৯১০ হইতে ১৯১১	১৯১১ হইতে ১৯১২
জনসংখ্যা	১০০	১০১·৬	১০৩·৭	১০৫·৭	১০৭·৮	১০৮·৪
আবাদী জমির বিস্তার	১০০	৯৮	১০৩	১০৫	১০৮	১০৬
যে পরিমাণ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়	১০০	৯৬	১০১	১০২	১০৬	১০৩
যে পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়।	১০০	৯৮	১০৫	৯৯	১০৩	১০·৯

৩। জলসেচন

আমরা 'কৃষি' অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে ভারতের কৃষি-উন্নতি বহুল পরিমাণে কৃত্রিম জলসেচনের সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। জলসেচনের জন্য যে জল প্রয়োজন হয় তাহা তিন উপায়ে মানুষ সংগ্রহ করে, যথা—(১) কূপ, (২) পুষ্করিণী (৩) খাল। আমাদের দেশে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তাহা নিতান্ত কম নয়; পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে এদেশে মোট ১২৫ লক্ষ কোটি ঘন-ফুট বৃষ্টিপাত হয়; কিন্তু মোট ৫১ লক্ষ কোটি ঘন-ফুট জল উপরে পাওয়া যায়। এই বৃষ্টিজল হইতে মাত্র ৬½ কোটি ঘন-ফুট জল সেচনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মোট বৃষ্টির ৫৯ ভাগ মাটি শুষিয়া লয়, ৩৫ ভাগ জল নদী বহিয়া সাগরে যায় ও ৬ ভাগ মাত্র কৃত্রিম উপায়ে রক্ষিত হইয়া সেচনের কাজে লাগে। যে পরিমাণ বৃষ্টি মাটিতে শুষিয়া লয় তাহার ১½ ভাগ মাত্র আমরা কূয়া খুঁড়িয়া উদ্ধার করিতে পারি এবং তাহাই শস্যোৎপন্নে ব্যবহার করি।

জলসেচনের ত্রিবিধ উপা

মোট বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ।

কূপ খনন করিয়া ভারতের কৃষিকার্য্য বহুকাল হইতে চলিতেছে। এই কার্য্যে পূর্ব্বেও কখনো সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় নাই—এখনও প্রয়োজন করে না। বর্তমানে ভারতের সমগ্র সিঞ্চিত ক্ষেত্রের শতকরা ৩% ভাগ কূপের সাহায্যে জল পাইয়া থাকে। কূপের জলে যেসব ক্ষেত্র সিঞ্চিত হয় সেখান হইতে যে আয় হয় তাহা অনুপাতে অনেক বেশী। ভারতে কূপের জলে সিঞ্চিত ১ কোটি ৬০ লক্ষ একার ক্ষেত্রের মধ্যে ৯৫ লক্ষ একার জমিই পঞ্জাবে ও যুক্ত-প্রদেশে। এই কূপ যে সর্বত্রই স্থায়ী তা

কূপ ও কৃষি।

নয়; অনেক সময়ে কাঁচাকূয়া হইতে কয়েক বৎসর জল তুলিয়া লোকে সেটিকে ছাড়িয়া দেয়। যুক্ত-প্রদেশের সিকি কূয়া পাকা—আর অবশিষ্ট কাঁচা। কাঁচা কূয়ায় প্রচুর জল পাওয়া যায় না; একটা কূয়ায় ১২।১৪ বিঘার বেশী জল যোগাইতে পারে না। কিন্তু পঞ্জাবের অধিকাংশ কূয়া পাকা বলিয়া গড়ে প্রতি কূয়া প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে জল যোগাইতে পারে। মান্দ্রাজের লম্বা আঁশের কাম্বোজী তুলার চাষ কূয়ার জলের উপর নির্ভর করে। যেখানে খাল, বিল, নদী, পুকুর কিছুই নাই সেখানে কূয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। এইজন্য কয়েক বৎসর কূপ খননের দিকে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। কূপ খনন যাহাতে আরো প্রচলিত হয় গভর্ণমেণ্ট সেইজন্য টাকা কর্জ দিবারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই 'তাকাভি' ধারের সুদও অল্প এবং জমি জল পাইয়া উর্বরা হইলে যাহাতে খাজনা বৃদ্ধি না হয় তদ্রূপ ব্যবস্থাও হইয়াছে।

কিন্তু কূয়া হইতে জল তোলার কষ্ট ও ব্যয় দুইই অধিক। বিলাতী পাম্প ও এঞ্জিন বসাইয়া ক্ষেতে জল দিবার মত শিক্ষা ও অবস্থা এখনো আসে নাই। পঞ্জাবের ঘটিচক্র প্রথার উন্নতি ও প্রচলন করিতে পারিলে এই সমস্যা কিয়দপরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে। সরকার বাহাদুর বোম্বাই ও যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগে একজন করিয়া ইঞ্জিনীয়ার বিশেষভাবে এইসব সমস্যা সমাধান করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমাদের দেশের শাস্ত্রে আছে যে পুষ্করিণী দান মহাপুণ্য কার্য্য। সেইজন্য ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছোট বড় পুষ্করিণী দেখা যায়। বাংলাদেশে এমন গ্রাম নাই যেখানে পাঁচ দশটা পুকুর না আছে; অবশ্য সেগুলি অধিকাংশ স্থলেই অপরিষ্কার, পঙ্কিল ও শৈবালে পূর্ণ। বাংলাদেশের অনেক স্থলে এই সব পুকুর

দীঘি ও কৃষি।

হইতে সেচ দিয়া নানাপ্রকার শস্য উদ্ভিদ্ (যেমন ইক্ষু ও আলু) উৎপন্ন হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যেই যথার্থভাবে কৃষি পুষ্করিণীর জলের উপর নির্ভর করে। মান্দ্রাজে ও মৈশূরে মোট পুষ্করিণীর সংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক। মান্দ্রাজের চিঙ্গলিপুট জেলায় এক একটি দীঘি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও গভীরতায় এত বৃহৎ যে ইহা হইতে দশ বার হাজার বিঘা জমিতে জল সেচন করা হয়। এখানকার অধিকাংশ পুকুর ও খাল হিন্দুরাজাদের সময়ে হয়। সিংহলের বাঁধগুলিকে দেখিলে তাহা কৃত্রিম বলিয়াই সন্দেহ হয়। দাক্ষিণাত্যে তুষারময় পর্বত নাই ; সেইজন্য সেখানকার নদীগুলি গভীর বা নৌতার্য্য নহে। বৃষ্টিও প্রচুর হয় না। সুতরাং যে বৃষ্টি পড়ে তাহাই ধরিয়া রাখিবার সাধ্যমত চেষ্টা লোকে করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পনের আনার উপর বাঁধ বা পুকুর—যাহা আজকাল দেখা যায়—প্রাচীন হিন্দু বা মুসলমান রাজা জমিদার ও গ্রাম্যমণ্ডলীর কীর্ত্তি।

কূপের ন্যায় ছোট ছোট পুকুর বা বাঁধ ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি। কিন্তু বড় বড় দীঘি বর্তমানে সবই সরকারের খাস অধীন ; সরকার বাহাদুরই এগুলির সংস্কার তদারক ও জলসেচনের জন্য প্রণালী নির্মাণ করিয়া দেন ; সুতরাং মুনফা তাঁহারই। সমগ্র বৃটীশ ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ একার জমি পুষ্করিণীর জলে সিঞ্চিত হয়। কিন্তু খুব অনাবৃষ্টির সময়ে অনেক পুকুরই শুকাইয়া যায়।

জলসেচনের তৃতীয় উপায় খাল। এই খাল নানা উপায়ে খোঁড়া হয়। প্রথমত যখন বন্যার জল অকস্মাৎ পাহাড় হইতে বরফ গলিয়া আসিয়া পড়ে, সেই জলের সদ্ব্যবহারের জন্য লোকে খাল কাটিয়া দেয় ; তখন বন্যার জল মরুময় দেশের ভিতরে প্রবেশ করে। পঞ্জাবে এই শ্রেণীর খাল বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; বর্তমানে সেগুলির ভার জেলা ও লোক্যাল বোর্ডের উপর ন্যস্ত। আরএক প্রকারে লোকে ক্ষেতে জল লইয়া

খাল ও কৃষি।

যায়। যে নদীর গতি ও মতির ঠিক নাই—তাহাতে বাঁধ দিয়া তাহার জল আলের মধ্য দিয়া বহাইয়া ক্ষেতে লইয়া যাইবার কৌশল মানুষ বহুকাল আবিষ্কার করিয়াছে। এ ছাড়া বড় বড় নদীর বক্ষ শুষিয়া যে খালগুলি পরিপুষ্ট তাহাদের জলের অভাব কখনো হয় না। আমরা এই তিন শ্রেণীর খালের তিনটি নাম দিলাম, যথা—বন্যাখাল, সাময়িক খাল, ও স্থায়ীখাল।

ইংরাজ আগমনের পূর্বে এদেশের বহুস্থানে খাল ছিল। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজগণ, ও উত্তর-ভারতে পাঠান মুঘল ও শিখ শাসনকর্তাদের সময়ে খুব বড় বড় খাল কাটা হইয়াছিল এবং অধিকাংশ স্থলেই পূর্বের খাল খুঁড়িয়া গভীর ও প্রশস্ত করিতেই সরকার বহুকাল ব্যাপৃত ছিলেন।

খাল-খননের ইতিহাস।

বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ১৮৪০ সালে খাল কাটাইবার প্রথম আয়োজন করেন। ১৮৪৭ সালে মান্দ্রাজ অঞ্চলে একটি কোম্পানী খাল খনন করিবার অনুমতি পায়; কিন্তু কিছুকাল কাজ করিয়া তাহারা বুঝিল রাজ সাহায্য ব্যতীত এ কাজ সম্ভব নহে। ইহাদের জলের কর কিছু অধিক ছিল বলিয়াও নানা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। লর্ড লরেন্সের শাসনকালে গভর্ণমেন্ট স্বয়ং এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লর্ড কর্জনের পূর্বে এ বিষয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হয় নাই। ১৯০১-৩ সালে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ জন্য এক কমিশন বা বৈঠক (Indian Irrigation Commission 1901-3) বসিয়াছিল। সেই বৈঠক ভারতের সর্বত্র জলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এক অতি সুন্দর প্রতিবেদন পেশ করেন। বস্তুতে গেলে সেই সময় হইতেই ভারতের জল-সেচন বিভাগের পত্তন। প্রতিবেদনে প্রকাশ ভারতের ২২কোটি ৬০ লক্ষ একার ভূমির মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অর্থাৎ মাত্র শতকরা ২০ ভাগ জমি যথার্থরূপে সেচন পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সরকারের সাহায্যে

জল পায় এমন ক্ষেত্রের অনুপাত শতকরা ৪২; অবশিষ্ট ৫৮ ভাগ ক্ষেত ক্লষকদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় সিঞ্চিত হয়। গত ২৫ বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ একার ভূমি চাষের উপযোগী করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে প্রায় ৩০ লক্ষ একার ভূমিতে জলদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

জলসেচনে সরকারী ও ব্যক্তিগত চেষ্টা।

গভর্ণমেণ্ট জলসেচনের নিমিত্ত যে অর্থব্যয় করেন জলের ট্যাক্স বসাইয়া তাহা সুদসহ আদায় করেন। অতএব পয়োপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিলে যে কেবল শস্যবৃদ্ধি পায় এবং প্রজার কল্যাণ হয়, তাহা নহে রাজকোষেও বেশ অর্থাগম হইয়া থাকে। ১৯১৭-১৮ সাল পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর পয়োপ্রণালীর জন্য প্রায় ৭২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন; ইহা হইতে সরকারী আয় প্রায় শতকরা ৮½ হিসাবে হইয়াছিল। এইরূপ লাভ গভর্ণমেণ্টের প্রতিবৎসরই হইতেছে। ভারতবর্ষীয় নেতারা ও অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ পয়োপ্রণালীর বহুল বিস্তারের জন্য সরকারকে বহুকাল হইতে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; এখানকার একবিঘা জমিও যদি জল বিনা শস্য উৎপন্ন করিতে না পারে তবে তাহা সরকার বাহাদুরের লোকসান। প্রজার শ্রীবৃদ্ধিই সরকারের মঙ্গল। সরকার বাহাদুর জলসেচনের সুব্যবস্থার জন্য যদিও ৭২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা রেলপথের ব্যয়ের তুলনায় কিছুই নয়। অথচ রেলপথের জন্য সরকারকে বহুকাল লোকসান দিয়া আসিতে হইয়াছে; কয়েক বৎসর মাত্র রেলপথ হইতে লাভ হইতেছে। রেলওয়ে ও পয়োপ্রণালী বিভাগে গভর্ণমেণ্টের কত আয় তাহা তুলনা করিয়া নিম্নে দেখাইতেছি।

জলকর ও সরকারী আয়

রেলপথ ও জলপথ

	১৯১৩-১৪	১৯১৪-১৫	১৯১৫-১৬	শতকরা
রেলওয়ে	১·৩৬ শতকরা	·৫৩ শতকরা	·৬২ শতকরা	৫·৩৫ ১৯২৫-২৬
পয়োপ্রণালী	৫·৮৭ „	৫·৪৪ „	৫·৩০ „	৮·৪০ ১৯১৭-১৮

অথচ প্রতিবৎসরই ভারতীয় বাজেটে রেলপথের জন্য প্রচুর ব্যয় করিবার ব্যবস্থা থাকে। যাহাই হউক এ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত কম নয়। পঞ্জাবে তাঁহাদের কাজ বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। সেখানে বৃষ্টি কম; সুতরাং যদি খাল্ কাটিয়া জল ভিতরে না লইয়া যাওয়া হয় তবে নদীর ধার ছাড়া চাষ হওয়া অসম্ভব।

পূর্বোক্ত কমিশনের সভ্যগণ বলিয়াছেন যে পঞ্জাব সিন্ধুপ্রদেশ ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কোনো কোনো অংশে জলাভাবে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা অধিক; সুতরাং এই সকল দেশে আশু ব্যবস্থা প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উপদেশানুসারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে এক বিরাট খাল কাটাইয়াছেন। সোয়াত নদী হইতে এই খাল উঠিয়া পর্বতগুহা বা টানেলের ভিতর দিয়া আর এক ধারে গিয়াছে। সীমান্ত-প্রদেশের ৩ লক্ষ ৮২ হাজার একার ভূমি এই খালের জলের সাহায্যে উর্বরা হইয়াছে। এই খাল খননে ভারত সরকারের প্রায় ১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু ইহার উপকারিতা অঙ্কপাতের হিসাবে দেখানো যাইবে না; যে পার্বত্য দস্যুগণের অত্যাচারে সীমান্তবাসীদিগকে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত, তাহারা আজ শান্ত কৃষক হইয়া বাস করিতেছে।

খালখননে ইংরাজদের কীর্ত্তি।

ইঞ্জিনিয়ারগণের আর একটি বিপুল কীর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাবে তাঁহারা এক অভিনব খাল নির্ম্মাণে মনোযোগ দিয়াছেন। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Triple Project বলে। ব্যাপারটা এই :—চন্দ্রভাগা ও ইরাবতীর অধিকাংশ জলরাশি দুই দোয়াব বা উভয় নদীর মধ্যস্থিত

প্রদেশে ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে বারিদোয়াবের দক্ষিণাংশটা মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক থাকিয়া যায়। অথচ চিরস্রোতা ঝিলাম বা বিতস্তায় জলের অভাব নাই। ইঞ্জিনীয়ারগণ উত্তরের সেই জলরাশি ঝিলাম হইতে কাটিয়া চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী পার করিয়া দক্ষিণ-পঞ্জাবে আনিতে কৃত সংকল্প। ঝিলামের জলের খাদ উচ্চ-ভূমি দিয়া প্রবাহিত; সুতরাং সেখানকার জল প্রথমে চন্দ্রভাগায় ও পরে ইরাবতীতে আনিয়া দক্ষিণ-পঞ্জাবে আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অনুমান প্রায় দশ ক্রোটী টাকা এই খাল-খননে ব্যয় হইবে; কিন্তু লাভও হইবে বাৎসরিক ৮০ লক্ষ টাকা। পঞ্জাবের খালের ধারে এখন লোকে লোকাকীর্ণ; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেসব জায়গায় কয়েক ঘর যাযাবর লোক ছাড়া আর কেহই বাস করিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি গভর্ণমেণ্ট বিনা-শুল্কে প্রজাকে খাল হইতে জল লইতে দেন না। জলের দর নানা দিক হইতে বিচারিত হয়; কতখানি জলের প্রয়োজন, কত দিন জল সরবরাহ করিতে হইবে; জমির উৎপাদিকা শক্তি কিরূপ, কোন জাতীয় শস্য উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি ভাবিয়া জলের দর ফেলা হয়। বোম্বাইএর কোন অংশে এক একার (৩ বিঘা ৵৷৹ আধ কাঠা) ইক্ষুর খেতের জন্য ৫০৲ পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। এ ছাড়া বোম্বাইয়ের অন্যত্র ১০৲ হইতে ২৫৲ টাকা সাধারণ জলকর। মান্দ্রাজ প্রদেশে ২৲ টাকা হইতে ৫৲ এবং বাংলা দেশের কোনো কোনো স্থানে ১৷৹৲ হইতে ২৷৹৲ টাকা সেঁচের জন্য সরকার পাইয়া থাকেন। পঞ্জাবে সাধারণত এক একারে ৩৲।৪৲ টাকা লাগে। মোটের উপর উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ১০ বা ১২ হার জলকর কৃষককে দিতে হয়। বাংলা ও বোম্বাইএ শতকরা ৬% হারে লাগে। প্রাচীনকালে হিন্দু বা মুসলমান শাসনের সময়ে জলকর ছিল না। সরকারের খাল হইতে

জলকরের হার

যথেষ্ট আয় হয়, সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে জলকর কমাইয়া দিতে পারেন।

ভারতের দেশীয় রাজগণের রাজ্যে ইংরাজ আগমনের বহু পূর্ব হইতেই জলসেচনের সুব্যবস্থা ছিল। তবে ইংরাজ সরকারের সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা দিয়াছে।

করদরাজ্যে সেচনের ব্যবস্থা

দেশীয় করদরাজ্যে ৫ কোটী ৩০ লক্ষ একার জমি প্রতি বৎসর কূপ, পুষ্করিণী ও খাল হইতে সিঞ্চিত হয়। করদ রাজ্যের মধ্যে মৈসূরেই জলসেচনের ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট। সেখানকার ভূপ্রকৃতি দীর্ঘখাল খননের মোটেই উপযুক্ত নহে। মৈশূরেই প্রায় ৩৯ হাজার জলাশয় আছে, অর্থাৎ প্রতি তিন বর্গ মাইলে চারিটি করিয়া জলাশয় আছে। জলাশয় ছাড়াও প্রায় ১০০ মাইল পয়োপ্রণালী মৈশূরে অছে।

ভারত সরকার জলসেচনের জন্য যে-ব্যয় করেন তাহা তিন প্রকারের। (১) ক্ষেত্রে জলসেচনের উদ্দেশ্যেই

তিন শ্রেণীর খাল

কতকগুলি খাল কাটা হয়; (২) দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থানে সাময়িক ব্যবস্থা করিবার জন্য জলাশয়াদি খোঁড়া হয়; (৩) ছোট ছোট কাজ। ইহার মধ্যে প্রথমটিতেই সরকারের বেশী টাকা ব্যয় হয়।

কেবল মাত্র কৃষি কার্য্যের সুবিধা করিবার জন্য যে খাল কাটিতে হয় এ ধারণা উত্তর-য়ুরোপের অধিবাসীদের নাই; তবে সেখানে রেলপথ নির্মিত হইবার পূর্বে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম

নৌতার্য্য খাল।

জলপথই ছিল, গমনাগমনের রাজপথ। ভারতবর্ষে নৌতার্য্য খালের সংখ্যা খুবই কম। বাংলাদেশের খালগুলি নৌতার্য্য; তা ছাড়া গোদাবরী, কৃষ্ণা ও সিন্ধুনদের কয়েকটি খালের অতি সামান্য দূর পর্য্যন্ত নৌকায় করিয়া যাওয়া যায়। এককালে নদীগুলিই উত্তর ভারতের প্রধান রাজপথ ছিল। এখন রেলপথই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পরিশিষ্ট—১

(১৯২৪-২৫ সালের হিসাব)

প্রদেশ	মোট কর্ষিত জমি	সরকারী জলসেচন বিভাগ হইতে সিঞ্চিত জমি	মোট কর্ষিত জমির সহিত সিঞ্চিত-জমির তুলনা	১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত মোট সরকারী ব্যয়	সিঞ্চিত জমিতে উৎপন্ন শস্যের আন্দাজী মূল্য
	একার (হাজার)	একার (হাজার)	শতকরা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
বর্মাদেশ	১,৫৮,৩৯,	:৭,৪১,	১১·০	৩৭১	৮২৮
বঙ্গদেশ	২,৩৫,২৮,	৯৭,	০·৪	৪২৫	৭৭
বিহার-উড়িষ্যা	২,৪৮,৯৭,	৮,২৬,	৩.৩	৬২৭	৬২৪
যুক্তপ্রদেশ	৩.৪৫,১৭,	২২,৭২,	৬ ৬	১৭০২	১৬৪৩
রাজপুতনার	৩,৫০	২৭,	৭·৬	৩৫	১০
পঞ্জাব	৩,১৭,২০,	১,০১,০০,	৩১·৮	২৬২৯	৫৭৭১
উ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ	২৫,১৪,	৩,৫৬,	১৪·১	২৮৭	২৯৮
সিন্ধু	৩৯,৫০,	৩৭,২৫,	৯৪·৩	৬০৮	১০৯০
বোম্বাই	২,৫১,২০,	৪,৮৮,	১·৭	৯১৫	৫১০
মধ্যপ্রদেশ	১,৭৮,৮৫,	৪,৫১,	২·৫	৫১০	২৫৯
বেলুচিস্থান	২,৭৬,	২৩,	৮·৩	৩২	৫
মান্দ্রাজ	৩,৭৯,২৪,	৭১,১০,	১৮·৭	১২১৭	৪১০৯
১৯২৪—২৫	২১,৮৫,২০,	২,৭১,৫৬,	১২ ৪	৯৩,৫৮	১৫২,২৪
১৯১৭—১৮ মোট	২০ ২৭,০৮	২,৫৯,৫০	১২ ৮	৭২,৭৯	৯৭,৯৭ লক্ষ

পরিশিষ্ট—২

১৯২৩-২৪

জল সেচন বিভাগের আয় ব্যয়।

১৯২১ সাল হইতে এই বিভাগ ভারতীয় ও প্রাদেশিক ভাগে বিলি হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এই সকল পূর্ত্ত কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে—

		মোট টাকা
ভারত সরকার	৩,৪২,৫৮,০০০	
প্রাদেশিক	৮২,৩৮,২০,০০০	৮৫,৮০,৭৮,০০০

		হাজার টাকা		হাজার টাকা
জল সেচন করিয়া আয়	ভারতীয়	১৭,৮৯,০০০	প্রাদেশিক	৫,৯৫,১১,০০০
সেচনের ফলে ভূমিকর উন্নতি	„	১,৯১,০০০	„	৪,১৪,৩৪,০০০
মোট	„	১৯,৮০,০০০	„	১০,০৯,৪৫,০০০
বাদ খরচ	„	৯,৬০, „	„	৩,৩৩,৯১,
মোট সরকারী আদায়	„	১০,২০, „	„	৬,৭৫,৫৪,
মূলধনের সুদ	„	১১,৯২, „	„	২,৯৬,৬১,
মোট সরকারী খাজনা	„	১,৭২, „	„	৩,৭৮,৯২,

এছাড়া যার জন্য লাভের মূলধন খরচ করিতে হয় নাই, তেমন খরচ হইতে আয় ভারতীয় আয় ৩৩,৯৬৭ প্রাদেশিক আয় ৩১ লক্ষ ৭ হাজার।

Statistical Abstract 1920 p 179.

৪। গো-পালন।

আমাদের দেশের লোকের শতকরা ৭২ জন কৃষি করিয়া জীবন ধারণ করে; সেইজন্য গরুকে আমাদের দেশে ধন বলিত। ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশে গোমহিষ ছাড়া লোকে বাঁচিতে পারে না। পশু কৃষকের ধন, পশু কৃষকের বল।

অথচ ভারতের কি সরকারী কি বেসরকারী মহলে গোধন রক্ষা লইয়া তেমন কোনো চেষ্টা হয় নাই; গোরক্ষিনী সভা ও পিঁজরাপোল দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন বলিয়া একদলের বিশ্বাস। ভারতের পশুসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে কি না তাহা লইয়া সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই মতভেদ দেখা যায়।

গোমহিষাদির সংখ্যা

নিম্নে আমরা একটি সরকারী প্রতিবেদন হইতে তালিকা দিতেছি তাহা হইতে দেখা যাইবে যে বৃষ, বলদ, গাভী, মহিষ, বাছুর সমস্তই হ্রাস পাইতেছে।

১৯১৯-২০ সালের পশু-সুমার অনুসারে প্রতি একশ একার (তিনশ বিঘা) জমিতে বঙ্গদেশে ১০১টি ও বোম্বাইয়ে ৩০টি করিয়া পশু ছিল; আর একশ জন লোক প্রতি ভাগলপুর পরগণায় ৮৬টি ও দিল্লীতে ৩৩টি করিয়া পশু ছিল। বৃটীশ ভারতে প্রতি একশ একারের ফসলফলা জমিতে ৬৬টি পশু [বলদ, গাভী, বছুর, বৃদ্ধ, রুগ্ন, বলিষ্ঠ কর্মষ্ঠ সমেত] বা প্রতি একশ জন অধিবাসী পিছু ৩১টি পশু আছে। (Wadia p 267) দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতের মত কৃষিগত-প্রাণ দেশের পক্ষে পশুর সংখ্যা নিতান্ত কম।

পৃথিবীর শিল্পজীবি দেশেরও এমন ভীষণ অবস্থা নয়। ডেনমার্কে শত অধিবাসী পিছু ৭৪টি করিয়া পশু আছে। য়ুরোপ বলিয়া শিল্পপ্রধান

দেশের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা ভাল। আমরা নিম্নে পৃথিবীর কয়েকটি কৃষিপ্রধান দেশের সহিত আমাদের পশু সংখ্যার তুলনা করিতেছি :—

দেশের নাম	জনসংখ্যা	পশু সংখ্যা	১০০ জন অধিবাসীর জন্য
উরগয় (দঃ আমেরিকা)	১৪ লক্ষ	৬৮'৩ লক্ষ	৫০০ গোমোহিষ।
আর্জেন্‌টাইন	৮০ ”	২,৫৮'৪	৩২৩ ”
অষ্ট্রেলিয়া	৫৫ ”	১,১৯'৫	২৫৯ ”
নিউ জিল্যাণ্ড	১৮ ”	:৮'১	১৫০ ”

		জনসংখ্যা	পশু সংখ্যা
কেপ কলোনী	১২০ ”	১১ লক্ষ	১২.৭ লক্ষ
কানাডা	৮০ ”	৭২.৫	৫৫.৭
মার্কিন রাজ্য	৭৯ ”	৯২০	৭,২৫.৩
ডেনমার্ক	৭৫ ”		
ভারতবর্ষ (বৃটীশ) *	৬১ ”	২৪,৪২	১৪,৭৩.৩

---

* ভারতের গোমহিষ ক্ষয়।

বৎসর	বৃষ ও বলদ	গাভী	মহিষ	গাই মহিষ	বাছুর
	লক্ষ	লক্ষ			
১৯১৬-১৭	৪,৯৪	৩,৭৫	৫৫	১,৩৬	৪,৩১
১৯১৭-১৮	৪,৯৩	৩,৭৪	৫৫	১,৩৬	৪,৩০
১৯১৮-১৯	৪,৯৩	৩,৭৪	৫৬	১,৩৬	৪,২০
১৯১৯-২০	৪,৯২	৩,৭১	৫৫	১,৩৩	৪,০৮
১৯২০-২১	৪.৮৯	৩'৭০	৫৪	১.৩৩	৪.৪৩

দেশে বলদের সংখ্যা চাষের অনুপাতে পর্য্যাপ্ত নহে; যথা-সময়ে মাঠে চাষ পড়ে না তাহার প্রধান কারণ সকল চাষীর হালের গরু নাই।

দেশে গাভীর সংখ্যাও নিতান্ত কম; দেশের লোক প্রচুর দুধ খাইতে পায় না, বিশুদ্ধ ঘৃত দুর্লভ। সরকারী-মতে এদেশের প্রতি গাভীর দুধ দৈনিক গড়ে ২ পাঁইট হয় অর্থাৎ পাঁচ পোয়া। গরু ৭ মাস দুধ দেয়। ৫ কোটি গাভী ও মহিষানীর দুধ দৈনিক ৬ কোটি পাঁইট; অতএব বৃটীশ ভারতের ২৫ কোটি লোকের প্রত্যেকের ভাগে গড়ে আধ পাঁইট বা পাঁচছটাক করিয়া দুধ পড়ে, যেখানে প্রয়োজন দুই পাঁইট। আইনী আকবরীতে দেখা যায় সে সময়ে গাই গরুতে দিনে প্রায় ২০ কোয়ার্ট বা প্রায় ২৫ সের দুধ দিত, আর বলদ ঘোড়ার চেয়ে বেশী দৌড়াইতে পারিত।

দুগ্ধ সমস্যা

দুধের অভাবে ভারতের শিশু-মৃত্যু ভীষণরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যুক্ত-প্রদেশের স্যানিটরী কমিশনার বলিয়াছিলেন যে শিক্ষিত ধাত্রীর অপেক্ষা সস্তায় যাহাতে দুধ পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন বেশী। গ্রামে পর্য্যন্ত শিশুর জন্য ভাল দুধ পাওয়া যায় না—কলিকাতার ত কথাই নাই। গত ষাট বৎসরে খাদ্যশস্যের দাম পাঁচ হইতে সাত গুণ বাড়িয়াছে কিন্তু দুধের দাম বাড়িয়াছে ৭০ গুণ। বর্ত্তমানে বিদেশী জমাট দুধ বা দুধ গুঁড়া কিরূপ ভাবে দেশে আসিতেছে তাহা পাঠক দেখিবেন। ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত ৪৫, ৬৪, ৪৪, ৪৬ ও শেষ বৎসরে ৫৬ লক্ষ টাকার বিলাতী দুধ ভারতবর্ষে আমদানী করিতে হইয়াছে। (Sea-borne Trade p. 44,404, 400) পাশ্চাত্য দেশে দুধের দর পূর্ব্বের চেয়ে তেমন বাড়ে নাই। আমাদের দেশে লোকে দুধে ঘিয়ে মানুষ হইত; এই

পুষ্টিকর সামগ্রীর অভাব হওয়াতে লোকের জীবনীশক্তি কিরূপে হ্রাস পাইতেছে তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। সেই জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে বলিয়া সকল প্রকার রোগেই লোকে সহজে আক্রান্ত হয়।

ভারতবর্ষের গো-জাতির অবনতির কারণ এবং তাহা দূর কেমন করিয়া করা যাইতে পারে সংক্ষেপে তাহা নির্দেশের চেষ্টা করিতেছি।

(১) দেশে গোচারণের মাঠ ও গোখাদ্যের অত্যন্ত অভাব।

গোচারণ ভূমির অভাব

আমাদের দেশে চিরকালই গ্রামের পার্শ্বে গোচারণে ভূমি রাখার নিয়ম ছিল; সেই জমিতে কেহ হাত দিত না। গোচারণ ভূমির অভাবে পশুর স্বাস্থ্য দিন দিন নষ্ট হইতেছে। জনসংখ্যা কিছু কিছু বাড়িতেছে; অথচ তাহাদের উপযুক্ত শিল্প বাণিজ্য নাই; সুতরাং সকলেই কৃষির দিকে ঝুঁকিতেছে। জমিদার বা প্রজা কেহই গ্রামের পাশের পতিত জমিটুকুর লোভ ছাড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু ইহাতে কি সত্যই উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বাড়িতেছে? তাহাও নহে। জমির উৎপাদিকা শক্তি যথোচিত সারের অভাবে হ্রাস পাইতেছে ও সেইজন্য বিস্তৃত ভূমি কর্ষণ করিয়া লোকে লোকসান পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

এছাড়া আমাদের দেশে গরুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই হয় না। খড়ের দাম প্রতি বৎসর এত চড়িতেছে যে গ্রামে গরীব লোকে অধিকাংশ স্থলে নিজেরাও যেমন খায় গো-মহিষকে তাহার চেয়ে অধিক খাদ্য সরবরাহ করিতে পারে না। দেশে রীতি-মতভাবে পশুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টার প্রয়োজন। জলের অভাবে ইহারা কষ্ট পায় এবং হাজারে হাজারে জলাভাবে মারা পড়ে।

গরুর একটি প্রধান খাদ্য খৈল। কিন্তু সেই খৈলও ভারতের গরু খাইতে পায় না; তাহার কারণ অন্যত্র নির্দেশ করিয়াছি। প্রতি-

বৎসর ভারত হইতে লক্ষাধিক টন্ (১৯২৫ সালে ৫৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণ) খৈল বিদেশে রপ্তানী হয়।*

(২) গরুর জাত দিন দিন খারাপ হইয়া আসিতেছে। খাদ্যাভাব ছাড়া আর একটি কারণে ভাল গরু ক্রমশই লোপ পাইতেছে। আমাদের দেশে ভাল ষাঁড় ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। পূর্বে হিন্দুরা পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধের সময়ে বৃষোৎসর্গ করিত; সেই 'ধর্মের' ষাঁড়কে কেহ বাঁধিতে মারিতে বা বধ করিতে পারিত না। সমাজের সকলেই তাহার যত্ন করিত; প্রত্যেক গ্রামেই এই শ্রেণীর অনেকগুলি করিয়া বলিষ্ঠ ষাঁড় থাকিত; সুতরাং ভাল জাতীয় গরু জন্মিত। কিন্তু বর্তমানে লোকে প্রায়ই বৃষোৎসর্গ করে না; এখন 'বৃষ-কাঠ' খানি নদীর ধারে পুঁতিয়া আচার রক্ষা করে, ধর্মের যথার্থ অর্থ লোক ভুলিয়াছে। তা ছাড়া কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও এলাহাবাদ হাইকোর্ট ধর্মের ষাঁড় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহা কাহারও সম্পত্তি নহে, সুতরাং কেহ হত্যা বা বিক্রয় করিলে অপরাধী হইবে না। (Sir John Woodrffe—Bharat Sakti p. 17) এই সর্বনেশে রায় প্রকাশ হওয়াতে ধর্মের ষাঁড়গুলিকে ম্যুন্সিপালটির গাড়ী বহিতে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল, কসাইরা

ভাল জাতের বৃষের অভাব

	হাজার টন্		হাজার টন্
*১৯১৫	১,৩৬,	১৯২০	১,৪৩,
১৯১৬	১,৫০,	১৯২১	৯৫,
১৯১৭	১,২৫,	১৯২২	১,১২,
১৯১৮	৮৬,	১৯২৩	১,৫১,
১৯১৯	৮৭,	১০২৪	১,৭৮,
		১৯২৫	১,৯৫,

(Stats. Abs. 3rd. Issue. Seaborne Trade 1923 p. 6.

নির্বিচারে মারিতে লাগিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এদিকে ত' সমাজের শাসন ও বন্ধন এমনি শিথিল, তারপর রাজবিধি ইহার অনুকূল নহে। কৃষি-বিভাগ ভাল জাতের বৃষ ও গাভী উৎপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পঞ্জাব এবিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশও চেষ্টা করিতেছে। বাংলাদেশে রঙপুরে সরকারী ফার্মে অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; এবং তাঁহাদের চেষ্টায় সরকারী খাস মহলে ও নানা জমিদারীতে ভাল জাতের বৃষের প্রচলন হইতেছে। সমগ্র ভারতের গোধনকে রক্ষা করিতে হইলে সমাজকেও এদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে—সরকারকেও সাহায্য করিতে হইবে। ১৯২৫এ ডিসেম্বরে পুসাতে ভারতের কৃষি-পরিষদের একটি বৈঠক বসে তাহাতে অনেক কাজের কথা হয় ও ভাল ভাল প্রস্তাব অনেক আলোচিত হয়।

গো-মৃত্যু

(২) পশুর মৃত্যু দুই প্রকারে হয়, এক রোগে আর এক কশাইএর হাতে; এ ছাড়া অনাহারে, বন্যায় নিতান্ত কম মরে না। এক একবার দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ করিয়া গরু মরে। ১৯০০ সালে রাজপুতনায় প্রায় ৭০ লক্ষ ও গুজরাটে ৫ লক্ষ পশু মরিয়াছিল। ১৮৯৭ ও ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষে এদেশ হইতে অনেক ভাল জাতের গরু একেবারে নির্বংশ হইয়া গিয়াছে। তারপর হইতে জনসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, গরু মহিষের সংখ্যা সেইরূপ বাড়িতে পারে নাই। অনাহারে, বন্যায় ও বার্দ্ধক্যহেতু বহু সংখ্যক গরু বাছুর ত মরিয়াই থাকে—তাহার হিসাব জানা সম্ভব নহে; কিন্তু সংক্রামক ব্যাধিতে ১৯১৩-১৪ সালে ১,৯৩,৭১১ ১৯২৩-২৪ সালে ২,৬৬,৪৭৭ গো-মহিষ মরিয়াছিল; গো-মড়কে মাঝে মাঝে দেশ উৎসন্ন যায়।

পশু চিকিৎসার জন্য সরকারী একটি বিভাগ আছে। মুক্তেশ্বর নামক স্থানে সরকারী গবেষণা-মন্দির (Imperial Institute of

Vetarinary Research) আছে; সেখানে বহু প্রকার পশু রোগের প্রতিশেধক বীজাণু প্রস্তুত হয়। সেখানকার পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে অনেক পশু ব্যাধির প্রতিশেধক আবিষ্কৃত হইয়াছে। গো-বসন্তের টীকা ক্রমেই চাষীরা বিশ্বাস করিয়া ব্যবহার করিতেছে। মুক্তেশ্বরে ১৯২৫ সালে ৩৫ লক্ষের উপর প্রতিশেধক পুরিয়া (Vaccine) প্রস্তুত হইয়াছিল। পশু চিকিৎসার জন্য বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কলিকাতা, লাহোরে কলেজ আছে। কিন্তু এত বড় দেশের পক্ষে মুক্তেশ্বরের পরীক্ষাগার ও চারিটি কলেজ নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত। তা ছাড়া চাষীদের কাছে দেশীয় ভাষায় কৃষি ও গো-পালন সম্বন্ধে উপদেশ সামান্যই পৌছায়। কৃষি-বিভাগের জিলা-কর্মচারীগণ ইচ্ছা করিলে চাষাদের কাছে অনেক বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিতে পারেন। সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইতেছে হাতে কলমে কাজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করা।

পশুচিকিৎসা

গো ক্ষয়ের দ্বিতীয় কারণ গোবধ। গো-মহিষ তিন কারণে বধ হয়। (১) খাদ্যের জন্য, (২) বিদেশে শুক্‌নো মাংস রপ্তানীর জন্য, (৩) চামড়ার জন্য। এই তিন দফাতেই গো-হত্যার সংখ্যা বাড়িতেছে। গো-হত্যা বাবদ ভারতের ম্যুন্সিপ্যালটির আয় গত দশ বৎসরে শতকরা ৭০ হারে বাড়িয়াছে; আর চামড়ার রপ্তানী ৫০ বৎসরে ২০ গুণ বাড়িয়াছে। প্রতি বৎসর বৃটীশ ভারতে এক কোটী গরু খাদ্যের জন্য মারা হয়। শুক্‌নো মাংস রপ্তানীর জন্য যে গরু বধ হয় তাহার সংখ্যা প্রায় বৎসরে ১০ লক্ষ। ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশে কৃষি উপযোগী গো-হত্যা নিবারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া বৎসরে ৩৬৪ দিন উদাসীন থাকিয়া একটি দিনে মুসলমানেরা গো-হত্যা করে বলে তাহাদের উপর জুলুম করিতে হইবে তাহার কোনো অর্থ নাই। যে সব গরু

গো-বধ

কৃষির উপযোগী বা দুগ্ধবতী সেরূপ পশু হত্যা বন্ধ করা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রত্যেকের স্বার্থ।

দুধ দেওয়া শেষ হইলে বহু সংখ্যক গরু আমাদের গ্রাম হইতে কশাই এর হাতে গিয়া পড়ে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী টাঙ্গরায় বৎসরে প্রায় ৯০,০০০ এবং সোনাডাঙ্গাতে প্রায় ১০,০০০ গাইগরু নিহত হয়। এই সংখ্যার মধ্যে ৩,০০০ গাইগরুর বয়স সাত বছরের নীচে। বোম্বাই সহরে ১৯১৪-১৫ সালে বান্দরা হত্যাশালায় ৪৪,১৭৭ গাইগরু ও ৮,৫৭৫ মহিষ নিহত হইয়াছিল। দুধ দেওয়া হইলে বোম্বাই প্রদেশে শতকরা ৭৫টা গরু মহিষ নাকি হত্যাশালায় প্রেরিত হয়।

কলিকাতার কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব সভাপতি স্যার চার্লস পেইন বলিয়াছেন, গোয়ালারা সাধারণত দুই বিয়ানের সময়ে গাইগরু কেনে। তার পর বাছুর বিক্রয় করিয়া দেয় ও কৃত্রিম 'ফুকা' দিয়া দুধ দুহিতে থাকে; এই পৈশাচিক কাণ্ড ছয় হইতে আট মাস পর্য্যন্ত চলে। তার পর আর দুই তিন বৎসর এই গাভী পাল ধরে না। এদিকে কশাই দুয়ার গোড়ায় হাজির, সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। যাহারা দুগ্ধের ব্যবসায় করে তাহারা অনেকেই হিন্দু।

ভারতবর্ষে কি পরিমাণ গরু মহিষ, বাছুর প্রতি বৎসর নিহত হয় বা মরে তাহার আংশিক প্রমাণ আমরা বিদেশে কাঁচা চামড়া (hide) ও তৈয়ারী চামড়ার (leather) রপ্তানী হইতে বুঝিতে পারিব। আংশিক বলিতেছি এই জন্য যে ভারতের মধ্যে টানারী দেশী ও বিদেশী পরিচালিত যে-সব ট্যানারী আছে তাহাতে যে পরিমাণ চামড়া ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা তুলনা করিবার উপাদান নাই।

নিহত গো-মহিষ ও চামড়া রপ্তানী

বিদেশে ১৯২১ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত যথাক্রমে ৪২, ৬০, ৫৪, ৫৭, ৬৪ লক্ষ করিয়া গো-মহিষের চামড়া (hide) রপ্তানী হইয়াছিল। এছাড়া

তৈয়ারী চামড়া (leather) ঐ সময়ে যথাক্রমে ১৪, ২১, ৩৭, ৪৮, ৪৮ লক্ষ বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশে যেসব চামড়া চালান যায় তাহা অধিকাংশ সময়ে নিহত গরুর চামড়া ; মরা গরুর চামড়া নিকৃষ্ট, উহা দেশীয় মুচিরা ব্যবহার করে।. বাছুরই প্রতি বৎসর ১০।১৫ লক্ষ করিয়া মারা হয়। বিদেশী বণিকেরা তাহা ক্রয় করে না। পরিশিষ্টের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে ভারতে প্রতি বৎসর কিরূপ গো-বধ হয়। পাঁচ বৎসরে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ গো-মহিষাদির চামড়া বিদেশে গিয়াছে। তবে আথিক দিক হইতে বিচার করিলে কতকগুলি উদ্বৃত্ত এঁড়ে বাছুর ও দুগ্ধহীন গাভী ও অকর্মণ্য বলদ আহারের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় আহারের জন্য বিশেষ এক প্রকার গরু পালন করা হয়। প্রয়োজন হইলে ভারতেও সেই প্রকার ব্যবস্থা করা উচিত।

(৪) ভারতবর্ষ হইতে গরু প্রতি বৎসরই রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের গরুই এককালে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকে জানিত। এখনো কয়েকটি জাতের গরুর খুব নাম আছে। এই রপ্তানী শতাব্দীকাল ধরিয়া সামান্যাকারে চলিতেছিল, কিন্তু বর্তমানে যে ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা পূর্বে কখনো হয় নাই। সরকারী

বলদ গাড়ীর রপ্তানী

কৃষি-বিভাগের প্রতিবেদনে প্রকাশ যে রপ্তানীর ফলে ভাল ভাল জাতের গরু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে ; যবদ্বীপে গরু খুব চালান হইতেছে এবং শোনা যাইতেছে এই রপ্তানী আরও বাড়িবে। যেসব গরু যবদ্বীপে যাইতেছে সেগুলি অল্পবয়সের ষাঁড় ও গাই ; মাংসের জন্য গরুর চাষ হইবে ওলন্দাজ সরকারের ইহাই অভিপ্রায়। যুদ্ধের সময়ে রপ্তানী কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে আবার বাড়িতে সুরু হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল হইতে দশ জন ব্যবসায়ী আসিয়া বোম্বাই হইতে সর্বোৎকৃষ্ট জাতের গরুগুলিকে চালান দিতেছিল। আমাদের দেশে যদি

গরু উৎপন্ন করিবার ফার্ম থাকিত তবে তো আমরা রপ্তানী করিয়া লাভবান হইতাম ; দুঃখের ত কোনো কারণ ছিল না বরং বিদেশে ভাল জাতের গরু পাঠাইবার গৌরব হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ত সে অবস্থা নয়। গরুর রপ্তানী কিরূপ হইতেছে নিম্নে তাহা দিতেছি :—

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
সংখ্যা	১৯,০৬৮	২১,১৭৯	১৩,৬৭৫	১২,৫৯৭	১০,১৯৫
মূল্য	২০,৪৪,৬৮০,	১৬,৭৪,২৮২,	৮,২৮,৯১২	৮,৫৮,৮০৪,	৮,৩৭,৪৮০

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জীবিত পশু বৎসরে ২।২½ লক্ষ করিয়া চালান যায়। পূর্ব্বে বেশীও যাইত। বিংশ শতাব্দীতে এ পর্য্যন্ত খুব কম করিয়া ৭০ লক্ষ জীবিত পশু ভারত হইতে বিদেশে চালান গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫।৬ লক্ষ গোমহিষাদি ২৫ বৎসরে গিয়াছে।

ভারতবর্ষের গো-সমস্যা অন্যান্য সমস্যার চেয়ে কোনো অংশে কম নহে। গোজাতির উন্নতির জন্য কোনো কালেই আমরা রাজদরবারে উপস্থিত হই নাই। প্রাচীন সমাজের ভাল প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখিয়া পশ্চিমের পরীক্ষালব্ধ সত্যগুলি লইতে হইবে। দেশে গোচারণ ভূমি রাখা, গরুর খাদ্যশস্য ক্ষেতে উৎপন্ন করা, ধর্মের ষাঁড়গুলিকে রক্ষা ও যত্ন করা, একত্রে গ্রামের চাষ বাস দেখা, একত্রে ভাল বীজ ক্রয় করা, এক সঙ্গে শস্য বিক্রয় করা ইত্যাদি অনেক কাজ নিজেরা আমরা করিতে পারি। দুধ ও ছানা বিক্রয়ের ব্যবস্থা, মাখম তোলা, ঘি করা ইত্যাদি কাহারও সাহায্য না লইয়াও নিজেরা করিতে পারি। চাষীদের মধ্যে সেই বোধ জাগ্রত করাই সরকার বাহাদুর ও দেশসেবকদের কাজ।

পরিশিষ্ট—রপ্তানী চামড়ার হিসাব।

	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
মহিষ (Hide)	৩,৪৭,৭২৮	২,৫৬,৪৫২	৩,৯৯,৮৭০	৬,১১,১১৮	৫,৩৫,৬৪১
(Leather)	৫১,১৯৩	৯৫,৪০৭	১,৪৭,২৩৮	১,৮৪,৯৮৫	২ ০২,০২৮
মহিষ, মৃত-নিহত	৩,৯৮,৯২১	৩,৫১,৮৫৯	৫,৪৭,১০৮	৭ ৯৬,১০৩	৭,৩৭,৬৬৯
গরু (Hide)	৬৩,৪৫,৭৯৬	৫৪,২২,২৩৫	৪৮,১২,৩৫৮	৫০,২৬,৮১০	৫৬,১৬,০৭৯
" (Leather	৯,৭৪,৮৬৩	১৫,৬৯,৭১৩	২৫,২০,৮২০	৩৪,৯৫,২৬৫	৩৭,৭৩,৫৩১
গরু মৃত, নিহত	৭৩,২০,৬৫৯	৬৯,৯১,৯৪৮	৭৩,৩৩,১৭৮	৮৫,৩২,০৭৫	২৩.৮৯,৬১০
বাছুর (Hide)	৫,২৯,৯৯৫	৩৮৫,০৯৩	২,০৪,৬৯৭	১,২৭,৩০৪	২,৮৩,১৭৬
" (Leather)	৪,৪২,৯৮৬	৪,৭৬,৩৯২	১০,২২,৪২৩	১১,৮২,৩৭২	১২,৭১,১১৩
বাছুর, মৃত-নিহত	৯,৭২,৭৮১	৮,৬১ ৪৮৫	১২,২৭,১২০	১৩,০০,৬৭৬	১৫,৫৪,২৮৯
অন্যান্য (Hide)	২২৩	২	৮৭৮	১,০০৫	১,৪৬৩
" (Leather)	১,৬৫৯	৬৫৫	৪১৫	১,৬৮২	৬০৬
অন্যান্য মোট	১,৮৮২	৬৫৭	১,২৯৩	২,৬৮৭	২,০৬৯
মোট নিহত মৃত গোমহিষ বাছুর	৫৬,৯৪,২৪৩	৮৭,৯৬,৯২৯	৯১,০৮,৬৯৯	১,০৬,৩০,৫৪১	১,১২,৮৩,৬৩৭

৮। খনি ও ধাতু

ভারতবর্ষের উপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও দৃষ্টি যে এত ঘন ঘন পড়িত তাহার কারণ ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসূ এই প্রবাদটি সত্যের ও সভ্যতার সকল সীমানা ছাড়াইয়া বহুদূর ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীক্‌দের মধ্যে প্রবাদ ছিল ভারতবর্ষের সোনার খনিতে পিপীলিকারা কাজ করিত। পারস্য-রাজ দরায়ুসের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিশটি প্রদেশের মধ্যে সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশ হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইত অন্য কোনটি হইতে সেরূপ হইত না।

ভারতের ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ।

ভারতের প্রতি লোভ করেন নাই এমন সভ্য অসভ্য জাতি নাই বলিলেই হয়; কেহ বা লুণ্ঠন করিতে কেহ বা দেশ জয় করিতে, কেহ বা কেবল মাত্র বাণিজ্য করিতে কেহ বা বাণিজ্য ও শাসন উভয় হস্তে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন ও নিজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে আসিয়াছেন।

একশত বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষ খনিজ ধাতু ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যে দেশের সকল প্রকার ধাতুশিল্প লোপ পাইয়াছে। আমাদের এই অধঃপতনের কারণ বাহিরের প্রতিযোগিতা ও পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি। য়ুরোপে রাসয়নিক উন্নতি সাধিত হওয়ায় সহজে ও সস্তায় ধাতু-সামগ্রী নির্মাণের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; ভারতে রেলপথের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব মাল দেশের মধ্যে সহজে ও অনায়াসে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবর্ষ যে এককালে ধাতু-রসায়নে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন মধ্যযুগের লৌহ সামগ্রীর চিহ্ন। প্রাচীন দিল্লীতে একটি লৌহ স্তম্ভ আছে;—সেটি সহস্রবর্ষাধিক নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু এতকাল বাহিরে

প্রাচীন ভারতের ধাতু শিল্প।

পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও তাহার গায়ে মরিচা পড়ে নাই; এটা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ ছাড়া ভারতের নানা স্থানে লৌহ নির্ম্মিত অনেক কামান পাওয়া যায়। পিতল, কাঁসা ও তামার সামগ্রী এককালে ভারতে তৈয়ারী হইত; এবং সে সমস্ত চাদর বা পাত এদেশে প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিল্পীদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। বর্ত্তমানে এ সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে। আমরা এখন বর্ত্তমান ভারতের খনিজ ও ধাতুশিল্পের অবস্থা কিরূপ তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সমগ্র খনিজ পদার্থকে আমরা সুবিধার জন্য কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছি:—

খনিজের শ্রেণী-বিভাগ।

(১) অঙ্গার-জাতীয় খনিজ—কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্রাফাইট্। (২) খনিজ ধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন্, তাম্র, জিঙ্ক বা দস্তা, শীশা, লৌহ, মাঙ্গানিস, নিকেল, আলুমিনিয়াম। (৩) প্রস্তর—গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত পাথর, শ্লেট্, চুণ, সিমেণ্ট, কর্দ্দম, বালি ইত্যাদি (৪) নানা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ, যেমন খনিজ রঙ, চীনা মাটি (৫) মণি মাণিক্য।

কয়লা।

বর্ত্তমানে আমাদের সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রী কয়লা। আমাদের গৃহকর্ম্মে, রন্ধনশালায় যে কয়লা নিত্য লাগে তাঁহা সমগ্র প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। পৃথিবীব প্রায় সমস্ত রেল, ষ্টিমার প্রভৃতি যান ও অধিকাংশ কল কারখানা কয়লায় চলিতেছে। ভারতের কয়লা প্রধানত রেলওয়ে ও কলকারখানায় ব্যবহৃত হয়।

কয়লার প্রয়োজন।

পৃথিবীতে কত কয়লা আছে এবং ভবিষ্যতে খোঁজ খবর লইলে আরও কত কয়লা পাওয়া যাইতে পারে সেবিষয়ে পণ্ডিতগণ গবেষণা করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহারা অনুমান করেন এখনো ৩০ হাজার কোটি টন্ কয়লা মজুত আছে এবং আরও ৪ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টন্ কয়লা চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে। প্রতি বৎসরে পৃথিবীতে যে পরিমাণ কয়লা উঠে তাহাতে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য প্রথম। গ্রেট্-বৃটেন দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ অষ্টম।

পৃথিবীর মজুত কয়লা।

ভারতের ভূতত্ত্ব অনুসারে দাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগপুর অতি প্রাচীন দেশ। এই ভূভাগ স্তরে স্তরে গঠিত, শিলাময় খনিজ ধাতুতে সমৃদ্ধ। এই ভূখণ্ডকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গণ্ডোয়ানা ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন। এই গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডের অন্তর্গত পাঁচটি বিভাগ বঙ্গদেশেই, একটি মধ্যভারতে, তিনটি মধ্যপ্রদেশে ও একটি হায়দ্রাবাদে আছে।

গণ্ডোয়ানী ক্ষেত্র।

ভারতবর্ষ খনিজ সামগ্রীতে কি প্রকার সমৃদ্ধ তাহাই দেখাইবার জন্য নিম্নে আমরা কয়েকটি বড় বড় খনিজ পদার্থের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। ভারতের এই সকল খনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরাজ-মূলধনে চলিতেছে; আমাদের দেশে ধনী লোকের অভাব নাই, অথচ দেশে মূলধন তুলিয়া খনিগুলিতে খাটাইবার মতো উৎসাহ বিদ্যা বুদ্ধি আমাদের নাই। অসুবিধা যতই থাকুক আমরা যদি বুঝিতাম যে দেশের খনিজ সামগ্রী আমরা তুলিয়া বিক্রয় করিলেই দেশের মঙ্গল তবে সকল প্রকার জড়তা দূর করিতাম।

বাংলাদেশের কয়লার খনি রাণীগঞ্জ হইতে আরম্ভ; কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যেই ঐখানকার খনিগুলি পড়ে। এখানকার কয়লা শতাব্দীকাল ব্যবহৃত হইতেছে

রাণীগঞ্জের কয়লা

বটে, কিন্তু ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (E. I. Ry.) এইখানে প্রবেশ করিয়া কারবারী ধরণে কাজ চালাইতে আরম্ভ করেন। মোটা-মুটি ভাবে বলা যাইতে পারে বাংলাদেশের কয়লার খনি দামোদর নদীর ধারেই অবস্থিত। রাণীগঞ্জের পশ্চিমে ঝরিয়ার বিখ্যাত কয়লা-ক্ষেত্র। ঝরিয়ার কয়লার ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে ২৭ মাইল ও প্রস্থে দশ মাইল মাত্র, কিন্তু খুব গভীর স্তরেও কয়লা আছে জানা গিয়াছে। অনুমান ৫ হাজার ফিট্ নীচেও কয়লা আছে। কিন্তু বর্তমানে অতি সামান্য অংশই খোঁড়া হইয়াছে। এখানে ১৮টি স্তর পাওয়া গিয়াছে, স্তরগুলির গভীরতা ৫ হইতে ৩০ ফিট্; সুতরাং কি পরিমাণ কয়লা আছে তাহা আমরা সহজেই হিসাব করিতে পারি। এখানকার কয়লা খনি ১৮৯৪ সাল হইতে খোঁড়া সুরু হইয়াছে। ১৯২৩ সালে ১ কোটি ৩ লক্ষ টন্ কয়লা ঝরিয়াতে উঠিয়াছিল।

ঝরিয়ার কয়লা খনি

ঝরিয়ার পশ্চিমে বোকারোর কয়লার খনির আয়তন প্রায় ২২০ বর্গ মাইল; সেখানে অনেকগুলি গভীর স্তর আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন এখানে প্রায় ১৫০ কোটী টন্ কয়লা মজুত আছে। হাজারীবাগ সহরে কয়লা সরবরাহের জন্য বোকারোর কয়লার উপরিতন স্তরে স্থানে স্থানে কাজ সূচিত হইয়াছে। ১৯২৩ সালে ৩টি কোলিয়ারীতে প্রায় ১০ লক্ষ টনের উপর কয়লা উঠিয়াছিল। অল্প দিন হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীদ্বয়ের সমবেত চেষ্টায়, আর বোকারো-রামগড় কোলিয়ারী কোম্পানীর যত্নে বোকারোর কয়লার কাজ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৪ সালে এখানে প্রায় ১০ লক্ষ টন্ কয়লা তোলা হইয়াছিল। ভারতের রেলওয়ে কোম্পানীরা এই সব খনির ইজারা লইয়া জোরে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

বোকারো ও রামগড়

হাজারীবাগ জিলার রামগড় ইলাকায় প্রায় ৪০ বর্গ মাইল স্থান

কয়লা আছে ; কিন্তু কয়লা তত ভাল নয়। হাজারীবাগের দক্ষিণে দামোদর নদীর ধারে করণপুরা নামে একটি স্থানের দুই জায়গায় কয়লা পাওয়া যায় ; ইহাদের মধ্যে একটি ৭২ বর্গ মাইল, অপরটি ৪৭২ বর্গ মাইল ; সুতরাং নিতান্ত কম নয়। উভয় স্থানে অনুমান প্রায় ৮৮২ কোটি ৫০ লক্ষ টন্ কয়লা আছে। এখানে কয়লা ৬০ ফিট্ পুরু, কোনো কোনো স্থানে ১৩৯ ফিট্ পর্য্যন্ত পুরু কয়লার থাক আছে। এখানে বড় বড় সাহেব কোম্পানী জোরে কাজ সুরু করিয়াছে। পালামৌ জিলার অন্তর্গত ডালটনগঞ্জের কয়লার খনি ১৯০১ সালে মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। গিরিধির কয়লার খনিগুলি খুব বিখ্যাত। এখানকার কয়লা-ক্ষেত্রের পরিমাণ ফল যদিও ১১ মাইলের অধিক নয় তথাচ গুণের জন্য এখনকার কয়লার নাম ও দাম দুইই অধিক। বঙ্গ-বিহারের খনি হইতে যে পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হয় সমগ্র ভারতে তাহা হয় না। ১৯২৩ সালের সমগ্র ভারতে উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৯৭.৪ ভাগ বঙ্গ-বিহারের গণ্ডোয়ানা পর্য্যায়ে উত্তোলিত হয়। ঐ সালে প্রায় ১ কোটি ৯২ লক্ষ টন্ কয়লা গণ্ডোয়ানা পর্য্যায়ে তোলা হইয়াছিল।

করণপুরার কয়লাক্ষেত্র

বঙ্গ-বিহারের খনির শ্রেষ্ঠত্ব

বঙ্গদেশের বাহিরে মধ্য-প্রদেশে সাতপুরা পাহাড়ের শাখা মহাদেও শৈল অঞ্চলে নরসিংহপুর, বিটাল ও চিন্দবরা জেলায় কয়লা পাওয়া যায়। এ প্রদেশের মোহাপানী কয়লার খনিতে ১৮৬২ সাল হইতে কাজ আরম্ভ হয়। মধ্য-প্রদেশে মোহপানী, বল্লরপুর এবং পঞ্চ ভ্যালির কয়লা খনি প্রসিদ্ধ ; ১৯১৭ সালে এই তিন স্থানে মোট ৩ লক্ষ ৭১ হাজার টন্ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল।

মধ্য-প্রদেশের কয়লা খনি

দাক্ষিণাত্যে কয়লা খুব কম পাওয়া যায়। নিজামের হায়দ্রাবাদে সিঙ্গারেণী কয়লা খনি ব্যতীত উল্লেখযোগ্য খনি আর নাই। এই

খনির পরিমাণ ফল ১৯ বর্গ মাইল। খনির কাজ ১৮৮৩ সালে

হায়দ্রাবাদে সিঙ্গারণীর খনি

.... হয় ও ১৯২০ সম্ভির খনিতে কাজ সুরু হয়। ১৯২৩ সালে উভয় স্থানে মোট ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। পাঁচ ফিটের বর্তমানে কাজ হইতেছে। অনুমান প্রায় ৪ কোটি টন্ কয়লা সে আছে।

মধ্য-ভারতের মহানদীর ধারে ধারে কয়লার খনি আছে। রাজ্যের উমরিয়া-ক্ষেত্রে ছয় স্তর কয়লা আছে। এইখানে প্রায় ২½

অন্যান্য দেশে।

কোটি টন্ কয়লা আছে বলিয়া বোধ হয়। উমরিয়ার ক্ষেত্রে ১৯১৭ সালে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। পরে এখানে কয়লা কম উঠিতেছে। গণ্ডোয়ানা পর্য্যার বাহিরে ব্রহ্মদেশে, আসাম, বেলুচিস্থান ও বিকানীরে কয়লার খনি আছে।

ভারতবর্ষে কয়লার খনি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথমত জ্বালানি কাঠের অভাব ও সহরের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে।

কয়লার খরচ

দ্বিতীয়ত রেলপথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। তৃতীয়ত ভারতীয় শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় কয়লার খরচ বাড়িতেছে। ১৮৭৮-৮০ সালে গড়ে বাৎসরিক উৎপন্ন কয়লা ৯ লক্ষ টনের অধিক ছিল না; ১৯১৫ সালে কয়লা প্রায় উহার ১৮ গুণ অধিক। গত দশ বৎসরে এই বৃদ্ধি আরও বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের যে কয়লা উৎপন্ন হইতেছে তাহা কিরূপভাবে খরচ হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ১৯২২-২৩ সালের অঙ্ক দেওয়া হইল।

রেলওয়ে	৬১ লক্ষ টন্	পাঁজা পোড়ানো	৪,৩৭ হাজার টন্
পাটের কল	৯.৪২ হাজার টন	জাহাজের জন্য	৫,৮২ হাজার টন

কাপড়ের কল	১১ লক্ষ টন্	খনির কাজ	২৪ লক্ষ „ টন্
লোহার ও পিত-লের কারখানা	২৪ লক্ষ টন্	অন্যান্য শিল্প ও গৃহাদির রন্ধন কার্য্যে	৪৪ লক্ষ „ টন্

মোট প্রায় ২ কোটি টন্ প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হয়; ইহার মধ্যে রেলওয়েতেই শতকরা ৩০ ভাগ লাগে (Geol. Surv. of India lvii 1925 p. 33)

কয়লা হইতে বহুপ্রকার উপসামগ্রী (By-products) পাওয়া যায়।

By-products

আল্‌কাতরা, আমোনিয়া, বেঞ্জন প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ সাকৃচি, বরাকর, গিরিধি প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। তাতার জামসেদপুরের লৌহ কারখানায় কয়লা বাই-প্রোডাক্ট প্রস্তুতের সর্বপ্রধান কারখানা আছে। পরে উহা বর্ণিত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষভাবে জারমেনীতে উপ-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া খনিওয়ালারা কোটি কোটি টাকা তুলিয়া থাকে।

১৯১৯-১৯২৩ পর্য্যন্ত কয়লার খনিসমূহে গড়ে প্রতিদিন ১ লক্ষ করিয়া মজুর খাটিত। ১৯২৭ সালে গড়ে তাহাদের দৈনিক আয় ॥৶১০

শ্রমজীবির সংখ্যা আয়, শ্রমশক্তি ও অপমৃত্যু

আনা; মাথা পিছু প্রত্যেক কুলী বৎসরে ১৭০ টন্ কয়লা উঠায়। আমাদের দেশের কুলীরা বিলাতের শ্রমজীবিদের তুলনায় কম পরিশ্রম করিতে পারে। বিলাতের দুইজন কুলী সারাদিন যে-কাজ করে আমাদের পাঁচ জনে তাহা অতি কষ্টে করে। কয়লার খনির কাজে মাঝে মাঝে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে—কর্তৃপক্ষের অমনোযোগই অধিকাংশ স্থলে ইহার জন্য দায়ী। ১৯২৩ সালে সমগ্র ভারতে ৩৬৩টি এইরূপ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

ভারতে ১৯২১ সালে সর্বসমেত ৬২৮টি কয়লার খনি ছিল। প্রায় ২ লক্ষ ৬৭ হাজার লোক কাজ করিত; ইহার মধ্যে ১,৮৪ হাজার

শ্রমজীবি ; ৬৭ হাজার কারিগর ; ৮,৪৫৭ জন ভারতীয় কর্মচারী ও ১৩১২ জন সাহেব বা ফিরিঙ্গী পরিচালক। (Stastitical Abs. 1920 p. 642.)

বাংলাদেশের ১৯১৭ সালে ১৪৩টি যৌথ-কোম্পানী ছিল, এবং তাহাদের মূলধন ছিল ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ; ইহার বিশ বৎসর পূর্বে মূলধন ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং এই কয় বৎসরে এই ব্যবসায় কি পরিমাণ বাড়িয়াছিল তাহা দেখিয়া বিস্ময় লাগে। কিন্তু ইহার পর নানা কারণে কয়লা খনির দুর্গতির জন্য বাংলাদেশের ২৭০টি কয়লার খনি স্থানে ২৫০টি খনি দাঁড়াইয়াছিল। Beng. Adm. Report 1924-25, p. 76) উপর্যুক্ত যৌথ-কারবার ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তিও অনেক আছে। বর্তমানে কয়লার ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপীয় বণিকদের হাতে না হইলেও বড় বড় ভাল খনিগুলির মালিক তাঁহারাই। ভারতবাসীদের খনিগুলির অধিকাংশই ছোট ছোট পিট বা ঢালু খনি।

বিদেশী কয়লার আমদানী

যুদ্ধের পর ১৯১৯ সাল হইতে ভারতের কয়লা ব্যবসায়ে ভীষণ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা আসিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, জাপান ভারতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ১৯১৯এর পূর্বে ভারতীয় কয়লা দেশে ব্যবহারের পরও কিছু বিদেশে রপ্তানী হইত। ভারতের শিল্প বিস্তার লাভ করায় কয়লার ব্যবহার যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি বিদেশী কয়লার আমদানীর জন্য কয়লা এখন উঠিতেছেও কম। ১৯০৯ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর ৬,৭৬,৯৫৯ টন্ করিয়া কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইত ; সেই স্থানে ১৯১৯-২৩ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ৪,৪৪,৫১০ টন্ করিয়া বিদেশে গিয়াছিল। (p. 35). ১৯২০-২১ সাল পর্য্যন্ত ভারতের রেলওয়েতে সমস্ত কয়লাই দেশীয় কয়লা ব্যবহৃত

হইত। ১৯২১ সাল্ হইতে শতকরা ১১'৫ ভাগ কয়লা তাঁহারা বিদেশ হইতে কিনিয়াছিলেন। ভারতীয় রেলওয়েগুলি ১৯২২-২৩ সালে ৭ লক্ষ ১০ হাজার টন্ বিদেশী কয়লা ক্রয় করিয়াছিল। ইহার ফলে কয়লা বাবদ রেল কোম্পানী সমূহের ভাড়ার আয়ও কমিয়াছে।

সিংহল ভারতের এত কাছে অথচ সেখানে ভারতীয় কয়লা রপ্তানী কমিতেছে। ভারতবর্ষ যেখানে ৪,০৮ হাজার টন্ পাঠাইত সেখানে ১,২৪ হাজার টন্ ১৯২৩ সালে পাঠাইয়াছিল। ইংলণ্ড সিংহলে ২,২০৪ টন্ পাঠাইত, পাঁচ বৎসরে সেখানে ১,৬৬,৯৬৮ টন্ পাঠাইয়াছে। ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টেও সেই দশা। ভারতের ৮৭ হাজার টনের জায়গা ২২ হাজার টন্ দাঁড়াইয়াছে। আর ইংলণ্ড ৬৯৪ টনের স্থানে ৩৩,৮৮৮ টন্ পাঠাইয়াছে। সরকারকে এ বিষয়ে কয়লা খনিওয়ালাদের সভা আবেদন করিতেছে কিন্তু বিদেশী কয়লা বন্ধ হইবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অনেক কয়লার খনির কাজ অতি মন্দ; কতকগুলি বন্ধও হইয়াছে।

পেট্রোলিয়াম

পেট্রোলিয়াম এক প্রকার তৈল; ইহার যথার্থ অর্থ পাথুরী-তৈল অর্থাৎ যে কোন প্রকারের তৈল মাটির মধ্য হইতে নির্গত হয় বা নিষ্কাশিত হয় তাহাকেই এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হয়। পেট্রোলিয়াম দেখিতে একটু হল্‌দে; কোনো কোনো শ্রেণীর তৈল কালো-বাদামী; ইহার উৎপত্তি কি তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে অনেকে অনুমান করেন যে অত্যধিক চাপে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থ পাতালের স্তরে স্তরে তৈল হইয়া গিয়াছে। মাটির মধ্য হইতে যে অপরিষ্কার তৈল পাওয়া যায় তাহাকে চোলাই করিয়া নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শোধন ও মন্থন করিয়া বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত

হয়। এই সকল পদার্থ নানা নামে নানা দেশে পরিচিত। আলো জালিবার জন্য যে এক প্রকার লঘু তৈল ব্যবহৃত হয় আমরা তাহাকে কেরোসিন বলি। অপেক্ষাকৃত ভারি তৈল কলে তেল দিবার জন্য, ঠাণ্ডার দেশে গৃহাদি উত্তপ্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় এই জাতীয় তৈলকে কেরোসিন বলে না, সেখানে বলে পারাফিন তৈল। পেট্রোলিয়ামের মধ্যে পারাফিন ও ন্যাপ্থা নামক সহজ-দাহ্য দুই প্রকার পদার্থ থাকে। বর্মার যে বাতিকে আমরা মোমবাতি বলি, বস্তুত তাহার সহিত মৌমাছির মোমের সম্পর্ক নাই সেগুলি পারাফিনের তৈয়ারী। আমেরিকান্ তৈলে পারাফিনের অংশ বেশী, রুশের তৈল ন্যাপ্থার ভাগ বেশী। পেট্রোলিয়াম বিশুদ্ধ করিলে কেরোসিন হয়।

১৯১৩ সালে পৃথিবীতে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন্, ১৯১৮ সালে ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টন্ ও ১৯২৩ সালে ১৪ কোটি ১৯ লক্ষ টন্ পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়; পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পেট্রোলিয়াম সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়। তৎপরে মেক্সিকো, রুশিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ।

১৯২৩ সালে ভারতবর্ষে ২৮৯কোটি ৪২ লক্ষ গ্যালন তৈল উঠিয়াছিল অর্থাৎ পৃথিবীর উৎপন্ন তৈলের শতকরা এক (·৮৯) ভাগেরও কম।

ভারত সাম্রাজ্যে পেট্রোলিয়াম

নিজ ভারতবর্ষে পেট্রোলিয়াম খুব কমই পাওয়া যায়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতের সীমানার বাহিরে হিমালয়ের দুই প্রান্তে পেট্রোলিয়ামের খনি আছে; পশ্চিমে পঞ্জাব, বেলুচিস্থান ও পারস্যে ও পূর্বে আসাম, ব্রহ্মদেশ ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে। ব্রহ্মদেশে তৈল মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চিত থাকিবার পক্ষে অনুকূল। এখানে দুই শত ফিটের মধ্যেই তৈল পাওয়া যায়; উপরে কর্দমের স্তর থাকায় তৈল অপব্যয় হয় না। বেলুচিস্থানে মৃত্তিকা বালুময় বলিয়া সমস্ত তৈলই নষ্ট হইয়াছে। পঞ্জাবে রবাম্নপিণ্ডি

জিলায় ১ হইতে ২ হাজার গ্যালন কেরোসিন বৎসরে পাওয়া যায়। এই কারবার মেসার্স ষ্টিল ব্রাদার্স কর্তৃক চালিত হইতেছে। বেলুচিস্থানে খাতাল নামক স্থানে ১৮৮৪-৫ সালে টাউণ্ডসেন নামক এক ব্যক্তি প্রথম তৈল-কূপ খনন করেন। কিছু তৈল উঠিয়াছিল; কিন্তু মৃত্তিকা বালুকাময় বলিয়া সমস্ত তৈলই নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

পঞ্জাবে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়; কাশ্মীর ও কাবুলের মধ্যবর্তী স্থানে কতকগুলি তৈল খনি আছে। এই স্থানের দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল ও প্রস্থ প্রায় ৯০ মাইল। ১৮৮৭ সালে এ দেশে প্রথম কূপ খনন আরম্ভ হয়। ১৯২২ সাল হইতে পঞ্জাবের তৈল-খনি হইতে প্রচুর তৈল উঠিতেছে। এক্ষণে প্রায় সওয়া লক্ষ টন্ করিয়া তৈল উঠিতেছে। আসামের তৈল-ক্ষেত্রের কথা ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১৮৯৯ সালের পূর্বে সেখান হইতে তৈল সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ঐ বৎসরে আসাম-অয়েল কোম্পানী গঠিত হয়। ১৯১৬ সালে বর্মা-ওয়েল কোম্পানী চট্টগ্রামের নিকটেও বদরপুর নামক স্থানে একটি পেট্রোলিয়াম খনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

আসাম ও চট্টোগ্রামের পেট্রোলিয়ামের খনি

বর্মাতেই ভারত সাম্রাজ্যের পেট্রোলিয়ামের প্রধান কেন্দ্র। সেখানে ইনান্‌গিয়াং সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও বিখ্যাত খনি। বর্মনরা শতাধিক বৎসর এইখান হইতে তৈল সংগ্রহ করিতেছিল। বৃটীশ অধিকারের পূর্বে বৎসরে ২০ লক্ষ গ্যালনের অধিক তৈল এখান হইতে উৎপন্ন হইত না। ১৮৮৭ সাল হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া পেট্রোলিয়াম বাহির করা আরম্ভ হয়। ১৮৯১ সালে বর্মা-ওয়েল কোম্পানী গঠিত হয় এবং তাহারা এই ব্যবসায়ে কিরূপ ধনী হইয়াছে তাহা তাহাদের একটি ব্যয়ের উদাহরণ দিলেই চলিবে। প্রথম প্রথম খনি হইতে পেট্রোলিয়াম তুলিয়া জালা ভরিয়া কুলীর মাথায় বা গরুর

গাড়ীতে করিয়া নদীর ধারে আনীত হইত। পরে বাঁশের নালাতে তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইত ও নদীতে দেশী নৌকার উপরে জালাতে ধরা হইত। কিছুদিন পরে আরও নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা-তলা বজরাতে বড় বড় মাটির পাত্রে তৈল ধরার ব্যবস্থা হইল। পরে বড় বড় ইস্পাতের চৌবাচ্ছাশুদ্ধ ষ্টীমার গঠিত হইল। ১৯০৮ সালে বর্মা-অয়েল কোম্পানী ১ কোটি ১২½ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া খনি হইতে রেঙ্গুনের নিকটস্থ কারখানা পর্য্যন্ত ২৭৫ মাইল দীর্ঘ দশ-ইঞ্চি-মোটা এক নল তৈয়ারী করিয়াছেন। রেঙ্গুনের তৈল সাফ্ করার জায়গায় এই নলে করিয়া প্রতিদিন ৫ লক্ষ ২০ হাজার গ্যালন তৈল আসে। এক ইনান্গিয়াং তৈল-খনি হইতেই পাঁচ বৎসরের গড়ে ১৮ কোটি গ্যালনের উপর করিয়া তৈল উঠিয়াছিল। সমগ্র বর্মাদেশের খনিতে ২৮ কোটি গ্যালন উঠে। বর্মা দেশের কেরোসিনের ব্যবসায় প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা আমরা উপরের উদাহরণটি হইতে বুঝিতে পারিলাম। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত ১৪ কোটি গ্যালন্ হইতে ২৯ কোটি গ্যালন কেরোসিন উৎপন্ন হয়; মূল্য লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ১৯ সাল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরেই উক্ত তৈলের পরিমাণ কমিতেছে। আরাকানের নিকটে কতকগুলি দ্বীপে কেরোসিন আছে বলিয়া বোধ আকাইবের সন্নিকটস্থ কয়েকটি দ্বীপেও কেরোসিন পাওয়া যাছে। বর্মার ১৪টি, পঞ্জাবে ও আসামে ১টি করিয়া মোট ১৬টি পেট্রোলিয়াম সাফ করিবার কারখানা আছে। ইহার সবই বিদেশী বণিকের মূলধনে চলিতেছে।

ভারতের উৎপন্ন তৈল।*

	গ্যালন [হাজার]	টাকা [হাজার]
১৯১৯	৩০,৫৭,৪৯	৮,৪০,৪৫,
১৯২০	২৯,৩১,১৬	৮,০১,৭৮,
১৯২১	৩০,৫৬,৮৩	৮,৪৬,৭৪,
১৯২২	২৯,৮৫,০৪	১০,৮০,৩৭,
১৯২৩	২৯,৪২,১৫	১০,৫১,১৮,

ভারতবর্ষে কেরোসিনের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে। এখন গ্রামে গ্রামে মাটির-তেল ও 'কূপী' বা 'লম্প' ডিক্ ব্যবহৃত হইতেছে।

যুদ্ধের পর হইতে বিদেশী কেরোসিন প্রভৃতি আমদানী ভারতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৩-২৪ সালে ৮,৩৯,৫৫ হাজার টাকার খনিজ তৈল আমদানী হইয়াছিল।

আমাদের দেশে কেরোসিন আসিবার পূর্বে সর্বত্রই জ্বালানীর জন্য নানাপ্রকার চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রদীপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কেরোসিন সেই স্থান পূরণ করিতেছে। পেট্রোলিয়াম বর্তমানে আমাদের জীবনের কত কোঠায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা তলাইয়া দেখিলে বুঝিব যে আমরা এখন একেবারে পৃথিবীর সকল প্রকার ঘূর্ণীর মধ্যে গিয়া বসিয়াছি, ঘরের কোণ বা দেশের গণ্ডি অনেক কাল আমাদিগকে ছাড়িতে হইয়াছে। মোটরকারের ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় পেট্রোলের আমদানী খুব বাড়িয়াছে।

* Records Geol. Survey. Vol: L VII. 1925 p. 255.

গ্যাসোলিন নামে এক প্রকার অত্যন্ত সহজ-দাহ্য পদার্থ পেট্রোলিয়ামের ভিতর হইতে পাওয়া যায়; ইহার আর এক নাম পেট্রোল। পেট্রোল গ্যাসে আজকাল যাবতীয় মোটর-গাড়ী, আকাশ-যান, এমন কি অনেক জাহাজ ও এঞ্জিন পর্য্যন্ত চলিতেছে। বেঞ্জিন নামে একপ্রকার পদার্থ ইহা হইতে পাওয়া যায়; রবার গাটাপার্চা করিবার সময়ে ইহার প্রয়োজন লাগে। ভ্যাসেলিন্ পেট্রোলিয়াম ইহা হইতেই পাওয়া যায়; ডাক্তারী চিকিৎসায়, কেশবিন্যাসে ইহার প্রয়োজন খুবই। এ ছাড়া একপ্রকার ধূমহীন বারুদ প্রস্তুত করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। স্ত্রীগোলিন নামে একপ্রকার তৈল এই পেট্রোলিয়াম হইতেই পাওয়া যায়। ইহা খুব সহজেই উপিয়া যায় ও কোনো স্থানকে অসাড় করিবার জন্য ইহা কাজে লাগে। নাপ্থা পেট্রোলিয়াম হইতে পাওয়া যায়। আমরা আলো জ্বালিবার জন্য কেরোসিন নামে যে একপ্রকার তরল পদার্থ ব্যবহার করি তাহা পেট্রোলিয়ামেরই রূপান্তর। রাস্তা তৈয়ারী করিতে পীচ নামে এক প্রকার সামগ্রী ব্যবহার করা হয়; ইহাও পেট্রোলিয়াম খনিরই জিনিষ। পারাফিন হইতে মোমবাতি প্রস্তুত হয়। দিয়াশলাইএর কাটিকে সহজদাহ্য করিবার জন্য ইহা পারাফিনে ডুবাইয়া রাখা হয়। নানা শিল্পের বিচিত্র ব্যবহারে পারাফিন লাগে। গড়ে বৎসরে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার হন্দর পারফিন বিদেশে রপ্তানী হয়। মৃত্তিকার এই ঐশ্বর্য্য হইতে ভারতবাসীরা বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু বিদ্যার অভাবে, বুদ্ধির অভাবে, চেষ্টার অভাবে এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সে হইতে পারে নাই। প্রায় দুইশত প্রকারের উপসামগ্রী প্রস্তুত হয়। ১৯২১ সালে পেট্রোলিয়ম খনি ২৭টি ছিল। সাড়ে তিন হাজার লোক দৈনিক কাজ করিত; ইহার মধ্যে ৫১১ জন মাত্র কারিগর; দেশীয় ১৭৪ জন ও সাহেব ৫৬ জন ছিল। এ ছাড়া

পেট্রোলিয়ামের উপ-সামগ্রী (By-Products)

পেট্রোলিয়ম রিফাইনারী (সাফ করিবার কারখানা) ২৭টি ছিল। ১৯২১ সালে ৩৩ হাজার লোক কাজ করিত; ৬২৫ জন সাহেব—ভারতবাসী মাত্র ১৮৯৮ জন কর্মচারী।

আম্বের ও গ্রাফাইট।

কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ভিন্ন অঙ্গারজাতীয় আরও দুইটি পদার্থ ভারতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশে Amber অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেলেও তাহার দাম বেশ যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রাফাইট ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়। যেমন ছত্রিশগড়, কুর্গ, গোদাবরীর পাশে, উত্তর বর্মা ও ত্রিবঙ্কুরে। সিকিমে বার্ণ (Burn) কোম্পানী বৃহৎ গ্রাফাইট খনির খোঁজ পাইয়াছে। রাজপুতানা ও উড়িষ্যাতেও গ্রাফাইট পাওয়া যায়। আমরা যাকে লেড্‌পেন্সিল বলি বস্তুতঃ তাহার সহিত শীশার সম্পর্ক বড়ই কম। পেন্সিল গ্রাফাইট হইতে হয়। ১৯২০ সালে ভারতে ১০০ টন্ গ্রাফাইট পাওয়া গিয়াছিল। পরে উহার কাজ উঠিয়া গিয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত।

ভারতবর্ষে বহু প্রকার ধাতু-চুর (ores) প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই এই সব ধাতু-চুর হইতে ধাতু নিষ্কাশিত হয় না। ধাতু-চুর বিদেশে চালান হইয়া যায়। চালান হইয়া যাইবার প্রধান কারণ এদেশে ধাতু-রসায়ন সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা খুব অধিক। খাদসমেত ধাতু-চুর পাঠাইতে আমাদের অনেক জাহাজ ভাড়া পড়িয়া যায়; তা ছাড়া বিদেশে তদ্দেশীয় বাজার দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে হয়। তাহা ব্যতীত কাঁচা মালের দর শিল্পকারদের মর্জির উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের খনিজ-শিল্পের উন্নতির অন্তরায়

ধাতুচুর ও বৈদেশিক শিল্প।

রসায়ন বিদ্যার সহিত খনিজ বিজ্ঞানের যোগের অভাব। উপ-সামগ্রী প্রস্তুত প্রণালী (By-product) আমাদের দেশে নূতন। আমরা এক্ষণে ভারতের প্রধান প্রধান খনিজ-ধাতুগুলির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

লৌহের ব্যবহার ভারতবর্ষে কতকাল হইতে চলিতেছে তাহার সঠিক ইতিহাস পণ্ডিতগণ দিতে অসমর্থ। প্রাচীনকালের লৌহ-সামগ্রী দেখিয়া মনে হয় এ শিল্প দেশময় এককালে বিস্তৃত ছিল। য়ুরোপীয় বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় অন্যান্য শিল্পের সহিত লৌহ-শিল্পও লোপ পাইল। কলের কাছে বাহুর কাজ টিকিল না। য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে লৌহ প্রস্তুত কেবলমাত্র বঙ্গ-বিহারে হইতেছে। বরাকরের নিকট একটি বিলাতী কোম্পানী লৌহ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে। এইখানে কয়লা ও লৌহ-চুর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; ম্যাগনেটাইট ও হেমাটাইট নামে দুই শ্রেণীর পাথরে লৌহচুর প্রচুর পরিমাণে থাকে; এই পাথর মানভূম ও সিংহভূম জেলায় পাওয়া যায় বলিয়া বরাকর কোম্পানী এখন লৌহচুর সেইখান হইতে আমদানী করিতেছেন।

বরাকরের লৌহের কারখানা।

কয়লা যেমন খনি হইতে খুঁড়িয়াই সহজে ব্যবহার করা যায়, লৌহ ও অন্যান্য ধাতু সেরূপভাবে ব্যবহার করা যায় না। লৌহ-পাথর ও মাটির সহিত সংমিশ্রিত অবস্থায় থাকে; আবার সকল স্থানের লৌহচুর এক প্রকারের নয়—কোথাও বা লৌহের সহিত অন্য এক প্রকারে ধাতু কখনো বা একাধিক জাতীয় ধাতু মিশ্রিত থাকে। এই লৌহচুর গলাইয়া ফেলিলে যে লৌহ পাওয়া যায় তাহাকে ঢালাই লোহা (pig-iron) বলে; ইহা কখনো বিশুদ্ধ হয় না। ইহার মধ্যে অঙ্গার, গন্ধক ও ফসফরাস থাকিয়া যায়। এই সব সামগ্রী থাকিয়া যায় বলিয়া কোনো মজবুত কাজ এই শ্রেণীর লোহার দ্বারা হয় না। এইজন্য এই ঢালাই-লোহা

ঢালাই ও পেটা লৌহ।

হইতে অঙ্গারের ভাগটি যথাসাধ্য বাহির করিয়া ফেলা হয়। এই লোহাকে পুনরায় আগুনে গলিতে দিয়া নাড়িতে থাকিলে অঙ্গারভাগ উপিয়া যায়। তখন তাহাকে পিটাইয়া চাদর বার করিয়া ফেলা সহজ। কিন্তু এত করিয়াও ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয় না; কিয়দ্ পরিমাণে খাদ্ বা ছাই ইহার ভিতর ভিতর থাকিয়া যায়। পেটা-লোহা ঢালাইএর চেয়ে অনেক অংশে মজবুত হয় বটে কিন্তু যথেষ্ট শক্ত হয় না। অস্ত্র-শস্ত্র, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি সামগ্রী নির্মাণের জন্য যে লোহার প্রয়োজন তাহা একই কালে কঠিন ও নমনীয় হওয়া চাই। এবং এই সকল কার্য্যের জন্য লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করিতে হয়। সাধারণ ইস্পাত সম্পূর্ণরূপে খাদ হইতে মুক্ত নয় ও শতকরা ৩ হইতে ২ ভাগ পর্য্যন্ত অঙ্গার থাকিয়া যায়।

পাথুরে-কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবার পূর্বে লৌহের কার-খানায় কাঠের আগুন ব্যবহৃত হইত। য়ুরোপে বিংশ শতাব্দীতেও রুশিয়া ও সুইডেনের লোহার কাজে কাঠ পোড়ানো হয়। অনেকে অনুমান করেন সেই জন্যই সুইডিশ লোহা এত শক্ত। পাথুরে কয়লার মধ্যে গন্ধক থাকায় লোহা খারাপ হয়; সেইজন্য আজকাল লোহার কারখানায় পোড়া কয়লা ব্যবহৃত হয়। * আমেরিকার কোথাও কোথাও পেট্রোলিয়াম এবং ভূগর্ভস্থিত গ্যাসের সাহায্যে লোহা গলানো হয়। আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম সস্তা নয় ও গ্যাস পাওয়া যায় না। লৌহচুর গলাইবার জন্য কেবলমাত্র কয়লারই প্রয়োজন হয় না; কিছু চুণ বা চুণে পাথর আগুনের মধ্যে লৌহচুরের সহিত ফেলিয়া দিতে হয়। তবে লাল হেমটাইট্ নামে যে লৌহচুর পাওয়া যায় তাহার মধ্যে

* লোহার কোম্পানীরা কাঁচা কয়লা কিনিয়া তাহা পোড়াইয়া লয়। কাঁচা পাথুরে কয়লার ধোঁয়া চোলাই করিয়া আলকাৎরা হয়। আজকাল অনেকেই এই ধোঁয়ার সদ্ব্যবহার করিতেছে।

শতকরা ৫৫ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত খাঁটি লৌহ থাকায় চুণের প্রয়োজন হয় না।

আগুনের চুল্লীর মধ্যে পোড়াকয়লা ও লৌহচুর দিয়া হাওয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আমাদের বাড়ীর উনানেও হাওয়া না দিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিলে আগুন নিবাইয়া যায়। এক্ষণে এই সব চুল্লীতে হাওয়া প্রবেশ করাইবার পূর্বে ইহাকে গরম করিয়া দিতে পারিলে তাপ বৃদ্ধি পায়, লোহাও সহজে গলে। কোনো কোনো উৎকৃষ্ট চুল্লীতে হাওয়ার তাপ ৮০০ ডিগ্রি হইতে ১২০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর চুল্লীতে গরম-হাওয়ার চুল্লী বা Hot Blast Furnace বলে। পূর্বে যেখানে এক টন্ (২৭৷৷০ মণ) লোহা তৈয়ারী করিতে ছয় টন্ কয়লা লাগিত এই চুল্লীর সাহায্যে সেখানে মাত্র দুই টন লাগে গরম হাওয়ার চুল্লীর মধ্যে যে গ্যাস্ উৎপন্ন হয় তাহাও নষ্ট হয় না—অন্যান্য এঞ্জিন চালাইতে কাজে লাগে। বর্ত্তমানে ইলেক্‌ট্রিসিটি কোথাও কোথাও লোহা গলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

Hot-Blast Furnace

বর্ত্তমানে বেসেমার-প্রণালী অনুসারে লৌহ পরিষ্কার করিবার প্রথা সর্বত্র প্রচলিত হইতেছে। হেন্‌রী বেসমার এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে Bessemer Steel বলে; কিন্তু মিঃ মুসেট্ ইহার যথার্থ উন্নতি করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে গলিত ঢালাই (Pig) লোহাকে একটি পাত্রে প্রথমে লইয়া যাওয়া হয়; এই পাত্রের গায়ে এক প্রকার বেলে পাথর গুঁড়ার প্রলেপ দেওয়া হয়। গরমে উহা পাত্রের গায়ে লাগিয়া যায়; ইহা সহজে ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না। এই পাত্রে নীচে কতক ছিদ্র আছে, এবং তলদেশ দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া এমনি প্রচণ্ডবেগে পাত্রে

Bessemer Steel

অবসর পায় না। এই বায়ু লৌহের মধ্যস্থিত অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দেয়। এতদূর হইলে পাত্রটিকে কাৎ করিয়া প্রয়োজন মত অঙ্গার মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর ইস্পাত ক্ষণভঙ্গুর হয় বলিয়া মিঃ মুসেট্ ম্যাঙ্গানিস্ নামে ধাতু ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া এই ইস্পাতের উক্ত দোষ দূর করিয়া দেন।

আর একটি প্রণালীকে বলে খোলা চুল্লী-প্রথা। বেসেমার প্রণালীর সহিত ইহার মোটামুটি সবই মেলে কেবল বেসেমার প্রবর্তিত বায়ু চালনার প্রথা সিমেন্স-মার্টিন প্রথাতে নাই ইহাতে খোলা উনানের চারিদিক হইতে বায়ু আসিয়া অঙ্গার দূর করিয়া দেয়।

কিছুকাল হইতে নানাপ্রকার ধাতুর সহিত লৌহ মিশ্রিত করিয়া নূতন নূতন গুণ-সম্পন্ন ইস্পাত তৈয়ারী হইতেছে। নিকেল-ইস্পাতে প্রায় তিন ভাগ নিকেল থাকে। ইহা সাধারণ ইস্পাত হইতে অনেক শক্ত। ইস্পাতের সহিত ম্যাঙ্গানিস্ নামে এক প্রকার ধাতু শক্ত করা ১২ হইতে ১৪ ভাগ মিশ্রিত করিলে ম্যাঙ্গানিস্ ইস্পাত হয়। এই ইস্পাত এমন কঠিন যে সাধারণ যন্ত্রে ইহাকে কাটা যায় না, সাধারণ অস্ত্র ইহাকে ভেদ করিতে পারে না। ক্রোম-ইস্পাতে ক্রোমিয়াম নামে এক প্রকার ধাতু শত করা দুই ভাগ মিশানো হয়। এই ইস্পাতও খুব শক্ত; লৌহাদি ভেদ করিবার জন্য যেসব অস্ত্র হয়, এই ক্রোমিয়াম ইস্পাতেই তাহা গঠিত। আরএক প্রকার ইস্পাতকে টাঙ্গস্টেন্ ইস্পাত বলে। ৭৫০ ডিগ্রি তাপেও ইহা নরম হয় না; সেইজন্য লেদ্ প্রভৃতি যন্ত্র যাহাতে অবিরত ঘর্ষণে তাপ সৃজিত হয়—সেগুলি টাঙ্গাস্টেন্ ইস্পাত দিয়া নির্মিত হয়।

নানাশ্রেণীর ইস্পাত

ভারতবর্ষে বর্তমানে এই সকল উপায়ে লৌহ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া আমরা একটু বিশদ্‌ভাবে জিনিষগুলি বুঝাইতে চেষ্টা

করিয়াছি। তাতা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এখন কেবল ভারতে নয়, ধীরে ধীরে পৃথিবীর মধ্যেও নাম করিতেছে। বোম্বাই এর পার্শী তাতা পরিবার বহু দিন হইতে বিখ্যাত। এই কোম্পানীর কাজ আরম্ভের পূর্বে তাঁহারা য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞদের আনাইয়া ভারতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা খুলিবার সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধাগুলি তন্নতন্ন করিয়া বিচার করিয়াছিলেন। প্রায় ৫½ লক্ষ টাকা তাঁহারা এই তথ্য অনুসন্ধানেই ব্যয় করিয়াছিলেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উপর তাতানগর ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে সিংহভূম জেলায় সাকৃচি নামে একটি স্থান আছে। বর্তমানে এই স্থানটির নাম জাম্‌শেদজী তাতার নামানুসারে জাম্‌শেদপুর হইয়াছে। ভারতে যে লৌহচুর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা সর্ব প্রথমে ভূতত্ত্ববিভাগের শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ (P. N. Bose) আবিষ্কার করেন ; তাঁহারই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া জাম্‌শেদজী তাতা এই কার্য্যে প্রথম মন দেন। তাতা কোম্পানী মৌরভঞ্জ রাজ্যে ও রাজপুর জেলায় দুইটি স্থানের লৌহচুরপূর্ণ পাহাড়ের পত্তনি লইয়াছেন। ইহার মধ্যে গুরুমৈশানির পাহাড়ে এখনো প্রায় ৭০ লক্ষ টন্ লৌহ প্রস্তর আছে ; সুলাইপত পাহাড়ে ৩২. লক্ষ টন্, বাদামপাহাড়ীতে প্রায় আরও ৭০ লক্ষ টন্ পাথর আছে। (Geol. 1925 p. 145—147). রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে এখানকার পাথরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ লোহা আছে। প্রতি বৎসর তিন লক্ষ টনের উপর করিয়া পাথর কোম্পানী লইয়া থাকেন। প্রথম ত্রিশ বৎসর টন্ প্রতি দশ পয়সা করিয়া দিতে হইবে ও ত্রিশ বৎসর পরে পাঁচ আনা করিয়া টন্-করা খাজনা দিতে হইবে। জাম্‌শেদপুর হইতে এই খনি ৪০মাইল দূরে এবং লৌহচুরের দাম আনিবার খরচ সমস্ত বাবদ্ টন্-করা ২।০করিয়া পড়ে। লৌহচুর ব্যতীত আরও কত জিনিষের প্রয়োজন তাহা

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই সব জিনিষের যোগাড় করা সহজ ব্যাপার নহে। গাংপুর রাজ্যে পানপোখা নামে এক স্থান হইতে চুণ আসে। মৈশূরে ম্যাগনেসাইট পাথর পাওয়া যায়; উহা হইতে ম্যাঙ্গানিস নিষ্কাশিত করা হয়। পাঁচটি কয়লার খনি হইতে কয়লা সরবরাহ হয়; প্রতি মাসে ৫৫,০০০ টন্ কয়লা বর্তমানে কাজে লাগে।

লৌহ গলাইবার জন্য ব্লাষ্ট চুল্লী আছে; ইহার তিনটিতে প্রায় ৩৫০ টন্ দুইটিতে ৫০০ টন্ করিয়া লৌহ প্রতিদিন প্রস্তুত হয়। এই সকল চুল্লীর জন্য যে পোড়া কয়লা লাগে তাহাও প্রস্তুত করিতে হয়। এই জন্য ১৮০টি কামরায় পাথুরে কয়লা পোড়ান হয়; প্রত্যেকটি কামরায় ৭½ টন্ করিয়া কয়লা ধরে। এই উনানগুলি রাতদিন বারমাস জ্বলিতেছে; ইহার ধোঁয়া নষ্ট হয় না—আলকাৎরা প্রভৃতি উপসামগ্রী (By-product) তৈয়ারী হয়। কোক প্রস্তুত করিবার জন্য আরও ১৫০টি ১৩-টনী উনান আছে। ইস্পাত তৈয়ারীর জন্য চারিটি ৫০-টনী ও দুইটি ৭৫-টনী খোলা-চুল্লী আছে ও এই ছয়টি ছাড়া আরও একটি খোলাচুল্লী, দুইটি ২৫ টনী বেসেমার চুল্লী, তিনটি বৈদ্যুতিক চুল্লী, দুইটি ২০০ টনী আর একপ্রকার চুল্লী এবং ব্ল্যাষ্টচুল্লী হইতে গলিত লোহা আনিয়া রাখিবার জন্য ১৩০০ টনের উপযোগী করিয়া স্থান নির্মিত হইয়াছে।

যুদ্ধের পর তাতা কোম্পানী তাঁহাদের কাজ খুব বিস্তৃত করিয়াছিলেন; অনেক নূতন নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে; ব্লুমিং (Blooming) মিল, (Sheet ও Bar) লৌহ চাদর ও 'বার' (কড়ি, রেললাইন, টী, আঙ্গেল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার মিল,) মার্চেন্ট; প্লেট মিল; রেল স্লিপার মিল; করগেট সিট মিল প্রভৃতিতে কাজ চলিতেছে।

তাতাদের বিশেষ চেষ্টা যে যথাসাধ্য বিলাতী মাল বর্জন করিয়া

দেশীয় উপকরণ দিয়া কাজ চালান। সেইজন্য ভারতের নানাস্থানে কোথায় কিরূপ জিনিষ পাওয়া যায় তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষজ্ঞগণ নিযুক্ত আছেন। চুল্লীর জন্য বিশেষ এক প্রকার ইটের প্রয়োজন; বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ করিয়া এই ইট আমদানী করা হইত। তাঁহারা আশা করিতেছেন এই ইট এই দেশেই প্রস্তুত করা যাইবে। তাতা কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারী প্রায় সবই সাহেব; কিন্তু ক্রমেই দেশীয় লোকে তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্মান পাইতেছে। কয়েকটি বাঙালী যুবক কতকগুলি বিভাগের ভার পাইয়াছেন। সম্প্রতি একটি টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয় এইখানে খোলা হইয়াছে। মনোনীত ছাত্রদের ৬০৲ টাকা করিয়া মাসহারা দেওয়া হয় ও তিন বৎসর পরে তাহারা ২০০৲ টাকা মাহিনার কাজ পায়।

দেশীয় উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা

ভারতের সর্বপ্রথম লৌহ কারখানা বরাকরের (বাংলাদেশ) বেঙ্গল লৌহ কোম্পানী (Bengal Iron company)। বর্তমানে মার্টিন কোম্পানীর হাতে যাইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। ১৯২৩ সালে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টন্ লোহা তৈয়ারী হইয়াছিল।

১৯১৮ সালে Indian Iron and Steel Company নামে একটি কোম্পানী গঠিত হয়। বার্ণ কোম্পানী ইহার পরিচালক। আসনসোলে ইহাদের কাজ আরম্ভ হইতেছে। ইহাদের লৌহখনি, কয়লা, চুনা-পাথর প্রভৃতি নিজেদেরই আছে। অধুনাতম যন্ত্রপাতি ইহারা আনাইয়া কাজ করিতেছেন। ইহাদের অধীন আন্দাজ ২৮ কোটি ৩২ লক্ষ টন্ লৌহচুর আছে। ময়ুরভঞ্জ ও নিকটস্থ আরও কয়েকটি করদ-রাজ্যে লৌহচুরের পাহাড় ইহারা ইজারা লইয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে প্রচুর লৌহচুর আছে বলিয়া ক্রমেই জানা যাইতেছে।

১৯২১ সালে সমগ্র ভারতে ছোটখাটো সর্বসমেত ১৬৫টি লৌহ ইস্পাতের ফাক্টরী ছিল। প্রায় ৪০ হাজার শ্রমজীবি কাজ করিত; ইহাদের মধ্যে ১৫ হাজার কারিগর; ২,৭৩৩ জন দেশীয় লোক; ২৬৫ জন সাহেব। ফাক্টরী বাদে লৌহের ফাউণ্ডারী ছিল ১০৩টি। ১৮৫১৭ জন শ্রমজীবি কাজ করিত।

স্বর্ণ

দেশের প্রধান ঐশ্বর্য্য সোণারূপা ও মণি মাণিক্য। রৌপ্য ব্যতীত আর প্রায় সব প্রকারই ধাতু আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আলাস্কা প্রভৃতি স্থানের স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ভারতের সোণা জগতে বিখ্যাত ছিল; এবং সেই কারণেই এ দেশের সোণার খ্যাতি অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। সোণা দুই রকমের পাওয়া যায়; এক জলের সঙ্গে ধুইয়া বালির সঙ্গে মিসিয়া আসে, আর এক প্রকার পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

স্বর্ণ

জলে ধুইয়া যে পরিমাণ সোণা পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই সামান্য। কাশ্মীরে লদক অঞ্চলে ১৯১০ সালে উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ ২৩৬ আউন্স হয়; ইহার পরে এখানকার উৎপন্ন স্বর্ণের কোনো পরিমাণ সরকারী বিভাগের গোচরীভূত হয় নাই। হিমালয়ের ভিতর হইতে স্বর্ণ প্রস্তরের পার্শ্ব দিয়া সিন্ধুনদ ধুইয়া আসিয়াছে, সেই জন্য সিন্ধুতে ও ইরাবতী ভিন্ন ইহার প্রায় অন্য সকল শাখানদীতেই সোণার চুর পাওয়া যায়। ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে পঞ্জাব প্রদেশে নদীসৈকতে ৬৭৬ আউন্স স্বর্ণ পাওয়া যায়।

নদীজলে স্বর্ণচুর

ছোটনাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশের পূর্বদিকে অনেকগুলি স্থানে সোণা পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে সিংহভূম জিলায় বৎসরে প্রায় ২½ হাজার আউন্স সোণা উৎপন্ন হয়। উত্তর আসামের ডিহং নদীর সোণা বহুকাল

হইতে প্রসিদ্ধ। শোনা যায় ইংরাজ-অধিকারের পূর্বে আসামের স্বর্ণকার-দের নিকট হইতে ২ লক্ষ টাকা খাজনা আদায় হইত। এই সোণা উত্তর ব্রহ্মপুত্রের উভয় পার্শ্বস্থ স্বর্ণ-প্রস্তর ভেদ করিয়া আসিতেছে। তিব্বতেও সোণার খনি আছে; সেখান হইতে স্বর্ণচুর আসে। ব্রহ্ম-দেশের ইরাবতী নদীতে বহুকাল হইতে সোণা পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্মনরা নদীতে সোণা সংগ্রহ করিত। ইহাদের সোণা-সংগ্রহের উপায় বড় অদ্ভূত ছিল; জলের মধ্যে চামড়া খোঁটা দিয়া টানিয়া পাতা থাকে; লোমের দিকটা উপরে থাকে বলিয়া স্বর্ণচুর তাহাতে লাগিয়া যায়। পরে ইহা উঠাইয়া রোদে শুকাইয়া ঝাড়িলেই সোণার গুঁড়া পড়িয়া যায়।

পৃথিবীতে ১৯২২ সালে প্রায় ৭ কোটি ২০ লক্ষ পর্য্যন্ত মূল্যের স্বর্ণ উঠিয়াছিল; ইহার মধ্যে ট্রান্সভাল প্রধান, ভারতবর্ষ অষ্টম। ১৮ লক্ষ ৫৭ হাজার পাউণ্ডের (২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা) সোনা ভারতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রাচীনকালে ধারবার ও নিজামের হায়দ্রাবাদ প্রদেশে সোণার খনি ছিল; সে সকলের চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। ধারবারের কোনো একটি খনিতে প্রায় ৫০০ ফিট নীচেও কাজ হইত। ছোটনাগপুরের নানা জায়গায় পাথর গুঁড়া করিবার হামানদিস্তা ও জাঁতা দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের সব চেয়ে বড় খনি মৈশূরের কোলার খনি। সমগ্র ভারতের উৎপন্ন সুবর্ণের শতকরা ৯৪ ভাগই এই কোলার খনি হইতে উঠিয়া থাকে। কোলার খনি মৈশূরের রাজধানী বাঙ্গালোর হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত; এখানকার যন্ত্রপাতি বাষ্পের দ্বারা ও কাবেরী জলপ্রপাত-উৎপন্ন বৈদ্যুতের সাহায্যে চলে। কয়লা বঙ্গদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী হয়। কোলার স্বর্ণখনি-গুলি সম্পূর্ণরূপে বৃটীশ মূলধনে চলিতেছে। সর্ব-

সোণার খনি

কোলার স্বর্ণখনি

প্রথম ১৮৮০ সালে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এখানকার সোণার প্রতি পড়ে। ১৮৮২ হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত কোলার স্বর্ণখনিতে ৬০,৩৮১,০৫৬ পাউণ্ড সোণা নিষ্কাশিত হইয়াছে। ২০,৩০৮,৩৬৫ পাউণ্ড (ত্রিশকোটি টাকা) অংশীদারগণকে লাভ দেওয়া হইয়াছে। ৩,১৮০,৩৭৯ পাউণ্ড মৈশূর সরকার খাজনা বাবদ পাইয়াছেন। (Geol. Survey. lvii, 1925 p. 117)

১৯২৩ সালে কোলার সোণার খনিগুলিতে ৪ লক্ষ ২০ হাজার আউন্স সোণা উৎপন্ন হয়। ইহার মূল্য ২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

কোলারের স্বর্ণখনির পরই হায়দ্রাবাদের হুটির খনি বিখ্যাত্। ১৯০২ সালে সেখানে কাজ আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সালে ওখানে ১৩,৪৬৬ আউন্স সোনা উঠে। এ ছাড়া বোম্বাইএর ধারবার জেলায় ও মান্দ্রাজের অনন্তপুর জেলায় সোণার খনিতে কাজ হয়। ১৯১১ সালে ধারবারে কাজ বন্ধ হইয়া যায়। বর্মাতেও সোণা পাওয়া যায়। পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশে কিছু কিছু সোণা আছে এবং কাজও চলে। ১৯২১ সালে ভারতে ৭ সোণার খনি আছে। ৩২,১৮৬ জন শ্রমজীবি কাজ করিত। ৭,২৭৭ জন কারিগর; ১৩৬ জন ভারতবাসী ও ২০১ সাহেব।

বিবিধ ধাতু

লৌহের সহিত ম্যাঙ্গানিসের সম্বন্ধ যে খুবই নিকট তাহা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। এক রুশিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোথায়ও এই ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর মোট ম্যাঙ্গানিসের শতকরা ৬৮ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু প্রায় সমস্তই বিদেশের শিল্প কারখানার জন্য রপ্তানী হইয়া যায়। ম্যাঙ্গানিস মধ্যপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, মধ্য-ভারত ও মৈশূরের নানা স্থানে পাওয়া যায়। এই ধাতু ব্যতীত ভাল ইস্পাত হয় না সে কথা পূর্ব্বেই

ম্যাঙ্গানিস

বলিয়াছি। এই জন্ম ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিস চুর বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। এ ছাড়া ইহা রাসয়নিক কারখানায় নানা কাজে লাগে। রঙ জ্বালাইয়া বা ফিকে করিবার জন্ম যে ব্লীচিং পাউডারের অভাবে আমাদের দেশে ভাল কাগজ দুষ্প্রাপ্য সেই ব্লীচিং সামগ্রী ম্যাঙ্গানিস হইতে করা যায়; কাঁচ, চীনামাটি রঙ করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। এই মূল্যবান্ খনিজ যে পরিমাণে চুর সমেত বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে ভারতের শিল্পের উন্নতির জন্য যখন এই খনিজের প্রয়োজন হইবে তখন উহা অর্দ্ধনিঃশেষিত হইয়া যাইবে। গাছ কাটিয়া পুনরায় বীজ পুঁতিলে ১০।২০ বৎসরে ফল পাইবার আশা করা যায়, শস্য পুঁতিয়া ভাল সার দিলে প্রতি বৎসর উন্নতি দেখা যায়; কিন্তু খনি হইতে ধাতু নিঃশেষিত হইয়া গেলে তাহা পুনর্প্রাপ্তির আশা করা বাতুলতা। ১৮৯২ সাল হইতে ১৯২৩ সাল এই ত্রিশ বৎসরে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন্ ম্যাঙ্গানিস চুর ভারতের খনি হইতে উঠিয়া ছিল এবং ১ কোটি ২৪ লক্ষ টন বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতে ত্রিশ বৎসরে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টন্ মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

লৌহের সহিত ক্রোমিয়াম্ নামে এক প্রকার ধাতু মিশ্রিত করিলে খুব মজবুত ইস্পাত হয় তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই ক্রোমিয়ামও

ক্রোমিয়াম্

ভারতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের অন্তর্গত সালেমে মৈশূরে, আন্দামান ও বেলুচিস্থানে এই ধাতু পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরে সিংহভূম জেলায় ক্রোমিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; ১৯১৩ সাল হইতে এখানে উক্ত ধাতু উত্তোলন কার্য্য চলিতেছে। এ সমগ্র ভারতে প্রায় ৩৫ হাজার করিয়া ক্রোমিয়াম্ উৎপন্ন হয়; ইহার মূল্য ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার। ইহার মধ্যে প্রায় ৩ হাজার টন্ই বিদেশে যায়।

পূর্বে আমরা টাঙ্গস্‌টন ইস্পাতের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতেই টাঙ্গস্‌টনের প্রধান খনি। ভারতবর্ষকে প্রকৃতি এই মূল্যবান্‌ ধাতুসম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। রাজপুতানা, নাগপুর ও সিংহভূমে এই ধাতু পাওয়া যায়। এ ছাড়া বর্মা-দেশে ট্যাঙর নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে এই ধাতু পাওয়া যায়। টাঙ্গস্‌টনের দাম খুব—এক টনের দাম তিন হাজার টাকা। গত যুদ্ধের পূর্বে ভারতের উৎপন্ন-টাঙ্গস্‌টনের অর্দ্ধেকই রপ্তানী হইত। ১৯১৭ সালে ৪৫৪২ টন্‌ ধাতু উঠিয়াছিল; ইহার মূল্য ৬,২৩,০৭৪ পাউণ্ড বা ৯৩ লক্ষ টাকার উপর। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ইহার উৎপন্ন ও আমদানী খুব জোরে চলিয়াছিল। ১৯২৩ সালে ১,৭২৫ টন উঠিয়াছিল।

টাঙ্গসটন বা ওলফ্রাম

টীন বলিলেই আমাদের মনে হয় কেরোসিনের টীন বা টীনের মগ বা বাক্স জাতীয় কোনো সামগ্রী। কিন্তু খনি হইতে আমরা যে জিনিষটা পাই সেটা মোটেই এরূপ নয়। টীনচুর পাথরের সঙ্গে ও পলিমাটিতে পাওয়া যায়। টীনচুর হইতে টীন নামে এক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। সেই ধাতু লোহার চাদরের উপর মাখাইলে ইহাতে মরিচা ধরিতে পারে না। আমরা যাহাকে টীন বলি তাহা যথার্থরূপে লোহার পাতলা চাদর। খনিজ টীন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায় মালয় উপদ্বীপে। ইহার পরেই ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর টীন উৎপন্ন হয়; সেখানকার টীন সবই প্রায় হল্যাণ্ডে যায় ও সেখান হইতে ইংলণ্ডে চালান হয়। তথায় বহুপ্রকারের জিনিষ তৈয়ারী হইয়া পুনরায় পূর্বদেশে ফিরিয়া আসে। ভারতের এত কাছে প্রচুর টীন, অথচ ভারতে সে-শিল্প জাগ্রত হয় নাই। ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বর্মা প্রদেশেও টীন পাওয়া যায়; তবে প্রচুর পরিমাণে নয়। ১৯২৩ সালে দুই হাজার টন্‌ টীনচুর বর্মা খনিতে

টীন

উঠিয়াছিল ; ইহার মূল্য প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। মার্গুইএর খনিতে কিছু টীন, টীনচুর হইতে প্রস্তুত হইত ; ১৯২০ সাল হইতে তাহাও বন্ধ।

১৯২১ সালে বর্মাতে ৪১টি টীন ও ওল্‌ফ্রামের খনি ছিল। ৫৩ জন সাহেব ছিলেন কর্তা। চারি হাজার শ্রমজীবি কাজ করিত।

টীনচুর অধিকাংশই বিদেশে চালান হইয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত পালগঞ্জ জমিদারীতে নাকি টীন পাওয়া যায়। তবে সেখানে তেমন অনুসন্ধান হয় নাই।

আমাদের দেশে তাম্র পবিত্র ধাতু বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাচীন কালের পূজার ও গৃহস্থালীয় বাসনপত্র অধিকাংশ স্থলে তামার হইত।

তাম্র।

তামা দক্ষিণ-ভারত, রাজপুতানা ও হিমালয়ের পাদমূলে কুলু, ঘরবাল, নেপাল, সিকিম এবং ভুটানে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানের তামার মূর্ত্তিসমূহ বিখ্যাত। এই সব জিনিষ এখানে নির্মিত হইত এবং তামাও দেশে পাওয়া যাইত। ছোটনাগপুরের কয়েকটি স্থানে তামার কাজ ছোট আকারে বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর হইল Cape Copper Company নামে একটি য়ুরোপীয় কোম্পানী মাটীগড়া নামক স্থানে (B. N. Ry গালুড়ি ষ্টেশনের নিকটে রাখা খনি) বিপুল উদ্যমে তাম্র নিষ্কাষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহারা আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে অতি অল্পকালের মধ্যেই এই কার্য্যে বেশ সুফল লাভ করিয়াছেন। ১৯১৭ সালে এই কোম্পানী ২০,১০৮ টন তাম্রচুর উত্তোলন করিয়াছিল ;

সিংহভূমে তাম্রখনি।

ইহার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত রাখা (Rakha) খনিতে ১৩০,১৯৭ তাম্রচুর উত্তোলন করা হয় এবং উহা হইতে পাঁচ বৎসরে ৩,৫৪৯ টন্ তাম্র নিষ্কাশিত হয়। তাম্রচুরের দাম ১ কোটি ৮০ লক্ষ

টাকা, আর তাম্রধাতুর মূল্য ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৫ সাল হইতে রাখা মাইনে কাজ জোরে আরম্ভ হইয়াছে। ভারত হইতে প্রায় ৪৬,হাজার হন্দর তাম্র ধাতু ১৯২৪ সালে বিদেশে চালান হইয়াছিল। সিংহভূম জিলায় ৭৭ মাইল একটা জায়গায় তামার চিহ্ন আছে। রাজদোহ নামে একটি স্থানে প্রায় আড়াই ফিট্ গভীর পর্য্যন্ত তাম্রচুর আছে। মেসোবলি নামক স্থানে Corboda Copper কোম্পানী ১৯২০ সাল হইতে কাজ সুরু করিয়াছে। আরও দুই একটি কোম্পানী কাজ করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গিরিধি হইতে বার মাইল দূরে বারগণ্ডা নামক একটি স্থানে তিনশ' ফিট্ মাটির নীচে প্রায় চৌদ্দ ফিট গভীর এক তাম্রচুরের স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; ইহার কাজ গিরিধিতে কিছু কাল মাত্র চলিয়াছিল। গিরিধির যে অংশে এই কারখানার কাজ হইত বর্ত্তমানে তাহাকেই বারগণ্ডা বলে।

আজকাল তামা বিদেশ হইতেই বেশীর ভাগ আমদানী হয়। বিদেশ হইতে আমদানী ধাতুর শতকরা ২০ ভাগ তামা। পৃথিবীর মধ্যে মার্কিন রাজ্যই তামাতে শ্রেষ্ঠ। ইহার পরেই স্পেন, পর্টুগাল, জাপান, চিলি, জারমেনী, অষ্ট্রেলিয়া। ইংলণ্ডে তামা কমিয়া গিয়াছে।

তামার ব্যবহার।

তামার পয়সা তামার বাসন ছাড়া তামা দিয়া বৈদ্যুতের তার প্রস্তুত হয়। পিতলের সহিত মিশাইয়া ভরণ করিবার জন্য তামার প্রয়োজন হয়। ব্রোঞ্জের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে তামা থাকে। বর্ত্তমানে ভারতে তামার যে প্রকার খরচ, বাহির হইতে এই ধাতু আমদানী না করিলে উপায় নাই ১৯২৪-২৫ সালে বিদেশ হইতে ২৭২,৪০৩ হন্দর তাম্র (চাদর, বার প্রভৃতি) ভারতে আসে। ইহার জন্য ভারতকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল। (Annual Statement 59th Issue. p. 303).

কারুকার্য্য করা তামার পিতলের জিনিষ কাশ্মীর, নেপাল, ব

সিকিম, পঞ্জাবের লাহোর অমৃতসর, যুক্তপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ (তামা) কাশী (কাঁশা, পিতল), জয়পুর, বিকানীর, ঢোলপুর, উজ্জয়িনী, ইন্দোর, বোম্বাই নাসিক, বড়োদা, কাথিবর, মহীশূর, মান্দ্রাজ, মদুরা, ভেলোর বিখ্যাত; বাংলার মধ্যে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়ার বাসন ও উড়িষ্যার শ্রীক্ষেত্রী বাসন খুব প্রসিদ্ধ। এছাড়া আরও নানারূপ ধাতুর শিল্প নানাস্থানে আছে। তবে সেগুলির স্থানীয় প্রসিদ্ধিই অধিক।

কারবারের স্থান

সীসা ও রূপা প্রায় একই জায়গায় পাওয়া যায়। সীসা-পাথরকে 'গ্যালেনা' বলে; ইহার মধ্যে সীসা ও গন্ধক প্রধানত থাকে; রূপা ইহার ভিতর হইতে বাহির করা হয়। ভারতের ভূতত্ত্বে যাহাকে পুরাণ-পাথর বলে তাহার মধ্যে ও অন্যান্য প্রাচীন স্তরে 'গ্যালেনা' পাওয়া যায়। সেই জন্য দেশে এক সময়ে রৌপ্য পাওয়া যাইত। দেশীয় কারিগরগণ ইহারই ভিতর হইতে সীসা ও রূপা নিষ্কাষণ করিত।

সীসা ও রূপা

বর্মার উত্তর পূর্বে শান্‌রাজ্যে সীসা রূপা ও দস্তা পরস্পরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এখানে এককালে চীনাদের প্রকাণ্ড কারবার ছিল। ইংরাজ বণিকেরা তাহাদের পরিত্যক্ত খাদ হইতেও অনেকখানি ধাতু বাহির করিয়া লইতেছে। ভারতের উৎপন্ন সমস্ত সীসাই ব্রহ্মদেশের শান্‌রাজ্যে পাওয়া যায়। ১৯১৯ সালে ১৯,০০০ টন্ সীসা হইতে ২০ লক্ষ আউন্স রূপা ও ১৯২৩ সালে ৪৬,০০০ টন্ সীসা হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ আউন্স রূপা নিষ্কাশিত হয়। ইহার মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার উপর।

সীসার ন্যায় ভারতের উৎপন্ন সমস্ত রৌপ্যই শান্‌ষ্টেটের বৌদউইন (Bawdwin) খনিতে প্রস্তুত হয়। ভারতে মুদ্রা ও অলঙ্কারাদির জন্য যেরূপ রৌপ্যের প্রয়োজন তাহা বিদেশ হইতে আমদানী না করিলে চলিতে

পারে না। রৌপ্য আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে হয়। সেইখান হইতে রৌপ্য কিনিয়া আমাদের সরকার বাহাদুরকে আনিতে হয়। সেখানকার বাজার-দর কমাবাড়ার সঙ্গে আমাদের বাজার-দরের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ১৯২৪-২৫ সালে ১২ কোটি ২৩ লক্ষ আউন্স রৌপ্য (মূল্য ২৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা) ভারতে আমদানী হয়। (Annual statement of Sea-borne Trade. 59th Issue of 1917-19).

আলুমিনিয়াম

আজকাল আলুমিনিয়ামের বাসনপত্রের খুব প্রচলন হইতেছে। ইহার চাদর বিদেশ হইতে আসে ও এখানকার কারখানার নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে ও বীরভূম প্রভৃতি জিলায় মাটির মধ্যে আলুমিনিয়াম আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আলুমিনিয়াম সস্তা ও মজবুত বলিয়া দিন দিন ইহার প্রসার হইতেছে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইহার অস্তিত্ব জানা যায়; ১৯১০ সাল হইতে ধাতুনিষ্কাসণের কাজ আরও হয়, সেই হইতে ইহার কাজ প্রতি বৎসর অগ্রসর হইতেছে। ১৯২৩ সালে ৩,৫০০ টন্ Bauxite—যাহা হইতে আলুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়, ধাতু উঠে। বক্সাইটের ব্যবহার অসংখ্য এবং দিন দিন নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। ভারতে ইহার কারখানা হয় নাই। আমেরিকায় যুক্ত-রাজ্যে ৫,২২ হাজার টন্ বক্সাইট ১৯২৩ সালে উঠিয়াছিল। ১৯২১ সালে ভারতে ১৭টি আলুমিনিয়াম বাসনপত্র করাইবার ফাক্টরী ছিল। ১৯২৩ জন শ্রমজীবি সর্বসমেত খাটিত।

পাথর ও মাটি।

মাটির নীচে হইতে যে সকল মূল্যবান্ পদার্থ পাই, তাহাই যে কেবল খনিজ পদার্থ এমন নহে। পাথর, শ্লেট্, কাঁকর, চুণ সমস্তই খনিজ সামগ্রী হইলেও সেগুলি ধাতু নহে। পাথর হইতে শীল, নোড়া,

জাঁতা, চাকি, বাটি, খোরা, গেলাস, ঘটি প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া বাড়ী তৈয়ারীর বেলে ও লাল পাথর, মূর্ত্তি প্রভৃতি খোদাই করিবার জন্য কালো পাথর, মূল্যবান কার্য্য করিবার জন্য মার্বেল পাথর ব্যবহৃত হয়। এই সবই খনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের স্থাপত্যের কীর্তিচিহ্ন যে রহিয়াছে তাহার কারণ সেগুলি পাথরের তৈয়ারী। কিন্তু আজকাল বিদেশ হইতে মার্বেল পাথর প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে; ইত্যালী, স্কট্‌ল্যাণ্ডে শ্বেতপাথর পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতের মার্বেল অপেক্ষা যে সেগুলি ভাল তাহা প্রমাণিত হয় নাই। বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর এক মার্বেল পাথরই দুই লক্ষ টাকার উপর আমদানী হয়; অন্যান্য শ্রেণীর পাথর ও প্রায় দুই লক্ষ টাকার উপর আসে। আমাদের দেশে রাজপুতনার মাকারাণার মার্বেল বিখ্যাত; তাজমহল প্রভৃতি মুঘলদের অতুল কীর্তিগুলি সমস্তই এইখানকার মার্বেলই নির্মিত। বর্তমান দিল্লীতে বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদের মার্বেল মাকারাণা হইতে সংগৃহীত হইতেছে।

পাথর ও মার্বেল

কেবলমাত্র প্রস্তরই গৃহাদি নির্মাণের উপকরণ নয়। চুণও একটি প্রধান উপাদান। চুণ জিনিষটা প্রাণীজ হইলেও আমরা তাহাকে প্রস্তররূপেই পাই। চুণের খনি পাহাড়েই পাওয়া যায়। একপ্রকার পাথর পুড়াইয়া চুণ হয়। বাংলাদেশে পূর্বদিকে খাশিয়া পাহাড়ে এই চুণেপাথর আছে। ছাতক এই চুণের ব্যবসায়ের কেন্দ্র বলিয়া ইংরাজ বণিকগণ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছাতক সিলেট জিলায় বলিয়া উহা 'সিলেটী' চুণ বলিয়া বিখ্যাত। জব্বলপুরের নিকট কাট্‌নীতেও আর একটী চুণের পাহাড় আছে। এছাড়া ছোটনাগপুরে ও বীরভূম জিলায় 'ঘুটিং' বলিয়া একপ্রকার কাঁকরে পাথর পাওয়া যায়। সেইগুলি পুড়াইয়া চুণ পাওয়া যায়।

পাথুরে চুণ ও ঘুটিং

শ্লেটপাথরের প্রচলন ক্রমেই বাড়িতেছে। কাঙ্গাড়া জিলায়, দিল্লীর দক্ষিণে রেবারীতে শ্লেটের ব্যবসায় বড় করিয়া ফাঁদা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে শ্লেট পাওয়া যায়; কিন্তু কোথাও ইহার হিসাব রাখা হয় না বলিয়া কি পরিমাণের ও কত মূল্যের সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহা বলা যায় না।

খনিজ রঙ ভারতে যে পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা সেরূপ হয় নাই। জামালপুর জিলায় খনিজ রঙের এক কারখানায় গিরিমাটি কাজে লাগানো হইতেছে এবং পান্না রাজ্যে হরিদ্রা রঙ প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু কলিকাতায় এই সব রঙ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। এ দেশের লোকে বহুকাল হইতে লাল, হরিদ্রা প্রভৃতি বিবিধ রঙ মৃত্তিকা হইতে বাহির করিয়া ব্যবহার করিত, তাহার চিহ্ন অজন্তা, বাগ, রামগড় প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন চিত্রে এখনো দেখা যায়। অজন্তা ও বাগের গুহার চিত্রগুলি খুব কম করিয়া বার শত বৎসরের পুরাতন, অথচ সকল প্রকার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে তাহাদের রঙ ঠিক রহিয়াছে, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এ সব রঙ এককালে দেশেই হইত। মধ্যযুগের রাজপুত, মুঘল চিত্রের রঙও ভারতে প্রস্তুত হইত; দাক্ষিণাত্যে ও বর্মাতে এক প্রকার পাথরকে 'মাকড়া' পাথর বলে; ইহা হইতে রঙ পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের ত্রিচিনপল্লী জিলায়, বর্মার বহুস্থানে গিরিমাটি রঙ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে প্রস্তর মূর্ত্তিসমূহের উপর এক প্রকার কাল রঙ দিয়া চকৃচকে করে। মথুরাতে লেখক সেই প্রকার রঙ দিতে স্বয়ং দেখিয়াছেন। এই বিদ্যা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং পাথরের উপর কি করিয়া এনামেল করিতে হয় তাহা দেশের লোক ভুলিয়া যাইতেছে।

খনিজ রঙ

অভ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথাও

তদ্রূপ দেখা যায় না। ভারতবর্ষ, কাণাডা ও মার্কিন দেশ এই তিনটি স্থানই পৃথিবীর অভ্র সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ উৎপন্ন হয়। ভারতের অভ্রের ব্যবসায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে; বর্তমানে এই কার্য্যে প্রায় ১৬,০০০ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র অভ্র পাওয়া যায় না। হাজারীবাগ ও গয়া জিলার মধ্যে ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রস্থ একটি স্থানে এবং দাক্ষিণাত্যে নেলোর জিলায় অভ্র পাওয়া যায়। ভারতে উৎপন্ন অভ্রের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই বিহারে খনিত হয়; প্রায় ৫ ভাগ মান্দ্রাজে ও অবশিষ্ট ৫ ভাগ রাজপুতনায় পাওয়া যায়।

অভ্র

অভ্রের খনিগুলিতে অত্যন্ত সে-কেলে ধরণে কাজ হয়। যেখানে অভ্র পাওয়া যায় সেই স্থানটি পুকুরের মত করিয়া খুঁড়িয়া ফেলা হয়, কুলিরা দল বাঁধিয়া সারি দিয়া উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় এবং পুষ্করিণী বা খাদ হইতে মাটি, জল ও অভ্রের চাপড়া তুলিতে থাকে। বর্ষাকালে জলের জন্য কাজ বন্ধ থাকে। কিন্তু এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করিতেছে। অভ্র চিরাই করিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। যুদ্ধের পূর্বে জারমেনী ছিল অভ্রের প্রধান খরিদ্দার। ১৯১৬ সালে ৬৪,৭০০ হন্দর অভ্র রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার ইহার মূল্য ১৬ লক্ষ টাকা। ১৯২৪-২৫ সালে ৮২,২৪৭ হন্দর অভ্র বিদেশে রপ্তানী হয়; ইহার মূল্য ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। (Annual Statement. 59th Issue p. 60-69.)

অভ্রের ব্যবহার বহুপ্রকার। অভ্রের চাদর আলোর কাঁচ জানালার কাঁচের জায়গায় লাগানো হয়। কিন্তু ইহার প্রধান ব্যবহার ইলেক্‌ট্রিক ডাইনামো ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে। য়ুরোপে ও আমেরিকায় মাইকানাইট (Micanite) শিল্প জাগিয়াছে। পাৎলা অভ্র গালা দিয়া

জুড়িয়া জুড়িয়া বড় বড় চাদর তৈয়ারী হয়; এবং তাহা হইতে যে কোনো স্বচ্ছ পাত্র বানানো যায়। অভ্র ও গালার প্রধান স্থান ভারতবর্ষ, অথচ ইহার ব্যবহার এদেশে হয় না। (Geol. Surv. of India lvii. p. 25.)

আসবেসটিস নামক আর এক প্রকার খনিজ অভ্রের ন্যায় তাপ নিবারক। ইঞ্জিন প্রভৃতিতে ইহার চাদর তাপ নিবারণের জন্য প্রয়োজনে লাগে। করোগেট টিনের পরিবর্তে কোথায় কোথায় ইহার চাদর ছাদে ব্যবহৃত হয়।

আসবেশটস

বিহারের সিংহভূমে সেরাইকেলা রাজ্যে, রাজপুতনার মেবারে, যুক্তপ্রদেশস্থ গড়বালে, মৈশূরের হসনন জেলায়, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডীর জিলায়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ইদর রাজ্যে আসবেসটস্ পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত ভারতে যত আসবেসটস্ পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনোটিই উচ্চশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইহাদের আঁশ সমূহ প্রায়ই অতিশয় ভঙ্গুর বলিয়া বিদেশে রপ্তানীর পক্ষে অনুপযোগী। অবশ্য আমাদের দেশে আসবেসটস প্রস্তুতোপযোগীর দ্রব্যাদির কারখানা খুলিলে এই আসবেসটসই অনেক কাজে আসিতে পারে। আমরা কেবল নামমাত্র দামে উৎকৃষ্ট খনিজ সমূহ বিদেশে চালান দিয়া থাকি। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর খনিজ বিদেশে চালান করিলে জাহাজ ভাড়া দিয়া লাভের অংশে কিছুই থাকে না; এই কারণে আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত একটু খারাপ শ্রেণীর ধাতুচুর বা মৃৎপ্রস্তরাদি ভূগর্ভে পড়িয়া থাকে অথবা নিতান্ত মাটির দরে চালান হইয়া যায়; কেননা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আমরা জানিনা। আসবেসটসের অনেক গুণ; ইহা আগুণ-সহ্য, ইহার দ্বারা রঙ, দস্তানা, পটি, চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ ইহা হইতে আরও কত জিনিষ বাহির করিতে পারেন তাহা বলা কঠিন।

মগ্নক বা ম্যাগনেসাইট নামে এক প্রকার ধাতু অন্যান্য খনিজ ধাতুর সহিত দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। সালেম জেলা ইহার প্রধান কেন্দ্র।

ম্যাগনেসাইট

কয়েক বৎসর হইতে ইহার খনন কার্য্য চলিতেছে; নানাপ্রকার রাসায়নিক সামগ্রীতে ইহার প্রয়োজন হয়, বিশেষভাবে ইস্পাত প্রস্তুতের চুল্লীর জন্য যে ইট লাগে সেই ইট নির্মাণের প্রধান উপাদান এই ম্যাগনেসাইট। সাকচির লোহার কারখানায় প্রচুর পরিমাণে এই ইট লাগে; এই তাপসহ ইটের প্রতিখণ্ডের দাম এক টাকারও উপর পড়ে। আর সর্বোৎকৃষ্ট ম্যাগনেসাইট্ যাহা চালান হইয়া যায় তাহার দাম মণকরা ৪৷৫৲ টাকার বেশী হয় না। এইরূপে দেশের মূল্যবান্ খনিজসমূহ মাটির দরে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তাতা কোম্পানী বিদেশ হইতে এই ইট আমদানী না করিয়া এদেশেই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১৪ সালের ১,৬৮০ টন্ হইতে ১৯২৩ সালে ১৯,৪৩৬ টন্ চুর উৎপন্ন হয়। ইহার দাম ২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। শেষ বৎসরে ভারতে ৬,৭০০ টন্ ম্যাগনেশিয়া প্রস্তুর হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধানত বিহারেই সোরা পাওয়া যায়। এককালে সোরা বারুদ তৈয়ারীর একমাত্র উপাদান ছিল। কিন্তু দক্ষিণ

সোরা

আমেরিকার অন্তর্গত চিলি দেশে সোডিয়াম্ নাইট্রেট নামে এক প্রকার তলানি জমাট (Deposit) আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতবর্ষের এই ব্যবসায় মন্দা পড়িয়া আসিয়াছে। এককালে য়ুরোপের গোলাবারুদের এই শ্রেষ্ঠ উপাদান বিহার হইতেই রপ্তানী হইত। যুদ্ধের পূর্বে ৪০।৪৫ লক্ষ টাকার মূল্যের অধিক সোরা উৎপন্ন হইত না। যুদ্ধের সময়ে ১৯১৬ সালে ৬৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার মূল্যের সোরা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে ৮,৫৫৫ টন্ সোরা ভারতে উৎপন্ন হয়, ইহার মূল্য ২২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

(Geol. Sur. p. 277.) ১৯০১ সালের আদমসুমারীতে প্রকাশ যে বিহারের নুনিয়া জাতি (যাহারা সোরা তোলে) ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ১৯১১ সালেও তাহাদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল। এই জাতের অবনতির কারণ সরকারের তরফ হইতে এই ব্যবসায়ের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগের অভাব। নুনিয়ারা জাতব্যবসায় ছাড়িয়া জমির শরণাপন্ন হইতেছে। ভারতে যে পরিমাণ সোরা হইত তাহার শতকরা ৮০ভাগই বিদেশে রপ্তানী হইত। অন্য দেশে তাহাদের যেপ্রকার সদ্‌গতি হয় এ দেশেও কেন তদ্রূপ হইতে পারে না তাহাই ভাবিবার বিষয়।

চীনামাটী

জিপসাম্ নামে এক প্রকার খনিজ মৃত্তিকা ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়। এই জিপসাম্ হইতে প্লাষ্টার অব প্যারীস (Plaster of Paris) তৈয়ারী হয়। এই পদার্থে নানা প্রকার খেলনা, মূর্ত্তি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি সামগ্রী নির্ম্মিত হয়। কলিকাতার পটারী ওয়ার্কসে ইহার খুব ব্যবহার হইতেছে। বর্দ্ধমান জিলায় বার্ণ কোম্পানীর কারখানা উল্লেখযোগ্য। ছোট নাগপুরে, সিন্ধুপ্রদেশে, কচ্ছউপদ্বীপে, পঞ্জাবের লবণ-পাহাড়ে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়। যোধপুরে এক জায়গায় প্রায় হাত দুই গভীর নীচে এই মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন সেখানে পূর্ব্বে একটা লবণ সমুদ্র বা হ্রদ ছিল। ভারতবর্ষকে মাটির জিনিষও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। চীনামাটি ও পোর্সিলেনের জিনিষ বিদেশ হইতে ৭৮ লক্ষ টাকার আসে। মাটির পাইপ আসে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার। ইট ও টালি আসে ৩৬ লক্ষ টাকার। মাটি (clay) আসে ১,৮১ হাজার টাকার। মোট ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত গড়ে আমরা বিদেশ হইতে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার মাটির সামগ্রী ক্রয় করিয়াছি। (Geol. Survey of India 1925 p. 347).

মধ্য প্রদেশে ও বঙ্গদেশে ১৯২১ সালে ২০টি পটারী ওয়ার্কস ছিল। ৩১৮৪ জন লোক খাটিত; সাহেব ছিল ১৬ জন ও দেশীয় ১৮৩ জন কর্মচারী। (Statistical Abs. p. 644).

ফিটকারী

ফিট্‌কারী একসময়ে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইত; কচ্ছ রাজপুতানা ও পঞ্জাবের নানা স্থানে ইহার বড় বড় কারবার ছিল। কিন্তু বিদেশ হইতে ইহার আমদানী সুরু হইলে এই ব্যবসায় লোপ পাইল। বর্ত্তমানে কচ্ছতে কিছু কিছু তৈয়ারী হয়। রঙ ও চামড়ার কাজে ফিটকারীর প্রধান ব্যবহার।

লবণ

আমাদের দেশে লবণ সমুদ্র, হ্রদ ও পাহাড় হইতে পাওয়া যায়। সাধারণত লোকে যে-লবণ খায় তাহা লিভারপুল বা এডেন হইতে আসে। সৈন্ধব লবণ পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে পাওয়া যায়; এই খনিতে বহু শতাব্দী ধরিয়া কাজ চলিতেছে এবং এখনো বহুকাল ধরিয়া চলিলেও নিঃশেষিত হইবে না। ১৮৪৯ সালে পঞ্জাব অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার লবণের খনি বৃটীশ তত্ত্বাবধানে আসে এবং ১৮৭২ সাল হইতে বরাবর নিয়মিত কাজ চলিতেছে। এখানে প্রায় ৫০০ ফিট্ গভীর লবণস্তর আছে; কিন্তু শেষ ২৭৫ ফিট্ লবণের সহিত এত মাটি মিশ্রিত যে তাহা কোনো কাজে লাগিবে না। কোহাটের সৈন্ধবক্ষেত্র আট মাইল স্থান জুড়িয়া আছে। ইহার গভীরতা হাজার ফিটের উপর। এই দুইটি স্থান ছাড়াও সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। সৈন্ধব লবণ বৎসরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন্ অর্থাৎ সমগ্র লবণের দশমাংশ উত্তোলিত হয়।

সৈন্ধব লবণ

সৈন্ধব লবণ ব্যতীত রাজপুতানার মধ্যস্থিত সম্বর হ্রদের লবণ উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই হ্রদের

পরিধি বর্ষাকালে ৬০।৭০ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু গভীরতা কোথায় দুই হাতের বেশী নয়। চারিদিকের লবণাক্ত মাটি ধুইয়া হ্রদে জল জমিতে থাকে এবং বৃষ্টির দুই তিন মাসের মধ্যে সমস্ত হ্রদের জল লবণাক্ত হইয়া যায়। এই হ্রদ বৃটীশ-সরকার যোধপুর ও জয়পুরের নিকট হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিয়া ইজারা লইয়াছেন। ইহা হইতে সরকারের বার্ষিক লাভ হয় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। এই হ্রদ হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন্ লবণ উৎপন্ন হয়। সমস্ত হ্রদেই কতকগুলি বাঁধ বাঁধিয়া ছোট ছোট চৌবাচ্ছার মতো করা আছে। সেই ঘেরা জলের উপর সর জমিতে থাকে; তাহাই তুলিয়া শুকাইতে দিলেই লবণ হয়।

সম্বর হ্রদের লবণ

সৈন্ধব ও হ্রদ ব্যতীত সমুদ্রের জল হইতে লবণ করা হয়। সমগ্র ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ টন্ লবণ ব্যবহৃত হয়; ইহার মধ্যে সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকাইয়া যে লবণ তৈয়ারী হয় উহা প্রায় অর্দ্ধেক। লবণ সরকারী সম্পত্তি বলিয়া সমুদ্রের ধারেও সরকারী লোক ছাড়া কেহই লবণ তৈয়ারী করিতে পারে না। ভারতে সর্বসমেত প্রায় ৪ কোটি ২১ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। ইহার মূল্য ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া বিদেশ হইতে প্রায় দেড় কোটি মণের উপর লবণ আমদানী হয়। এজন্য বিদেশে প্রায় দেড় কোটি টাকা চলিয়া যায়।

সামুদ্র লবণ।

১৯২১ সালে ২০১টি লবণ সাফের কারখানা ছিল। ১৩ হাজার লোক কাজ করিত। সাহেব কর্মচারী ২০ জন ও দেশীয় কর্মচারী ৬৬১ জন ছিল।

মণিমাণিক্যের জন্য ভারতবর্ষের নাম এককালে পৃথিবীতে সুপরিচিত ছিল; কিন্তু বর্তমানে তাহার সে স্থান আর নাই। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা. পর্য্যটকদের বিবরণে ভারতের গৌরবের

কথা, এখন স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। হীরক দক্ষিণ-ভারতে তিন স্থানে পাওয়া যায়, ১ম—মান্দ্রাজের কুড্‌ডাপা, অনন্তপুর, কুরনুল, গণ্টুর, কৃষ্ণা ও গোদাবরী জিলা; ২য়—মহানদীর অপ্‌বাহিকা প্রদেশ সম্বলপুর ও চান্দ জিলা; ৩য়—মধ্য-ভারতের পান্না রাজ্য। ভারতে যেসব বিখ্যাত হীরক পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কয়েকটির নাম ও ওজন প্রদত্ত হইল। কোহিনুর ১৮৬ কারেট, গ্রেট্ মুঘল—২৮০ কারেট, অরলফ্—১৯৩ কারেট, পিট্ ৪১০ কারেট, (১ কারেট=৩½ গ্রেণ; ১ গ্রেণ প্রায় ৪ মাষা) পিট্ হীরকের দাম অনুমান ৫ কোটি টাকা।

মণিমাণিক্য।

প্রসিদ্ধ হীরক।

পদ্মরাগ মণি, নীলকান্ত, গোমেদ মণি ও অন্যান্য শ্রেণীর মণি ব্রহ্মদেশ, কাশ্মীর, ছোটনাগপুর, রাজপুতানা প্রভৃতি নানা স্থানে পাওয়া যায়।

কাঁচ ও কাঁচের জিনিষ

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভারতের নানা স্থানে কাঁচের চিহ্ন পাইয়াছেন। সেসকল জিনিষ শিল্পের দিক হইতে প্রশংসনীয় নহে। ভারতের কাঁচের জিনিষ কোনো যুগেই য়ুরোপীয় সামগ্রীর সহিত কোনো অংশে তুলনীয় নহে। স্ত্রীলোকদের জন্য চুড়ি বহুকাল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে নির্মিত হইয়া আসিতেছে; এ ছাড়া আতর গোলাপজল প্রভৃতি রাখিবার জন্য শিশি বোতল তৈয়ারী হইত। এইরূপ শিল্প দক্ষিণ-ভারতেও ছিল তাহার প্রমাণ আছে।

কাঁচের শিল্পের ইতিহাস।

ভারতের কাঁচ-শিল্পের আরম্ভ ১৮৯০ সাল হইতে ক্রমে গত শতাব্দীর শেষ বৎসরের মধ্যে পাঁচটি কারখানা স্থাপিত হয়; তাহার মধ্যে দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত দুটি শীঘ্রই উঠিয়া যায়। অবশিষ্ট তিনটিতে য়ুরোপীয় মূলধন ছিল। য়ুরোপের কাঁচের কারখানা হইতে লোক আনাইয়া এগুলি একপ্রকার চলিতেছিল কিন্তু এ তিনটিও ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

প্রাচীনকালের কাঁচ।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে যেরূপ অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য লোকের চেষ্টা হইয়াছিল—কাঁচের কারখানা সম্বন্ধেও লোকের উৎসাহ কিছু কম প্রকাশিত হয় নাই। ১৯০৬ হইতে ১৯১৩ সালের মধ্যে ১৬টি কাঁচের কারখানা খোলা হইয়াছিল; ইহাদের অধিকাংশ গুলির না ছিল অর্থবল, না ছিল বুদ্ধিবল। কেবল উৎসাহের জোরে তাঁহারা কল চালাইয়াছিলেন; কিন্তু বেশী দিন এমন কারখানা ও কারবার চলিতে পারে না। এই সব কারখানাতে য়ুরোপীয়ান ও জাপানী কারীগর কাজ করিত। কিন্তু পূর্বের য়ুরোপীয় কারখানাগুলি কেন উঠিল, তাহাদের বাধা কোথায় এ সমস্ত জটিল সমস্যার কোনো প্রকার সমাধানের চেষ্টা না করিয়া এগুলিতে হাত দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন তিনটি মাত্র কারখানা অত্যন্ত কষ্টে কাজ চালাইয়া কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বাঁচিয়া ছিল, ব্যবসায় বা লাভের জন্য নয়। ইহার মধ্যে একটি বোম্বাইএর 'পয়সা ফাণ্ড' কর্তৃক স্থাপিত। পঞ্জাবের আম্বালার কাঁচের কারখানা এখানে উল্লেখ-যোগ্য। যুদ্ধের সময়ে পুনরায় ২০টি কারখানা তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে ভারতে ১২টি কারখানা মাত্র জীবিত ছিল এবং নূতন কতকগুলি কারখানা গড়িয়াছিল। পূর্বের কিন্তু অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এই কারখানাগুলির সুবিধা হইয়াছিল।

যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ সালে অষ্ট্রিয়া ও জারমেনী হইতে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার কাঁচের চুড়ি, পুঁথি, বোতল, ফানেল, প্রভৃতি মনোহারী সামগ্রী এদেশে আসিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে কাঁচের বাণিজ্যের শতকরা ৫৭ ভাগ অষ্ট্রিয়া-জারমেনীর হাতে ছিল। এই আমদানী বন্ধ হওয়াতে জাপান আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। যেখানে সে যুদ্ধের পূর্বে শতকরা ৮ ভাগ মাত্র রপ্তানী করিত ১৯১৮ সালে সেইখানে ৭১ ভাগ করিয়াছিল। কিন্তু জারমেনরা পুনরায় তাহাদের পূর্ব বাণিজ্য উদ্ধার করিয়াছে। ১৯২৪ সালে ২,৬০ লক্ষ টাকা কাঁচের সামগ্রী আসে।

কাঁচের ব্যবসা

যুদ্ধের ফলে ভারতে অনেকগুলি কাঁচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল —সব শুদ্ধ প্রায় ২০টি; ইহার মধ্যে ৭টি ফিরোজাবাদে স্থাপিত হয়। এগুলিতে চুড়ির কাঁচ নির্মিত হইত। এখান হইতে সংযুক্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের চুড়ি নির্মাতারা কাঁচ কিনিয়া লইয়া চুড়ি তৈয়ারী করিত। ব্যবসায়ীদিগকে বহু দূরদূর স্থান হইতে কাঁচের প্রধান প্রধান উপকরণগুলি আমদানী করিতে হয়। সোডা বিদেশ হইতে, চূণ মধ্যপ্রদেশের কাটণী হইতে, বালি এলাহাবাদের দক্ষিণ হইতে, আর কয়লা বিহার বা বাংলা হইতে। ফিরোজাবাদ যে এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে তাহার কারণ— এখানে অনেকগুলি কারিগর আছে, তা ছাড়া ব্যবসায়ের দিক হইতে কোনই সুবিধা নাই। ১৯২১ সালে ফিরোজাবাদে ৫০টি চুড়ি করিবার কারখানা ছিল। চুড়ির কাঁচ তৈয়ারীর কারখানাগুলি সবই হিন্দু মহাজনদের হাতে; তাঁহাদের প্রায় চারি লক্ষ টাকা এখানে খাটিত। প্রতিদিন প্রায় ২০।৩০ টন কাঁচ তৈয়ারী হইত। যুদ্ধের জন্য বিদেশী প্রতিযোগিতা না থাকায় ফিরোজাবাদের এই শিল্প ও বাণিজ্য জাগিয়াছিল। এখন বিদেশী কাঁচের চুড়ি এত আমদানী হইতেছে যে এগুলি

কাঁচের কারখানা

তাহাতে বাঁচিতে পারে না। বর্তমানে যুক্তপ্রদেশে মাত্র একটি কারখানা আছে। (Statistic. Abs. 3rd issue. p, 627).

আমরা কি পরিমাণ কাঁচের সামগ্রী বিদেশ হইতে আনি তাহা একটু বিশদভাবে দিতেছি। ১৯২৪-২৫ সালে চুড়ি ১ কোটি টাকার, পুঁথি ও ঝুটা মুক্ত ৩৭ লক্ষ টাকার; বোতল ও সোডাজলের বোতল ১২ লক্ষ, ছোট খাটো শিশি ২২ লক্ষ টাকা আলোবাতি, চিম্নী, ডোম ১৬ লক্ষ টাকার ইত্যাদি। দেশের লোকের মনোভাব কি সে সম্বন্ধে সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। (Annual State. 56th Issue p. 33).

কারবার না জাগিবার অন্তরায়

এদেশে কাঁচের কারখানা যে তেমনভাবে জাগিয়া উঠিতেছে না তাহার কারণ দেশীয় কোম্পানীগুলির মূলধন নিতান্ত কম; এই মূলধনে কারবারে আজকাল বাহিরের প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো কঠিন; তা ছাড়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে যে যাঁহারা এই ব্যবসায় আরম্ভ করেন তাঁহাদের এ সব বিষয়ে কোনো প্রকার জ্ঞান নাই বলিলে চলে। এ ছাড়া আরও কতকগুলি বাধা আছে। (১) ফুঁকো কাঁচের কাজের জন্য যোগ্য লোকের একান্ত অভাব; যাহারা কাজ করে তাহারাও ভাল করিয়া জানে না। তবে আশা করা যায় এ অসুবিধা বেশী দিন থাকিবে না। কাঁচের কাজের মধ্যে অনেক জিনিষ ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেহ জানে না। বিদেশে এই সকল কারখানায় প্রবেশ লাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ও সেখান হইতে কিছু শিখিয়া আসা অসম্ভব। (২) শিল্পকেন্দ্রগুলিতে কয়লা লইয়া যাইতে যে পরিমাণ খরচ পড়ে তাহাতে ব্যবসায় পোষায় না। (৩) জার্মাণী ও জেকোস্লোভেকিয়ার সহিত প্রতিযোগিতা করা বর্তমানে অসম্ভব।

নবম ভাগ

১। শিল্প ও বাণিজ্য

বর্তমানে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ও এখানকার শতকরা ৭২ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি-উপজীবি। কিন্তু চিরকাল ভারতবর্ষ এমনভাবে কৃষিগত প্রাণ ছিল না। শিল্প ও কৃষির মধ্যে এককালে একটা সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু তাহার ভিত্তি দৃঢ় ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা রাজনৈতিক অবস্থা অনুকূল ছিল না বলিয়াই হউক, বাহিরের সহিত সংঘর্ষে ও প্রতিযোগিতায় উহা দাঁড়াইতে পারিল না। আমরা নিম্নে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎপন্নানুসারে শিল্প সামগ্রী সমূহকে বর্ণনা করিব।

শিল্প ও কৃষি

আরণ্য শিল্প

সামগ্রী মাত্রকেই তিন ভাগে ভাগ করা যায়; অরণ্যজ বা উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও খনিজ। আমরা প্রথমে উদ্ভিজ্জ পদার্থকে নিম্নে বিবৃত করিব। প্রত্যেক দেশেই উদ্ভিদ্ দুই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায় (১) আরণ্য উদ্ভিদ্ ও (২) কৃষিজাত উদ্ভিদ্। প্রথমত আমরা ভারতবর্ষের আরণ্য উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কৃষিজাত উদ্ভিদ্ যেরূপ আমাদের নানাবিধ উপকারে আসে, সেইরূপ আরণ্য-উদ্ভিদ্ হইতেও আমরা বহু প্রকার উপকার পাই। এ দেশের অরণ্যে এত প্রকার কাঠ আছে যে

ভারতের আরণ্য উদ্ভিদ

তার ধারণা সাধারণের নাই। বড় বড় গাছ প্রায় ২,৫৮০ জাতের আছে, এবং ছোট ছোট উদ্ভিদের সংখ্যাও প্রায় তদ্রূপ।

ভারতের প্রকাণ্ড বনভূমিগুলির রক্ষাভার গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং লইয়াছেন। সুবৃহৎ স্থানগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন সহজ ব্যাপার নহে। স্থানীয় লোকেরা যদৃচ্ছাক্রমে গাছ কাটিয়া লইত এবং সামান্য প্রয়োজন সাধনের জন্য ঘাসে বা পাতায় আগুন লাগাইয়া অনেক সময়ে দাবানল সৃষ্টি করিত। ইহার ফলে অনেক অরণ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসী প্রথমে এদিকে দৃষ্টি দেন; কিন্তু তখনকার দিনে সরকারী কল এত মন্দ চলিত যে কোনো কাজ সহজে ও শীঘ্র হইয়া উঠিত না। অবশেষে ঠিক হইল ভারতের এই মূল্যবান্ বনভূমিকে মূর্খ গ্রামবাসী বা পাহাড়ীদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এদিকে ইংলণ্ডে আরণ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিতেন না। এইজন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তিন জন জার্মান পণ্ডিতকে সর্বপ্রথমে এই বিভাগের কর্তা করিয়া আনয়ন করিলেন। ইহাদের মধ্যে স্যার ডেটরিক্ ব্রাণ্ডিস খুবই নাম করিয়া গিয়াছেন; 'ভারতীয় বৃক্ষ' (Indian Trees) নামে তাঁহার পুস্তক পৃথিবী বিখ্যাত। এই জার্মান বন-বিজ্ঞানবিদের চেষ্টায় বনভূমি সুবন্দবস্তে আসিল। ১৮৬৯ সালে ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ জারমেনী ও ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমে এদেশে আসিলেন।

বনবিভাগে সরকারী ব্যবস্থা

এইরূপভাবে কাজ ১৮৭৬ পর্য্যন্ত চলিল। সেই বৎসরে ইংলণ্ডে "জাতীয় আরণ্য-বিজ্ঞান বিদ্যালয়' স্থাপিত হইল। এই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদল ১৮৮৭ সালে ও শেষ দল ১৯০৭ সালে আসেন। ইহার পর অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ, এডিনবারা, ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই আরণ্য-বিজ্ঞান

আরণ্য-বিজ্ঞানের আলোচনা

বিভাগ খোলা হয়। এইরূপে ভারত গভর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া এদেশের বন-বিভাগের কর্ম্মের জন্য আনিতে লাগিলেন।

ভারতীয় বন-বিভাগে উচ্চকর্মচারীর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি এ দেশীয় অল্পবেতনের কর্মচারীর প্রয়োজন। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য দেরাদুনে ১৮৭৮-সালে বন-বিভাগের একটি বিদ্যালয় খোলা হয়। অল্পকাল হইল এই বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত হইয়াছে। বর্ম্মাতে ও মান্দ্রাজ প্রদেশে দুইটি বিদ্যালয়েও আরণ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই নিম্নস্তরের কর্মচারী তৈয়ারী করিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে এখনো প্রধান কর্মচারীরা বিলাত হইতেই বাছাই হইয়া আসে।

দেরাদুনের কলেজ

ভারত সাম্রাজ্যের সমগ্র বর্গফলের একপঞ্চমাংশ বন-ভূমির অন্তর্গত। ১৯২১-২২ সালে বন-ভূমির বর্গফল ছিল ২,৪৯,৫০৪ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১,০৩,৭৮৯ বর্গমাইল ভূমি বা শতকরা ৪১ভাগ ছিল 'রিজার্ভ' অর্থাৎ সেখান হইতে কেহ গাছ যদৃচ্ছাক্রমে কাটিতে পারে না; ৭,৫৫০ বর্গমাইল, বা ৩ ভাগ রক্ষিত; ও ১,০৮,১৩৫ বর্গমাইল বা ৫৬ ভাগ অনির্দ্দিষ্ট।

বনভূমির পরিমাণ ও আয়

বনজাত সামগ্রী হইতে সরকারের আয় ক্রমশই বাড়িতেছে। প্রতি বর্গমাইলে ১৯০৫-৬ সালে ১,০৫৪ ঘনফুট কাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছিল; ১৯২১-২২ সালের হিসাবে ১,৪৪৮ ঘনফুট পাওয়া যায়। খুচরা সামগ্রী বিক্রয়ে ১৬ বৎসরে বর্গমাইলে আয় ২৭৲ টাকা হইতে ৫৫৲ উঠিয়াছে বনভূমির বর্গপরিমাণ মাত্র শতকরা ৬ হারে বাড়িয়াছে, কাষ্ঠাদি হইতে আয় ৫৬ হারে ও খুচরা সামগ্রী হইতে শতকরা ১০০৲ হারে বাড়িয়াছে।

১৯২১-২২ সালে ভারত সরকারের বনবিভাগের আয় হইয়াছিল ৪,৯৯,৩০,০০২৲ টাকা। (Das-Productien in India p. 43-46.)

বর্মাতে কাঠ বিখ্যাত; সেখান হইতে সেগুণ কাঠ ভারতে আমদানী হয়। করাতি-মিল ২৪৬টি ছিল; ২৩ হাজার লোক খাটিত; ১৭৮ জন সাহেব ইহার কর্তা ও ১৪৬৬ দেশী কর্মচারী ছিল; কাঠের উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান ১১৯টি ছিল; এখানেও ৮৮টি সাহেব ও ফিরিঙ্গি পরিচালক।

গঁদ জাতীয় সামগ্রী

বৃক্ষের কাষ্ঠ ও ছালের মধ্যে একরূপ তরল ও পিচ্ছিল রস উৎপন্ন হয়। এই রস শুষ্ক করিয়া অথবা অন্য উপায়ে জমাইয়া নানাবিধ আটা বা গঁদ ও তজ্জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বসন্তকালে উক্ত নির্য্যাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ছাল ও কাষ্ঠচক্রের মধ্যে থাকিয়া বৃক্ষের কাষ্ঠাংশের পরিপুষ্ট সাধন করে। এই নির্য্যাসের সাহায্যেই আম্রাদি বৃক্ষের জোড় বা কলম লাগিয়া থাকে। সজিনা, জিওল ও আমড়া-গাছের ছাল কাটিয়া দিলে অনতিবিলম্বেই আটা বাহির হইয়া পড়ে। বট ও অশ্বত্থের দুধ ঘনীভূত হইলে আটায় পরিণত হয়। নিম্নে নির্য্যাসজাত কতিপয় দ্রব্যের উল্লেখ করা যাইতেছে।

গঁদ বা বৃক্ষনির্য্যসাদি

বঙ্গদেশের নদীতীরে ও চরাজমিতে বহুসংখ্যক বাবলাগাছ জন্মিয়া থাকে। সাধারণত বালুকাপ্রধান স্থানেই বাবলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বাবলা নানা জাতীয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের পার্শ্ববর্তী বনেজঙ্গলে গুয়ে-বাবলা, সাঁই বাবলা ও লাল বাবলা প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হইয়া

বাবলার আটা বা আরবী গঁদ

হইয়া থাকে। টেইরিনামক এক প্রকার ফল হইতে পল্লীগ্রামের ছেলেরা "কষের কাঙ্গী" প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই টেইরিবৃক্ষও এক জাতীয় বাবলা। পার্বত্য প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বাবলা গাছ একটু কটিয়া দিলেই তাহা হইতে "আটা" বাহির হয়। এই নির্য্যাস জলে গলিয়া যায়; য়্যাল্‌কহল কিংবা ইথারে গলে না। রাসায়নিক হিসাবে বাবলার আটাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যত প্রকার "আটা" আছে তাহাতে য়্যারাবিন্ (Arabin), ব্যাসোরিণ (Bassorin) ও সেরাসিন (Cerasin) এই তিন প্রকার পদার্থের যে কোন একটি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। বাবলার আটার যথেষ্ট য়্যারাবিন্ আছে। এই পদার্থ জলে সম্পূর্ণরূপেই গলিয়া যায়, সুতরাং কাগজাদি আঁটিবার জন্য বাবলার আটাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

বাবলা ব্যতীত আরও অনেক গাছ হইতেই আটা বাহির হয়, যেমন জিওল, নিম, সজিনা, আম ইত্যাদি। কিন্তু বাণিজ্যে ইহাদের মূল্য খুব কম।

সর্জ্জরস বা রজন

রজনও বৃক্ষনির্য্যাস বিশেষ। ব্যবসায়ীরা গাছের বহির্ত্বক একটু একটু করিয়া কাটিয়া দেয়। নির্য্যাস বাহির হইলে পরে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনে। কাষ্ঠাদি বাণিশ করিবার জন্য আমরা যে রজন ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা পাইন্ নামক বৃক্ষের নির্য্যাস। এই গাছ দেখিতে প্রায় ঝাউগাছের ন্যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদ প্রধানত শীতপ্রধান দেশে জন্মে। আমাদের দেশে হিমালয় অঞ্চলে এই উদ্ভিদ্ অরণ্য সৃষ্টি করিয়াছে। পাইন বৃক্ষের নির্য্যাস পরিশ্রুত (Distilled) করিয়া লইলে অর্থাৎ চুয়াইয়া লইলে যে কঠিন অংশ পাওয়া যায় তাহাই রজন এবং তরলাংশ বল্‌সাম (Balsam oil) তৈল নামে পরিচিত।

শালবৃক্ষের ছালের ভিতরে যেসকল কোষ আছে তাহারা ধনা

আধার। ধুনা পরিপুষ্ট হইলে ঐ সকল কোষ ফাটিয়া যায় এবং ধুনা বাহির হইয়া থাকে।

এরূপ অনেক উদ্ভিদ্ আছে যাহাদের "দুগ্ধে" কুচুক নামক পদার্থ থাকে, এই সকল উদ্ভিদে ত্বক্ একটু কাটিয়া দিলেই ক্ষত-স্থান হইতে দুগ্ধ নির্গত হইতে থাকে। এই দুগ্ধান্তর্গত কুচুক কণিকাসমূহ জমিয়া রবারে পরিণত হয়। ব্যবসায়ীরা উক্ত দুগ্ধ শুকাইয়া রবার প্রস্তুত করে ঐ দুগ্ধের সহিত য়্যাসেটিক্ (Acetic acid) মিশাইলেও রবার জমিয়া যায়। আমরা সাধারণত যে রবার-বৃক্ষ দেখিতে পাই তাহা অনেকটা বটবৃক্ষের ন্যায়।

কুচুক (Coautohouc)

বন-বিভাগের অন্তর্গত 'রবার' গাছের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ যোগ্য। ভারতবর্ষে দিন দিন রবারের জিনিষের প্রয়োজন বাড়িতেছে; সাইকেল, মোটর, কলকব্জায় প্রচুর পরিমাণে রবার লাগে; নানা প্রকার জলসহা জিনিষ্ করিতেও রবারের প্রয়োজন। এই সমস্ত রবার বিদেশ হইতে আসে। অথচ ভারতবর্ষে এই গাছ হয় এবং আরও বিস্তৃতভাবে ইহার চাষ করিলে এই শিল্প খুবই লাভজনক হইয়া উঠিবে তাহাও নিশ্চয়। বর্তমান আসামের অন্তর্গত তেজপুরে, মান্দ্রাজে ও বর্মায় ১,২৪,৪৫৮ একার ভূমিতে ৬৬ লক্ষ ৮৫ হাজার গাছ আছে। (১৯২২ সালে) ইহার মধ্যে ৬২ হাজার একার জমির গাছের রবার রস বাহির করা হয়। সিংহলে ২,২০,০০০ একার, মলয় উপদ্বীপে ৫ লক্ষ একার, জাভা প্রভৃতি দ্বীপে ৪ লক্ষ একারে রবার চাষ হয়। প্রতি গাছে বৎসরে গড়ে তিন পোয়া হইতে দেড় সের রবারের আটা নির্গত হয়। বিঘাপ্রতি গাছ করিতে শতাধিক টাকার বেশী পড়ে না। গাছপ্রতি বৎসরে ২।৩ টাকার রবার পাওয়া যায়। বিঘাপ্রতি ৩০।৪০টী গাছ হইলে গাছ পোঁতার ৫।৭ বছরের মধ্যে ১০০৲ টাকার ব্যয়ে ১০০৲।২২৫৲ টাকার আয় হইতে পারে। ১৯২২-২৩ সালে

রবার

৪,৮৩,০০০৲ পাউণ্ডের রবার বিদেশে রপ্তানী হয়। প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড (lbs) ওজনের রবার বিদেশে যায় এবং তাহা হইতে বিচিত্র জিনিষ প্রস্তুত হইয়া শতগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়।

লাক্ষা

উপর্য্যুক্ত গঁদ জাতীয় সকল সামগ্রীই উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন; গঁদ জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে লাক্ষা ও মোম প্রাণীজ। সাধারণত আমরা গালার চুড়ি, খেলনা দেখিতে পাই। তা ছাড়া ছুতার কাঠের ফাঁক ভরিতে, কুমার 'বর্ণ' দিতে, শেক্‌রা সোনা রূপার গহনার মধ্যে 'পান' দিতে গালা ব্যবহার করে। এ ছাড়াও যে শিল্পীর যা কিছু জুড়িতে হয়—এই গালা ব্যবহার করে।

লাক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বার্ণিশ তৈয়ারীর প্রধান উপদান লাক্ষা; আস্‌বাব পত্র, ঘোড়াগাড়ী রেলগাড়ী বার্ণিসে লাক্ষার প্রয়োজন নিতান্ত সামান্য নয়। শীল মোহরের জন্য, লিথোগ্রাফী ছাপার কালীর জন্য, গ্রামোফনের রেকর্ড তৈয়ারী করিতে গালা লাগে। ইলেক্‌ট্রিক কলকব্জার inculating পদার্থ হিসাবে বিদেশে লাক্ষার আদর ও দর খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

য়ুরোপে ১৭৯০ সালে প্রথমে লাক্ষা রপ্তানী হয়। তখন হইতে বহুদিন ইহার প্রসার খুব ধীরে ধীরে হইয়াছিল। ১৮৩৮ সালে ২২১ লক্ষ টাকার গালার বাণিজ্য হইয়াছিল; ইহার মধ্যে ৮ লক্ষ টাকার গালার রঙও ছিল; কিন্তু জার্ম্মানীতে আনালিন রঙের আবিষ্কারেও অন্যান্য রঙের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে গালার রঙ লোপ পায়। ১৯০৮ সালে গালার আদর পশ্চিমে হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় ইহার দর ৮৲ টাকা মণ ত.৪০৲ টাকা মণ চড়িয়া যায়; কিন্তু পরে পুনরায় ২০৲ টাকায় নামিয়া যায়। ১৯১৮ সালে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার গালা বিদেশে

লাক্ষা বাণিজ্যের ইতিহাস

রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২২-২৩ সালে সকল প্রকার লাক্ষা ১০ কোটি ২৬ লক্ষ, ৪৫ হাজার টাকার রপ্তানী হইয়াছিল।

পৃথিবীর মধ্যে লাক্ষার বাজারে ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দো-চীন; কিন্তু সেখানকার গালা তেমন ভাল নয়। সুতরাং ভারতের শিল্পোন্নতি হইলে লাক্ষার শত প্রকারের সামগ্রী একদিন এখানেই প্রস্তুত হইবে।

বর্মায় লাক্ষার কাজ

বর্মার গালার বার্ণিস দিয়া বাক্স, ধামা, গহনা প্রভৃতি জিনিষ তৈয়ারী হয়। এ ছাড়া বড় বড় কাজ গালার দ্বারা হইয়া থাকে; এমন কি সিংহাসন চেয়ার প্রভৃতি এই লাক্ষায় প্রস্তুত হয়। যাদুঘরে বর্মার রাজা থীঅবর (Thibaw) যে সিংহাসন আছে তাহার প্রধান উপাদান লাক্ষা। আজকাল জাপান হইতে গালায় বার্ণিস করা পাতলা কাঠ বা পোষ্টবোর্ডের তৈয়ারী থালা বাটি রেকাবী গেলাস প্রভৃতিও এদেশে আমদানী হইতেছে। লাক্ষাকীট ঢাক, পলাশ, বাবুল, কুসুমফুলের গাছ, অড়হর গাছে বাড়িতে থাকে। এই কীটের মুখ নিসৃত লালা গাছের রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গালা তৈয়ারী হয়। ইহা সাফ করিয়া নানা শ্রেণীর গালা প্রস্তুত হয়। বাংলা ও যুক্তপ্রদেশেই লাক্ষার প্রধান কেন্দ্র। কলিকাতার বন্দর দিয়া শতকরা ৯৬ ভাগ লাক্ষা রপ্তানী হয়। এই শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি পৃথক কর্ম আছে। যাহারা লাক্ষা গাছ হইতে সংগ্রহ করে তাহারা পৃথক জাতীয় লোক,—আবার যাহারা লাক্ষার সামগ্রী প্রস্তুত করে তাহারা অন্য জাতীয় লোক।

লাক্ষা পরিষ্কার ও অপরিষ্কার দুই ভাবেই বিদেশে যায়। ক্রমশই পরিষ্কার লাক্ষার রপ্তানী বেশী হইতেছে; ইহার কারণ বোধ হয়, ভারতের সস্তা মজুরীতে পরিষ্কার করা মাল সস্তায় পাওয়া যায়। লাক্ষার প্রধান খরিদ্দার মার্কিন দেশ, ও তৎপরে ইংলণ্ড, জারমেনী,

ফ্রান্স। আমেরিকার গ্রামোফোনের রেকর্ড, লিথোকালী ইলেক্‌ট্রিক ব্যবসায়ে ইহার প্রচুর ব্যবহার করে।

মোম

মৌমাছির চাষ পার্বত্য প্রদেশে বন্য জাতির মধ্যে আবদ্ধ। সেখানে অত্যন্ত আদিম প্রথানুসারে মধু ও মোম সংগৃহীত হয়। আমরা যে মধু খাই তাহার মধ্যে যথার্থ মধুর অংশ সামান্যই থাকে। অধিকাংশ স্থলে চিনির রসের সঙ্গে আলুসিদ্ধ দেওয়া মধু বাজারে বিক্রয় হয়। সেইরূপ মোমবাতি বলিতে আমরা যে জিনিষ বাজার হইতে কিনিয়া আনি তাহার সহিত মোমের সম্পর্ক নাই; সেগুলি প্যারাফিন নামে পেট্রোলিয়মের একটি উপসামগ্রী হইতে প্রস্তুত। বর্তমানে মধু ও মোম পশ্চিম হিমালয়, কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য জাতিরাই এই ব্যবসায় চালাইতেছে। দাক্ষিণাত্যে মোম ও রঙের সাহায্যে বিচিত্র বর্ণের কাপড় ছোপানো হয়; বর্মাদেশে রেশমের কাপড় রঙে ছুপাইবার পূর্বে মোমের মধ্যে ছুপাইয়া লয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মধুমক্ষিকার চাষ রীতিমত ভাবে হইতেছে। আমাদের দেশে ইহা করা খুবই সহজ; গ্রামে গ্রামে লোকে সামান্য চেষ্টা করিলে মক্ষিকাপালন করিতে পারে এবং দুই পয়সায় সংস্থান করিতে পারে।

মোমের বিচিত্র ব্যবহার

স্নেহপদার্থ—উদ্ভিজ্জ তৈল

স্নেহপদার্থ বলিতে তৈল ও ঘৃতাদি সামগ্রী বুঝায়। তৈল সাধারণত তিন শ্রেণীর হয় যথা—প্রাণীজ, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ। ঘৃত চর্বি প্রাণীজ তৈলের মধ্যে পড়ে। কেরোসিন খনিজ তৈল। সরিষা নারিকেল, রেড়ি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ।

রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২২-২৩ সালে সকল প্রকার লাক্ষা ১০ কোটি ২৬ লক্ষ, ৪৫ হাজার টাকার রপ্তানী হইয়াছিল।

পৃথিবীর মধ্যে লাক্ষার বাজারে ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দো-চীন; কিন্তু সেখানকার গালা তেমন ভাল নয়। সুতরাং ভারতের শিল্পোন্নতি হইলে লাক্ষার শত প্রকারের সামগ্রী একদিন এখানেই প্রস্তুত হইবে।

বর্মায় লাক্ষার কাজ

বর্মার গালার বার্ণিস দিয়া বাক্স, ধামা, গহনা প্রভৃতি জিনিষ তৈয়ারী হয়। এ ছাড়া বড় বড় কাজ গালার দ্বারা হইয়া থাকে; এমন কি সিংহাসন চেয়ার প্রভৃতি এই লাক্ষায় প্রস্তুত হয়। যাদুঘরে বর্মার রাজা থীঅবর (Thibaw) যে সিংহাসন আছে তাহার প্রধান উপাদান লাক্ষা। আজকাল জাপান হইতে গালায় বার্ণিস করা পাতলা কাঠ বা পোষ্টবোর্ডের তৈয়ারী থালা বাটি রেকাবী গেলাস প্রভৃতিও এদেশে আমদানী হইতেছে। লাক্ষাকীট ঢাক, পলাশ, বাবুল, কুসুমফুলের গাছ, অড়হর গাছে বাড়িতে থাকে। এই কীটের মুখ নিসৃত লালা গাছের রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গালা তৈয়ারী হয়। ইহা সাফ করিয়া নানা শ্রেণীর গালা প্রস্তুত হয়। বাংলা ও যুক্তপ্রদেশেই লাক্ষার প্রধান কেন্দ্র। কলিকাতার বন্দর দিয়া শতকরা ৯৬ ভাগ লাক্ষা রপ্তানী হয়। এই শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি পৃথক কর্ম আছে। যাহারা লাক্ষা গাছ হইতে সংগ্রহ করে তাহারা পৃথক জাতীয় লোক,—আবার যাহারা লাক্ষার সামগ্রী প্রস্তুত করে তাহারা অন্য জাতীয় লোক।

লাক্ষা পরিষ্কার ও অপরিষ্কার দুই ভাবেই বিদেশে যায়। ক্রমশই পরিষ্কার লাক্ষার রপ্তানী বেশী হইতেছে; ইহার কারণ বোধ হয়, ভারতের সস্তা মজুরীতে পরিষ্কার করা মাল সস্তায় পাওয়া যায়। লাক্ষার প্রধান খরিদ্দার মার্কিন দেশ, ও তৎপরে ইংলণ্ড, জারমেনী,

ফ্রান্স। আমেরিকার গ্রামোফোনের রেকর্ড, লিথোকালী ইলেকট্রিক ব্যবসায়ে ইহার প্রচুর ব্যবহার করে।

মোম

মৌমাছির চাষ পার্বত্য প্রদেশে বন্য জাতির মধ্যে আবদ্ধ। সেখানে অত্যন্ত আদিম প্রথানুসারে মধু ও মোম সংগৃহীত হয়। আমরা যে মধু খাই তাহার মধ্যে যথার্থ মধুর অংশ সামান্যই থাকে। অধিকাংশ স্থলে চিনির রসের সঙ্গে আলুসিদ্ধ দেওয়া মধু বাজারে বিক্রয় হয়। সেইরূপ মোমবাতি বলিতে আমরা যে জিনিষ বাজার হইতে কিনিয়া আনি তাহার সহিত মোমের সম্পর্ক নাই; সেগুলি প্যারাফিন নামে পেট্রোলিয়মের একটি উপসামগ্রী হইতে প্রস্তুত। বর্তমানে মধু ও মোম পশ্চিম হিমালয়, কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য জাতিরাই এই ব্যবসায় চালাইতেছে। দাক্ষিণাত্যে মোম ও রঙের সাহায্যে বিচিত্র বর্ণের কাপড় ছোপানো হয়; বর্মাদেশে রেশমের কাপড় রঙে ছুপাইবার পূর্বে মোমের মধ্যে ছুপাইয়া লয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মধুমক্ষিকার চাষ রীতিমত ভাবে হইতেছে। আমাদের দেশে ইহা করা খুবই সহজ; গ্রামে গ্রামে লোকে সামান্য চেষ্টা করিলে মক্ষিকাপালন করিতে পারে এবং দুই পয়সায় সংস্থান করিতে পারে।

মোমের বিচিত্র ব্যবহার

স্নেহপদার্থ—উদ্ভিজ্জ তৈল

স্নেহপদার্থ বলিতে তৈল ও ঘৃতাদি সামগ্রী বুঝায়। তৈল সাধারণত তিন শ্রেণীর হয় যথা—প্রাণীজ, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ। ঘৃত চর্বি প্রাণীজ তৈলের মধ্যে পড়ে। কেরোসিন খনিজ তৈল। সরিষা, নারিকেল, রেড়ি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ।

আমাদের রঙ ও চামড়ার কাজে বহুকাল হইতে তৈল ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। দৈনিক জীবনে তৈলের প্রয়োজনের

তৈলের প্রয়োজন

ব্যবহার বহুবিধ; আহার করিতে, গায়ে মাখিতে, পোড়াইতে, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন উপাদানের তৈল ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে নারিকেল ও তিলের তেল লোকে মাথায় মাখে, মাদ্রাজে ও বোম্বাইএ উভয় তেল লোকে খায়। সাবান যদিও পূর্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না—আজকাল ইহার প্রচলন খুবই বাড়িয়া গিয়াছে; সাবানের কাজে চবি ও তেলের প্রয়োজন খুব বেশী।

পূর্বে আলো জ্বালাইবার জন্য দেশীয় উদ্ভিজ্জ তৈলই ব্যবহৃত হইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের গৃহের ত কথাই নাই, বড় লোকের বৈঠকখানায় এমন কি সাহেবদের তোষাখানায় রেঢ়ী বা সরিষা তেলের সেজ আলো জ্বলিত। আমেরিকা ও রুশ হইতে সস্তায় কেরোসিন তেল আমদানী হইতে আরম্ভ হইলে ভারতের উদ্ভিজ্জ তেলের প্রচলন কমিয়া আসে। বর্মায় কেরোসিন খনি আবিষ্কৃত হইবার পর ইহার প্রচলন আরও বাড়িয়াছে। কেরোসিন ভারতে মহা পরিবর্তন সংঘটিত করিয়াছে।

ভারত সাম্রাজ্যের তৈল-বীজের সম্পদ ও মূল্য কয়লা ও অন্যান্য খনিজ ধাতুর চেয়ে কিছু কম নহে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাবান মানুষের জীবনের নানা কাজে লাগিতেছে; উদ্ভিজ্জ

উদ্ভিজ্জ তৈলের ব্যবহার

তৈল বা চর্বিই ইহার প্রধান উপাদান। দামী ভাল তৈল রান্নার কাজে লাগে। এক সময়ে য়ুরোপে জলপাইএর তেল রান্নায় লাগিত। এখন চীনাবাদামের তেলই লোকের বেশী প্রিয়। ধূমহীন বারুদ ও ডিনেমাইট প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে গ্লিসেরিনের প্রয়োজন এবং ইহার অধিকাংশই সাবান বা মোমবাতির কারখানা হইতে পাওয়া যায়।

মাখমের পরিবর্তে য়ুরোপ ও আমেরিকায় উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হওয়ায় তৈলবীজের বিক্রয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে চীনাবাদামের তৈল ঘৃতের মত জমাট বাঁধিয়া ফেলা যায়। গাড়ীর চাকা ও কলে 'তেল' দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে তৈল লাগে। ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে তেলের প্রয়োজন কম নহে।

ভারতের প্রধান প্রধান তৈলবীজ এইগুলি :—মসিনা, তুলা, নারিকেল,সরিষা, চীনাবাদাম, রেঢ়ী, তিল,মহুয়া। পরিশিষ্টের তালিকায় কি পরিমাণ তৈলবীজ, তৈল ও তৈল-খৈল বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষ কাঁচা মালই বিদেশে প্রেরণ করিতেছে; পরিষ্কার তৈল প্রেরণ না করিয়া কেবলমাত্র তৈলবীজ ও খৈল পাঠাইয়া নানাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

প্রধান প্রধান তৈল

য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই শিল্পের খুবই উন্নতি সাধন হইয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি কলকব্জা ও রাসায়নিক বিদ্যার সাহায্যে বীজের খোসা ছাড়াইয়া পেষা হওয়ায় নির্মল তৈল বাহির হইতেছে। খৈলও একটা খুব দামী জিনিষ। রেঢ়ীর খৈলের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ থাকায় সেগুলি ক্ষেতের সারে লাগানো হয়; অপর বীজের খৈল গোরু ভেড়ার খুবই উত্তম আহার্য্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

কয়েকটি কল ছাড়া ভারতের অধিকাংশ তৈল বীজ দেশীয় ঘানিতে মাড়া হয়। ইহার ফল সন্তোষজনক নহে। খৈলের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত তৈল থাকিয়া যায়। এই খৈল না গোরুর ভাল আহার্য্য, না উপকারী সারের পক্ষে। এ ছাড়া বীজের খোসা ছাড়ানো হয় না বলিয়া তৈল নির্মল হয় না। ইহার মধ্যে অম্লরস থাকিয়া যায় এবং সহজে নষ্ট হইয়া যায়।

তৈল ও খৈল

ভারতবর্ষ এখন বাণিজ্যের দরবারে কেবলমাত্র কাঠ কাটিবার ও জল টানিবার অধিকার পাইতেছে; এই শোচনীয় দশা হইতে তাহাকে উঠাইতে হইলে ভবিষ্যতের শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণকে কতকগুলি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

তৈল শিল্পের সুবিধা অসুবিধা

১। ভারতের বাহিরে যেসব স্থানে কাঁচা মাল যায় কোথায়ও তাহার জন্য শুল্ক লাগে না। কিন্তু তৈয়ারী সামগ্রীর উপর রীতিমত শুল্ক আছে। জারমেনী বিনা শুল্কে নারিকেল লইত, কিন্তু নারিকেল তৈল দেশে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া উচ্চ শুল্ক বসাইয়া দিয়াছিল। এরূপ সব দেশেই।

বীজ ও তৈলের উপর বিভিন্ন শুল্ক

২। বিদেশে কাঁচামাল চালানের ভাড়া কম। ভারতবাসীদের নিজেদের জাহাজ নাই। এমন কি খৈল পাঠানোর ভাড়া সাধারণ কাঁচা মাল হইতে অধিক—তৈলাদির ভাড়া ত খুবই বেশী; সুতরাং বর্তমান অবস্থা শিল্পোন্নতির মোটেই অনুকূল নহে। ১৯১৩-১৪ সালে ৩০ লক্ষ গ্যালনের উপর তৈল প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৯২২-২৩ সালে দেখা যায় যে রপ্তানী তৈল ২৩ লক্ষ গ্যালন মাত্র।

ভাড়ার তারতম্য

৩। যুদ্ধের পূর্বে জারমেনী ভারতের বড় খরিদ্দার ছিল। ১৯১৪ সাল হইতে ফরাসী সেই কাজ করিতেছিল; কিন্তু যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড তাহার সাম্রাজ্যের তৈলবীজ স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া নিজ দেশেই তৈল উৎপন্ন করিতেছে। ফরাসী-সরকার তাহার উপনিবেশের নানাস্থানে তৈলবীজ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকাও এ বিষয়ে মন দিয়াছে; সুতরাং ভারতের অনেকগুলি তৈলবীজ সম্বন্ধে এক চেটিয়া বাণিজ্য কমিয়া যাইবে।

বিদেশের চেষ্টা

৪। ঘানির অসুবিধার কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈল বাহির করিতে না পারিলে বিদেশে এ প্রকার জঘন্য জিনিষের আদর হইবে না।

৫। ভারতীয় তৈলের মধ্যে অম্ল (অ্যাসিড) থাকায় ইহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

ভারতবর্ষের সমক্ষে এইরূপ আরও অনেক সমস্যা আসিবে। ভারতের কৃষিক্ষেত্রগুলির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া আসিতেছে অথচ খৈলের ন্যায় এমন উত্তম সার বিদেশে চালান হইতেছে; তৈলবীজ চলিয়া যাওয়াতে বিদেশের কৃষক ব্যবসায়ীরা লাভবান্ হইতেছে। সমগ্র ভারতের বার্ষিক তৈলবীজ ৫০ লক্ষ টন্ উৎপন্ন হয়; ইহার মোট মূল্যের আন্দাজ ৫ কোটি পর্য্যন্ত। যুদ্ধের পূর্বে (১৯১৩-১৪ সালে) বার্ষিক রপ্তানী সমগ্র উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ ছিল। ইহার উপর যদি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার গ্যালন্ তৈল ও ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন্ খৈল ধরা হয় তবে ঐ বৎসরে তৈল বীজের রপ্তানী মূল্য ১ কোটি ৮০ লক্ষ পর্য্যন্ত হয়; ১৯২২-২৩ সালে সামগ্রীর পরিমাণ রপ্তানী কম হইলেও মূল্য হইয়াছিল ১,৯৫,০০,০০০ পাউণ্ড।

পূর্বইই বলিয়াছি তৈলের রপ্তানী বিদেশে কমিতেছে; ১৯১৩-১৪ সালে প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ডের তৈল বিদেশে গিয়াছিল; ১৯২২-২৩ সালে ৩½ লক্ষ পাউণ্ড। খৈলের রপ্তানী প্রতি বৎসর বাড়িতেছে। ইহার কারণ পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি।

মসিনা

মসিনা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্বে গড়ে প্রায় ৫ লক্ষ টন্ করিয়া মাসিক উৎপন্ন হইত; যুদ্ধের সময়ে উহা কমিয়া যায়। যুদ্ধের পর বাড়িয়াছে। ১৯২২-২৩ সালে ৩৩,৫৮হাজার একারে ৫,৩২হাজার টন্ মসিনা উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে এখন ভাল মসিনার তেল পাওয়া যায়; পূর্বে এই

মসিনার তৈল বিলাত হইতে আসিত। মসিনার তেল শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় বলিয়া রঙের কাজে ইহা খুব প্রয়োজনে লাগে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ জমিতে মসিনা হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ জমিতে সমগ্র উৎপন্নের ৫০ ভাগ হয় দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেনটাইনে। ভারতবর্ষে পৃথিবীর শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে মাত্র। ২০ ভাগ উৎপন্ন হয়। মার্কিন রাজ্যে জমির পরিমাণের অনুপাতে উৎপন্ন বেশী হয়। হয় না কেবল ভারতের জমিতে। (Das.—*ibid*, p. 39)

তুলাবীজ হইতে তেল করিবার ব্যবসায় এখনও তেমন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বোম্বাইতে সামান্য চেষ্টা হইয়াছে।

তুলাবীজ

বিলাতে তুলাবীজের তৈল হয় বটে, কিন্তু আমেরিকায় ইহার উন্নতি খুবই হইয়াছে। ভারতে যে পরিমাণ তুলা হয় তাহা হইতে প্রতিবৎসর ২ লক্ষ টন্ তৈল হইতে পারে; কিন্তু ব্যবস্থার অভাবে এদেশে সামান্য লাভ হয়। ভারতীয় তুলাবীজ হইতে শতকরা ১৮ ভাগ তৈল নির্গত হয়—আমেরিকান বীজ হইতে ২০ ভাগ বাহির হয়। য়ুরোপে ও আমেরিকায় পরিস্কার তৈল লোকে জলপাইএর তৈলের বদলে রান্নায় ব্যবহার করিতেছে। খৈলের একাংশ গোরুতে খায়, অপরাংশ ময়দার বদলে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারত হইতে সকল বৎসরে এক পরিমাণ তুলাবীজ রপ্তানী হয় না। ১৯২২-২৩ সালে ১,৮৩,০০০ টন্ তুলাবীজ, (মূল্য ১৩,১৪,৮৯৯ পাউণ্ড) বিদেশে যায়; ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে যায় শতকরা ৯৯ভাগ। তুলাবীজ-তৈল বিদেশে ক্রমেই কম যাইতেছে। ১৯১৯-২০ সালে ২৫,৭৬২ পাউণ্ড মূল্যের তৈল যায়, ১৯২২-২৩ সালে মাত্র ২ পাউণ্ড মূল্যের তৈল যায়। (Cotton—Handbook p. 186).

সরিষার বীজ ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মায়। সরিষার

মধ্যে ৪০।৪৫ ভাগ তৈল থাকে। ইহার কি কি ব্যবহার হয় তাহা আমরা ভাল করিয়া জানি। মার্কিন রাজ্য সরিষা বীজের প্রধান খরিদ্দার; তারপরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইতালি ইত্যাদি। ভারতের কালসরিষার ও রাইসরিসার মোট উৎপন্ন ১২,৬০,০০০ টন্। ইহার মধ্যে রাইসরিষার শতকরা ২০ ভাগ বিদেশে যাইত। সরিষার খৈল সারের জন্য ইংলণ্ড, জাপান ও ষ্ট্রেট্‌ সেট্‌লমেণ্টের বাগিচার জন্য প্রচুর পরিমাণে যাইতেছে।

সরিষা ও তিল

তিল কেবল যে ভারতেই হয় তাহা নহে; যবদ্বীপ, চীন, জাপান, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকায় জন্মায়। ইহার মধ্যে ৪৪ ভাগ তৈল আছে। কিন্তু ভারতীয় প্রথানুসারে সমস্ত তৈল নির্গত হয় না। এই তৈল রান্নায় ও মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তিলের তৈল বাহিরে রপ্তানী হয় না; তবে তিলবীজ প্রচুর পরিমাণে বাহিরে চলিয়া যায়। ফ্রান্সে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল সাবানে ও কলে ব্যবহৃত হয়। খৈল গোরুতে খায়।

চীনাবাদামের তৈল পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তৈয়ারী হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বর্মাতে ইহা প্রধানত হয়। বাংলা দেশে চীনাবাদাম অপেক্ষাকৃত উষর ভূমিতে উৎপন্ন হয়। খুব ভাল তেল করিতে হইলে প্রথমে খোলা ভাঙিয়া লাল খোশা উঠাইয়া লইতে হয়। ভারতবর্ষ হইতে যে-তেল বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা মোটেই খাদ্যাদিতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। সাধারণত সাবানে এই তেল লাগে। পিষ্ট খৈল গোরু ছাগলের খুব ভাল খাদ্য, ময়দার সঙ্গে মিশাইলে ইহা খুবই উত্তম মনুষ্যখাদ্য হয়। ১৯২২-২৩ সালে ৩৬ হাজার টন্ যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ভারতে প্রায় ২১ লক্ষ একার জমিতে চীনাবাদাম উৎপন্ন হইত। ১৯২২-২৩ সালে ২৫ লক্ষ একারের উপর জমি চাষ হয়। ১৯২২ ২৩ সালে বীজ ২,৬৭,০০০টন্

চীনাবাদাম

খৈল ৬৪০ ০ টন্ ও তৈল ৫৩,০০০ গ্যালন রপ্তানী হয়। ১৯২১ হইতে ১৯২৩ খৈলের রপ্তানী বাড়িতেছে ও তৈলের রপ্তানী কমিতেছে।

রেঢ়ীর তেল আকাশযানের ইঞ্জিনের কলে লাগে বলিয়া য়ুরোপে ইহার দাম খুব চড়িয়াছে। ১৯১৪ সালে ইংলণ্ডে ১৫ হাজার টন্ তেল তৈয়ারী হয়। ১৯১৮ সালে ইহার তিন গুণ তেল তৈয়ারী হইয়াছিল। বলিতে গেলে একমাত্র ভারতবর্ষেই রেঢ়ীবীজ উৎপন্ন হয়। অথচ ভারতের বাহিরেই অধিকাংশ বীজ রপ্তানী হইয়া যায়। রেঢ়ীর তেল কলে দিবার জন্য, ঔষধে, সাবানে এবং চামড়ার কাজেও লাগিয়া থাকে। রেঢ়ীর খৈল খুব ভাল সার কিন্তু বিষাক্ত বলিয়া গোরুর আহারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ১৯২২-২৩ সালে ৮৩,৬১৩টন্ রেঢ়ী বীজ (মূল্য ১২,২২,৪৩২ পাউণ্ড) বিদেশে রপ্তানী হয়। রেঢ়ী তেল ছয় লক্ষ গ্যালনের কিছু বেশী বিদেশে গিয়াছিল।

রেঢ়ী

নারিকেল তেল সম্বন্ধে বিশেষভাবে অন্যত্র আলোচনা হইয়াছে।

মহুয়াবীজ—মহুয়া গাছ হইতে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুর ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে আছে। যুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সে মহুয়া রপ্তানী হইত, ইহারও খৈল বিষাক্ত এবং সার ছাড়া আর কোনো উপায়ে ব্যবহার করা যায় না; এদেশে চর্বির বদলে মহুয়ার তেল ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে জারমেনী ও ফ্রান্স ইহার প্রধান খরিদ্দার।

মহুয়া

এগুলি ছাড়া ভারতবর্ষে আর অনেক রকমের বীজ পাওয়া যায়, যেমন সূর্য্যমুখী বীজ, রারার বীজ, কোকাম, নিম, চালমুগরা প্রভৃতি; ইহাদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য হিসাবে লাভজনক করা যাইতে পারে।

উদ্বায়ী তৈল

ভারতবর্ষ ও পূর্বদেশসমূহ বহুকাল হইতে নানাপ্রকার উদ্বায়ী তৈলের জন্য বিখ্যাত। যে-তেল খোলা রাখিলে 'উপিয়া' যায়,

তাহাকে উদ্বায়ী তেল বলে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রায় ১৪ রকমের তেল পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দারুচিনি, এলাইচির তেল, চন্দন, এলাইচি পাতার তেল, লেবুর তেল, খশখসের তেল, লেবুঘাসের তেল, মোতিয়া তেল, ধনের তেল, জেয়ান ও আদার তেল প্রধান। ইহার মধ্যে দারুচিনি, চন্দন, জোয়ান, মোতিয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ও সিংহলে উৎপন্ন হয়; অন্য তেলগুলির উপাদান পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়।

যুদ্ধের পূর্বে লিমনঘাস, মোতিয়া, আদাপাতা (Ginger grass) লেবুর তেল এ দেশ হইতে রপ্তানী হইত। কিন্তু আর সমস্তই কাঁচা অবস্থায় বিদেশে যাইত। উপর্য্যুক্ত তেলগুলি যে এ দেশে চোলাই করা হইত—তাহার বিশেষ কারণ আছে। ঘাস বিলাত ও আমেরিকা পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার খরচে পোষায় না এবং অতদূর যাইতে যাইতে শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ১৯১৪ সালের পর হইতে উদ্বায়ী তৈলের চোলাই আরম্ভ হইয়াছে।

চন্দন তৈল ইহার মধ্যে খুব দামী; ইহার ব্যবহার ও প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। চন্দন গাছ শিকড় বিস্তার করিয়া অন্যান্য গাছ হইতে তাহার রস সংগ্রহ করে। শিকড়ে ও গুঁড়িতে চন্দনের গন্ধকোষ থাকে।

চন্দনতৈল

ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরের কম চন্দনের গাছ কাটিয়া তৈল করিবার উপযুক্ত হয় না। দেড় হইতে চারি হাজার ফিট উচ্চভূমিতে যে-গাছ হয় তাহার গন্ধ ভাল। মান্দ্রাজ প্রদেশের দুইটি জেলায় ও মহীশূরে এবং কুর্গে চন্দন প্রধানত পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে মহাশূর সরকারের চন্দন বন অধিক। যুদ্ধের পূর্বে সরকার বনভূমি নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১৯১১ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর প্রায় ২॥—৩ হাজার টন্ কাঠ ৫০০৲ টাকা টন্ হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল। তারপরে দুই বৎসর জারমেন বণিকদের এই ব্যবসায় এক চেটিয়া করিয়া

লইবার চেষ্টার ফলে দাম প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়। যুদ্ধারম্ভের পরেও দুই বৎসর বাজার দর খুব চড়া থাকিল।

চন্দনের তৈল চোলাইএর ব্যবসায় বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু দেশীয় প্রথানুসারে প্রায় সম্পূর্ণ তৈলাংশের ১০।১২ ভাগ কাঠের মধ্যে থাকিয়া যায়। মহীশূরে এযাবৎকাল চোলাই করা নিষেধ ছিল। মান্দ্রাজের দুই এক জায়গায় মাত্র হইত। যুক্তপ্রদেশে কানৌজে চন্দনের তেল আতরে ব্যবহার করিবার জন্য চোলাই করা হয়।

১৯১৬ সালে মহীশূর সরকার চন্দন চোলাইএর কল স্থাপন করেন এবং মাসিক দুই হাজার পাউণ্ড তেল তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

মহীশূরের চেষ্টা

দুই বৎসরের মধ্যে মাসিক উৎপন্ন ৬ হাজার পাউণ্ড হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আর একটি কল তৈয়ারী হইতেছে। সেখানে মাসিক ২০ হাজার পাউণ্ড তেল তৈয়ারী হইবে।

চন্দনতেলের দর বিলাতে যুদ্ধের পূর্বে ছিল ৩০৲ টাকা সের। ১৯১৫ সালে ৫০৲ টাকা, ১৯১৭ সালে ৮০৲ টাকা এবং আরও পরে ১০০৲ টাকা সের পর্য্যন্ত উঠে। এই তেল সমস্তই বিলাতে চোলাই হইত। ইতিমধ্যে মহীশূর সরকার স্বয়ং এই ব্যবসায়ে নামিলেন। এই বিরাট কারখানার ভার একজন দেশীয় রসায়নবিদের উপর ন্যস্ত আছে; তাঁহার অধীনের কর্মচারী ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ভারতবাসী। বিলাতের ডাক্তার ও রাসায়নিকগণ সকলেই মহীশূর সরকারের চন্দন তৈল প্রস্তুতের প্রণালীর প্রশংসা করেন। সরকার ১৯০১সালে কাষ্ঠ নিলামে বিক্রয় করিয়া ১৩লক্ষ টাকা, ১৯১২-১৩ সালে ২৬॥ লক্ষ টাকা লাভ করেন; কিন্তু ১৯১৮-১৯ সালে কাঠ ও তেল বিক্রয় করিয়া সরকারের ৩৯ লক্ষ টাকা লাভ হয়। চন্দন তৈল হইতে যেসকল ঔষধ হয় তাহা কেমন করিয়া এ দেশেই প্রস্তুত করা যায় সে বিষয়ে মহীশূর সরকার গবেষণা করিতেছেন। ১৯২২-২৩ সালে ৫৬ হাজার পাউণ্ডের চন্দন কাঠ ও ১,৫৭ হাজার

পাউণ্ডের চন্দন তৈল বিদেশে রপ্তানী হয়। কাঠের প্রধান খরিদ্দার জারমেনী, আমেরিকা ও ইংলণ্ড। ইংলণ্ড অতি সামান্য চন্দন ক্রয় করে। তবে চন্দন তৈলের প্রধান ক্রেতা ইংলণ্ড।

জোয়ান

জোয়ান হইতে থাইমল নামে এক প্রকার ঔষধ তৈয়ারী হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যারামে এই ঔষধের খুব প্রয়োজন। যুদ্ধের পূর্বে এদেশ হইতে অধিকাংশ জোয়ান জারমেনীতে রপ্তানী হইত। বর্তমানে অনেকগুলি থাইমলের কারখানা হইয়াছে। জোয়ান হইতে থাইমল ছাড়া আরও অনেক প্রকার সামগ্রী হয়। এই শিল্প ও বাণিজ্য দেশ মধ্যে আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত। বিদেশে যাহাতে এই বীজ প্রেরণ করিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই সে বিষয়ে দেশের ধনী বণিকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

দাক্ষিণাত্যের দারুচিনি তৈল ও যুক্যালিপ্টাস তৈল উল্লেখযোগ্য। উটাকামণ্ডে প্রকাণ্ড একটি কারখানাতে যুক্যালিপ্টাস তৈল চোলাইএর আয়োজন হইয়াছে।

রঙের তেল

রঙের জন্য বহুপ্রকারের তেল প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে মসিনার তেল ব্যবহারের প্রচলন সব চেয়ে বেশী। মসিনা ও তিসির অধিকাংশ বীজ বিদেশ রপ্তানী হইয়া যায়। এ ছাড়া পাইন গাছ হইতে যে ধুনা বাহির হয় তাহা চোয়াইয়া তারপিন তেল প্রস্তুত হয়। ব্যথা মালিস প্রভৃতি কাজে তারপিনের প্রয়োজনের কথা আমরা জানি। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই শিল্প খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভবাল, যুক্ত-প্রদেশ, জাল্লো ও পঞ্জাবে তারপিন তেল চোলাই করিবার কারখানা আছে। আমেরিকা হইতেও এই তেল আসিয়া থাকে। কিন্তু দেশের ভিতর এই শিল্পের উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমেরিকার চালান কমিতেছে।

তারপিন তেল

১৯০০ সালে ১,৬০০ গ্যালন, ১৯১০ সালে প্রায় ৩০

হাজার গ্যালন ও ১৯১৭ সালে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার গ্যালন তারপিন তেল এ দেশে তৈয়ারী হয়। কিন্তু ইহা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলিয়া আমেরিকা হইতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার গ্যালন তারপিন তৈল আমদানী করা হয়। রোজিন নামে একটি ধুনাজাতীয় সামগ্রী পাইন হইতে নিষ্কাশিত হয়; রঙের কাজে ইহার প্রয়োজন লাগে।

মোমযান

ভারতবর্ষের নানা স্থানে মোমযান নামক একপ্রকার কাগজ পাওয়া যায়। Safflower এর তেল বহু ঘণ্টা ফুটাইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া দিলে রোগান নামে এক সামগ্রী পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ রঙের সহিত মিশ্রিত করিয়া বহুবিধ কাজে ইহাকে লাগানো হয়। ভারতে অয়েল-ক্লথ বা জলসহা সামগ্রী প্রস্তুত করা যায় তাহার নিদর্শন দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বুদ্ধি ও শক্তি এসব জিনিষের উন্নতির দিকে নিয়োজিত হয় নাই।

সুগন্ধি নির্য্যাস

ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশসমূহ এককালে নানা প্রকার সুগন্ধি নির্য্যাস, তৈল, আতরের জন্য জগৎবিখ্যাত ছিল। মুঘল শাসন সময়ে এই সকল সামগ্রীর আদর ও প্রচলন দুই দেশব্যাপী ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেশীয় সামগ্রীর আদর কি পরিমাণ কমিয়াছে তাহা বিদেশ হইতে আমদানী নির্যাসে তালিকা দেখিলেই বুঝা যায়। বর্তমানে জৌনপুর, কনৌজ, গাজিপুর এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর এই ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে বোম্বাই ও কলিকাতা বিদেশী এসেন্স আমদানীর প্রধান কেন্দ্র। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার নির্য্যাসপূর্ণ বীজ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে এবং তাহারই নির্য্যাস নানা বিলাতী ও ফরাসী নামে ফিরিয়া আসিয়া শত গুণ দামে বিক্রয় হইতেছে।

প্রাণীজ তৈলাদি পদার্থের মধ্যে চর্বি, মাছের তেল, মাখম, ঘি প্রভৃতির বাণিজ্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

তৈলবীজ, তৈল এবং খৈলের রপ্তানী।

	পরিমাণ—হাজার টন্			মূল্য—হাজার টাকা		
	প্রাক যুদ্ধ	যুদ্ধ পর্ব	১৯২৫	প্রাক যুদ্ধ	যুদ্ধ পর্ব	১৯২৫
বীজ-সুগন্ধি	১০	৮	১২	২০,৫৭	২৪,১৬	২৪-২৫
মষিণাবীজ	৩.৭৯	২,৭০	৩,৭১	৭,৯৮,৯০	৪,৯৪,৯৪	৯,৭৪,৩৯
চীনাবাদাম	২,১২	১,১৯	৩,৭৬	৩,৫২,৫৭	১.৯১,১৭	১০,৬৭,০৫
রেপবীজ	২,৭৩	০১	২,৬১	৪,১৪,৬০	১,৪৩,০১	৬,০৩,৫৭
তিল জিঞ্জিলি	১,১৯	৩৩	৩১	২,৪৮,১৫	৬৭,৩৫	৯৪,৪৯
রেঢী	১,১৪	৮৯	৯৫	১,৬৬,৪৩	১,৪৭,৫৫	২,৮৮,৬৬
নারিকেল তৈল	৩১	১৬	...	১,১০,৪৩	৬০,৭৩	২,০০
তুলাবীজ	২,৪০	৬৯	১,৬১	১,৭৯,৯৮	৫০,২৫	১,৯১,২৯
সরিষা	৪	৩	৪	১০,০৮	৯,১৬	১৪,৪৮
মহুয়া	২৯	৩	২	৪২,৫৩	২,০৪	৩,৬৭
পোস্ত	৩৩	৫	৬	৬৯,৪১	৯,৫৮	১৬,২০
অন্যান্য বীজ	৯	২	৯	২৩,২৩	৬,৪৮	১৯,৫৬
মোট বীজ	১৪,৫৩	৭০৮	১১,৭৭	২৪,৩৬,৯৭	১২,১৭,৪২	৩৩,১৬,৮৫
খৈল	১,৪০	১,১৭	১,৯৫	১,০১,৩৭	৯৪,৮৫	২,২০,০০
নির্য্যাস(গ্যালন)	৪৬	৫১	৯১	১১,৮৮	১২,৮৪	৫০,১৫
সরিষার তৈল	১১.১৫	১৫,৬৪	৪,৯৭	১৫,২২	২৮,২২	১৪,৮০
নারিকেল তৈল	১৭৩৭	৩২০৯	১,৯৫	৩১,১৫	৬৫,৩৮	৩,৬১
অন্যান্য	১১,৭৫	২০,৪৫	৭,১০	১৯,৭২	৪৯,৬৬	২৩,০৭

তৈল রপ্তানী যুদ্ধের পর প্রতি বৎসর কমিতেছে। তৈলবীজের রপ্তানী বাড়িতেছে।

রঙরেজ্ ও ছিপিকর্ম

বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্রই ছোপানো বা কাপড়ের প্রচলন দেখা যায়। কাপড় রঙ করিবার ব্যবসায় বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদেশী ও বিশেষভাবে জার্মানীর (আনালিন) কৃত্রিম রঙের আমদানীর ফলে এই শিল্পের অধঃপতন খুবই হইয়াছে। ছিপিকর্ম যে ক্রমেই ধ্বংস পাইতেছে একথা সরকারও স্বীকার করেন। বিদেশী রঙের যে এত প্রচলন হইয়াছে তাহার কারণ সেগুলি সহজে করা ও সস্তায় পাওয়া যায়। এছাড়া দেশী অনেক রঙ পাকা নয়—এই সব কারণে দেশী রঙের শিল্পের অবনতি। কিন্তু ইহার দ্বারা যে কেবল আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে—দেশের শিল্পীদের রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ নষ্ট হইতেছে। নষ্ট শিল্প বাণিজ্য উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু বিকৃত রুচিকে সুন্দর করা দুঃসাধ্য। রঙরেজ ও ছিপিকারগণ এক্ষণে দেশের রঙ খুবই কম ব্যবহার করে, প্রাচীন রঙে রঙে মিলাইবার কায়দাও তাহারা প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে।

রঙের কারবারের অবনতি

বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও এখন নিম্নলিখিত রঙগুলি দেশের মধ্যে চলিতেছে। নীলরঙ এককালে বাংলাদেশে খুব উৎপন্ন হইত। বিদেশে এই নীল রপ্তানী হইত—কারণ তখনো কৃত্রিম নীল জার্মানীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই নীল উৎপন্ন করিবার জন্য নীলকরদের উপদ্রবের ইতিহাস 'নীলদর্পণে' স্বর্গীয় দীনবন্ধুমিত্র অমর করিয়া রাখিয়াছেন। বর্তমানে বিহারে কয়েকটি জিলায় এখনো নীল উৎপন্ন হয়; সেগুলি সাহেবদেরই অধীন। ছিপিকারগণ নীল রঙে সাজিমাটি, চুণ ও কিয়দ পরিমাণ গুড় মিশাইয়া গুলিয়া তিন চারিবার কাপড় ডুবাইয়া ডুবাইয়া তোলে।

নীল রঙ

নীল রঙ প্রায় ৩০০ রকম গাছ হইতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভারতে প্রায় ৪০ রকমের গাছ আছে। পশ্চিম ভারতেই ২৫ রকমের গাছ দেখা যায়, কিন্তু বাঙ্গালা বিহারের দিকে নানা জাতের নীল না থাকিলেও উৎপন্ন এই দিকেই বেশী হয়।

নীল কারবারের ইতিহাস

য়ুরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নীল পশ্চিম ভারত হইতে রপ্তানী হইতে থাকে। তারপর কিছুকাল মাঝে নানা কারণে ইহার বাণিজ্য মন্দা পড়ে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝ হইতে পূর্বদ্বীপ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া যায়—তখন এক মাত্র ভারতবর্ষের উপর পৃথিবীর নীল রঙের সরবরাহের ভার পড়ে। বাংলাদেশের নরম মাটিতে নীলের চাষ সহজে হইবে ভাবিয়া এখানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়। কিছুদিনের মধ্যে কুঠিয়াল ও সরকারের মধ্যে যে বিবাদ বাঁধে তাঁহার ইতিহাস বাঙ্গালীর অজানা নাই। চাষীরা নীল বুনিতে অস্বীকৃত হইল—সরকারও কুটিয়াল-দের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন এই শিল্প বাংলা হইতে উঠিয়া বিহার ও যুক্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানে ইহা অন্য কারণে টিকিতে পারিল না। ১৮৯৭ সালে জার্মানীর রঙ বাজারে নামে—সেই হইতে নীলের চাষ ও শিল্পের সর্বনাশ সুরু হইয়াছে। জার্মানী হইতে আনালিন রঙ আসিয়া প্রতিযোগিতা করিতে লাগিল এবং সে প্রতিযোগি-তায় নীল ও অন্যান্য রঙের কারবার টিকিতে পারিল না। যুদ্ধের সময়ে বিদেশী রঙের আমদানী বন্ধ হইলে নীলের কারবারের উন্নতি কেমন করিয়া হইতে পারে এই লইয়া দিল্লীতে বিশেষজ্ঞদের এক অধিবেশন হয় এবং তাহাতে কৃষির বৈজ্ঞানিক গবেষণার ও কারবারের দিক হইতে উহার উন্নতি বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই শেষ। পরযুগে নীলের চাষ তাহার প্রমাণ।

নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত বরাবর

নীলের চাষ রপ্তানী ও তাহার মূল্য সর্বত্রই কমিয়াছিল ; কিন্তু যুদ্ধারম্ভে নীলের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অন্যান্য রঙ

লাক্ষার রঙ—সাজিমাটির সঙ্গে লাক্ষা গুঁড়া মিশাইয়া জলে ফুটাইয়া ফুটন্ত রঙে কাপড় ছোপানো হয়। ইহাতে পাকা লাল রঙ হয়। হলুদ গুঁড়া করিয়া সাজিমাটির সঙ্গে মিশাইয়া ফিটকারী দিয়া হল্‌দে রঙ তৈয়ারী হয়।

কুসুম ফুলের রঙ।—ছোট ছোট ফুল ভাল করিয়া প্রথমে শুকানো হয় ; পরে ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া হল্‌দী ছোপটা দূর করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেও সাজিমাটি দিয়া লাল রঙ বাহির করা হয়। বিলাতি ইল্‌দি নামে একবার হল্‌দে রঙ পাওয়া যায়—রেশম রঙ করিতে এই হল্‌দি ব্যবহৃত হয়। পলাশ, অল, হরিতকী * হইতেও রঙ হয়। দেশী রঙের প্রধান দোষ হইতেছে যে সেগুলি পাকা নয়—বিলাতী রঙ পাকা ; সেই জন্য বাজারে দেশী রঙ টিকিতে পারে নাই। এ দেশের প্রাচীন বস্ত্রের নমুনা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে এক কালে রঙের কার্য্য কি প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মান্দ্রাজের 'কালিকো' কাপড়ের ছাপা এককালে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে এককালে সুন্দর সুন্দর রঙীন রুমাল বিদেশে রপ্তানী হইত, কিন্তু এখন সে শিল্প ধ্বংসমুখীন। মোটের উপর ভারতের রঙের অবস্থা খুবই শোচনীয় ; কেমন করিয়া এই শিল্প পুনরায় দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তা করুন।

---

* হরিতকীর রপ্তানী

	হন্দর	মূল্য টাকা
প্রাক্ যুদ্ধ পর্ব	১৩,৯৯,০০০	৫৯,৭৮ হাজার
যুদ্ধ পর্ব	১০,৫৮,০০০	৫৬,৫১ হাজার
১৯২৪-২৫	১৩,৩৯,০০০	৭৯,৬৬ হাজার

প্রাণীজ শিল্প সামগ্রী

প্রাণীজ শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে চামড়া, হাড় ও শিঙের কাজ পড়ে। ইহার মধ্যে চামড়া প্রধান।

সরকারী আন্দাজ অনুসারে ভারতে গো-মহিষ প্রায় ১৮ কোটী ও ছাগ মেষ প্রায় ৯ কোটী আছে। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে উক্ত সংখ্যা বেশী না হইলেও চামড়া ও ছালের ব্যবসায়ের পক্ষে ইহা নিতান্ত কম নয়। চামড়ার ব্যবসায় দুটি পৃথক শিল্প; একটি হইতেছে কাঁচা চামড়া ও ছাল তৈয়ারী করিয়া পাকানোর কাজ; অপরটি হইতেছে পাকা চামড়া হইতে সামগ্রী প্রস্তুত। আমাদের দেশে চামড়ার কাজ চামার ও মুচিরা করে; ইহারা হিন্দু সমাজের প্রায় সর্বনিম্ন স্তরে পড়িয়া আছে। গ্রামের ভাগাড় হইতে মরাগোরুর চামড়া পাইবার জন্য চামারেরা জমিদারের কাছ হইতে জমি ইজারা লইয়া থাকে। সেখান হইতে চামড়া সংগ্রহ করিয়া তাহারা অত্যন্ত আদিম প্রথানুসারে সেগুলিকে সাফ করে। চামড়া সাফের প্রধান উপাদান বাব্‌লা গাছের ছালের ক্বাৎ ও চূণ। হরিতকীর কষও ইহার

চামড়া

	নীলের চাষ একার	রপ্তানীর পরিমাণ হন্দর	রপ্তানীর মূল্য হাজার টাকা
১৯০১-০২	৭৯১,০০০	৮৯,৭০০	১,২৩,৪০
১৯১০-১১	২৭৬,০০০	১৬,৯০০	২২,৩৫
১৯১৩-১৪	১৭৬,০০০	১৫,০০০	২৯,৯২
যুদ্ধ পর্ব	১৭৬,০০০	৩১,০০০	১,৫৭,৩৫
১৯২৪-২৫	১৭৬,৬৭৩	৩,০০০	১০,৯২

অন্যতম উপাদান। কিন্তু দেশীয় প্রথানুসারে যে চামড়া হয় তাহ আদৌ ভাল নহে, ইহাতে চুণ বেশী দেওয়া হয়, লোম ভালরূপ সাফ হ না। অনেক সময়ে দেশী মুচিরা কলিকাতা, আগ্রা বা কাণপুর হইতে বিলাতী চামড়া কিনিয়া সামগ্রী বানায়।

দেশী মুচিরা নাগরা ও সাধারণ জুতা, বুট, চটি, জলের মোট, ভিস্তি ঘোড়ার সাজ ও জিন লাগাম বানায়। এছাড়া ডুগি তবলা, খোল ঢোল, মাদল, মৃদঙ্গ, ঢাক, মন্দার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও ইহারা নির্মাণ করে। কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র। দেশী জুতার প্রধান কেন্দ্র কটক, পাটনা ও সারন। এছাড়া অনেক স্থানে মুচিদের জুতা, চটির নামডাক আছে। কলিকাতার মুচিরা আজকাল বিলাতী জুতার ন্যায় সুন্দর সুন্দর জুতা বানাইতেছে। তবে মুচির সর্বত্র মহাজনদের হাতের মধ্যে। তাহারা ৫০ টাকা দাদন দিয়া মাসে মাসে ২০ জোড়া জুতা আদায় করে। অধিকাংশ জায়গায় মুচিরা মহাজনের হাতে থাকাতে তাহাদের নিজেদের উন্নতি হয় না। জেলেদের মধ্যে একটা কথা আছে—"জেলেদের পরোনে ত্যানা, লণ্ডনের কাণে সোনা" এ কথাটা মুচিদের সম্বন্ধেও খাটে। কলিকাতায় মেছুয়া বাজারে মুচিদের সমবায় হইয়াছে,—আশা হইতেছে ইহাতে তাহারা রক্ষা পাইবে।

দেশী চামড়ার কাজ

মুচিদের দুর্দ্দশা

য়ুরোপীয় প্রথানুসারে চামড়া তৈয়ারী মিলিটারী-বিভাগের দ্বারা প্রথমে আরম্ভ হয়। সৈনিকদের জন্য জুতা, বুট, বেল্ট, গুলি রাখিবার ব্যাগ, অশ্বের জিন লাগাম প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত প্রস্তুত করিবার জন্য ১৮৬০ সালে গভর্ণমেণ্ট কানপুরে চামড়ার এক কারখানা স্থাপন করেন; কিছুকাল পরেই কুপার ও আলেন কোম্পানি

বিলাতী ধরণে চামড়া তৈয়ারী

আর একটি কারখানা স্থাপন করে ও গভর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে জাঁকাইয়া তোলেন। বর্তমানে তাহারাই সৈনিক বিভাগের চামড়ার জিনিষ সরবরাহ করে।

ভারতবর্ষের চামড়া ও ছাল কাঁচা বা আধপাকা অবস্থায় অধিকাংশই বিদেশে চালান হইয়া যায় ও সেখান হইতে পাকা চামড়া হইয়া এদেশে আমদানী হয়। ১৮৪৬ সালে ৪৮ হাজার চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল—প্রতি চামড়ার মূল্য ছিল ।৵৫ ও ছালের দাম ছিল ৵২; যুদ্ধের পূর্বে ১ কোটী ৩৪½ লক্ষ চামড়া বিদেশে যায়—তখন চামড়ার দাম ছিল ৬৲ টাকা ও ছালের দাম ১৷৵৬। সুতরাং গত সত্তর (৭০) বৎসরে রপ্তানী চামড়ার পরিমাণ ২৫০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, দাম ১২ গুণের উপর বাড়িয়াছে।

চামড়ার দাম

যুদ্ধের পূর্বে জারমেনী ও অষ্ট্রীয়াতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভারতীয় চামড়া রপ্তানী হইত। এদেশেও চামড়ার বাণিজ্য এক প্রকার জারমেন বণিকদের হাতে ছিল। ১৯১৩-১৪ সালে একা জার্মানী ভারতীয় চামড়ার শতকরা ৩৫% ভাগ নিজ দেশে লইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে শত্রুদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইল এবং সমগ্র ব্যবসায় দেউলা হইবার উপক্রম হইল। তখন স্বয়ং সরকার বণিকরূপে আসিয়া চামড়ার ব্যবসায় গ্রহণ করিলেন —নতুবা বণিকদের সর্বনাশ। এছাড়া যুদ্ধের জন্য শত প্রকারের চামড়ার জিনিষ নিয়ত প্রেরণ করা সরকারের তখন নিতান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য যাবতীয় চামড়া সরকার স্বয়ং ক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং এখান হইতে নানা প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন।

চামড়ার বাজার

যুদ্ধের ফলে ভারত সরকারকে যেসব শিক্ষা শিখিতে হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে ভারতীয় কাঁচামাল হইতে ভারতের মধ্যেই সামগ্রী

প্রস্তুত করার উপায় উদ্ভাবন। সেই জন্য চামড়ার কাজ যাহাতে এ দেশে ভাল হয়—সে সম্বন্ধে সরকার মনোযোগ দিয়াছিলেন। যুদ্ধের পূর্বে শোনা যাইত ভাল চামড়া এদেশের কারখানাতে করা যায় না। কলিকাতার জল ভাল নয়। সেখানকার আবহাওয়া চামড়া বানাইবার পক্ষে অনুকূল নয়, মাল মশলা এখানে দুর্লভ ইত্যাদি অনেক কথা শুনিয়া দেশের লোক সেদিকে কখনো দৃষ্টি দেয় না। যুদ্ধের পূর্বে এসব যুক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হইত—কিন্তু সরকারী গবেষণার ফলে তাহা অপ্রমাণিত হইয়াছে।

চামড়া তৈয়ারীর প্রতিকূল অবস্থা

বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ন্যাশন্যাল ট্যানারী, বহরমপুর ট্যানারী, উৎকল ট্যানারী প্রভৃতি স্থাপিত হয়। এছাড়া ডেভিড সেস্থন, গ্রেহাম কোম্পানী, বার্ড. কোং ও গ্রেস ব্রাদার্স প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানী প্রকাণ্ড কারখানা কলিকাতায় খুলিয়াছিলেন; সেখানে চামড়া সাফ করিয়া বিদেশে চালান হয়। ইহার মধ্যে সবগুলি বর্তমানে নাই। পূর্বে অনেক কোম্পানী দেশী প্রথানুসারে সাফকরা চামড়া কিনিয়া রপ্তানী করিত। কিন্তু ওসব জিনিষ সাধারণত এমন জঘন্য যে তাহা পুনরায় না পাকাইলে কাজ চলে না। দেশী প্রথামতে চামড়া পরিষ্কার করিতে এক মাস হইতে দেড় মাস পর্য্যন্ত লাগে কিন্তু বর্তমানের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মহিষের চামড়া ৭ দিনে, গোরুর চামড়া এক দিনে ও ছাল ৬।৭ ঘণ্টায় পাকা হইয়া যায়।

চামড়ার ব্যবসায়ী

ভারতবর্ষে চামড়া পাকাইবার বহুবিধ উদ্ভিজ্জ সামগ্রী পাওয়া যায়; সেসব জিনিষ খুব সস্তা, আমাদের দেশে মুচিরা ইহার ব্যবহারও জানে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সব কাজ করিতে পারে না বলিয়া ভাল চামড়া হয় না। চামড়ার শিল্প ও ব্যবসায় যে বিদেশী বণিকদের হাতে চলিয়া গিয়াছে ইহার প্রধান কারণ,—আমাদের দেশের মুচিদের সামাজিক

অবস্থা। তাহারা সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে আছে বলিয়া ভদ্রলোক মূলধন ও উচ্চশিক্ষা লইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করেন নাই। সাহেবদের সে অভিমান নাই—তাই চামড়াব কারবারে তাহারা লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত সব কাজই মুসলমানদের একচেটিয়া।

যুদ্ধের পূর্বে গো-মহিষ চর্ম (Hide) প্রায় ৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার রপ্তানী হয়। তৈয়ারী চামড়া ও ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার বিদেশে যায়। তা ছাড়া ছাগ মেষাদির চামড়া আছে। কিন্তু এই রপ্তানী কমিয়া আসিয়াছে।

১৯২৩-২৪ সালে কাঁচা চামড়া	২,৮৫,৪৭০০০ টাকা
কাঁচা ছাল	৪,০৫,৭১,০০০ টাকা
তৈয়ারী চামড়া	৩,১৬,৭৮,০০০ টাকা
তৈয়ারী ছাল	২,৭৩,০৮,০০০ টাকা
মোট	১২,৮১,০৪,০০০ টাকা

চামড়া রপ্তানী বিষয়ে জারমেনী তাহার প্রাক্‌যুদ্ধ পর্বের বাণিজ্য প্রায় ফিরাইয়া পাইয়াছে; জারমেনী কাঁচা গো-চর্মের বড় খরিদ্দার, অর্দ্ধেকের উপর (৫১%) জারমেনী একলা লইত। অন্যান্য দেশের মধ্যে ইতালী, অষ্ট্রীয়া স্পেন বড় খরিদ্দার। য়ুরোপের সকলেই কাঁচামাল ক্রয় করিয়া শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পুনরায় পাঠায়।

অন্যান্য প্রাণীজ শিল্পের মধ্যে হাতীর দাঁতের কাজ খুব বিখ্যাত। হাতীর দাঁত বা হাড় আফ্রিকা হইতে আমদানী হয়। প্রাচীনকালে এই হাড় সুদূর গ্রীনল্যাণ্ড সাইবেরিয়া হইতে এ দেশে আসিত। এই শিল্প প্রধান পাঁচটি জায়গায় উন্নতি লাভ করিয়াছে—দিল্লী, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, ত্রিবঙ্কুর, ও বর্মার মৌলমনে। এই কয়টি স্থানের মধ্যে মহীশূরের কারুকার্য্য বিখ্যাত। মুর্শি-

হাতীর দাঁতের কাজ

দাবাদ ছাড়া ত্রিপুরা ও ঢাকার কাজ বাংলাদেশের মধ্যে খুব খ্যাত। এ শিল্প এখনো কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে; কারিকরগণ সকলেই প্রায় নিরক্ষর।

মহিষের শিংএর চিরুণী, কলম প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত হয়। কটক, মুঙ্গের, সাতখিরা, যশোহর, হুগলী ও শ্রীরামপুরের চিরুণী, ব্রুচ, হার, চুড়ী প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষ তৈয়ারী হয়। এ ছাড়া আসামের শিবসাগর, জয়পুর, রাজকোট, বড়োদা, কাথিবার, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে মহিষের শিংএর নানারূপ সামগ্রী হয়।

মহিষের শিংএর কাজ

শাঁখার কাজের জন্য ঢাকার শাঁখারীদের নাম সর্বত্র বিখ্যাত।

আঁশাল জিনিষ

ভারতবর্ষে প্রায় ৩০০ প্রকারের আঁশাল গাছ ও উদ্ভিদ্ আছে। ইহার মধ্যে প্রায় শতাধিক প্রকারের গাছ লোকে নানা ভাবে ব্যবহার করে; এবং তাহারও মধ্যে ১০ ১২ রকম বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের কাছে তুলা, পাট, শন খুব সুপরিচিত—নারিকেলের কাতা নিতান্ত অজানা নয়। উদ্ভিজ্জ আঁশাল সামগ্রী ছাড়া রেশম ও পশম প্রাণীজ আঁশালের মধ্যে সুপরিচিত।

আঁশাল সামগ্রী

তুলা।

ভারতবর্ষে তুলার চাষ ও সুতার কাপড় বহুকাল হইতে হইতেছে ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে লোকে সুতার কাপড় বুনিতে জানিত না ইহাকে লোকে সাদা পশম বলিত; সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিবার পূর্বেও ইহা য়ুরোপে চালান হইত।

যুদ্ধের পূর্বে ১৯১৩-১৪ সালে সমগ্র ভারতে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ একার লক্ষ একার জমিতে তুলার চাষ হইত। যুদ্ধের পর কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিয়াছে। দুই এক বৎসর সামান্য বাড়িয়াছিল। ১৯২৩-২৪ সালে ১,৫৩,৮৫,০০০ একার জমিতে তুলা হয়। যুদ্ধের পূর্বে

উৎপন্ন তুলার হিসাব

পাঁচমণে বস্তার ৫২ লক্ষ বস্তা তুলা ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল; ১৯২৩-২৪ সালে ৫৯ লক্ষ বস্তা তুলা হইয়াছিল। কিন্তু কোনো বার বেশী, কোনো বার কম হয় বলিয় গড়ে বাৎসরিক ৪০ লক্ষ বস্তা তুলা উৎপন্ন হয় ধরা হয়। ইহার মধ্যে গড়ে প্রায় ১৭½ লক্ষ বস্তা বিদেশে রপ্তানী হয়, প্রায় ১৮ লক্ষ বস্তা দেশী কাপড়ের কলে ব্যবহৃত হয় ও প্রায় ৪॥ লক্ষ অন্যান্য কাজে লাগে। ১৯২৩-২৪ সালে ৯৮,৬৭,৫৯ হাজার টাকার তুলা, ৩,৬৬,২২ হাজার টাকার সুতা, ৭,২৯,২৭ হাজার টাকার সুতার সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হয়।

ভারতবর্ষের সমগ্র উৎপন্ন তুলার এক-তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। যুদ্ধের পূর্বে জাপান, জার্মানী, বেলজিয়াম, ইতালী, অষ্ট্রীয়া,

তুলার ইতিহাস

ফ্রান্স, ইংলণ্ড, চীন, ও জাপান ভারত হইতে তুলা আমদানী করিত। এশিয়ার মধ্যে জাপান, ও য়ুরোপের মধ্যে জার্মানী ছিল ইহার বড় খরিদ্দার। ইংলণ্ডে ভারতীয় তুলা বেশী যাইত না। ম্যানচেষ্টারের কলের জন্য তুলা প্রধানত মার্কিণ ও মিশর হইতে আমদানী হয়। ভারতবর্ষ হইতে গড়ে ৫০ হাজার বস্তার বেশী ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত না। ১৮৬০ সালে আমেরিকায় ঘরাও যুদ্ধ বাঁধিলে কয়েক বৎসর বাণিজ্যের খুব গোলযোগ ঘটে। সেই সময়ে ভারতের তুলার উপর ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালাদের দৃষ্টি কিছু কালের জন্য পড়িয়াছিল; সেই হইতে তুলার চাষ ও চালান দুইই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

তারপর কয়েক বৎসর হইতে তুলার রপ্তানী কিছু মন্দা পড়িয়াছে। ইহার দুইটি কারণ। প্রথমত—দেশীয় কাপড়ের কলের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে তুলার টান সেদিকে বাড়িয়াছে; দ্বিতীয়ত—ভারতের তুলা ভাল জাতের নয় বলিয়া বিলাতী কলওয়ালারা ইহা লইতে অনিচ্ছুক। আমেরিকা হইতে সুবিধাদরে ভাল তুলা পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা সেখান হইতে তুলা আমদানী করিতেছেন। ম্যানচেষ্টার কলওয়ালারা যখন এ দেশ হইতে তুলার আমদানী কমাইয়া দিল—জাপান হইতে খরিদ্দার আসিয়া তুলা কিনিতে লাগিল। বর্তমানে জাপান ভারতীয় তুলার প্রধান খরিদ্দার সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। তুলার এই টান শীঘ্রই কমিবে। জাপান কোরিয়াতে ভাল জাতের আমেরিকান তুলার চাষ সুরু করিয়াছে, এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান হয় ত' ভারতের তুলা ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিবে। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই ও বেরার প্রদেশে তুলা সব চেয়ে অধিক উৎপন্ন হয়।

কাপড়ের কল

বোম্বাইতে ১৮৫১ সালে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তারপর দশ বৎসরের মধ্য প্রায় ১২টি কল ও তাহার সঙ্গে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার চরকার কাজ আরম্ভ হয়। চল্লিশ বৎসর পরে ১৯০১ সালে ১৯৪টি কল ছিল। যুদ্ধের পূর্বে কাপড়ের ও সুতার কলের সংখ্যা ছিল ২৭২টি; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যখন কাপড় চোপড়ের ভীষণ টানাটানি সেই সময়ে ভারতে একটিও নূতন কল স্থাপিত হয় নাই। বরং ছয়টি কল সুতার অভাবে উঠিয়া গিয়াছিল। সরু সুতার জন্য আমাদের কলওয়ালাদের বিদেশে তাকাইয়া থাকিতে হয়। এ ছাড়া কলকব্জার প্রত্যেকটি অংশ বিলাত হইতে আসে; যুদ্ধের সময়ে সেসব বন্ধ ছিল—তা ছাড়া জাহাজও ছিল না। ১৯০৫ সালের 'বয়কট' ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশী কাপড়ওয়ালাদের সুদিন আরম্ভ হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরে পূর্বাপেক্ষা

কাপড় প্রায় দ্বিগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতের মিলের যে শ্রেণীর কাপড় তৈয়ারী করিলে কলওয়ালাদের পোষায় তাহা অত্যন্ত মোটা, ভারতে সাধারণত তাহা ব্যবহৃত হয় না। এই জন্য মিলের উৎপন্ন সামগ্রীর প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। ১৯২৩-২৪ সালে বৃটীশ ভারতে মোট ২৫৯টি কাপড়ের কল ছিল। দেশীয় রাজ্যে ও অন্যত্র ছিল ৫১টি; এই মোট ৩১০টি। ইহার মধ্যে মান্দ্রাজে ২১, বোম্বাইতে ১৮৩, বঙ্গদেশে ১২, যুক্ত প্রদেশে ২২, পঞ্জাবে ৩, মধ্যপ্রদেশে ১০, আজমীরে ৩, দিল্লীতে ৪, বর্মায় ১টি কাপড়ের কল। ইহাদের আসল ধূলধন ৫৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, তবে ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। যুদ্ধের ১৯১৮-১৯ সালে বৃটীশভারতে ২৩৫টি কল ছিল সুতরাং পাঁচ বৎসরে ২৪টি নূতন কল হইয়াছে। ১৯২৩-২৪ সালে ২৫৯টি কলে দৈনিক ৩,১৪,০০০ শ্রমিক খাটিত। তাঁতের সংখ্যা ১,৩৩,০৬০ এবং চরকার সংখ্যা ৭১,৯৪,৫৪৮। এই সব মিলে ১৯২৩-২৪ সালে ১ হইতে ৪০ কাউণ্টের ৫৭ কোটি পাউণ্ডের উপর সুতা প্রস্তুত হয়। দেশীয় রাজ্যে ও ফরাসী রাজ্যে সর্বসমেত ৫১টি কাপড়ের কল আছে। এখানে দৈনিক প্রায় ৩৬ হাজার লোক খাটে। তাঁতের সংখ্যা ১৪ হাজার ও চরকার সংখ্যা ৭,০৮,৬১৮। দশ বৎসর পূর্বে দেশীয় রাজ্যে মাত্র ২২টি কল ছিল। দেশীয় রাজ্যের মিলে ৪ কোটি ৭২ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সুতা প্রস্তুত হয়। ১৯১৭-১৮ সালে বৃটীশ-ভারতের ২৩৬টি মিলে ২৬ কোটি টাকা কাপড় প্রস্তুত হয়; ১৯২০-২১ সালে ২৩৭টি মিলে ৬০ কোটি টাকার কাপড় উৎপন্ন হয়; কিন্তু ১৯২৩-২৪ সালে ২৫৯টি মিলে ৫০ কোটি টাকার কাপড় মাত্র প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ ১২টি কল বাড়া সত্ত্বেও ১০ কোটি টাকার কম কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। দেশীয় রাজ্যের মিলগুলিতে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার কাপড় হইয়াছিল। (Stat. Abs. p. 618)

সমগ্র বিদেশী আমদানীর মধ্যে সুতা ও কাপড় সব চেয়ে বেশী টাকার—এক-পঞ্চমাংশের বেশী ; কিন্তু দেশীয় রপ্তানীর বিশ ভাগের এক অংশ মাত্র দেশীয় সুতা ও কাপড়ের মূল্য। বিদেশ হইতে আমাদের দেশে সুতা আসে মিলের জন্য,—ও কাপড় আসে লোকদের জন্য। আমরাও যেমন প্রত্যক্ষভাবে কাপড়ের জন্য বিলাতের মুখাপেক্ষী—দেশীয় মিলওয়ালাদের অনেকে সুতার জন্য বিলাতের মুখাপেক্ষী। যুদ্ধের পূর্বে দেশী কলে কাপড় কম প্রস্তুত হইতেছিল, কারণ পূর্বদিকে জাপান ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। চীন ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে মোটা কাপড় ও মোটা সুতা আমদানী করিত ; কিন্তু সে এখন জাপান হইতে কাপড় পাইতেছে।

সুতা ও কাপবের আমদানী ও রপ্তানী

ভারতীয় সুতা ও কাপড়ের প্রধান খরিদ্দার মিশর, তুর্কী, জাপান এখন সকলেই আমদানী কমাইয়া দিয়াছে। জাপান ১৮৮৮ সালে ২ কোটী ৩১ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সুতা ভারত হইতে আমদানী করিয়াছিল ;—১৮৯৯-১৯০০ সালে সেই স্থানে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়। বর্তমান সময়ে সে ভারতে সুতা ও কাপড় রপ্তানী করিতেছে।* ইংলণ্ড হইতে (১৯১৪ হইতে ১৯২৩) দশ বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম যখন বস্ত্রাদি আসিয়াছে তাহার মূল্য হইয়াছে ৩৯ কোটি টাকা

---

* বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত আমদানী জাপানী সুতা ও কাপড়ের মূল্য প্রায় ৬৫ গুণ বাড়িয়াছে।

১৯০১ সালে		১৩ লক্ষ
১৯১০ "		৭৫ "
১৯১৩ "	১ " কোটি	২০ "
১৯১৮-১৯ "	১০ "	৯৪ "
১৯২০-২১ "	১০ "	৯২ "
১৯২৩-২৪ "	৮ "	৩৫ "

(১৯১৫ সালে); উর্দ্ধতম উঠিয়াছে ৮১ কোটি (১৯২০ সালে)। ১৯২৩ ২৪ সালে ৫৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার বিলাতের কাপড় চোপড় ভারতে আসে। সমস্ত বিদেশ হইতে ১৯২৩-২৪ সালে মোট ৬৭,৪৮,৪৬,০০০ টাকার বস্ত্রাদি আসে। গত দশ বৎসরে ১৯১৫ সালে সর্বাপেক্ষা কম ৪৩ কোটি টাকা ও ১৯২০-২১ সালে সর্বাপেক্ষা অধিক ১০২ কোটি টাকার বস্ত্র সামগ্রী ও সুতাদি আসিয়ছিল। গড়ে দশ বৎসরে ৬১ কোটি টাকার বিদেশী সুতা ও কাপড ভারতে আসিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে 'তুলার রপ্তানী বাড়িয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও ভারত বিদেশে কাঁচামাল সরবরাহ করিতেছে। জাপান দশ বৎসরে ১৪ কোটি টাকার স্থানে ৪২ কোটি টাকার তুলা আমদানী করিয়াছে—অর্থাৎ দশ বৎসরে সে তিনগুণ তুলা ভারত হইতে লইয়াছে। কিন্তু ভারতের কাপড়ের কলগুলি এই দশবৎসরে বিদেশে ৮ কোটি হইতে ১০ কোটি টাকার সামগ্রী পাঠাইয়াছে। মধ্যে ১৯১৯-২০ সালে ২৭ কোটি টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে ক্রমশই ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানীর মূল্য কমিতেছে।

নিম্নে ভারতের বস্ত্র শিল্পের অবস্থা কিরূপ তাহা অন্য দুটি দেশকে পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিতেছি:—

	কল	চরকা	তাঁত	শ্রমজীবি	মজুরী (পা) বার্ষিক	কত অং দেশে রা
* বিলাত	২,০১১	৫,৯৩লক্ষ	৮,০৫হাজার	৬,২৭হাজার	৪৮,৯০লক্ষ	২০ %
মাকিণ	১,৪৪৯	৩,২২ „	৬,৯৬ „	৩,১৮ „	৩২,৪০ „	৯৪ %
ভারতবর্ষ	২৭২ †	৬৬ „	৯৪ „	২,৫৩ „	৬,৫৩ „	৭৯ %

* ইংলণ্ডে যে পরিমাণ কাপড় বা সুতা উৎপন্ন হয় তাহার মা শতকরা ২০ ভাগ দেশে থাকে, অবশিষ্ট সমস্তই বিদেশে চালান দেয় ইহার প্রধান খরিদ্দার ভারতবর্ষ।

† অনেকগুলি কল মাঝে উঠিয়া যায়। ১৯২২ সালে ২৬৩, ১৯২৩ সালে ২৬৯টি ছিল।

ভারতের তাঁতের কাপড়ের ইতিহাস না বলিলে বস্ত্র-শিল্পের কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। সূক্ষ্মকাজে ভারতবর্ষ এককালে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ঢাকার মসলিন সম্বন্ধে যাহা শোনা যায় তাহাই উহার বড় নিদর্শন। সেখানে এক সময়ে ৩৬ রকমের কাপড় তৈয়ারী হইত।

ঢাকার মসলিন

মসলিনসম্বন্ধে শোনা যায় যে ঘাসের উপর উহা রাখিলে দেখা যাইত না—জলের মধ্যে ধরিলে আছে কি না সন্দেহ হইত। জাহাঙ্গীরের সময়ে ৩০ হাত লম্বা ১২ হাত প্রস্থ একখানি ঢাকাই মসলিনের ওজন ছিল (৯০০ গ্রেণ) দুই ছটাক। পারস্যের রাজার কাছে উপঢৌকনের মধ্যে সাহজাহান একখানি মসলিন পাঠাইয়া ছিলেন—সেটি ৬০ হাত লম্বা একটি পাগড়ি—মণিমুক্তা খচিত একটি নারিকেলের খোলের মধ্যে পুরিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বর্তমানে এসব জিনিষের আদর ও ব্যবহার নাই। সেইরূপ শিল্পীও আর দেখা যায় না। এইরূপ সূক্ষ্ম ও দামী কাজের জন্য ভারতের আরও অনেক জায়গা বিখ্যাত ছিল।

এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই তাঁতি ছিল। তাহারা বাড়ী বাড়ী তুলা দিয়া আসিত; মেয়েরা বিশেষত বিধবারা চরকা কাটিয়া সুতা করিতেন। এখনো ভারতের বহুস্থানে তাঁতি বা জোলাদের একপ্রকার কাপড় তৈয়ারী হয়; তবে তাহাদের আদর কমিয়াছে বটে—কিন্তু দর নানা কারণে কমে নাই। তথাচ বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। বাংলাদেশের ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, ঢাকা, শিমলা প্রভৃতি অনেক জায়গার ধুতি, চাদর, সাড়ী—ময়নামতী, কুষ্টিয়া ও পাবনার ছিট এখনও বাঙালীর ঘরে আদর পায়। তা ছাড়া বাংলার চারিপার্শ্বে কতকগুলি আদিম জাতি আছে যাহাদের বস্ত্রশিল্প ও বয়ন-প্রণালী সত্যই মুগ্ধকর। ইহাদের মধ্যে মণিপুরের খেস, টিপরাদের লাইছাম্‌পী, নেপালীদের চাদর খুবই সুন্দর। এ ছাড়া কাপড়ে সুতার

বা রেশমের বা সোনার ফুল তোলায় বাংলার কোনো কোনো স্থান এখনো বিখ্যাত।

ভারতবর্ষের কোথায় কতগুলি তাঁত আছে তাহা আমরা নিম্নে দিতেছি :—*

আজমীর মেরবারা	১,৫৮৭	তাঁত
আসাম	৪,২১,৩৬৭	”
বঙ্গদেশ	২,১৩,৮৮৬	”
বিহার উড়িষ্যা	১,৬৪,৫৯২	”
বর্মাদেশ	৪,৭৯,৬৩৭	”
দিল্লী	১,০৬৭	”
মাদ্রাস	১,৬৯,৪০৩	”
পঞ্জাব	২,৭০,৫০৭	”
বড়োদা রাজ্য	১০,৮৫১	”
হায়দ্রাবাদ	১,১৫,৪৩৪	”
রাজপুতানা	৮৯,৭৪১	”

* Indian Cyelopaedia by P. T. Chandra Hydarabad, Sind 1924, p. 169.

কাপড়ের কলের হিসাব (০০০ হাজার)*

	মিলের সংখ্যা	চরকার সংখ্যা	তাঁত	শ্রমজীবি	তুলা হন্দর	সরকারী বাণিজ্য শুল্ক
১৮৯৭	১৭৩	৪০,৬৫	৩৭,	১,৪৪,	৪৫,৫৩	১২,১৪,০০০
১৯০১	১৯৩	৫০,০৬	৪১	১,৭২,	৪৭,৩১	১৮,৩১,০০০
১৯০৫	১৯৭	৫১,৬৩	৪৪	১,৮১,	৬০,৮৭	২৭,৯০,০০০
	স্বদেশী	আন্দোলনে	সূত্র	পাত		
১৯০৬	২১৭	৫২,৭৯	৫২	২,০৮	৭০,৮২	২৯,৮২,০০০
১৯১৪	২৭১	৬৭;৭৮	১০৪	২,৬০	৭৫,০০	৫৬,৭৭,০০০
১৯১৯	২৫৮	৬৬,৮৯	১,১৮,	২,৯৩,	৭১,৫৪,	১,১৪,৮৭,০০০
১৯২৫	২৫৫	৭৪,৭৯	১,৩৫	৩,৩৭		১,৫২,৫৪,০০০
দেশীয় রাজ্য	৫০	৮,০৬	১৪	৩৮		৮,৯০,০০০

* Indian Year-Book 1926, p. 797.

পাট

ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনো দেশে এখনও পাটের চাষ বিস্তৃতভাবে আয়ত্ত করা হয় নাই। ভারতবর্ষের মধ্যেও আসাম ও বঙ্গদেশেই ইহার

চাষ বিশেষ প্রচলিত। বর্তমানে বঙ্গদেশে ৮ কোটি বিঘা জমি চাষ হইয়া থাকে, এবং ৮ কোটি বিঘার মধ্যে প্রায় ১ কোটি বিঘা জমিতে পাট চাষ হয়। বৎসরে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। এ ছাড়া পাটের চট, থলি প্রভৃতিও বিদেশে পাঠান হয়।

পাটের জমির পরিমাণ

বাংলাদেশে পাটের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সূত্রপাত ১৮৫৫ সালে। ঐ বৎসরে রিশড়া সহরে প্রথম পাটের কল চলিতে আরম্ভ করে। তখনকার দৈনিক ৮ টনের স্থলে বর্তমান পাটের কলে প্রতিদিন (৩০০০) তিন হাজার টন পাট উৎপন্ন হইতেছে। জর্জ অকল্যাণ্ড নামক জনৈক স্কটল্যাণ্ডবাসী এই ব্যবসায়ের প্রথম উদ্‌যোক্তা; তাঁহারই চেষ্টায় মিঃ জন কার নামক জনৈক ধনী তাঁহাকে টাকা দিয়া সাহায্য করেন। তিনি ভারতে কলকব্জা লইয়া আসিয়া রিশড়াতে কারখানা খোলেন।

পাটের কলের ইতিহাস

ইহার পর হইতে পাটের কারবার দ্রুত আগাইয়া যাইতে থাকে। ১৮৮০ সাল হইতে ১৮৮৪ সালের মধ্যে পাটের কল ছিল ২১টি; ১৯১১ সালে ৯০টি—অর্থাৎ তাহার চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৪ সালে ৬৪টি পাটের কলে ৩৭ কোটি থলি এবং ১০৬ কোটি ২০ লক্ষ গজ পাটের চট বোনা হইয়াছিল।

পাটের ব্যবসায় বৃদ্ধির কথা বলা হইল; কিন্তু এক্ষণে পাটের চাষ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। পাটের চাষ বহুদিন হইতে এ দেশে চলিয়া আসিতেছে। ১৮০২ সালে রংপুর অঞ্চলে নাকি ২০,০০০ একার (৬৫ হাজার বিঘায়) জমিতে পাটের আবাদ ছিল। পাটের সঙ্গে য়ুরোপের পরিচয় ১৮২। সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে। কিন্তু ১৮৭২ সালে সব প্রথম সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি ইহার উপর পড়ে। তার পর ১৯১১ সালে

পাটের চাষের ইতিহাস

পর হইতেই পাটের চাষের উন্নতি চেষ্টার প্রার্থনা লইয়া য়ুরোপীয় বণিকেরা বহুবার উপস্থিত হইলে গভর্ণমেণ্ট ১৯০৪ সালে একজন বিশেষজ্ঞকে এই বিভাগ তদারক করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। কৃষি-বিভাগ পাটের উন্নতির জন্য কৃষককে সময়ে সময়ে অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আরো একটি কাজ কৃষিবিভাগকে করিতে হয়। তাহার নাম 'পাটের পূর্বভাস'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কি পরিমাণ পাট জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়; ফসল উঠিবার পূর্বেই তাহার কিছু আভাস দিতে পারিলে বিদেশী পাট-বণিকের ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সুবিধা হয়। এই সুবিধাটুকুর জন্য কৃষিবিভাগ যথেষ্ট করেন। আষাঢ় মাস হইতে 'পূর্বাভাস' প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এই কাজ লইয়াই কৃষিবিভাগ ব্যস্ত থাকেন; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বেশ দেখা যায় যে, সেসকল স্থানের কৃষি মহাসম্মিলনী হইতে কত জমিতে কি কি ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে তাহা কৃষকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়। তদনুসারে তাহারা চাষ আবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কৃষকদের উন্নতির জন্য সেরূপ কোনো ব্যবস্থাই নাই। কৃষকেরা কোন ফসলের কত প্রয়োজন তাহা না জানিয়াই আবাদ করে; তাহা না জানাই তাহাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল আমাদের কৃষকেরা উৎপন্ন করে বলিয়া এত কম মূল্যে পাট তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে হয়; কারণ গরজটা কৃষকদের বণিকদের নয়।

প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক পাট উৎপন্ন হয়

১৯২০ সালে প্রায় ৬২ লক্ষ গাইট অর্থাৎ ৩ কোটি ১০ লক্ষ মণ পাট মজুত ছিল; তার উপর এই বৎসরের সরকারী পূর্বভাস অনুসারে ৩ কোটি মণ পাট হইবে। এই মোট ৬, কোটি ১০ লক্ষ মণ পাট মজুত আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। বিদেশে রপ্তানী এবং কলিকাতার

মিলগুলির সাম্বৎসরিক মোট খরচ অনুমান ৪ কোটি ৩২ লক্ষ মণ। মোটামুটি ৩৫॥০ লক্ষ গাইট অর্থাৎ ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ পাট উদ্বৃত্ত থাকিয়া ১৯২২ অব্দের ছিল। ইহা ছাড়া বিলাতের কারখানায় কিছু পাট গুদমজাত থাকে। এখন প্রশ্ন এই উদ্বৃত্ত পাট লইয়া আমরা কি করিব! যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে আমদানী বেশী সেখানে গরজ বিক্রেতার, ক্রেতার নহে। এছাড়া দাদন খাইয়া চাষা অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। একই দিনে বাজারে যখন পাটের দাম ৮॥৵০-৯৲ মণ, তখন দাদন খাইয়া কৃষক ৫॥০-৬৲ টাকা মণে পাট মহাজনের কাছে বিক্রয় করিতেছে। আমাদের দেশের বিশেষভাবে বাংলাদেশে আখ, তামাক ও তুলার চাষ খুব কমই হয়; অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট বুনিয়া চাষারা চিরদিন দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইতেছে। সরকার বাহাদুর এই দিকে যদি দৃষ্টি দেন তবে চাষীদের যথার্থ উন্নতি হয়।

এছাড়া বর্ষাকালে পাটের 'জাগের' জন্য জল দূষিত হইয়া যে ম্যালেরিয়া হয় তা সকলেই স্বীকার করেন। পাটের ক্ষেতেও ম্যালেরিয়ার মশা বাস করে। পাটপচা দূষিত জলে মাছ পর্য্যন্ত মরিয়া যায়। তাহাতে যথেষ্ট মাছের অভাবে দেশের খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিয়া থাকে। অতএব পাটের বুনানী কম করিলে যে কৃষকের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং প্রয়োজন অনুরূপ পাট উৎপাদন জন্য কৃষকের ও দেশের ধনাগমও বৃদ্ধি হইবে। *

পাটের চাষ ও দেশের অবস্থা

কোনো কোনো বৎসর পাটের দর ৫৲ মণেও নামে। কিন্তু এই পাট বিদেশে গিয়া ৫০৲ টাকা দরেও বিক্রয় হয়। এদেশের কোনো

* ব্যারিষ্টার এচ্ ডি. বসু মহাশয় লিখিত "পাটের চাষ ও কৃষকের অবস্থা"—মালঞ্চ, ৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ১৩২৭ দ্রষ্টব্য।

কোনো কল এক বৎসরে প্রতি ১০০৲ টাকার অংশে খরচপত্র সমুদয় বাদে অংশীদারগণকে ৩৭৫৲ টাকা হারে লাভ দিয়াছেন। অথচ উপস্থিত দুর্মূল্যতার দিনে সর্ব-প্রকার খরচ এবং বাজারদরে মজুরী ধরিয়া গৃহস্থ ৬৲ হইতে ৬।৭ টাকার বেশী এ বৎসর পায় নাই। *

পাট কলের লাভ

পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও পাট হয় না এবং বাংলাদেশের পাটের তৈয়ারী চট ও থলিতে পৃথিবীর অনেক জিনিষ বস্তাবন্দী হইয়া সমুদ্র পারাপার করে; পাশ্চাত্য জগতের অনেক প্রয়োজন লাগে বলিয়া ইহার বিষদ আলোচনা করিলাম।

* পাটের কলে লাভ

১৯১৪— ৯ লক্ষ ৮২ হাজার পাউণ্ড
১৯১৫—৫৯ „ ২০ „
১৯১৬—৬১ „ ৫৫ „
১৯১৭—৪৪ „ ৪৭ „
১৯১৮—১২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা
১৯১৯—১১ „ ৬৫ „
১৯২০—১২ „ ৫৩ „
১৯২১— ৪ „ ৯৫ „
১৯২২— ৩ „ ৫৮ „
১৯২৩— ৪ „ ৪৫ „
১৯২৪— ৬ „ ১০ „

পাটের কলের হিসাব

পাঁচ বৎসরের গড়	কলের সংখ্যা	মূলধন	লোক	তাঁত	চরকা	বস্তা প্রতি দাম
		লক্ষ				
১৮৮০—১৮৮৪	২১ (১০০)	২,৭০, (১০০)	৩৮,৮০০ (১০০)	৫,৭০০ (১০০)	৮৮,০০০ (১০০)	২৩॥০
১৮৯০—৯৪	২৬ (১২৪)	৪,০২, (১৪৯)	৬৪,৩০০ (১৬৬)	৮,৬০০ (১৫১)	১৭২,৬০০ (১৯৬)	৩২।৵০
১৯০০—১৯০৪	৩৬ (১৭১)	৬,৮০, (২৫১)	১,১৪,২০০০ (২৯৪)	১৬,২০০ (২৯৫)	৩৩৪,৬০০ (৩৮০)	৬২/৭
১৯১০—১১	৫৮ (২৭৬)	১১,৫০, (৪২৫)	২,১৬,৪০০ (৫৫৮)	৩৩,১০০ (৬০২)	৬৮২,০০০ (৭৭৬)	৪১॥০
১৯১৪ ১৪	৬৪ (৩০৫)	২৩,০৯, (৪৮৬)	১,১৬,৩০০ (৫০০)	৩৬,০০০ (৫০০)	৭৪৪,০০০ (৮৪৬)	৭৬৸৵০
১৯১৮—১৯	৭৫	১৪,২৮	২,৭৫,৫০০	৪০,০৪৩	৮৩৮,৯১৯	
১৯২৩—২১	৮৯	৮০ কোটি	৩,৩০,৪০৮	৪৯,০৩৮	১০,৪৩,৪১৭	

নারিকেল

নারিকেল যে কত রকম কাজে লাগে তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। আমরা কেবল ইহার ফলের জল ও শাঁস খাই, ছোবড়া পোড়াই; পাতার কাঠিতে ঝাঁটা তৈয়ারী করি এবং অবশিষ্ট অংশগুলি রান্নাঘরে লাগাই। নারিকেলের তৈল মেয়েরা মাথায় মাখেন বটে তবে সে-তেল বাংলাদেশে খুব কমই হয়।

দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে লোকদের প্রধান উপজীব্য নারিকেল গাছ। পল্লীবাসীরা ছোট ছোট নৌকায় করিয়া সমুদ্র দিয়া কোচীনের বন্দরে নারিকেলের শাঁস ছোবড়া দড়ি বা কাতা প্রভৃতি লইয়া যায়। আমাদের গ্রামে যেমন ধান বা পাট দিয়া লোকে অনেক সময়ে গ্রামের দোকানীর কাছ হইতে তাহার সংসারের খরচের জিনিষপত্র পায়—মালাবারে তেমনি নারিকেলের সুতা বা দড়ি দিয়া গ্রামবাসীরা সব রকম জিনিষ বিনিময়ে সংগ্রহ করে। মালাবারে কি পরিমাণ নারিকেল গাছ আছে এবং কি পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহার কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। মোটামুটি প্রতি একারে প্রায় দেড় হাজারের উপর ফল হয় এবং বৎসরে প্রায় ৮০ কোটি নারিকেল হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইহার মূল্য ৪ কোটি টাকা ছিল।

মালাবারে নারিকেল

নারিকেলের শাঁস বৈদেশিক বাণিজ্যের দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয়। নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া মালা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। জলটা লোকে শুধুই খায় বা গাঁজাইয়া মাদকরূপে পান করে। শাঁসগুলি কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বন্দরে চালান দেয়। যুদ্ধের পূর্বে আরমেনী একা

নারিকেলের বিচিত্র ব্যবহার

শতকরা ৭৩ ভাগ শাঁস এবং তৈলের মাত্র ৩৩ ভাগ লইত। হামবুর্গ ছিল এই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র; জারমেনীর এলবে নদীর ধারে অনেক গুলি নারিকেল তেলের কল চলিত। তেল বাহির করার পর যে খৈল থাকে তাহা গোরু, ছাগলের উপাদেয় খাদ্য এবং ক্ষেতের খুব ভাল সার। জারমেনী এই সারটি পাইবার জন্য কাঁচামাল আমদানী করিত এবং সেইজন্য নারিকেল তৈলের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়া নারিকেলের শাঁস বিনা শুল্কে দেশ মধ্যে আসিতে দিত। এই তৈল ১৯১৩ সালে ইংলণ্ডেই ৩০ হাজার টন্ রপ্তানী হয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আহার্য্য তৈল ও ঘৃতের প্রয়োজন বাড়িয়া গেল—অথচ বাণিজ্য বন্ধ। তখন ইংলণ্ডে এই শিল্পের সৃষ্টি হইল। বর্ত্তমানে এই বাণিজ্য জারমেনীর হাত হইতে ইংলণ্ডের হাতে গিয়াছে। ইংলণ্ড ভারত হইতে ৫৭ হাজার পাউণ্ডের তৈল ১৯২৩-২৪ সালে আমদানী করে। ১৯২৩-২৪ সাল আমেরিকা ছিল প্রধান খরিদ্দার। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড। নারিকেল তৈল সাবানে ও নানাপ্রকার ঔষধে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে।

নারিকেলের ছোবড়া হইতে সুতা ও দড়ি হয়। ইহা এখনো কুটির শিল্প। ছোবড়া সমুদ্রের ধারে মাটিতে ৮।৯ মাস কখনো কখনো দেড় বৎসর পুঁতিয়া রাখা হয়। তার পর কাঠের উপর ইহা থ্যাত্লাইয়া মেয়েরা চরকা দিয়া সুতা কাটে। এই সুতা বেনিয়া, দোকানী, কোম্পানীর লোক ইত্যাদি নানা হাত ফিরিয়া জাহাজে উঠে। বর্ত্তমানে কোচীনে কাছি, ম্যাটিং, পাপোষ প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। অধিকাংশ দড়ি ও সুতা বিদেশে চালান হইয়া যায়। অথচ নারিকেল তেল, নারিকেলের দড়ি বা কাছি, ম্যাটিং সমস্তই এ দেশে তৈয়ারী হইতে পারে। ভারতবর্ষের

নারিকেলের ছোবড়ার প্রয়োজনীয়তা

কৃষিক্ষেত্রগুলি প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ নারিকেলের সার হইতে বঞ্চিত হইতেছে এবং বিদেশ হইতে বহুপ্রকারের সার কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

কাগজ

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে তালপত্রে ও ভূর্জপত্রে পুঁথি লেখা হইত; এই সকল পুঁথিপত্র কীট দংশন হইতে বাঁচাইবার উপায় সেকালের পণ্ডিতগণ জানিতেন; বর্তমানে সে-শিল্প একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কাগজের চলন এদেশে খুব প্রাচীন; তুলোট কাগজের খুব প্রাচীন পুঁথি এদেশে আবিষ্কৃত হইতেছে। ভারতের অধিকাংশ স্থলেই এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল; বড় বড় সহরে এক এক মহল্লার নাম এই কারিগরদের শিল্পানুযায়ী হইত। হাতে তৈয়ারী কাগজ এখনো বহু স্থানে প্রচলিত আছে; অনেক স্থলে গ্রামের দোকানী ও জমিদারগণ এই কাগজ ব্যবহার করাকে পসার ও পবিত্রতার পরিচায়ক মনে করেন। বর্তমানে অনেক জেলখানাতে এই কাগজ তৈয়ারীর শিল্প পুনপ্রবর্তিত হইয়াছে। দেশীয় কারিগরগণ কোনো প্রকার কলকব্জার সাহায্যে ইহা প্রস্তুত করে না; ছেঁড়া কাগজ পচাইয়া বাটিয়া, কাই বানাইয়া এবং বারকোশে ফেলিয়া কাগজ করে। বর্তমানে কাগজের যে বিপুল প্রয়োজন তাহা এই হাতে-করা কাগজ কখনো পুরণ করিতে পারিবে না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে কিছু কিছু দেশী কাগজ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহা কিছুমাত্র দেখা যায় না।

দেশী তুলোট কাগজ

বিলাতী ধরণে কাগজ বানাইবার কলের ইতিহাস খুব পুরাণো। মান্দ্রাজের তাঞ্জোর জিলায় দিনেমারদের রাজ্যে ১৭১৬ সালে এক খৃষ্টান পত্রিকা প্রকাশিত হয়; সেই পত্রিকার কাগজ বানাইবার জন্য এক কল স্থাপিত হয়। যে মুদ্রাযন্ত্রে সেই কাগজ ছাপা হইত সেটি নাকি

বিদেশী প্রথায় কাগজ প্রস্তুত

এখনো আছে, তবে কাগজের কলটি বহুকাল যাবৎ উঠিয়া গিয়াছে। বিলাতী ধরণে কাগজ করিবার ইহাই প্রথম চেষ্টা।

"শ্রীরামপুরী কাগজ"

বাংলা দেশে প্রথম চেষ্টা ১৮১১ সালে। শ্রীরামপুরে এই কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এখনো আমরা "শ্রীরামপুরী কাগজ" বলি, কিন্তু যথার্থ শ্রীরামপুরে কোনো কাগজের কল বর্তমানে নাই।

"বালির কাগজ"

১৮৭০ সালের পূর্বে কাগজ বানাইবার বড় কল এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই বৎসরে প্রথম বিলাতের এক কোম্পানী কলিকাতার নিকটে বালিতে কাগজের কল খুলিলেন। ১৯০৫ সালে এই কল উঠিয়া যায় এবং ইহার কলকজা টিটাগড় কাগজের কলওয়ালারা কিনিয়া লয়। বর্তমানে আমরা যাহাকে "বালির কাগজ" বলি—তাহাও যথার্থ পক্ষে এখন নাই।

গবালিয়ারে কল

ইহার পর লক্ষ্ণৌতে Upper India Couper Paper Mill ১৮৭৯ সালে স্থাপিত হয়। বর্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় ৩,৩০০ টন্ কাগজ তৈয়ারী হয়। মহারাজা সিন্ধিয়া গবালিয়ারে একটি কল স্থাপন করেন; কিন্তু কয়েক বৎসর কাজের পর তাহা আর না চলায়, বামার লরী সাহেব কোম্পানী ইহার ভার লইয়া চালাইতেছে। এখন বাৎসরিক ১,২০০ টন্ কাগজ সেই কলে তৈয়ারী হয়।

অন্যান্য স্থানের কাগজের কল

টিটাগড় কাগজের মিলের মূলধন ভারতেই তোলা হয়। কাঁকিনাড়ায়, বালির কাগজের কলের অনেক অংশ কিনিয়া লওয়ায় ইহাদের কারবার খুব জাঁকাইয়া চলিতেছে। বর্তমানে ৮টি কলে ১৮,০০০ টন্ কাগজ প্রতি বৎসর হইতেছে।

রাণীগঞ্জের কাগজের কল ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের

তিনটি কলে ৭,০০০ টন্ কাগজ হয়। এছাড়া বোম্বাইতে দুটি কল, সুরাটে একটি ছোট কল, ত্রিবঙ্কুরে একটি কল আছে। ভারতের কাগজের প্রয়োজন প্রতিবৎসর ৭৫,০০০ টন্, ইহার মধ্যে দেশীয় কলে মাত্র ৩০,০০০ টন্ তৈয়ারী হয়। সুতরাং অবশিষ্ট ৪৫,০০০ টনের জন্য আমরা বিদেশের মুখাপেক্ষী। এই কলগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়, দুই একটি কল ছাড়া অধিকাংশই কোনো লাভ দেখাইতে পারে না।

ভারতে যে কাগজের কল ভালরূপে চলে না তাহার প্রধান কারণ হইতেছে যে এখানকার কলওয়ালারা বিদেশ হইতে কাগজ বানাইবার 'কাই' আমদানী করেন। আমেরিকা ও য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে এই 'কাই' বা পাল্প কাঠ ও ঘাস হইতে প্রস্তুত হয়। সেখান হইতে 'কাই' আনাইয়া কাগজ বানাইয়া, বিদেশী আমদানী কাগজের সহিত প্রতিযোগিতা করা খুব শক্ত কথা। অথচ ভারতের বহু প্রকারের আঁশাল ও ঘাস্ জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে যাহা হইতে কাগজের এই 'কাই' বানান যায়। বাঁশও প্রায় আঠার রকমের আছে। ঘাস হইতেও এই 'কাই' তৈয়ারী হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত তেমন কোনো চেষ্টা হয় নাই। যুদ্ধের সময়ে য়ুরোপ হইতে কাঠের 'কাই' আসা যখন বন্ধ হইল, তখনই দেশীয় উপাদান সংগ্রহের দিকে ভারতীয় কলগুলির দৃষ্টি গেল সাহেবগঞ্জ 'সাবুই' ঘাসের একটা প্রকাণ্ড বাজার; এখান হইতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মণ ঘাস কলিকাতায় চালান হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর এখন পুনরায় আমেরিকা ও জাপানের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে; এবং দেশীয় কাগজ এইবার টিকিতে পারিবে কিনা তাহা সন্দেহ। কারণ 'কাই' একমাত্র জিনিষ নয়; ঘাসের কাই, কাঠের কাই, অথবা ছেঁড়া কাপড় হইতে যে কাই বানানো হয় উহাকে শোধন করিতে যে-সকল

বিদেশী আমদানী "কাই" বা pulp

অপর্য্যাপ্ত ভারতীয় উপাদান

রাসায়নিক দ্রব্য লাগে তাহাও বিদেশ হইতে আসে। বর্তমানে কিছু কিছু জিনিষ হইতেছে। কাগজ চক্চকে করিতে চীনমাটি লাগে; সেই মাটি এখন অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

কাগজ ছাড়া পেষ্ট বোর্ড এদেশে সহজেই তৈয়ার করা যায়; অথচ ইংলণ্ড ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশ হইতে এই সামান্য জিনিষও লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী হয়।

১৯১৬ সালে ভারতবর্ষে সর্বসমেত ৮টি কাগজের কল ছিল; ইহাদের মূলধন প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা। ১৯১৬-১৭ সালে ৩১.৯০০ টন্ কাগজ এই কলগুলি হইতে তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯২২-২৩ সালে কলের সংখ্যা হইয়াছিল ৮টি ও মোট উৎপন্ন কাগজ ২৫,৯৭০ টন্, অর্থাৎ ৬,০০০ টন্ কাগজ কমিয়াছে। ১৯২৩-২৪ সালে ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় বিদেশী কাগজ আমদানী হয়। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার কাগজ ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিল। জারমেনী হইতে আসিয়াছে ৪৮ লক্ষ টাকার কাগজ।

কাগজের কল।

	মূলধন	মজুরী	মাল	মূল্য
বৃটীশ ভারত ১৯২৩	৭,৫৩ লক্ষ টাকা	৫,২৫৩	২৫,৬০২টন্	১,৩৯ লক্ষ
দেশীয় রাজ্য „	১,০,৪৯ হাজার	১০৪	৩৭৮	১,২৮হাজার

প্রাণীজ আঁশাল সামগ্রী—রেশম

প্রাণীজ আঁশাল-সুতার মধ্যে রেশমই প্রধান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যের সময়ে প্রথম প্রথম রেশমের শিল্প ও বাণিজ্য দুইই উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বহু প্রকারের রেশমের গুটি এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে চীন ও জাপান হইতে ভাল জাতের গুটি পোকা আমদানী করিয়া য়ুরোপের

রেশম শিল্পের ইতিহাস

দক্ষিণে সেগুলিকে তদ্দেশোপযোগী করিবার জন্য সুরু হইল। ফ্রান্স ও ইতালীতে এই নূতন শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রেশমের অধোগতি আরম্ভ।

তসর, মুগা ও এণ্ডী

এদেশে তিন প্রকার রেশমের গুটি পাওয়া যায়। তসর, মুগা ও এঁড়ী পোকা নিম্ন পার্বত্য ভূমিতে পাওয়া যায়; সকল প্রকার গাছপালা খাইয়া এই পোকা বাড়িতে থাকে। মুগা আসাম পূর্ববঙ্গ ছাড়া আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। আসামের ঘরে ঘরে মেয়েরা তাঁতে মুগার কাপড় তৈয়ারী করেন। এঁড়ী পোকা সরিষার গাছ খাইয়া জীবিত থাকে। শিল্পের ও সৌন্দর্য্যের দিক হইতে মুগার দাম ও আদর সব চেয়ে বেশী।

বিভিন্ন স্থানে রেশমের উন্নতির চেষ্টা

ভারতবর্ষের রেশমের উন্নতির জন্য বহু প্রকারের পরীক্ষা করা হইয়াছে। য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে ভারতের রেশমের অধোগতির কারণ পোকার ব্যাধি ও পরগাছার উপদ্রব। কাশ্মীরে য়ুরোপীয় প্রথানুসরণ করিয়া ফল খুব ভাল হইয়াছে। মহীশূরে জাপানী প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। বিখ্যাত তাতা কোম্পানী মহীশূরে বড় একটা ফার্ম খুলিয়াছেন। মহীশূর সরকার স্বীয় প্রজাদের রেশম ও গুটি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য তাতা কোম্পানীকে বাৎসরিক তিন হাজার করিয়া টাকা দান করেন। রেশমের উন্নতির জন্য খৃষ্টীয় মুক্তি-ফৌজের দল অনেক কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া তুঁত গাছ চাষে লোককে উৎসাহ দিতেছেন এবং তাঁহাদের পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে রেশমের চাষ ও কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পঞ্জাবে তাঁহাদের এ কাজ খুব আগাইয়াছে। বাংলাদেশে বরহমপুরে গভর্ণমেণ্টের একটি রেশমের কুটি আছে।

বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী ও বর্দ্ধমান জেলায় তুঁত

পোকার রেশমগুটি বিখ্যাত। রংপুর, জলপাইগুড়ী, বগুড়াতে এঁড়ী রেশম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশেই সব চেয়ে অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয় এবং বর্মা ও পঞ্জাবের লোকেরা ইহার সদ্ব্যবহার সব চেয়ে বেশী করে। শিল্পের কাজ এখনো গ্রামের কুটিরের মধ্যে আবদ্ধ; কারবারী আকারে ইহার আয়তন সামান্যই প্রাসারিত হইয়াছে। এককালে বাংলা দেশের নানাস্থানে রেশমের কুটি ছিল, এখন সেই সমস্ত বাড়ী চামচিকার বাসা।

বাংলাদেশের রেশমের চাষ

রেশমের মি কাজের জন্য এককালে আমাদের দেশ পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত ছিল। কিংখাব নামে রেশম ও সোনারূপার কাজ করা এক প্রকার মূল্যবান কাপড় হয়। কাশী, আহমদাবাদ ও মুর্শিদাবাদের কিংখাব, বাফ্‌তা বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। বুটাদার বা ফুলতোলা কাপড়ের কাজের জন্য মুর্শিদাবাদ, কাশী, মুলতান, বহাবলপুর, আহমদাবাদ, সুরাট, পুণা, রৈচুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান প্রসিদ্ধ; এছাড়া সাঙ্গী, গুলবদন, মশরু, গরদ, মটক, কেটে, কোরা, সাটিন প্রভৃতি নানা প্রকার বস্ত্রের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান খ্যাত। এ সমস্ত শিল্প এখনো কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ। বৃটীশ ভারতে ১৯২৩ সালে ৫টি, দেশীয় রাজ্যে ১টি রেশমের কারখানা ছিল। এই সব কারখানায় মাত্র ১,৫০০ লোক খাটিত।

অন্যান্য স্থানের রেশমের কাজ

ভারতে রেশমের চাষ ও শিল্প ধ্বংসোন্মুখ। ১৭৭২ সালে সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে রেশম রপ্তানী হয়। তারপর পাঁচ বৎসরে গড়ে ১,৮০,০০০ পাউণ্ড চালান হয়। ১৭৮৫ সালে ৩,২৪,৩০৭ পাউণ্ড ও ১৭৮৫ সালে ৩,৮০,৩৫২ পাউণ্ড রেশমের সামগ্রী রপ্তানী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও বাংলার রেশম য়ুরোপে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও ইতালীতে রেশমের চাষ আরম্ভ হইল ও ভারতের

রেশমের ভাগ্য বিপর্য্যয় সুরু হইল। ১৮৫৭ সাল হইতে শিল্কের বাণিজ্য উল্টা হইতে সুরু করিল। শিল্কের সুতার সামগ্রীর বদলে কাঁচামাল রপ্তানী হইতে লাগিল। ১৮৬৭ সালেও ২২,২৬,০০০ পাউণ্ড (মূল্য ১৫,১২,৮১৯ টাকা) ওজনের কাঁচা রেশম রপ্তানী হইয়াছিল।

শিল্কের সামগ্রীর রপ্তানী দিন দিন কমিতেছে। ১৮৯৩ সালে ১,৬২,০০০ পাউণ্ড মূল্যের রপ্তানী হয়; ১৯০৩ সালে ৫৫,০০০ পাউণ্ড, ১৯১০ সালে ৩৭,৭৪০ পাউণ্ডের, ১৯২২ সালে ১৪,৬৭৮ পাউণ্ডের সামগ্রী রপ্তানী হয়। এখন দেশীয় শিল্ক ফাক্টরী ও তাঁতের জন্য বিদেশী শিল্ক আমদানী হইতেছে। শত বৎসরে যুগান্তর হইয়া গিয়াছে।

পশমের কারবার

পশমের কাজ উত্তর ভারতে ও হিমালয়ের পাদমূলে বহু সহস্র বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাশ্মীরের শাল, আলোয়ান, লুই, ধোসা, পট্টু প্রভৃতি গরম কাপড় সবদেশেই সুপরিচিত। বর্ত্তমানে লুধিয়ানা, ধারবাল ও কাণপুরে বিপুল আয়োজন সহকারে পশমের কাজ কারবারী ফাঁদে চলিতেছে। কাণপুরের লালিমলি মিল খুব বিখ্যাত; তবে ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী মূলধনে চলিতেছে। বৃটীশভারতে ১০টি মিল আছে, ও দেশীয় রাজ্যে ৪টি মিল ও ৫টি শাল প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।

ভেষজ শিল্প

ঔষধাদিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—একটি উদ্ভিজ্জ, অপরটি খনিজ। এককালে ঔষধের শিল্প একটা বড় রকমের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু দেশে আয়ুর্বেদ ও হাকিমী চিকিৎসার অনাদর ও অধঃপতনের সঙ্গে ঔষধাদি সংগ্রহে লোকের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। আজকাল বিদেশীভাবে চিকিৎসার চলন হইয়াছে বলিয়াই ঔষধ পথ্য সবই বিদেশ হইতে

দেশীয় চিকিৎসার অধঃপতন

আসিতেছে। ভারতে প্রায় দেড় হাজার রকমের গাছপালায় ঔষধাদি হয় বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু ৫০।৬০ প্রকারের গাছপালা ছাড়া আরগুলি সম্বন্ধে কোন তথ্যই অনুসন্ধান হয় নাই। এ দেশের অধিকাংশ ভৈষজ-গাছপালা ও শিকড়, পাতা প্রতি বৎসর বিদেশে চালান যায়। যুদ্ধের পূর্বে জারমেনী ইহার প্রধান খরিদ্দার ছিল; অনেক ঔষধ জারমেনীতে তৈয়ারী হইয়া ইংলণ্ডে আসিত, ও সেখান হইতে পুনরায় ভারতে আসিত। ভারতবর্ষে এই সকল ঔষধ তৈয়ারী করার অনেক বাধা।

উদ্ভিদাদির বিদেশে রপ্তানী

হিমালয়ের পাদমূল হইতে কাঁচা সামগ্রী আনিয়া বোম্বাই বা কলিকাতায় ঔষধ করিতে যে রেল পড়ে তাহা জারমেনী হইতে লণ্ডন ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিতে পড়ে না। এখন গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে দেশের লোক কোম্পানী খুলিয়া এই সকল ঔষধ এখানে প্রস্তুত করেন। যুদ্ধের সময়ে কোন কোনো ঔষধের দাম পাঁচ দশগুণ হইয়াছিল। সরকার স্বয়ং দার্জিলিং ও নীলগিরি পাহাড়ে সিনকোনা গাছ পুঁতিয়া কুইনাইনের নির্য্যাস বাহির করিতেছেন। তথায় ১৯২৫ সালে ৫,৬০ হাজার পাউণ্ড ওজনের সিনকোনা ছাল বিদেশে (৫,৩৪ হাজার ইংলণ্ডেই) চালান হয়। ইহার মূল্য মাত্র ২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। কিন্তু কুইনাইন আসে ৩০ লক্ষ টাকার। ১৯২৫ সালে ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার ঔষধ আমাদের দেশে আমদানী হয়। (Seaborne Trade, 1925 p 32.)

রসায়ন শাস্ত্র আমাদের দেশে এখনো তেমন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কলিকাতার বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস ছাড়া নাম উল্লেখ করিবার মত আর কোনো দেশীয় কারখানা ভারতবর্ষে নাই। এ দেশে সামগ্রীর অভাব নাই। দেশের আয়ুর্বেদ ও হাকিমি চিকিৎসা পুন-র্জীবিত না হইলে এবং বর্তমান সময় ও বিজ্ঞানোচিত উপায়ে পরীক্ষাদি

না করিলে লোকের শ্রদ্ধা বিশ্বাস ফিরিবে না। আমাদের দেশে টোট্‌কা ঔষধ অসংখ্য, সেগুলিকেও বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করিয়া য়ুরোপীয় আদর্শে তাহার প্রচলন করা প্রয়োজন।

আহার্য্য সামগ্রী—চাল

খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে শস্যই প্রধান। শস্য বলিতে ধান, গম, বিবিধ প্রকারের ডাইল বা কলাই বুঝায়। সকল প্রকার খাদ্য শস্য প্রায় ২ কোটি একার জমিতে চাষ হয়। ইহার মধ্যে চালই প্রধান। পৃথিবীর বার্ষিক উৎপন্ন ধান অনুমান ৯ কোটি টন। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষে (ব্রহ্ম দেশ লইয়া) ৩৫ ভাগ উৎপন্ন হয়। ১৯২৩ সালে সমগ্র বৃটীশ ভারতে ৮ কোটি ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার একার জমিতে ধান চাষ হয়। ইহার মধ্যে বাংলা দেশে ২৭ ভাগ জমি আছে অর্থাৎ ২,১৭,৭৩ হাজার একার। আসামের কর্ষিত জমির শতকরা ৮০ ভাগ, বর্মার ৭৪ ভাগ, বঙ্গদেশের ৭০ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয়। ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণে চাউল রপ্তানী হয় তাহা সমস্ত উৎপন্ন-শস্য শতকরা ৬ ভাগ অর্থাৎ ২০,৮৭,০০০ টন রপ্তানী হয় ১৯২২-২৩ সালে। কিন্তু এই রপ্তানী চালের অধিকাংশই বর্মা হইতে যায় (অর্থাৎ ৮৬%)। ভারতীয় চালের প্রধান খরিদ্দার সিংহল; বিদেশীদের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে বা পরে জারমেনীই প্রধান গ্রাহক, সে একাই ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন চাল আমদানী করে।

চাল ঘরেই ভানা হইত। কিন্তু বর্তমানে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে, গ্রাম অঞ্চল হইতে সহর ও শিল্পকেন্দ্রে প্রেরণের জন্য চালের কুটীর শিল্প কারবারী আকার ধারণ করিতেছে। বর্মায় প্রায় ৬০০ চালের কল আছে। আজকাল বাংলা দেশেও বহু শত কল হইয়াছে। সমগ্র বৃটীশ ভারতে ১,১০৪টি চালের কল আছে, এক

বৎসরে ১৭৩টি কল বাড়িয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি বোলপুরে গত দশ বৎসরের মধ্যে ২০টি চালের কল হইয়াছে এবং আরও হইতেছে। এই একটি ষ্টেশন হইতে বৎসরে লক্ষ মণ চাল রপ্তানী হয়। তবে এই সব মিল হইতে চালান দেশের মধ্যেই হয়।

গম

পৃথিবীতে গম উৎপন্ন হয় ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টন্। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষেই দশ ভাগের এক ভাগ জন্মায়। গম-আবাদী জমির হিসাবে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়, কিন্তু উৎপন্ন হিসাবে উহা তৃতীয়। অর্থাৎ ভারতের জমির উৎপাদিকা শক্তি কম। ১৯২২-২৩ সালে ৩,০৮,৪৪ হাজার একার জমিতে ৯৮,৮৮ হাজার টন্ গম উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে ৬,৩৮,০০০ টন্ বিদেশে যায়। যুদ্ধের সময়ে গমের দর ভীষণ চড়িয়াছিল; দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে গম মেসোপটেমিয়া ও অন্যান্য স্থানের সৈন্যের জন্য রপ্তানী হয়; এছাড়া বৃষ্টির অভাবে ফসল অল্প হয়। ইহার ফলে দেশব্যাপী যে নিদারুণ অভাব হইয়াছিল তাহা লোকের মনে এখনো স্পষ্ট রহিয়াছে। সরকার অবশেষে এ বিষয়ে বিধি নিষেধ স্থাপন করেন।

গম হইতে আটা, ময়দা ও সুজি প্রস্তুত হয়। উত্তর ভারতের বিশেষভাবে পঞ্জাবীদের প্রধান খাদ্য আটা। বাংলাদেশে ময়দার প্রচলন বেশী।

অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যব, ডাইল, জোয়ার, বাজরা, ছোলা, ভুট্টা, ওট্। এসব খাদ্যশস্যগুলির কিছু কিছু প্রতি বৎসর রপ্তানী হয়।

খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় কিনা এবং দেশের অধিবাসী অনুপাতে সেই খাদ্যশস্য প্রচুর কিনা সে-বিষয় অর্থনীতিজ্ঞগণের মধ্যে

মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন পাট ও তুলা প্রভৃতির ফসল বাহিরের চাহিদার উপর নির্ভর করে এবং অন্য দেশের কলের খাঁকতি ভরাইবার জন্য উৎপন্ন করা হয়।

চা ও কফি

অন্য খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে চা, কফি দেশ মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার লাভ করিতেছে। ব্যবসায়ও সমস্যা হিসাবে চায়ের কারবার বিশেষ ভাবে বর্ণনীয়।

চাএর ব্যবসায় ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে এ দেশে ছিল না। আমাদের দেশে ধানের মত চা ছিল চীনের লোকের ধন। ধান দিয়া যেমন এককালে সব জিনিষ বিনিময়ে পাওয়া যাইত তেমনি চীনে চা দিয়া সব জিনিষ পাওয়া যাইত। হিমালয়ের দক্ষিণে চা-এর বাগান অতি প্রাচীন কাল হইতে ছিল। কিন্তু কারবারী আকারে চা উৎপন্ন করিবার ইতিহাস খুব পুরাণো নয়।

চাএর উৎপত্তিস্থল

চা সাধারণত আসামে, বাংলাদেশে, দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহলে উৎপন্ন হয়। এই চা-বাগিচায় উত্তর-পশ্চিম, বিহার, বাংলা, মাদ্রাজ, ও মধ্যপ্রদেশের লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করিতেছে; এসব প্রদেশে আর চাষের জমি নাই ও উদ্বৃত্ত লোক ভূমি না পাইয়া কুলিগিরি করিবার জন্য চা-বাগানে যায়। আসামে লোকসংখ্যা খুবই কম, সেখানে এই কুলীদের সংমিশ্রণে এক নূতন জাতি সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং লোক-সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ব্যবসায়ে দেশীয়দের উৎসাহ প্রথম প্রথম তেমন দেখা যায় নাই, কিন্তু ইদানীং দেশীয়দের কয়েকটি চা-বাগিচা খুব ভালরূপ চলিতেছে। ১৯১৬-১৭ সালে সমগ্র ভারতে ৬া০ লক্ষ একার জমিতে, ১৯২২-২৩ সালে ৭ লক্ষ ৭ হাজার একার জমিতে চা-বাগিচা ছিল।

নিম্নে কোথায় কতখানি চা হয় তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

১৯২২-২৩ সাল

	একার	পাউণ্ড (হাজার)
আসাম-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সুরমা (কাছাড়-শ্রীহট্ট)	৪,১২,৪৯৯	১৯,৮৯,২৫
বাংলা দেশ	১,৮০,৩৭৮	৭,১৭,২১
বিহার উড়িষ্যা	২,১১৬	২,০০
যুক্তপ্রদেশ	৬,০১৫	১৫,৪২
পঞ্জাব	৯,৭৬২	১৫,৪৮
মাদ্রাজ	৪৩,৬০২	১,৪২,৪০
ত্রিবঙ্কুর, কোচিন	৪৮,৩০৮	২,২৩,০৭
ত্রিপুরা	৫,০৫৩	১,১৪
মোট	৭,০৭,৭৭৩ একার	৩১,০৫,৯৭,০০০ পাউণ্ড

চায়ের ব্যবসায় দেখিতে দেখিতে খুব উন্নতি হইতেছে ; যুদ্ধের পূর্বে বৃটীশ সাম্রাজ্যের নানাঅংশে ভারতবর্ষ হইতে ৮২,২৫ হাজার পাউণ্ড দামের চা রপ্তানী হইয়াছিল ও অন্যান্য দেশে ১৭,৩৫ হাজার পাউণ্ড। ১৯২২-২৩ সালে ২৮ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী হয় ; ইহার মূল্য ছিল ১ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড ; অর্থাৎ সমগ্র রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৭ ভাগ। ইংলণ্ড ইহার প্রধান খরিদ্দার। কিন্তু এই চা-বাগিচায় অধিকাংশ মূলধন বিদেশী বলিয়া ইহার লাভের অংশ ভারতবাসীর ভাগে খুব কম পড়ে।

চায়ের ব্যবসা

বর্তমানে ভারতে চায়ের ব্যবহার খুবই বাড়িয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসর দুই-তিনকোটি পাউণ্ড চা ব্যবহার হয়। ১৯২২-২৩ সালে ২,৮৩, ১৬ হাজার পাউণ্ড চা ভারতে ব্যবহারের জন্য মজুত ছিল।

আরব দেশ হইতে একজন মুসলমান হাজি মহীশূরে প্রায় দুইশ' বৎসর পূর্বে কফি আনিয়াছিল বলিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবাদ আছে। কফি লইয়া গত শতাব্দীতে কিছু কিছু পরীক্ষা ও চেষ্টা হইয়াছিল; কারবারী ধরণে কফি-বাগিচা ১৮৪৬ সালে নীলগিরিতে স্থাপিত হয়। ১৮৯৬ সাল হইতে কফি-বাগিচার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে কমিতেছে, চা ও রবার গাছ কফির স্থান লইতেছে; সস্তা ব্রেজিলিয়ান্ কফি য়ুরোপে চালান হইতে আরম্ভ করায় ভারতীয় কফির আদর ও চালান কমিয়া গিয়াছে।

কফি

ভারতবর্ষ চিনি বা ইক্ষুর আদিম স্থান। এখনো পৃথিবীতে আর কোথায়ও এত জমিতে শর্করা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এ দেশে চাষের এমনি দুর্দ্দশা যে বিঘাপ্রতি যে-পরিমাণ ইক্ষু উঠে তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম এবং ফলে আজ ভারতবর্ষ নিজ ইক্ষুক্ষেত হইতে দেশবাসীর শর্করা সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। ইহার ফলে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানী হইতেছে। জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া হইতে এক সময়ে 'বিট' বা শালগমের চিনি এদেশে আসিত। বর্ত্তমানে জাভাদ্বীপ ও মরিশাসদ্বীপ হইতে চিনি আমদানী হয়।

চিনি

ভারতে ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার একার জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। ১৯০১ হইতে ইক্ষু চাষ প্রায় শতকরা ৮ ভাগ করিয়া কমিয়াছে। দেশের লোকে ভাল চিনি সস্তায় প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানে না; ইহার ফলে বিদেশী চিনির আমদানী দিন দিন বাড়িতেছে ও আমরা ওলন্দাজ বণিকদের অর্থাগমে সাহায্য করিতেছি।

ভারতে গুড় উৎপন্ন হয় ২৫ লক্ষ ৩২ হাজার টন্। এ ছাড়া ৩১টি চিনির কারবার আছে। সেখানে ৭৭,৬০০ টন্ পরিষ্কার চিনি উৎপন্ন হয়। দেশী উপায়ে আরও প্রায় ৪০ হাজার টন্ দোবরা চিনি তৈয়ারী

হয়। সিংহলে ও মালয় উপদ্বীপে ভারতীয় গুড় রপ্তানী হয়। ভারতের চিনি ও গুড় যথেষ্ট হয় না বলিয়া ৪,৪২,০০০ টন্ জাভার চিনি আমদানী হয়।*

৭। বাণিজ্য

প্রাচীন বাণিজ্য

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই দুই একজন ব্যবসায়ী থাকিত, তাহারা একাধারে মহাজনের তেজারতী কাজ ও ব্যবসায়ীর কেনাবেচা করিত। কয়েকখানি গ্রামের মাঝে একটি হাট থাকিত; সেই হাটে হাটবারে বেচাকেনা চলিত—অধিকাংশ কারবার বিনিময়ে চলিত। উদ্বৃত্ত মাল বাহিরের ব্যবসায়ী ও ফিরিওয়ালারা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু পথঘাট ভাল ছিল না বলিয়া এক গ্রামের জিনিষ সহজে অন্য গ্রামে বা সহরে লওয়া সুকঠিন ছিল। য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক দেশে নৌতার্য্য খাল খনন করা হয়—সেইজন্য আভ্যন্তর-বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। আমাদের দেশের প্রধান পথ নদী; নদীর ধারে 'গঞ্জে' জিনিষ-পত্র গো-শকটে আসিত।

প্রাচীনকালের বাণিজ্য

প্রাচীনকালে দ্রব্য-বিনিময়ের আর একটি স্থান ছিল তীর্থস্থানগুলি।

* Cotton—*Handbook*—P. 326-27.

বাণিজ্যের কেন্দ্র

ভারতবর্ষে অসংখ্য তীর্থস্থান আছে—ইহার কতকগুলি খুবই নগণ্য ও গ্রাম্য—তথাচ সর্বত্রই বছরে একবার করিয়া মেলা হয়। এ ছাড়া হরিহরছত্রের মেলা বহুকাল হইতে দ্রব্য কেনা-বেচার জন্য বিখ্যাত। বড় বড় সহর ও রাজধানীগুলি বাণিজ্যের ও শিল্পের কেন্দ্র ছিল।

এই সকল ব্যবসায়-বাণিজ্য কতকগুলি বিশেষ জাতের লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। রাজপুতনার মাড়োয়ারীরা ভারতের সর্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে, মান্দ্রাজের চেটিয়া, বোম্বাইএর পার্সী ও ভাটিয়ারা উক্ত প্রদেশগুলির একচেটিয়া ব্যবসায়ী; মুসলমানদের মধ্যেও ক্রমে এক এক স্থানের লোকেরা বাণিজ্য-বুদ্ধিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে বোম্বাইএর ও গুজরাটের বোড়া ও খোজারা নামজাদা ব্যবসায়ী, দিল্লীর মুসলমানেরাও উত্তর-ভারতে বিখ্যাত।

প্রাচীনকালে হিন্দুদের উপনিবেশ।

প্রায় তিন হাজার বৎসর ভারতবর্ষীয় হিন্দু বণিকেরা পূর্বগোলার্দ্ধে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইয়াছিল। পেগু, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, বালি, লম্বক, সুমাত্রা, বোর্ণিও, জাপান, সিংহলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-চীন, মলয়, আরব, পারস্য, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ও প্রাচীন জগতের বাণিজ্যের মহাকেন্দ্র আলেকজেণ্ড্রিয়াতে হিন্দুদের যাতায়াত ছিল।

মধ্যযুগের বাণিজ্য।

মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমানগণ বহির্বাণিজ্যবিমুখ ছিলেন; সুতরাং আরবী মুসলমানগণ য়ুরোপ ও এশিয়ার মধ্যস্থলে থাকিয়া বাণিজ্যের মধ্যবর্তিত্ব করিয়া বিপুল অর্থ লাভ করিত। পূর্বদ্বীপপুঞ্জ ও ভারত হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহারা মিশরের মধ্য দিয়া বা মেসোপটেমিয়া ও তুর্কীর ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরের কূলে গিয়া উপস্থিত হইত; সেখানকার বন্দরসমূহ হইতে ভেনিসের বণিকেরা পূর্বদেশের জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া য়ুরোপময়

প্রেরণ করিত। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্য ইতিহাস এইরূপই চলিয়াছিল।

ইতিমধ্যে আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পর্টুগীজেরা সমুদ্রপথে ভারতে প্রবেশ করিয়া আরবদের হাত হইতে বহির্বাণিজ্য কাড়িয়া লইল।

হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রতি কখনো তেমন মনোযোগ দেন নাই। হিন্দুরাজগণ মন্দিরনির্মাণে, বৌদ্ধ নৃপতিগণ স্তূপগঠনে, মহারাষ্ট্রাগণ দুর্গনির্মাণে, মুসলমান বাদসাঃগণ প্রাসাদ ও কবরগঠনে তাঁহাদের অর্থ-সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বর্তমানের বাণিজ্য

য়ুরোপীয় বণিকগণই প্রথম বাণিজ্য-নগরী বা ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। বর্তমান সভ্যতার কেন্দ্র এই বাণিজ্য-নগরী। গত চারিশত বৎসর ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যকে গ্রাম হইতে সহরে বা কুটীর হইতে ফ্যাক্টরীতে বা বহুজনের হাত হইতে কয়েক জনের মুষ্টির মধ্যে আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্তমান সভ্যতার গতি সেইদিকে।

পর্টুগীজ বণিকেরা অমানুষিক অত্যাচার করিয়া ভারতের বাণিজ্য হস্তগত করে। আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপ হইতে চীনের পূর্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূলে তাহাদের ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রাকৃতিক কারণের জন্য মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ভিতর বাংলাদেশই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল; ইহার অসংখ্য নদনদী বাহিয়া উত্তর-ভারতে বাণিজ্য চলিত। চাটিগাঁ, সাতগাঁ মুসলমান যুগের প্রধান বন্দর ছিল। ক্রমে নদীর জল শুকাইতে আরম্ভ করিলে সাতগাঁ বন্দরে বড় জাহাজ চলা অসম্ভব হইয়া উঠে ও গঙ্গার জলরাশি বর্তমান ভাগীরথী দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিলে পর্টুগীজরা হুগলীতে তাহাদের বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করে। তাহাদের বন্দর সমূহকে বাণ্ডেল বলিত।

পর্টুগীজদের দেখাদেখি ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরাজ সকলেই

বাণিজ্য বিস্তারের আশায় এ দেশে আসিতে লাগিল। এই বাণিজ্যজয় লইয়া বিবাদ ক্রমে দেশজয়ে পরিণত হইল; সে-সব যুদ্ধ ও রক্তপাত ইতিহাসের অন্তর্গত, সুতরাং এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কোম্পানীর বাণিজ্য

১৬০০ সালে ইংরাজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। তখন এই কোম্পানীর মূলধন ছিল মাত্র সাতলক্ষ টাকা ও অংশীদার ছিল ১২৫ জন। বৎসরে পাঁচ-ছয়খানি জাহাজ (ইহার মধ্যে ছয়শ'টনী জাহাজ দুই-একখানি মাত্র থাকিত) তিন মাস সমুদ্র ঘুরিয়া ভারতে আসিত। তখনকার বাণিজ্যের অসংখ্য বাধা ছিল; পথঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত,—য়ুরোপের দেশে দেশে লড়াই—সমুদ্রে বোম্বেটের উৎপাত; তা ছাড়া ঝড়ের ভয়, ব্যাধির আক্রমণ। এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ৭৫ বৎসর পরে এই কোম্পানীর বাণিজ্য প্রায় ১৩ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বে কোম্পানীর অংশীদারগণ শতকরা প্রায় ১৫০ হারে লাভ পাইয়াছিলেন; অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে কোম্পানীর আয়তন বাড়িতে লাগিল। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে কোম্পানী ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করেন এবং ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত শাসন ও বাণিজ্য একাধারে চালাইলেন। এই বৎসরে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য উঠাইয়া দেওয়া হয়—তখন নিজ কোম্পানীর মূলধন হইয়াছিল ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। এ ছাড়া বেসরকারী ইংরাজ বণিকদের মূলধন নিতান্ত অল্প খাটিত না। ১৮৩৩ সালে কোম্পানী একেবারে বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল রাজ্যশাসনে মন দিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কোম্পানীর বাণিজ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের তুলনায় নিতান্তই সামান্য ছিল। য়ুরোপীয় বণিকেরা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

তখনো তেমন করিয়া ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই ; উপকূল হইতে অধিক দূর পর্য্যন্ত যাওয়া সে যুগে দুঃসাধ্য ছিল ; পথঘাট সাধারণতঃ দুর্গম ছিল এবং এমন কি সুগম হইলেও সেখান হইতে অধিক পরিমাণে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনা এবং বিলাতে চালান দিয়া দাম পোষানো কঠিন ছিল।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ হইতে শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতে চালান যাইত। ইহাতে এ-দেশীয় কারিকরগণ লাভবান হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের মধ্যে শিল্পোন্নতি আরম্ভ হইলে এ-দেশের স্বার্থের সহিত সে-দেশের স্বার্থের বিরোধ বাঁধিল। এখানকার শিল্পজাত সামগ্রী—যেমন রেশমের ও সূতার কাপড়-চোপড় ও চিনি—ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত।

ভারতীয় ও বিলাতী বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে নূতন নূতন কল ও ষ্টীমশক্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে জিনিষ উৎপন্ন হইতে থাকিল। সেই সব জিনিষ ভারতে ও অন্যান্য দেশে চালান না দিলে লাভ করা অসম্ভব। সেইজন্য বহু আইন পাশ করিয়া ভারতের শিল্পজাত সামগ্রী য়ুরোপের বাজার হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত করা হয়। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বস্ত্র ব্যবসায় লইয়া যে প্রতিদ্বন্দিতা চলিয়াছিল তাহার ইতিহাস যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই দ্বন্দের সময়ে বিলাতের কলওয়ালাদের রক্ষা করিবার জন্য যে-সকল আইন পাশ করা হইয়াছিল, তাহার জন্য সে-যুগের ও পরবর্তিযুগের অনেক ভদ্র ইংরাজ লজ্জিত ও অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি কোম্পানীর জনৈক পরিচালক এসব ব্যাপারে তাঁহার তীব্র মত লিখিয়া গিয়াছেন। *

* Henry St. George-Tucker—Memorials of Indian Government.

১৮৪৬ সালে ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত হয় এবং ইহারই বৎসর দশ পরে কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার পার্লামেণ্টের উপর পড়ে। এতদিন এক দল বণিক রাজার নামে ভারত শাসন করিত—এখন স্বয়ং রাজা সে ভার লইলেন।

ভারতের বাণিজ্য-বিস্তার আরম্ভ হয় রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে। ১৮৪৬ সালে রেলপথ আরম্ভ হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে আট বৎসরের মধ্যে ২৭০ মাইল রেল নির্মিত হইয়াছিল। এই সামান্য রেলপথের সাহায্যেই বাণিজ্য খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তুলার রপ্তানী তিন গুণের বেশী হইয়াছিল। আমদানী সামগ্রীর মূল্য আট বৎসরেই প্রায় দেড় কোটি পাউণ্ড হইতে আড়াই কোটী পাউণ্ড দাঁড়ায়। এই কয় বৎসরেই রেলপথ যুগান্তর আনিয়াছিল। যতই রেলপথ বাড়িতে লাগিল ততই দেশের কাঁচামাল সহজে ও সুলভে বন্দরে আনীত হইতে লাগিল ও বিদেশের সস্তামাল দেশময় সহজে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৮৬৫ সালে সুয়েজখাল খোলা হইল; সুয়েজখাল কাটা হওয়াতে ভারতের বাণিজ্যের মূলে শেষ কুঠারাঘাত পড়িল; সহজে ও সস্তায় বিদেশী জাহাজ সমূহ আসা-যাওয়া করিতে আরম্ভ করিল।

রেলপথ ও বাণিজ্য-বিস্তার

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইংরাজ সরকার বুঝিলেন কেবলমাত্র রণনীতি ও রাজ্যরক্ষার দিক হইতেই রেলপথ নির্মাণ আশু প্রয়োজন। সেই জন্য ভারত-সাম্রাজ্য পুনরায় সুস্থির হইলে রেলপথ নির্মিত হইতে লাগিল। কিন্তু দ্রুত রেলপথ বিস্তারের আর্থিক ফল ভাল হইল না। প্রথমত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশীয় শিল্পী ও কারিকরগণ আমদানী ও বিদেশীমালের সহিত বাজারে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিল না। অকস্মাৎ বাজার বিলাতীমালে বোঝাই হইয়া গেল। একজন সাহেব লেখক লিখিয়াছিলেন যে, যদি এই রেলপথ বিস্তার

ধীরে ধীরে হইত—তবে হয় ত দেশীয় শিল্পী ও কারিকরগণ বিদেশী বণিকদের এই সহসা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত এবং য়ুরোপে যেমন ধীরে ধীরে লোকে নানা কাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন-যাত্রার সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল এখানেও তাহা সম্ভব হইত। এতদিন ভারতে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ছিল তাহা ধ্বংস হইল। শিল্পীর শিল্প ধ্বংস হওয়াতে তাহার একমাত্র গতি থাকিল কৃষি অবলম্বন; যাহারা জমি পাইল না তাহারা শ্রমজীবি হইল।

ভারতীয় অর্ণবযান

বাণিজ্য-বিস্তারের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে জলপথ। ভারতবর্ষের জাহাজ এককালে সমুদ্রপথে যাওয়া-আসা করিত—যখন তাহার নিজের বাণিজ্য নিজের হাতে ছিল। ভারতবর্ষের জাহাজ ও এখানকার লস্করদের অধঃপতনের ইতিহাস বড়ই শোকাবহ। সংক্ষেপে ভারতীয় সমুদ্রপথের ইতিহাস এখানে বিবৃত করিলে অবান্তর হইবে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আসিবার পূর্বে ভারতের বাণিজ্য দেশীয়দের হাতে ছিল এবং সমুদ্র-জাহাজ এদেশেই প্রস্তুত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে স্থরাটে ও পরে বোম্বাইতে ডক্ খোলেন। এই ডকের কর্তা ছিল পার্সীরা। একশত বৎসর ধরিয়া তাহারা এমন স্থচারুরূপে কাজ চালাইয়াছিল যে ইংলণ্ডেও সকলে তাহাদের প্রশংসা করিতেন। এই সব দেশী জাহাজের গঠনপ্রণালী ও বিশেষত্বসমূহ ইংরাজ জাহাজনির্মাতারা পরে গ্রহণ করেন। তখনকার ভারতীয় নৌবাহিনী বোম্বাইতে থাকিত। এই সব জাহাজ দেশেই প্রস্তুত হইত। দেশী জাহাজের উপাদান ছিল, সেগুণ, শাল ও শিশু কাঠ। এই সব কাঠ বিলাতের ওকের চেয়ে ভাল বলিয়া সকলে বলিতেন। বিলাতী জাহাজ বার বছর অন্তর বদলাইতে

জলপথ ও বাণিজ্য-বিস্তার

হইত, ভারতীয় জাহাজ পঞ্চাশ বছরেও কিছু হইত না। অনেক সময়ে ৭।৮ বার এদেশ হইতে বিলাত যাওয়া-আসার পরেও কোম্পানী রণ-বিভাগের জন্য দেশী জাহাজ ক্রয় করিতেন। বোম্বাইএর জাহাজ তৈয়ারী করিতে প্রায় সিকি খরচ কম পড়িত, আর বিলাতী জাহাজ বার বছর অন্তর বদলাইতে হইত বলিয়া খরচ হিসাব মত চতুর্গুণ পড়িত। বাংলাদেশে ঢাকা, সিলেট ও কলিকাতা জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র ছিল। কলিকাতার বন্দরে ১৭৮১ হইতে ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত ৩৫ খানি জাহাজ নির্মিত হইয়াছিল। ১৮০১ সালে ১৯ খানি, ১৮১৩ সালে ২১ খানি জাহাজ তৈয়ারী হয়। ১৮০১ হইতে ১৮২১ সাল পর্য্যন্ত হুগলী নদীতে ২৩৭ খানি জাহাজ নির্মিত হয়; ইহার ব্যয় প্রায় দুই কোটি টাকা পড়ে। ইহার অধিকাংশই দেশী লোকের হাতে নানা উপায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। এ ছাড়া উপকূলে বাণিজ্য নিতান্ত অল্প ছিল না; সে-সব বাণিজ্য দেশী নৌকা বা জাহাজে চলিত। বাংলাদেশের 'দোনী' নৌকা সমুদ্রে চলাফেরা করিত; মান্দ্রাজ হইতে লবণ আনা ছিল ইহার প্রধান কাজ; প্রতিমণ লবণে তাহারা ৫৫৲ টাকা করিয়া পাইত।

দেশীয় জাহাজের ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে বিলাতে ভারতীয় জাহাজে, ভারতীয় সামগ্রী, ভারতীয় লস্করদের দ্বারা চালিত হইয়া যাইত বলিয়া বিলাতে কথা উঠিল। ভারতীয় লস্করদের বিলাতে যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা সুরু হইল। এদিকে ১৮৪০ সাল হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে জাহাজ নির্মাণ করা এক প্রকার কমাইয়া দিল। ভারত-সাম্রাজ্য পার্লামেণ্টের হাতে যাইবার ৫ বৎসর পরেই ১৮৬৩ সালে ভারতের বন্দরে জাহাজ তৈয়ারী একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ভারতের বন্দরে বন্দরে প্রতিবৎসর খানকয়েক করিয়া জাহাজ নির্মিত হয়। সরকারী রিপোর্টে তাহাই

ships বলিয়া লিখিত। ১৯১০-১৫ সালে তৈয়ারী ১০৭ খানি জাহাজের মোট ওজন ৪২৮৫ টন্ ছিল; ইহার মধ্যে ৯৯ খানি sailing ship অর্থাৎ ঢাউস নৌকা। ৮ খানি steam ship! এই অনুপাতেই বরাবর হইয়াছে। ইদানীং কম। (Statist Abstract—3rd issue, p. 555).

এই শিল্প উঠিয়া যাওয়াতে ভারতের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে বুঝা যায় না। ১৮৭০ সালে সুয়েজ খাল কাটা হইলে য়ুরোপ হইতে ভারতে আসিবার পথ, সময় ও ব্যয় সবই কমিয়া যায়। এই সময় হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য আরও বাড়িতে লাগিল। ১৮৭১ সালে সর্বপ্রথম এদেশ হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী হয়। সেই হইতে প্রতিবৎসরই আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার জন্য বিদেশী জাহাজ কোম্পানীদের হাতে বছরে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা আমরা দিয়া থাকি। ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ, ইতালীয়, মার্কিন, জাপানী প্রভৃতি পৃথিবীর সকল দেশের জাহাজ ভারতের বন্দর হইতে যায়—কেবল যায় না ভারতের জাহাজ ভারতের বন্দর হইতে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত আমাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ—একদিকে য়ুরোপ, আফ্রিকা,—অপরদিকে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া। ভৌগোলিক দিক হইতে ভারত এমন সুন্দর স্থানে অবস্থিত যে এখান হইতে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য সহজে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

জাহাজের অভাবে ভারতের লোকসান

এদেশের বহির্বাণিজ্যই যে কেবল বিদেশী জাহাজে চলিতেছে তাহা নহে। অন্যান্য প্রায় সব দেশেই উপকূলের বাণিজ্যে যাহাতে বাহিরের প্রতিযোগিতা না থাকে সে বিষয়ে সরকার দৃষ্টি দিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অবাধ-বাণিজ্যনীতি অনুসরণের ফলে এখানে শতকরা ৮৫ ভাগ বাণিজ্য বিদেশী জাহাজে চলে। এমন কি ভারতের নদী-পথে যে সব ষ্টীমার কোম্পানী আছে তাহাও বিদেশী মূলধনে চলিতেছে;

তাহাদের আয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ভারত হইতে প্রতিবৎসর ২০।২৫ হাজার মুসলমান মক্কাতে হজ্ করিতে যায়—ইহাদের জাহাজ ভাড়া বিদেশেই যায়। আমাদের দেশে যে-সব ইংরাজ সৈন্য থাকে, তাহাদের প্রায় ২৫ হাজার গড়ে ভারত হইতে প্রতিবৎসর আসে যায়—ইহাদের ভাড়া ৫৫ লক্ষ টাকা ভারতবাসীরা পায় না। ভারতের ডাক বিদেশী জাহাজ কোম্পানী বহন করিয়া বছরে ৮।১০ লাখ টাকা পায়। ভারতের সমুদ্রপথে যে বাণিজ্য চলে তাহার শতকরা একভাগও দেশী জাহাজের ভাগে পড়ে না। আজকাল আমাদের জাহাজ বলিতে খানকয়েক নৌকা বুঝায়। ৮০ টনের কম ১৩০ খানি ও ২০ টনের ৭২৮০ জাহাজ যুদ্ধের পূর্বে আমাদের সম্বল ছিল। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ; ইহার সমুদ্র উপকূল ৪,০০০ মাইলের উপর; অথচ জাহাজ নামের উপযুক্ত জাহাজ একখানিও এদেশে হয় না বা এদেশের লোকের নাই। আমাদের যে কেবল অর্থের ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে; এই নৌবাহিনী গঠনের শিল্প দেশের লোক ভুলিয়াছে এবং করিবার পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ভারত সরকার দেশীয় বাণিজ্য জাহাজের উন্নতি-সাধনের জন্য একটি কমিশন বসাইয়াছিলেন। দেশমধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে। বোম্বাইএর মিঃ হাজি এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতবর্ষের বন্দরে যুদ্ধের পূর্বে প্রতিবৎসর ৮৫৬৭ জাহাজ আসিত; ইহার মধ্যে দেশী জাহাজ ও নৌকা ছিল ১৪৪৭—যাহা বন্দরে আসা-যাওয়া করিত। ইহার মধ্যে শতকরা ৭৫ খানি ছিল ইংরাজদের। পূর্বে ৪৯৩৪ খানি আসিত যাইত। ১৯২৪-২৫ সালে জাহাজের সংখ্যা কমিয়াছে—৪৫২৭ খানি ইংরাজ জাহাজ ভারতে আসিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে জার্মান জাহাজ ভারতে বাৎসরিক ৪৯২ খানি আসিত; ১৯১৩-১৪ সালেই ৫৫৭ খানি জাহাজ সুয়েজখাল দিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে

জার্মানদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ ছিল। ১৯২৪-২৫ সালে ১৭২ খানি জার্মান জাহাজ সামগ্রী লইয়া আসে যায়। জাপান যুদ্ধের পূর্বে বাৎসরিক গড়ে ১৩০ খানি করিয়া জাহাজ ভারতে পাঠাইয়াছিল। যুদ্ধের কয়বৎসর গড়ে ৪১০ খানি করিয়া জাপানী জাহাজ এদেশে আসে। তন্মধ্যে ১৯১৭ সালে ৪৭৭ খানি আসে। মাঝে কমিয়া যায়। পুনরায় ভারতীয় বন্দরে জাপানী জাহাজের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে; ১৯২৪-২৫ সালে ৫৭১ খানি জাপানী জাহাজ আসিয়াছিল। এই উন্নতির কারণ জাপানী গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাহাজ কোম্পানীগুলিকে ২ কোটি টাকার উপর দানসাহায্য করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। বর্তমানে জাপানী জাহাজ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পরেই ইতালীর বাণিজ্য চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যুদ্ধের পূর্বে বৎসরে ৮২ খানি ইতালীর জাহাজ আসিত যাইত। কিন্তু ১৯২৫-২৬ সালে ২৮৯ খানি ইতালীর জাহাজ আসে যায়—দুই বৎসরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। (Review of Trade in India for 1924-1925, p. 95)

বিদেশী জাহাজ

আমাদের জাহাজ না থাকিবার আর একটি অসুবিধা হইতেছে যে বিদেশী কোম্পানীরা যে যেমন ভাড়া বলে তাহাই আমাদের মানিয়া লইতে হয়। ভারত হইতে যে-সব কাঁচা মাল যায় তাহার ভাড়া এক প্রকার; তৈয়ারী সামগ্রী যেমন তেল প্রভৃতির ভাড়া আবার এমনবেশী যে এদেশ হইতে সে-সব সামগ্রী বিদেশে চালান করিয়া লাভ করা দুঃসাধ্য। এইসব কারণে ভারতের নিজস্ব জাহাজ থাকার নিতান্ত প্রয়োজন। ভারত সরকার এখন বুঝিয়াছেন যে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি না করিয়া ভারতকে কেবলমাত্র পৃথিবীর বাণিজ্য-সভার জলবাহক ও কাষ্ঠচ্ছেদকের কার্য্যে লিপ্ত রাখিলে তাঁহাদেরই লোকসান; ভারতের শিল্পোন্নতিতে তাঁহাদের উন্নতি একথা

এই নিদারুণ যুদ্ধের শিক্ষা। তবে যুদ্ধের পর হইতে তাঁহাদের ভারতের শিল্পোন্নতি করিবার উৎসাহ ক্রমশ যেন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে।

যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে (১৯১৩-১৪ সালে) ১৯১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার সামগ্রী আমদানী ও ২৪৯ কোটি টাকার সামগ্রী রপ্তানী হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে শত্রুরাজ্যের সহিত কারবার বন্ধ হওয়ায় জাহাজের অভাবে আমদানী-রপ্তানীর মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল; কিন্তু যথার্থ সামগ্রীর আমদানী আরও কমিয়াছিল; কারণ জিনিষের দাম অসম্ভবরূপ বাড়িয়াছিল। যুদ্ধের পর আমদানী-রপ্তানীর মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং এখন প্রতিবৎসর সমগ্র বাণিজ্যের মূল্য ৫০০—৬০০ কোটি টাকা। বাৎসরিক পাঁচ-ছয় শত কোটি টাকার বাণিজ্য নিতান্ত কম ব্যাপার নয়। কিন্তু ভারতের ৩০ কোটি লোকের তুলনায় ও অন্যান্য দেশের বাণিজ্যের তুলনায় ভারতের বাণিজ্য নিতান্ত সামান্য। তারপর ভারতের এই বাণিজ্যের মধ্যে কতখানি ভারতবাসী-দের নিজস্ব আছে তাহাও বিচার করিতে হয়। এজেন্সীর লাভ, রেলের লাভ, জাহাজের লাভ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিদেশীদের হস্তে যায়।

মাথাপিছু বাণিজ্য-অংশ

পৃথিবীর সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিতেছে; এখন একবার দেখা যাক্ ভারতের অধিবাসীদের ভাগ্যে অন্য দেশের তুলনায় এই বাণিজ্যের অংশ কিরূপ পড়ে। * (পর পৃষ্ঠার তালিকা দেখুন।)

১৮৬৪-৬৫ সাল হইতে ১৯১৩-১৪ সাল পর্য্যন্ত এই পঞ্চাশ বৎসরে আমদানী ছয় গুণ ও রপ্তানী পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৬৫ সালে ৩১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার আমদানীর স্থানে ১৯১৪ সালে ১৯১ কোটি

* Shah—Trade, Tariff & Transport—p. 57.

৩১ লক্ষ হইয়াছিল; ৫৫,৮৬ লক্ষ টাকার রপ্তানী হইতে ২৪৯,০১ লক্ষ টাকার হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দী হইতে এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষিত

দেশ	মোট বাণিজ্য	জন-সংখ্যা	মাথাপিছু	সাল
	মিলিয়ন পাঃ	কোটি, লক্ষ		
বৃটেন	১৪০৩	৪,৫৫	৩০'৮ পাঃ	১৯১৩ সাল
	১৭২৮	৪,৭৩	৮৬'৫ "	১৯২২ "
ফ্রান্স	৫৮৩ মিঃ পাঃ	৩,৯৬	১৪'৭ "	১৯১২ "
	৪৫০৯১ ফ্রাঙ্ক	৩,৯২	১১৫৩ ফ্রাঙ্ক	১৯২১ "
জারমেনী	১০৭০ মিঃ পাঃ	৬,৫৯	১৬'৩ পাঃ	১৯১৩ "
মার্কিনদেশ	৮৪৮ "	৯,১৯	৯.২ "	১৯১৩ "
	২০০৮ "	১০,৫৭	১৯.৩ "	১৯২১ "
জাপান	১১৮ "	৫,৩৩	২'৪ "	১৯১৪ "
	২২৬ "	৫,৯৯	৩'৭৫ "	১৯২১ "
ভারতবর্ষ	২৯৩ "	৩১,৫১	০-১৮-৮ "	১৯১৩-১৪
	৩৪৬ "	৩১,৯০	১-১-৮ "	১৯২১-২২

হয়। ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে আমদানী ১০৭ কোটি টাকার উপর ও রপ্তানী দশ বৎসরে ১২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। বিদেশ হইতে আমদানী সামগ্রীর দীর্ঘ ও বিচিত্র তালিকা দেখিলে

বেশ বুঝা যায় আমাদের দেশে এমন সব জিনিষ আসে, যাহা অনায়াসে এখানে তৈয়ারী করা যায়। কিন্তু নানা কারণে এত দিন এসব জিনিষ হইতে শিল্পদ্রব্য এখানে তৈয়ারী করা শিল্পীদের পোষাইত না। আমদানী সামগ্রীর মধ্যে কাপড়চোপড় সব চেয়ে বেশী; সূতা কাপড় মোজা গেঞ্জী ৬৬-৬৭ কোটি টাকার আমদানী হয়। ১৯২৪-২৫ সালে ৮২ কোটির টাকার কাপড়চোপড়ই আমদানী হয়। এ ছাড়া লোহা, ইস্পাত, কলকজা, লবণ, মন্ত, চিনি ঔষধাদি প্রভৃতি অনেক জিনিষ আসে। *

আমদানী সামগ্রী

বিদেশ হইতে আমরা বড় বড় কলকজা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি তুচ্ছ জিনিষ পর্য্যন্ত আমদানী করি। দেশের লোকের অধঃপতন কতদূর হইয়াছে তাহা বিদেশী জিনিষের তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়। প্রথমত সামান্ত জিনিষ আমরা প্রস্তুত করিতে অক্ষম, দ্বিতীয়ত তুচ্ছ বিদেশী জিনিষ আমরা বর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ। দেশের জাতীয় আন্দোলন লোকের মনে কোনো ভাব সৃষ্টি করিয়াছে কিনা এক একবার সন্দেহ হয়—এই তালিকার প্রতি দৃষ্টি দিলে। ১৯২৫ সালে পোষাক-পরিচ্ছদ ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার; বুরুশ ও ঝাড় ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার; বোতাম ২৭ লক্ষ টাকার; ছুরি-কাঁচি ৪০ লক্ষ টাকার; বাজি ১৩ লক্ষ টাকার; ফল ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার; কাঠের আসবাবপত্র ১৫ লক্ষ টাকার; কাঁচের চুড়ি ৩৭ লক্ষ টাকার (১৯২১ সালে ১৯ হাজার হন্দর আমদানী হয়; ১৯২৫ সালে ৩০ হাজার হন্দর); বাদ্যদ্রব্য, গ্রামোফোন, হারমোনিয়াম, রেকর্ড প্রভৃতি প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার; বিদেশী মদ, স্পিরিট ইত্যাদি ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার; দেশলাই ৮৮ লক্ষ টাকার; সার প্রায় ২০ লক্ষ টাকার; গন্ধতৈল প্রায় ১০ লক্ষ টাকার;

* Sea-Borne Trade—p. 4.

কাগজ ও পিসবোর্ড ৩ কোটি টাকার, এসেন্সাদি সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার, বিলাতী খাদ্যদ্রব্য প্রায় ৪ কোটি টাকার; সাবান ১,৬২ লক্ষ টাকার (১৯২১ সালে ৩,১৩ হাজার হইতে ১৯২৫ সালে ৩,৬১ হাজার হন্দর ওজনের জিনিষ আসে; যদিও ইহার মূল্য নামিয়াছে); পেন্সিল আসে ২৭ লক্ষ, ১৮ হাজার ডজন—মূল্য ৮১ লক্ষ টাকার; তামাক (সিগার সিগারেট ইত্যাদি) ৭৬ লক্ষ পাউণ্ড ওজন হইতে পাঁচ বৎসরে ১ কোটি পাউণ্ড হইয়াছে—মূল্য ১,৯৫ লক্ষ হইতে ২, ৯৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে; খেলনা ৩৯ লক্ষ টাকার; তাস ১০ লক্ষ টাকার; সকল প্রকার খেলনার সরঞ্জাম প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার; ছাতা ৪৮ লক্ষ টাকার; সাইকেল (৬২,০০০) ও সরঞ্জাম ৭৭ লক্ষ টাকার। তালিকা দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। দেশ যে কি পরিমাণ বিদেশী বণিকদের করায়ত্ত হইয়াছে তাহারই উদাহরণ দেওয়া গেল। (Sea-Borne Trade—95th Issue, 1922, pp. 28, 54,75,570; সরকারী আমদানী pp. 960-990).

যুদ্ধের পূর্বে রপ্তানীর মূল্য ছিল ২৪৯ কোটি টাকা। কাঁচা মালই ভারতের প্রধান রপ্তানীর বিষয়। ইহার মধ্যে খাদ্যশস্য সব চেয়ে বেশী পরিমাণে রপ্তানী হইত। তা ছাড়া য়ুরোপের শিল্পের জন্য এখান হইতে তুলা, পাট, নানা প্রকার তৈলবীজ, চামড়া প্রায় অধিকাংশই প্রেরিত হইত। এই সব জিনিষের খুব বড় খরিদ্দার ছিল জারমেনী। ভারতের কাঁচামাল হইতে বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সেখানকার বণিকগণ খুব লাভবান হইয়াছিল। ভারতবর্ষের উৎপন্ন সামগ্রীর কত অংশ বিদেশে রপ্তানী হইত তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রপ্তানী সামগ্রী

চাউল—৯%; গম—১৫%; তুলা—৫৫%; সরিষা—২৩%; ৫০

মসিনা—৭৭%; তিল—২৫%; চিনি—৫%; নীল—৩৯%; চীনা বাদাম—৩৮%; পাট—৫০%।

ভারতের আন্তর-বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না; কারণ দেশের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ উৎপন্ন হয় যাহা নৌকা ও গোশকটে করিয়া স্থানান্তরিত করা হয়। রেলের আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আরোহীর সংখ্যা ও মালের ওজন সবই বাড়িয়া চলিতেছে। প্রতি বৎসর অনুমান ১০০০ কোটি টাকার কারবার দেশের মধ্যে চলিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব হইতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

আন্তর-বাণিজ্য

বহির্বাণিজ্য ও আন্তর-বাণিজ্য ব্যতীত সীমান্তস্থিত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য চলে। এই সীমান্ত প্রদেশ প্রায় ৬,৮০০ মাইল বিস্তৃত। তিব্বত, ভুটান, নেপাল, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সহিত এই কারবার চলে। যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ২২ কোটি টাকার কারবার ছিল—যুদ্ধান্তে আর ৬ কোটি টাকা বাড়িয়াছিল; ১৯২৪—২৫ সালে মোট সীমান্ত-বাণিজ্যের মূল্য উঠিয়াছিল ৪১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। ইতিপূর্বে এত টাকার বাণিজ্য সীমান্ত-প্রদেশের সহিত কখনো হয় নাই।

সীমান্ত-বাণিজ্য

উপকূল-বাণিজ্যের মধ্যে ভারত হইতে বর্মার বাণিজ্যই প্রধান। বর্মা হইতে কেরোসিন তেল, চাল, ও সেগুণ কাঠ প্রধানত আমদানী হয়। এ ছাড়া বন্দর হইতে বন্দরে মাল চালাচালি চলে। এই বাণিজ্য যুদ্ধের পূর্বে প্রায় ৬৫ কোটি টাকার ছিল।

উপকূল-বাণিজ্য

মালপত্রের আমদানী রপ্তানী ব্যতীত বিদেশের সহিত সোণারূপার আমদানী রপ্তানী হয়। যুদ্ধের পূর্বে পাঁচ বৎসরের সোণার গড় আমদানী

ছিল ২৮ কোটি টাকা ; অবশ্য তাহার পূর্বে কখনো এত টাকার সোণা আসে নাই; ৯ কোটি টাকার সোণা ছিল সব চেয়ে বেশী আমদানী। ইহার পরেও সব বৎসরে একরূপ হয় নাই; ১৯২৩-২৪ সালে এই আমদানী আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধি পায় ; ঐ বৎসরে ৭৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার সোণা ভারতে আসে। এই সংখ্যাটি দেখিলে হঠাৎ অনেক মনে হইতে পারে। কিন্তু ৩১ কোটি লোকের পক্ষে ৭৪ কোটি টাকার সোণা পাওয়া খুব বেশী নয়।

ভারতবর্ষ এখন আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ নহে। ইংরাজদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সহিত যোগযুক্ত হইয়াছে। যুরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমাদের লেনাদেনা চলিতেছে—যদিও প্রধান কারবার বিলাতের সঙ্গেই। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের সমগ্র আমদানী রপ্তানীর অর্দ্ধেকের উপর গ্রেট বিটেন (৪১%) ও তাহার উপনিবেশাদির (১১%) সহিত চলিত। অবশিষ্টাংশ (৪৮%) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ছিল।

দেশহিসাবে বাণিজ্য

মহাদেশ হিসাবে য়ুরোপ আমাদের সব চেয়ে বড় খরিদ্দার ও দোকানদার; যুদ্ধের পূর্বে আমদানী সামগ্রীর প্রায় ৮০ ভাগ য়ুরোপ হইতে আসিত। অবশিষ্ট ২০ভাগ অন্যান্য মহাদেশ প্রেরণ করিত। কিন্তু রপ্তানীর দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় য়ুরোপ ব্যতীত অন্যান্য মহাদেশের সহিত ভারতের যোগ যথেষ্ট। য়ুরোপ এখান হইতে রপ্তানী সামগ্রীর ৫৭ ভাগ, এশিয়া ২৬, আমেরিকা ১২, আফ্রিকা ৩, ও অষ্ট্রেলিয়া ২ ভাগ গ্রহণ করিত। যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর সহিত ভারতের বাণিজ্য ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছিল। যুদ্ধারম্ভে জার্মানী ও তাহার মিত্রদের সহিত কারবার বন্ধ হইয়া যায়। জার্মানীর বন্ধুদের মধ্যে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী কাঁচামালের খুব বড় খরিদ্দার ও চিনি প্রভৃতির বড় রকমের

আড়তদার ছিল। তাহাদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে ইংলণ্ড ফ্রান্স ইতালী মার্কিণ প্রভৃতি দেশের খুব সুবিধা হইয়াছিল। শত্রুদের হাতে সমগ্র বাণিজ্যের নয়ভাগের একভাগ ছিল; এই বাণিজ্য ইহারা ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

যুদ্ধের পর দেখা যাইতেছে ভারতের বৃটীশ-আমদানী কমিয়াছে। ১৯০১ সালে বৃটীশ মাল আমদানীর শতকরা ৬৪·৫ ভাগ ছিল, তাহা হ্রাস পাইয়া ৫৬·৬ হইয়াছে। ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানীও কমিয়াছে, ২৫.১ হইতে ২০·১ অর্থাৎ বিশ বৎসরে ৫ হারে কমিয়াছে। বাড়িয়াছে জাভা। ১৯০৩ সালে তাহার অংশ নামমাত্র ছিল, ১৯২১ সালে সমগ্র আমদানী বাণিজ্যের ৯ ভাগ জাভার ওলন্দাজ বণিকদের হাতে। ইহা সবই চিনি আমদানী বাবদ। বৃটীশ-আমদানী কমিয়াছে বলিয়া আমাদের শিল্পের বা বাণিজ্যের তেমন কিছু লাভ হয় নাই। অবশ্য যুদ্ধের সময়ে অনেক লোক ছোট-খাটো কনট্রাকটারী করিয়া, কাপড়ের ব্যবসা করিয়া খুব লাভবান হইয়াছিল; কিন্তু আসলে লাভবান্ হইয়াছিল জাপান ও আমেরিকা। জাপান এখনকার কাঁচামাল সস্তায় ক্রয় করিয়া শত প্রকারের মনোহারী সামগ্রী বানাইয়া এ দেশে চালান দিতেছে। জাপান হইতে এখন সকল প্রকার শিল্পজাত সামগ্রী আমদানী হইতেছে। বাজার জাপানী সামগ্রীতে বোঝাই। কাপড়চোপড়, সূতা, রেশমের সামগ্রী, রুমাল, গেঞ্জি, মোজা, তোয়ালে, বোতাম, চীনের বাসন, ছাতা, খেলনা, ঘড়ি, কলকব্জা, কাঁচের জিনিষ, দিয়াশলাই, ঔষধ-পত্র প্রভৃতি শত প্রকারের জিনিষ এখন জাপান পাঠাইতেছে। ঔষধপত্র জাপান হইতে শতকরা ৮১°/০ ভাগ আসিয়াছিল। * ১৯১৩-১৪

জাপানের উন্নতি

* Review of Trade, 1924-25, p. 42.

সালে জাপানী মালের আমদানী ছিল মাত্র ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ও ভারত হইতে রপ্তানী ছিল ২২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। দশ বৎসর পরে ১৯২৩-২৪ সালে আমদানী ১৪ কোটি ও রপ্তানী ৫১ কোটি টাকার; ১৯২৪-২৫ সালে অর্থাৎ এক বৎসরেই এই বাণিজ্যের মূল্য যথাক্রমে ১৭ কোটি ও ৫৭ কোটি টাকা হইয়াছে। যুদ্ধের ৫ বৎসরে জাপান ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া ১৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে। মার্কিনের সহিত ভারতের বাণিজ্য যুদ্ধের সময়ে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল এবং ১৯২৪-২৫ সালে বহির্বাণিজ্যে তাহার স্থান তৃতীয়। বর্তমানে মার্কিন রাজ্যের সহিত প্রায় ৪৯ কোটি টাকা বাণিজ্য চলিতেছে। ১৯২৪ হইতে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোকিয়া সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাহাদের বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি হইতেছে। * জার্মানী যুদ্ধের পূর্বের বাণিজ্য পুনরায় দখল করিয়া লইতেছে। ১৯১৩-১৪ সালে জারমেন মাল ১২ কোটি টাকা উপর ছিল; ১৯২৩-২৪ সালে প্রায় ১২ কোটি হইয়াছিল। ১৯২৪-২৫ সালে প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। রপ্তানীতে জারমেনী এখন দ্বিতীয়; ১৯২৩-২৪ সালে ২৮ লক্ষ টাকার কাঁচামাল জারমেনী একাই রপ্তানী করে; অষ্ট্রিয়া ২৩ লক্ষ টাকার মাল লয়। সুতরাং এই জারমেনীর শক্তিদ্বয় আমাদের আর্থিক জীবনে কতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, আমরা তাহা জানি না।

ভারতের সহিত যাহাদের ব্যবসা চলিতেছে মাল লেন-দেনের অনুপাত অনুসারে সাজানো তাহাদের একটি তালিকা পর-পৃষ্ঠে দেওয়া গেল। †

* Review of Trade, 1924-25, p. 42-43.

† Shah—Trade, Tariffs & Transport in India, p. 195.

উপরি উক্ত তালিকা প্রস্তুতের পরে ইতালী বাণিজ্য বিষয়ে ভীষণ উন্নতি করিয়াছে।

	১৯০১-২		১৯২১-২২	
	আমদানী	রপ্তানী	আমদানী	রপ্তানী
১	বৃটিশরাজ্য	বৃটিশরাজ্য	বৃটিশরাজ্য	বৃটিশরাজ্য
২	আষ্ট্রিয়া	জারমেনী	জাভা	জাপান
৩	জারমেনী }	হংকং	মার্কিনরাজ্য	মার্কিনরাজ্য
৪	বেলজিয়াম }	ফ্রান্স	জাপান	জারমেনী
৫	ষ্ট্রেট্ সেটল্‌মেণ্ট,মার্কিনরাজ্য, চীন		অষ্ট্রেলিয়া	সিংহল
৬	মরিশাস	জাপান	জারমেনী	চীন
৭	মার্কিনরাজ্য	ষ্ট্রেট সেটলটমেণ্ট	বেলজিয়াম	ফ্রান্স
৮	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ষ্ট্রেট্ সেটল্‌মেণ্ট	বেলজিয়াম
৯	হংকং	সিংহল	চীন	ষ্ট্রেট্ সেটল্‌মেণ্ট
১০	ইতালী		ইতালী	হংকং
			মরিশাস	

যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় মোট আমদানী মালের শতকরা ৬৩ ভাগ ছিল গ্রেটবৃটনের মাল; যুদ্ধের সময়ে উহা কমিয়া ৫৬ ভাগ হয়। ১৯২২-২৩ সালে পুনরায় ৬০ পর্য্যন্ত উঠে, তারপর হইতে বৃটীশ মাল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৪-২৫ সালে ৫৪ ভাগ হইয়াছে, অর্থাৎ পনের বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ বৃটীশ মালের আমদানী কমিয়াছে। জাপান, আমেরিকা শতকরা ২ ও ৩ ভাগের জায়গায় পনের বৎসরে ৭ ও ৬ ভাগ আমদানী বাণিজ্য দখল করিয়াছে।

বাণিজ্যের ভাগ

১৯১৩-১৪ সালে ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার রপ্তানী ছিল, ১৯২৪-২৫ সালে সেই জায়গায় ২৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে। আমদানীতে এক বৎসরে ১ কোটি টাক বাড়াইয়াছে। বিস্তারের দিকে ইতালীয়দের বিশেষ দৃষ্টি গিয়াছে।

আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্যে বৃটেনের ভাগ শতকরা ২৬। বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজ্য যথা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের কাঁচামাল আমদানী কমাইয়াছে; পনের বৎসরে শতকরা ১৭ ভাগ হইতে ১২ ভাগে নামিয়াছে। তার কারণ সেই সব দেশ সস্তায় প্রচুর কাঁচামাল উৎপন্ন করিতেছে। মার্কিন রাজ্যও রপ্তানী কমাইতেছে; যুদ্ধের সময়ে শতকরা ১২ ভাগ তাহাদের দেশে যাইত; উহা প্রতি বৎসর কমিতে কমিতে ৯ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। কেবল জাপানে ভারতীয় কাঁচামাল রপ্তানী বাড়িয়াছে। পনের বৎসরে রপ্তানীর শতকরা ৭ ভাগ হইতে ১৪ ভাগ হইয়াছে। ফ্রান্স ৫ ভাগ, জারমেনী ৭ ও অন্য অসংখ্য দেশ অবশিষ্ট ২৭ ভাগ ভারতের কাঁচামাল গ্রহণ করে।

একমাত্র ইংলণ্ড অবাধ-বাণিজ্য-নীতির পক্ষপাতী, তাছাড়া য়ুরোপীয় আর সকল দেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও এমন কি বৃটীশ উপনিবেশগুলিও অবাধনীতির বিরোধী। ইংলণ্ডে বিদেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিনা শুল্কে বিক্রয় হয়। কিন্তু তা' বলিয়া বৃটীশসামগ্রী কেহ নিজদেশে অবাধে প্রচলিত হইতে দেয় না। এক দল লোক বলেন, ইংলণ্ডেও সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করা হউক; কারণ ইংরাজবণিক

বৃটীশ বাণিজ্যনীতি

যখন নিজ টাকা হইতে বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে শুল্করূপে রাজস্ব দিতেছে, তখন যাহারা বিলাতে ব্যবসা করিতে আসিবে তাহারা শুল্করূপে কেন সেখানকার রাজকোষে টাকা দিবে না? কিন্তু কেবল যে জার্মানী, আমেরিকাই বিদেশী জিনিষের উপর শুল্ক বসাইয়াছে, তা নয়—ইংরাজের কলোনী বা উপনিবেশগুলিও সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছে, সুতরাং বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ সুবিধারু ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। সমগ্র সাম্রাজ্য একটি ঐক্য অনুভব করিয়া পরস্পরের ক্ষতিবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি

দিবে—একের অভাব অন্তে পূরণ করিবে। ভারতবর্ষকে এই প্রস্তাবের মধ্যে টানিবার চেষ্টা হইতেছে। বাণিজ্য বিষয়ে এই প্রথা প্রচলিত হইলে ভারতের চা, কফি, চিনি, গম এবং সকল প্রকার কাঁচামাল বিনা শুল্কে ইংলণ্ডে ও বৃটীশ কলোনীসমূহে রপ্তানী হইতে পারিবে; এবং ভারতবর্ষে বিনা শুল্কে বৃটীশ শিল্পজাত সামগ্রী আমদানী হইবে।

ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯০৩ সালে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, (১) ইংলণ্ড কোনো কালে ভারতের শিল্পরক্ষা করিবার জন্য তাহার সংরক্ষণশীল শুল্ক বসাইতে দিবেন না। (২) বৃটীশ শিল্পজাত সামগ্রীর উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলে রাজস্বের ভীষণ ক্ষতি হইবে। অন্যান্য বিদেশীদের উপর শুল্ক বসিলেও ভারতবর্ষের বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা কম; কারণ বৃটীশ-বাণিজ্য সমগ্র বাণিজ্যের শতকরা ৫৪ ভাগ; ১৯২৪-২৫ সালে আমদানীর প্রায় ৭০ ভাগ বৃটীশ ও বৃটীশ সাম্রাজ্য হইতে আসে। বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য বিনাশুল্কে আসিতে আরম্ভ করিলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান বা আমেরিকা প্রভৃতি প্রতিযোগী জাতির আমদানীবাণিজ্যের পালা শেষ হইবে। তাহারা শুল্ক দিয়া বাণিজ্য চালাইবে ও ইংরাজ, কানাডাবাসী, অষ্ট্রেলিয়াবাসী ও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ইংরাজেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবে, এমন অসুবিধাকর অবস্থায় পড়িয়া তাহারা কয়দিন টিকিবে? সুতরাং ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বৃটীশ সাম্রাজ্যের লোকদের হাতে গিয়া পড়িবে। নূতন প্রস্তাব অনুসারে তাহাদিগকে শুল্ক দিতে হইবে না বা নামমাত্র শুল্ক দিয়া অবাধবাণিজ্য চালাইতে পারিবে; ফলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হস্তগত হইবে ও ভারতের রাজস্ব ১২।১৩ কোটি টাকা করিয়া কমিবে।

ভারত-সরকারের আপত্তি

(৩) ভারতবর্ষ ঋণ-গ্রস্ত দেশ। ইংলণ্ডের নিকট তাহার কোটি কোটি টাকা ঋণ। * সেই ধারের সুদ আমাদিগকে নিয়মিত ভাবে প্রতিবৎসর সোণায় গুণিয়া দিতে হয়। আমাদের উদ্বৃত্ত কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া আমরা যে টাকা পাই তাহাই দিয়া দেনা ও সুদ দিয়া থাকি। বৃটীশ সাম্রাজ্যের সহিত যদি আমরা বিশেষ কোনো সুবিধাসর্ত্তে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে বিদেশী বণিকেরা ভারতের রপ্তানীমাল না লইতে পারে, ফলে ভারতের রপ্তানীর উদ্বৃত্ত টাকা ঘরে আসিবে না এবং ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ দেউলে হইবে।

উপরের মীমাংসা হইতেছে বাহির হইতে বিদেশীর মীমাংসা; দেশের এক দল লোক ভারতের বাণিজ্য-উন্নতির জন্য যে-পথ নির্দ্দেশ করেন তাহা রাজপুরুষ বা পার্লামেণ্ট বা ইংরাজ বণিকদের মনঃপূত নহে। সেই পথ হইতেছে সংরক্ষণ-নীতি।

সংরক্ষণ নীতি

তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যের তিনটি অবস্থা আছে। (১) দেশের কৃষিযুগে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রচলিত থাকা ভাল। সভ্য শিল্পীদের সংস্পর্শে আসিয়া দেশের লোকের চক্ষু খুলিয়া যায়। (২) দ্বিতীয় অবস্থায় প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিশু বাণিজ্য বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। ছোট চারা গাছের চারিদিকে যেমন বেড়া দিতে হয়, পাছে তার চারি পাশের বড় গাছ আওতা করিয়া তার প্রাণ

* আমরা কাঁচামাল বিক্রয় করিয়া বেশী টাকা পাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে বেশী টাকা পায় সে ঋণ করিবে কেন? ১৮৯৯ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত পনের বৎসরে ভারতবর্ষ ১২৬ ৯৩৩,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ বৎসরে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া ঋণ করিয়াছিল। যুদ্ধের পর বিদেশে এই ঋণ বাড়িয়া যায়। ১৯১৫-১৬ হইতে ১৯১৯-২০ মধ্যে যুদ্ধের জন্য বিশেষত মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের জন্য ভারতকে ৩০ কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রস্ত হইতে হয়। ব্যবসায়ে ভারত যদি লাভবানই হইবে তবে তাহাকে ঋণ করিতে হয় কেন? (Shah—Trade, Tariffs, etc. p. 70; Sixty Years of Indian Finance, p. 361)

শুকাইয়া মারে, তেমনি দেশের বাণিজ্যও প্রথম অবস্থায় বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে; এ ক্ষেত্রেও সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়া শিল্পজাত সামগ্রীর উপর আমদানী-শুল্ক বসাইয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে দেশীয় ব্যবসায়কে রক্ষা করিতে হইবে। (৩) তৃতীয় অবস্থায় দেশ ধন ও বাণিজ্যের উচ্চ শিখরে উঠিলে পুনরায় অবাধ বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিবে। এই অবস্থায় গৃহে বদ্ধ হইয়া থাকিলে জাতীয় জীবনে শৈথিল্য ও আলস্য প্রবেশ করিবে, সুতরাং পৃথিবীর সহিত পুনরায় যোগযুক্ত হওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন।

সংরক্ষণ নীতি ও অবাধ বাণিজ্যনীতি.

ভারতের পক্ষে কি প্রয়োজন তাহা লইয়া এখনো বিবাদ চলিতেছে। এক দলে বলেন, অবাধ বাণিজ্যনীতিই। লুক,—তাহাতে লোকে সস্তায় জিনিষ পাইবে। দেশের মধ্যে বাণিজ্য-উন্নতির যথার্থ চেষ্টা চলুক, কিন্তু স্বদেশীর নাম দিয়া জঘন্য জিনিষ চালাইয়া দেশকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। আর একদল বলেন, দেশের বাণিজ্য রক্ষা করিতে হইলে বাহিরের শিল্পজাত সামগ্রী, যাহা দেশীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উহাকে ধ্বংস করিতেছে, তাহার উপর শুল্ক বসানো উচিত। কাপড়ের কলের ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি যে ভারতের পক্ষে এই সংরক্ষণ নীতির কত প্রয়োজন; এবং সেইটি না থাকাতে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একজন ইংরাজ (Sir Edward Law) বলিয়াছিলেন যে, 'ভারতের অধিবাসীদিগকে কাঠ কাটিবার ও জল টানিবার জন্য রাখাই হইতেছে পৃথিবীর বাণিজ্য সংরক্ষণশীল জাতির স্বার্থ ও অভিপ্রায়।'

ব ণজ্যের মূল্য

ক) আমদানীর মূল্য

সমুদ্রপথে বাণিজ্য	১৯১৪-১৫	১৯১৯-২০	১৯২৫-২৬
আমদানী—	(হাজার টাকা)	(হাজার টাকা)	(হাজার টাকা)
ব্যবসায়ীর মালের মূল্য	১৩৭,৯২,৯০,	২০৭,৯৭,২৪,	২৪৬,৬২,৬৫,
সরকারী মাল	৭,০০, ১৮,	১৩,৭৩,০০,	৬,৭৩,৮২,
মোট বিদেশী মাল	১৪৪,৯৩,০৮,	২২১,৭০,২৪,	২৫৩,৩৬,৪৭,
ধন টাকাকড়ি			
বেসরকারী	২১,৭৭,০৪,	১১,১২,৩২,	৯৯,১৭,৭৯,
সরকারী	৩,৭৯,	৬৭,১১,৫৭,	২,০৫,
মোট টাকাকড়ি	২১,৮০,৮৩,	৭৮,২৩,৮৯,	৯৯,১৯,৮৪,
মোট আমদানীর মূল্য	১৬৬,৭৩,৯১	২৯৯,৯৪,১৩,	৩৫২,৫৬,৩১

বাণিজ্যের মূল্য

(খ) রপ্তানীর মূল্য (হাজার টাকা হিসাবে)

রপ্তানী * { মালের মূল্য	১৮১,৫৯,১৭,	৩৩০,০৫,৬৯,	৩৯৮,১৭,৪৪,
{ সরকারী	৫৮,৪৪,	৫,৯৬,৪৮,	২,০৬,৮২,
মোট ভারতীয় মালের মূল্য	১৮২,১৭,৬১,	৩৩৬,০২,১৭,	৪০০,২৪,২৬,
টাকাকড়ি			
বেসরকারী	৩,৩০,৩৩,	৭,৫১,৯৬,	৪,৯১,৩৭,
সরকারী	১,৯৮,৬১,	৬,১৬,০২,	২৫,৪৪,
মোট রপ্তানী টাকাকড়ি	৫,২৮,৯৪,	১৩,৬৭,৯৮,	৫,১৬,৮১,
মোট রপ্তানীর মূল্য	১৮৭,৪৬,৫৫,	৩৪৯,৭০,১৫,	৪০৫,৪১,০৭,
স্থলপথে বাণিজ্য			
রপ্তানী	১১,৪১,৯৩,	১৭,০২,৩১,	১৯,৯৫,৬৭,
আমদানী	৯,৪৯,৪৫,	১৫,৯১,৫৩,	১৬,২৭,৬৪

সালের মূল

৩। দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার

ভিক্ষা যখন দুর্লভ হয় তখনই লোকে বলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। আমাদের দেশে ভিক্ষা দেওয়াটা লোকধর্মের অন্তর্গত অনুষ্ঠান ছিল, সুতরাং সেই ধর্ম লোকে করিতে অক্ষম হইলে দেশে অকাল হইত। এই অকাল বা দুর্ভিক্ষ নানা কারণে হয়; যুদ্ধের জন্য শস্যক্ষেত্র নষ্ট হয়, বন্যায় দেশ ডুবিয়া যায়, জলাভাবে শস্য পুড়িয়া যায়, পঙ্গপালে শস্য খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে। মোটের উপর খাদ্যশস্যের অভাব হইলে দুর্ভিক্ষ হয় বা অকাল দেখা দেয়। তবে আমাদের দেশে সাধারণত বৃষ্টির অভাবেই শস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে শতকরা ৭২ জন লোক কৃষির মুখাপেক্ষী; সুতরাং চাষ নষ্ট হইলে লোকের কি অবস্থা হয় তাহা কল্পনা করা যায়; তবে সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষ এত বড় দেশ এবং এখানকার জলবায়ু, কৃষি-পদ্ধতি এত বিচিত্র রকমের যে সমগ্র দেশে একসঙ্গে দুর্ভিক্ষ খুব কমই হয়। এক প্রদেশে অন্নাভাব হইলেও অন্য প্রদেশে শস্য সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে এবং বর্তমানে রেলপথের সুবিধা হওয়ায় শস্য সহজে স্থানান্তরিত করা কঠিন হয় না। কিন্তু সমস্যা শস্য সরবরাহ নহে—সমস্যা হইতেছে লোকের অর্থাভাব। সারা বছর যাহারা ক্ষেতে খামারে কাজ পায় সেই ভূমিহীন শ্রমজীবিদেরই সর্বপ্রথমে কাজ বন্ধ হয়। সেই লোকদের কাজ দেওয়াই সমস্যা; বর্তমানের দুর্ভিক্ষ অন্নের অভাব নয়, অর্থ ও কর্মের অভাবে লোকের অন্ন কিনিবার অক্ষমতা।

অনেকের ধারণা যে ইংরাজ আগমনের পূর্বে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না; এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সত্যযুগে সত্য সত্যই

প্রাক দুঃখ ছিল না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। তবে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও পরিব্রাজকগণের বর্ণনাতে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ খুবই কম পাওয়া যায়। গ্রীক পরিব্রাজক ও দূত মেগাস্থেনীস লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'ভারতে কখনো দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ কখনো সাধারণভাবে অনটন হয় নাই।' গ্রীক দূতের কথা অতিরঞ্জন হইতে পারে। কৌটিল্য তাঁহার অর্থ-শাস্ত্রে দেশে অকাল বা দুর্ভিক্ষ হইলে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাহা এই:—(১) রাজস্ব মাপ; (২) দেশান্তর গমন; (৩) রাজকোষ হইতে অর্থ ও শস্য দান; (৪) জলাশয়, কূপ ইত্যাদি খনন (৫) অন্য অন্য স্থান হইতে শস্য আনয়ন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুসলমান শাসনকালের অনেকগুলি দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়াছেন; প্রথম দুর্ভিক্ষ হয় ১৩৪৩ সালে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে। মহম্মদ অর্দ্ধউন্মাদ ছিলেন, তথাচ দিল্লীর অধিবাসীরা যাহাতে ছয় মাসের খাদ্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আকবরের সময়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে বৃষ্টির অভাবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাদসাহ বড় বড় সহরে খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে যে প্রকার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহার তুলনা পূর্বে পাওয়া যায় না। সম্রাটের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বহু লক্ষ লোক মরিয়াছিল। আরঙজেবের সময়েও পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই দেশব্যাপী অভাবের দিনে তিনি রাজোচিত মহানুভবতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কৃষকদের খাজনা ও অন্যান্য কর মাপ করিয়া দিয়াছিলেন, রাজকোষ হইতে প্রজারা প্রচুর দান সাহায্য পাইয়াছিল; সস্তায় শস্য কিনিয়া আনিয়া সরকার স্বল্পমূল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ভারতবর্ষের কোনো না কোনো

অংশে সর্ব্বশুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ১২ বার ও ৪ বার অকাল হয়। আমরা নিম্নে সেই সব দুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি।

১৭৬৯-৭০। সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়; এই দুর্ভিক্ষ ছেয়াত্তরে মন্বন্তর নামে প্রচলিত। শোনা যায় এই মন্বন্তরে বাংলা দেশের একতৃতীয়াংশ লোক লোপ পাইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আসিয়া বাংলা দেশের যে বর্ণনা দেন তাহা অতি ভীষণ। এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলাদেশের শাসনকর্তা হইলেও তখনকার শাসন-ভার মুসলমান-ইংরাজ উভয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৭৬৯ সালেই চারিদিকে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন দেখা দেয়, কিন্তু কেহই কোনো প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই।

১৭৮১-৮২। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ভীষণ অকাল দেখা দেয়। মৈশূরের যুদ্ধের পর দাক্ষিণাত্যে এই দুর্ভিক্ষ হয়।

১৭৮৪। সমগ্র উত্তরভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অযোধ্যা প্রভৃতি দেশ ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ সমৃদ্ধ ছিল, এই সময়ে তাহার চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা জানা যায় না।

১৭৯২। ১৭৯১ সালে অতিবৃষ্টির জন্য বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে দুর্ভিক্ষ মারাত্মকরূপে দেখা দেয়। মান্দ্রাজে রিলিফ বা সেবাকার্য্য এই বৎসর খোলা হয়। ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয়—তারপর হইতে বাংলাদেশে মারাত্মক রকমের দুর্ভিক্ষ খুব কম হইয়াছে॥

১৮০২-৩। বৃষ্টির অভাবে এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ও মান্দ্রাজে অকাল দেখা দিল। লর্ড ওয়েলেসলীর সহিত মারাঠাদের যুদ্ধের অনতিকাল পরেই এই দুর্ভিক্ষ হয়। হোলকার ও তাঁহার পিণ্ডারী দস্যুদের উৎপাত ও ধ্বংসকার্য্য এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ।

১৮০৩-৪। সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যাতে দুর্ভিক্ষের পরেই উপর্যুক্ত অন্নকষ্ট দেখা দেয়। অযোধ্যা-নবাবের রাজ্যের কিয়দংশ বৃটীশ শাসনাধীনে আসিলে জমি-জমার বিলি নূতন করিয় হয়। খাজনা আদায় সম্বন্ধে ইংরাজ কর্মচারীরা যেরূপ নিষ্ঠা দেখাইতেন মুসলমান আমলের ঢিলাঢালা ব্যবস্থাকালে তাহা সম্ভব হইত না। সরকার প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা মাপ করিয়াছিলেন; তা ছাড়া টাকা ধার দিয়া, বাহির হইতে শস্য আমদানী করিয়া প্রজার সুবিধা করিয়াছিলেন

১৮০৫-৭। মান্দ্রাজের কয়েকটি জেলাতে অন্নাভাব দেখা দেয়। স্যার টমাস্ মন্‌রো এখানকার নূতন জমি বিলিব্যবস্থা করেন অন্নাভাবের সময়ে সরকার হইতে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। দেশীয় লোকের বদান্যতার উপর গভর্ণর বাহাদুর দুস্থ লোকের সেবার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেন।

১৮১১-১৪। এই কয় বৎসর মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও রাজপুতনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়—কোথায়ও বা ভীষণভাবে কোথায়ও বা সামান্য আকারে। রাজপুতানার দশাই সবচেয়ে শোচনীয় হইয়াছিল; অনুমান ১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা পড়িয়াছিল। দেশীয় রাজারা ইহার জন্য দায়ী—বৃটীশ সরকার নয়।

১৮৩০। বহু সুবৎসরের পর এই বার উত্তর মান্দ্রাজে, দক্ষিণ মারাঠ্ঠাদেশে, মৈশূর ও হায়দ্রাবাদে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গণ্টুর জেলার ৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ লক্ষ লোক নিঃশেষিত হইবার পর মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের চেতনা হয়; কারণ সরকার এই আকস্মিক ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এই দুর্ভিক্ষে উক্ত প্রদেশগুলির অনেক জেলার শতকরা অর্দ্ধেক লোক অনাহারে বা অনাহারজনিত পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে।

১৮৩৭। এই বৎসরে উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়। সরকার হইতে এই বার সর্ব-প্রথম 'রিলিফ' কাজ খোলা হইয়াছিল, কিন্তু পীড়িত ও অকর্মণ্যদের সেবার ভার সরকার বে-সরকারী দান সাহায্যের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কানপুর অঞ্চলে সরকার হইতে শব ফেলিবার ব্যবস্থা হয়, অনুমান ৮ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা পড়িয়াছিল; ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ-কমিশন বলেন যে উক্ত অনুমান কম হইয়াছিল। ১৮৩৮ ও ৩৯ সালে গুজরাট, কচ্ছ ও কাথিবাড়ে অকাল ও ১৮৪৪ সালে দাক্ষিণাত্যে অন্নাভাব হইয়াছিল।

১৮৫৪। মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদের কিয়দংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সরকার এবার 'রিলিফ' কার্য্য খুলিয়া বহু অনাথের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। নয় মাস ধরিয়া ৫০ হাজার লোক কাজ করিয়াছিল।

১৮৫৭। এই সালের পর ভারতবর্ষ শাসনের ভার কোম্পানীর হাত হইতে বৃটীশ পার্লামেণ্টের হাতে গেল। সিপাহী বিদ্রোহের পর গোল মিটাইয়া বসিতে বসিতে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ দেশকে আক্রমণ করিল।

১৮৬০-৬১। এই দুর্ভিক্ষ দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলেই ভীষণাকারে দেখা দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশের রাজনীতি, শাসন-পদ্ধতি ও অর্থনীতি সমস্তের মধ্যেই একটা নাড়া পড়িয়া যায়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অর্দ্ধেকের উপর রাজস্ব মাপ করিতে সরকার বাধ্য হন। এই দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৫ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। সরকার দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়—ইহার মধ্যে সাধারণে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা দেয়। দুর্ভিক্ষান্তে দুর্ভিক্ষের কারণ, কতখানি স্থানে অভাব হইয়াছিল, কত লোক অনাহারে মরিয়া ছিল ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকার কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ নামে জনৈক বিচক্ষণ কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন।

১৮৬৫-৭। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ নামে বিখ্যাত; তবে মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশেও হইয়াছিল। সবসমেত ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ লোকের মধ্যে অন্নাভাব দেখা দেয়। উড়িষ্যার কষ্টের তুলনা হয় না। সরকার দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে ভুল সংবাদ পাইয়াছিলেন। সত্য খবর পাইবার পর উড়িষ্যাতে শস্য পাঠাইবার সময় চলিয়া গিয়াছিল; তখন উড়িষ্যায় রেল হয় নাই। সমুদ্রপথে জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান পাঠাইলে উড়িষ্যায় পৌঁছিল আশ্বিন মাসে। বন্দর হইতে শস্য দেশের মধ্যে লইয়া যাইবার উপায় ছিল না। ফলে উড়িষ্যার ১০ লক্ষ বা এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সরকারী রিপোর্ট অনুসারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। শোনা যায় মাদ্রাজে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ ও অন্যান্য স্থানে প্রায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার লোক মরিয়াছিল। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে সরকারের প্রায় ১½ কোটি টাকা নানাভাবে লোকসান হয়। উড়িষ্যায় সরকারী রিলিফে প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং দুই বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাত ভাত দেওয়া হইয়াছিল। মাদ্রাজে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ পাত ভাত বিলি করা হয়।

১৮৬৮-৭০। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের অভাবের ক্রন্দন থামিতে না থামিতে পশ্চিমে ও উত্তরভারতবর্ষে অনাহারের বিকট রূপ দেখা দিল। রাজপুতানায় ইহা বড়ই তীব্রভাবে হয়। এইখানেই প্রায় ১২ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশেও কেহ কেহ বলেন প্রায় ১২ লক্ষ লোক অনাহারে বা অনাহারজনিত পীড়ায় মারা পড়ে। এবারের দুর্ভিক্ষে কেবল যে মানুষের খাদ্যশস্যের অভাব হইয়াছিল তাহা নহে, গো-মহিষের খাদ্য ও জলের অভাব খুব হয়। রিলিফ কার্য্যে ভারত সরকার প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন ও ৭ লক্ষ টাকা সরকার কৃষকদের ধার দেন। এই গেল রাজপুতানা ও আজমীরের কথা। আগ্রা

প্রদেশেও প্রায় সর্বসমেত ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। বৃষ্টির অভাবে এই দুর্ভিক্ষ হয়।

১৮৭৩। বঙ্গ, বিহার, সংযুক্তপ্রদেশের পূর্বদিকে, মধ্যভারতে ও বুন্দেলখণ্ডে দুর্ভিক্ষ হয়। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বড়ই নিদারুণ হইয়াছিল; সেবার বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট খুবই তৎপরতা ও দক্ষতার সহিত রিলিফ কার্য্য করিয়াছিলেন। সরকারের প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এবারে মানুষ বেশী মরে নাই।

১৮৭৬-৭৮। দক্ষিণ ভারতবর্ষ, মান্দ্রাজ, মৈশূর, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই অঞ্চলে ১৮৭৬ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; পর বৎসরে এই মন্বন্তর মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইতিপূর্বে এরূপ অন্নাভাব কখনো হয় নাই। দুঃখের বিষয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ রিলিফকার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে পারেন নাই। সরকার বলিলেন যে মানুষের প্রাণরক্ষা করা কখনই সরকারের দায় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। খরচের দিকে না তাকাইয়া জীবনরক্ষার ভার লওয়া সরকারের সাধ্যের বাহিরে। কাহাকেও অলস হইয়া খাইতে দেওয়াটা নীতিবিরুদ্ধ; সুতরাং এবিষয়ে খুব কড়াক্কড়ি হওয়াতে ফলটা হইল ভীষণ। দুর্ভিক্ষ কমিশন (১৮৭৮-৮০) অনুমান করেন যে কেবলমাত্র বৃটিশ ভারতে খুব কম করিয়া ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক এই দুই বৎসরে অনাহারে বা অনাহারজনিত পীড়ায় মারা পড়ে। এক মৈশূরেই ১১ লক্ষ লোক মরিয়াছিল।

১৮৭৮-১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতে দুইটি দুর্ভিক্ষ ও পাঁচটি অকাল হয়; তবে সেগুলি সমস্ত দেশব্যাপী হয় নাই, অনাহারে মৃত্যুও হইয়াছিল বলিয়া খবর পাওয়া যায় না।

১৮৯৬-৯৭। বৃষ্টির অভাবে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, বিহার, মধ্যভারত, রাজপুতানা, পঞ্জাব, বর্মা প্রভৃতি

দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বৃটীশভারতেই ৬ কোটি ২৫ লক্ষ লোক অভাবগ্রস্ত হয়। সরকার প্রায় ৭ কোটি টাকা রিলিফে, ১½ কোটি টাকা খাজনা মাপে, ১½ কোটি টাকা ঋণদানে ব্যয় করেন। এক মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশেই রিলিফের কার্য্য খুব ভাল হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন বৃটীশ ভারতে ৫০ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। সরকারী কমিশন বলেন এরূপ দুর্ভিক্ষ পূর্বে ভারতে কখনো হয় নাই। সরকারী ইংরাজ কর্মচারীগণ দুর্ভিক্ষের সময়ে কলেরা প্রভৃতি মহামারী ব্যাধির সহিত কি ধীরভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্ময় লাগে। সমস্ত কর্মচারী প্রাণভয়ে পলাইয়াছে কিন্তু ইংরেজ কর্মচারী প্রাণ দিয়া নিজের কর্তব্য করিয়াছেন।

১৮৯৯-১৯০০। পূর্বোক্ত দুর্ভিক্ষের জের মিটিতে না মিটিতে ১৮৯৮ সালে আজমীঢ়ে অকাল দেখা দিল ও পর বৎসরে মৈসুমবায়ুর অভাবে পশ্চিম ও মধ্যভারতে ভীষণ রকম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেশীয় রাজ্যদের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, কাথিবাড়ে দুর্ভিক্ষ হয়। বৃষ্টি অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১১ ইঞ্চি কম হয়। ১৯০০ সালে এপ্রিল মাসে প্রায় ৬৫ লক্ষ লোককে রিলিফকাজ দিতে হইয়াছিল। সরকারী কমিশন অনুমান করিলেন প্রায় ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক মারা পড়ে, গো-মহিষও বিস্তর মরে। সরকারের প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

১৯০১-১৯০৭। পর্য্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে বড় রকমের দুর্ভিক্ষ না হইলেও প্রাদেশিক দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব অনেক বার হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে ভারতে প্রায় ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য কম উৎপন্ন হয়। সরকার ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা চাষীদের অগ্রিম দেন।

বিংশ শতাব্দীতে ছোট ছোট দুর্ভিক্ষ অনেকগুলি হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে যুক্তপ্রদেশে যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় ১৭ হাজার বর্গ মাইল স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ৩০ হাজার বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অকাল দেখা দেয়; কিন্তু

সরকারী রিলিফের কার্য্য খুবই ভাল চলিয়াছিল বলিয়া ইহা মারাত্মক হয় নাই। ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের বাঁকুড়াজেলার দুর্ভিক্ষের কথা অনেকের স্মরণ আছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসর দেশের চারিদিক হইতে নিদারুণ অভাবের কথা শোনা গিয়াছিল। ১৯২০ সালের পুরীর দুর্ভিক্ষ সেদিন শেষ হইয়াছে।

পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে চিরদিন হইয়া আসিতেছে এবং এখন পর্য্যন্ত তাহা কমে নাই। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন বলেন যে গড়ে প্রত্যেক সাতটি সুবৎসরে দুইটি করিয়া দুর্বৎসর হয়। আর দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রায় বারভাগের একভাগ লোক অভাবগ্রস্ত হয়। কতকগুলি প্রদেশে সহজেই অভাব হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এমন বৎসর যায় না যখন কোথায় না কোথায় দুর্ভিক্ষ অল্প বিস্তর না থাকে। বড় বড় দুর্ভিক্ষ কয়েক বৎসর অন্তর হয়, কিন্তু সেইরূপ ভীষণ মন্বন্তর হইবার পূর্বে আভাষ পাওয়া যায়।

দুর্ভিক্ষের প্রধান ও প্রথম কারণ বৃষ্টির অভাব; যেবার সময় মতো বৃষ্টি হইল না অথবা বারিপাত কম হইল সেবারই শস্যের অভাব হয়। শস্যের দাম চড়িয়া থাকে, এবং শ্রমজীবিদের মধ্যে যাহারা সাধারণতই শ্রমবিমুখ তাহারা গিয়া ভিক্ষুকের দল পুষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে ঋণ দুর্লভ হয় ও ভিক্ষার অভাব দেখা দেয়। চুরি ডাকাতি বাড়িতে থাকে এবং বেশ একটা চঞ্চলতা দেখা যায়। খাদ্যাভাবে দেশের স্বাস্থ্যহানি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রকার সংক্রামক ব্যাধির আগমন দুর্ভিক্ষের প্রথম সূচনা জানাইয়া দেয়।

সরকার বহুবার দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোন্ প্রদেশের কোথায় দুর্ভিক্ষ হইলে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দুর্ভিক্ষ আইন পুস্তকে (Famine Code) লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে প্রত্যেক সরকারী

কর্মচারীর কর্তব্য নির্দ্ধারিত আছে। দুর্ভিক্ষের সূচনা হইলেই সরকার নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করেন। পুরাণো কূপগুলি ঝালাই, নূতন কূপ খনন ও গ্রামের অন্যান্য উন্নতির জন্য সরকার প্রচুর অর্থ অগ্রিম দেন; বে-সরকারী সাহায্য লাভ করিবার জন্য জেলার কর্মচারীরা চেষ্টা করেন, আগামী বৎসরের জন্য বীজ কিনিতে টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়; অসহায় পথিককে উদ্ধারের জন্য পুলিশের হাতে কিছু টাকা দেওয়া থাকে: লোকের যথার্থ অভাব হইয়াছে কি না জানিবার জন্য সরকার কাজ করিতে ডাকেন; ইহাকে 'Test work 'যাচাই কাজ' বলা হয়। বড় বড় সহরে দরিদ্রাবাস খোলা হয়। রাজস্ব মাপ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লওয়া সুরু হয়; প্রত্যেক জেলা বা প্রদেশের মধ্যে রিলিফ-এলাকা তৈয়ারী করা হয়। গো-মহিষাদির খাদ্য বা জলাভাব হইলে সরকার বাহির হইতে পশুখাদ্য আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া সাহাযা করেন।

'যাচাই কাজের' উদ্দেশ্য দুর্ভিক্ষ দমন নয়, লোকের যথার্থ অবস্থা জানিবার ইহাই একমাত্র উপায়। অভাব যদি সত্য হয় তবে সেই যাচাই কাজকে রিলিফ-কাজে পরিণত করিয়া যথাবিধি সাহায্য দান করা হয়। যাহারা কাজ করিতে আসে তাহাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ফুরান বা মজুরী হিসাবে পয়সা দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে যে মজুরী দেওয়া হয়, তাহা দেহকে কোনো প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষেই উপযুক্ত। এ ছাড়া অনেক লোককে বিনাশ্রমেই খাইতে দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর দরিদ্রাবাসে অনাথ ও অক্ষম লোকে আহার্য্য বা খোরাকী পায়। দরিদ্রাবাসে বহু ভিক্ষুক সেই সময়ে আসিয়া জোটে; এ ছাড়া অনেকে জাত্যাভিমানে শারীরিক শ্রম করে না—তাহারা দরিদ্রাবাসে আসিয়া জোটে।

সরকারী এই সব কাজ ছাড়া খৃষ্টান মিশন, ব্রাহ্ম মিশন, রামকৃষ্ণ

মিশন, আর্য্য মিশন ও অন্যান্য অনেক ভারতীয় সেবা-সমিতি দুর্ভিক্ষের সময়ে কাজ করেন। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে সরকার কৃষকদের টাকা কর্জ দিয়া আস্তে আস্তে রিলিফ কাজ ওঠান।

ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের কারণ প্রাকৃতিক ও আর্থিক। প্রাকৃতিক-কেন তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। বৃষ্টিই কৃষির প্রাণ, সেই বৃষ্টি কম হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হয়। সেই হেতু জলসেচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য খাল তৈয়ারীর প্রয়োজন এত অধিক। ১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছিলেন যে, সকল প্রদেশে বড় বড় খাল খনন করা সম্ভব না হইলেও ছোট ছোট খাল ও জলাশয় খনন করিবার অনেক কাজ বাকি আছে। এ ছাড়া 'শুষ্কচাষ', বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশমধ্যে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হওয়া দরকার। অনেক সময়ে ভীষণ বন্যায় শস্য ক্ষেত নষ্ট হইয়া যায়; জল চলাফেরার পথ পরিষ্কার থাকিলে এমন বন্যা হইতে পারে না। পঙ্গপালের উৎপাতেও বহুবার শস্য নষ্ট হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের প্রাকৃতিক কারণগুলি খুব বড় হইলেও এইগুলিই প্রধান নয়,—ইহার প্রধান কারণ আর্থিক। শস্যের অভাব স্থানে স্থানে হয়—কিন্তু শস্যের অভাবে লোকে মরে না, লোকে মরে শস্য কিনিবার টাকার অভাবে। বস্ত্রের অভাবে যখন কোনো স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, তখন স্থানীয় বাজারে কাপড়ের অভাব দেখা যায় না, তেমনি অর্থের অভাবে লোকে শস্য কিনিতে পারে না। শস্যের অভাবে মরে না। সুবৎসরে চাষী বাঁচিয়া থাকে, অকালের দিনে তাহার বাঁচিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য প্রবাদগত। দুর্ভিক্ষের সময়ে ভিক্ষা দেয় নাই এমন সুসভ্যজাতি পৃথিবীতে নাই। ১৯১৮ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে কানাডার টরেণ্টোবাসীরা অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য টাকা তুলে; কিন্তু তাহারা ভারতের দারিদ্র্যের চিত্র নাকি খুব অতিরঞ্জন করিয়া বর্ণনা করিয়াছিল বলিয়া ভারত-সচিব তাঁহাদের দান

গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের একমাত্র ব্যবসায় ও উপজীবিকা কৃষি। কেবল কৃষি করিয়া জাতি বাঁচিতে পারে না। আমাদের শিল্পকলা ধ্বংস হইয়াছে—তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতোর সকলেই চাষ করিতেছে। শিল্প ও কৃষির মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। একজন কৃষক বৎসরের অধিকাংশ সময় হয় বসিয়া না হয় সামান্য দিন মজুরী করিয়া কাটায়—কোনো শিল্প তাহার জানা নাই। এমন কি তাঁতির ছেলে তাঁতের কাজ জানে না বা শিখিতে চায় না; কারণ কাপড় বুনিয়া তাহার পোষায় না। কয়েকজন মাত্র লোক ধনী ও ব্যবসায়ী হইলে ভারতের এই দারিদ্র দুঃখ দূর হইবে না। যুদ্ধের সময়ে অনেকে ধনী হইয়াছেন। তাহাদের অর্থ দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে দেশের দারিদ্র্য কমিয়াছে তবে তাঁহারা সত্যদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলেন। সরকার দেশের দারিদ্র্য যাহাতে দূর হয় সে জন্য জলসেচনের জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন; শিল্পবিভাগের উন্নতিকল্পেও বহু অর্থ ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; কৃষির দিকে তাঁহাদের সুদৃষ্টি পড়িয়াছে; কিন্তু সরকার যেমন চেষ্টা করিতেছেন দেশের লোকেও তাহার উপযুক্ত হইবার চেষ্টায় পিছপাও হইলে চলিবে না। সেই চেষ্টার নাম 'কো-অপারেশন' বা সমবায় বা একজোট হইয়া লেন-দেন করিবার শক্তির বিকাশ।

১৯০০ সালে জয়পুরের মহারাজা ১৬ লক্ষ টাকা সরকারের হাতে দিয়া একটি দুর্ভিক্ষ-তহবিল খুলিতে বলেন। সেই টাকা হইতে দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত প্রদেশগুলিকে রক্ষার চেষ্টা হয়। বর্তমানে সেই তহবিলে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা জমিয়াছে।

৪। সমবায় ও যৌথ ঋণদান সমিতি

জগতের অতীত ইতিহাস—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও বলবানের উৎকর্ষ সাধনের ইতিহাস। জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সহকারিতা, সহযোগিতা ও আপামর সাধারণের আনন্দ দিবার জন্য প্রয়াসের ইতিহাস। বর্ত্তমানজগৎ অতীতের দ্বন্দ্বের যুগ ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের সাম্যের যুগে যাইতেছে বলিয়া চারিদিকে এমন বিভীষিকা। ভারতবর্ষেরও উন্নতি নির্ভর করিতেছে সেই সমবায় ও সহকারিতার উপর।

ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, এখানকার শতকরা ৭২ জন লোক কৃষিজীবী, সুতরাং তাহাদের উন্নতিতেই জাতির কল্যাণ। কৃষি ও কৃষকের দশা আমাদের দেশে ভাল নয়। টাকা ধার করিবার সুযোগ-সুবিধা না থাকিলে কোনো দেশেই চাষের কাজ ভালরূপে চলিতে পারে না। ছোট ছোট জোতদার ও কৃষকের টাকার প্রয়োজন খুবই বেশী এবং সেই জন্যই দেখা যায় পৃথিবীর সর্বত্র তাহারাই দুঃসহ ঋণের ভারে মারা পড়ে। যাহারা জমির মালিক ও চাষী আমাদের দেশে সেই শ্রেণীর ছোট ছোট জোতদারের সংখ্যাই বেশী এবং অধিকাংশ কৃষকই মহাজনের কাছে ঋণী। আমাদের চাষীদের শতকরা ৭৫ জনের কিছু না কিছু ঋণ আছে। পঞ্জাবের কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিষ্ট্রার কৃষিজীবিগণের ঋণবৃদ্ধি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন যে বড় বড় জমিদারগণ যে পরিমাণে রাজস্ব গভর্ণমেণ্টকে দিয়া থাকেন, তাঁহাদের দেনা তাহার সাত গুণ। কিন্তু ছোট ছোট জমিদারের (অর্থাৎ যাহাদের পঁচিশ বিঘা জমি আছে) দেনা তাহাদের দেয় রাজস্ব হইতে আটাশ গুণ বেশী! সমগ্র পঞ্জাবের কৃষিজীবীদের দেনার সমষ্টি ত্রিশ

হইতে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা। ১৮৯৫ সালে মান্দ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে ঐরূপ তদন্তের ফলে জানা গিয়াছিল যে দেনার সমষ্টি ছিল এক কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বা ১৩ কোটি হইতে ১৯ কোটি টাকা। ভারতবর্ষের ঠিক দেনার সমষ্টি কত হইবে তাহা জানা নাই, তবে কেহ কেহ অনুমান করেন মোট ঋণ প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকা হইবে। ইহা অসম্ভব নয়, কারণ বাংলাদেশের এক ফরিদপুর জেলার কৃষিজীবির মোট ঋণ দেড় কোটি টাকা বা প্রতি কৃষক পরিবারের ঋণ গড়ে প্রায় ১২১৲ টাকা ছিল —সেও ১৯০৬ সালে। বোম্বাই প্রদেশের একটি কৃষিপল্লীর অবস্থা তদন্ত করিয়া তৎকালীন কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ ম্যান্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের ঋণ ১১৮৲ টাকা। ব্যাপারটি খুব ভাবনার বিষয় বলিয়া সরকার খুবই চিন্তিত; কেন না যতদিন কৃষক ঋণভারে প্রপীড়িত থাকিবে, ততদিন তাহাদের আর্থিক বা নৈতিক উন্নতির আশা অল্প। অথচ মূলধন নাই বলিয়া তাহাদের ঋণ করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। মহাজনকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষে কৃষিকর্ম চলিতে পারে না। সকল প্রকার সুখ-দুঃখের একমাত্র সহায় গ্রামের 'মহাজন'। মহাজন সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথা শুনা যায়—কিন্তু এই মহাজনের অভাবে চাষ বন্ধ হইয়া যায়। চাষীরা মহাজনের কাছ হইতে কখন টাকা বা কখন বীজ কর্জ করে। অধিকাংশ প্রজা মাঠের ফসল বন্ধক দিয়া টাকা লয়। ধান উঠিলে ঋণশোধ করিয়া যদি কিছু থাকে ত' সে ঘরে তোলে, তারপর সারা বৎসর মজুরী করিয়া কোনো রকমে চালায়; আবার চাষের সময় ঋণ করে। এইরূপেই তাহার জীবন কাটে। যাহাদের অল্পস্বল্প জমি আছে, তাহারা মহাজনের কাছে সহজেই ঋণ পায়। অনায়াসে ঋণ করিবার সুযোগ পাইয়া ইহারা অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে ঋণের দায়ে সমস্ত জমি মহাজনের হাতে পড়িয়াছে।

মহাজন সাধারণত কৃষকের নিকট হইতে অতিরিক্ত হারে সুদ আদায় করিয়া থাকে। সুদের হার স্থান ও পাত্রভেদে কমবেশী হয়; সুদ শতকরা বার্ষিক ৩৭॥০ টাকা হইতে ১৫০৲ পর্য্যন্ত আদায় করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ১৮৲ হইতে ৩০৲ টাকার বেশী লওয়া হয় না। মহাজন ৯৯৲ টাকা ধার দিয়া ৬,০০০৲ টাকা ডিক্রি পাইয়াছে, ৯৯৲ টাকা ধার দিয়া ৪,০০০৲ সুদে আসলে দাবী করিয়া ৫৮৫৲ টাকা ডিক্রি পাইয়াছে এরূপ অনেক উদাহরণও পাওয়া যায়।

চাষবাসের ফলাফলটা কিছু অনিশ্চিত এবং কৃষকের ঋণ শীঘ্র আদায় না হইবার আশঙ্কা থাকায় তাহাকে টাকা ধার দিতে গিয়া মহাজন অধিক সুদ হাঁকিয়া বসে। তা ছাড়া অধিকাংশ মহাজনের মূলধনও অল্প। ভাল করিয়া চাষবাস করিতে যে টাকা প্রয়োজন হয় মহাজন তাহা দিতে পারে না বা দেয় না। এই কারণে ইচ্ছা থাকিলেও চাষী কৃষি-উন্নতির জন্য কিছু করিতে পারে না।

বহুকাল হইতে ভারতীয় কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার নানা প্রকার প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের মনে উদয় হইয়াছে। বিশেষতঃ যতবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ততবারই তাঁহারা একটা কিছু করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন; কিন্তু ঠিক পথ নির্দেশ করিতে না পারিয়া অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। ১৯০১ সালে লর্ড কর্জ্জনের আমলে দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিলেন যে কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার জন্য ও চাষবাসের উন্নতির জন্য টাকা ধার দিবার সহজ পথ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন। ইহার পূর্বে যে সকল আইন কানুন হইয়াছিল তাহাতে দেশের ব্যাধির যথার্থ প্রতিকার হয় নাই, তাহা সাময়িক উপশমের জন্য প্রলেপের মতো কাজ করিত। লর্ড কর্জ্জন ১৯০৪ সালে যৌথ ঋণদান সমিতি স্থাপনের এক আইন মঞ্জুর করিলেন।

প্রধানত কৃষকদের পক্ষে সহজে ঋণ পাওয়ার কিছু সুবিধা করিয়া

দেওয়াই এই আইনের উদ্দেশ্য। যাহাতে পল্লীর সূত্রধর, কর্মকার কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পীগণও টাকা পাইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা হইল। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া 'রেজিষ্ট্রার' নিযুক্ত হইল এবং কাজ সুরু করার মত মূলধন ভারত সরকার দান করিলেন। তবে ব্যাঙ্কের অংশ বিক্রয় করিয়া ও জনসাধারণের গচ্ছিত টাকা লইয়া উহাকে চালাইবার ইচ্ছা সরকারের ছিল। ১৯১৫-১৬ সালে মোট মূলধন ছিল ১০, ৩২, ৬৭, ১৪৯ টাকা; ইহার মধ্যে ১১ লক্ষ টাকা রাজকোষ হইতে ধার দেওয়া হইয়াছিল, বাকি সমস্তই অংশ বিক্রয়লব্ধ ও গচ্ছিত টাকা। ১৯০৪ সালের পর ১৯১২ সালে কো-অপারেটিভ বা সমবায় সম্বন্ধে আইন নূতন করিয়া প্রণীত হয়। আমরা নিম্নে সরকারী পুস্তক 'ভারত বিবরণী' হইতে যৌথ-সমাজ সম্বন্ধে কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি:—

"এই যৌথ-সমাজ অনুষ্ঠানটির বিস্তৃতির কোন সীমা নাই বলিলেই চলে। এখনও সমগ্র ভারতবর্ষে তেত্রিশ হাজার সমাজও স্থাপিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ২৯,০০০ সমাজ কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত। ভারতবর্ষে অনেক বিষয় ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, সেই পুনর্গঠনে যৌথ-সমাজ অনেক কাজে লাগিবে। অবশ্য এই অনুষ্ঠান যাহাতে ঠিক পথে চালিত হয় তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বশেষে দায়ী। কিন্তু সাধারণের মনে একটা ইচ্ছা জাগিয়াছে যে, ইহা বেসরকারী ব্যক্তিদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এটা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজে অস্পৃশ্য জাতিবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষ প্রসার হইতেছে। এ প্রদেশে যৌথ সমাজগুলির সভ্যসংখ্যা আড়াই লক্ষ......বঙ্গপ্রদেশে যৌথসমাজের সংখ্যা ছিল ৩৯২৩; পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা ৫০০ বাড়িয়াছিল। সভ্যসংখ্যা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার। পঞ্জাবপ্রদেশে কৃষিজীবিগণের যৌথ-সমাজের সংখ্যা ৩৯৩৭ হইতে ৫২২৮তে উঠিয়াছিল। উক্ত প্রদেশে ১৪টি জেলায় ১৪৮টি যৌথসমাজ দশ বৎসর হইতে কাজ করিতেছে। ইতিমধ্যে সভ্যগণের মধ্যে

সিকি ভাগের অধিক এখন সমবায়ের কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হইয়াছে। লাহোর জেলায় অনেকগুলি যৌথসমাজ সামাজিক ব্যাপারে কতকগুলি অসঙ্গত ধুমধামে অন্যায় ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া আইন করিয়াছে। এইরূপ অনেক জনহিতকর নিয়ম দেশের নানা স্থানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোম্বাইএ যৌথ-সমাজের সংখ্যা ও তাহাদিগের মূলধন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৯ সালে সমাজের সংখ্যা দুই হাজারের অধিক ছিল ও মূলধন এক হইতে দেড় কোটির মধ্যে। এখানে অনেক বেসরকারী দক্ষ লোক পাওয়া যায় ও সেইজন্য উক্ত প্রদেশে এই শুভ অনুষ্ঠানের এত প্রসার হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে যৌথ-সমাজের সংখ্যা ২৮৭৬ হইতে ৩১৮৬তে উঠিয়াছিল, কিন্তু সভ্যসংখ্যা ৯২ হাজারই আছে, তবে তাহাদের টাকা বাড়িয়াছে। বেহার-উড়িষ্যা প্রদেশে যৌথ-সমাজের সংখ্যা ছিল ২০৪৪। বস্তুত যৌথ-সমাজের স্থাপনা কেবল টাকা ধার দিবার জন্য নহে, অন্যান্য উদ্দেশ্যেও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। দোকানদার জিনিষ-পত্রের দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া দিলে, যৌথসমাজ মাল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া সস্তায় বেচিয়া সভ্যগণের অনেক সুবিধা করিয়াছিল।”

যৌথসমাজের একমাত্র কাজ ঋণদান নয়; চাষীরা জোট বাঁধিয়া সার, লাঙ্গল, বীজ খরিদ করিতে পারে; ব্যয়সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারে; ফসল গোলাজাত করিতে, গরু-বাছুরের উন্নতি বিধান করিতে পারে। দালাল আসিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বেশীর ভাগ লাভ করে, চাষীরা একত্র হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ধান, গম, শস্য, তরীতরকারি, ডিম প্রভৃতি জিনিষ চালান করিতে পারে। আবার সহর হইতে জিনিষ-পত্র কিনিয়া নিজেদের জন্য আনিতে পারে। এই বেচা ও কেনা দুইই যৌথ-সমাজের দ্বারা হইতে পারে। মাঝে পড়িয়া যাহারা কৃষকের সর্বনাশ করিতেছে

তাহাদের সুদিন চলিয়া যাইবে; প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর মুক্তি নাই, ভারতেরও নাই। সহকারিতা ও সমবায়তায় ভারতের মুক্তি।

"সমবায়তা একদিকে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রের নির্জীব অবিচ্ছন্নতায় অপর দিকে একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিষ্ফলতায় আঘাত করে, একদিকে রাষ্ট্রচেষ্টার মধ্যে মানুষের স্বচেষ্টার অবসাদকে অপরদিকে ব্যক্তিগত দৌর্বল্যের মধ্যে সমষ্টিগত শক্তির বিক্ষেপকে নিরস্ত করিয়া দেয়।" *

Co-operation strikes at the same time at the dead abstractions of the socialistic State and at the sterility of individualism, that corrosion of energy, that dispersion of collective force in individual frailties.—Romain Rolland.

* 'কৃষি-উন্নতি' হইতে

	৯০৬-০৭			৯২০-২১
	১৯০৯-১		৯-২	
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৭			৪৪৯
সুপারভাইসিং ও গ্যারাণ্টি য়ুনিয়ান ব্যাঙ্ক	...	...	৬৩৮	১,১৫০
কৃষি সমবায়	১,৭১৩	৮৯১	২৫,৮৭৩	৩২,৫৮২
সা রণ সমব য় সমিতি	১৯৬	৬৬৪	১,৬৬২	৩,৩২২
মোট—	১,৯২৬	১১,৭৮৬	২৮,৪	

ndian Year Book 1927 p. 408.

* অপর পৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ দেখুন

সমবায় সমিতির সংখ্যা

	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৪৮০	৫১৪	৫৩০	৫৫৫
সুপারভাইসিং ও গ্যারাণ্টি য়ুনিয়ান ব্যাঙ্ক	১,২৪০	১,৩৭৯	১,৪০২	১.৩৪০
কৃষি সমবায়	৪৬,৭৮৮	৫০,২৮৬	৫৪,৬৮৫	৬৪,২৮১
সাধারণ সমবায় সমিতি	৩,৬৭৪	৩,৯৫৭	৪,৫২৯	৫,৪৩২
মোট—	৫২,১৮২	৫৬,১৩৬	৬১,১০৬	৭১,৬০৮

Indian Year Book 1927, p 408.

গ্রন্থপঞ্জী

(BIBLIOGRAPHY)

General

Holdich, T. H.—India—Regions of the World Series —H. Frowde, 1904.

Imperial Gazetteer in 4 Vols.—Clarendon Press, 1908: Vol. I. Physical; Vol. II. Historical; Vol. III. Economical; Vol. IV. Administrative.

India [From 1917 to 1924—25] by L. F. Rushbrook-Williams. [Formerly known as "Material and Moral Progress of India"—a Blue-book submitted to the Parliament]—Govt. Publication.

India in 1925—26 by J. Coatman [the same series as above]—Govt. Pub., 1926.

Indian Year-Book—Ed. by S. Reed, Times of India, Bombay, since 1914……to 1927.

Indian Cyclopaedia—Ed. by P. T. Chandra—Hyderabad, Sind.

Oxford Survey of the British Empire, Vol. II, Asia—Ed. by A. T. Herbertson and O. J. R. Howarth;

Provincial Geographies of India Series.

(*a*) Bengal, Bihar and Orissa by L. S.S. O'Malley.

(*b*) The Punjab, N. W. Frontier Province and Kashmir by James Douie.

Statistical Abstract for British India—Department of Commercial Intelligence and Statistics, 1st. Issue 1912-13 to 1921-22; 2nd. Issue 1913-14 to 1922-23; 3rd. Issue 1914-15 to 1923-24; 4th. Issue 1915-16 to 1924-25.

Sea-borne Trade of British India with the British Empire and Foreign Countries, for the years 1923, '24, '25.

Bengal Administration Report—1923, 1924, 1925.

Census of India, 1901, 1911, 1921.

Census of Bengal, 1901, 1911, 1921.

Part I.

CHAP. I.—Physical.

Douie, James—Chap. I of the Punjab etc., Provincial Geographies (see above).

Holdich, T. H.—India (see above) Chaps. II-VI.

„ „ —Physical Aspects—Imp. Gaz. Vol. 1, Chap. I (see above).

O'Malley, L. S. S.—Chap. I. of Bengal etc., Provincial Geographies (see above).

Mackinder, Halford J.—The Sub-continent of India—Chap. I of Cambridge History of India, Vol. I, 1922.

Oldham, R. D.—Physical Geography and Geology, see Oxford Survey above.

CHAP. II.—Meteorology.

Article in the Imp. Gaz. Vol. 1., Chap. III. For further reference see Bibliography under the article.

Eliot, J.—Climatological Atlas of India—Govt. Pub.

Walker & Hem Raj—Climate and Weather, see Oxford Survey above.

Holdich—India, Chap. XII.

CHAP. III.—Flora.

Rocksburg—Flora Indica.

Bose and Kirtikar—Indian Medicinal Plants, 2 Vols. Text—Panini Office, Allahabad.

Hooker, J. D.—Botany—see Imp. Gaz., Vol. I, Chap. IV.

Chatterjee, Bhim Chundra—The Economic Botany of India.

Eardley Wilmot, Sainthill—Vegetation, Forestry, Chap. III. The Oxford Survey.

Brandis, D.—Indian Trees.

Hooker, J. D.—Flora Indica.

V. Ball—Economic Geology of India.

CHAP. IV.—Fauna.

Blanford, W. T. - Zoology—Chapter V.

Imperial Gazetteer, Vol. I, Chap. V.

Cunningham, D. D.—Plagues and Pleasures of Life in Bengal. Murray—'07.

Cunningham, D. D.—Some Indian Friends and Acquaintances. Murray—'03.

Sterndale, Robert A.—Natural History of Mammalia of India and Ceylon. Spink—'84.

Eardley Wilmot, Sainthill—Fauna, see above Oxford Survey—Chap. III.

CHAP. V.—Ethnology.

Baines, Athelstane—Ethnography (castes and tribes) —Grundriss Series. Strassburg, 1912.

Crooke, W—The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh. Vols. I, II, III, IV.—1896.

Ibbetson, Denzil—Punjab Castes, 1916.

Risley, Herbert—The Peoples of India, 1908.

Rose, H. A.—Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier Province. Vols. I, II. 1919.

Thurston, Edgar—Castes and Tribes of Southern India, Vols. I to VII, 1909.

Risley, H.—Tribes and Castes of Bengal, 4 Vols.

Iyer, Ananta Krishna—The Cochin Tribes and Castes—2 Vols., 1912.

Risley, H.—Ethnology and Caste—see Imp. Gaz., Chap. VII, Vol. I.

Russell & Hiralal—Castes and Tribes of Central Provinces, 4 Vols., *Mac.*

P. Mitra—Pre-historic India—2nd Edition.

CHAP. VI.—Languages.

Grierson. G. A.—Languages—Chap. VII of Imp. Gaz., Vol I—see the exhaustive bibliography, Appendix II, Imp. Gazetteer Vol. 1, Chap. VII.

Chatterjee, Sunitee Kumar—Origin and Development of Bengali Language, 2 Vols, Cal. Univ.

Bhattacharya, Bidhu Sekhar—Introduction to the Pali Prakash.

Grierson, G. A.—Index to the Languages of India. Govt. Pub.

Part II.

Chap. I.

Brij Narain—The Population of India.—Lahore, 1925.

Sarkar, Kishori Lal—A Dying Race—How Dying? —Calcutta, 1912.

Banerjee, U. N.—Hindu—A Dying Race.

Wattal, P. K.—The Population Problem in India, Bombay—1916.

Census Reports—India & Bengal (see above).

William Archer—The Future of India.

CHAP. II.

Census Reports—(See above) Chapts. on Age, Sex and Marriage.

CHAP. III.

Roberts, A. F.—Public Health and Vital Statistics, Chap. X.

See—Imperial Gaz., Vol. I, Chap. X.

See—Bibliography—Imperial Gazetteer, Vol. I, Ch. X.

Annual Report of the Sanitary Commissioner with the Government of India.

Report of the Indian Plague Commission.

Provincial Reports of Vaccination.

Bentley, Charles—Report on Malaria.

Cunningham, J. M.—Cholera—What can the State do to prevent it?

Ross, Ronald—Report on the Nature of Kala-Azar.

Lane, Major Clayton—Hook-worm Disease and how to prevent it ?

Medical Administration, Hospitals and Sanitation : Imperial Gazetteer—Vol. IV, Chap. XIV.

CHAP. IV.—Town and Village.

Baden-Powell, B. H.—Village Communities in India.

Baden-Powell, B. H.—The Indian Village Community.

Jack, J. C.—The Economic Life of a Bengal District.

Matthai, John—Village Government in British India.

Mukherji, Radha Kamal—Foundation of Indian Economics.

Mann, Harold—Some Deccan Villages—Studies made by Poona Agricultural College workers.

Slater, Gilbert—Some South Indian Villages—(Economic Studies, Vol. 1) 1918.

Reports of the Punjab Economic Enquiry Committee.

CHAP. V.—Infirmities.

Annual Reports on Lunatic Asylums (New Mental Hospital)—Provincial.

Infirmities—Census Reports (see above).

CHAP. VI.—Occupation.

Article on Occupation—Census Reports—Imperial and Provincial.

CHAP. VII.—Migration.

Population—Imp. Gaz.—Vol. I, Chap. IX.—Migration—(Inter).

Emigration—India of To-day Series.

Report on Inland Emigration—by the Superintendent of Emigration.

Proceedings of the Assam Labour Enquiry—by the Secretary Assam Labour Enquiry Cmmittee, 1906.

See Census Reports.

Part III.

CHAP. I.—Religion.

Crooke, W.—Religions—Imp. Gaz., Vol. I, Chap. VIII.

Barnett , L. D.—Hinduism—1906.

Barth, A.—Religions of India—Translated by J. Wood.

Eliot, Charles—Hinduism and Buddhism. 3 Vols, 1921.

Hopkins, E. W.—The Religions of India.

Macnicol—Indian Theism.

Monier-Williams—Religious Thought and Life in India. 1883.

Farquhar—Outlines of Religious Literature of Ancient India.

Bishop Whitehead—Indian Problems.

CHAP. II.—Castes.

Bhattacharya, Jogendranath—Hindu Castes and Sects, 1896.

Ketkar, Shridhar V.—History of Caste in India.

Shama Sastri—Evolution of Caste, Parts I and II.

Senart, Emile—Les Castes dans L'inde. 1896.

Wilson, John—Indian Caste (2 Vols), 1877.

Census Reports—Chapters on Caste.

CHAP. III.

Society of Bengal.

লালমোহন বিদ্যানিধি—সম্বন্ধ নির্ণয়।

নগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ৫ম খণ্ড।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—জাতিভেদ।

হরিপদ শাস্ত্রী—ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস।

হরিলাল চট্টোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণ ইতিহাস।

CHAP. IV.

Brahmo Samaj.

Farquhar, J. N.—Modern Religious Movement in India. Mac, 1918.

Lillingston (Frank)—Brahmo Samaj and Arya Samaj. Mac, 1901.

Ramananda Chatterjee—Rammohan Roy and Modern India.

Sivanath Sastry—History of the Brahmo Samaj. 1911.

Sitanath Tattvabhusan—Philosophy of Brahmoism.

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী।

CHAP. V.

Arya Samaj.

Lajpat Roy—Arya Samaj—Longmans.

Dayananda Saraswati—Light of Truth (Eng. Trans.)

Swami Dayananda Saraswati—a critical review of his career together with a short life sketch.

Indian Spirituality or the Travels and Teachings of Sivanarayana—Mohinimohon Chatterji. 1907.

Amrita Sagara—(The teaching of Sivanarayan in Bengali)—Mohinimohon Chatterji.

Swami Dayananda—Report of the Bharat Dharma Mahamandal for the year 1920.

Report of the Arunachal Mission—Lila Mundir, Deoghar.

CHAP. X.—Parsis, Islam and Christianity.

Karaka Dosabhai Framji—History of the Parsis—Vols. I and II. 1884.

Modi, Jevanji Jamshedji—The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees.

Claims and Teachings of Ahmad.

Mirza Ghulam Ahmad—The Teachings of Islam.

Life and Works of Sir Syed Ahmad.

Stoddard, Lothrop—New World of Islam. 1921.

Andrews, C. F.—North India English Church.

History of Christianity in India—Sketch compiled from Sherring Smith, Bodley and Reports—S. P. C. K., Madras.

I. J. S. Taraporewala—Zorastrianism.

Part IV.

CHAPS. I. and II.

See Bibliography at the end of ভারতে জাতীয় আন্দোলন।

CHAP. III.—Education.

Mukhapadya, U. N.—হিন্দু জাতির শিক্ষা, Vols. 1, II.

Adams—Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar.

Basu, B. D.—History of Education in India under the Rule of the East India Company.

Huque, M. Azizul—History and Problems of Moslem Education in Bengal, 1917.

Lajpat Rai—The Problem of National Education in India—(Madras).

Ghose, Aurobinda—A System of National Education.

Panikar, (K. M.)—Essays on Educational Reconstruction in India—(Madras), 1920,

Village Education in India—The Report of a Commission of Inquiry.—Y. M. C. A.

Annual and Quinquennial Reports on Education—Govt. Pub.

J. N. Ghose—History of Education under British Rule.

CHAP. IV.—Topical Literature.

কেদারনাথ মজুমদার—বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্য।

Basu, Phanindranath—A Hundred Years of Bengali Press.

[illegible]—A few articles in the [illegible] [illegible]

[illegible] History of Bengali Literature, Vol. [illegible]

Part V.

Administration.

Kale, V. G.—Indian Administration. [Poona—1917]

Ilbert—The New Constitution of India—[Lon. Univ. Press, 1923]

Montague-Chelmsford Report on Constitutional Reforms, 1918.

Macdonald, J. Ramsay—The Government of India. [London]

Sapre, B. G.—The Growth of Indian Constitution. [Bom. Book Dep, 1925]

Strachey, John—India—Mac.

Thakore, B. K.—Indian Administration to the dawn of Responsible Govt.—[1765—1920]

Das, Taraknath—Sov ereign Rights of the Indian Princes—(Ganesh & Co.)

Sir T. B. Sapru—The Indian Constitution.

Part VI.

CHAP. I.—Land-System.

Baden-Powell, B. H.—A Short Account of the Land Revenue and its Administration in B. India with a Sketch of the Land Tenures (Ox—1894).

Baden-Powell, B. H.—The Land System of India, 3 Vols. (1892).

Dutt, R. C.—Open letters to Famines and Land Assessments in In[illegible]

Datta, [illegible] [illegible] Propr[illegible]

(C[illegible]

Report of the Taxation Committee—1925.

Roy, S. C.—Land Revenue Administration in India —Cal. Uni.

For Chaps. II and III see Bibliography under part V.

CHAP. IV.—Army.

See above—Part V.

Esher Committee's Report on the Army in India —1919—20.

Skeen Committee Report.

Indian Army—Government of India Publication.

Part VII.

CHAPS. I—IX. Economics.

Bhatnagar, B. G.—The Bases of Indian Economy, 1925—Allahabad.

Chatterji, H. C.—Indian Economics—1922.

Digby, William—Prosperous British India—[London, 1901.]

Gokhale, G. K.—Speeches of G. K. Gokhale. [Mad. —1921.]

Sarkar, Jadunath—Economics of British India. [Cal., 1917.]

Kale, V. G.—Indian Economics—[Poona—1922.]

Kale, V. G.—Gokhale and Economic Reforms— [Poona 1916.]

Krishna Rao, G. V.—The Plunder of India's Wealth [Tagore & Co., Madras.]

Krishna Mu[illegible], T. S.—Reverse Councils and other Organised [illegible]—[G[illegible] & Co., Mad.]

CHAP. V.—Mines and Minerals.

Wadia—Wealth of India—Mac.

Ball, V.—Economic Geology of India.

Quinquennial Report of the Geological Survey of **India.**

Part IX.

CHAP. .—Industries and Trades.

Arts and Manufactures—Imperial Gaz., Vol. III, Chap. IV.

S. A. Latifi—The Export Trade of Rice.

Wallace—The Romance of Jute.

Watts—Commercial Products of India.

Bose, Pramathanath—Essays and Lectures on the Industrial Development of India—Calcutta, 1906.

Das, Rajanikanto—Production in India.

Cotton, C. W. F.—Hand-book of Commercial Information for India—Calcutta, 1924.

Holland - Industrial Hand-book (Indian Munitions Board) Calcutta, 1919.

Mukerji, Bijoy.—The Cottage Industry of Bengal.

Das Gupta, Satischandra - Khadi Manual, Vols. I. & II. (Khadi Pratisthan).

Fraser, Lovat—Iron and Steel in India, 1925.

Solomon—Protection for Steel in India—Calcutta University Press.

Rao, Ra[illegible]—The Economics of Leather Industry, Calc[illegible]

Talcherka[illegible] [illegible]5

Indian Industrial Commisson Report.

Reports of the Tariff Board on Cotton, Steel, Cement and Paper.

CHAP. II—Commerce.

See Bibliography under Part VII, Chap. I.

Shah, K. T.—Trade, Tariffs and Transport in India—1923.

Wacha, D. E.—Commerce and Statistics.

Annual Statement of the Sea-borne Trade of British Empire and Foreign Countries—[Vols. I and II.] 1927.—

S. N. Haji—Economics of Shipping.

CHAPS. III & IV.

Dutt, R. C.—Economic History of India, 2 *vols.*

Digby—Prosperous British India.

Naoroji—Un-British Rule in British India.

J. C. Sinha—Economic History of Bengal, 1757—1793.

P. D. Mukerjea—The Co-operative Movement in India.